মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

ঊনত্রিংশ বর্ষ

১৩২৬

কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭৯, বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

———

সাহিত্য, ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সুদাসের রাজধানী ও বিশ্বামিত্রের বাসস্থান।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় 'সাহিত্যে' রাজা সুদাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধগুলি 'বেদ-প্রবেশিকা' নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি ঐ সকল প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, সুদাসের রাজধানী 'কুরুক্ষেত্রের সীমান্তে মৎস্যদেশে অবস্থিত ছিল।' (১) তাঁহার মতে, মগধের পশ্চিমে ভোজপুর নামক স্থানে বিশ্বামিত্র ঋষির বাসস্থান ছিল। (২)

কোন্ যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বটব্যাল মহাশয় সুদাসের রাজধানীর অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, প্রবন্ধে তিনি তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, পরুষ্ণী (বর্ত্তমান রাভী) নদীর কূলভেদ করিতে আর্য্য নরপতিগণ দলবদ্ধ হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা সুদাসের সহিত আক্রমণকারীদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে সুদাস তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া সমগ্র উরুক্ষিতির ঈশ্বর হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে আমরা অনুমান করি, রাভী নদীর তীরে রাজা সুদাসের রাজধানী ছিল। অপর এক প্রবন্ধে এই বিষয় সবিস্তার দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

ঋষি বিশ্বামিত্রের বাসস্থান সম্বন্ধে বটব্যাল মহাশয় কতকগুলি যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা সেই সকল প্রমাণ বিচারসহ কি না, নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব। বটব্যাল মহাশয় যে সকল যুক্তি উপন্যস্ত করিয়াছেন, প্রথমতঃ পাঠকদিগের নিকট সে সকল উপস্থিত করিতেছি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেপ-উপাখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বামিত্র ঋষি অজীগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেপকে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের পদে বরণ করেন। কিন্তু তাঁহার এক শত পুত্র ছিল। উহাদের মধ্যে প্রথম ৫০ জন শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তাহাতে তিনি উহাদিগকে ত্যাগ করেন, এবং 'অন্ত্যজাতিভাক্

---

(১) বেদ-প্রবেশিকা; পৃঃ ১৪১।

(২) এক্ষণে মগধের পশ্চিমে যে ভূখণ্ড ভোজপুর নামে বিখ্যাত, তথায় বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা নামক মহর্ষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।—বেদ-প্রবেশিকা, পৃঃ ৬১।

হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। এই ৫০ জনের মধ্যে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রেরা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ে দেখা যায়, ভীম পুণ্ড্রাধিপকে জয় করিয়া বঙ্গরাজ-জয়ে গমন করেন। অতএব মহাভারতের কালে বঙ্গের পশ্চিমভাগ পুণ্ড্রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে ৭০০।৮০০ খৃষ্টের পূর্ব্বে ভোজগৌড় নামক এক নৃপতি গৌড় নগর স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলার ভবুয়া মহকুমায় বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ঐ স্থানের নাম ভোজপুর।

ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ঋষির বিরচিত একটী সূক্তের দুইটী ঋকে কীকট, প্রমগন্দ ও ভোজ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বটব্যাল মহাশয় উল্লিখিত প্রমাণ সকলের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্রের যজমানগণ ভোজ নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান ভোজপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ এই ভোজপুরের ভোজ-গৌড় নামক নৃপতিই গৌড় নগর স্থাপন করেন। পৌণ্ড্রগণ গৌড়দেশে বাস করিত, এবং উহারাই বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত-পুত্র-বংশীয় ছিল।

আমরা প্রথমতঃ বিশ্বামিত্র-রচিত ঋক্দ্বয় উদ্ধৃত করিয়া, বটব্যাল মহাশয়ের যুক্তি কত দূর সমীচীন, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

কিম্। তে। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু। গাবঃ ন। আশিরং। দুহ্রে। ন। তপন্তি। ঘর্ম্ম্।
আ। নঃ। ভর। প্রমগন্দস্য। বেদঃ নৈচাশাখম্। মঘবন্। রন্ধয়। নঃ॥—৩.৫৩।১৪

কীকটদিগের গো সকল তোমার কি করে? (তাহারা) তোমার আশির (অর্থাৎ সোম-মিশ্রণ-দুগ্ধ) দোহন করে না। তোমার (সোমের) ঘড়া উত্তপ্ত করে না। হে মঘবন্! প্রমগন্দের ধন আমাদিগকে দাও; নীচাশাখ পুত্রকে আমাদিগের বশে আনয়ন কর।

[সায়নাচার্য্য কীকটের 'অনার্য্য জনপদ সকল বা যাগ হোমাদি ক্রিয়ায় অবিশ্বাসী নাস্তিক' অর্থ করেন। প্রমগন্দ শব্দের অর্থ করেন—কুসীদি-কুল।]

ইমে। ভোজাঃ। অঙ্গিরসঃ। বিরূপাঃ দিবঃ। পুত্রাসঃ। অসুরস্য। বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায়। দদতঃ। মঘানি সহস্রসাবে। প্র। তিরন্তে। আয়ুঃ॥—৩.৫৩.৭

এই সকল ভোজ, বিবিধ-রূপ-যুক্ত, অঙ্গিরার স্বর্গীয় পুত্রগণ, অসুরের বীরগণ, সহস্র (সোম) অভিষব যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে ধন সকল প্রদান কর, আয়ু বর্দ্ধিত কর।

বটব্যাল মহাশয় ১৪শ ঋক্ হইতে অনুমান করিয়াছেন, বিশ্বামিত্রের বাসস্থান কীকটদিগের সন্নিহিত ছিল, এবং কীকটদিগের দেশই মগধ দেশ। কারণ, এই

ঋকে 'প্রমগন্দ' শব্দ বর্তমান। তাঁহার মতে, প্রমগন্দ হইতে মগন্দ এবং পরে মগন্দ হইতে মগধ শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। (১) এই শব্দতত্ত্ব দ্বারা তিনি কীকট-দিগের দেশকে মগধ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন, মগধের ঠিক্ পশ্চিমে অবস্থিত সাহাবাদ জেলার ভোজপুর নগরে বিশ্বামিত্রের যজমান ভোজগণ বাস করিতেন। কীকটগণ ভোজদিগের প্রতিবেশী বলিয়াই তাহাদের উপর উপদ্রব করিত, (২) ইহাই বটব্যাল মহাশয়ের ধারণা।

রাজা সুদাস দশ জন অ-যজ্ঞকারী রাজার সহিত যমুনাতীরে এক যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধ ভেদের যুদ্ধ বলিয়া বেদে প্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্র ঋষি ভারত-দিগের অধিনায়ক হইয়া সুদাসের সাহায্যার্থ ঐ যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধ-জয়ের পর সুদাস এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞের অশ্ব লইয়াই বিশ্বামিত্র ঋষি কুশিকদিগের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হন। বটব্যাল মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, বিশ্বামিত্রের অনুচর 'কুশিকেরা সুদাসের অশ্বমেধের অশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত হয়েন।' (৩) পূর্ব্বোল্লিখিত যে দুইটী ঋকের বলে বটব্যাল মহাশয় বিশ্বামিত্রের বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ দুইটী একই সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তটী বিশ্বামিত্র ঋষির বিরচিত। আমরা অনুমান করি, তিনি অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া ভ্রমণের কালে কীকটদিগের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইলে, একটী যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র ও মরুৎগণকে রক্ষার্থ আহ্বান করেন। সেই যজ্ঞের জন্যই এই সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ আমরা নিম্নে যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের ভ্রমণের কি নিয়ম ছিল, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৪) এই ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ ও ঋগ্বেদের

(১) বেদ-প্রবেশিকা; পৃঃ ৫৪।

(২) 'কীকট-ভূমির অন্য নাম মগন্দ, বা মগধ রাজ্য। ইহাতে মগধের সীমান্তেই বিশ্বামিত্রের বাস ছিল, বোধ হইতেছে। অন্যথা, মগধের দস্যুগণের সহিত বিশ্বামিত্র-যজমান-গণের বিরোধের কারণ কি? মগধের পশ্চিম পার্শ্বেই ভোজপুর। ইহাতেও বিশ্বামিত্রকে ভোজপুরীয়া বলিয়া অনুমান করি।'—বেদ-প্রবেশিকা, পৃঃ ৫৪।

(৩) বেদ-প্রবেশিকা; পৃঃ ১৪১।

(৪) In front (of the sacrificial ground) there are those keepers of it ready at hand,—to wit, a hundred royal princes, clad in armour; a hundred warriors armed with swords; a hundred sons of heralds and headmen, bearing quivers filled with arrows; and a hundred sons

পরে রচিত হইলেও, এই নিয়ম যে ঋগ্বেদের কালেও প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

অশ্বমেধের অশ্ব এক বৎসর তাহার ইচ্ছামত ভ্রমণ করিবে, এই নিয়ম শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যাইতেছে। এই ভ্রমণকালে তাহার সহিত শত বর্ম্মধারী রাজপুত্র, শত খড়্গধারী বীর, শত ধনুর্ব্বাণধারী ভট্ট ও গ্রামাধ্যক্ষ, শত যষ্টিধারী সারথি ও অনুচর এবং শত বৃদ্ধ অশ্ব গমন করিত। ইহাকে দিকে দিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপ্য, সাধ্য, অন্বাধ্য ও মরুৎগণকে প্রার্থনা করা হইত।

অশ্বমেধের অশ্বকে ভ্রমণের জন্য মুক্ত করিবার সময় একটী যজ্ঞ করা হইত। পাছে শত্রুগণ ঐ অশ্বের অনিষ্ট করে, বা উহাকে আবদ্ধ করে, সেই জন্য উহার সহিত বীরপুরুষগণ গমন করিতেন। যদি কোনও জাতি অশ্বের ভ্রমণে বাধা দিত, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ বাধিত। আমরা অনুমান করি, বিশ্বামিত্র-প্রমুখ ভারতদিগের সহিত কীকট জাতির এইরূপ এক যুদ্ধ হইয়াছিল। বৈদিক যুগে, যুদ্ধকালে যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগের সহায়তা-লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইত। বিশ্বামিত্রও কীকটদিগের সহিত যুদ্ধকালে একটী যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র ও মরুৎদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ যজ্ঞে তিনি যে স্তব পাঠ করেন, তাহাই ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্ত; এবং বটব্যাল মহাশয়-ধৃত দুইটী ঋক্ ইহারই অন্তর্গত।

বিশ্বামিত্র ঋষি যে যজ্ঞে এই সূক্ত পাঠ করেন, তাহা অশ্বমেধের অশ্বকে এক বৎসর ভ্রমণার্থ মোচন করিবার যজ্ঞ নহে। কারণ, ঘোটক কোন্ স্থানে বা কোন্ জাতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবে, তাহা তখন জানা থাকে না। কিন্তু বিশ্বামিত্র-ঋষি-বিরচিত সূক্তে কীকটগণ শত্রুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আমাদের অনুমান যে সত্য, তাহা এই শব্দই সপ্রমাণ করিতেছে। এই সূক্তের অপরাপর

---

of attendants and charioteers, bearing staves ; and a hundred exhausted, worn-out horses amongst which, having let loose that (sacrificial horse), they guard it.—*XIII Kanda, 4 Adhyaya, 2 Brahmana 5.*

He says, 'O ye gods, guardians of the regions, guard ye this horse, consecrated for offering unto the gods !' The (four kinds of) human guardians of the (four) regions have been told, and these now are the divine ones, to wit, the Apyas, Sadhyas, Anvadhyas, and Maruts ; and both of these, gods and men, of one mind, guard it for a year without turning it back.—*XIII Kanda, 4 Adhyaya, 2 Brahmana, 16. Satapatha-Brahman Vol. V. pp. 355 and 359.*

ঋক্‌ও যে আমাদের মতের সমর্থন করে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে কতক-গুলি উদ্ধার করা যাইতেছে। (১)

উদ্ধৃত ৮ম ঋকে ইন্দ্রকে অনৃতুপা বলা হইয়াছে। কারণ, ইন্দ্র যুদ্ধের দেবতা বলিয়া অনেক সময় তাঁহার যজ্ঞের কালাকাল বিচার করা চলে না। ঋষি

---

(১) রূপং রূপং। মঘবা। বোভবীতি মায়াঃ। কৃণ্বানঃ। তন্বম্। পরি। স্বাম্।
ত্রিঃ। যৎ। দিবঃ। পরি। মুহূর্তম্ আ। অগাৎ। স্বৈঃ। মন্ত্রৈঃ। অনৃতুপাঃ। ঋতাবা॥
—৩।৫৩।৮

মঘবান্ (ইন্দ্র) মায়া করিয়া নিজ তনুকে নানা রূপ দিতে পারেন। যেমন দিব্য লোক হইতে তিন (সবনে) ঋতুকালে সোমপানকারী (ইন্দ্র) স্বীয় মন্ত্র সকলের দ্বারা (আহূত হইয়া) মুহূর্তমধ্যে আগমন করেন, অঋতুতেও (তিনি) সোমপানকারী।

মহান্। ঋষিঃ। দেবজাঃ। দেবজূতঃ অস্তভ্নাৎ। সিন্ধুং। অর্ণবম্। নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্ অপ্রিয়ায়ত। কুশিকেভিঃ। ইন্দ্রঃ।—ঐ ৯
মহান্, ঋষি, দেবজাত, দেব-তেজে আকৃষ্ট, অশ্বনয়নদিগের মধ্যে তেজস্বী বিশ্বামিত্র জলপূর্ণ সিন্ধুকে নিরোধ করিয়াছিলেন, যখন সুদাসকে বহন করিয়াছিলেন; ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়বৎ আচরণ করিয়াছিলেন।

হংসাঃ ইব। কৃণুথ। শ্লোকম্। অদ্রিভিঃ মদন্তঃ। গীর্ভিঃ। অধ্বরে। সুতে। সচা।
দেবেভিঃ। বিপ্রাঃ। ঋষয়ঃ। নৃচক্ষসঃ। বি পিবধ্বম্। কুশিকাঃ। সোম্যম্। মধু॥—ঐ ১০
হংস সকলের মত শ্লোক (উচ্চারণ) কর; মুষল দ্বারা যজ্ঞে সোম অভিষুত হইলে গীতি দ্বারা মত্ত হও। হে বিপ্র, ঋষি, নৃচক্ষা কুশিকগণ দেবতাদিগের সহিত সোম্যমধু পান কর।

উপ। প্র। ইৎ। কুশিকাঃ। চেতয়ধ্বম্ অশ্বং। রায়ে। প্র। মুঞ্চত। সুদাসঃ।
রাজা। বৃত্রম্। জঙ্ঘনৎ। প্রাক্। অপাক্ উদক্। অথ। যজাতে। বরে। আ। পৃথিব্যাঃ॥
—ঐ ১১

হে কুশিকগণ! সুদাসের অশ্ব-সমীপে গমন করিয়া চেতনা দাও, এবং ধনলাভার্থে মোচন কর। রাজা (সুদাস) পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, অনন্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে যজ্ঞ করিতেছেন।

যঃ। ইমে। রোদসী। উভে অহম্। ইন্দ্রম্। অতুষ্টবম্।
বিশ্বামিত্রস্য। রক্ষতি। ব্রহ্ম ইদম্। ভারতম্। জনম্॥—ঐ ১২
যে আমি উভয় দ্যাবা-পৃথিবীকে (ও) ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছি; বিশ্বামিত্রের স্তোত্র এই ভারত-জনকে রক্ষা করে।

বিশ্বামিত্রাঃ। অরাসত। ব্রহ্ম। ইন্দ্রায়। বজ্রিণে।
করৎ। ইৎ। নঃ। সুরাধসঃ॥—ঐ ১৩
বিশ্বামিত্রগণ বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তব করিয়াছে; (তিনি) আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র বিপদে পড়িয়াই অঋতুতে, অর্থাৎ অসময়ে তাঁহার যজ্ঞ করিতেছেন, এই ঋকে তাহারই আভাস দিয়াছেন। ভেদের যুদ্ধে গমনের সময় বিশ্বামিত্র ঋষি বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীর সঙ্গমস্থলে আগমন করিয়া দেখেন, তাহারা জল-পূর্ণা হইয়াছে। রথ, শকট, সৈন্য লইয়া পার হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য তিনি

কিম্ । তে । কৃণ্বন্তি । কীকটেষু । গাবঃ... ।—ঐ ১৪

(পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া অর্থ করা গিয়াছে)

স্থিরৌ । গাবৌ । ভবতাম্ । বীড়ুঃ । অক্ষঃ মা । ঈষা । বি । বর্হি । মা । যুগম্ । বি । শারি ।
ইন্দ্রঃ । পাতল্যে । দদতাম্ । শরীতোঃ অরিষ্টনেমে । অভি । নঃ । সচস্ব ।—ঐ ১৭

(শকটের) গোদ্বয় দৃঢ় ও (শকটের) অক্ষ দৃঢ় হউক ; দণ্ড না ভাঙ্গুক, যুগ বিশীর্ণ না হউক ; ইন্দ্র পতনকালে কীলকদ্বয়কে ধারণ কর ; হে অরিষ্টনেমি রথ ! আমাদিগের অভিমুখে সংগত হও।

বলং । ধেহি । তনূষু । নঃ বলং । ইন্দ্র । অনড়ুৎসু । নঃ ।
বলং । তোকায় । তনয়ায় । জীবসে ত্বং । হি । বলদাঃ । অসি ।—ঐ ১৮

হে ইন্দ্র ! আমাদিগের দেহ সকলে বল ধারণ কর, আমাদিগের বৃষ সকলে বল (ধারণ কর) ; পুত্র পৌত্রকে জীবন-(রক্ষার) জন্য বল (দাও) ; তুমিই বলদাতা হও।

অভি । ব্যয়স্ব । খদিরস্য । সারম্ ওজঃ । ধেহি । স্পন্দনে । শিংশপায়াম্ ।
অক্ষ । বীড়ো । বীড়িত । বীড়য়স্ব । মা যামাৎ । অস্মাৎ । অব । জীহিপঃ । নঃ ।—ঐ ১৯

খদিরের সারকে (আণির জন্য) দৃঢ় কর ; শিংশপা কাষ্ঠের স্পন্দনে শক্তি প্রদান কর ; হে অক্ষ ! দৃঢ় হও, দৃঢ়ীকৃত হও ; এই গমন হইতে আমাদিগকে পাতিত করিও না।

অয়ম্ । অস্মান্ । বনস্পতিঃ মা । চ । হাঃ । মা । চ । রিরিষৎ ।
স্বস্তি । আ । গৃহেভ্যঃ । আ অবসৈ । আ । বিমোচনাৎ ।—ঐ ২০

এই বনস্পতি (অর্থাৎ রথ) আমাদিগকে যেন না ফেলে, এবং বিনাশ না করে। গৃহে প্রত্যাগমন, রথবেগ-সংবরণ (ও অশ্ব)-বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক।

ইন্দ্র । ঊতিভিঃ । বহুলাভিঃ । নঃ অদ্য যাৎশ্রেষ্ঠাভিঃ । মঘবন্ । শূর । জিন্ব ।
যঃ । নঃ । দ্বেষ্টি । অধরঃ । সঃ । পদীষ্ট যম্ । উ । দ্বিষ্মঃ । তম্ । উ । প্রাণঃ । জহাতু ।
—ঐ ২১

হে ইন্দ্র। হে মঘবন্। হে শূর ! অদ্য আমাদিগকে বহুল রক্ষার দ্বারা, বধ হইতে বাঁচাইবার শ্রেষ্ঠ (রক্ষা) সকলের দ্বারা প্রীত কর। যে আমাদিগকে দ্বেষ করিবে, সে দক্ষিণ দিকে (বা নিম্ন দিকে) গমন করিবে। (আমরা) যাহাকে দ্বেষ করিব, প্রাণ তাহাকে ত্যাগ করুক।

পরশুম্ । চিৎ । বি । তপতি শিম্বলং । চিৎ । বি । বৃশ্চতি ।
উখা । চিৎ । ইন্দ্র । যেষন্তী প্রযস্তা । ফেনম্ । অস্যতি ।—ঐ ২২

হে ইন্দ্র ! যেমন কুঠারকে (প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ) দুঃখ পায়, (যেমন) শিম্বলকে ছেদ করে ; ফাটা স্থালী হইতে যেরূপ, (যেটার) সেইরূপ (মুখ হইতে) ফেনা বহির্গত হউক।

নদীদ্বয়ের স্তব করেন। তাহাতে জল কমিয়া গিয়াছিল, এবং তিনি সুখে সসৈন্যে পার হইয়াছিলেন। ৯ম ঋকে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্যও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসকে লইয়া নদীদ্বয় পার হইয়া গেলে, ইন্দ্র কুশিকদিগের প্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা উল্লেখ করতঃ কুশিকদিগকে তিনি সাহস দিতেছেন। ১০ম ঋকে তিনি কুশিকদিগকে সোম-পানে মত্ত হইতে বলিতেছেন। ১১শ ঋকে সুদাসের অশ্বকে চেতনা দিয়া বন্ধন-মোচন করিবার আদেশ দিতেছেন। এই ঋকে ইহাও জানাইতেছেন যে, সুদাস ঐ সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে যজ্ঞে বৃত হইয়াছেন। ঐ শ্রেষ্ঠ স্থান আমরা রাভী নদীর তীর বলিয়া অনুমান করি। কারণ, তথায় সুদাসের রাজধানী ছিল। ১২শ ও ১৩শ ঋকে, রোদসী ও ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের স্তবে প্রীত হইয়া কুশিকদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বলিয়া তিনি উৎসাহ দিতেছেন। কারণ, কীকটদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত। পর ঋকেই কীকটদিগের উল্লেখ রহিয়াছে। অনুদ্ধৃত ১৫শ ও ১৬শ ঋকে তিনি জমদগ্নির বাক্য উচ্চারণ

ন। সায়কস্য। চিকিতে। জনাসঃ লোধং। নয়ন্তি। পশু। মন্যমানাঃ।

ন। অবাজিনম্। বাজিনা। হাসয়ন্তি ন। গর্দভম্। পুরঃ। অশ্বাৎ। নয়ন্তি॥—ঐ ২৩

হে জনগণ। (যেষ্টা) সায়কের (তেজ) জানে না; লুব্ধকে (অর্থাৎ যেষ্টাকে) পশু মনে করিয়া আনিতেছে। (দেবগণ) জ্ঞানী দ্বারা অজ্ঞানীকে হাসান না; অশ্বের অগ্রে গর্দভকে লইয়া যান্ না।

[আমরা মনে করি, বিশ্বামিত্রের বক্তব্য এই:—হে ভারতজন! শত্রু আমাদের সায়কের তেজ জানে না। ঐ দেখ, শত্রুকে পশুর মত ধরিয়া আনিতেছে। আমি জ্ঞানী, ঋষি; কিন্তু আমাদের শত্রুগণ অজ্ঞানী। ইন্দ্র কি অজ্ঞানীদিগকে জয় প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন? অশ্বের অগ্রে গর্দভকে লইয়া যাইবেন? তাহা কখনই নহে। সায়নাচার্য্য ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন।]

ইমে। ইন্দ্র। ভরতস্য। পুত্রাঃ অপপিত্বম্। চিকিতুঃ। ন। প্রপিত্বম্।

হিন্বন্তি। অশ্বম্। অরণম্। ন। নিত্যং জ্যাবাজং। পরি। নয়ন্তি। আজৌ॥—ঐ ২৪

হে ইন্দ্র! এই ভরতের পুত্রগণ (যেষ্টার সহিত) শত্রুতা জানে, মিত্রতা জানে না। (তাহারা) অরণসদৃশ অশ্বকে নিত্য প্রেরণ করে; যুদ্ধে জ্যা-রূপ বল (অর্থাৎ ধনু) লইয়া যায়।

[নিরুক্তের টীকাকার বসিষ্ঠ-বংশীয়; সুতরাং তিনি এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'সা বসিষ্ঠদ্বেষি ঋক্ অহংচ কাপিষ্ঠলো বাসিষ্ঠঃ অতঃ তাং ন নির্ব্রবীমি।' আচার্য্য রোথ ও মক্ষমূলর বলেন, ঋগ্বেদের অনেক হস্তলিপিতে এই ঋক্ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। রমেশবাবুর ঋক্সংহিতা; পৃঃ ৪২১।]

করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, এই ঋষির বাক্য 'পঞ্চজন'-দিগের কৃষকদিগকে সুমতি ও নূতন আয়ু প্রদান করে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষি, আর্য্য পঞ্চ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই যজ্ঞে ইন্দ্র ও মরুৎদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ঋকে তিনি রথে, রথবাহক বৃষে, পুত্র ও পৌত্রের দেহে বল প্রদান করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এ প্রার্থনা কিসের জন্য? কোনও যুদ্ধের প্রাকালেই এরূপ প্রার্থনার সার্থকতা বুঝা যায়। ২০শ ঋক্ আমাদের মতের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এই ঋকে দেখা যাইতেছে যে, ঋষি নিজ গৃহ হইতে দূরে আসিয়াছেন। এই দূর দেশ হইতে যেন 'ভাগয় ভাগয়' গৃহে প্রত্যাগমন ও অশ্ববিমোচন করিতে পারেন, এই প্রার্থনা করিয়াছেন। ২১শ হইতে ২৩শ ঋকে শত্রু-সংহারের প্রার্থনা আছে। ২৪শ ঋক্, সায়ন মনে করেন, বিশ্বামিত্র ঋষি বসিষ্ঠদিগের বিরুদ্ধে রচনা করিয়াছেন। অথচ ঐ ঋকে বা সমগ্র সূক্তের মধ্যে বসিষ্ঠের নামগন্ধ নাই। এই ঋকের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্র ঋষি দশটী ভারত জাতির সৈন্যাধ্যক্ষ (বা পুরোহিত) হইয়া রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। পরাজিত হইয়া তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন এই যজ্ঞ করেন। এই মত যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা এই সূক্তের অন্তর্গত ৯ম ও ১১শ ঋক্‌দ্বয়ের দ্বারা সুন্দররূপে সপ্রমাণ করা যায়। সায়নাচার্য্য ২৪শ ঋকের অর্থে বসিষ্ঠ ঋষিকে বিশ্বামিত্রের শত্রু-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ৯ম ঋকের অর্থে তিনি বিশ্বামিত্রকে সুদাসের মিত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, সায়নাচার্য্য এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমেশ বাবু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনুসরণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

'মূলে "বিশ্বামিত্রো যৎ অবহৎ সুদাসম্" এইরূপ আছে। সায়ন অর্থ করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্র সুদাসের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু "অবহৎ" শব্দের সে অর্থ সঙ্গত নহে। এবং বিশ্বামিত্র সুদাসের শত্রুদিগের পুরোহিত, সুদাসের জন্য যজ্ঞ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।'—৩।৫৩ সূক্তের ৯ম ঋকের পাদটীকা।

রমেশবাবু এই মত অবলম্বন করিয়া ৯ম ঋকের এই অর্থ করিতেছেন :—

তিনি (অর্থাৎ বিশ্বামিত্র) সুদাস রাজাকে তাড়না করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রকে

কুশিক-বংশীয়দের প্রিয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ১১শ ঋকের কিরূপ অর্থ করিতেছেন, পাঠক একবার দেখুন:—'হে কুশিকগণ! তোমরা অশ্বের সমীপে গমন কর, অশ্বকে উত্তেজিত কর, ধনের জন্য সুদাসের অশ্বকে ছাড়িয়া দাও।' রাজা ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করিয়াছেন, অতএব সুদাস রাজা পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করিতেছেন।'

কেহ কি অনুমান করিতে পারেন, বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু হইয়া যজ্ঞে এইরূপ স্তব করিয়াছেন? রমেশবাবু ইহার কোনও টীকা করেন নাই। বটব্যাল মহাশয় এই ঋকের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন,—কুশিকগণ সুদাসের অশ্বমেধ-অশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিল। অতএব রমেশবাবু ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ যে ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। এই সূক্তে কীকটদিগের নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহারা যে ইন্দ্র-পূজা করে না, তাহাও দেখা যাইতেছে। ইহাদিগকে বশে আনিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা। অথচ বসিষ্ঠ-বংশীয় নিরুক্তের টীকাকার ২৪শ ঋক্‌কে বসিষ্ঠদ্বেষিণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদ্যপি ধরিয়া লওয়া যায় যে, টীকাকারের মত ঐতিহাসিক সত্য, তাহা হইলেও, ঐ সূক্তের অপর ২৩টী ঋক্ যে বসিষ্ঠদ্বেষিণী নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

ভারতদিগের সহিত বসিষ্ঠ-বংশীয় তৃৎসুদিগের প্রতিযোগিতা ঋগ্বেদের কালেই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ইহা ঘোর শত্রুতার আকার ধারণ করিয়াছিল কি না, তাহা ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় না। যদ্যপি পরবর্ত্তী যুগে তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, বিশ্বামিত্র ঋষির স্কন্ধে উহার আরোপ কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

পূর্ব্বোক্ত 'ইমে ভোজা' নামক ৭ম ঋকের অর্থ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এক্ষণে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব, ঋগ্বেদে ভোজ অর্থ কি ছিল। দেখিতে পাই, ভোজ অর্থে দক্ষিণা-দাতা বা দাতা বুঝাইত। (১) কোনও কোনও ঋষি

---

(১) ন। ভোজাঃ। মমূ্রঃ। ন। অর্থং। ঈয়ুঃ। ন। রিষ্যন্তি। ন। ব্যথন্তে। হ। ভোজাঃ। ইদং। যৎ। বিশ্বং। ভুবনং। স্বঃ। চ এতৎ। সর্বং। দক্ষিণা। এভ্যঃ। দদাতি॥

—১০।১০৭।৮

ভোজগণ মরে না, নিকৃষ্টা গতি পায় না; ভোজগণ হিংসিত হয় না, ব্যথিত হয় না; এই যে বিশ্বভুবন ও স্বর্গ, এ সমস্তই ইহাদিগকে (তাহাদের) দক্ষিণা দান করে।

সেই জন্য ইন্দ্রকে ভোজ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১) বিশ্বামিত্র-ঋষি-রচিত ও বটব্যাল-মহাশয়-ধৃত ঋকের 'ইমে। ভোজাঃ। অঙ্গিরসঃ। বিরূপাঃ' অংশের অর্থ সায়ন এইরূপ করিয়াছেন,—'ভোজাঃ সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ তেষাং যাজকাঃ নানারূপা মেধাতিথিপ্রভৃতয়ঃ।' অর্থাৎ, সুদাস-বংশীয়দিগের যজ্ঞকারী, বিবিধ-রূপযুক্ত, মেধাতিথি প্রভৃতি পুরোহিতগণ। কিন্তু ইহার এইরূপ অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ঋগ্বেদের ঋষিগণ অগ্নিকে প্রধান অঙ্গিরা (২) ও নবগ্ব ও দশগ্বগণকে বিবিধ-রূপযুক্ত অঙ্গিরার পুত্রগণ বলিতেন। (৩) ইহাদিগকেই বিশ্বামিত্র ঋষি ভোজ বা দাতা বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। যজ্ঞে মেধাতিথি প্রভৃতি সুদাসের পুরোহিতগণকে আহ্বান করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

ঋগ্বেদের মধ্যে একটী ঋকে পাকস্থামা নামক এক ব্যক্তিকে ভোজ ও দাতা বলা হইয়াছে। (৪) ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, ঋগ্বেদের কালেও ভোজ-বংশীয় রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজা সুদাসকে ঋগ্বেদের কোথাও ভোজ-বংশীয় বলা হয় নাই। যদ্যপি তর্কচ্ছলে সায়নের অর্থ আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে, সুদাসের রাজধানী বটব্যাল মহাশয়ের প্রদর্শিত ভোজপুর

---

(১) কিং। অঙ্গ। ত্বা। মঘবন্। ভোজং। আহুঃ।—১০।৪২।৩

হে মঘবন্! কি জন্য তোমাকে ভোজ বলে?

ভোজং। ত্বাং। ইন্দ্র। বয়ং। হুবেম।—২।১৭।৮

হে ইন্দ্র! ভোজ তোমাকে আমরা আহ্বান করি।

(২) ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরাঃ। ঋষিঃ দেবঃ। দেবানাং। অভবঃ শিবঃ। সখা।
—১।৩১।১

হে অগ্নি! তুমি প্রধান অঙ্গিরা, ঋষি, দেব, দেবতাদিগের শিব সখা হইয়াছ।

(৩) বিরূপাসঃ। ইৎ। ঋষয়ঃ তে ইৎ। গম্ভীরবেপসঃ।

অঙ্গিরসঃ। সূনবঃ। তে অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে।—১০।৬২।৫

বিবিধ-রূপ-যুক্ত ঋষিগণ, তাঁহারা গম্ভীরকর্ম্মা; তাঁহারা অঙ্গিরার পুত্রগণ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

যে। অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে বিরূপাসঃ। দিবঃ। পরি।'

নবগ্বঃ। নু। দশগ্বঃ। অঙ্গিরঃ তমঃ সচা। দেবেষু। মংহতে।—১০।৬২।৬

বিবিধ-রূপ-যুক্ত যাঁহারা দিব্যলোকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, (তাঁহারা) নবগ্ব ও দশগ্বগণ; অঙ্গিরাদিগের মধ্যে (যিনি) শ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের মধ্যে (তিনি) সমান মহীয়ান্ হইয়াছেন।

(৪) তুরীয়ং। ইৎ। রোহিতস্য। পাকস্থামানং। ভোজং। দাতারং। অব্রবং।—৮।৩।২৪

রোহিত (অশ্বের) দাতা ভোজ পাকস্থামকে চতুর্থ (বলি) বলিয়াছি।

হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার মতে, সুদাসের রাজধানী কুরুক্ষেত্রের সীমান্তে মৎস্য দেশে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রথম শূরসেনদিগের রাজ্য, পরে মৎস্য রাজ্য। (১) তাহা হইলে, মৎস্য ও মগধের পশ্চিম ভোজপুর পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত, দেখা যাইতেছে। অতএব বটব্যাল মহাশয়ের মীমাংসা কিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়?

বৈদিক যুগে, মহাভারতীয় যুগে ও অশোকের কালে ভোজরাজ বা ভোজগণ কুরুক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ দেশে বাস করিতেন, অবগত হওয়া যায়। (২) কারণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, দক্ষিণ দেশের সত্বৎ নামক জনগণের রাজা অভিষিক্ত হইয়া ভোজ উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই দক্ষিণ দেশ যে ঐ ব্রাহ্মণে উক্ত মধ্য-দেশের দক্ষিণে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ মধ্যদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই;—ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যদেশে সবশ, উশীনর-গণের ও কুরু-পাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা অভিষিক্ত হইয়া রাজা নামে অভিহিত হইতেন। (৩)

মহাভারতে দেখিতে পাই, সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিতে গমন করিয়া প্রথমে শূরসেন, পরে মৎস্য প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া কুন্তিভোজের রাজ্যে উপস্থিত হন। (৪) মহাভারতে আরও দেখিতে পাই, পুলিন্দ ও অন্ধ্রগণ দক্ষিণ দিকে বাস করিত। (৫) অশোকের সময়েও ভোজ, পুলিন্দ ও অন্ধ্রগণ দক্ষিণ দেশে বাস করিত। (৬) ইহার বহু কাল পরে ৮১৮ খৃঃ অব্দে

---

(১) তথৈব সহদেবোঽপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ।
মহত্যা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশম্॥ ১
স শূরসেনান্ কার্ৎস্ন্যেন পূর্ব্বমেবাজয়ৎ প্রভুঃ।
মৎস্যরাজঞ্চ কৌরব্যো বশে চক্রে বলাদ্বলী॥ ২

(২) দক্ষিণস্যাং দিশি যে কে চ সত্বতাং রাজানো ভৌজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে ভোজেত্যেনানভিষিক্তানাচক্ষত।

(৩) ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দিশি যে কে চ কুরুপঞ্চালানাং রাজানঃ সবশোশীনরাণাং রাজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে রাজেত্যেনানভিষিক্তানাচক্ষত। ঐঃ ব্রাঃ; ৮।১৪

(৪) নররাষ্ট্রঞ্চ নির্জ্জিত্য কুন্তিভোজমুপাদ্রবৎ।
প্রীতিপূর্ব্বঞ্চ তস্যাসৌ প্রতিজগ্রাহ শাসনম্॥—দিগ্বিজয় পর্ব্ব; ৩১ অধ্যায়; ৬।

(৫) পুলিন্দাংশ্চ রণে জিত্বা যযৌ দক্ষিণতঃ পুনঃ।—দিগ্বিজয় পর্ব্ব; ৩১। ১১
অন্ধ্রাংস্তালবনাংশ্চৈব কলিঙ্গানুষ্ট্রকর্ণিকান্। ঐ; ৩১।৭১

(৬) The Bhojas, Pulindas and Pitinikas dwelling among the

রাজপুতানার অন্তর্গত গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যের রাজা নাগভট্ট, কনৌজের রাজা চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (১) তিনি নিজে বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কনৌজকে রাজধানী-রূপে গ্রহণ করেন। নাগভট্টের পৌত্র মিহির, 'ভোজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এত বড় রাজা ছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যকে সাম্রাজ্য বলা যাইতে পারে। (২) তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্বে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধের পশ্চিমে যে ভোজপুর বর্ত্তমান, তাহা মিহির ভোজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, কে বলিতে পারে? পাঠক আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবেন। রাজপুতানার এই রাজা যখন সম্রাট হন, তখন ভোজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জানিয়াছি। মগধের নিকট ভোজপুর নগর অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের কালে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, ভোজগণ অশোকের সময় পর্য্যন্তও দক্ষিণে বাস করিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত শুনঃশেপ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশ্বামিত্রের বাসস্থান নির্দ্ধারিত করা যায় কি না, এক্ষণে আমরা তাহার বিচার করিব। প্রথম মনে রাখিতে হইবে, ইহা শুধু গল্প। শতপথ ব্রাহ্মণে এই গল্পের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, ঐ ব্রাহ্মণেরও পরে ইহা রচিত হইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

---

hills of the Vindhya and Western Ghats; and the Andhra Kingdom between the Krishna and Godabari rivers.

Vincent A. Smith's The Early History of India. p. 184.

(১) About 818 Chakrayudha king of Kanouj was deprived of his throne by Nagbhatta, the ambitious king of the Gurjara-Pratihar kingdom in Rajputana the capital of which was Bhilmal. Nagbhatta presumably transferred the head quarters of his government to Kanouj which certainly was the capital of his successors for many generations, and so again became for a considerable time the premier city of Northern India.—*Vincent A. Smith's Early History of India. p. 378-379.*

(২) The next king, Rambhadra's son Mihir, usually known by his title Bhoja, enjoyed a long reign of about half a century (C. 840—890), and beyond question was a very powerful monarch, whose dominions may be called an 'empire' without exaggeration. They certainly included the Cis Sutlaj districts of the Punjab, most of Rajputana, the greater part, if not the whole, of the United Provinces of Agra and Oudh, and the Gwalior territory...On the east his dominions abutted on the realm of Devapala, king of Bengal and Bihar, which he invaded successfully.—*Vincent A. Smith's Early History of India. p. 379.*

প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই গল্পে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব, এই কয় অন্ত্য জাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা দস্যুদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া বর্ণিত। এই নামগুলি রচয়িতার স্বকপোলকল্পিত নহে; কারণ, ইহাদের অনেকগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহাদিগকে তিনি বিশ্বামিত্র ঋষির অবাধ্য সন্তান-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা গল্প কি ইতিহাস, কে বলিবে?

অতি প্রাচীন কাল হইতে বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র-বংশীয়দিগের মধ্যে যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে বসিষ্ঠ-বংশীয় কেহ বিশ্বামিত্র-বংশীয়দিগের প্রতি কুৎসা বা অপবাদের আরোপ করিয়া উপন্যাস রচনা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা অনুমান করি, শুনঃশেপ উপাখ্যানের লেখক সম্ভবতঃ বসিষ্ঠ-বংশীয় ছিলেন। সেই জন্য অঙ্গিরা-বংশীয় শুনঃশেপকে তিনি বিশ্বামিত্র-বংশের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা যেন বিশ্বামিত্র-বংশ সমাজে উন্নত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইল। আর, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অন্ত্য জাতি—যাহারা আর্য্যদিগের নিকট দাস দস্যু নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহা বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণের অপবাদ-রটনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ঋগ্বেদে যে বিশ্বামিত্র ঋষির রচনা বর্ত্তমান, তিনি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। আমরা অনুমান করি, সুদাসের রাজধানীর নিকট তাঁহার বংশীয় ভারত ও কুশিকগণ অবস্থান করিতেন। রাভী নদীর তীরে সুদাসের রাজধানী ছিল, আমাদের এই অনুমান যদ্যপি সত্য হয়, তবে সেই নদীর তীরেই বিশ্বামিত্রগণ বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য।

১

গল্প আছে, পুরোহিত যজমানের গৃহে আসিয়া 'নূতন পঞ্জিকা' চাহিলে যজমানের বালক পুত্র বহিরাবরণে 'নূতন পঞ্জিকা' মুদ্রিত দেখিয়া গত বৎসরের পঞ্জিকা আনিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সে তাহার ভুলের জন্য লজ্জিত হইলে পুরোহিত বলিয়াছিলেন—যত দিন ব্যবহারফলে পঞ্জিকার বহিরাবরণ ছিন্ন হইয়া না যায়, তত দিন তাহা পুরাতন হইলেও নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে।

আমি আজ যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব, তাহা যদি অনেকের কাছে পুরাতন বোধ হয়, তবে, আশা করি, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। কেন না, পত্রিকার বহিরাবরণ ব্যবহারফলে ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন তাহাকে 'নূতন' বলিয়াই বোধ হয়—সাহিত্যের নূতন স্তরও তেমনই নূতনতর স্তরের নিম্নে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন বলিয়াই পরিচিত হয়। নূতন ভাবের বন্যা সাহিত্যে নূতন স্তর গঠিত করে—ইংরাজীতে তাহাকে renaissance বলে। যত দিন নূতন ভাবের বন্যা পুরাতন বন্যার গঠিত স্তরের উপর নূতন স্তরের সৃষ্টি না করে, তত দিন পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর নূতন। বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা বন্যায় নানা স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। শেষ স্তর—এ দেশে ইংরাজী ভাবের প্রভাবে ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রচারে নূতন ভাব-বন্যার ফল। আমরা আজ সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা ভাষা পুরাতন ভাষা—কপিলবস্তুর প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থ এই ভাষায় পাঠ লইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে কবে এই ভাষার সৃষ্টি, তাহা জানিবার উপায় আজও হয় নাই—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করিবার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতে এ ভাষায় বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত দেশে পণ্ডিতের ভাষা ছিল, কিন্তু দেশের জনসাধারণের জন্য যে সাহিত্য রচিত হইত, তাহা তাহাদের নিত্য-ব্যবহৃত ভাষায়—বাঙ্গালায় রচিত হইত। তাহার অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছে। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাজেই পুস্তকের প্রচারও তত অধিক হইতে পারিত না। এ দেশের জলবায়ু তালপত্রের বা কাগজের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের পক্ষে অনুকূল নহে; কীটের উদরে অনেক পুস্তক জীর্ণ হইয়াছে; রাষ্ট্রবিপ্লবের বন্যায়—বিজয়লালসামত্ত বাহিনীর অত্যাচারে—মোগল পাঠানের আক্রমণে অনেক পুঁথি লুপ্ত হইয়াছে; অনেক পুঁথির সামান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে। আবার এখনও বাঙ্গালায় পুঁথির অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয় নাই—যত সন্ধান হইতেছে, ততই নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধান মিলিতেছে। যে সব পুস্তক সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল, সে সব সর্ব্ববিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করিয়াছে—বাঙ্গালার লোকশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত রাখিয়াছে। সেই সকলের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,

চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে কালের অনেক পুস্তক সংস্কৃত ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে; অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পুস্তকে ফারসী ভাবের ছাপ আছে। শেষোক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য 'ভারতী-ভরসা' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'।

'অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকাল ভারতের ইতিহাসে যুগসন্ধি-সময়। যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হইয়াছিল, তিনি পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের অন্যতম সহায়। পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন যুগের আরম্ভ। দুর্ব্বল মুসলমান-শাসনের পতনকালে ও ইংরাজ-শাসনের প্রবর্ত্তন-কালে দেশে শৃঙ্খলার একান্ত অভাবে সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। ইংরাজ-শাসনে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইলে, যখন রাজা প্রজা উভয়েরই বাঙ্গালার ভাষার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন সে ভাষার সংস্কার-ভার সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের উপর ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার-ভার যাঁহারা লইলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রদ্ধা করিতেন না—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগের একান্তই অভাব ছিল। কাজেই তাঁহাদের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি বা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীসাধনের সম্ভাবনা ছিল না। তখন বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রবাহ সংস্কৃতের বাপী হইতে সামান্য সলিল লাভ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল—গতি মন্দ হওয়ায় আবর্জ্জনায় ও শৈবালে তাহা পূর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, প্রবাহখাতে পঙ্ক সঞ্চিত হইতেছিল। সেই পঙ্কে মূল বিস্তার করিয়া কখনও কখনও দুই একটী পঙ্কজ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু জাতির উন্নতির কোনরূপ সহায়তা-সম্ভাবনা সে প্রবাহে ছিল না। তাহার বক্ষে পণ্য লইয়া তরণীর গতায়াত অসম্ভব হইয়াছিল—তাহার প্রবাহে পূতিগন্ধ ছিল। যাঁহারা এই সময়ের 'রজনীকান্ত' প্রভৃতি অপাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সে কালের একমাত্র শিশুপাঠ্য প্রথমশিক্ষার পুস্তক—'শিশুবোধক'। 'টেকচাঁদ ঠাকুরে'র কৃত কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দুর্দ্দশা, তখন আর এক দিকে ভাবের বারি সঞ্চিত হইতেছিল। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ফলে এবং ইংরাজী ভাবের প্রভাবে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে নূতন ভাবের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল।

সেই উৎসমুখনির্গত বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া প্রবাহিত হইবার পথ সন্ধান করিতেছিল। তাহার প্রথম পরিচয়—প্রচলিত ভাষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে "টেক-চাঁদের" বিদ্রোহ-ঘোষণা। 'টেকচাঁদে'র ভাষা বিদ্রোহের ভাষা, তাঁহার রচনার আদর্শ বিদেশী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—তিনি বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন; তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, 'আমাদের সাহিত্যের উপাদান আমাদের ঘরেই আছে।'

তাহার পর নূতন ভাবের বন্যা বাঙ্গালা ভাষার খাতে প্রবাহিত হইল। তাহার প্রথম ফল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। বাঙ্গালার নূতন renaissanceএর যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পাল, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় বলিয়াছিলেন—

'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্ব্বে কি ছিল, এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদীনির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল।'

সে দিন সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল। সে-ই নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ। তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত-পণ্ডিতরা বাঙ্গালাকে 'গ্রাম্য' এবং ইংরাজী-পণ্ডিতরা 'বর্ব্বর' জ্ঞান করিতেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া ইংরাজী রচনায় যশ অর্জ্জন করিবার মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামবাগানের দত্ত-পরিবার হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত সকলেই বিদেশী ভাষায় রচনা দ্বারা অমরত্ব লাভের দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মধুসূদন বিদেশে চতুর্দ্দশপদী কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভ্রমের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি শেষে বুঝিয়াছিলেন—

'ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি;
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি!'

বঙ্কিমও প্রথমে সেই ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মত তাঁহার ভ্রম অল্প দিনেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। শেষে তিনিই রমেশচন্দ্র দত্তকে ইংরাজীতে পুস্তক রচনা

করিয়া যশ অর্জ্জন করিবার দুরাশা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেই উপদেশের ফলেই বাঙ্গালা সাহিত্য 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'জীবন-প্রভাত', 'জীবন-সন্ধ্যা', এই ঐতিহাসিক উপন্যাস-চতুষ্টয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীতে তাঁহার আত্মচরিতের কতকাংশ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে তিনি 'বঙ্গদর্শন'-প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্রসূচনা'য় লিখিয়াছেন, যে ভাব বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা দেশের অধিকাংশ লোক বুঝে না, কাজেই তাহার প্রচার ব্যর্থ হয়। সুতরাং বাঙ্গালীকে কোনও কথা শুনাইতে হইলে তাহা বাঙ্গালাতেই বলিতে হইবে। তাঁহার আত্ম-চরিতে তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগের শিক্ষা-দান এক জনের দ্বারা সম্ভব নহে—কাজেই অনেককে এক সঙ্গে করিতে হইবে। সেই জন্যই 'বঙ্গদর্শনে'র সৃষ্টি। বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের নৃপতিমণ্ডলে রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনিই শাসক, তিনিই সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির নিয়ামক। তাঁহার সমসাময়িক ও সহকর্ম্মীদিগের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা দেখিলে মনে হয়, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিলে অর্জ্জুন যেমন আর গাণ্ডীব ব্যবহার করিতেও পারেন নাই, তেমনই বঙ্কিমের প্রভাবে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিতেছিলেন, বঙ্কিমের প্রভাব-তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কেহ কেহ আর সে কীর্ত্তিস্তম্ভ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—সেই আরব্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণকীর্ত্তি আকবরের ফতেপুর শিকরীর মত কালের ব্যবধানে আজ দর্শকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসর মাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর্শ স্থাপন করিয়া 'জলবুদ্বুদ জলেই মিশাইয়াছিল'। কিন্তু সেই চারি বৎসরে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সম্পদ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে 'যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের মন্দিরে।' যাঁহার সমালোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না', বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সৌন্দর্য্যরসিক ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-পরিচালনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহায় ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে হরপ্রসাদের অসাধারণ কৃতিত্বের ঔজ্জ্বল্যে আমরা যেন স্বল্পায়ু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বিস্মৃত না হই। 'নব-জীবনে'র অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম উদয় 'বঙ্গদর্শনে'র গগনে। যে চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' বঙ্গসাহিত্যে গদ্যকাব্যের আদর্শ হইয়া আছে, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে তাঁহার সহকারিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের

শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই; কেন না, বঙ্গদেশে এক জন সুকবির আবির্ভাব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবির জন্য যে দুই জন কবির রোদন 'বঙ্গদর্শনে' স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন—হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের নাম বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে না। প্রত্নতত্ত্বে মৌলিক গবেষণা অমূল্য, কিন্তু শ্রমশীল অনুসন্ধানকারী রামদাসের অনুসন্ধান-ফল যে বহুমূল্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 'গ্রীক ও হিন্দু'র লেখক প্রফুল্লচন্দ্রকেও আমরা এই শ্রেণীর লেখক মনে করিতে পারি।

এই সব সহযোগীর ও সহকর্ম্মীর সাহায্যে বঙ্কিম নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত করিয়াছিলেন; ইঁহারা সেই নূতন সাহিত্য-গঠনে যাঁহার যাহা সাধ্য,সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' দেখিলেই বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রকেই সর্ব্ব বিভাগে রচনার আদর্শ-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু সে পথে বাহিনী-চালন করিয়া কেহ ত অগ্রসর হয়েন নাই! আজ তাঁহার আর সে দুঃখের কারণ নাই। সে দিন যে তাঁহাকে দুঃখ করিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সমাজের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ঋষি, তাঁহার দৃষ্টি যত দূর লক্ষ্য করিতে পারিত, তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি তত দূর ভেদ করিতে পারিত না। এই দূরদৃষ্টিবলেই তিনি বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের প্রচ্ছন্ন শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই দূরদৃষ্টিবলেই তিনি সে দিন দেশকে মা বলিয়া চিনিয়া মাতৃমূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন—

'দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত; পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী। দক্ষিণে লক্ষ্মী, ভাগ্যরূপিণী; বামে বাণী, বিদ্যাবিজ্ঞান-দায়িনী; সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়—কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।'

তাঁহার রচনার প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে 'বন্দে মাতরম্' তাঁহার সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সর্ব্বত্র মাতৃপূজার মন্ত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে—ভারতবর্ষের আকাশে, বাতাসে সেই বন্দনা-মন্ত্র ধ্বনিত—ঝঙ্কৃত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-রচনার আদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন, সমালোচনায় দোষ-গুণ-বিচারের পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অধিকার না থাকিলেও কেমন করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝাইতে হয়, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, এবং 'সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত' করিয়াছিলেন। হাস্যরসের অভিব্যক্তি দুই প্রকারে হয়, ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে। ব্যঙ্গের ক্রিয়াক্ষেত্র—বুদ্ধি; বিদ্রূপের ক্রিয়াক্ষেত্র—মনোভাব। যাঁহারা 'লোক-রহস্য' ও 'কমলাকান্ত' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বিমল ব্যঙ্গে ও শাণিত বিদ্রূপে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু এই দুইখানি পুস্তকের রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাব আরও গভীর; উপরে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মৃদুসমীরসঞ্চারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মির খেলা, আর নিম্নে গভীর ভাবের প্রবাহ। বঙ্কিমের স্বাভাবিক হাস্যরসজ্ঞতার পরিচয় সময় সময় অতি সামান্য বিষয়েও ফুটিয়া উঠিত—রবি-কর কেবল কমলদলই বিকশিত করে না, তাহার স্পর্শে তৃণ পুষ্পও মনোহর বর্ণে বিকশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনায় এই রস যেন উছলিয়া উঠিত। কোনও নাটককার তাঁহার নায়িকাকে দিয়া নায়ককে বলাইয়াছিলেন, গুলঞ্চ যেমন নিম্ব-বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাঁহার ইচ্ছা তেমনই ভাবে প্রণয়াস্পদকে বেষ্টন করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করিলেন—'এমন পিত্তহারী প্রেম সচরাচর দেখা যায় না।' এই এক ছত্রে যে সমালোচনা হইল, বুঝি শত পৃষ্ঠা লিখিলেও তাহা হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল, সে তাহার শুচিতা। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের জন্য নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগেই কিরূপ কঠোর ভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি বলিয়াছেন—'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।" আজ বাঙ্গালী লেখককে এই কথা, সাহিত্য-সম্রাটের এই উপদেশ বা আদেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যকে সর্ব্ববিধ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকরা যেন তাহাকে কলঙ্কিত না করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকরা যে তাঁহার প্রতিভাপ্রবাহে পুষ্ট হইয়া-

ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই সমালোচনার আদর্শ তাঁহার পরে 'কাব্যসুন্দরী'র লেখক পূর্ণচন্দ্র বসুর ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের রচনার মধ্য দিয়া অধ্যাপক ললিতকুমারের রচনায় আসিয়া বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারই 'কমলাকান্তে'র স্বদেশপ্রীতি 'আর্য্য-দর্শনে'র সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের রচনায় স্ফুরিত হইয়াছিল। যিনি আর এক দিকে বাঙ্গালায় যুগাবতার, যিনি আর এক ক্ষেত্রে আপনই স্বতন্ত্র, এবং আপনার কীর্ত্তিগৌরবে বাঙ্গালীর নমস্য, সেই স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার নিকট কত ঋণী, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগকে বলিয়াছেন—'আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য-ব্যবসায়ী, তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোনও কালে বিস্মৃত না হন।'

আজ যে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব—সর্ব্ববিধ রচনা সহজ, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে সেই বাঙ্গালা ভাষার সেই স্বাভাবিক শক্তি কাহারও কল্পনায়ও আসিত না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ও সাধনার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাহার সেই শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। তাই আজ বাঙ্গালা ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, ক্রোধে বিকম্পিত, দ্বিধায় বিচলিত, লজ্জায় সঙ্কুচিত, শোকে বিলুণ্ঠিত, করুণায় বিগলিত, গর্ব্বে বিস্ফুরিত হইয়া উঠে। এই বাঙ্গালা ভাষা আমাদের নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক কীর্ত্তি, তিনি সাহিত্যকে ধনীর আশ্রয় হইতে আনিয়া স্ব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য ধনীর আশ্রয়ে থাকিয়া কখনও বা শ্রদ্ধায় কখনও বা অনুগ্রহে পুষ্ট হইত। সে তাহার আপনার মন্দিরে আপনার ভক্তদিগের পুষ্পাঞ্জলি-লাভের কল্পনাও করিতে পারিত কি না সন্দেহ। সে কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা দেখা যাউক। তখনও বাঙ্গালা সাহিত্য লতার মত ধনীকে আশ্রয়তরু-বোধে অবলম্বন করিত, এবং আপনার কুসুমের ঐশ্বর্য্যে সেই আশ্রয়কেও সুন্দর করিয়া তুলিত। আত্ম-শক্তিতে তাহার এই অপ্রত্যয়ে তাহার আত্মসম্মান যে ক্ষুণ্ণ হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে বাঙ্গালায় মহাভারত ও রামায়ণ অনূদিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের বদান্যতায় বাঙ্গালী মহাভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ পাইয়াছে। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণও বাঙ্গালী ধনীর বদান্যতার

ফল। শোভাবাজার রাজবাড়ী হইতে রাজা সার রাধাকান্ত দেবের অর্থে 'শব্দকল্পদ্রুম অভিধান' প্রচারিত হয়। তাহা বাঙ্গালা অভিধান না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বাঙ্গালা সাহিত্য তখনও আপনাকে বাঙ্গালীর উপযোগী করিতে পারে নাই, তাই বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সে সাহিত্য তখনও আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর অত্যাবশ্যক ও নিত্য-সহচর করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যেরও এক দিন এই দশা ছিল। অভিধান-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া জনসন ধনী লর্ড চেষ্টারফিল্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে দীর্ঘকাল জনসন সে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তত দিন উপেক্ষার পর, তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি সমাপ্ত হইবার প্রাকালে, লর্ড চেষ্টারফিল্ড দরিদ্র লেখককে অনুগ্রহ প্রদান করিয়া পুস্তকের সহিত আপনার নাম কালজয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জনসনের প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। আহত-অভিমান-জনিত ক্রোধে জনসন তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা কটু কথনের হিসাবে অতুলনীয়। সেই উত্তরে জনসন বজ্রনাদে ইংরাজ-সমাজে ঘোষণা করিয়া দেন—ইংরাজী সাহিত্য আর কখনও ধনীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে না। জনসন অপমান সহ্য করিয়া সাহিত্যের অপমান দূর করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা বুঝিয়াই সাহিত্যের আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দরিদ্র লেখক রাজকৃষ্ণ রায় আপনার ক্ষমতায় নির্ভর করিয়া রামায়ণের ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আর তাহার পর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু জীবনব্যাপী শ্রমে বাঙ্গালায় বিরাট অভিধান 'বিশ্বকোষ' সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের অবিচলিত ও অনাবিল শ্রদ্ধার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। ধনীর অনুগ্রহ ব্যতীত যে তেমন বিরাট অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালী তাহা মনেও করিতে পারিত না। কিন্তু নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যে সে দিনের 'অসম্ভব' অনায়াসে সম্ভব হইয়াছে।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটি বিভাগ আছে, সে ক্ষণবিধ্বংসী সাময়িক সাহিত্য। সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হয়, তাহা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করে না বটে, কিন্তু তাহা জনসাধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে না

পারিলে ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে, এবং সেই জন্যই তাহাতে লিপিচাতুর্য্য ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য আবশ্যক হয়। সংবাদপত্র এখন সভ্যতার সহচর ও নিদর্শন। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার রাজনীতিক কারণের আলোচনা আমাদের আজিকার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারি না যে, সাহিত্যের এই বিভাগও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্যে বঞ্চিত হয় নাই; অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'র লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক জন ছিলেন। সে কথা অনেকে জানেন না। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার উপর তাঁহার মত-প্রকাশের ধারা কিরূপ ছিল, তাহা 'প্রচার'-পাঠকেরা অবগত আছেন। কংগ্রেস একটু সবল হইলেই সার অকৃল্যাণ্ড কলভিন প্রভৃতি কখনও প্রকাশ্যভাবে, কখনও বা ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের অন্তরালে থাকিয়া, তাহার প্রতি বাণবর্ষণে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রাজা শিবপ্রসাদ সেই দলে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথায় লিখিয়াছিলেন,—যাত্রার দলের রাজা হইলে মধ্যে মধ্যে সং দিতে হয়। আমাদের দেশের রাজত্বহীন রাজার যাত্রার দলের ঝুঁটা মুকুট পরা এবং টিনের তরবারধারী রাজার সঙ্গে তুলনা কত মধুর তাহা 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।' তাহার পর অধিকারীর আদেশে রাজার সাজ বদলাইয়া সং সাজিয়া আসরে আসার কথাটুকুর সার্থকতা অবশ্যই সপ্রকাশ।

এই নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীকে তাহার পুরাতন সাহিত্যের সন্ধানে উৎসাহিত করিয়াছে। সেই পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপকরণ লুক্কায়িত আছে। যাঁহারা রোমে বা বুদ্ধগয়ায় মৃত্তিকায় প্রোথিত পুরাতন কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সন্ধানের ফলে আমরা ইতিহাসের কি অমূল্য উপাদান পাইতে পারি। বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ; বাঙ্গালী প্রাচীন জাতি। এই দেশে এই জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক, কবি, দার্শনিক, শিল্পী, সকলেরই আবির্ভাব হইয়াছে। এই দেশে হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে, হিন্দুধর্ম্মে ও মুসলমান ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে; বৌদ্ধ বিহার হিন্দুর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, হিন্দুর মন্দিরের উপাদানে মুসলমানের মসজেদ রচিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মের দ্বন্দ্বে, রাজনীতির বাত্যায়, জিগীষার বন্যায় ইতিহাসের অনেক উপকরণ নষ্ট হইয়াছে; এই উষ্ণপ্রধান নদীমাতৃক দেশের জলবায়ুর প্রভাবে অনেক শিল্পকীর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; ইহার দ্রুতবর্দ্ধনশীল লতাগুল্মে অনেক কীর্ত্তি আচ্ছন্ন হইয়া লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি সামান্য চেষ্টায়

কত কীর্ত্তির সন্ধানই পাইয়াছেন। যে দেশে সামান্ত সন্ধানেই এত রত্ন মিলে, সে দেশে কত রত্নই ছিল! সামান্য সন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এই বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায় উচ্ছিন্ন করিবার জন্য প্রজারা আপনাদের শাসক নির্ব্বাচিত করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এখন সে সব কীর্ত্তির সন্ধানে আমাদের উৎসাহ হইয়াছে। আর উৎসাহ হইয়াছে—প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে। ভূস্তরে যেমন বিলুপ্ত জীব জন্তুর অবশেষ পাওয়া যায়, প্রাচীন সাহিত্যে তেমনই বিলুপ্ত আচার-ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়—বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বিবিধ ধর্ম্মমতের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালীর উন্নতি-অবনতির ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীন-সাহিত্য-উদ্ধারের কাজে সারদাচরণ মিত্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কালিদাস নাথ প্রমুখ অনেকে সাহায্য করিয়াছেন। এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। *

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কারণটা কি ?

১

মহেন্দ্রবাবু দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া দেশে আসিয়াছিলেন। শীঘ্রই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 'প্রোফেসরি' করিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামক গ্রামে। সেখানে শিক্ষিত লোক নাই বলিলেও হয়। কেবল কৈবর্ত্তের বাস। তাহাদেরই মধ্যে রামধন নামক কৈবর্ত্ত মহেন্দ্রবাবুর বাটীর পুরাতন খানসামা। মহেন্দ্রবাবু তাহাকে লইয়াই আপাততঃ দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছিলেন।

মহেন্দ্র। রামধন!

রামধন। হুজুর!

মহেন্দ্র। তুমি যে কাজটা ক'রবে, এবং যা দেখ্‌বে, তার কারণটা প্রথমে ভেব। জগতে সব জিনিসের মধ্যে কারণ প্রবাহমান। কারণ না থাক্‌লে কোনও ঘটনাই ঘট্‌তে পারে না। যখন কারণ আছে, তখন কর্ত্তা আছে, এবং

* দিনাজপুর 'বঙ্গ-সাহিত্য-সভা'য় পঠিত।

উদ্দেশ্য আছে। এ ব্যাপারটার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা ও অধীনতা। অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

রামধন। হুজুর যা আজ্ঞা ক'চ্ছেন, তা আমার শিরোধার্য্য। ভবিষ্যতে আমি খুব কারণ দেখে বেড়াব। আপাততঃ আমি দশ দিনের ছুটী চাই।

মহেন্দ্র। কেন ?

রামধন। ঐ যে কর্ত্তার কথা ব'ল্লেন, তিনি আজ আমাকে অনর্থক একটা চড় মেরেছেন। ও রকম ওজনের দুটো চার্‌টে চড় খেলে কাজে ইস্তফা দিতে হবে।

মহেন্দ্রবাবু অতিশয় খুসী হইয়া বলিলেন, 'রামধন ! এটা খুব জটিল বিষয়। তুমি স্থির হয়ে ব'স। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

'কর্ত্তাবাবু' মহেন্দ্রের খুল্লতাত। তাঁহার পুত্রসন্তান না হওয়াতে মহেন্দ্রই বিষয়ের উত্তরাধিকারী। মহেন্দ্র পিতৃ-মাতৃহীন।

মহেন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'প্রথমতঃ আমি ধ'রে নিলুম যে, তুমি চড় খেয়েছ। কারণ, তুমি বরাবর সত্যি কথা বল, এবারও ব'লবে, তা খুব সম্ভব। আর, কাকাও যে চড় মেরেছেন, তাও খুব সম্ভব ; কারণ, হঠাৎ চড় মারা আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস।'

রামধন। কিন্তু চড় খাওয়া ত আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস নয়।

মহেন্দ্র। আমি ক্রমে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে চড় মারে, সে কর্ত্তা। যে খায়, সে কর্ম্ম। কর্ত্তারই অভ্যাস হয় ; কারণ, এ স্থলে ইচ্ছাশক্তি তিনিই ব্যবহার করেন। যে চড় খায়, তার 'চড় খাওয়া অভ্যাস', এ কথা বলা ভুল। 'সাম্‌লে যাওয়ার অভ্যাস' বরং সম্ভব। তা তোমার এখনও হয় নি। এখন দেখ্‌তে হবে যে, কর্ত্তার ক্রিয়াটা 'অটোম্যাটিক্' কিংবা 'ভলণ্টারি'। 'অটোম্যাটিক্' মানে—যা অভ্যাসবশতঃ হঠাৎ হয়ে যায়। এটীর পুরাকালে কোনও উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে বংশানুক্রমিক অভ্যাসটা থেকে যায়, উদ্দেশ্যটা বুঝা যায় না। যেমন 'গোঁফে তা'। 'ভলণ্টারি' মানে কোনও একটা মত্‌লব ক'রে, কাজটা যতগুলি উপায়ে হ'তে পারে, তার মধ্যে একটা বিশেষ উপায় বেছে নেওয়া। এখন মতলবটা আর তাঁর নির্ব্বাচিত উপায়টা, দুটোকেই বিচার করা দরকার।

'তুমি জান যে, চড় মারা আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস। আমি স্বীকার করি, অভ্যাসটা ভাল নয়। কেন না, যে মারে, তার হাতে ব্যথা লাগে, এবং যে খায়, তারও লাগে। কিন্তু কাজটা অন্যায় হয়েছে কি না, তার বিচার করা

থাক্। যখন তাঁর নিজের হাতে ব্যথা লাগ্‌বে নিশ্চয়, তখন আত্মসুখের জন্য চড় মারেন নি, সেটা ঠিক। সুতরাং তাঁর মতলবের মধ্যে ভাল একটা কিছু ছিল। খুব সম্ভবতঃ তোমার কোনও দোষ সংশোধন করা, কিংবা তদ্দ্বারা দশ জনের মঙ্গলসাধন করা। আচ্ছা বল, তুমি তখন কি কচ্ছিলে ?

রামধন। গাছতলায় চুপ ক'রে বসেছিলুম।

মহেন্দ্র। চুপ ক'রে বসে থাকা জগতের অমঙ্গল। এই জন্য যখন শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমে চুপ ক'রে বেকুবের মত দুষ্মন্তকে ভাবছিলেন, তখন সুযোগ পেয়ে দুর্ব্বাসা চট্ ক'রে উপস্থিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে গেল। তোমার বিষয়টাও সেই রকম। যা হোক, এখন দেখা যাক, জগতের মঙ্গলের জন্যও, চড় মারা ছাড়া অন্য উপায় আছে কি না ? আপাততঃ বোধ হ'চ্ছে যে, তিনি মিষ্টি কথায় তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তুমি মিষ্টি কথায় ভাল হবার লোক, তার পরিচয় এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কাকাবাবু পান নাই।

রামধন। আমি মিষ্টি কথার দাস।

মহেন্দ্র। সেটা তোমার কথায় বুঝতে পাচ্ছিনে। তুমি চড় খেয়ে যখন চাক্‌রী ছাড়বার মতলবে ছুটী নিচ্ছ, তখন বেশ বোধ হচ্ছে, তুমি স্বাধীন হতে চাও।

রামধন। কি করি বলুন ? অদৃষ্ট মন্দ হলে আর কি উপায় ?

মহেন্দ্র। এইখানে ভাল ক'রে বুঝা উচিত। চড় খেয়ে যে সাম্‌লে যায়, সেই স্বাধীন, এবং তারই পুরুষকার আছে। যে চড় খেয়ে চাক্‌রী ছাড়ে, সেই লোকই স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট, এবং অদৃষ্টের অধীন। আমরা এইটুকু বুঝতে পারিনে। অবশ্য, পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেটা মঙ্গলের জন্য চড়। এ রকম চড় খেয়ে যদি স্বামী, কিংবা স্ত্রী, কিংবা প্রভু, কিংবা চাকর, কিংবা পুত্র কন্যা, সাম্‌লে যায়, তারাই স্বাধীন হয়, তারাই ভবিষ্যতে কর্ত্তা হয়। আর যাদের একটা ভ্রমাত্মক স্বাধীনতার ভাব চেগে উঠে, তারা অদৃষ্টক্রমে ক্রমে অহরহঃ চড় খেতে থাকে। তুমি যদি চড় খেয়ে চাক্‌রী না ছাড়, তবে তোমাকেই আমি বন্ধু ও ভাই ব'লে গ্রহণ করব।

ইহা বলিয়া মহেন্দ্র রামধনের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। তাহাতে রামধন কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, এবং মহেন্দ্রবাবুর পা টিপিতে লাগিল।

২

রামধনের সহিত তর্কে পরিশ্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন,

এবং সেই ঘুমে সারাদিন কাটিয়া গেল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, বেলা তিনটা। লোক জনের সাড়া শব্দ নাই। জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইল।

ইহার কারণ কি? মহেন্দ্রবাবুর মনে পড়িল যে, নিদ্রাকালে তিনি বাহ্য-চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আত্মচৈতন্যের ক্রোড়ে ছিলেন। 'যা নিশা সর্ব্বভূতেষু তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী'। তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি হাসিলেন, এবং একটা বাঁশী লইয়া বাজাইতে সুরু করিলেন।

এমন সময় একটী রমণী আসিয়া ডাকিল, 'দাদা, তুমি জেগেছ?'

সেই রমণী-ক্রোড়স্থ একটী শিশু ডাকিয়া উঠিল, 'মামা!'

বিনোদিনী মহেন্দ্রের খুল্লতাত-কন্যা। সে আই. এ. পাশ্, এবং দাদাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করে। 'খোকা' বিনোদিনীর তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র। সে মহেন্দ্র-বাবুর স্কন্ধে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে বসিল। বিনোদিনী গোটাকতক সন্দেশ আনিয়া মহেন্দ্রকে খাইতে দিল। মহেন্দ্রবাবু তাহা প্রীতিসহকারে গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন, এবং খোকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি বাঁশী বাজাইতে থাক, আমি সন্দেশ খাই।'

সন্দেশ খাইতে খাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, এই সন্দেশ খাওয়া, যত রকম জীবনধারণের উপায় আছে, তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, এটা মেয়েরা ভাল তৈরী করতে পারে। ভাল করে তৈরী করার অভ্যাস বংশানুক্রমিক। এটা যখন দেশ জুড়ে সকলেরই অভ্যাস, তখন বুঝ্তে হবে যে, আদিম কালে এটা সমাজে খুব প্রচলিত ছিল। সমাজে যেটা প্রচলিত হয়, সেটা সেই সমাজের আদর্শপুরুষ কিংবা রাজার পছন্দসই জিনিস। সে কালের রাজা সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন, অতএব বুঝতে হবে যে, সন্দেশ ধার্ম্মিক পুরুষদের খাদ্য। ঐ সম্বন্ধে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে রাজি। বোধ হয়, তোমার মনে থাক্তে পারে যে, ন্যায় শাস্ত্রে এ রকম 'সিলজিস্‌ম'-এর অনেক দোষ হয়।

বিনোদিনী তর্ক না করিয়া বলিল, 'বরং তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল্ আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সন্দেশ খেতেন।'

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'তার আরও একটা প্রমাণ যে, খোকা বাঁশী বাজাতে ভালবাসে'। ইহা বলিয়া তিনি খোকার মুখচুম্বন করিলেন।

বিনোদিনী সুযোগ পাইয়া বলিল, 'দাদা, যদি বংশানুক্রমে ধর্ম্ম রক্ষা হয় তবে—।'

মহেন্দ্রবাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া পড়িল, এবং তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পড়িলেন। দার্শনিক প্রশ্নের মধ্যে বিবাহ ও বংশরক্ষা তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা জটিল! মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'বিনু! এখনও আমার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা হয় নাই।'

বিনোদিনী। কিন্তু দাদা, তুমি ত আগ্রায় চাক্‌রী কর্‌তে যাবে, আর কবে আলোচনা কর্‌বে? আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে, যাবার আগে কাজটা হয়ে যায়।

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ চঞ্চলভাবে বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের মনের ভাব আমাকে বল। আমার বক্তব্য আমি পরে বল্‌ব।'

বিনোদিনী। দাদা! কিছু মনে ক'র না। আমি মূর্খ। আমরা মোটামুটি এই বুঝি যে, বিয়ে করা ধর্ম্ম। খুব ভাল কাজ। ভগবানের বিধান। বংশ-রক্ষা, জাতিরক্ষা, প্রাণরক্ষা, সমাজরক্ষা, এ সবই জগতের ভাল নিয়ম। এর উদ্দেশ্য কি, জানিনে; তবে মনে নেয় যে, কষ্ট পেলেও এ কাজ্‌টা করা উচিত।

মহেন্দ্রবাবু। তোমার কথার মধ্যে খাঁটী সত্য আছে, তবুও আমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই। মিল, বেন্থাম, স্পেন্সর, ডারউইন, সকলের সঙ্গে তোমার মত মেলে। জগতের ক্রমবিকাশের একটা কারণ আছে। মনে করা যাক্‌, সেটা মঙ্গলময়। ক্রমবিকাশ হতে গেলে বংশবৃদ্ধি চাই, এবং জীবনধারণ চাই। জননী না থাক্‌লে, জীবনধারণ অসম্ভব। অতএব বিয়ে কর্‌তেই হবে, বিয়ে না হলে বংশরক্ষা হয় না। এ বিধানটা সনাতন, এবং সকল জাতির মধ্যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ও সকল জীবের মধ্যে কোনও না কোনও রকমে দেখ্‌তে পাই। অতএব এটার 'এক্‌স্‌টার্ণাল স্যাংক্‌শন্‌' আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এটাও 'অটোম্যাটিক্‌', অর্থাৎ, অভ্যাসের বশবর্ত্তী কর্ম্ম হয়ে পড়েছে। যেমন তোমরা এক থালা সন্দেশ এনে দিলে আমরা খেয়ে ফেলি, তেমনই একটা 'বৌ' এনে দিলে আমরা বিয়ে করি। কিন্তু বুঝে দেখ যে, ক্রমবিকাশে 'অটো-ম্যাটিক্‌'গুলো 'ভলণ্টারি' হয়ে পড়ে। ভাল উপায় অবলম্বন ক'রে, বেছে নিয়ে, একটা আদর্শ দেখে বিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের সমাজ আগে খুব হুঁসিয়ার ছিল, এখন সেটুকুর দিকে কেউ চেয়ে দেখে না।

বিনোদিনী। দাদা! আমরা যে কনে' পছন্দ করেছি, সে খুব সুন্দরী। অতি সুন্দর স্বভাব। তুমি দেখ্‌লেই 'ভলণ্টারি' হয়ে পড়্‌বে।

মহেন্দ্র। সুন্দরী আমার আদর্শ নয়। বংশের হিত, জাতির হিত ও

ধর্ম্মের বিকাশ যাহার দ্বারা হ'তে পারে, এমন স্ত্রী বেছে নেওয়াই 'ভলন্‌টিয়রে'র কাজ। নচেৎ সুন্দরী দেখে বিয়ে করে ফেলা, কিংবা টাকার লোভে বিয়ে করা যাদের উদ্দেশ্য, তাদের 'মোটিভ্' ও 'ইন্‌টেন্সন্', অর্থাৎ, মতলব ও উপায়, দুই-ই খারাপ। নীতিশাস্ত্রের মতে তাদের মনুষ্যত্ব এখনও হয় নাই।

বিনোদিনী। তুমি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখো এখন। সে মেয়ে কিছুতে খাটো নয়। বিশেষতঃ আমি যখন তাকে বেছে ঠিক ক'রেছি, তখন—

মহেন্দ্র। সে আমাকে পছন্দ করবে কেন?

বিনোদিনী। তাও আমি ভাল ক'রে ভেবে দেখেছি।

৩

বিনোদিনী কিঞ্চিৎ আশা পাইয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র বাবু ক্রমেই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'রামধন!'

রামধন। হুজুর!

মহেন্দ্র। তোমার স্ত্রী ছিল;—সে কোথায়?

রামধন। আপনি জগার মার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? সে বিশ বৎসর আগে অক্কা পেয়েছে। জগা এখন পুলিসে কাজ ক'চ্ছে।

মহেন্দ্র। তোমার বিয়ে করে' কোনও কষ্ট হয়েছিল?

রামধন। কষ্ট বিশেষ কিছু হয়নি। তবে পূজোর সময় জগার মা এক ছড়া সোনার হার চেয়েছিল, না পেয়ে সেই দুঃখেই ম'রে গেল। আমার সেইটুকুই কষ্ট।

মহেন্দ্র। তোমার মন-কেমন করে?

রামধন। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। আপনাদের হাতে কলম না থাক্‌লে যেমন শূন্যিকার বোধ হয়, জগার মা না থাকাতে আমারও সেই রকম হয়।

মহেন্দ্র খুব চিন্তাপূর্ব্বক বলিলেন, 'ইহার কারণ কি?'

রামধন বলিল, 'আমার বোধ হয়, সে আমাকে সাম্‌লে রেখেছিল, এখন চালাবার কেউ নেই ব'লে আমি স্রোতের মুখে হেলে দুলে যাচ্ছি।'

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'তুমি কারণ এবং অবস্থা, উভয়ের মধ্যে গোলমাল বাধাচ্ছ। চার দিকে যদি শুক্‌নো খড় থাকে, তার মধ্যে আগুন পড়লেই অগ্নিকাণ্ড হয়। ভিজে খড়ের মধ্যে হয় না।'

রামধন। আমি শুক্‌নো খড়েরই মত। মুখে একবার আগুন দিলে হয়!

মহেন্দ্র। তার কোনও সন্দেহ নাই। যখন তোমার মাথা ঘুরছে, সেই সময়ই আগুন লেগেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে আগুন দিল কে ?

রামধন। হয় ত সে-ই দিয়ে গেছে, কিংবা ভগবান দিয়েছেন! একই কথা।

মহেন্দ্র (সহাস্যে)। তুমি অনেকটা বুঝেছ। কিন্তু তুমি পুড়ে যাবার আগে যদি আমি এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে তোমার অবস্থা ভাল ক'রে দিই, তবে কি হয় ?

রামধন। বিয়ে করবার আর ইচ্ছে নেই হুজুর! বিশ বচ্ছর জ্বলে' পুড়ে কষ্ট পেয়েছি, এখন দুঃখই আমার ভাল লাগে। হুজুরেরই এখন বিয়ে করবার বয়স।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'যদি আমি তোমার মতন এখনই দুঃখ পেয়ে থাকি, তবে আমি বিয়ে ক'রব কেন? আরও বুঝিয়ে বলি। কারও দুঃখ স্ত্রীবিয়োগে হয়, কারও দুঃখ জগতের দুঃখ দেখে কল্পনাতে হয়। যদি দুটোতেই সমান দুঃখ হয়, তবে আমি বেকুফের কাজ ক'রব কেন ?'

রামধন। হুজুর একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন। হয় ত কারও স্ত্রী আগে মরে; কারও স্ত্রী পরে মরে। এক জনের দুঃখ ত হবেই। সহমরণ আর চলে না। বংশরক্ষা করতেই হবে। তবেই ভেবে দেখুন যে, ভগবানের নাম ক'রে কাজটা সেরে ফেলাই ভাল।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'কথাটা বড় জটিল। আরও ভেবে দেখ্তে হবে। ইত্যবসরে তুমি একটা কাজ কর। তোমার দিদিমণিকে বল যে, তিনি যে কনের কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি দেখ্তে রাজি আছি।'

ইহাতে নিতান্ত উৎফুল্ল হইয়া রামধন চলিয়া গেল। রামধন চলিয়া গেলে মহেন্দ্র বাবু এক রাশি কাগজ লিখিয়া ফেলিলেন, এবং লিখিয়া সেগুলি ছিঁড়িলেন, এবং পুনরায় নূতন করিয়া লিখিলেন। তাহার পর চুপ করিয়া বসিলেন; আবার চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় হরিনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমার অভিলাষ অনুযায়ী আমরা কালই কন্যা দেখ্বার বন্দোবস্ত করেছি।'

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'বসুন। আচ্ছা, একটা কথা আপনি বলতে পারেন? জগতে এই যে সকল পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এটা চঞ্চলতার লক্ষণ। এর কারণ কি ?'

ভট্টাচার্য্য। বাবা! এর কারণ শাস্ত্রে বলে যে, প্রকৃতি পুরুষকে অধিকার ক'রলে পুরুষ মুক্তি লাভ করবার জন্য চঞ্চল হয়।

মহেন্দ্র। আর কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষ কারণস্বরূপ কোনও মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছেন, তাঁকে আমরা ক্রমবিকাশ বলি।

ভট্টাচার্য্য। তাঁর পক্ষে আর মঙ্গলময় উদ্দেশ্য কি? মুক্তিই মঙ্গল। তবে তিনি কি বদ্ধ? তা নয়। তাঁর এমনই স্বরূপ যে, প্রকৃতিই চঞ্চল হয়; আমরা মনে করি, তিনিই চঞ্চল হচ্ছেন। এ সব কথার মধ্যে প্রবেশ করা বড় কঠিন।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, কোনও লোকের বিবাহের প্রস্তাব হ'লে সে চঞ্চল হয়ে পড়ে কেন?

ভট্টাচার্য্য। বোধ হয় সেই রকম মুক্তি পাবার জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা! বিবাহ করলেই যেমন একটা বদ্ধ ভাব আসে, তেমনই আবার বিবাহ না করলেও মুক্তির ভাব আসে না। যেমন সূর্য্যগ্রহণ। আপনাদের কোনও পুঁথিতে এ কথা নাই।

মহেন্দ্র। এটা 'ডাইয়ালেক্‌টিক্।' অর্থাৎ, কোনও স্বরূপ প্রকাশ করতে হ'লে তার বিপরীত ভাব থাকা চাই। আত্মার স্বরূপ মায়ার আবরণেই ফুটিয়া উঠে। মুক্তির সময় সুখ, এবং মুক্তি পেয়ে দুঃখ, আবার বন্ধের সময় সুখ, ও বদ্ধ হয়ে দুঃখ। এই রকম পরিবর্ত্তন।

ভট্টাচার্য্য। তবে উপায়?

মহেন্দ্র। কোনও উপায় নাই। এ একটা ঘোর বন্ধন! এর সমস্যা এখনও পূর্ণ হয় নাই। কোনও উপায় দেখিতে পাই না। এখন কি করতে হবে?

ভট্টাচার্য্য। একবার আপনি সেখানে যাবেন। গোটাকতক ধান দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন। এই ত ব্যাপার। তার পর শুভক্ষণে বিবাহ। আমি পঞ্জিকা দেখেছি। শুক্রবারেই চলুন। আমি সঙ্গে যাব।

মহেন্দ্র। রামধনও যাবে।

ভট্টাচার্য্য। গ্রামের আর কেহ?

মহেন্দ্র। দরকার নাই।

৪

দর্শনশাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা করিলে, মস্তিষ্ক 'শূন্য' নামক বিখ্যাত স্থানে উপস্থিত হয়। শূন্যে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, সুতরাং তথায় স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলে দার্শনিক পণ্ডিতের ভীতিসঞ্চার হয়। বিশেষতঃ তাহার মধ্যে মুক্তিতত্ত্বের সঞ্চার হইলে, সেই ভয় প্রবল হইয়া 'কিম্ভূত-কিমাকার' নামক দৃশ্য উৎপাদন করে।

এই কারণেই হউক, কিংবা অন্য কোনও দুরূহ কারণেই হউক, মহেন্দ্রবাবু আহারের পর শয়ন করিয়া ক্রমে সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

মহেন্দ্রবাবুর বোধ হইল যে, তিনি মুক্তিলাভের জন্য 'ছট্‌ফট্‌' করিতেছেন। জিহ্বা শুষ্ক, মুখ বিবর্ণ, দারুণ তৃষ্ণা, রাত্রি বোধ হয় শেষ হয় না! ডাক্তার দত্ত প্রভৃতি পার্শ্বে বসিয়া। বাহ্য লক্ষণ বড়ই ভয়ানক। কিন্তু হৃৎপিণ্ড খুব সবল দেখিয়া এক জন ডাক্তার বলিলেন, 'এটা স্নায়বীয়'। কথাটা মহেন্দ্রবাবুর কর্ণে গেল। মহেন্দ্রবাবু স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন, 'না না, স্নায়বীয় নয়! আপনারা 'ডায়গনোসিস্' করিতে পারেন নাই। যে মুক্তির জন্য আমার প্রাণ ব্যগ্র, তাহা লাভ না করিলে প্রাণসংশয়।'

ডাক্তার। কথাটা ঠিক। কিন্তু তাহাকেই আমরা স্নায়বীয় বলিয়া থাকি। 'সংশয়' কথাটার অর্থ কি? মুক্তিও যেমন সংশয়স্থল, প্রাণও তথৈবচ। সংশয় উপস্থিত হইলেই প্রাণের চলাচল বন্ধ হয়। প্রাণ চতুষ্পদ বিস্তার করিয়া পদাঘাত করিতে থাকে। তাহাতে হয় ত সংশয় দূর হইয়া মুক্তিলাভ হয়, নচেৎ প্রাণ বহির্গত হইয়া মুক্তিলাভ হয়। ফল একই। তবে মুক্তিলাভ অপেক্ষা প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই বেশী বাঞ্ছনীয়। যখন আর কিছু লাভ হয় না—যেমন বৃদ্ধাবস্থায়—সেই সময়ই মুক্তিলাভের পক্ষে প্রশস্ত।

মহেন্দ্র। বেশ চিন্তা করিয়া দেখুন। বড় কঠিন সমস্যা। মুক্তিলাভের অনেক উপায় আছে; তবে বিবাহ নামক উপায়ই যে অবলম্বন করিব, তাহার কারণ কি? ইহা অপেক্ষা অন্য কোনও সদুপায় নাই?

ডাক্তার। কোথায়ও শুনা যায় নাই। আমি দেখিয়াছি, এক জন বৃদ্ধ মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া বিরানব্বই বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। 'বিকৃতি'ই মুক্তির লক্ষণ। বিবাহ করিবামাত্র নিজের বিকৃতি হইয়া পড়ে।

ইহা বুঝাইয়া দিয়া ডাক্তার পুনর্ব্বার মহেন্দ্রবাবুর হার্ট পরীক্ষা করিলেন, এবং বলিলেন, 'ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে।'

মহেন্দ্রবাবুর বোধ হইল, যেন ডাক্তার ও পার্শ্বস্থ আত্মীয় বন্ধু সকলেই চলিয়া গেল। ক্রমে সব অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা দেখিয়া মহেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিলেন যে, মুক্তি সন্নিকট! কি ভয়ানক অবস্থা! মহেন্দ্রবাবু আর্ত্তস্বরে বলিলেন—'আমি মুক্তি লইয়া করিব কি? মুক্তির মধ্যে সুখ কই? দুঃখই বা কোথায়? এ যে মহাশূন্য!'

সেই আঁধারে মহেন্দ্রবাবুর বোধ হইল, যেন রামধন দূবে দাঁড়াইয়া।

রামধনের পরে খোকা, তাহার পরে বিনোদিনী, এবং সকলের পশ্চাতে একটী অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরী। তাহার কেশ দীর্ঘ, বাহু মৃণালের ন্যায়, এবং কপালে অলক্ত অক্ষরে লেখা—

'বৌ'

কি ভয়ানক! তার চক্ষু কই? মহেন্দ্রবাবু দেখিলেন, মুদিত পল্লব। ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত।

মহেন্দ্রবাবু স্বপ্নাবস্থায় বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপারখানা কি?'

খোকা বলিল, 'এ মামীমা।'

রামধন বলিল, 'এই বৌ ঠাকৃরুণ।'

মহেন্দ্রবাবু দারুণ ভীতিসহকারে বলিলেন, 'বিনু, 'বৌ' শব্দের অর্থ কি? তুমি ত ন্যায়শাস্ত্র পড়েছ। খানিকটা বুঝিয়ে দাও।'

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, 'দাদা! 'বৌ' শব্দের 'কন্‌সেপ্ট্' (ধারণা) হ'তে অনেক দিন লাগে। 'বৌ' একটী স্ত্রীলোক। কিন্তু অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, 'বৌ' তোমার। তোমার জিনিস অন্যের জিনিস থেকে কত তফাৎ, তা বুঝিতে গেলে তোমারই পরীক্ষা করা উচিত। তাই আমরা চ'লে যাচ্ছি।'

বিনোদিনী, খোকা ও রামধন চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিনোদিনী গৃহে একটী ল্যাম্প জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহারই আলোকে মহেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, 'বৌ' নিস্তব্ধভাবে তখনও দাঁড়াইয়া।

মহেন্দ্র বাবু স্বপ্নে দেখিলেন যে, বৌর চারি দিকে ছায়ার মত কতকগুলি পদার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইল, সেগুলি ভীষণ সংসারের কতকগুলি অংশ। যেন বৌ তাহার মধ্যে জড়সড়!

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'তুমি ব'স। ভয় নাই। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা ক'রব, তার উত্তর দিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে দিও। আমি টুকে নেব।'

বৌ উপবিষ্টা হইলে মহেন্দ্র বাবু কাগজ ও পেন্সিল লইয়া বিবাহের দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রথমে টুকিয়া লইলেন, এবং সম্মুখীনা বৌকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—'তুমি মনে কর, আমি এক জন গুরুমহাশয়। আমার কথাগুলোর সরলভাবে উত্তর দাও। যা মনে আসে, তৎক্ষণাৎ ব'লে ফেল। বেশী ভেব না। যদি কোনও কথাতে হাসি পায় ত হেস', কান্না পায় ত কেঁদ। যদি সন্দেহ হয় ত আমার দিকে চেয়ে থেক। যখন সন্দেহ হবে, আমি আবার বুঝিয়ে দেব।'

৫

মহেন্দ্র বাবু স্বপ্নাবস্থাতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র। আমার দিকে তাকিয়ে বল যে, আমি উল্টো না সোজা। অর্থাৎ, আমার মাথা নীচের দিকে ও পা ঊর্দ্ধ দিকে কি না? অন্য জিনিসগুলো কি রকম?

বৌ আঁখিপল্লব উন্মীলিত করিয়া মহেন্দ্রের দিকে তাকাইল। মহেন্দ্র বাবুর বোধ হইল, সমস্ত জগৎ তাহারই মধ্যে।

বৌ ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনাকে উল্টো দেখ্‌ছি। আপনার মাথা নীচে, আর পা ঊর্দ্ধ দিকে। অন্য জিনিসগুলো সব সোজা দেখছি।'

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। আমি যে প্রশ্ন কর্‌ছি, তাতে তোমার মনে কি ভাব হ'চ্ছে? হাসি পাচ্ছে, না কান্না পাচ্ছে?

বৌ। কান্না পাচ্ছে।

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। তুমি কখনও পাখী পুঁষেছ?

বৌ। আমার একটা ময়না পাখী আছে।

মহেন্দ্র। সেটাকে ছেড়ে দাও না কেন?

বৌ। তাকে আমি বুলি শিখিয়েছি। তিন বৎসর ধ'রে লালন পালন করেছি। কি ক'রে ছেড়ে দেব?

মহেন্দ্র। সে উড়ে গেলে অন্য দেশে অনেক লোকের কাছে অনেক বুলি শিখবে। তাতে বাধা দাও কেন?

বৌ এবার হাসিয়া বলিল, 'তা কখনও শিখ্‌বে না। একটা শিখ্‌বে, আর একটা ভুলে যাবে। অর্থ একই, বুলি অনেক রকম। এক জনের কাছে শিখ্‌লেই ভাল। উড়ে বেড়ালে কোনটাই শেখে না।

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, মনে কর, তোমার সঙ্গে যদি কারও বিয়ে হয়, আর সে যদি তোমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে, আর তারই বুলি যদি তোমাকে শেখায়, তবে তোমার মনে কষ্ট হয় কি না? তোমার কোনও লজ্জা নাই, ঠিক করে বল।

বৌ সন্দিগ্ধনয়নে মহেন্দ্রের দিকে চাহিল।

মহেন্দ্র। তুমি ত অনেক বৌ দেখেছ। তারা হয় ত তাদের মনের কথা তোমাকে বলেছে। তোমার ধারণা কি?

বৌ। আমি তা ঠিক বল্‌তে পারব না। আমার ছুটো ময়না ছিল। তাদের ছু'জনকেই একটা খাঁচায় রেখেছিলুম। প্রথমে তারা ঝগড়া করত। তার পর আলাদা খাঁচায় রেখে তাদের ঝগড়া মিট্‌ল। আমি যে বুলি শেখাতুম, তা ছু'জনেই শিখ্‌ত। আমি না থাক্‌লে এক জন আর এক জনকে শেখাত। তাদের ত কোনও কষ্ট হয়নি। মানুষেরও হবার কথা নেই।

মহেন্দ্র। ছুটো পাখীই এখনও আছে?

বৌ। একটা মরে গিয়েছে। যেটা বেঁচে আছে, সেটা কেবল মরাটার বুলি আওড়ায়। নতুন কথা শেখালেও শেখে না।

মহেন্দ্র। সেটাকে এবার উড়িয়ে দাও না কেন?

বৌ। যে দুঃখ পেয়েছে, সে উড়ে যাবে কেন? সে দিন বিনুদিদির খোকা খাঁচার দোর খুলে রেখেছিল, তবুও সে উড়ে যায় নি। আমাদের বাড়ীর কাছে এক জন নাপিতের বৌ আছে। সে বাড়ীর বাহিরে যায় না। তাদের সংসারে এত দুঃখ কষ্ট যে, তাই দেখ্‌তেই তার সময় কেটে যায়, বাহিরে যাবে কেন? সকলেরই তাই।

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, এই যে ঘর দেখ্‌ছ, এর জিনিসগুলোর মধ্যে কোনও দুঃখ কষ্ট টের পাচ্ছ? যদি পাও, সেগুলোকে ঠিক্‌ করে ফেল।

বৌ সানন্দে উঠিল। 'এই বালিসটা মাটীতে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে।' বৌ সেই বালিস হইতে ধূলা ঝাড়িয়া মহেন্দ্র বাবুর বালিসের পার্শ্বে রাখিল। একটা খেল্‌না উলঙ্গ ছিল, তাহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিল। একখানা পুরাতন ছবির ধূলা ঝাড়িয়া দেওয়ালে সযত্নে টাঙ্গাইয়া দিল। টেব্‌লে চা'র দাগ ধরিয়াছিল, সেগুলি ধুইল। মহেন্দ্রের জুতার এক পাটি ঘরের এক কোণে উল্টাইয়া ছিল, তাহা লইয়া আর এক পাটির সহিত যুক্ত করিয়া রাখিল। মশারির মধ্যে গোটাকতক মশা ছিল, তাহা উড়াইয়া দিয়া মশারিটি গুছাইয়া রাখিল। কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া একত্র করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা ঘড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা চাবি দিয়া পুনরায় চালাইয়া দিল।

বৌর গৃহকর্ম্ম আর শেষ হয় না। এই ছোট ঘরটুকুর মধ্যে যে দুঃখ, তাহাই দূর করিতে করিতে রাত্রি কাটিল। দীপ নিভিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু টুকিতে টুকিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, প্রভাত হইয়া গিয়াছে। ঘর নির্জ্জন। বৌ চলিয়া গিয়াছে। এ জগৎ কি নশ্বর? তা ত বোধ

হয় না। গৃহ হাস্যময়। সে হাসিটুকু বৌ তার গৃহকর্ম্মে রাখিয়া গিয়াছে। এই বদ্ধ জগতের মধ্যে জড় পদার্থের দুঃখটুকু বিমোচন করিয়া বৌ তাহার অমর হাসি তাহারই মধ্যে দিয়া গিয়াছে। জগতের মধ্যে গৃহ। গৃহের মধ্যে বৌ। বৌ তাহার গৃহিণী। তার এত কাজ যে, সেই ছোট গৃহ ছাড়া তাহার বাহিরে যাইবার অবসর নাই। যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, সেই গৃহ ও গৃহস্থবর্গ তাহারই আনন্দে সজীব। সে না থাকিলে সবই শূন্য।

৬

মহেন্দ্রবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তিনি সজ্জিত গৃহ দেখিয়া সন্দিহান হইলেন। পার্শ্বে রামধন দাঁড়াইয়াছিল।

মহেন্দ্র। রামধন!

রামধন। হুজুর!

মহেন্দ্র। আমার ঘর এমন ক'রে সাজিয়ে গেল কে?

রামধন। দিদিমণি ও বাড়ীর দত্ত মহাশয়ের মেয়েকে দিয়ে কাজ গুছিয়েছেন।

মহেন্দ্র। আমি তখন কোথায়?

রামধন। বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলেন।

মহেন্দ্র। তুমি বিনুকে ডে'কে আন।

বিনোদিনী জড়সড় হইয়া আসিল। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'অনেক সময় স্বপ্ন সত্য হয়ে পড়ে, তার কারণ কি?'

বিনোদিনী। আমি তা ঠিক জানিনে, তবে শুন্‌তে পাই যে, স্বপ্নের 'আমি' ও জাগ্রত 'আমি' একই মানুষ। বিশ্বের যত পদার্থ, সব জিনিসেরই ছাপ প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে পড়ে। জাগ্রত অবস্থায় সেটুকু আমরা জানতে পারিনে। তবে ঘুমন্ত অবস্থায় কখনও কখনও স্বপ্নে সেটা বেরিয়ে পড়ে। খোকা এমনই দুষ্টু যে, অনেক সময় বাহিরে খেল্‌তে গিয়ে গুঁতোগাঁতা খায়। সে ভয়ে বলে না, কিন্তু আমি না দেখ্‌তে পেলেও আমার প্রাণ সেটা দেখে। হয় ত স্বপ্নের সময় সেটা বেরিয়ে পড়ে, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বুকে করি।

মহেন্দ্র। এটা 'ইমানেন্স্' থিওরি। অর্থাৎ, সকলেই বিশ্বচৈতন্যবিশিষ্ট। যা হোক্, স্বপ্নে গোটাকতক কথা আমি মনে মনে টুকেছিলুম, তা তোমাকে বল্‌ব। অর্থাৎ, বৌ নামক স্ত্রীলোকের 'কন্‌সেপ্ট' বড় জটিল।

১। উহারা স্বামীকে বিপরীত ভাবে দেখে, এবং তাহাকে সোজা করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করে।

২। স্বামীর কথা শুনিলে তাহাদের কান্না পায়।

৩। তাহারা স্বামীকে বদ্ধ করিয়া আর ছাড়িয়া দিতে চাহে না।

৪। নিজের গৃহের দুঃখমোচন করিতেই তাহাদের জীবন কাটিয়া যায়। ফলে আনন্দ রাখিয়া যায়।

৫। ন্যায়শাস্ত্রের মতে স্ত্রীলোক নামক 'জীনসে'র (genus) মধ্যে বৌ একটা 'স্পিষিজ্' (species) ইহাই প্রথমে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু আমি বলি যে, বৌ নামক পদার্থের কর্ম্মকলাপ দেখিলে বোধ হয় যে, উহারা বিশ্বপদার্থ। বিজ্ঞান, বিশ্বপদার্থের মধ্যে প্রকৃতিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। স্ত্রী-প্রকৃতিই সেই বৌ। এবং তাহার আদর্শ আমাদের ঘরের বৌ। তাহাদের নয়নে স্বামীর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেটা 'ইনভার্টেড্'। আত্মচৈতন্যতে সেটা তারা ক্রমশঃ ঠিক করিয়া লয়। এই জন্য বৌ পরপুরুষের মুখ দেখিতে কুণ্ঠিতা। কতকগুলি প্রতিবিম্ব একত্র করিলে 'স্বামী' (অর্থাৎ 'পরমপুরুষ') কি, তাহার কোনও নির্ণয় হয় না। দার্শনিক ক্যাণ্ট, কিংবা হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর বহু পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া, সম্পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব, ইহাই ঠিক করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান পুরুষের পক্ষে শীঘ্র সম্ভবে না। যাহারা সতী, তাহাদেরই সৎপদার্থের শীঘ্র জ্ঞান হয়। 'বৌ' সেই সতী নামক জীব। স্বামীর সন্দেহ দেখিলে তাহাদের দুঃখ হয়, এবং তাহাকে সেই জন্য বদ্ধ করিয়া নিজে বদ্ধ হয়, এবং উভয়ে উভয়ের দুঃখে দুঃখী হইয়া জ্ঞান লাভ করে।

বিনোদিনী দাদার মন্তব্য শুনিয়া খুব আহ্লাদিতা হইল। 'দাদা! তবে বৌকে মনে ধরেছে?'

মহেন্দ্রবাবু খুব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'হাঁ! কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, তুমি যাকে এই ঘরে এনেছিলে, তাকে আমি স্বপ্নাবস্থায় দেখলুম কি ক'রে?'

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, 'বৌ জিনিস স্বপ্নাবস্থাতেই আসে, স্বপ্নাবস্থাতেই চ'লে যায়।'

ইহা বলিয়া বিনোদিনী চলিয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ডাকিলেন, 'রামধন!'

রামধন। 'হুজুর!'

মহেন্দ্র। আচ্ছা, আমি ঘুমোবার সময় ধড়ফড় করেছিলুম, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়েছিল যে, হার্ট ফেল্ হবে।

রামধন করযোড়ে বলিল, 'কর্ত্তা যখন আমাকে চড় মেরেছিলেন, তখনও

আমার ঐ রকম হার্ট ফেল্ হবার উপক্রম হয়েছিল। কষ্ট পেলে আমরা সকলেই স্বাধীন হ'তে চাই. কিন্তু সান্ত্বনা ক'রলেই আবার অধীন হয়ে পড়ি। হয় ত হুজুরকেও কেউ এসে সান্ত্বনা করেছিল।'

মহেন্দ্র এই উত্তর শুনিয়া রামধনকে পাঁচ টাকা বখশিশ্ দিলেন, এবং আড়-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, 'বল্ ত, কে সান্ত্বনা করেছিল ?'

রামধন খুব দূরে গিয়া মাস্তসহকারে কহিল, 'বৌ ঠাকরুণ।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

ভারতীয় ভাষাবিবর্তন।

ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির সম্বন্ধে আজ কাল নানা প্রকার গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অতীতের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ফলেই বর্তমানের বৈশিষ্ট্য, সুতরাং আধুনিক ভাষা-তত্ত্বের আলোচনায় উহাদের পূর্বাপর ইতিহাসের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। এই প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ পণ্ডিত সার্ জর্জ গ্রীয়ারসন * ও অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রভৃতির মতের আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষে ও সিংহলে আর্য্য উপনিবেশের সহিত আর্য্য সভ্যতার প্রচার আরম্ভ হয়। উপনিবেশ উপলক্ষে আর্য্যগণ যখন যে স্থানে গিয়াছেন. তাঁহারা তথায় আপনাদের ধর্ম, শিক্ষা, সমাজগত রীতিনীতি ও আর্য্য ভাষার বিস্তৃতিসাধন করিয়াছেন। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ভারত ও সিংহলের হিন্দুসভ্যতা মুখ্যতঃ আর্য্য সভ্যতারই প্রকারভেদ। সুতরাং সহজেই মনে হয় যে, তত্রত্য ভাষাও আর্য্য ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে প্রথিতনামা পণ্ডিত সার্ জর্জ গ্রীয়ারসনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মত এই যে— 'আর্য্য ও অসভ্য অনার্য্য ভাষার সংঘর্ষে শেষোক্তের পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী। আর্য্যগণ অনার্য্য ভাষায় কথোপকথনের চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু পরস্পর মনোগত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য অনার্য্যগণকে বাধ্য হইয়া উচ্চতর আর্য্য সভ্যতার ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। প্রথমতঃ অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ আর্য্য ভাষার এক প্রকার বিকৃত রূপ (pigeon form) ব্যবহৃত হইতে থাকে। কালক্রমে এই বিকৃত রূপ বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতে থাকে ; শেষে আর্য্য ভাষারই প্রকারভেদে পরিণত হয় ; কিন্তু ইতিমধ্যে তাহাদের অনার্য্য ভাষা প্রথমে বিস্মৃত, পরে লুপ্ত হইয়া যায়।' সার্ জর্জের উক্তি আংশিক সত্য হইলেও এক বিষয়ে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতির সহিত উত্তর-ভারতে আর্য্য ভাষার প্রচলনে অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা বিতাড়িত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে আর্য্য ভাষা ও অনার্য্য দ্রাবিড়

---

* Prakrita Bibhasha, F. R. A. S.

ভাষার সংঘর্ষে অনার্য্য ভাষারই জয় হইয়াছে, এবং আর্য্য ভাষার অবনতি ও তিরোভাব ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ, উত্তর-ভারতের ভাষাবিবর্ত্তনের ইতিহাস, তাহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। উত্তর-ভারতে আর্য্যগণের উপস্থিতির পূর্ব্বে যে তথায় অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বেলুচিস্থানে খান-অধিকৃত কেলাট-ভূমির অধিবাসী পার্ব্বত্য জাতির ভাষা ব্রাহুইতে কেবল কতকগুলি দ্রবিড় শব্দমাত্র নয়, বহুতর দ্রবিড়-ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, রূপ ও ব্যবহার-রীতি দৃষ্ট হয়। সিন্ধুনদের উত্তরে প্রচলিত ভাষাতেও এই দ্রবিড় উপাদান দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, আর্য্য সিথিয়ান প্রভৃতির ন্যায় দ্রবিড়গণও উত্তর-পশ্চিম মার্গে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত শব্দও যে প্রকৃতপক্ষে দ্রবিড় শব্দ, ইহাও অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কন্নড়-ইংরাজী (Kannada-English) অভিধানে শ্রীযুত Kittel এইরূপ শব্দাবলীর একটী সুদীর্ঘ তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তালিকাটীর একটী প্রধান দোষ এই যে, গ্রন্থকার কেবলমাত্র পাণিনি-নিয়ন্ত্রিত (classical) সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই শব্দচয়ন করিয়াছেন। উক্ত সাহিত্য কদাপি কথিত-ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত কি না, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, বৈদিক সাহিত্যের ভাষা যে এক সময় লোকে কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহাতেও দ্রবিড় ভাষার প্রভাব প্রস্ফুট। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১০।১) 'মটচী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

মটচী হতেষু কুরুষু আটিক্যা সহ জায়য়া
উষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।

ইহাতে কুরুদেশে মটচী কর্ত্তৃক শস্য-ধ্বংসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক জন ব্যতীত সকল টীকাকারই 'মটচী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'শিলাবৃষ্টি।' কিন্তু এক জন মাত্র ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'রক্তবর্ণ-ক্ষুদ্র-পক্ষিবিশেষঃ।' * ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই রক্তবর্ণ-পক্ষবিশিষ্ট জীবগণ প্রকৃতপক্ষে 'পঙ্গপাল', এবং উহারা কুরুদেশের শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিত। অদ্যাবধি ভারতের নানা দেশে ইহাদের অত্যাচার সমানে চলিয়াছে। এই 'মটচী' শব্দটী সর্ব্বজনবিদিত কানারীস (Kanarese) শব্দ মিদিচের সংস্কৃত রূপভেদমাত্র। কিটেলের অভিধানে 'মিডিচের অর্থ,—ঘাসচারী পতঙ্গ, বা পঙ্গপাল'। বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ার জেলায় অদ্যাবধি উহা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। †

ছান্দোগ্য উপনিষদ ভারতের একটী প্রাচীনতম উপনিষদ। উত্তর-ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে এই উপনিষদ তৎকালীন প্রচলিত কথিত ভাষায় নিবদ্ধ হয়। ইহাতেও দ্রবিড় শব্দ পাওয়া যাইতেছে, এবং যদি দ্রবিড়-ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বহুতর দ্রবিড় শব্দ বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য-অভিযানের পূর্ব্বে দ্রবিড়ি ভাষাই উত্তর-ভারতের ভাষা ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত

* F. R. A. S., 1911, P. 510.

† IA., 1913, P.235.

'খোকা' ও 'খুকী' (বালক ও বালিকা অর্থে) ওরাওন (Oraon) ভাষায় 'কোকা' ও 'কোকী'; বাঙ্গালা 'তেলো' (মস্তক) তেলুগু ভাষায় 'তলা', এবং তামিল 'তলাই'; বাঙ্গালা 'নোলা' (জিহ্বা) তামিলে 'নলু'। বহুবচনার্থ বাঙ্গালা 'গুলি' ও 'গুলা' তামিলে 'গুল'। সংস্কৃত-বহুল কথিত বাঙ্গালায় এবংবিধ বহু দ্রবিড় শব্দ দৃষ্ট হয়। * হিন্দী ভাষায় অনেক দ্রবিড় শব্দ ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বদা প্রযুক্ত 'ঝগড়া' প্রভৃতি শব্দও দ্রবিড় ভাষা হইতে প্রাপ্ত। অতএব দ্রবিড় ভাষা যে এক সময়ে উত্তর-ভারতের কথিত ভাষা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। + কিন্তু আপাততঃ উত্তর-ভারতে আর্য্য ভাষার একাধিপত্য দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, আর্য্য ভাষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য ভাষা লুপ্ত হইয়াছে।

এইবার দক্ষিণ-ভারতের ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উত্তর-ভারতের ভাষা-সংঘর্ষের ঠিক বিপরীত ফল পরিলক্ষিত হইবে। আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার সংস্পর্শে অনার্য্য ভাষার প্রাধান্য ও পূর্ব্বোক্তের অবনতি ঘটিয়াছে। ইহার কারণ, অন্বেষণ-চেষ্টার পূর্ব্বেই কিন্তু বিচার করা আবশ্যক যে, আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কি না; অর্থাৎ, আর্য্যগণ দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশস্থাপন করিবার পরও তত্রত্য অনার্য্য অধিবাসিগণ আর্য্য ভাষা বুঝিতে বা ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত কি না? এ সমস্যার সমাধানে প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-ভারতের তেলুগু-প্রধান প্রদেশটী গ্রহণ করা যাউক। এ স্থানে প্রাপ্ত অনুশাসনরাজির মধ্যে অশোক-অনুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মাদ্রাজের উত্তর-পূর্ব্বে গঞ্জাম জেলার জৌগড়া নামক স্থানে ক্ষোদিত অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অনুশাসনগুলির উপর তত দূর নির্ভর করা যায় না; কারণ, এখানকার ভাষা প্রধানতঃ তেলুগু হইলেও উত্তরাংশে উড়িয়া ভাষাও প্রচলিত আছে। কেবলমাত্র দ্রবিড় ভাষা ব্যবহৃত হয়, এরূপ একটী স্থান গ্রহণ করা উচিত। দক্ষিণে কৃষ্ণা জেলা এইরূপ একটী স্থান। এ স্থানে তিনটী বৌদ্ধস্তূপ ও কয়েকটী অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। ভট্টিপ্রোলু প্রাচীনতম, তদনন্তর অমরাবতী, তাহার পর জগ্গয়পেত। সবগুলিই দানসূচক দলীল, ইহাতে দাতা ও দানের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অনুশাসনসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্ববিধ সমাজ ও অবস্থার লোকই এবংবিধ ধর্ম্মার্থদানে প্রবৃত্ত হইতেন। যোদ্ধৃশ্রেণী অথবা বণিকসম্প্রদায়ের ন্যায় উচ্চতর অবস্থার ব্যক্তিবর্গের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; কারণ, অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, তাঁহারা আর্য্য বিজেতৃগণের শাখাভেদ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকেও বর্জ্জন করা যাইতে পারে; কারণ, তাহাদের আদি সামাজিক অবস্থার বিষয় অনুশাসনলিপি হইতে স্পষ্টতঃ কিছু জানা যায় না। গহপতি বা গ্রাম্য ভূম্যধিকারী, হেবণিক বা সুবর্ণকার এবং চম্মকার বা চর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিষয় বিচারসাপেক্ষ, কারণ ইহারা নিঃসন্দেহরূপে অনার্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহাদের ব্যবহৃত অধিকাংশ সংজ্ঞাই আর্য্য নাম, সুতরাং ইহারা যে আর্য্য সভ্যতার অনুশীলন ও অনুকরণের ফলেই আর্য্য নাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর থাকে না। এক জন ভূম্যধিকারীর নাম ইল, অর্থাৎ

---

* বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ি উপাদান, সা. পরিষৎ-পত্রিকা, Vol. XX. Pt. I.
IA. 1916, P. 16.

ইন্দ্র ; তাহার পত্নী কন্হা অর্থাৎ কৃষ্ণা, তাহার কন্যার নাম রমা।* এক জন স্বর্ণকারের নাম সিদ্ধথ, অর্থাৎ সিদ্ধার্থ, এবং দুই জন চর্ম্মকার পিতা পুত্রের নাম, বিধিক, অর্থাৎ বৃদ্ধিক, এবং নাগ। ইহাদের প্রত্যেকটীই যে আর্য্য নাম, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এক ব্যক্তির নাম কন্হ, অর্থাৎ কৃষ্ণ। ইহাও একটী আর্য্য নাম, কিন্তু সংজ্ঞাধারী নিজেকে দমিল নামে অভিহিত করিয়াছে। এই দামিল, তামিল ও সংস্কৃত দ্রাবিড় অভিন্ন। বস্তুতঃ উক্ত নামনির্দ্দেশই দ্রাবিড় জাতির প্রাচীনতম উল্লেখ। অতএব বেশ দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণা জেলায় আর্য্য-উপনিবেশের ফলে তত্রত্য অনার্য্য অধিবাসিগণ আর্য্য সভ্যতায় এতাদৃশ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, নিজেদের নামস্বরূপ আর্য্যসংজ্ঞা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু তাহারা আর্য্য-ভাষা বুঝিতে এবং উহাতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত কি? কৃষ্ণা জেলায় প্রাপ্ত অনুশাসনলিপি হইতে এ বিষয়ের কোনও প্রকার সন্ধান পাওয়া যায় কি না? অনুশাসনে ব্যবহৃত ভাষা হইতে এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায়। ইহাদের ভাষা পালি, এবং পালি আর্য্য-ভাষা। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীঃ-পূঃ ১৫০ হইতে খ্রীষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণা জেলায় আর্য্য ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, উক্ত আর্য্য-ভাষা উপনিবেশকারী আর্য্যগণই ব্যবহার করিতেন; ইতর লোকে উহা বুঝিত না। কিন্তু এরূপ আপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ, মূল বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, ইতর ভদ্র সকলের ভিতরই ধর্ম্মের প্রচার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত জেলায় সর্ব্ববিধ অবস্থার আদিম অনার্য্য অধিবাসীর ভিতর হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিষ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা সকলেই যে ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিত, বুঝিতে পারিত, উহার ব্যবহারই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। এ বিষয়ে একটী প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। মহীশূর রাজ্য কানারীস-(Kanarese)-ভাষা-প্রধান প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মহীশূরের অন্তর্গত চিতলদ্রুগ জেলায় অশোকের তিনটী ক্ষুদ্রতর গিরিলিপি (Minor Rock Edicts) পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটিতে অশোকের 'ধম্ম'শব্দের অর্থবোধক গুণসমূহের বর্ণনা, এবং সকলকে, বিশেষতঃ হীন অবস্থার লোকদিগকে উচ্চতম-জীবন-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল গিরিলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য, লোকের শিক্ষাদান ও সৎ-কার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধন। সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিনিচয়ের সহজসাধ্য ও বোধগম্য না হইলে উক্ত উদ্দেশ্যের সাফল্য অসম্ভব। এই সকল অনুশাসন পালিতে রচিত। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, পালি তাহাদের জাতীয় ভাষা না হইলেও অন্ততঃ সকল শ্রেণীর লোকেরই সুখবোধ্য ও কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত হইত।

জাতীয় ভাষা ও সুখবোধ্য ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিব। বহুসংখ্যক কানারীস-ভাষাভাষী প্রদেশ মারহাট্টাগণ কর্ত্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল, এবং তাহাদের কয়েকটী অদ্যাবধি মারহাট্টা অধিকারে রহিয়াছে। অত্রত্য আদিম অধিবাসিগণ সকলেই স্ব স্ব গৃহে বা পরস্পরের সহিত কথোপকথনে কানারীস ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু অতি নীচ শ্রেণীর লোকেও মারহাট্টা বুঝিতে পারে। কানারীসদিগের নিজ

* A S S T., I. 55.

শিল্পকলা ও সাহিত্য বিদ্যমান থাকিতেও দুই শতাব্দীর যাযাবরী অধিকারের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু উপরিউক্ত পালি অনুশাসন হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ অন্ততঃ দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দী ধরিয়া আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব, অশোক অনুশাসন ও বৌদ্ধ স্তূপের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর আদিম দ্রাবিড় অধিবাসীই আর্য্য ভাষায় বাক্যালাপ করিতে, অন্ততঃ উহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন।

কিন্তু আর্য্য ভাষা যে জাতীয় অনার্য্য ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিতরূপে একটী চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মিসর দেশে Oxyrtynctus নামক স্থানে একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত একটী গ্রীক প্রহসন নিবদ্ধ আছে।* ইহাতে চারিটিয়ন (Charition) নাম্নী গ্রীক মহিলার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চারিটিয়ন জলযান-ধ্বংসে নিরাশ্রয় ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলস্থ কোনও স্থানে পতিত হইয়াছেন। ঐ দেশের রাজা স্বীয় অনুচরবর্গকে 'ভারতীয় নেতৃবর্গ' নামে সম্বোধন করিতেছেন। স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ যে স্থানে চারিটিয়ন তাঁহাদিগকে মদ্য বণ্টন করিয়া দিতেছেন, তথায় উক্ত রাজা ও তাঁহার স্বদেশবাসিগণ আপনাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতেছেন। অনেক বিচ্ছিন্ন শব্দ বুঝা যায়, কিন্তু আপাততঃ দুইটী সম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধার করা গিয়াছে। ইহা হইতে নিশ্চিত সপ্রমাণ হয় যে, তাঁহাদের মাতৃভাষা কানারীস। একটী বাক্য—'বেরে কোক মধু পত্রকেছকি'; অর্থাৎ, 'প্রত্যেক পাত্রে পৃথক্‌ভাবে কিঞ্চিৎ মধু ঢালিয়া'। দ্বিতীয়—'পানম্ বের এত্তি কত্তি মধুবম্ বের এত্তুবেনু'; অর্থাৎ, 'পাত্রটী পৃথক্‌রূপে গ্রহণ ও আচ্ছাদন করিয়া আমি স্বতন্ত্রভাবে মদ্য পান করিব।'

পাপিরাস (Papyrus) লিপিতে প্রযুক্ত ভারতীয় কানারীস ভাষা দেখিয়া অনুমান হয় যে, ভারতের পশ্চিম তীরভূমিতে কারওয়ার ও মাঙ্গালোরের মধ্যবর্ত্তী কোনও বন্দরে চারিটিয়নের বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়। প্রহসনের অভিনয়স্থান মিশর, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মিশরে অনেকেই কানারীস ভাষা বুঝিত। কারণ, যদি মিশরের গ্রীক অভিনয়-দর্শনের জন্য সমাগত দর্শকবর্গ কিছুমাত্র কানারীস না জানিতেন, তাহা হইলে মদ্যপান-দৃশ্যটীর রসাস্বাদন দুরূহ হইত, এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারটীই অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত হইত। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে মিশর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে রীতিমত বাণিজ্য চলিত; সুতরাং মিশরের কতক লোক যে কানারীস বুঝিতে পারিত, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। উক্ত পাপিরাস হইতে বেশ প্রতীতি হয় যে, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে দ্রবিড়-জাতীয় শাসক-সম্প্রদায় কানারীস ভাষায় কথোপকথন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কথিত কানারীস বিশুদ্ধ কানারীস নহে; ইহাতে পালি ভাষার বহু শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গ্রীক প্রহসন হইতে যে দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পাত্র, পানম্ ও মধু (মদ্য) অনাবিল আর্য্য শব্দ; বৈদিক সাহিত্যেও তাহাদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মদ্যপানের ন্যায় সাধারণ দৈনন্দিন

* F. R. A. S. 1904. p. 399 ff.

কার্য্যেও বিজেতার কানারীস শব্দ ব্যবহার না করিয়া আর্য্য শব্দের প্রয়োগ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আর্য্য ভাষার প্রভাব অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অনার্য্য ভাষা কানারীসের উপর স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল।

যাহা হউক, সপ্ত শতাব্দীর আর্য্য আধিপত্য ও দক্ষিণ-ভারত হইতে অনার্য্য দ্রবিড় ভাষার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, দক্ষিণ-ভারতেও সভ্যতা, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি প্রধানতঃ আর্য্যভাব-প্রণোদিত। এমন কি, দ্রাবিড় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন তামিল সাহিত্যেরও এমন কোনও অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায় না, যখন মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ আর্য্যপ্রভাব প্রস্ফুট নহে। * তামিল দেশে সঙ্গম্ নামে এক প্রকার বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে কয়েক জন নিয়ামক (censor) সাহিত্য হইতে আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য নিয়োজিত হইতেন। এই বিজ্ঞ সমালোচক-সম্প্রদায়ের মনোনীত হইলে গ্রন্থ রাজকীয় সাহায্যলাভের অধিকারী হইত। প্রবাদ আছে যে, মদুরায় এবংবিধ তিনটী তামিল 'সঙ্গ' ছিল। প্রথম দুইটী অলীক হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয়টি যে ঐতিহাসিক সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তামিল পণ্ডিতগণের মতে ইহা খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর এল. ডি. এস. স্বামিকন্নি পিলাই জ্যোতিষ-গণনার উপর নির্ভর করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তামিল সাহিত্যের কোনও অংশই, এমন কি, 'তোল-কপ্যম্' † পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজকীয় শাসনলিপি প্রভৃতিতে পালি ভাষার প্রয়োগ প্রথমে বিরল, পরে লুপ্ত হয়।

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চম শতাব্দীতে দ্রাবিড় ভাষার পুনরভ্যুদয়ের জন্য বিশেষ প্রবল উদ্যোগ হয়, এবং তাহারই ফলে আর্য্য ভাষা দ্রাবিড় ভাষার কিছুমাত্র ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্রাবিড় ভাষাই আর্য্য ভাষাকে হীন করিয়া অনুশাসনলিপি ও সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। দ্রাবিড়ী-কথিত ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কানারীসের আবির্ভাব হয়। ৫৯৭—৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে চলুক্যরাজ মঙ্গলেশের শাসনপত্রে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহার পরে তামিল ৬১০—৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মা স্বীয় শাসনপত্রে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে আর্য্য ভাষার প্রাবল্যে দ্রাবিড়ী ভাষার ক্ষতি না হইয়া, উহাই কেবলমাত্র দ্রাবিড় জাতির নহে, আর্য্যবংশধরগণেরও ভাষায় পরিণত হইল।

খ্রীষ্টীয় ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত আর্য্য ভাষা ও অনার্য্য ভাষা দক্ষিণ-ভারতে যুগপৎ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহার পর আর্য্য ভাষার লোপ ও শেষোক্তের একাধিপত্য ঘটিল। অদ্যাবধি ঐ একাধিপত্য অব্যাহত।

দক্ষিণ-ভারত হইতে আর্য্যগণ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফলে সিংহলে উত্তর-ভারতের ভাষাবিপর্য্যয়ের পুনরভিনয় ও স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনের সিদ্ধান্ত অব্যর্থ হইয়াছে। আর্য্য ভাষার প্রভুত্বে অনার্য্য সিংহলীয় অবনতি ও আর্য্য পালির বিকৃতি সাধিত হইয়াছে।

---

* S. Krishnaswami Aiyangar, Ancient India, p. 70.

† Syst. Chron. Early Tamil Lit. p. 23 pt. IV.

এই কারণে সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। স্বনামধন্য বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পুত্র কর্ত্তৃক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সিংহল বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, মহেন্দ্র তাঁহার পিতার রাজধানী হইতে যে সকল ধর্ম্মপুস্তক সিংহলে আনয়ন করেন, তাহা নিশ্চয়ই মগধী ভাষায় লিখিত হইবে। কার্য্যতঃ কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটী মাগধিক কথা বর্জ্জন করিলে সিংহলে প্রচলিত ধর্ম্ম-সাহিত্যের সহিত মাগধী পালির সাদৃশ্য অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ-অনুসন্ধানের ব্যপদেশে অধ্যাপক ওল্‌ডেনবার্গ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক-আনয়ন-প্রসঙ্গে মহেন্দ্রের বিবরণ মিথ্যা জনবাদ বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। ইনি দেখাইয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রের অনুশাসনাবলী ও উড়িষ্যার মহারাজ খারবেলের হথিগুম্ফা-অনুশাসনের সহিত সিংহলী পালির প্রভূত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, দক্ষিণ-ভারতের মহারাষ্ট্র অথবা কলিঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সময়ে ত্রিপিটক সিংহল দ্বীপে আনীত হয়। মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ উপনিবেশী আর্য্যগণ একই ভাষা ব্যবহার করিতেন, ইহা তাঁহাদের অনুশাসন হইতে প্রকাশিত হয়। পরে যখন তাঁহারা সিংহল অধিকার করিয়া তথায় বসতি করিলেন, তখন সেখানে তাঁহাদের আর্য্য ভাষা প্রচারিত হইল। এই উপনিবেশ-স্থাপন কার্য্য মৌর্য্য-অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে সুসম্পন্ন হয়, এবং আর্য্য ভাষা সিংহলীগণের ভাষায় পরিণত হয়। সুতরাং অধ্যাপক ওল্‌ডেনবার্গের মহেন্দ্রবিষয়ক মত স্বীকার না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিবার পূর্ব্বেই পালি ভাষা সিংহলের কথিত ভাষা ছিল। মহেন্দ্রের আনীত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অবশ্য মাগধী পালিতে রচিত। কিন্তু বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে * ভগবান বুদ্ধদেব স্পষ্টরূপে আদেশ করিয়াছেন যে, ভিক্ষুগণ তথাগতের বার্ত্তা জনবর্গের নিকট তাহাদের নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব মহেন্দ্রের মাগধী সাহিত্যের পরিবর্ত্তে সিংহলের কথিত পালির প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রহিল। কয়েকটী মাগধী শব্দ ও রূপ থাকিয়া গিয়াছে; কারণ, মাগধী ও সিংহলী পালি প্রকৃতপক্ষে একটী আর্য্য ভাষারই রূপভেদমাত্র; উভয়ই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আধুনিক সিংহলের ভাষাসমূহ পূর্ব্বোক্ত পালি ভাষার ক্রমবিকাশ।

আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিশ্লেষণকালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উত্তর-ভারত ও সিংহলের ভাষা আর্য্যভাষাসম্ভূত, এবং দক্ষিণ-ভারতে অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা আর্য্য পালিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং বহুতর সমৃদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। †

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

---

* Vinonya-Pitakam, Vol. I. Intro. pp. liv-lo

† Prof. D. R. Bhandarkar, Carmichæl Lecture.

রায় পরিবার।

৫

শ্বশুরবাড়ীতে গৌরীর আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটী ছিল না। তাহার শাশুড়ী মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, মনেও তাহাই ভাবিতেন; বধূরা 'ছেলেমানুষ', সুখে লালিতাপালিতা, পাছে তাহাদের কোনও অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে সংসারের কোনও কাজ করিতে দিতেন না; যে কাজ তাহারা সখ করিয়া করিতে চাহিত, কেবল তাহাই তাহারা করিতে পাইত। সে বিষয়ে গৌরীর মাতা গৌরীর অপেক্ষা অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল; সে জিদ করিয়া কাজ করিত; গৌরীর সে বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যাইত না। বিধাত্রী দেবী তাহাকে যত আদরেই রাখিয়া থাকুন না, সর্ব্বদাই কাজ করিতে উপদেশ দিতেন, এবং শিখাইতেন। গৌরী যখন 'ঘর করিতে' যায়, তখনও তিনি তাহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সদুপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীর মাতার ভাবটা গৌরীতে সংক্রান্ত হইয়াছিল। মা যে সর্ব্বদাই মনে করিতেন, গৌরীর শ্বশুরবাড়ী তাঁহার মেয়ের উপযুক্ত হয় নাই, মেয়ে তাহা জানিত। সে পিতামহীকে সংসারের সব কাজ করিতে দেখিয়াছিল, এবং আপনার সংসারের কাজ আপনি করা যে অপমানজনক নহে, তাহাও বুঝিত; কিন্তু তাহার মা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, সে ত আর সংসারের কর্ত্রী নহে, কাজেই যে সংসারে ঝির অভাবে বাড়ীর বধূকে সংসারের কাজ করিতে হয়, সে সংসারে কাজ করা বধূর পক্ষে অপমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই গৌরী কাজ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। তাহাতে তাহার শাশুড়ী কিছুই মনে করিতেন না; কিন্তু সুশীল বিরক্ত হইত। বিশেষ শাশুড়ীর যে মতের বিষয় সে জানিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সে গৌরীর ব্যবহারে সন্দেহ করিত, সেও মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, শ্বশুরবাড়ী তাহার মত ধনী কন্যার উপযুক্ত হয় নাই। এইরূপ বিশ্বাস যুবকের পক্ষে যেমন কষ্টকর, তাহার ভালবাসার পক্ষে তেমনই মারাত্মক। ইহা সসর্প গৃহে বাসের অপেক্ষাও ভয়ানক, চক্ষুতে বালু লইয়া কাজ করার অপেক্ষাও কষ্টকর। সে যাহাই হউক, শ্বশুরবাড়ী যে গৌরীর কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে, এমন কথা বলিবার অবকাশ তাহার মাতাও পাইলেন না।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেলে সুশীলকুমারের পরিবারে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিল। মফঃস্বলে একটা মামলা করিতে যাইয়া তাহার ভগিনী-

পতি জ্বর লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা প্রবল হইলে ডাক্তারেরা রক্ত-পরীক্ষায় তাহার নিদান নির্ণয় করিলেন—কালাজ্বর। দীর্ঘ ছয় মাস সর্ব্ববিধ চিকিৎসা চলিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জ্বরে পড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার খরচ কুলাইতে অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গিয়াছিল। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর সুশীল ও তাহার ভ্রাতা দিদিকে আপনাদের সংসার-ভুক্তা করাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল।

সুশীল হাইকোর্টের বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ভাল করিয়া ওকালতী আরম্ভ করিতে পারে নাই; ভগিনীপতির চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় জন্য বিব্রত ছিল। দিদিকে সংসারভুক্তা করিবার পর সে-ই জিদ করিল, বড় ভাগিনেয়কে বিলাতে পড়িতে পাঠাইবে। ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবার সব ব্যবস্থা তাহার ভগিনীপতিই করিয়াছিলেন—কিন্তু কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুশীল যখন তাঁহার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে জিদ করিল, তখন তাহার দিদিই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভাই, আমার পোড়া কপালে সে আশাও শ্মশানে পুড়িয়াছে, ও কথা আর তুলিও না। সে আশা এখন ছেঁড়া চেটাইয়ে শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার সমান।' সুশীল কিন্তু ছাড়িল না। দিদি বলিলেন, 'তুমি কি পাগল? একে এই সব ছেলে মেয়ে লইয়া তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছি—তোমাদের অবস্থা যাহা, তাহাও ত জানি; এখন কি আর মাসে মাসে দুই শত তিন শত টাকা জোগান যায়!' সুশীল যেটা জিদ ধরিত, সহজে সেটা ছাড়িত না; সে হিসাব করিয়া দেখাইল, মাসে দুই শত টাকা হইলেই খরচ কুলাইবে, আর তাহাতে শেষে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই; কারণ, এ দেশে ডাক্তার হইতে ভাগিনেয়ের আরও চারি বৎসর লাগিবে। বিলাতে যাইলে সে দুই বৎসরে ডাক্তার হইয়া আসিতে পারিবে। সে বলিল, 'তোমার বাড়ীর ভাড়া মাসে এক শত টাকা আছে, আর আমার শ্বশুরবাড়ীর এক শত টাকা আছে, ইহাতেই কুলাইয়া যাইবে।' দিদি অনেক করিয়া বুঝাইলেন, এখন আর সুধীরকে বিলাতে পাঠান সম্ভব নহে। সুশীল কিছুতেই বুঝিল না। সুধীর প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল—তাহাকে সে এক মাসের মধ্যেই বিলাতে পাঠাইবে। সে তখনই সব ব্যবস্থা করিতে বসিয়া গেল। দিদি সংসারভুক্তা হওয়ায় খরচ বাড়িয়াছে, যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে। কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, পাছে বধূদিগের অসুবিধা হয়,

সেই আশঙ্কায় তাহার মাতা দুই বধূর জন্ম দুই জন দাসী রাখিয়াছিলেন। সেই বাহুল্য কমাইয়া সুশীল ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্তাব করিল। সেই প্রস্তাব হইতে সংসারে বিষম গোল বাধিল।

গৌরীর দাসীর কাজ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। কাজের মধ্যে তাহার বাপের বাড়ী সংবাদ-বহন। সে দেখিল, এইবার সে অবস্থায় পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; তাই সে নানা কথায় গৌরীর 'কান ভারী' করিতে লাগিল। গৌরী তাহার কথায় বুঝিল, এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইতেও পারে, অসুবিধা হইবেই।

পর দিন অপরাহ্নে গৌরী সংবাদ পাঠাইয়া বাপের বাড়ীর গাড়ী আনাইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ তাড়াতাড়ি আসিলি কেন? আজ মাসের সংক্রান্তি, আজই ফিরিয়া যাইতে হইবে; যখন আসিলি, দুই দিন পরে আসিলে ত দুই দিন থাকিয়া যাইতে পারিতিস'। উত্তরে গৌরী বলিল, 'কাল হইতে আমার ঝি সংসারের কাজে যাইবে, আর ত আসিবার অবসর পাইব না, তাই আজ আসিলাম।' মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন রে?' তখন গৌরী সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'ঠাকরুণ যে কি বুঝ বুঝিয়া এ কাজ করিয়াছিলেন!' তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আমি কাল সুশীলকে বলিব, তা হইবে না; তোর ঝি রাখিতে হইবে।' গৌরী বলিল, 'না—তুমি কিছু বলিও না; কি জানি কে কি মনে করে।' মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'কেন? আমি ত মাসে এক শত টাকা দিয়া থাকি, আমার মেয়ের একটা ঝি রাখিতে হইবে, সে কথাও বলিব না? এত ভয় কিসের?'

সন্ধ্যার পর গৌরী যখন ফিরিয়া গেল, তখন মার আদেশে রমা দিদির সঙ্গে যাইয়া সুশীলকে পর দিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

মেয়ের বিবাহে যে তাঁহার কথা থাকে নাই, শাশুড়ী আপনার মতে কাজ করিয়াছিলেন, সে কথা গৌরীর মা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার আহত অভিমান মনের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, বাহির হইবার পথ সন্ধান করিতেছিল—পথ পাইতে ছিল না, কাজেই সুশীলের সঙ্গে ঝি রাখার কথায় তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া কথা কহিতে পারিলেন না, কথাটা গোড়া হইতেই একটু কড়া হইল। সুশীলও এই বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক ছিল; গোড়া হইতেই কথাটা একটু বাঁকা ভাবে ধরিল। শাশুড়ী যখন প্রথমে বলিলেন, 'গৌরীর

ঝিকে না কি জবাব দিতেছ?' তখনই সুশীল বুঝিল, পূর্ব্ব দিন গৌরীই আসিয়া সে সংবাদ দিয়া গিয়াছে। সে দৃঢ়ভাবে বলিল, 'জবাব দিতেছি না, অন্য কাজ দিতেছি।' শাশুড়ী সে ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'দেখ বাবা, তা হইবে না—আমার ঐ এক মেয়ে, উহার কোনও কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না।' সুশীল উত্তর দিল, 'যাহাতে কোনও কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।' শাশুড়ী মাত্রা আর একটু চড়াইয়া বলিলেন, 'দেখ, আমি যে মাসে মাসে এক শত টাকা দিয়া থাকি, সে তোমার ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীর জন্য নহে, আমার মেয়ের জন্য।' সুশীল বলিল, 'অনুগ্রহ করিয়া এই মাস হইতে আর টাকা দিবেন না। যত দিন সে টাকা স্নেহের উপহার ছিল, তত দিনই ভাল ছিল; এখন তাহা অনুগ্রহ হইয়াছে, সুতরাং আমার পক্ষে সে টাকা লওয়া একেবারেই নিগ্রহ।' তাহার মাসহারা যে অনুগ্রহে পরিণত হইয়াছে, ইহা সে এত দিন লক্ষ্য করিতে পারে নাই বলিয়া, সুশীল আপনাকে ধিক্কার দিল। বিধাত্রী দেবীর আমলের আর বর্ত্তমান সময়ের ব্যবস্থার প্রভেদ মুহূর্ত্তে তাহার কাছে পরিস্ফুট হইল। তিনি গোপনে তাহাকেই মাসহারার টাকা দিতেন—সে আসিতে না পারিলে দুইবার তাহার বাড়ীতে যাইয়াও দিয়া আসিয়াছিলেন; এখন আর সে আবরণ নাই। এই কথা স্মরণ করিয়া সুশীল আপনার প্রতি ধিক্কারে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শাশুড়ী বলিলেন, 'আজ তাহা বলিতে পার—এখন বুঝি 'মানুষ' হইয়াছ—আর দরকার নাই।' সুশীল বলিল, 'যে ভুল হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা অসম্ভব, সুতরাং আমি আর কোনও কথা বলিতে চাহি না। আমি জানি, রূপে ও অর্থে যেমন জামাই আপনি চাহিয়াছিলেন, তেমন পান নাই। কিন্তু সে জন্য আমাকে অপরাধী করিতে পারিবেন না।'

সুশীল বুঝিতে পারিল, সে আপনার ধীরতা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না; তাই সে ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। শাশুড়ীর কাছে বিদায় লইবার সময় সে যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা গৌরীর কাছে শুনিবার পূর্ব্বে তাহার মনেও হয় নাই। রাত্রিকালে শয়নকক্ষে আসিয়া সে দেখিল, গৌরী বসিয়া আছে। সুশীলের মনে হইত, তাহার সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে সাগরের সাদৃশ্য অসাধারণ। গৌরীর মুখে সাগরের সৌন্দর্য্য, নয়নে সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলোর্ম্মির দীপ্তি, হৃদয়ে সাগরবারির চাঞ্চল্য, হাসিতে তরঙ্গলীলা, কুন্দদন্তে সাগরের ফেন-শোভা। আজ সে সাদৃশ্য আরও পরিস্ফুট মনে হইল আজ তাহার নয়নের দীপ্তি মধ্যাহ্ন-দিবাকরের কিরণপ্রদীপ্ত সাগরের

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত, তাহার অধরে সাগরোর্ম্মির কুঞ্চন। গৌরী সুশীলকে বলিল, 'আমাদের বাড়ী গিয়াছিলে?' স্বরে কোমলতার লেশমাত্র ছিল না।

সুশীল বলিল, 'হাঁ।'

'মাকে প্রণামেরও অযোগ্য মনে করিয়া তাচ্ছীল্য করিয়া আসিয়াছ!'

সুশীল বুঝিল, ইহার মধ্যেই তাহার মাতা তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় তাহার মনের বেগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল—সে আর বিচলিত হইল না, বলিল, 'আমি বড় চঞ্চল হইয়াছিলাম, তাই, বোধ হয়, ভুল করিয়াছি; ইচ্ছা করিয়া যে তাঁহাকে প্রণাম করি নাই, এমন নহে।'

সুশীল নরম হইল দেখিয়া গৌরী সুরে আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিল—'তাহাতে মার কোনও ক্ষতি হইবে না, ক্ষতি যদি কাহারও হয়, সে তোমাদেরই। মাসহারার টাকা আর লইবে না, বলিয়া আসিয়াছ?'

'হাঁ।'

'তা'র পর? এ দিকে ত ভাগিনেয়কে বিলাতে পাঠাইতেছ!'

'তা'র পরের জন্য তত ভাবি না। গরীবের ছেলে অবস্থার উপযোগী আকারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া পরের পয়সায় 'বড়মানুষ' হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে, এখন আপনার অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব।'

গৌরী আর কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, কেবল বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'ওঃ—'

সে রাত্রিতে সুশীল ঘুমাইতে পারিল না। সে বুঝিল, তাহার জীবনে দাম্পত্য সুখের আশা গৌরীর সে দিনের ব্যবহারের অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে—কেবল তাহাকে যাবজ্জীবন বহ্নিজ্বালা সহ্য করিতে হইবে। অথচ এই যাতনার কথা কাহাকেও বলিবার নহে। সে যত ভাবিতে লাগিল, তত দারিদ্র্যের মাহাত্ম্যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাহার মনে সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল—এক দিন সে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব পদাঘাতে চূর্ণ করিবে, তাহার সমগ্র শক্তি অর্থার্জ্জনে প্রযুক্ত করিয়া সে দেখাইবে, সে অর্থ ধূলির মত পরিহার করিতে পারে। কিন্তু হায়!—জীবনের সব সুখ ত স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া গেল। কেবল অর্থার্জ্জনে কি জীবন ব্যয়িত হইবে? সঙ্গে সঙ্গে সুধীরকে ব্যবসাধা শিক্ষা দিবার সঙ্কল্পও সে করিল—সে সঙ্কল্প যেন গৌরীর ব্যবহারের প্রতিশোধ।

পর দিন আর একটা ঘটনা ঘটিল। সুশীল ভাগিনেয়ের যাত্রার জন্য

আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বাজার করিয়া ফিরিয়া সে হিসাবটা লিখিবার জন্য আপনার বসিবার ঘরে গেল। তাহার শয়নকক্ষ তাহার পার্শ্বেই। গৌরী সেই ঘরে ছিল, এবং সুশীলের আগমন লক্ষ্যও করিয়াছিল—দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দ্বার মুক্ত ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সুশীল শুনিতে পাইল, এক জন স্ত্রীলোক গৌরীকে বলিল, 'কি গো, ছোট বৌদিদি, একা ঘরে বসিয়া আছ ?'

গৌরী বলিল, 'এই যে তাঁতিনী! কাপড় আনিয়াছিলে ?'

'না, বৌদিদি; আজ টাকা দিবার কথা ছিল, তাই আসিয়াছিলাম।'

'কত টাকা ?'

'এই—তত্বতাবাসের কাপড়ের দরুণ, প্রায় এক শত টাকা পাওনা ছিল, মাসে মাসে শোধ হয়ে আর টাকা ত্রিশ আছে।'

'আজ কত টাকা পাইয়াছ ?'

'আজ টাকা পাই নাই; নাতির বিলাত যাইবার খরচ, তাই গিন্নী-মা বলিলেন, সামনের মাসে দিবেন।'

'ছিঃ—কথার ঠিক থাকে না!'

'ও কথা বলিও না, বৌদিদি, এ বাড়ীতে কথার নড়চড় হয় না—তবে এবার—অমন সংসার করিতে গেলেই হয়।'

'যাহার কথার ঠিক থাকে না, তাহার জীবনে থাকে কি ? কথার ঠিক না থাকিলে কেবল ত আপনারাই ইতর জানান হয় না, যে যেখানে আছে, সবাইকেই ইতর করা হয়।'

'সে কি কথা, বৌদিদি!'

তাহার পর গৌরী তাঁতিনীকে কাপড়ের পুঁটুলী খুলিতে বলিল—কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও প্রায় সব কয়খানা কাপড়ই কিনিল, এবং 'ধারে আমার বড় ঘৃণা' বলিয়া আলমারী খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দাম চুকাইয়া দিল।

গৌরীর এই ব্যবহারের লক্ষ্য কে, সুশীলের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না—যাতনায় যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সব আশা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে নিরাশার বিস্ফোটক লইয়া জীবনে কেবল যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহাই তাহার নিয়তি। কিন্তু সে কেমন করিয়া গৌরীর সান্নিধ্যে থাকিবে ? যে সান্নিধ্য উভয়ের পক্ষে অনন্ত সুখের কারণ হইবার আশা সে করিয়াছিল, তাহা এখন অনন্ত দুঃখের কারণ

পরিণত হইয়াছে। গৌরী যখন তাহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে তাহার গর্ব্ব লইয়াই সুখে থাকুক ; সে নিষ্ফল জীবনের বেদনা অনুভব করিবে না। কিন্তু সুশীল? সে কি লইয়া থাকিবে? অর্থ, যশ—এ সব কিসের জন্য? যখন এ সকলে প্রেমাস্পদের সুখবিধান হয়, তখনই এ সব সুখের, নহিলে এ সব কেবল সময় কাটাইবার উপাদান, ব্যর্থ জীবনের বেদনা কার্য্যের প্রলেপে আবৃত করিয়া গোপন করিবার প্রয়াস। এই গৃহ, পিতার স্মৃতিপূত, মাতার স্নেহস্নিগ্ধ, স্বজনের ভালবাসায় সমুজ্জ্বল, এই গৃহে বাসও তাহার পক্ষে কেবল কষ্টের কারণ হইয়াছে। তবে সে কি করিবে?

সুশীলের মনে পড়িল, কয় দিন পূর্ব্বে সে তাহার এক সতীর্থের পত্র পাইয়াছে। গিরিজা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গিয়াছে। বঙ্গদেশে উকীলের আধিক্যে বিশেষ সুযোগ বা অসাধারণ প্রতিভা ব্যতীত নূতন লোকের পক্ষে অল্প দিনে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। গিরিজার আর্থিক অবস্থা তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার অন্তরায় বলিয়া সে 'বিদেশে' গিয়াছে। সে সুশীলকে লিখিয়াছে, সে অল্প দিনের মধ্যেই পশার করিয়াছে। সে আরও লিখিয়াছে, তথায় সুশীলের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে সাফল্য সুলভ। সুশীল ভাবিল, সে 'বিদেশে' যাইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। সে তাহাই করিবে।

হিসাব লেখা রাখিয়া সে সুধীরকে ডাকিল, এবং বলিল, সাত দিন পরে যে জাহাজ যাইবে, সে সেই জাহাজে যাইতে পারিবে ত? বিলাতে যাইবার ঝোঁক সুধীরের পক্ষে নেশার মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, 'নিশ্চয় পারিব।' তখন সুশীল যাইয়া মাতাকে সে কথা বলিল। মা বলিলেন, 'তোর, বাবা, যখন যেটার ঝোঁক হয়! এত তাড়াতাড়ি কেন?' সুশীল বলিল, গিরিজার পত্র পাইয়া সে স্থির করিয়াছে, সে গিরিজার কর্ম্মস্থানে যাইবে, তাই সুধীরকে পাঠাইয়া যাইতে চাহে। মা আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'তাহাতে কাজ নাই, আমি তোকে 'বিদেশে' যাইতে দিব না। সুখে হউক দুঃখে হউক, সব এক জায়গায় থাকিব।' সুশীল বলিল, 'দেখ, মা, এখন টাকার দরকার বাড়িতে চলিল—আর 'বিদেশ' ত এক দিনের পথ।' দিদি বলিলেন, 'তা কিছুতেই হইবে না।' কিন্তু সুশীলের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে স্নেহযুক্তিসবল দুই জন নারীকে যুক্তিতর্কে পরাভূত করা সহজসাধ্য। যদিও আপনার প্রতিভায় তাহার যে প্রত্যয় ছিল, তাহাতে সে বিশেষ আস্থিত, সে কখনই তাঁহাদের

পশ্চাতে বদ্ধ 'গাধা-বোটে'র মত পরের শক্তিতে চালিত হইয়া সাফল্যের গঞ্জে ভিড়িবে না, তথাপি সে বলিল, 'মা, যখন ওকালতী করিব স্থির করিয়াছিলাম, তখন ভরসা ছিল, জামাই বাবুর সাহায্য। দিন কাল যেরূপ, তাহাতে তেমন সাহায্য না হইলে, এখানে পশার করা দুষ্কর। কিন্তু অন্য স্থানে এখনও সে সুবিধা আছে। তাই অনেক ভাবিয়া আমি যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।' সুশীলের দাদাও তাহার যুক্তির সমর্থন করিলেন। তখন আর কোনও বাধা রহিল না। কেবল দিদির নয়নে অশ্রু শুকাইল না—তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'হায়, এমন পোড়া কপাল লইয়াই জন্মিয়াছিলাম! ভাই আমার—আমারই জন্য সর্ব্বত্যাগী, বনবাসী হইতেছে।'

মা এক দিন সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর যাইবার কথা তোর শাশুড়ীকে বলিয়াছিস?' সে কথাটার খোলসা উত্তর না দিয়া সে বলিল, 'আমার যত ভয় ছিল তোমাকে। যখন তোমার মত হইয়াছে, তখন আর কাহারও মতের জন্য ভাবনা নাই।' তাহার পর মা প্রস্তাব করিলেন, সুশীল গৌরীকে লইয়া যাইবে—'না হয়, আমি দিন কতক থাকিয়া সংসার পাতাইয়া দিয়া আসিব। তোর দিদি থাকিতে এখানে কোনও অসুবিধা হইবে না।' সুশীল বলিল, 'মা, যে সাঁতার শিখিতে যাইতেছে, তাহার কোমরে ভারী জিনিস বাঁধিয়া দেওয়াটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। সুবিধা হইবে আশা করিয়া যাইতেছি, যদি না হয়, ফিরিয়া আসিতে হইবে। এ সময় কি ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা করা চলে?' মা নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু সে যে একা 'বিদেশে' যাইতেছে, সেটা কিছুতেই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষ, তাহার একা যাওয়াটা তিনি কিছুতেই ভাল মনে করিতে পারিতেছিলেন না।

সুশীলের যাইবার কথা বাড়ীর মধ্যে কেবল গৌরীই জানিতে পারে নাই। তাহার ঝি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোটবাবু নাকি 'বিদেশে' যাইতেছেন?' তখন সে বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কই—আমি ত কিছু জানি না!' ঝি বলিল, 'তুমি আবার জান না! বিদেশে যাওয়া কেন?'

সুশীলের বিদেশে যাইবার প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত যে, তাহা অসম্ভব মনে করিয়া গৌরী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেরূপ ব্যবস্থা তাহার কল্পনারও অতীত, এবং ধারণারও সীমার বাহিরে।

কিন্তু অসম্ভবই সম্ভব হইল। সাত দিন পরেই এক দিন মধ্যাহ্নে সুশীলকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর সুশীল তাহার মনোনীত কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিল। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ঘাতকের মায়া।

১

মহেশ চক্রবর্ত্তীর ছেলে শিবু চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য হইলেও পাঁঠা কাটিয়া আপনার নামটাকে প্রসিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে গ্রাম্য দেবতা সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত ছিল। এক পুরুষের সেবায়েত নয়, পাঁচ পুরুষের সেবা। সুতরাং পূজকের উপযুক্ত বিদ্যা না থাকিলেও সে পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত, গুরুর ছেলে গুরু, ইহাই নিয়ম। শিবুর বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। দেবতার যে আয় ছিল, তাহাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার সংসার চলিয়া যাইত।

সংসারে খরচও তেমন বেশী ছিল না; শুধু সে নিজে আর বুড়া পিসী। মা বাপ মারা গেলে পিসীই শিবুকে মানুষ করিয়াছিলেন। লেখাপড়া শিখাইবারও চেষ্টা যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। নিষ্ফলতার কারণ কতকটা তাঁহার আদর, কতকটা শিবুর অমনোযোগ। সাধারণ জ্ঞান হইবার পর শিবু দেখিল, সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় যে চাল কলা সন্দেশ বাতাসা ঘরে আসে, তাহাই খাইয়া যখন শেষ করিতে পারা যায় না, তখন ইহার উপর সরস্বতীর কৃপালাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সুতরাং পাঠশালায় বর্ণপরিচয় শেষ করিবার পর যখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বানান করিয়া পড়িতে পারিল, তখন সে কেবল গুরুমহাশয়ের নিকট নয়, সরস্বতীর নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করিল। পিসীমা এ জন্য অনুযোগ করিলে উত্তর দিল, 'ভাবনা কি পিসীমা, মা সিদ্ধেশ্বরী থাকতে আমাদের বংশে কারও গুরুমহাশয়ের বেত খাবার দরকার হবে না।'

উপনয়নের পর শিবু রামসদয় বাচস্পতির টোলে গিয়া জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে কালীর ধ্যানটা লিখিয়া আনিয়া তাহা মুখস্থ করিল, এবং তাহার পর হইতে নিজে দেবতার পূজার ভার গ্রহণ করিল। পূজারীর ছেলে পূজারী হইবে, সুতরাং ইহাতে গ্রামের লোকের কোনও আপত্তি রহিল না। মূর্খ বলিয়া যে দুই এক জনের আপত্তি ছিল, পূজার কলাকে দ্বিগুণ করিয়া লইয়া শিবু তাহাদের সে আপত্তির খণ্ডন করিয়া দিল। যদিও সে ধ্যানপাঠকালে 'দ্বিভুজা দক্ষিণে দেব্যাঃ মুণ্ডমালাং প্রসেবিতাং, সদ্যচ্ছিন্নাং শিরঃ খড়্গো বামাছদ্ধে করাম্বুজাং' পাঠ করিত, এবং 'সিদ্ধেশ্বরী কালিকায় নমঃ' বলিয়া দেবীর চরণে

পুষ্প প্রদান করিত, তথাপি সে মন্ত্রগুলি সুরের সহিত এমনই উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে থাকিত যে, বাজারের দোকানদারেরা তাহা শুনিয়া প্রশংসা করিয়া বলিত, 'লেখাপড়া না জানলে কি হয়, পূজারী ঠাকুরের ভক্তিটুকু বেশ আছে।'

শিবুর এই ভক্তিটুকু আরও বর্দ্ধিত হইত, যে দিন কোনও যজমান পাঁঠা লইয়া মানসিক শোধ করিতে আসিত। সে দিন সে নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির 'ব্রহ্মমুরারি ত্রিপুরান্তকারী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নমঃ শিবায় শান্তায়' পর্য্যন্ত একনিঃশ্বাসে পড়িয়া যাইত। এই ভক্তিবৃদ্ধির কারণও ছিল। আগে কামারে পাঁঠা কাটিত, এবং সে পারিশ্রমিকস্বরূপ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইত। শিবু ইহাতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল, এবং সে দেশের যেখানে যত বেল গাছ ছিল, তাহা উজাড় করিয়া বেল আনিয়া তাহা কাটিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সে ছেদন কার্য্যে হাত পাকাইয়া প্রচার করিল যে, বলিচ্ছেদ পূজকেরই কার্য্য, সুতরাং এখন হইতে সে নিজেই বলিদান করিবে। ইহাতে কামার বৃত্তিলোপের আশঙ্কায় আপত্তি তুলিল। কিন্তু শিবু তাহার প্রাপ্য ছাগমুণ্ড তাহাকে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় কামার নিরস্ত হইল।

শিবু দিন কতক আপনার কথা রাখিল, নিজে পাঁঠার মুড়ি লইয়া কামারের ঘরে পঁহুছাইয়া দিত। তার পর আর কে বা যায়! কামারও ভাবিল, দূর হউক, বামুনের ছেলে পাঁঠা কাটবে, আর আমি তার মুড়ি খাব। তার চেয়ে বামুনে খায় মন্দ কি। তদবধি ছাগমুণ্ড শিবুর নিজের ঘরেই আসিত, এবং তদ্দ্বারা তাহার পরিপাটীরূপে নৈশ-ভোজনের আয়োজন হইত। যে দিন দুই তিনটা পাঁঠা কাটা হইত, সে দিন শিবু দুই এক জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, এবং তাহার গাঁজার পরিমাণটা ডবল মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত।

ক্রমে শিবু পাঁঠা কাটায় এমনই সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল যে, গ্রামের যেখানে যত বড় বড় পাঁঠা কাটা হইত, সেইখানেই পূজারী ঠাকুরের ডাক পড়িত। অনেক স্থলে সে আবার উপযাচক হইয়া, বিনা পারিশ্রমিকে পাঁঠা কাটিতে ছুটিত, এবং বড় বড় পাঁঠাগুলাকে এক এক কোপে কাটিয়া দর্শকগণের বিস্ময় ও প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিকেই স্বীয় বীরত্বের যথেষ্ট পারিশ্রমিক বলিয়া মনে করিত। তার পর মুদীর দোকানে, কামারশালায় বসিয়া পাঁঠা কাটার মধ্যে যে কত প্রকার কৌশল আছে, তাহাই ব্যক্ত করিতে থাকিত। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোকে বুঝিতে পারিত, পাঁঠা কাটার মত মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে আর নাই!

এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া, মধ্যে মধ্যে গাঁজায় দম দিয়া, এবং সিদ্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবু যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছিল, তখন পিসীমা ধরিয়া বসিল, 'বিয়ে কর্ শিবে, বাপের বংশরক্ষা হউক্।'

বংশরক্ষায় শিবুরও আপত্তি ছিল না। সুতরাং সে বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে সাত বিঘা জমী বন্ধক দিয়া চারি শত টাকা সংগ্রহ করিল, এবং সেনহাটীর পরমেশ্বর বাউলী মহাশয়কে সেই টাকা ধরিয়া দিয়া, তাঁহার সাড়ে সাত বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। কিন্তু বিবাহের পর একটা গোল উঠিল, পরমেশ্বর বাউলীর বিবাহগত দোষ আছে; তিনি অধিকারী ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; শিবুর চারি শত টাকা মূল্যের পত্নী সেই অধিকারী-কন্যার গর্ভজাত। গ্রামে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। গ্রামের প্রধানেরা ধরিয়া বসিল, হয় মেয়েটাকে ত্যাগ কর, নয় সিদ্ধেশ্বরীর সেবা ছাড়।

শিবু জীবিকার একমাত্র অবলম্বন দেবসেবা ছাড়িতে পারিল না, নববিবাহিতা পত্নীকেই ত্যাগ করিল।

সে আজ প্রায় সাত আট বৎসরের কথা। তার পর অনেকেই শিবুকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। শিবু কিন্তু তাহাদের কথায় কান দেয় নাই, বা বিবাহের কোনও চেষ্টাও করে নাই। কেবল সকালে এক ছিলিম গাঁজা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

২

সকালে গাঁজায় দম দিয়া বেশ এক ছিলিম কড়া তামাক সাজিয়া লইয়া, শিবু রাস্তার ধারের চালাটীতে বসিয়া আছে, এমন সময় একটী কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু কূর্দ্দন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিল, এবং দুই একবার অস্ফুট শব্দ করিয়া তাহার জানুতে শৃঙ্গহীন মস্তক ঘর্ষণ করিতে লাগিল। শিবু বাঁ হাতে হুঁকা ধরিয়া ডান হাত দিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

রসিক রায় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল; পূজারী ঠাকুরকে তামাক খাইতে দেখিয়া সে আসিয়া পাশে বসিল। শিবু কলিকা-সমেত হুঁকাটা তাহার দিকে হেলাইয়া দিল। রসিক হাত বাড়াইয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইল, এবং উভয়-হস্ত-সংযোগে তাহাতে টান দিতে দিতে শিবুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছাগশিশুটীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'দিব্যি নধর পাঁঠাটি! কার হে?'

শিবু সম্মুখস্থ কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'বীরুর মায়ের।'

রসিক বলিল, 'বুড়ী বুঝি ছাগল চাষ করে?'

শিবু বলিল, 'কাজেই। ছেলে গেছে, কিন্তু পেট তো আছে।'

শিবুর স্বরটা যেন করুণায় আর্দ্র হইয়া আসিল। রসিক সে দিকে মনো-যোগ না দিয়া, ছাগশিশুর উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'পাঁঠাটী কিন্তু চমৎকার। তবে এখনও বলির লায়েক হয় নি।'

শিবু বলিল, 'এই মোটে মাস দু'য়ের।'

ছাগশিশুটী তখন সরিয়া আসিয়া শিবুর পৃষ্ঠ-লেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রসিক ধূমপান শেষ করিয়া, কলিকাটা শিবুর হস্ত-ধৃত হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে যে খুব ভাব দেখ্‌ছি।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'আমি এখানে বসলেই ছুটে আমার কাছে আসে।'

রসিক বলিল, 'দিন থাকতে ভাব ক'রে রাখছে। তোমার হাতেই তো এক দিন ওর নিয়ৎ আছে।'

রসিক হাসিয়া উঠিল। তাহার সে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ভীত হইয়া ছাগশিশু অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে শিবুর কোলের কাছে সরিয়া আসিল। শিবু ডান হাত দিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রসিক উঠিয়া গেল।

শিবু ডাকিল, 'কালু!'

ছাগশিশুটী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া শিবু তাহাকে কালু, কালুয়া, কেলো প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। তাহার সাদর আহ্বানে কালু আর একটু সরিয়া আসিল, এবং নিজের মুখটা উচু করিয়া শিবুর মুখের উপর স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। শিবু 'আঃ' বলিয়া বিরক্তভাবে তাহার মুখটা ঠেলিয়া দিল। কালু যেন এ বিরক্তিটুকু বুঝিতে পারিয়া একটু পিছাইয়া আসিল, এবং একবার তাহার পৃষ্ঠে ও জানুদেশে মাথা ঘষিয়া পাশে শুইয়া পড়িল। শিবু তামাক খাইতে খাইতে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার গলাটা টিপিয়া টিপিয়া স্থূলতা ও কোমলতার পরীক্ষা করিতে লাগিল। নাঃ, নিতান্তই কোমল, হাড় নাই বলিলেই হয়; এখনও খড়্গাঘাতের আদৌ উপযুক্ত হয় নাই; হাড়ীকাটে ফেলিয়া একটা টান দিলেই ছিঁড়িয়া যাইবে। অন্ততঃ এক বৎসরের না হইলে ইহাকে কাটিয়া সুখ নাই।

ঘাড়ের লোমগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে করিতে শিবু ডাকিল, 'কালু!'

কালু মুখ তুলিয়া চাহিল। শিবু বলিল, 'তুই যখন বড় হবি, আর আমি তোকে কাটতে যাব, তখন কি হবে বল্ দেখি?'

কালু উত্তর করিল, 'প্যাঁ—এ্যাঁ।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'হবে আর কি, তোর পশুজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যাবে। কিন্তু তুই মনে করবি, বামুনটা কি নিষ্ঠুর!'

কালু উত্তর দিল, 'প্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ।'

শিবু হাসিয়া উঠিল; বলিল, 'দূর বেটা, ভয় পেলি নাকি? না না, আমি তোকে কাটবো না। কেমন?'

কালু স্বীয় সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। পিসীমা আসিয়া বলিলেন, 'হাঁরে শিবে, এখনো ব'সে বসে গল্প করবি, এর পর নাইবি, পূজো করবি কখন্?'

বলিয়াই তিনি ইতস্ততঃ চাহিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিস্? এই ছাগলছানার সঙ্গে?'

শিবু বলিল, 'কেন পিসীমা, ছাগলছানাটা কি মানুষ নয়?'

ঈষৎ হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, 'হাঁ, মস্ত মানুষ। তা এখন উঠবি না কি? তোর আবার আজ কাল পূজোর ঘটা এত বেড়েছে যে, দুপুর গড়িয়ে গেলেও পূজো সাঙ্গ হয় না।'

শিবু বলিল, 'কি করি বল পিসীমা, মন্ত্র তন্ত্র তো কিছুই জানি না, তাই মায়ের কাছে দু'দণ্ড ব'সে মাকে বুঝিয়ে বলি, মাগো, বামুনের ছেলে, গলায় শুধু পৈতেগাছটা আছে মাত্র, মন্ত্রহীন, তন্ত্রহীন, ভক্তিহীন, নিজের পূজা নিজে নাও মা।'

পিসীমা যেন একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, 'তা বাছা, একটু সকাল-সকাল গিয়ে তো মাকে বুঝিয়ে বললে পারিস্।'

পিসীমা গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। শিবুও স্নানে যাইবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইল। এমন সময় নিতাই মণ্ডল আসিয়া বলিল, 'হাদে বাবাঠাকুর, একটু সকাল সকাল মায়ের থানে চলো, আমাকে আজ মানসিক শোধ কত্তে হবে।'

একটু উল্লাসের সহিত শিবু বলিয়া উঠিল, 'তোর সেই খয়রা বড় পাঁঠাটা দিবি নাকি?'

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শিবু জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ হঠাৎ যে?'

নিতাই বলিল, 'কি করি বল, দায়ে প'ড়ে। ছোট ছেলেটার ভাত, পাঁচ

কুটুম্‌কে নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে; কিন্তু তিনটে বাজার ঢুঁড়ে দু' সের মাছ মিললো না। এখন পাঁচ জনের পাতে কি দিই? তাই ভাবলাম, মানসিকটা শোধ ক'রে দিই, পাঁঠাটা বড় আছে, পঞ্চাশ জনের খুব হবে।'

শিবু বলিল, 'তা হবে।'

নিতাই বলিল, 'একটু তৎপর এসো তা হ'লে বাবাঠাকুর। এর পর আবার তৈরী কর্‌তে, সিদ্ধ হ'তে বেলা থাকবে না।'

নিতাই চলিয়া গেল। শিবু আপন-মনে হাসিয়া বলিল, 'চমৎকার মানসিক-শোধ!'

মানসিক-শোধ যেমনই হউক, নিতাই মণ্ডলের পাঁঠাটা খুব বড় ছিল। সুতরাং শিবু উৎসাহের সহিত স্নান করিতে ছুটিল।

৩

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শিবুর বাহিরের ঘরে বেশ একটা মজলিস বসিয়াছিল। নিতাই মণ্ডলের মানসিকী পাঁঠাটার মাথা অন্ততঃ তিন সেরের কম হইবে না। সুতরাং তাহার সদ্‌ব্যবহারার্থ শিবু তিন চারি জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ঘরের ভিতর পাঁঠার মাংস পাক হইতেছিল। শিবু এক একবার আসিয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দিতেছিল, তার পর বাহিরে গিয়া, এত বড় পাঁঠাটা সে কেমন কৌশলের সহিত কাটিয়াছে, অনেকেই তাহাকে দাঁড়াইয়া কোপ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু সে বসিয়াই কত সহজে কলাগাছের মত নামাইয়া দিয়াছে, তাহাই গল্প করিয়া বন্ধুগণকে শুনাইতেছিল।

অমূল্য ঘোষ এক পাশে বসিয়া গাঁজা টিপিতেছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর!'

শিবু উত্তর দিল, 'কি রে?'

অমূল্য বলিল, 'তুমি যে এই পাঁঠাগুলো কাট্‌চো, এর পর এরাও তো তোমাকে কাট্‌বে?'

শিবু হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হাঁ, আমাকে কাট্‌বে! কে বল্‌লে?'

অমূল্য বলিল, 'শাস্তরে বলচে; কেন শাস্তর দেখ নি?'

শিবু ঈষৎ রাগিয়া বলিল, 'না, আমি শাস্তর দেখি নি, আর তুই বেটা গয়লার ছেলে, বাঁক বইতে বইতে যত শাস্তর দেখেছিস।'

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তা আমি শাস্তর না দেখি, শুনেছি তো। এই যে সে দিন মনসাতলায় যাত্রা হ'লো সুরথ রাজার দুর্গোৎসব। তাতে কি হ'লো ?'

'কি হ'লো ?'

'সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়েছিল, সেই এক লক্ষ পাঁঠা এক লক্ষ খাঁড়া নিয়ে তাকে কাটতে এলো। তার পর রাজার ভগবতী সহায় ছিল, তাই না হয় বেঁচে গেল।'

তাচ্ছীল্যের সহিত শিবু বলিল, 'ও সব রচা কথা! যাত্রায় অমন বলে।'

অমূল্য বলিল, 'শুধু শুধুই কি বলতে পারে ? বেদ পুরাণে না থাকলে বলবে কোথা থেকে ?'

তর্কে হারিয়া শিবু বলিল, 'আচ্ছা, আমি পাঁঠা কাটি, আমাকে না হয় তারা কাটবে। কিন্তু যারা খায়, তাদের কি হবে ?'

অমূল্য কলিকায় গাঁজা সাজাইতে সাজাইতে বলিল, 'কাটায় আর খাওয়ায় অনেক তফাৎ খুড়োঠাকুর, চোরাই মালের ভাগ লওয়া যায়, কিন্তু চুরী করা যায় না।'

সকলে হাসিয়া উঠিল। শিবু বলিল, 'ধরা পড়লে চোরের সঙ্গে মালের ভাগীদারকেও সাজা পেতে হবে, তা জানিস্ ?'

অমূল্য বলিল, 'তা হয়, কিন্তু চোরের চেয়ে কম সাজা হয়।'

পুনরায় একটা হাস্যরোল উত্থিত হইল। কলিকায় অগ্নিসংযোগ হইল; হাস্য হইতে বিরত হইয়া সকলে তাহার সংকারে মনোনিবেশ করিল। অমূল্য গাহিল—

> "জগৎগুদ্ধ মায়ের ছেলে জেনেও তুমি তা জান না;
> কেমনে সন্তোষ করবে মাকে হত্যা ক'রে এক ছাগলছানা।
> মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।"

গান ছাড়িয়া অমূল্য বলিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর, তোমার কি একটু দয়া মায়া হয় না ? পাঁঠাগুলো ভ্যা ভ্যা ক'রে চেঁচাতে থাকে, তার উপর এক কোপ।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'তোদের খুব মায়া হয়, না ?'

সাতকড়ি পাল বলিল, 'তা হয় দাঠাকুর, বড্ড মায়া হয়। আমি তো ছুটে পালিয়ে যাই।'

শিবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'দূর পাগল, এতে কি মায়া করলে চলে? এ যে মায়ের বলি, ওদের পশুজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যায়।'

অমূল্য বলিল, 'ডাকাতরাও না কি মানুষ মারবার সময় এই রকম কি একটা কথা বলে, "এস, তোমার দেহটা পাল্‌টে দিই"।'

শিবু তিরস্কার করিয়া বলিল, 'ডাকাতদের মানুষ মারার সঙ্গে আর বলি-দানের সঙ্গে বুঝি তুলনা? সে হ'লো খুন, আর এ হ'লো মায়ের ভোগ। পাঁঠাদের সৃষ্টি এই জন্যই। হয় নয়, বাচস্পতি মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস।'

কিন্তু তখন আর জিজ্ঞাসা করিতে যাইবার সময় ছিল না, মাংস প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়টা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া সকলে মাংসের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল, এবং নির্ম্মমভাবে নিহত ছাগের মাংসটা যে সম্পূর্ণ মুখরোচক হইয়াছে, সকলে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

সে রাত্রে শিবু কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় পড়িয়া অমূল্য ঘোষের কথাগুলা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। মূর্খ অমূল্য বলে কি? দেবতার বলির জন্য পশুবধ নির্দ্দয়তা! যজ্ঞে বধ করিবার জন্যই ত পশুর সৃষ্টি। কলিতে যজ্ঞ নাই, দেবতার ভোগই সেই যজ্ঞ। যাহা দেবতা গ্রহণ করেন, তাহা কি অধর্ম্ম হইতে পারে? যাহাতে দেবতার তৃপ্তি, তাহার অনুষ্ঠান কি নিষ্ঠুরতা! কিন্তু সত্যই কি ছাগশোণিতে দেবতা তৃপ্ত হন? সত্যই কি তিনি ইহা গ্রহণ করেন? ভক্তির ভগবান্; ভক্তির সহিত দিলে বোধ হয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কুটুম্বগণের ভোজনের উদ্দেশ্যে—তাহাদের জন্য পাতা পাতিয়া দেবতাকে পাঁঠা দিতে আসা, সে পাঁঠা কি দেবতা গ্রহণ করিতে পারেন? তাহাকে বধ করা কি অন্যায় বধ নয়? কে জানে, এখানে শাস্ত্র কি বলে? শিবু শাস্ত্র জানে না, কিন্তু তাহার মনটা যেন খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল।

৪

বৎসরান্তে একবার করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বারোয়ারী পূজা হয়। গ্রামের ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, সকলের চাঁদায় পূজার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; বিশ পঁচিশটা পাঁঠা পড়ে, চণ্ডীর গান হয়, গ্রামখানা যেন উৎসবে মাতিয়া উঠে। যাহার যাহা মানসিক থাকে, তাহা এই সময়েই দিবার জন্য সকলে প্রস্তুত

হয়। এই এক দিনের আয়ে শিবুর ছয় মাস সংসার চলে; পাঁঠা কাটিতে কাটিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এ বৎসরও বারোয়ারী পূজার আয়োজন চলিতেছিল। পূজার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ঘরে ঘরে চাঁদা আদায় হইতেছিল; গ্রামের মধ্যে উৎসবের সাড়া পড়িয়াছিল। চাঁদা আদায় ও পূজার অন্যান্য উদ্যোগের জন্য শিবুকেও খাটিতে হইতেছিল। এ জন্য সে দিন তাহার পূজা করিয়া ফিরিতে অনেকটা বেলা হইয়াছিল। সে গামছার এক খুঁটে ভিজান চাল, অপর খুঁটে ফল-মূল বাঁধিয়া লইয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দীনুর মার ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'কালু!'

ডাকিয়া শিবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল, কিন্তু কালু আসিল না। তখন সে আরও একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'কেলো! আয়, আয়!'

কেলো আসিল না; শিবু ইহাতে যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেলো যেখানেই থাকুক, তাহার পূজা করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ ঐ তেঁতুলতলায় শুইয়া সে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে; তার পর তাহার প্রদত্ত এক মুঠা ভিজা চাল ও এক মুঠা ভিজা ছোলা, দুই চারিটা কলা মূলা খাইয়া তবে অন্য দিকে চরিতে যায়। কোনও দিনই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আজ সে গেল কোথায়? রৌদ্রতপ্ত পথের মাঝে দাঁড়াইয়া শিবু উচ্চকণ্ঠে বার বার 'কেলো আয়, কেলো আয়!' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

তাহার ডাক শুনিয়া দীনুর মা বাহির হইয়া আসিল। শিবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ কেলো কোথায় গেল দীনুর মা?'

দীনুর মা বলিল, 'কেলো তো নাই বাবাঠাকুর!'

বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে শিবু বলিয়া উঠিল, 'নাই!'

দীনুর মা বলিল, 'হাঁ বাবা, নাই। আজ তাকে বেচে ফেলেছি।'

গর্জ্জন করিয়া শিবু বলিল, 'বেচে ফেলেছিস্? কাকে বেচ্লি?'

দীনুর মা বলিল, 'বাস্পোত মশায় কিনে নিয়ে গেল। মায়ের কাছে তেনার ছেলের মানসিক আছে, তাই আড়াই টাকা দিয়ে নিয়ে গেল।'

শিবু স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

শিবুর ইচ্ছা হইল, সে আড়াইটা টাকা ফেলিয়া দিয়া কেলোকে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু বাচস্পতি ফিরাইয়া দিবে কি? না হয় আড়াই টাকার স্থলে

তিন টাকা, চারি টাকা, পাঁচ টাকা লইবে। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? সে যখন ছাগ-জন্ম গ্রহণ করিয়াছে,তখন এক দিন না এক দিন এইরূপেই তাহার নিয়তি শেষ হইবে। ইহা ভিন্ন তাহার নিয়তিতে আর অন্য বিধান নাই। সুতরাং তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াই বা ফল কি? আর একটা পাঁঠার জন্য এতটা পাগলামী, লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে? সে যে নিজের হাতে অসংখ্য পাঁঠাকে পশুজন্ম হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছে। তাহারা যে পদার্থ, কেলোও ত তাই। বিশেষ বাচস্পতি তাহাকে মায়ের নামে লইয়া গিয়াছেন। তাহাকে এখন ফিরাইয়া আনিতে গেলে কি দেবীর কোপে পড়িতে হইবে না? ছি ছি, সামান্য একটা পাঁঠার জন্য তাহার এ কি পাগলামী!

পাগলামী বলিয়া ভাবিলেও শিবুর মনটা কিন্তু সে দিন এমনই অপ্রসন্ন হইয়া রহিল যে, কিছুতেই তাহার মনে স্ফূর্ত্তি হইল না। সন্ধ্যার সময় সিদ্ধেশ্বরীর আরতি শেষ করিয়া আসিয়া সে যখন অন্ধকার চালাটীতে একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তখন অমূল্য ঘোষ আসিয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া পাশে বসিল, এবং বারোয়ারীর আয়োজন সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার শুনছি নাকি তিরিশ চল্লিশটা পাঁঠা আসবে?'

অন্যমনস্কভাবে শিবু উত্তর দিল, 'তা হবে।'

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু এত পাঁঠা তুমি একা কাটতে পারবে খুড়োঠাকুর?'

অন্য দিন হইলে সে কত উৎসাহসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিত, এবং সে যে একদমে এক শত ছাগের শিরশ্ছেদন করিতে পারে, সগর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু নিতান্ত নিরুৎসাহভাবেই উত্তর করিল, 'কি জানি।'

অমূল্য বলিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর, যদি এক আধটা দু'কোপ হ'য়ে যায়?'

গভীর ঔদাস্যসহকারে শিবু বলিল, 'হয় হ'লো।'

অমূল্য বলিল, 'তা হ'লে ত তোমার দুর্নাম!'

বিরক্তির সহিত শিবু বলিল, 'তবে আর কি! নে, মাল তৈরী কর্।'

পাঁঠা কাটার গল্পে খুড়োঠাকুরের এই ঔদাস্য দেখিয়া অমূল্য অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত গঞ্জিকা-প্রস্তুত-করণে ব্যাপৃত হইল।

গাঁজায় শেষ দম দিয়া অমূল্য উঠিয়া যাইবার সময় আপন-মনে মুদুস্বরে গায়িতে গায়িতে গেল—

'জগৎগুরু মায়ের ছেলে জেনেও তুমি তা জান না ;
কেমনে সন্তোষ করবে মাকে হত্যা করে এক ছাগলছানা।
মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।'

শিবু চুপ করিয়া একা বসিয়া রহিল। অমূল্যর গানের প্রতিধ্বনিটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার মনের উপর যেন আঘাত করিতে লাগিল—'জগৎগুরু মায়ের ছেলে'।

শিবুর এই মানসিক অবসাদটা কিন্তু স্থায়ী হইল না। সে যতই শুনিতে লাগিল, মিত্তিররা মোষের মত একটা পাঁঠা কিনে এনেছে, বারুইদের পাঁঠাটা ওজনে এক মনের কম হবে না, বাগেদের কালো পাঁঠাটার জন্য বোধ হয় একটা নূতন হাড়ীকাঠ তৈরী করতে হবে, ইত্যাদি, ততই একটা নবীন উৎসাহ আসিয়া শিবুর অবসাদ দূর করিয়া দিতে লাগিল, এবং এই সকল প্রকাণ্ডকায় ছাগকুল ছেদন করিয়া সে যে অখণ্ড গৌরব অর্জ্জন করিবে, তাহারই কাল্পনিক আনন্দে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৫

ধূমধামের সহিত দেবীর পূজা শেষ হইল। পূজক শিবু; সমারোহের পূজা। সুতরাং বাচস্পতি মহাশয় কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতেছিলেন। পূজাশেষে বলিদানের পালা। পঁচিশটা পাঁঠা উপস্থিত হইয়াছে; তিনটা বারোয়ারীর পাঁঠা, অবশিষ্ট সব মানসিকী। প্রথমে বারোয়ারীর পাঁঠা তিনটা উৎসর্গ করা হইল। তার পর মানসিকী পাঁঠা উৎসর্গ। প্রথমেই বাচস্পতি মহাশয়ের মানসিকের পাঁঠা আসিল। তাহাকে দেখিয়াই শিবু শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে অজ্ঞাতে উচ্চারিত হইল, 'কেলো!'

বাচস্পতি মহাশয় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, 'পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি—'

শিবু মন্ত্র পড়িবে কি, কেলো তখন আহ্লাদে কূর্দ্দন করিয়া তাহার বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়াছে। শিবু হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয় পুনরায় মন্ত্রটা আবৃত্তি করিলেন। শিবু কিন্তু মন্ত্র পড়িল না; সে বাচস্পতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বাচস্পতি মশায়, পাঁঠাটা বড্ড ছোট—'

বাধা দিয়া বাচস্পতি বলিলেন, 'হাঁ হাঁ ছোট, বড় কোথায় পাব, বল। বারোয়ারীর হিড়িকে দেশে কি আর পাঁঠা আছে?'

শিবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'কিন্তু বলির অযোগ্য —'

উগ্রস্বরে বাচস্পতি বলিলেন, 'ওহে বাপু, যোগ্য কি অযোগ্য, তোমার চেয়ে আমার বেশী জানা আছে। 'ন চ ত্রৈমাসিকায়ূনং পশুং দদ্যাচ্ছিবাবলিং'— কাল এর বয়স তিন মাস উত্তীর্ণ হ'য়েছে। এখন মন্ত্র কটা ব'লে যাও।'

অগত্যা শিবু মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু মন্ত্রগুলা ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহা জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

তার পর মিত্তিরদের বড় পাঁঠাটা উৎসৃষ্ট হইবার জন্য আসিল। সেই প্রকাণ্ডকায় ছাগবীর আপনার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গর্ব্বে শৃঙ্গ উন্নত করিয়া যখন শিবুর পাশে দাঁড়াইল, তখন শিবুর সুপ্ত জিঘাংসা আবার যেন জাগিয়া উঠিল। সে জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাকে উৎসর্গ করিতে লাগিল।

বলির সকলই প্রস্তুত। উৎসৃষ্ট পাঁঠাগুলিকে পর পর আটচালার খুঁটাতে বাঁধা হইয়াছে; গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বলিদান দেখিবার জন্য আটচালা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। শিবু সিন্দূরে ললাট চর্চ্চিত করিয়া, দেবীর চরণের বিল্বপত্র কানে গুঁজিয়া, খড়্গহস্তে যূপ-কাষ্ঠের নিকট আসিয়া বসিল। প্রথম পাঁঠাটিকে আনিয়া হাড়কাঠে ফেলা হইল। দুই তিন জনে পাঁঠাটাকে টানিয়া ধরিল। শিবু দৃঢ়মুষ্টিতে খড়্গ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল; ছাগশিশুর আর্ত্ত চীৎকারে, দর্শকমণ্ডলীর উল্লাসসূচক মা মা শব্দে দেবীমন্দির কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ঘাতকের উদ্যত খড়্গ ছাগের স্কন্ধে পড়িল না; খাঁড়া তুলিয়া শিবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মন্দিরমধ্যস্থ দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিতেই রজ্জুবদ্ধ ভীতিকম্পিত কেলোর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে খাঁড়াটা এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বামহস্তে যূপকাষ্ঠমধ্যস্থ পাঁঠার গলাটা মুক্ত করিয়া দিল। জনমণ্ডলী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

বাচস্পতি রুদ্রগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, 'শিবু!'

শিবু রক্তদৃষ্টি উন্নমিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বাচস্পতি বলিলেন, 'এ কি তোমার কাণ্ড!'

শিবু উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'আমার কাণ্ড নয়, মায়ের কাণ্ড। ঐ দেখুন, ছেলেকে কাটতে দেখে মা কাঁদছে।'

জনমণ্ডলী শিহরিয়া উঠিল। বাচস্পতি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'উন্মাদ! মা কাঁদেন কি? রুধিরপ্রিয়া মা রুধিরোৎসবের আয়োজন দেখে হাসছেন!'

শিবু একবার মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'রাক্ষসী!'

পরক্ষণেই সে ভিড় ঠেলিয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। বাচস্পতি তাহাকে অর্ব্বাচীন, উন্মাদ, পাষণ্ড প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া কামারকে বলিদানের জন্য আদেশ দিলেন।

সন্ধ্যার পর অমূল্য আসিয়া বলিল, 'ও খুড়োঠাকুর, পাঁঠা কাটা ছেড়ে দিলে যে?'

শিবু বলিল, 'শুধু পাঁঠা কাটা নয়, যে ঠাকুর পাঁঠা খায়, তার পূজো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলাম।'

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে অমূল্য বলিল, 'বল কি খুড়োঠাকুর, এত আয়—'

শিবু হাসিয়া বলিল, 'আয় হ'লে কি হবে অমূল্যচরণ, আয়ের চেয়ে যে ব্যয় অনেক বেশী। এখানেই যেন পাঁঠা বেচারীদের আইন আদালত নাই, কিন্তু ও পারে ত আছে। তখন কি হবে বাপ?'

অমূল্য বলিল, 'তখন শাস্তরের দোহাই দেবে।'

শিবু বলিল, 'ও সব শাস্তর টাস্তর বাচস্পতি বিদ্যানিধি মশায়দের জন্য, আমাদের মত গাঁজাখোরদের জন্য নয়।'

অমূল্য হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি দেখছি সত্য সত্য গোঁড়া বোষ্টমঠাকুর হ'য়ে পড়লে। এক দিনেই সব ছেড়ে দিলে?'

শিবু বলিল, 'সব ছাড়লেও গাঁজা ছাড়চি না বাপু। এখন বড় ক'রে একটা ছিলিম তৈরী কর দেখি।'

অমূল্য ফূর্ত্তির সহিত ছিলিম তৈরী করিতে করিতে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে,
মহাকালী জয়কালী ব'লে বলি দাও ষড় রিপুগণে।
মন তোর এত ভাবনা কেনে।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গত ১৭ই চৈত্র সায়াহ্নে 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ সালে উপেন্দ্র বাবু ৩ নং বীডন স্কোয়ার হইতে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক একখানি মাসিকপত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয়। শিবাপ্রসন্নবাবু চারি পাঁচ মাস 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে, এবং আমি উপেনবাবুর সহিত পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে, এবং বর্ত্তমানে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল, আমার অগ্রজতুল্য সুহৃৎ শ্রীযুত মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমে'র কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষের 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নয় মাসে সমাপ্ত হয়। চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ-গণনার ও নাম-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করি, এবং 'কল্পদ্রুম' বর্জ্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র নামে ষ্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জন্য প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যে'র ললাটে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেনবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর, বোধ হয়, ১২৯৮ সালে, উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্য্যায়ে সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তোফী 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' বন্ধ করিয়া দেন।

উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার ও তাহার সম্পাদকের হিতৈষী ও অনুরাগী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সূত্রে জড়াইয়া নিয়তি আমাকে 'সাহিত্যে'র সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ মহাকালের ইঙ্গিতে কোথায় উড়িয়া গেল। উপেন্দ্রবাবু সেই ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া পর-পারে চলিয়া গেলেন। গত বৎসর কাগজের অভাবে 'সাহিত্য' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শত কার্য্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র জন্য কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' ও তাহার সম্পাদক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

উপেন্দ্রনাথের জীবন বৈচিত্র্যময়। তাহাতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বাঙ্গালীর প্রণিধান-যোগ্য। আশা করি, তাঁহার জীবন-কাহিনী বাঙ্গালীর অগোচর থাকিবে না।

১৭ই চৈত্রের 'দৈনিক বসুমতী'তে সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উপেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

'উপেন্দ্রনাথের জীবন বৈচিত্র্যময়। দারিদ্র্যের বিদ্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন—জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি উৎসাহে ও উদ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সাফল্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় একক জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ক্ষমতায় বাঙ্গালা দেশে আপনার যশ কালজয়ী করিয়া গিয়াছেন। বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদসন্ধানে একক ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, এবং সে প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহায় ছিল—আত্মশক্তিতে প্রত্যয়, সম্বল ছিল—আপনার অসাধারণ উৎসাহ। সেই সহায়সম্পদ লইয়া তিনি পদে পদে সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যেন আপনার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া—বাঙ্গালার সাহিত্য-প্রচারে ও সংবাদপত্রে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি পূর্ণব্রত অবস্থায় অপরিণত বয়সেই মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

'তিনি যখন সাহিত্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার এত পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। তখন মধুসূদন 'মহীর পদে মহানিদ্রাগত'—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাতপন মধ্যগগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র স্বদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কেবল অরুণবিকাশসূচনা। তখনও 'বটতলা' বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারপাল, পরিবেশের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময় উপেন্দ্রনাথ সাহিত্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পরিণতি 'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরে। সেই সাহিত্য-মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নামমাত্র মূল্যে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়াছে; সেই মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জীবচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এই সাহিত্য-প্রচারই বোধ হয় তাঁহার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। যে ভাব বাঙ্গালার নবীন সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল—সেই ভাব-মন্দাকিনী ধনবানেরই অধিগম্য ছিল। কিন্তু তাহাতে জাতির উদ্ধারসাধনের উপায় হইতেছিল না। উপেন্দ্রনাথ ভগীরথের মত সাধনা করিয়া সেই ভাব মন্দাকিনী বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিয়া বাঙ্গালীর উদ্ধারসাধন করিয়াছেন—বাঙ্গালার শ্মশানভস্মে জীবনসঞ্চারের উপায় করিয়াছেন।

'পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে এক এক জন—এক এক দিকে দিক্‌পাল; এক এক জন এক এক বিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্য্যের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণের দেবত্বের নিদর্শন দেখাবার বিকশিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ গুরুর দেবত্বে সন্দেহ করিলে গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'এখনও তোর মনে সন্দেহ!' আর যে দিন তিনি দেহরক্ষা করেন, সে দিন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন—শিষ্যবর্গ তাঁহার শব জাহ্নবীপুলিনে শ্মশানে

আসিয়াছেন—পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশন-দষ্ট হইলেন। তিনি নীলবর্ণ হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। কিন্তু একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। সে জীবনের কাজ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে—সে কাজ সম্পন্ন না করিলে তিনি ত যাইতে পারেন না! তাহার পর সে কাজ শেষ হইয়াছে—বাঙ্গালায় নব ভাবের প্রচার হইয়াছে। তাই বুঝি—আজ তাঁহার অতর্কিত তিরোভাব। ইহাতে শোকের কারণ যতই কেন থাকুক না, সান্ত্বনারও প্রচুর অবসর আছে।

'সেই ভাববিকাশের অন্যতম উপায়—"বসুমতী"। বিবেকানন্দ যখন তাঁহার "গুরুভাই" উপেন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্র-প্রচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"সাহস হয় না।" তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন। তদবধি তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন—নানা কারণে সে সকলের স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই। তাহার পর "বসুমতী"র প্রচার। "বসুমতী" ২০ বৎসরকাল একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সাধনা করিয়া আসিয়াছে। সে ভাব—জাতীয় ভাব—দেশাত্মবোধের ভাব; সে সাধনা—মার সাধনা।

'যে "সাহিত্য" আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্ব্বত্র সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্ত্তক। তখন বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাহেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায়-বিশেষেরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত—নূতন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যে'র প্রচার,—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্ত্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।

'সামাজিক জীবনে উপেন্দ্রনাথ বিনয়ী, অমায়িক ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলেই লোক তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইত, তাঁহার বিনয়ে আকৃষ্ট হইত। তিনি বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন, বহুলোক-প্রতিপালক ছিলেন। এক সময় "বঙ্গবাসী"র যোগেন্দ্র, "হিতবাদী"র কালী প্রসন্ন ও "বসুমতী"র উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রত্রয়ের পরিচালক ছিলেন, উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের শেষ। কাজেই তাঁহার আনন্দ ছিল, তিনি কখনও কাজ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। মৃত্যুব্যাধিতে পক্ষকাল শয্যাগত থাকিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কখনও এত দিন কাজ ছাড়িয়া থাকেন নাই।'

১৮ই চৈত্রের দৈনিক বসুমতীতে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, উপেনের উদ্দেশে তাহাই আমার সামান্য পুষ্পাঞ্জলি। তাহাও উদ্ধৃত করিলাম:—

'বাঙ্গালায় বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত অপরিচিতের ও "বসুমতী"র 'উপেন মুখুয্যে'—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ও তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চিরপ্রিয় উপেন ধরার পান্থশালায় 'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিহার করিয়া আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মপ্রিয়, কর্ম্মসর্ব্বস্ব, কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ চিরজীবনব্যাপী কর্ম্মযজ্ঞে মানব-জীবনের সমগ্র উদ্যম উৎসাহ অধ্যবসায় আহুতি দিয়া কর্ম্মশেষে কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুমত্ত ভৃঙ্গ উপেন অন্তিমে তাঁহারই নামকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্ছিত পদারবিন্দে শান্তি ও নিবৃত্তি লাভ করিলেন।

'অনেক দিনের সম্বন্ধ, বহু দিনের বন্ধন, বহু কালের সুখ-দুঃখের স্মৃতি শ্মশানে ভস্ম হইয়া গেল। নৈমিত্তিক অপ্রীতির কালো মেঘের ছায়া আর কখনও নিত্য প্রীতির উজ্জ্বল আলোক আচ্ছন্ন—ম্লান করিতে পারিবে না। চিতার আলোকে অতীতের পটে উপেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবন আজ যে বর্ণে যে রেখায় ফুটিয়া উঠিল, তাহাই ত উপেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ।

'সেই শৈশবে সহায়হীন, নিঃস্ব, নিরুপায় ব্রাহ্মণ-বটু—সংসার-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, তথাপি ধরণীর চিরন্তন জীবন-দ্বন্দ্বে নবোদ্যমে সদা অগ্রসর ব্রাহ্মণকিশোর, আর এই বঙ্গদেশের আশ্রয়, বহুজনের অন্নদাতা, বিশাল অনুষ্ঠানের কর্ণধার, "বসুমতী"র উপেন্দ্রনাথ—বিবিধ বিচিত্র অধ্যায়ে সুসম্পূর্ণ জীবন-উপন্যাসের নায়ক উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কর্ম্মক্ষেত্রে 'সাধিলেই সিদ্ধি'র আদর্শ রাখিয়া গেলেন।

'কৈশোরে উপেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই দেবতার পূজাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। 'তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনম্' যদি 'তদুপাসনম্' হয়, তাহা হইলে ভক্ত গৃহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীকে যে মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রূপে তাহা সফল। উপেন্দ্রনাথের ঐহিক কর্ম্মেও সেই দেবতার আশীর্ব্বাদ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ধর্ম্মজীবনের উপযোগী কর্ম্মজীবন গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ গৌড়ভূমির চিত্তক্ষেত্রে যে লোকশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে জলসেক করিয়াছেন। ইহাই ত "তদুপাসনম্"।

'উপেন্দ্রনাথের কর্ম্মরচনা স্থূল, অতি স্থূল; সাংসারিক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি, ঐহিক ঘাত প্রতিঘাতে তাহার পুষ্টি, আপাতদৃষ্টিতে তাহা সংসারীর সেবাধর্ম্ম বটে। কিন্তু এই ঐহিক কার্য্যের নিম্নে বিশ্বাসের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিনী বহিয়া গিয়াছে, তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তির মন্দাকিনী, বাঙ্গালা দেশে যাহা জ্ঞানের—ভাবের অমৃত বিতরণ করিয়াছে।

'উপেন্দ্রনাথ 'সঙ্কল্প' করিয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নূতন উচ্ছ্বাস বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলায় সেই 'ছোট' কেতাবের দোকানখানির পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পর সেই ক্ষুদ্র দোকান 'বসুমতী'র বর্ত্তমান সাফল্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার গুরুমন্ত্রপ্রচারে সহায় হইয়াছিল,—জীবনচরিতের পক্ষে এমন নির্দ্দেশ লোভনীয় হইতে পারে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের জীবনে তদপেক্ষা শতগুণে বরেণ্য মহাসত্যের পরিচয় আছে। সে সত্য এই যে, উপেন্দ্রনাথ যে এক বিন্দু গুরুকৃপা লাভ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যে তাঁহার ঐহিক অনুষ্ঠানেও জ্ঞানে অজ্ঞানে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রের উপাসনা, রামকৃষ্ণ-পন্থীদিগের কর্ম্মব্রতে সাহচর্য্য সম্ভব হইয়াছিল। "কয়লাকী ময়লা তব ছোড়ে, যব আগ করে পরবেশ"। আজ চিতাগ্নির আলোময়ী লেখায় ভক্তের এই মহাবাণীই দেদীপ্যমান দেখিতেছি। উপেন্দ্রনাথের ব্যবসায়, বাণিজ্য, বেসাতীর কয়লা সেই পুণ্য পাবকের স্পর্শে নির্ম্মল—উজ্জ্বলবিভাসের পথ হইয়াছিল।

'"বসুমতী'র এক জন প্রিন্টার ৺রাধিকাপ্রসাদ এক দিন বলিয়াছিল,—"এটা বসুমতী আফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত।' ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাঁড়ারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে মনের খোরাক যোগাইয়াছেন; অনেক বাঙ্গালীকে ক্ষুধার অন্নও দান করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ "ভোগী"র দুর্ভাগ্য ভোগ করিবার দুষ্কৃতি লইয়া আসেন নাই। তিনি রামকৃষ্ণমণ্ডলীর একটা 'হাত-বাক্স', লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন; আর সাতসাৎ করিয়াছেন; সদাব্রত নয়?

'"বসুমতী"র প্রবর্ত্তক হইতে নিম্ন পর্য্যায়ের সেবক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ ভক্ত। এ সমবায় আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এই ভক্ত-মণ্ডলীর গঠন করেন নাই। তিনি গুরুর কৃপায় যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রামকৃষ্ণ-পরিবারে পরিণত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ এই পরিবারের কেন্দ্র শক্তি ছিলেন। তিনি গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুর আশীর্ব্বাদে তাঁহার শক্তি তাঁহার পরিবারে অন্য আধার আশ্রয় করিবে। সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি ও কামনা করি,—তাঁহার শক্তি, তাঁহার ভাব, তাঁহার গুরুর আশীর্ব্বাদ তাঁহার প্রতিচ্ছবি পুত্রে ফুটিয়া উঠিবে;—উপেন্দ্র-কল্পিত এই রামকৃষ্ণ-পরিবারকে আরও সংহত করিবে; এক সূত্রে গাঁথিয়া এক-লক্ষ্যে ধরিয়া রাখিবে; এই আরম্ভ চরম পরিণতি লাভ করিবে।'

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র।—'চিত্রকর শ্রীমুহম্মদ আবদর রহমান চগতাই মহাশয়ে'র 'প্রদীপ ও চন্দ্র' নামক ছবিখানির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে প্রদীপও আছে, চন্দ্রও আছে। সে হিসাবে ইহা সার্থক। বাঙ্গালা সাহিত্যের 'কাবি্য'র মত 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'তেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ অবোধ্য ও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি দেখিতে পাই। ইহাও বিশেষত্ব বটে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রকূটের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহার সূচনায় প্রকাশ,—'ছবির নাম 'প্রদীপ ও চন্দ্র' হইতে বোঝা যায় না, চিত্রকর এই ছবির দ্বারা কি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।' কিন্তু দেখা যাইতেছে, বোঝা না গেলেও বোঝান যায়। চারু নিজে বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা চিত্রের অপেক্ষাও দুর্ব্বোধ। অতএব, ছবিখানি 'মিষ্টিক'। বাঙ্গালীর বুদ্ধির উপর এমন 'জুলুম' ও 'আর্টে'র এত অপমান ও লাঞ্ছনা বাঙ্গালা দেশেও অল্পই দেখিয়াছি। চারুর মতে, এই চিত্রের প্রতি-পাদ্য—'আমার জীবনের ধারা অনন্ত বহমান।' যে বাবাজী 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন,—'অজ্ঞান তিন মণ দশ সের', তাঁহাকে মনে পড়ে। 'জনৈক বিবেকানন্দ-ভক্ত হিন্দু'র 'স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ' উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 'শ্রী, শ্রীমতী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'ভারতভূমির কোথাও কেহ নিজের নামের আগে 'শ্রী' যোগ করে না, বলাতে না, লেখাতে না; কেবল আমরা করি। ওড়িশাতে কিছু কিছু আছে। কিন্তু

বলাতে কুত্রাপি নাই, লেখাতে গুরুজন ব্যতীত অন্যত্র নাই। কিন্তু বঙ্গের কি উৎকলের গ্রামে, বিশেষতঃ বিদ্যাহীন জনে 'শ্রী' বলে না। 'শ্রী' কি লেখাপড়া জানার চিহ্ন? আজি-কালি আমরা সবাই 'শ্রীযুক্ত', সবাই 'বাবু', তুমি আমি রাম শ্যাম যদু। দেশীয় রাজা থাকিলে হয় ত এই ধৃষ্টতার দণ্ডবিধান হইত। কারণ, রাজা শিষ্টাচারেরও রাজা। কবে হইতে শ্রীহীন বাঙ্গালা শ্রীযুক্ত হইয়াছে, কেহ গবেষণা করিলে সময় কাটিতে পারে। বোধ হয়, শত বৎসরের সে দিকে খুঁজিতে হইবে না।' শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'ময়ূরপুচ্ছ' চলন-সই গল্প—মাসিকপত্রের পাদপূরণে সার্থক হইয়াছে। 'বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুপুর' মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। শ্রীমতী হেমলতা দেবী 'স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসে' অত্যন্ত সংক্ষেপে এই নারী-রত্নের মৃত্যুসংবাদ দিয়াছেন। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক এক জন নূতন কবি 'কী জানি কোন্ ভুলে' নামক একটী হেঁয়ালির গোড়ায় লিখিয়াছেন,—

'পক্ষীরাজ ঘোড়া আমি—কি জানি কোন্ ভুলে,
মাথামরি! নেমে এলাম্ তোমার মায়া-কূলে!'

চাণক্য বলিয়াছেন,—'শতহস্তেন বাজিনম্।' অতএব, দূর হইতে নমস্কার করি। কিন্তু যে সাহিত্যে কবিরা জাহিজর, এবং ঘোড়ারাও মন্দুরা হইতে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া কবিতা লিখিতেছে, সে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সমুজ্জ্বল! ইটালিয়ান সার্কাসের যে পাটী ঘোড়াটা ক্ষুর দিয়া অঙ্ক কষিত, উইলসনের সার্কাসের যে আরবী ঘোড়াটা ঢাকা বাক্স হইতে মুখ দিয়া হুকুমমত লাল বা নীল রুমাল বাহির করিয়া দিত, 'এই 'পক্ষীরাজ ঘোড়া' তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পক্ষীরাজ ঘোড়া যে গাঁজা খায়, কোনও ঠাকুরমাও এত দিন উপকথাগামী শিশুপালকে এ কথা বলেন নাই। 'প্রবাসী'র ললাটে বিধাতা যে রহস্য-নিবেদনের সৌভাগ্য লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইল। পক্ষীরাজ ঘোড়াটি বলিতেছে,—'কী জানি কোন্ সুখের কলে জুটিলে পলেম ফুলে!' ফুলের উপর হইতে পক্ষীরাজ 'কোন পাখী হয়ে' 'কী ফাঁদে যে কাহারি' 'পড়ে গেছেন', বাঙ্গালীকে চিহির ভাষায় তাহা প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু রূপটার পক্ষ নাই; হুঁ টি আছে. তাহার সে গৌরব নাই; বাগবাজার আছে, কিন্তু গাঁজার সে সৌরভ নাই। কে এই বিষম প্রশ্নের উত্তর দিবে? কল্পনার দৌড় 'পক্ষীরাজ'কেও হারাইয়া দিয়াছে, সম্পাদকের ভাবুকতার দৌড় এরো-প্লেনের অপেক্ষাও অধিক, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'সংস্কৃতশিক্ষা' প্রবন্ধে একটী সাংঘাতিক সার-সত্য দেখিলাম,—'ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে যে, সমস্ত ভাষাতেই অভিজ্ঞ পণ্ডিত না হইলে হয় না, তাহা নহে; ব্যাকরণ ও অভিধান বুঝিয়া লইতে পারিলেই কায চলে। সকলেই যে-কোনো ভাষারই সাহায্যে হউক, এইরূপেই কাজ করিয়া থাকেন।' বলা বাহুল্য, আমরা তাহা জানিতাম না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাষার অভ্যন্তরে নব্য। যাঁহারা ঝিকে জামাই বলিতেন, কদাচিৎ দুচে নামিতেন, ইনি তাঁহাদের কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 'চঞ্চল' নামক কবিতায় অনেক 'আবোল-তাবোল' বকিয়াছেন। বাঙ্গালায় হাস্য-রস দুর্লভ; মাসিকের কবিতাগুলিতে আমরা দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। আমরা হাসি বটে, কিন্তু আমাদিগকে হাসাইবার জন্য কবিরা কাঁদিয়া

ককাইয়া কত কষ্ট পান, তাহা কল্পনা করিলে, 'অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্ !' ইঁহারা আধের মত নিজেরা কষ্টকল্পনায় পিষ্ট ও ক্লিষ্ট হন, কিন্তু আমাদিগকে হাস্যরসের স্বাদ দেন! শ্রীকালীচন্দ্র ঘোষালের 'ভয়ার মেয়ে' বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক আর এক জন সংস্কারক কবি বৌ-কথা কও পাখীর 'হাঁক' শুনিয়া বঙ্গ-নারীকে কথা কহিতে বলিয়াছেন। দেড় চরণে চারিবার 'কথা কও' আছে। সুতরাং 'অনুরোধ'টা যে নিতান্ত 'উপরোধ' নহে, আন্তরিক, তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই। ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু—

> 'অয়ি মাতা, অয়ি কন্যা, ভগ্নী স্নেহময়ি,
> কথা কও, কথা কও; জীর্ণ ছিন্ন করি'
> দাসীত্বের অভিজ্ঞান কেল দূর করি'
> অবগুণ্ঠ শির হ'তে;'

অমার্জ্জনীয়। মিথ্যা কথা। বাঙ্গালীর মা, বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর বোন দাসী নহেন। 'অবগুণ্ঠ' দাসীত্বের প্রমাণ নহে—বরং দাসত্বের নিদর্শন হইতে পারে। রচনায় প্রসাদগুণ আছে। পড়িয়া অর্থ বুঝিবার জন্য দৈবজ্ঞের বাড়ী ছুটিবার দরকার হয় না। তথাপি ইহা সত্যেন্দ্র-চষা কাব্য-নন্দন 'প্রবাসী'তে স্থান পাইয়াছে। তাহার কারণ বোধ করি এই সংস্কারের ধুয়া। শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়ের 'নাবালকের চালক' চারি চরণে সম্পূর্ণ শ্লোক। বক্তব্য বেশ; কিন্তু ভাষা চোখা নহে, 'এপিগ্রামাটিক্' নহে।

ভারতী। চৈত্র।—শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত 'মা' নামক ছবিখানিতে পরিপ্রেক্ষিত নাই বলিলেও চলে, কিন্তু বিষয়-গুণে মনোজ্ঞ। খোকার পরিকল্পনা সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। স্বভাবকে পদদলিত না করিয়াও 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' তাহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, এবং বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যতম প্রমাণ। শ্রীকালীপদ মিত্রের 'মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্প-কলা' উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃগুপ্ত' সুখপাঠ্য সংক্ষিপ্ত রচনা। শ্রীসুশীলকুমার দের 'অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা' চৈত্রের 'ভারতী'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কি কবিতায় 'গাজি' হইয়া উঠিলেন? নিমে দত্ত কবিতার দুইটী গুণের আবিষ্কার করিয়াছিল,—মানে ও মজা। করুণা-নিধানের কবিতার 'মানে' নাই,—উচ্চঃশ্রবীর 'কাব্য'তে তাহার আশাও অবশ্য করা যায় না—কিন্তু 'মজা' আছে। সে 'মজা' এই 'কাব্য'র আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত খণ্ডে ও অখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় 'সুসময়' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে ভ্যাংচাইয়া সুখী হইয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'হনুকরণ'-স্মরণে বাধ্য হইয়াছি। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'বরণে' বৈচিত্র্য আছে।

ভাণ্ডার। ফাল্গুন।—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'কৃষকের দুঃখে' গ্রাম্য জীবনের ছবি বেশ ফুটিয়াছে। 'নানা কথা' বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। 'সমবায়-ক্রয় ও বিক্রয়' সুলেখিত ও

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। 'অনুতাপ' নামক গল্পটি এবার 'ভাণ্ডারে'র অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা উদ্দেশ্যমূলক গল্প,—টলষ্টয়ের গল্প অবলম্বনে লিখিত। 'ভাণ্ডার' শীর্ষ লক্ষ্যের অনুযায়ী গল্প প্রকাশ করিলে, "কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে' সার্থক হইতে পারে। ক্ষুদ্র 'ভাণ্ডারে' অনুবাদের স্থান কোথায়?

প্রতিভা। ফাল্গুন —শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের 'মূর্খের কথা' উল্লেখযোগ্য। প্রসাধনে প্রবন্ধটি আরও উৎকর্ষলাভ করিত। লেখক ইচ্ছা করিলে, এবং গুছাইয়া বলিলে, সংক্ষিপ্ত হইতে পারিত। অনাবশ্যক বিবৃতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'দোল' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহা কি কবিতা? জীবেন্দ্র ত অনেক ছাপিয়াছেন, এই কানা, খোঁড়া, কুঁজো কবিতাটিকে ছাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ছাপিয়া দিলেন? 'পিচকারী মোর নয়ন দুটি, হৃদয় আবীর আমলো লুট' কি মাইকেল, হেম, নবীন, রবির দেশে শোভা পায়, না সহ্য হয়? শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থের 'সুবর্ণগ্রামে' কবিত্বও নাই; 'কাহিনী'ও নাই। তাঁহার কবিত্বের অনুসরণে কবিত্ব-প্রকাশ যদি অমার্জ্জনীয় না হয়, তাহা হইলে বলা যায়, কবি একবারে কাঁচা কষো কবিতা হৃদয়-শাখ হইতে পাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাও আঁশড়ার ফলের মত—মানুষের অভক্ষ্য। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'নব-পরমাণুবাদ' সুলিখিত ও সারগর্ভ নিবন্ধ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'ঊষাপরিণয়' নামক একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 'অভাব' নামক কবিতায় আরম্ভ করিয়াছেন,—'প্রাণে আজ বুঝিতেছি দারুণ অভাব!' আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সবিনয়ে বলি, এই অভাবটা যদি তাঁহার প্রাণের পরিবর্ত্তে সময়ে বর্ত্তিত! তাহা হইলে 'প্রতিভা'র দুই পৃষ্ঠা কালীর অভাব হইত বটে, কিন্তু আর কোনও ক্ষতি হইত না। কবিও 'দারুণ অভাবে'র তাড়নায় কবিতা লিখিতেন না, এবং সে কবিতা কবিত্বের 'অভাবে' এতটা ক্লিষ্ট হইত না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক নব্য কবি জগতের সকল অভাব অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের যে একটা অত্যন্ত অপরিহার্য্য জিনিসের অভাব আছে, তাহা আদৌ অনুভব করেন না। যেদিন তাঁহারা এই অভাবটি অনুভব করিতে পারিবেন, সে শুভ-দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নের 'বেদবিদ্যা' পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রচনা।

সুদাস।

১

সুদাস নামে এক প্রসিদ্ধ নরপতি বৈদিক যুগে উত্তরলোকের সম্রাট হইয়াছিলেন। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। আমরা এই ঋষিদ্বয়-রচিত ঋক্ হইতে সুদাস সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হই। এই প্রবন্ধে আমরা সেই প্রাচীন যুগের এক শ্রেষ্ঠ নরপতি ও দুইটী অতিপ্রসিদ্ধ ঋষির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পাদটীকায় ঋক্ উদ্ধার করিয়া দিব। কোনও কোনও স্থলে সায়নাচার্য্য ঋকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে ঋষিদিগের রচনায় সামঞ্জস্য থাকে না। সেই জন্য আমরা ঋকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বিচার দ্বারা স্থির করিবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋষিদিগের রচনা হইতে যে ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সুদাসের পিতার নাম পিজবন, এবং পিতামহের নাম দেববান ছিল। (১) একটী ঋকে পৈজবন ও দিবোদাস, এই দুইটী নাম একত্র প্রাপ্ত হইয়া সায়নাচার্য্য পিজবনের অপর এক নাম দিবোদাস মনে করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) কিন্তু দিবোদাস ঋগ্বেদের যুগের অন্য এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। ঋগ্বেদের বহু স্থলে এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সেই স্থলে সায়না-চার্য্য দিবোদাস অর্থে পিজবন করেন নাই। বধ্র্যশ্ব নামে এক ঋষি দিবোদাসের

---

(১) দ্বে। নপ্তুঃ। দেববতঃ। শতে। গোঃ। দ্বা। রথা। বধূমন্তা। সুদাসঃ।
অর্হন্। অগ্নে। পৈজবনস্য। দানম্। হোতা। ইব। সদ্ম। পরি। এমি। রেভন্। ৭।১৮।২২
হে অগ্নি! দেববানের পৌত্র, পিজবনের পুত্র সুদাসের দুই শত গো ও বধূযুক্ত দুইটী রথের সম্মানার্হ দানকে, যজ্ঞগৃহে (অবস্থিত) হোতার মত স্তব করিতে করিতে (উহার) চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছি।

(২) ইমম্। নরঃ। মরুতঃ। সশ্চত। অনু। দিবোদাসম্। ন। পিতরম্। সুদাসঃ।
অবিষ্টন। পৈজবনস্য। কেতম্। দূণাশম্। ক্ষত্রং। অজরম্। দুবঃযু।—৭।১৮।২৫
হে নেতা মরুৎগণ! এই সুদাসের পিতাকে, দিবোদাসকে যেমন, (সেইরূপ) রক্ষা কর। হে পূজাকামিগণ! পিজবন-পুত্রের গৃহ (ও তাঁহার) অজয়, অবিনাশী বলকে রক্ষা কর

পিতা ছিলেন, ভরদ্বাজ ঋষি একটী ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন। (১) মূলে 'দিবোদাসম্ ন' আছে। ইহার অর্থ দিবোদাস-সদৃশ। সায়নাচার্য্য 'দিবো-দাসমিব' অর্থ করিয়াও 'দিবোদাস ইতি পিজবনস্যৈব নামান্তরম্' বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারি না। এই বিষয়টীকে কেহ সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই সকল স্থলের প্রকৃত অর্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই জন্য আমরা এই বিষয় সম্বন্ধে এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের অর্থ যথার্থ হইলে, সুদাসের পূর্ব্বে দিবোদাস বর্ত্তমান ছিলেন। এমন কি, ভরদ্বাজ ঋষিও রাজা দিবোদাসের পরে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সুদাসের পিতার আর এক নাম ছিল দাশরাজ। ইহার অর্থ দেবসেবক রাজা। (২) সায়নাচার্য্য 'দাশরাজ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'দশ জন রাজা'। এই অর্থ সাধন করিতে তাঁহাকে 'ছান্দস দীর্ঘ, বিভক্তিব্যত্যয়' প্রভৃতি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এরূপ অর্থ তাঁহার মনে উদিত হইবার কারণ এই যে, সুদাসকে দশ জন অযজ্ঞকারী রাজার সহিত একটী যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে যে ঋকে দাশরাজ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় সুদাসের পিতা 'দাশরাজ' অর্থ করিলে ঋক্‌গুলির অর্থ সরল ও যুক্তিযুক্ত হয়। (৩) ঋষি-বর্ণিত ঘটনাবলীতে এই অর্থ অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে না।

---

(১) ইন্দ্র। অবদাৎ। রভসাং। ঋণচ্যুতম্। দিবোদাসম্। বধ্র্যশ্বায়। দাশুষে।—৬।৬১।১
ইনি (সরস্বতী) হবির্দাতা বধ্র্যশ্বকে বলবান্ ঋণমোচনকারী দিবোদাসকে দান করিয়াছেন।

(২) দেবায়। দাশন্তঃ। স্যাম।—৭।১৪।৩
দাশন্তঃ পরিচরন্তঃ ভবেম ইতি সায়ন। (আমরা) দেবতাকে সেবা করিব।

(৩) দাশরাজ্ঞে। পরিযত্তায়। বিশ্বতঃ। সুদাসে। ইন্দ্রাবরুণৌ। অশিক্ষিতম্।—৭।৮৩।৮
চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে ইন্দ্র বরুণ দাশরাজার নিমিত্ত (বিজয়) প্রদান করিয়াছিলেন।

[দশশব্দস্য ছান্দসোদীর্ঘঃ বিভক্তিব্যত্যয়ঃ দশভীরাজভিঃ শত্রুভূতৈঃ।]

এব। ইৎ। নু। কম্। দাশরাজ্ঞে। সুদাসম্। প্র। আবৎ। ইন্দ্রঃ। ব্রহ্মণা। বঃ। বসিষ্ঠাঃ।
—৭।৩৩।৩

হে বসিষ্ঠগণ! দাশরাজার নিমিত্ত কোন্ সুদাসকে তোমাদিগের স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছেন?

[দাশরাজ্ঞে দশভী রাজভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্তে সতি সুদাসং রাজানমিন্দ্রঃ প্রাবৎ প্রারক্ষৎ, ইতি সায়ন]

বরং এই অর্থ গ্রহণ করিলে যুদ্ধকালে সুদাসের পিতা জীবিত ছিলেন, বুঝায়। বসিষ্ঠ ঋষি যুদ্ধের পর যজ্ঞ করিয়া যে আশীর্ব্বাদসূচক ঋক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধার করিয়াছি। ইহা হইতে দেখিতে পাই, সুদাসের পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। অতএব পিজবনের আর এক নাম দাশরাজ ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

ভরদ্বাজ ঋষি দেববান নামক এক ব্যক্তির পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচীবানের রাজ্য প্রদান করেন, ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন। (১) তিনি আর এক ঋকে বর্ণনা করিয়াছেন,—চয়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তী বরশিখের পুত্রের রাজ্য লাভ করেন,এবং ইন্দ্র বৃচীবান্‌দিগকে হরিযূপীয়া-তীরে সংহার করেন উল্লেখ করিয়াছেন। (২) পরে ঋক উদ্ধার করিয়া দেখান যাইবে, ভরদ্বাজ ঋষি চয়মান-পুত্র সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। চয়মানের কবি নামক আর এক পুত্র সুদাসের রাজ্যে পরুষ্ণী নদীর কূল ভেদ করিতে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইহাও পরে দেখান যাইবে। অতএব, অভ্যাবর্ত্তী ও পিজবন যে সমসাময়িক ছিলেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। ভরদ্বাজ ঋষিও যে বসিষ্ঠ ঋষির সময়েই জীবিত ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে মনে হয়, সুদাসের সহিত পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধের সময় ভরদ্বাজ ঋষি জীবিত ছিলেন না।

রাজা পিজবনের জীবিতকালেই তাঁহার পুত্র সুদাস যমুনাতীরে গোধন-হরণার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। এইখানে দশ জন অযজ্ঞকারী রাজা আসিয়া তাঁহাকে বাধা দেন। ইহাতে যে যুদ্ধ হয়, তাহা 'ভেদের সহিত যুদ্ধ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

(১) যস্য। গাবৌ। অরুষা। সুযবস্যূ। অন্তঃ। ঊঁ। সু। চরতঃ। রেরিহাণা।
স:। সৃঞ্জয়ায়। তুর্ব্বশম্। পরা। অদাৎ। বৃচীবতঃ। দৈববাতায়। শিক্ষন্ ॥—৬।২৭।৭
যাঁহার অরুণবর্ণ, শোভনতৃণভক্ষণকারী, লেহনশীল গোদ্বয় (দ্যাবা পৃথিবী)-মধ্যে সুখে বিচরণ করে, সেই (ইন্দ্র) সৃঞ্জয়কে তুর্ব্বশ প্রদান করিয়াছেন, বৃচীবানের (রাজ্য) দেববানের পুত্রকে প্রদান করিয়াছেন।

(২) বধীৎ। ইন্দ্রঃ। বরশিখস্য। শেষঃ। অভ্যাবর্ত্তিনে। চায়মানায়। শিক্ষন্।
বৃচীবতঃ। যৎ। হরিযূপীয়ায়াম্। হন্। পূর্ব্বে। অর্দ্ধে। ভিয়সা। অপরঃ। দর্ত্ত ॥
—৬।২৭।৫
ইন্দ্র চয়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে দান করিতে বরশিখের পুত্রকে বধ করেন। হরিযূপীয়া-তীরের পূর্ব্বভাগে যখন বৃচীবানগণকে (ইন্দ্র) হনন করেন, পশ্চাৎভাগে স্থিত (গণ) ভীতি দ্বারা বিদীর্ণ হয়।

এই যুদ্ধ-জয়ের পর, বসিষ্ঠ ঋষি সুদাসের যজ্ঞে তাঁহার বিজয়গীতি রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই বিজয়গীতি ৭ম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে দেখিতে পাই। (১) এই যজ্ঞকে পরে প্রদর্শিত বিশ্বামিত্র-বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞ বলিয়া মনে করি। এই সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন যে, গো লাভ করিবার ইচ্ছায় পৃথু-কুঠার-

---

(১) যুবাং। নরা। পশ্যমানাসঃ। আপ্যং। প্রাচা। গব্যন্তঃ। পৃথুপর্শবঃ। যযুঃ।
দাসা। চ। বৃত্রা। হতং। আর্য্যাণি। চ। সুদাসং। ইন্দ্রাবরুণা। অবসা। অবতম্ ॥

—৭।৮৩।১

হে নেতৃদ্বয়! তোমাদিগকে বন্ধুভাবে দর্শনকারী, গো-লাভ-ইচ্ছাকারী, পৃথু-কুঠারযুক্তগণ পূর্ব্ব দিকে গিয়াছিল। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দাস ও বৃত্রদিগকে হনন করিয়াছ, আর্য্যদিগকে ও সুদাসকে রক্ষণ দ্বারা রক্ষা করিয়াছ।

[সায়নাচার্য্যের মতে, ইন্দ্র-বরুণ দাস, বৃত্র ও আর্য্যদিগকে সংহার ও সুদাসকে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা এই অর্থের অনুমোদন করি না।]

ইন্দ্রাবরুণা। বধনাভিঃ। অপ্রতি। ভেদং। বন্বন্তা। প্র। সুদাসম্। আবতম্।
ব্রহ্মাণি। এষাম্। শৃণুতম্। হবীমনি। সত্যা। তৃৎসূনাম্। অভবৎ। পুরঃহিতিঃ ॥—৭।৮৩।৪

হে ইন্দ্র-বরুণ! বধ করিতে সক্ষম অস্ত্র সকল দ্বারা ভেদ (নামক শত্রুকে) হিংসা করিয়া সুদাসকে রক্ষা করিয়াছিলে। ইহাদিগের যুদ্ধকালের স্তোত্র ও আহ্বান শ্রবণ করিয়াছ; তৃৎসুদিগের পুরোভাগে (তোমাদিগের অবস্থান) সত্য হইয়াছিল।

যুবাং। হবন্তে। উভয়াসঃ। আজিষু। ইন্দ্রং। চ। বস্বঃ। বরুণং। চ। সাতয়ে।
যত্র। রাজভিঃ। দশভিঃ। নিবাধিতম্। প্র। সুদাসং। আবতম্। তৃৎসুভিঃ সহ ॥

—৭।৮৩।৬

ইন্দ্র ও বরুণ দুই জনকে সংগ্রামে ধনলাভের জন্য উভয় দলের (ঋত্বিক্‌গণ) আহ্বান করিতেছে। যে (যুদ্ধে) দশ জন রাজাদিগের দ্বারা আক্রান্ত সুদাসকে তৃৎসুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছ।

দশ। রাজানঃ। সমিতাঃ। অযজ্যবঃ। সুদাসম্। ইন্দ্রাবরুণা। ন। যুযুধুঃ।
সত্যা। নৃণাং। অদ্মসদাম্। উপস্তুতিঃ। দেবাঃ। এষাং। অভবন্। দেবহূতিষু ॥—৭।৮৩।৭

হে ইন্দ্র-বরুণ! দশ জন অযজ্ঞকারী রাজা মিলিত হইয়াও সুদাসকে যুঝিতে পারে নাই। অন্নভোজী নেতাদিগের স্তোত্র সত্য হইয়াছিল। ইঁহাদিগের দেবাহ্বানে দেবগণ (আবির্ভূত) হইয়াছিলেন।

দাশরাজ্ঞে। পরিযত্তায়। বিশ্বতঃ। সুদাসে। ইন্দ্রাবরুণৌ। অশিক্ষতম্।
শ্বিত্যঞ্চঃ। যত্র। নমসা। কপর্দিনঃ। ধিয়া। ধীবন্তঃ। অসপন্ত। তৃৎসবঃ ॥—৭।৮৩।৮

চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে দাশরাজের মিলিত ইন্দ্র-বরুণ (বিজয়) প্রদান করিয়াছিলেন; যে (যুদ্ধে) শ্বেতবর্ণ কপর্দ-(অর্থাৎ চূড়া)-যুক্ত, ধীযুক্ত, তৃৎসুগণ ধী-দ্বারা নমস্কার দ্বারা (ইন্দ্র-বরুণকে) পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

যুক্ত আর্য্যগণ পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়াছিলেন। পরে দাস, বৃত্র ও ভেদের সহিত সুদাস রাজার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দশ জন অ-যজ্ঞকারী রাজা আসিয়া সুদাসকে বেষ্টন করে। অগ্নিহোত্র ঋত্বিকগণ ইন্দ্র ও বরুণকে আহ্বান করায়, তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া সুদাসকে ও আর্য্যদিগকে রক্ষা, এবং দাস, বৃত্র ও ভেদকে সংহার করেন।

বসিষ্ঠ ঋষি তৃৎসুদিগের নায়ক ছিলেন। সেই জন্য (৮ষ্ঠ ঋকে) তিনি বলিতেছেন, 'দশ জন রাজাদিগের দ্বারা আক্রান্ত সুদাসকে তৃৎসুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছ।' কিন্তু তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'উভয় দলের লোক সকল' ইন্দ্র-বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল। এই উভয় দল কে? যে দশ জন অ-যজ্ঞকারী বিপক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, তাহারা ত ইন্দ্র-বরুণকে ডাকিবে না। অতএব সুদাসের সহিত দুই দল পুরোহিত এই যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাদের এক দল বসিষ্ঠ প্রমুখ তৃৎসুগণ, এবং অপর দল বিশ্বামিত্র প্রমুখ কুশিকগণ। পরে বিশ্বামিত্র ঋষির বিরচিত ঋক্ উদ্ধার করিয়া ইহা দেখান যাইতেছে। ভেদের সহিত যুদ্ধ যে যমুনাতীরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বসিষ্ঠ ঋষি আর এক সূক্তে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। (১)

রাজা সুদাস যে যমুনাতীরে গো জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথায় আগমন করিয়া ভেদ প্রমুখ দশ জন অযাজ্ঞিক রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা বসিষ্ঠ ঋষি ঋক্‌বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বসিষ্ঠের রচনা হইতে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সুদাস পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া যমুনাতীরে আগমন করেন। অতএব তিনি পঞ্জাবের দিক হইতে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। পঞ্জাব হইতে আগমনকালে পথে একটী বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও বিশ্বামিত্র ঋষি ঋক্‌বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। (২) যখন তাঁহারা বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীর সঙ্গমস্থলে উপনীত

---

(১) আবৎ। ইন্দ্রং। যমুনা। তৃৎসবঃ। চ। প্র। অত্র। ভেদং। সর্বতাতা। মুষায়ৎ।
অজাসঃ। চ। শিগ্রবঃ। যক্ষবঃ। চ। বলিং। শীর্ষাণি। জভ্রুঃ। অশ্ব্যানি।—৭।১৮।১৯

ইন্দ্রকে যমুনা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; তৃৎসুগণও (ইন্দ্রকে তুষ্ট করিয়াছিলেন); এই স্থানের যুদ্ধে (ইন্দ্র) ভেদকে প্রকৃষ্টরূপে দূর করিয়াছিলেন। অজগণ, শিগ্রুগণ, যক্ষুগণ অশ্বের মস্তক সকল উপহার আহরণ (বা প্রদান) করিয়াছিল।

(২) প্র। পর্বতানাং। উশতী। উপস্থাৎ। অশ্বে ইব। বিসিতে। হাসমানে।
গাবা ইব। শুভ্রে। মাতরা। রিহাণে। বিপাট্। শুতুদ্রী। পয়সা। জবেতে॥—৩।৩৩।১

হন, তখন দেখিতে পান, ঐ দুই নদী জলপূর্ণা হইয়া বেগে ধাবিত হইতেছে। বিশ্বামিত্র ঋষি ভরতগণের অধিনায়ক হইয়া আসিতেছেন। অশ্ব, শকট, সৈন্য প্রভৃতি পার হওয়া কঠিন হইল দেখিয়া তিনি একটী সূক্ত রচনা করিয়া নদীদ্বয়কে জলস্রোত রোধ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাদটীকায় এই সুন্দর স্তোত্রটী উদ্ধার করিলাম। (১) এই সূক্ত হইতে জানা যাইতেছে

বন্ধনমুক্তা, আনন্দিতা, কামাতুরা অশ্বীদ্বয়ের মত, (বৎস) লেহন করিতে (ধাবমানা) দুইটী শুভ্রা গাভী মাতার মত পয়োযুক্তা বিপাশা ও শুতুদ্রী (নদীদ্বয়) পর্ব্বতদিগের ক্রোড় হইতে (বহির্গত হইয়া) বেগে গমন করিতেছে।

(১) ইন্দ্রেষিতে। প্রসবম্। ভিক্ষমাণে। অচ্ছ। সমুদ্রম্। রথ্যা ইব। যাথঃ।

সমারাণে। ঊর্মিভিঃ। পিন্বমানে। অন্যা। বাম্। অন্যাম্। অপি। এতি। শুভ্রে॥

—৩।৩৩।২

প্রসবভিক্ষাকারিণী, ইন্দ্র-প্রেরিতা-দ্বয়, রথীসদৃশ, সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছেন। হে ঊর্ম্মি সকল দ্বারা যুক্তা, পরস্পর সংগতা, শুভ্রা-(বা শোভমানা)-দ্বয়! তোমাদিগের এক জন অন্যার দিকে আসিতেছ!

অচ্ছ। সিন্ধুং। মাতৃতমাং। অযাসম্। বিপাশং। উর্বীম্। সুভগাম্। অগন্ম।

বৎসং ইব। মাতরা। সংরিহাণে। সমানং। যোনিং। অনু। সঞ্চরন্তী।—ঐ ৩

(আমি) মাতৃতমা সিন্ধুর (অর্থাৎ সরস্বতীর) অভিমুখে গিয়াছিলাম। সুভগা, মহতী, বিপাশা নদীতে (আমরা) আসিয়াছি। (বিপাশা ও শুতুদ্রী) বৎসলেহন-ইচ্ছুক (গাভী) মাতৃদ্বয়ের মত, একই গৃহের অভিমুখে গমনকারিণীদ্বয় (সদৃশ)।

[এই ঋকের সায়নাচার্য্য-সম্মত অর্থ অন্য প্রকার। তাঁহার মতে, মাতৃতমা সিন্ধু শুতুদ্রী নদী।]

এনা। বয়ম্। পয়সা। পিন্বমানাঃ। অনু। যোনিম্। দেবকৃতম্। চরন্তীঃ।

ন। বর্তবে। প্রসবঃ। সর্গতক্তঃ। কিংযুঃ। বিপ্রঃ। নদ্যঃ। জোহবীতি।—ঐ ৪

এই জল দ্বারা স্ফীত হইয়া, দেবকৃত গৃহের অভিমুখে গমনকারিণী আমরা; গমনে প্রবৃত্ত স্রোত নিবৃত্ত হইবার নহে। কি জন্য বিপ্র, 'হে নদীগণ' (বলিয়া) আহ্বান করিতেছেন?

রমধ্বম্। মে। বচসে। সোম্যায়। ঋতবরীঃ। উপ। মুহূর্তম্। এবৈঃ।

প্র। সিন্ধুং। অচ্ছ। বৃহতী। মনীষা। অবস্যুঃ। অহ্বে। কুশিকস্য। সূনুঃ।—ঐ ৫

হে জলপূর্ণা! আমার সোম্য বাক্য (শ্রবণের) নিমিত্ত অশ্ব সকলের সহিত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল হও। রক্ষা-ইচ্ছুক কুশিকের পুত্র মহতী মনীষা (অর্থাৎ স্তোত্র) দ্বারা সিন্ধুর অভিমুখে আহ্বান করিতেছে।

ইন্দ্রঃ। অস্মান্। অরদৎ। বজ্রবাহুঃ। অপ। অহন্। বৃত্রম্। পরিধিম্। নদীনাম্।

দেবঃ। অনয়ৎ। সবিতা। সুপাণিঃ। তস্য। বয়ম্। প্রসবে। যামঃ। উর্বীঃ।—ঐ ৬

বজ্রবাহু ইন্দ্র নদীদিগের পরিধি (অর্থাৎ বেষ্টনীরূপ) বৃত্রকে হনন করিয়া আমাদিগকে খনন করিয়াছেন। সুপাণি, দেব সবিতা (আমাদিগকে) আনয়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রসব নিমিত্ত উরুলোক সকলে গমন করি।

যে, বিশ্বামিত্র ঋষি কুশিকের পুত্র ছিলেন (৫ম ঋক্); তিনি মাতৃতমা সিন্ধুর অভিমুখে গিয়াছিলেন (৩য় ঋক্)। বর্ত্তমান সিন্ধুনদীকে পূর্ব্বে মাতৃতমা সিন্ধু বলা হইত, ইহা 'সপ্তসিন্ধু' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি সিন্ধুতীরে গিয়াছিলেন কোথা হইতে? বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীতীর হইতে নহে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, নদীদ্বয় ঋষিকে ভবিষ্যৎ যজ্ঞে তাঁহাদের নামে ঋক্ রচনা করিতে অনুরোধ করিতেছেন (৮ম ঋক্)। অতএব, এই নদীদ্বয়ের তীরে বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণ বাস করিতেন না। গো-হরণ-যুদ্ধযাত্রায় জন্যই আসিয়া পড়িয়াছেন। পরে দেখাইব, পরুষ্ণী বা বর্ত্তমান রাভীনদীর তীরেই তাঁহারা বাস করিতেন।

ক্রমশঃ

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

প্রবাচ্যম্। শশ্বধা। বীর্য্যম্। তৎ। ইন্দ্রস্য। কর্ম্ম। যৎ। অহিং। বিবৃশ্চৎ।
বি। বজ্রেণ। পরিসদঃ। জঘান। আয়ন্। আপঃ। অয়নম্। ইচ্ছমানাঃ॥—ঐ ৭

অহিকে যে সংহার করেন, ইন্দ্রের সেই বীর-কর্ম্ম সদা কীর্ত্তনীয়। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতদিগকে বজ্র দ্বারা বধ করিয়াছেন; (তখন) গমন ইচ্ছাকারিণী জল সকল আসিয়াছিল।

এতৎ। বচঃ। জরিতঃ। মা। অপি। মৃষ্ঠাঃ। আ। যৎ। তে। ঘোষান্। উত্তরা। যুগানি।
উক্থেষু। কারো। প্রতি। নঃ। জুষস্ব। মা। নঃ। নি। কঃ। পুরুষত্রা। নমঃ। তে॥—ঐ ৮

হে স্তবকারি! এই বাক্য যেন বিস্মৃত না হও। ভবিষ্যতে তোমার যে সকল স্তোত্র ঘোষিত হইবে, হে কারো (অর্থাৎ স্তবরচনাকারী)! (সেই) উক্থ সকলে আমাদিগকে তুষ্ট করিও। আমাদিগকে পুরুষসদৃশ (বর্ণনা) করিও না। তোমাকে নমস্কার।

ও। সু। স্বসারঃ। কারবে। শৃণোত। যযৌ। বঃ। দূরাৎ। অনসা। রথেন।
নি। সু। নমধ্বম্। ভবত। সুপারাঃ। অধঃ। অক্ষাঃ। সিন্ধবঃ। স্রোত্যাভিঃ॥—ঐ ৯

হে সুন্দর ভগিনীগণ! কারুকে শ্রবণ কর। শকট ও রথ সহিত দূর হইতে (আসিয়া) তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুন্দররূপে নত হইয়া সুখে পারকারিণী হও। হে সিন্ধুগণ! স্রোত সকলের সহিত (রথচক্রের) অক্ষের নিম্নে (গমন কর)।

আ। তে। কারো। শৃণবাম। বচাংসি। যযাথ। দূরাৎ। অনসা। রথেন।
নি। তে। নংসৈ। পীপ্যানা ইব। যোষা। মর্য্যায় ইব। কন্যা। শশ্বচৈ। তে॥—ঐ ১০

হে কারো! তোমার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াছি। (তুমি) দূর হইতে শকট ও রথ সহিত আগমন করিয়াছ, স্তনদানকারিণী মাতার মত তোমার (নিকট) নত হইব; পিতার নিকট কন্যার মত তোমার (নিকট) নত হইব।

স্থাপত্য শিল্প।

৮

স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য কোথায়, ইহা বুঝিবার অল্প-বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। অনেকের ধারণা যে, কোনও সৌধকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে পূর্ণ করিলে ইহাকে সৌন্দর্য্যের আধারে পরিণত করা যাইতে পারে। সর্ব্বসময়ে ও সকল অবস্থায় সম্পূর্ণতা দ্বারা সৌন্দর্য্য-রক্ষা সাধিত হয় না; তাহা যদি হইত, প্রকৃতি-সংস্থানে আমরা এইরূপ জ্যামিতিক সম্পূর্ণতা বা পারিপাট্য দেখিতে পাইতাম। ঐ যে প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প তোমার চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতেছে, মাপিয়া দেখ দেখি, উহার কয়টি পর্ণের পরিমাণ সমান? চাহিয়া দেখ দেখি, ইহার কয়টির সীমারেখার বক্রতা সম্পূর্ণভাবে একই প্রকারের? প্রাকৃতিক সংস্থানে কোনও বস্তুতেই আমরা সম্পূর্ণতা দেখি না; এই অসম্পূর্ণতাই বোধ হয় বস্তুটির মধ্যে প্রাণস্পন্দন আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করে; ইহাতেই তাহার সৌন্দর্য্য প্রকটিত।

বাস্তবিকই আমরা প্রাণস্পন্দন দেখি না কি? আমরা দেখি যে, শিল্পী তাঁহার আদর্শটি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াও কেমন ফুটাইতে পারিতেছেন না! প্রত্যেক প্রস্তরে যেন চেষ্টাটি চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে; আমরা দেখি যে, শিল্পী কোনও কোনও অংশে চিরচঞ্চল ভাবকে প্রস্তরে বাঁধিবার জন্য কতই না কৌশল অবলম্বন করিয়াও শেষে তাহাকে আর আঁটিতে পারিলেন না। ছেনির সেই শেষ চিহ্নটি তাঁহার হৃদয়ের কতই ব্যগ্রতা, কতই আগ্রহ—আর অবশেষে বোধ হয়—কতই না বিষাদদিগ্ধ হতাশার পরিচয় দেয়! আমরা এই অসম্পূর্ণ শিল্পে দেখি যে, কল্পনা আদর্শকে শিল্পীর নিকট বন্দী করিয়া আনিয়া দিলেও তাহার শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধা অসম্ভব; শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়। প্রস্তর-গাত্রে এই কারণেই আদর্শের বিদ্রূপহাস্যের সহিত শিল্পীর নির্ব্বাপিত বাসনা চিরকালের জন্য যেন উৎকীর্ণ দেখা যায়; আর দেখা যায়—

'বিফল ব্যাকুলতা
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।'

প্রাণহীন প্রস্তরে ইহা অপেক্ষা প্রাণের অভিব্যক্তি আর কি আশা করা

যাইতে পারে? আর এই অভিব্যক্তিতে যে সৌন্দর্য্য প্রকটিত তাহার তুলনা কোথায়?

অট্টালিকাটিকে ঠিক ছবির ন্যায় পরিপাটী করিয়া নির্ম্মাণ করিলেই মনে করিও না যে, ইহাতে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইয়াছে, আর অপরিপাটীভাবে নির্ম্মাণ করিলেই অসুন্দর বা অশোভন হইল। অট্টালিকার নগ্নতাই অনেক সময় তাহার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। দিল্লী-সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তোগ্‌লকের সমাধিহর্ম্ম্যে পারিপাট্য কিছুই নাই; কিন্তু বোধ হয় কেহ বলিবেন না যে, এই কারণে ইহা অশোভন। প্রকৃতপক্ষে ইহার সৌন্দর্য্যে মন দ্রব না হইয়া যায় না। এই কারণেই পাঠান-স্থাপত্যের মধ্য-যুগে নির্ম্মিত সৌধে বা সমাধিতে যে সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়, তাহা আদি ও অন্ত্য যুগে দৃষ্ট হয় না। ইংলণ্ডস্থ নরম্যান্ স্থাপত্যে যে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, তাহা বহুপরবর্ত্তী টিউডর্-দিগের স্থাপত্যে কোথায়? অবশ্য সম্রাট সপ্তম হেন্‌রীর চ্যাপেল্ প্রভৃতি কয়েকটি অতিশয় মনোহর সৌধের কথা ছাড়িয়া দিলেও নরম্যান্ যুগে নির্ম্মিত লণ্ডনস্থ সেণ্টজন্‌স্ চ্যাপেলে (St. John's Chapel) যে গাম্ভীর্য্য ও তজ্জনিত সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, তাহা টিউডর্ যুগের স্থাপত্যে দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তার বিকাশ না থাকিলে তাহা তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। যে মানব প্রকৃতিতে গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তার বিকাশ নাই, তাহা কখনই শোভন নহে; যে মানব শুদ্ধ স্ত্রীজনসুলভ কমনীয়তাপূর্ণ, তাহার সৌন্দর্য্য মানবসমাজে উপভোগ করিবার নহে; তাহা 'গ্লাস্‌কেসে' শোভা পাইবার যোগ্য। স্থাপত্য সম্বন্ধেও এই সনাতন নিয়ম প্রযোজ্য।

গিয়াসুদ্দীন তোগ্‌লকের সমাধিহর্ম্ম্যও গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত জুনাগড়স্থ মাইজি সাহেবার সমাধির তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তিটির যাথার্থ্য প্রতীয়মান হইবে। শেষোক্তটিতে কারুকার্য্যের এত পারিপাট্য ও প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান থাকিতেও প্রথমোক্তটির মত উহা হৃদয় দ্রব করে না। জুনাগড়ের সমাধির গাত্রস্থ কারুকার্য্যগুলি অতিশয় ধৈর্য্যের পরিচায়ক ও পরিশ্রমদ্যোতক; সে হিসাবে ইহা প্রশংসার্হ; কিন্তু জ্যামিতিক পারিপাট্য দ্বারা কাহারও ভাবনার দ্বার ত খুলিয়া যায় না! ইহা দেখিতে দেখিতে কেহ ত চিন্তা-সমুদ্রে মগ্ন হয় না! ইহাতে শুদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক হয়; কেবলমাত্র মনে হয় যে, এগুলিতে শিল্পীকে কত ধৈর্য্য-সহকারে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ভাবনা-প্রবাহে ভাসিয়া না গিয়া দর্শকের চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং তাঁহার মন নিরুদ্ধ না হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া

উঠে ; সূক্ষ্ম কার্য্যের প্রাচুর্য্যে তাঁহার যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, ও মনের মধ্যে হাঁফ ধরে। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জ্যামিতিক অসম্পূর্ণতা যে অনেক সময়ে স্থাপত্যকে সম্পূর্ণতার মহিমায় মণ্ডিত করে তাহা য়ুরোপীয় গথিক্ স্থাপত্যানুশীলন করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

স্থাপত্যকে সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াসের মত অস্বাভাবিক কার্য্য আর কিছুই নাই ; মানুষের অনন্ত শক্তি থাকিলে তাহা সম্ভবপর হইত। প্রত্যেক প্রস্তরের সীমা-রেখা বা পার্শ্ব যদি ছেনির সাহায্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ক্ষোদিত করিবার বা তাহার গাত্রদেশ মসৃণ করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহার কি কোনও কালেও শেষ হইবে? সে সৌধ কোনও কালে সম্পূর্ণ হইবে না। অংশকে সম্পূর্ণ করিতে গিয়া সমগ্রটি বিকল, অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই কারণে ভারতবর্ষের মধ্যযুগে অনেক মন্দির সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই ; ইহা ভারতের একটী অভিশাপ। নিজামরাজ্যস্থ ওয়ারঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হোনাম-কুণ্ডা গ্রামে চালুক্যরীতিতে নির্ম্মিত যে মনোহর শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্ত অংশগুলি বোধ হয় কোনও কালে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই ; কিন্তু এ মন্দিরের অন্তরাল বা অর্দ্ধমণ্ডপস্থ স্তম্ভগুলি এমন মসৃণ ও সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-যুক্ত যে, ইহারা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মন্দিরের সম্মুখে যে মহামণ্ডপ ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইয়াছিল যে, ইহা কোনও কালেই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। মহিসুরস্থ হালেবিড গ্রামের হৈসলেশ্বর মন্দিরেরও এই অবস্থা। উড়িষ্যারও কোনও কোনও মন্দিরে দেখিয়াছি যে, সর্ব্বাংশে কারুকার্য্য-গুলি সমান ভাবে সূক্ষ্ম নহে। মহাবলিপুর বা মামল্লপুরস্থ কয়েকটি রথের গাত্রে দেখিয়াছি যে, ভাস্কর্য্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস করিলে, সৌধটির সমস্ত অঙ্গগুলির যোজনা ও সৌষ্ঠবসংরক্ষণে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাওয়া যায় না ; আর সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছার প্রেরণায় বোধ হয় অভিসম্পাত আছে। যিনিই কোনও বস্তুকে সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ করিবার দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। কোনও চিত্রকর যদি তাঁহার আলেখ্যের পিছনের আকাশ বা বৃক্ষটির উপর তুলিকা চালনা করিয়া, বা তাঁহার চিত্রিতব্যের নখ বা অঙ্গুলির বর্ণ-প্রকাশের জন্য সমস্ত সময় অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্রটি আর সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে না ; এই জন্যই ইহাতে মনোনিবেশ না করিয়া, তুলিকার সাহায্যে দুই একটি রেখা দ্বারা অনেকে চিত্রটিকে ফুটাইবার চেষ্টা করেন, এবং সে চেষ্টা সফল ও সার্থক হয়। শিল্প-

দেবতাটির পূজা না করিয়া, শুদ্ধ ধূপ, ধূনা, বা পুষ্পসম্ভারের বন্দোবস্তে সময় অতিবাহিত করিলে চলিবে কেন? চিত্তোন্মাদকারী গানটি না গায়িয়া শুধু সুর সাধিলে ত কোনও সার্থকতা নাই; অবশেষে দুঃখে ও হতাশায় বলিতে হইবে, 'আজ আমাদের সুর সাধা শুধু, হয়নি সে গান গাওয়া।'

সকলেরই কি সৌধকে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে? সে ক্ষমতা বহু অভ্যাস ও শিক্ষা সাপেক্ষ; কিন্তু যাহা আপন আপন চিন্তা ও কল্পনা-শক্তির সাহায্যে অনায়াসলভ্য, তাহার উৎকর্ষবিধানে মনোযোগ না দিবার কারণ কি? সকলেই আপন কল্পনার সাহায্যে ক্রিষ্টোফার রেন্, জকনাচার্য্য, বা অমরনন্দ খাঁর ন্যায় উৎকর্ষ দেখাইবেন, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু যাঁহার যেটুকু শক্তি আছে, তাহার প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা যে অভিনব বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বৈচিত্র্যের কথা বলা হইয়াছে; আর বলা হইয়াছে যে, বৈষম্য-নির্দ্দেশক অঙ্গগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাচীন স্থাপত্য কোনও কালেই এ বিষয়ে উদাসীন ছিল না; কিন্তু অনেক দেশের প্রাচীন স্থাপত্যে একই ধরণের অঙ্গসমূহের ব্যবস্থা দেখিয়া কল্পনাকে শ্রান্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অনন্ত ভাব-রাজ্যের বহু উচ্চে উঠিতে হয় না; বহু নিম্নে যাহা সাধারণ ভাবরাজ্যের সীমার অন্তর্গত, তাহার মধ্যেই ইহার পক্ষসঞ্চালন নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই কারণেই অনেক দেশের স্থাপত্যকে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে হয় নাই, এবং অধিক দিন স্থায়ীও হইতে হয় নাই। যাঁহারা পারস্যের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, একিমিনিড্-(Achaemenid)-বংশীয় নৃপতিদিগের সর্ব্বপ্রথমাবস্থায় যে স্থাপত্যরীতির প্রচলন হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহার অনুকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া, ইহার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটিয়া উঠে নাই। এ সম্বন্ধে পারসীকেরা প্রকৃতি কর্ত্তৃক বহু সম্পদশালিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেও, তাঁহাদের অদূরে আশিরীয়, ফিনিসীয়, ইজিপ্সীয়, গ্রীক্, মিডীয় প্রভৃতি নানা আদর্শ বর্ত্তমান থাকিতেও, তাঁহারা বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। নিনেভে, টায়ার, থিব্স্, এথেন্স্ ও একবাটানা প্রভৃতি নগরে অভান্ত যে বিভিন্ন স্থাপত্য-রীতি বর্ত্তমান ছিল, তাহা ডেরায়স্ বা জারাক্সিসের (Xerxes) পরবর্ত্তী নরপতিদিগের হৃদয়ে কোনও স্থায়ী ভাব অঙ্কিত করিতে পারে নাই। ইঁহারা একিমিনিড্ বংশের স্থাপয়িতা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত রীতির মধ্যে সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে

লাগিলেন; কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এই অভ্যাস চলিতে লাগিল, এবং যাহা আশা করা যাইতে পারে,তাহাই ঘটিল। এ বংশীয় নরপতিদিগের যখন তিরোধান হইল, তখন দেখা গেল যে, এই কয়েক শতাব্দীতে স্থাপত্যের কোনও উন্নতিই সাধিত হয় নাই, বরং ক্ষীণ অনুকরণের প্রভাবে ইহা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

যে বৈচিত্র্যের অভাবে পারসীক স্থাপত্যের অবনতি হইয়াছিল, ভারতেও তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্যের অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, অঙ্গগুলির মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব বর্ত্তমান, ইহা কোথাও নাই; এমন কি, নীল ও তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিসের উপত্যকাতেও দৃষ্ট হয় না; কিন্তু হইলে কি হয়? এই সব অঙ্গগুলি লইয়া যে এককের সৃষ্টি, যাহাকে 'জৈবিক একক' স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে ত বিশেষ বৈষম্য দেখা যায় না। এখানে এ কথা বলিয়া রাখি যে, ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রীতির ভিন্নতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোনও বিশেষ প্রদেশ ধরিলে ইহার স্থাপত্যে বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া দেখ যে, 'বৈতাল দেউল' ও গৌরী মন্দির ভিন্ন কোনও বিমানে আকৃতিগত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সমস্ত 'জগমোহন' পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, পরশুরামেশ্বর মন্দির ও 'বৈতাল দেউল' ভিন্ন সকলই প্রায়শঃ এক আকৃতির। এই আকৃতিগত সাম্যের অনেকগুলি কারণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, এই সাম্য-রক্ষাই ইহার উৎকর্ষসাধনের বিশেষ প্রতিকূল। সমাজে যেমন বিরুদ্ধবাদী বা Dissenter দ্বারা যাহা কিছু অপকার সাধিত হউক না, ইহারা যে অন্ততঃ সমাজের রক্তসঞ্চালনে সহায়তা করেন; অবশ, নিস্তেজ পেশী ও স্নায়ুগুলিকে শক্তিযুক্ত করেন, সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সেইরূপ শিল্পরাজ্যে সমতা বা একত্ব রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে যাইলেই বিশেষত্বের তিরোধান হইয়া, উহা অচিরেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, গ্রীক্ শিল্পীরা এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ছিলেন। তবে এ কথা বলিয়া রাখি যে, প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের এখনও কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেও চলে। যৎসামান্য যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই প্রতি আমার মতটি প্রযোজ্য। অঙ্গগুলির উৎকর্ষবিধানে ভারতীয় শিল্পী অনেক বিষয়ে গ্রীক্ বা রোম্যান্ শিল্পীর স্থান বহু নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

যাহা গ্রীক্ বা রোম্যান্ শিল্পীর গৌরবের বস্তু, সেই স্তম্ভের কথাই ধরা যাউক। ভারতবর্ষে ইহার যত প্রকার অধিষ্ঠান (Base) প্রচলিত দেখা যায়, পৃথিবীর কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না। মানসার গ্রন্থে প্রতিবন্ধ, একবন্ধ, শ্রীবন্ধ, শ্রেণীবন্ধ, প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকারের অধিষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু ইহা ভিন্ন যে কত প্রকারের অধিষ্ঠান নয়নগোচর হয়, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। স্তম্ভের নলাকার অংশেরও যে কত বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা দক্ষিণ-ভারতে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন। আমি পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীক্ বা রোম্যান্ স্থাপত্যে আমরা স্তম্ভের বোধিকা (capital) তিন প্রকারের, বা কম্পোজিট (composite) লইয়া চারি প্রকারের কল্পিত হইয়াছে, দেখি; কিন্তু ভারতীয় বোধিকা অসংখ্য প্রকারেই কল্পিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে ভারতীয় স্থাপত্যের অঙ্গগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিব যে, ইহাদের বৈচিত্র্য অতুলনীয় ও বৈচিত্র্যসম্পৎ অনন্ত। এই অনন্ত-বৈচিত্র্যযুক্ত অঙ্গগুলিকে যে কেন সুন্দররূপে গ্রথিত ও সংবদ্ধ করা হয় নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করা গিয়াছে। ইহা কি 'বিন্দুতে সিন্ধু' দেখায়ই ফলস্বরূপ, না আর্য্যদিগের বিশ্লেষণী শক্তিরই অভিব্যক্তি? ইহা ধ্রুব সত্য যে, কোনও বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, শুদ্ধ তাহার বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না; ইহার যে সমগ্র সংগঠনাত্মক (synthetical) রূপ, তাহারও সন্ধান লইতে হইবে।

খ্রীষ্টীয় যুগের পূর্ব্বে ভারতের স্থাপত্য বলিয়া যাহা ছিল—যথেষ্ট ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—তাহাতে বিষয়টিকে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত বাস্তুত-তোরণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইবে। তোরণশীর্ষে ও রেলিংএর গাত্রে যে সমস্ত সৌধের চিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্বেকার স্থাপত্য বিষয়ে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সামান্য পরিচয়ে আমরা যে বৈচিত্র্য ও সাহসের নিদর্শন পাই, তাহা বহুপরবর্ত্তী গুপ্তযুগে দেখি না। কি সূক্ষ্মাংশ হিসাবে, কি তাহাদের সমগ্র রূপে আমরা বৈচিত্র্য দেখি। যখনই আইন কানুনের বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হইল, যখনই শিল্পীর কার্য্য সূত্রাকারে নির্দ্দিষ্ট হইল, তখনই তাহার অবনতিরও সূত্রপাত আরব্ধ হইল। সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিবার অনেক গুণ আছে, স্বীকার করি; ইহাতে অনেক

অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় বিস্মৃতিসাগরে লোপ পায় না বটে, কিন্তু যেখানে সূত্রকার শিল্পীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, সেইখানে তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। প্রকোষ্ঠগুলি কোনও নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণযুক্ত বা নির্দ্দিষ্ট-গবাক্ষযুক্ত করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, স্থপতির মৌলিকতা রক্ষা পায় কি প্রকারে? যদি এই-রূপ বিধি প্রবর্ত্তিত হয় যে, বিমানমাত্রেরই পাঁচটির অধিক কুড্যস্তম্ভ বা pilaster কল্পিত হইবে না, বা তাহাকে নবরত্নযুক্ত বা একথারী করিতে হইবে, তাহা হইলে শিল্পীর চিন্তা করিবার রহিল কি? চিত্রকরকে তাঁহার মানসী দেবীর রূপ কল্পনা করিতে না দিয়া যদি Art Magazine হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি রূপের জমায়েস করা হয়, তবে চিত্রকরের সময়সংক্ষেপ ও পরিশ্রমের লাঘব হইবে বটে, কিন্তু সে চিত্র দেখিয়া নিশ্চয়ই কেহ বলিবেন না, 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।' স্থাপত্য সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। যদি বলা যায় যে, শাস্ত্রানুযায়ী মন্দিরগাত্রের চারি পার্শ্বে দশটি করিয়া স্তম্ভের যোজনা করিতে হইবে, তাহা হইলে স্থপতির কল্পনা যে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেন না, স্থপতি জানেন যে, সৌধের গাত্রস্থ স্তম্ভের সংখ্যা জানালা বা কুলুঙ্গির সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

ভারতবর্ষে যে কেবল সূত্রাকারে স্থাপত্য-বিধি নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে; রোমক দেশেও এইরূপ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় যুগের কিছু পূর্ব্বে ভিট্রুভিয়াস গ্রীক্ ও রোমান্ স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তনা করিয়া স্থাপত্যশিল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু য়ুরোপ অপেক্ষা ভারতে বিধিনিষেধের অধিকতর প্রভাব দৃষ্ট হয়; এবং মধ্যযুগেও এদেশীয় নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে খিলানের প্রচলন ছিল না বলিয়াও, বৈচিত্র্য হিসাবে স্থাপত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খিলান বলিতে আমরা এ স্থলে কেন্দ্রগ ইষ্টক বা প্রস্তর (radiating voussoir) নির্ম্মিত খিলানের কথাই বলিতেছি।

এই বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে একটী আপত্তির কথা এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন যে, বৈচিত্র্যকে যদি এত প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, বা অনুপাতানুযায়ী সমস্থান-রক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার দুরূহ, এবং অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া উঠে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্যামিতিক সামঞ্জস্য বিষয়ে মনোযোগ দিলেই যে কোনও সৌধের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইবে, তাহা কখনই যথার্থ নহে, এবং অনেক স্থলে তাহার প্রয়োজনীয়তাই দৃষ্ট হয় না। নিমন্ত্রণ-বাটীতে নিমন্ত্রিতের বসিবার আসনে জ্যামিতিক পারিপাট্য দেখিলেই নিমন্ত্রণ-

কর্ত্তার কর্ত্তব্য সাধিত হইল না; আদর, আপ্যায়ন ও ভোজ্য বস্তুর পারিপাট্য ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। স্বরবৈচিত্র্যেই সঙ্গীতের উন্মাদনা-শক্তি স্ফুরিত; একটানা সুরে কাহারও হৃদয়গ্রাহী হয় না; ভিন্ন ভিন্ন সুরগুলি কেমন সুন্দর ভাবে মিশিয়া এক প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতরূপ 'একক'-এর সৃষ্টি করে। সৌধ সম্বন্ধেও এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। একই প্রকার বোধিকা বা 'মাত্‌লা'-যুক্ত স্তম্ভের অরণ্য বা বিরাট সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ দেখিলেই কখনও মনে করা উচিত নয় যে, স্থাপত্যশিল্পের ললামভূত আদর্শ নয়নগোচর হইল। ইহা অপেক্ষা অল্পায়তন দশটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপে আমরা শিল্পের অধিকতর মনোহর লীলা প্রকটিত দেখি। যদি কেহ চালুক্যদিগের নির্ম্মিত, বিশেষতঃ জকনাচার্য্য-কল্পিত মণ্ডপ পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, পূর্ব্বোক্ত উক্তি সত্য কি না। মহিসুরস্থ বেলুড় বা হালেবিডের মন্দিরে স্তম্ভগুলির বৈচিত্র্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়; এগুলি উৎকীর্ণ করিবার সময় স্থপতি নিশ্চয়ই চিন্তা করিতেছিলেন যে, বৈচিত্র্য না থাকিলে কোনও সৌধই হৃদয়গ্রাহী হইবে না। এই স্তম্ভগুলিতে বোধিকা, কাণ্ড, বা অধিষ্ঠানগুলির অসংখ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ইহার পর যদি কেহ শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চী বা চিদম্বরমের বহু স্তম্ভযুক্ত বিশাল মণ্ডপগুলি পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, চোল ও চালুক্য রীতির মধ্যে কত প্রভেদ, এবং কি জন্যই শেষোক্ত রীতি এত মনোহর।

বিজয়নগর-নরপতিদিগের রাজত্বকালে বৈচিত্র্য-প্রকাশের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়, এবং এই সময়ে দক্ষিণভারতের স্থাপত্য রীতিতে যে প্রাণের সঞ্চার হয়, তাহা মৃতপ্রায় শিল্পের আবার বহুবর্ষব্যাপী জীবনদানের সূচনা করে। যে সমস্ত প্রভাবের ফলে বিজয়নগরীয় নরপতিদিগের সময়ে স্থাপত্যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, আমরা সে সকল কথার অবতারণা করিতেছি না; আমরা দেখিতেছি যে, স্থপতিকে বিধিনিধানের নিগড় হইতে অনেকটা মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই, স্থাপত্যে এত দূর উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। যাঁহারা কাঞ্চীর বরদরাজ মন্দিরের মধ্যে মহারাজ শ্রীকৃষ্ণদেব মহারায় নির্ম্মিত দোলমণ্ডপ দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, স্তম্ভগুলি অনেকগুলি ক্ষুদ্রায়তন স্তম্ভের সমষ্টিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। এই যে সনাতননিয়মপ্রবর্ত্তিত প্রথা হইতে বিভিন্ন প্রথার অনুসরণ, ইহাতে স্থাপত্যের দিব্যশ্রী কি অধিক বিকশিত হয় নাই? খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্বকালীন বার্‌হুত তোরণের স্তম্ভকল্পনায়ও এই প্রকার অভিনব রীতির সূচনা দেখি;

ইহাতে স্তম্ভগুলিকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, তাহা অনুভব করিবার জন্য আমি পাঠকগণকে কলিকাতায় মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-শাখা-গৃহ সন্দর্শন করিতে বলি।

সৌন্দর্য্যবিকাশে বৈচিত্র্যের প্রভাব কিরূপ, বুঝিবার অল্পবিস্তর চেষ্টা করা গেল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুদ্ধ বৈচিত্র্য বা বহুত্বে সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহার মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই সৌন্দর্য্যের আধার। যেমন পরমাণুর সমষ্টির বিশেষ কোনও মূল্য নাই, কিন্তু সেগুলি আণবিক আকর্ষণ দ্বারা যখন সংহত পদার্থে পরিণত হয়, তখনই তাহাদের মূল্য; সেইরূপ অসম্বদ্ধ বৈচিত্র্য দ্বারা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ত দূরের কথা, সৌধটি বিসদৃশ প্রতীয়মান হয়। বৈচিত্র্যগুলি এমন ভাবে স্থাপিত ও সম্বদ্ধ করিতে হইবে, যেন তাহারা সূত্র দ্বারা গ্রথিত 'মণিগণাঃ'র ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আর একটী কথা স্মরণে রাখা উচিত; পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে ইহা অন্যরূপ। বৈচিত্র্যগুলি এমন ভাবে স্থাপিত করিতে হইবে, যেন সৌধের একটী বিশিষ্টতা বা অনন্যসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে। মানব-জীবনে যেমন বিশিষ্টতা না থাকিলে তাহা সাধারণের প্রিয় হয় না, তেমনই সৌধগুলি একই ছাঁচে নির্ম্মিত হইলে তাহা কখনই লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধক হইতে পারে না। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে ভ্রমণ করিতে গিয়া Model House Square নামক পল্লীর বাটীগুলির একই ভাবের গঠনপ্রণালী দেখিয়া বিশেষ বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে মানুষের বসতি না হইয়া যদি পণ্যদ্রব্য রক্ষিত হইত, তাহা হইলে আপত্তির কারণ হইত না; সেগুলি হইতে কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত ও ন্যূনাধিক শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত—মচ্ছিভবন, লালবারোদারী, বা ছত্রমঞ্জিল প্রভৃতি লক্ষগুণে উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর বিশিষ্টতা-যুক্ত। এগুলিকে আমি স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া গণ্য করি না; তথাপি আধুনিক যুগে প্রবর্ত্তিত ইষ্টকস্তূপ অপেক্ষা অনেকাংশে মনোজ্ঞ ও মার্জ্জিতরুচির পরিচায়ক।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

গোলাপী ওড়না।

আমি ইংরাজীতে বলিতেছিলাম, 'হাঁ হাসান! তুমি কি উহাকে দেখিতে পাইতেছ না? মেয়েটি যে এখনও রাস্তার ও পারে ওই দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।' ক্ষণিক ঔৎসুক্যে বিহ্বল হইয়া, আমি মুসলমান 'গাইড্'টির বাহু স্পর্শ করিয়া সেই মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলাম।

হাসান অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে, অলস ভঙ্গীতে একবারমাত্র লক্ষ্যাভিমুখে চাহিয়া, বিজ্ঞের গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিল, 'আপনি কি বলিতেছেন হজুর? কৈ, দোকানের সম্মুখে ত কিছুই নাই। শুধু খানিকটা রৌদ্র দুয়ারের ভিতর দিয়া বুড়া বেন্ হাজের প্রকাণ্ড দেহটার উপর গিয়া পড়িয়াছে।'

আমি আর কি বলিব? চাহিয়া দেখি, যুবতীর কজ্জল-কল্পিত নেত্রদ্বয় তখনও পথ পানেই নিবদ্ধ। রাস্তা দিয়া পীতপাদুকাধারী এ দেশী লোক ও ভারবাহী অশ্বতর প্রভৃতি কত যে চলিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। সাধারণ আরব-রমণীগণের ন্যায় এ মেয়েটি মুখ ঢাকা লম্বা ঘেরা টোপে আবৃত নহে। তাহাদের সে 'হাইকে'র পরিবর্ত্তে ইহার গায়ে গোলাপী রঙের সূক্ষ্ম ওড়্না, চোখে সুর্‌মা, হাত দুখানি মেহেদি পাতায় রঞ্জিত। বক্ষাঞ্জলি হইয়া, ললিত ভঙ্গীতে, তখনও সে একই ভাবে দাঁড়াইয়া।

হাসানকে বলিলাম, 'সে কি বাপু! দিনের বেলায়, প্রকাশ্য স্থানে, সম্মুখের এক জন লোককে মোটেই দেখিতে পাইতেছ না! এও কি কখনও হয়? তুমি যে তাহার দিকেই তাকাইয়া আছ!' হাসান পূর্ব্বেরই ন্যায় স্থিরভাবে বলিল, 'আমি ত শুধু বেন্ হাজ্ বুড়াকেই দেখিতেছি—ওখানে ত আর কেহই নাই।' তাহার শরীর কাজ করা জমকাল নীল উর্দ্দিতে ধূলা লাগিয়াছিল—সে আর আমার কথা খেয়াল না করিয়া সযত্নে তাহাই ঝাড়িতে লাগিল। হাসানের এই 'খাতির নদারৎ' ভাব দেখিয়া আমার বড়ই রাগ হইতেছিল, আমি বলিতে যাইতেছিলাম, 'কোথাকার আহাম্মক তুমি', কিন্তু কথা কয়টি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমার যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল—দেখিলাম, অপর এক ব্যক্তি সেই অপরিসর দ্বার-পথে প্রবেশ করিতেই তরুণী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল। এরূপ সঙ্কীর্ণ দুয়ার দিয়া দুই জনের এক সঙ্গে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। দ্বার অতিক্রম করিয়াই বেন্ হাজের অন্ধকারপ্রায় বিপণী, ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণের নয়নাভিরাম চীনাংশুক প্রভৃতি চারুবস্ত্রে সজ্জিত। এই ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যেই স্থূলাকৃতি বেন্ হাজ তাহার দেহের সেই কম্পমান মেদপুঞ্জ স্তব্ধ করিয়া, বসিয়া বসিয়া সারা দিন কোরাণ পাঠ করে।

হাসান অনুযোগের সহিত তাহার সুগঠিত হস্ত দুইটি বিস্তার করিয়া বলিল, 'কি আছে না আছে তা এখন ত দেখিতেছেন হজুর!' তাহার সে ঘাড় বাঁকানর ভঙ্গী নির্ব্বোধ অজ্ঞ বিদেশীর প্রতি অশেষ অনুকম্পায় পরিপূর্ণ। সম্মুখ দিয়া কয়েকটি গর্দ্দভারূঢ় শীর্ণকায় মলিনবর্ণ বালক, তাহাদের নিরীহ বাহনগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে করিতে

তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি এই অনতিদীর্ঘ রাসভ-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, রৌদ্রোত্তপ্ত রাজপথের অপর পারে সেই স্বল্পালোকিত পণ্যশালার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দোকানের ভিতর চারি দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও স্ত্রীলোকের চিহ্নমাত্র নাই; শুধু বৃদ্ধ বেন্ হাজ অবদ্‌গণের ন্যায় গদীর উপর 'আসনপীড়ি' হইয়া বসিয়া চারখানা টুইডের পোষাক পরা এক জন বিদেশী ভ্রমণকারীর অতি হাস্যকর ভ্রমপূর্ণ আরবী 'বোল্ চাল' মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছে। অনুজ্জ্বল রৌপ্যসূত্রখচিত, এক খণ্ড গোলাপী ক্রেপের চাদর দরজার নিকট লৌহ কীলকে আলুগা ভাবে ঝুলিতেছিল। হাসান তাহার স্বাভাবিক ভব্যতার সহিত আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতেছিল, 'সাহেব লোকের ভারী জিদ, হুজুরকে ত আমি কালই বলিয়াছিলাম যে, আরবেরা 'ঔরৎ'দের মুখ না ঢাকিয়া কখনও বিনা 'বোর্খা'র পথের ধারে দাঁড়াইতে দেয় না, আমরা কি হারামী য়েহুদী, না—' বিচক্ষণ 'গাইড' তাহার কথা শেষ না করিয়াই অভিনিবেশসহকারে সিগারেট পাকাইতে লাগিল। আমি অবশ্য তখনই বুঝিলাম যে, স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ না করিলেও সে মনে মনে 'য়েহুদী'র পর 'খ্রীষ্টান' শব্দটিই জুড়িয়া দিয়াছে।

বন্দর হইতে সহরের প্রান্তস্থিত বাজার পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ অপরিসর রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। আমি সে দিন—সেই স্বর্ণাভ-সৌরকর-প্লাবিত পথে—জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম। হাসানকে বলিলাম, 'আজ এই তিন দিন মেয়েটিকে একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম।' হাসান তৎক্ষণাৎ আমার উক্তি সংশোধন করিয়া বলিল, 'হাঁ, হুজুরের এই লইয়া, তেসরা বার দেখা হইল বলিয়া মনে হইতেছে।'

আমি তাহার কথাগুলি যেন শুনিতে পাই নাই, এইরূপ ভাব দেখাইলাম। হাসানের সহিত তর্ক করা নিরর্থক। এই কয় দিন বহুবার তাহার কবল-মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া, অবশেষে অসম্ভব বোধে সে আশা ত্যাগ করিয়াছি। বরং বিনা মেঘে বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু একবার সে কাহারও সঙ্গ লইলে, হাসানের সাহচর্য্য-ত্যাগ সম্ভব নহে। মধ্যাহ্নে আহারান্তে দোতালার কক্ষসংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়াইয়া, নিম্নের রাজপথে কয়েকটি অতি শীর্ণ মেষের দর-দস্তুর লইয়া, সৌম্যমূর্ত্তি দীর্ঘশ্মশ্রু আরব কৃষকগণের বিচিত্র বাহ্বাস্ফোট ও ধীবররমণীসুলভ অকথ্য ভাষায় পরস্পরের প্রতি অঙ্গভঙ্গীসহকারে আক্রমণ সকৌতুকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, হঠাৎ চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভিবাদননিরত হাসানের লাল তুর্কীটুপি বায়ুতাড়িত ভূচম্পকবৎ সবেগে আন্দোলিত হইতেছে।

ইঙ্গিতমাত্র হাসান নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, 'হুজুর কি এখন একবার সহরের দিকে বেড়াইতে যাইবেন?' তাহার সে মৃদুকণ্ঠের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বাধ্য হইয়া জানাইতে হইল যে, এ গরমে বাহির হওয়া আমার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। হাসান আমার আপত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে নিতান্ত মোলায়েম ভাবে নিবেদন করিল, 'সে কি হুজুর, কি বলিতেছেন আপনি? গরম কোথায়? এখন তো দরিয়ার হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আমাদিগকেও সমুদ্রকূলাভিমুখেই যাইতে হইবে। সেখানে কাফিখানায়

আমাদিগের অপেক্ষায় এক জন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছে।' এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমি সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কি আর জিব্রাল্টারের জাহাজ আসিয়াছে না কি?' হাসান কোনও অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের সূচনা করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'হাঁ, জীব্রাল্টারের ষ্টীমার আসিয়াছে শুনিয়াছি, এবার না কি অনেকগুলি মেমসাহেব সমুদ্রপীড়ায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ ব্যক্তি কিন্তু জীব্রাল্টারবাসী নহে। সেই যে আপনি গোলাপী ওড়না-ওয়ালা মেয়েটিকে দেখিয়াছিলেন—এ তাহারই পরিচিত।' বিস্ময়গর্ব্বিতের ন্যায় আমি একটু আস্ফালনসহকারেই কহিলাম, 'তবে না তুমি তাহাকে একবারেই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলে? বলিয়াছিলে, তেমন কোনও লোকের অস্তিত্বই নাই।'

হাসানের মুখে সেই পূর্ব্ববৎ ধীর প্রশান্ত ভাব; সে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ করিয়া কোনও গোপনীয় কথাই সহজে প্রকাশ হইবার নহে। হাসান সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'নাই যে, সে কথা মিথ্যা নয়, তবে ছিল বটে।'

বাক্যব্যয় নিষ্ফল জানিয়া তাহার সহিত কাফিখানায় যাওয়াই সাব্যস্ত করিলাম। যাইবার সময় বেন্ হাজের দোকানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আজ আর সেখানে কেহই উপস্থিত নাই —নিস্তব্ধ ঘরটিতে বেন্ হাজ একেলা বসিয়া আছে—মনে হইল, ভিতর হইতে বাতাসে যেন ঈষৎ মৃগনাভির গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

নীল রঙ ও সাদা চূণকামে সমুদ্রতীরের এই ছোট্ট কাফিখানাটি ছেলেদের খেলাবাড়ীর ঘরের মতই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ভিতরে কেহই নাই—শুধু জমকাল উর্দ্দিপরা এক জন সুপুরুষ আরব সিপাহী ছোট একটা টেবিলের ধারে বসিয়া কাফি পান করিতেছে। আমি হাসানকে বলিলাম, 'কৈ হে, এখানে ত কেহই অপেক্ষা করিয়া নাই।' সে অঙ্গুলিসঙ্কেতে সিপাহীটিকে দেখাইয়া বলিল, 'এ যে আমাদের জন্যই এতক্ষণ এখানে বসিয়া আছে, তাহা সে নিজেই জানে না।'

হাসানের ব্যাখ্যায় সে রহস্য-কুহেলিকা যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। 'গাইড' তাহার চেয়ারখানি আমার আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, 'শুনুন হুজুর-আলি, আজ সকালে আপনার কাছ হইতে বিদায় লইবার পর অনেক নূতন খবর জানিতে পারিয়াছি।' এইটুকু বলিয়াই কথা বন্ধ রাখিয়া হাসান কাফিখানার কিশোর পরিচারককে কাফি আনিতে আদেশ করিল। সেই সময়ে এক জন জুতা-বুরুশওয়ালা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই সে দ্বিধামাত্র না করিয়া তাহাকে তাহার ধূলিমণ্ডিত পাদুকাযুগল বুরুশ করিয়া দিতে বলিল। আমার খরচে আমীরীচালে চলায় হাসান এই কয় দিনেই বেশ বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

আমি অধৈর্য্য হইতেছি দেখিয়া সে অবশেষে রীতিমত গল্প জুড়িয়া দিল। গল্প ত নয়, পুরাদস্তুর 'রোমান্স'।—প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বেন্ হাজ এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীর পাণিপীড়ন করিয়া, তাহার ষোল আনা মালিকত্ব লাভ করিয়াছিল। তেমন রূপসী বোধ হয় বেহেস্তের হুরীগণের মধ্যেও মিলে না। সে হরিণেক্ষণার নিকট 'গেজেল' মৃগও যেন লজ্জা পাইত। সমুদ্রপথে অর্ণবপোতের ন্যায়, বেন্ হাজের হৃদয় তরণী—তাহার সেই স্থূল মেদাবরণ ভেদ

করিয়া অতি সরল ও দ্রুতগতিতে এই নবপরিণীতা তরুণীর প্রতি অগ্রসর হইতেছিল। বৃদ্ধের অপর পত্নীদিগের রত্নালঙ্কার সমস্তই তরুণীর দেহসজ্জার জন্য নিয়োজিত করিয়াও সে সেই সুযৌবনা, সুলোচনার মনোহরণ করিতে সমর্থ হইল না। সিপাহীটি কোণে বসিয়া আপন মনে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিল—হাসান তাহাকে দেখাইয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, 'এই সৈনিকই তাহার প্রণয়াস্পদ।' শুনিয়া লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। সিপাহী বাস্তবিকই সুপুরুষ বটে—এমন প্রণয়ী পাইলে অনেক যুবতীই আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করে। কাঁচা সোনার মত বর্ণ, অনতিস্থূল দেহখানি চিত্র-শার্দ্দূলের ন্যায় পেশল ও নমনীয়। অঙ্গুলির নখগুলি তরুণীজনের করাগ্রভাগের ন্যায় লাল বর্ণে রঞ্জিত। চিবুকাগ্রে রেশমবৎ সুচিক্কণ কৃষ্ণ-শ্মশ্রুর আবির্ভাবমাত্র সূচিত হইয়াছে—হাঁ, এ দেশের আরবগুলা দেখিতে সুশ্রী বটে।

হাসান বলিতেছিল, 'মাস দুই পরে রাস্তার ধারে কাঁটা গাছে ফুল ফোটার ন্যায় উহাদের 'আশেক' হঠাৎ এক দিন 'তামাম' হইয়া গেল। তার পর কি করিয়া জানি না—কোন্ পাখীতে বেন্ হাজের মনে সন্দেহ-বীজ ছড়াইয়া দিয়াছিল—সে ক্রমে এই গুপ্ত ঘটনার সংবাদ পাইল।'

হাসান তাহার সযত্নসংরক্ষিত হস্ত দুইখানি বিস্তারিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'কি আর বলিব হুজুর, সেই হইতেই সিদি আবদুল্লা এইখানে বসিয়া, রমজানের সময় 'ভূখা' লোকের মত সাত দিন পূর্ব্বেকার পুরাতন 'আকবর' (খবরের কাগজ) পাঠ করিয়া থাকে।'

আমি বলিলাম, 'বেন্ হাজের সেই বড় সাধের নবীনা বধূর হইল কি ?'

হাসান শিহরিয়া উঠিয়া সতর্কতার সহিত কহিল, 'সে হয় ত এখন 'বেহেস্তে' কি আর কোথাও। ত্রস্তা স্ত্রীর তালাক্ ও মৃত্যুদণ্ড উভয়ই প্রচলিত আছে। আমি এ সবের আর কিছুই বলিতে পারি না, শুধু এইমাত্র জানি, বেন্ হাজের দুয়ারের ধারে যে লাল ওড়্নাটি ঝুলিতে দেখেন—সেটি তাহারই ছিল।'

আমি সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এ সব খবর পাইলে কি করিয়া ?'

হাসান দুষ্ট বালকের ন্যায় এক-গাল হাসিয়া বলিল, 'আমার 'দোস্ত' বন্ধু বড় কম নাই—বেন্ হাজের বাড়ীর যে লোকটির কাছে এ সংবাদ পাইয়াছি, সেও কিন্তু এ ওড়্না দুয়ারে টাঙ্গাইয়া রাখার প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা জানে না।'

আমি যেন একটু চিন্তামগ্নভাবে বলিলাম, 'তাহার দোকানের সম্মুখ দিয়া গমনাগমনকালে বেন্ হাজ হয় ত যুবককে প্রতিবার জানাইয়া দিতে চায় যে, তাহার 'মাশুক'কে সে চির দিনের জন্যই হারাইয়াছে;—সে যাহা হউক, এ ওড়নাটি আমাকে কিনিয়া দিতে হইবে। হাসান তাহার লাল টুপীর কাল থোপনাটী সবেগে সঞ্চালিত করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, 'না হুজুর, এই কার্য্যটিই পারিব না—সিদি আবদুল্লা কত বার লোক পাঠাইয়া বেন্ হাজের কাছে উহা যে কোনও দামে কিনিতে চাহিয়াছে, কিন্তু বুড়া কিছুতেই বেচিতে সম্মত হয় নাই।'

আমি বলিলাম, 'আমার কিন্তু ওটি না হইলেই চলিবে না। প্রতিদিন কিছু আর গোলাপী ওড়্না-ঘেরা ছায়ামূর্ত্তি পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায় না; আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও মানিয়া লইতে হইতেছে যে, বেন্ হাজের দুয়ারের সম্মুখে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা প্রেতাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ওড়্নাটির অভাবে হয় ত তাহার পরলোকেও গতি হইতেছে না।'

হাসান একটু উদ্বিগ্নভাবেই বলিল, 'না সাহেব, ভূত প্রেত কিছুই নাই। মানুষ অবশ্য জীবিত মৃত দুই রকমই দেখা যায়, কিন্তু ভূত আমি মানি না। হয় ত সূর্য্যের আলোকে আপনার চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল, এবং ওড়নাখানিও হয় ত বাতাসে নড়িতেছিল, তাই হঠাৎ দেখিয়া আপনার এই সব মনে হইয়াছে।' বলিতে বলিতে হাসান দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, 'দেখুন, আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসিয়াছে—বোধ হয় হুজুরকে ওড়্নাটি যোগাড় করিয়া দিতে পারিব, কিন্তু এ কাজ বড় সহজে হইবে না।'

তাহার সে শঠতাপূর্ণ সূক্ষদৃষ্টির প্রকৃত অর্থ আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহাকে যথোচিত বখ্‌শিসের লোভ দেখাইলাম। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে হাসান আমার নিকট ওড়্নাখানি আনিয়া দিল।

এই সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের সেদিনকার সে সজীব ভাব আর নাই। আমার ক্রোড়ে উহা অসাড় ভাবেই পড়িয়া রহিল, কেবল কস্তুরীর একটা ফিকা গন্ধ—কাহার উষ্ণ করস্পর্শের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। আমি হাসানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁহে, এটি যোগাড় করিলে কি করিয়া?' হাসান কল্পিত বিনয়ের সহিত মুখ নত করিয়া কহিল, 'বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই হুজুর। আমি বুড়াকে বলিলাম, "দেখ, তোমার দুয়ারে টাঙ্গান এ গোলাপী ওড়্না কোনও গোলাপী করপল্লবের সঙ্কেতের ন্যায় পথচারী প্রণয়ী জনকে সর্ব্বক্ষণ আশান্বিত করিতেছে"—শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ ওড়্নাখানি বেচিয়া ফেলিল।'

হাসানের উক্তির শেষাংশ তাহার সেই সঙ্কেতচিহ্ন দ্বারা প্রণয়ী জনকে আশান্বিত করিবার কথাটি যেন কিছুক্ষণ ধরিয়া আমার কানে বাজিতে লাগিল।

হঠাৎ আমার কি ঝোঁক চাপিল, জানি না—বলিলাম, 'দেখ হাসান, তোমার ত বুদ্ধির অভাব নাই—আমার অনুরোধে আর একটি কাজও তোমায় করিতে হইবে। কাল ইংরাজদিগের গোরস্থানে আমার সহিত সিদি আব্দুল্লার একবার সাক্ষাৎ করাইবার ব্যবস্থা কর।'

হাসান অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সে কি হুজুর! এ আবার আপনার কি নূতন খেয়াল!'

আমি এ কথার জবাব না দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবে বলিতে লাগিলাম, 'দেখ, সিদি আব্দুল্লাকে জানাইবে যে, ইংরাজদিগের গোরস্থানে লোকসমাগম নাই বলিয়াই আমি উহা সঙ্কেতস্থান রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি—আর সেই সঙ্গে বলিও, তাহাকে উপহার দিবার উপযোগী কোনও দ্রব্য আমার নিকট রহিয়াছে, সেই জন্যই তাহাকে কষ্টস্বীকার করিয়া আসিবার নিমিত্ত এই অনুরোধ।'

রাত্রিসমাগমে, 'গাইড্'প্রবর—আমার এই নূতন প্রস্তাবে নানা রূপ আপত্তি জানাইয়া—

তাহার স্বপক্ষমোদিত দেহভার লইয়া প্রস্থান করিলে, কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই। হঠাৎ জাগিয়া দেখি, আমার কক্ষটি চন্দ্রালোকে আলোকিত—আর সেই কৌমুদীপ্লাবিত গৃহ-কুট্টিমে রজতদীপ্তিশালিনী এক জ্যোৎস্নাময়ী রমণীমূর্ত্তি। তাহার পেলব করপল্লবের ঈষৎ-সঞ্চালনজনিত কিঙ্কিণীর কণ-কণ শব্দ তখনও আমার কানে বাজিতেছিল। আমি ওড়নাখানি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম—দেখিলাম, সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জরীর কাজ করা পা'ড়ের ধারে ধারে হাত দিয়া কি যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। আমি হঠাৎ একটু নড়িতেই রমণী আমার দিকে মুখ ফিরাইল—দেখিলাম, যেন্ হাজের বিপণিদ্বারে যে মুখখানি দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম—এ সেই মুখ। আমি অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিতেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। রহিল শুধু মেজের উপর খানিকটা অস্পষ্ট চাঁদের আলো।

আমি সকালে উঠিয়া ওড়নাখানি হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, জরীর পাড়ের এক অংশ যেন অন্য দিকের চেয়ে একটু বেশী মোটা। পাড়ের ধারে ধারে সামান্য একটু সেলাই খুলিতেই দেখিলাম, খুব চাপিয়া ভাঁজ করা একখানি আরবী লেখা ক্ষুদ্র কাগজ তাহার ভিতর লুকান রহিয়াছে। আমি নিজে অবশ্য আরবী পড়িতে জানি না, কিন্তু দেখিয়াই মনে হইল যে, এ পত্র স্ত্রীলোকের লেখা—প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে লিখিত। এ সম্বন্ধে আমার আর কোনও সন্দেহই ছিল না, তাই সেই পত্রখানি আর হাসানকে দেখাইয়া তর্জ্জমা করিয়া লইলাম না। ভাবিলাম, দেখি, আজ বিকালে দেখা সাক্ষাতের পর কি দাঁড়ায়।

তখন সৌরকরমণ্ডিত শান্তিমগ্ন সমাধিক্ষেত্রটি যেন পাহাড়ের উপর ক্লান্তভাবে ঝিমাইতে-ছিল। ভিতরের পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া ফুলগাছের 'কেয়ারি'র ভিতর দিয়া চারি দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৃণমণ্ডিত হরিত ক্ষেত্রে শ্বেত 'ডেজী' পুষ্পের ন্যায় দূরাগত শুভ্র সমাধিপ্রস্তরসমূহ যেন মাথা তুলিয়া সন্তর্পণে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। আমার অনতিদূরেই একটা সদ্যঃখনিত সমাধিগহ্বর। পার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে লাল ফুলের পাপড়ীগুলি তাহার ভিতর যেন কাহার রক্ত অশ্রুর ন্যায় নিপতিত হইতেছিল। অন্যমনা হইয়া একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেছিলাম, পদশব্দ শুনিয়া, পশ্চাতে চাহিতে না চাহিতেই, সিদি আক্‌রা তাহার সৈনিকোচিত পরিচ্ছদে—অকস্মাৎ বায়ুপথে সমাগত বিশাল নীলবর্ণ পতঙ্গের ন্যায় আমার পার্শ্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদবকায়দায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সে আমাকে সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন?' উচ্চারণে ও কথায় স্বরে বুঝিলাম, তাহার ইংরাজী বলার ক্ষমতা হাসানের অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। আমি সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া 'সিরিঙ্গা' বীথির মধ্যস্থিত অপর একটা রাস্তার পার্শ্বে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলাম। আক্‌রাকে কাগজ-মোড়া ওড়নাটি দেখাইয়া বলিলাম, 'ইহার ভিতর যে জিনিসটি রহিয়াছে, তাহা আপনি হয় ত পাইলে আনন্দিত হইবেন।' সে কহিল, 'হাসান আমাকে এ সম্বন্ধে সকল কথাই বলিয়াছে—মুখে আর কি জানাইব, আপনার নিকট আমার এ ঋণ শোধ হইবার নহে।' সৈনিকের কণ্ঠস্বর সদ্য উৎপন্ন রেশমসূত্রের ন্যায় কোমল।

আমি বলিলাম, 'হাসান আপনাকে সমস্তই জানাইয়াছে বটে, কিন্তু দেখুন, সেলাই করা জরীর পাড়ের ভিতর হইতে আমি এই আর একটী জিনিস পাইয়াছি।' এই বলিয়া তাহার হাতে মোড়ক করা সেই ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডটি অর্পণ করিলাম।

আব্দুল্লা সাগ্রহে সেখানি আমার হাত হইতে লইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই স্বর্ণসূত্রগ্রথিত যোদ্ধ্‌বেশের চাকচিক্যমান জরী কাজের উপর যেন মরীচিমালী তাঁহার তির্য্যগ্‌গামী কিরণবাণ বর্ষণ করিয়া আমাকে যেন অপাঙ্গভঙ্গীতে সপরিহাসে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। পাঠান্তে আব্দুল্লা জানাইল যে, তাহার প্রণয়িনীর ইহাই শেষ লিপি।

তাহার সেই মরুকুসুম এই পত্র দ্বারা জানাইয়াছে যে, বেন্ হাজের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের মিলনে অন্তরায় হইতে পারিবে না—আর যদি মৃত্যুই ঘটে, তাহা হইলে সে 'বেহেস্তে' তাহার প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করিবে।

সিপাহী গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'দেখুন, এই পত্র লেখার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, আজ্‌রায়েল (মৃত্যু-দূত) তাহাকে লইয়া গিয়াছে, নতুবা সে কোনও না কোনও প্রকারে ইহা আমার নিকট পাঠাইয়া দিত।'

আমি অস্তোন্মুখ রবির রক্ত কিরণে দীপ্ত, বিচিত্র রূপালী কাজ করা, গোলাপী ক্রেপখণ্ডটি তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'লও, এ তোমারই, আমার ইহাতে আর অধিকার নাই।' তরুণীর মুখমারুতের ন্যায় মৃগমদের সেই ফিকা গন্ধ তাহার মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আব্দুল্লা তখনই বহির্গমনপথে প্রস্থান করিল। সমাধি-ক্ষেত্রের ফটকে দাঁড়াইয়া সে যখন দুয়ার খুলিতেছিল, তখন কোথা হইতে খানিকটা গোলাপী কুয়াসা তাহার নিকট আসিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল।

তাহার পর সে যখন গিরিগাত্র বাহিয়া উপত্যকার পথে নামিয়া যাইতেছিল, তখন যেন দেখিলাম এক জন জীবিতা রমণীই তাহার সঙ্গিনী। সে সময় এ কথা, আবশ্যক হইলে, আমি হলফ্‌ লইয়াও বলিতে প্রস্তুত ছিলাম। অন্ততঃ একটী বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। সে নগরে অবস্থানকালে আরও কত বার বেন্ হাজের দোকানের সম্মুখ দিয়া গিয়াছি, কিন্তু সেই সুন্দরী পরলোকবাসিনীর আর কখনও সাক্ষাৎ পাই নাই। *

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

চিত্রবিদ্যা।

চিত্রস্থ মানব প্রভৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণাদি সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে। সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিলে চিত্র সম্বন্ধে একখানি বড়

* Louise Hellgers প্রণীত গল্পের অনুবাদ।

পুস্তক হইতে পারে। আমরা শিল্পের পরিচয়মাত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুতারাং বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টিতার পরিচায়ক কতিপয় বিষয় এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত করিব।

শাস্ত্রে আদেশ আছে যে, রাজাদিগকে মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত করিতে হইবে।* তাঁহাদের শরীর চক্রবর্ত্তিলক্ষণযুক্ত হইবে। হস্ত জালপাদের মত হইবে। তাঁহাদের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঊর্ণা (আবর্ত্তচিহ্ন) দেখাইতে হইবে। তাঁহাদের উভয় হস্তের মধ্যে তিনটী করিয়া মনোহর রেখা দেখাইতে হইবে; ঐ রেখাগুলি শশকের রক্তের মত বর্ণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কেশগুলি তরঙ্গের মত ভঙ্গী-যুক্ত, সূক্ষ্ম, ইন্দ্রনীলমণির মত বর্ণযুক্ত, স্বাভাবিক তৈলাক্তভাববিশিষ্ট ও দক্ষিণা-বর্ত্ত-তরঙ্গান্বিত হইবে। চক্ষুর আকার সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার কথিত হইয়াছে। চাপাকার (ধনুরাকার), মৎস্যোদরসদৃশ, উৎপলপত্রসদৃশ, পদ্মপত্রসদৃশ ও শশাকৃতি। তন্মধ্যে চাপাকার চক্ষু তিন যব পরিমিত; মৎস্যোদর চক্ষু চারি যব পরিমিত; উৎপলপত্র চক্ষু ছয় যব পরিমিত; পদ্মপত্র চক্ষু নয় যব পরিমিত, এবং শশাকৃতি চক্ষু দশ যব পরিমিত করিতে হয়। স্বকীয় অঙ্গুলি মানানুসারে যবমান বুঝিতে হইবে। যোগস্থ ব্যক্তিদিগের চক্ষু 'চাপাকার'; কামীদিগের ও নারীদিগের চক্ষু 'মৎস্যোদরাকৃতি'; নির্বিকারচিত্ত ব্যক্তির চক্ষু 'উৎপলপত্রাভ'; ত্রস্ত ব্যক্তির ও রোদনকারী ব্যক্তির চক্ষু 'পদ্মপত্রনিভ'; এবং ক্রুদ্ধ ও বেদনাপীড়িত ব্যক্তির চক্ষু 'শশাকৃতি' হওয়া আবশ্যক।

দেবতাদিগের চক্ষু মনোজ্ঞ, বিশাল, প্রসন্নতাব্যঞ্জক কৃষ্ণবর্ণ-তারাযুক্ত ও পদ্মপত্রপ্রান্তের মত হইবে। উভয় চক্ষু সমান, গোক্ষীরবর্ণসদৃশ ও পক্ষ্মযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

দেবতার চিত্র পূর্ব্বোক্ত হংসের প্রমাণানুসারে করিতে হইবে। তাঁহাদের চক্ষুর পক্ষ্ম ও ভ্রূদ্বয়, এই কয় স্থানে লোম অঙ্কিত হইবে। তাঁহাদের আকৃতি ষোড়শবর্ষীয়ের মত হওয়া আবশ্যক।

চিত্রে দেবতার আকৃতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, রাজাদিগের রূপও সেইরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। অধিকন্তু নৃপতিদিগের গাত্রে লোম অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। ঋষি, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, দানব, মন্ত্রী, পুরোহিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্, ইঁহাদের আকৃতি পূর্ব্বোক্ত ভদ্রের প্রমাণানুসারে অঙ্কিত করিতে হইবে। ঋষিদিগের আকৃতি জটাজুটশোভিত হইবে। তাঁহাদের গাত্রে কৃষ্ণাজিন

* নৃপাশ্চ সর্ব্বে কর্ত্তব্যা মহাপুরুষলক্ষণাঃ।

উত্তরীয় বস্তরূপে দেখাইতে হইবে, এবং আকৃতি দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক ও তেজস্বিতা-দ্যোতক হওয়া আবশ্যক। দেবতাদিগের ও গন্ধর্ব্বদিগের মস্তকে মুকুট থাকিবে না। ব্রাহ্মণদিগের পরিধানে শুক্ল বস্ত্র ও শরীর ব্রহ্মবর্চ্চস-(বেদাধ্যয়নজনিত তেজ)-যুক্ত হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রী, পুরোহিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত হইবেন। পরন্তু ইঁহাদের মস্তকে মুকুটের পরিবর্ত্তে উষ্ণীষ থাকিবে। দৈত্য দানবদিগের মুখ ভ্রূকুটীভীষণ ও চক্ষু গোলাকার। তাহাদের বেশ অত্যন্ত ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক। ভদ্রের পরিমাণানুসারে বিদ্যাধরের আকৃতি অঙ্কিত করিতে হয়। ইহাদের প্রত্যেক ছবিই পত্নী-সহিত ও মাল্যা-লঙ্কারে ভূষিত হইবে। কিন্নর, সর্প ও রাক্ষস, ইহাদের আকৃতি মালব্যের পরিমাণানুসারে অঙ্কনীয়। এই স্থলে যে সর্পের কথা বলা হইয়াছে, উহা সর্পসংজ্ঞক মনুষ্য। নাগকন্যা উলুপীকে অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। অত্রত্য উরগও সেই জাতীয় মনুষ্য। রুচকের প্রমাণানুসারে যক্ষের মূর্ত্তি অঙ্কনীয়। প্রধান মানবের আকৃতি শশকের প্রমাণানুসারে অঙ্কিত হইবে।

পিশাচ, বামন, কুব্জ ও প্রমথ, ইহাদের আকৃতি ও রূপ প্রসিদ্ধ নিয়মানু-সারে চিত্রনীয়। উক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের প্রমাণানুসারে, অর্থাৎ যাহাতে পুরুষের সহিত সামঞ্জস্য হয়, তদনুরূপ চিত্রিত করিতে হয়।

কিন্নর সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে এক শ্রেণী মনুষ্যমুখ; অপর শ্রেণী অশ্বমুখ। মনুষ্যমুখদিগের শরীর ঘোড়ার মত, এবং অশ্বমুখ-দিগের শরীর মনুষ্যের মত। অশ্বমুখদিগের শরীর সর্ব্বালঙ্কারভূষিত। ইহা-দিগকে দ্যুতিমান ও গীতবাদ্যযুক্তরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। রাক্ষসের আকৃতি ভীষণ, বিকলচক্ষু ও ঊর্দ্ধকেশযুক্ত। দেবাকৃতি সর্পগণ ফণাযুক্ত। যক্ষগণ অলঙ্কারযুক্ত। দেবতাদিগের গণ অর্থাৎ পারিষদবর্গ নানা প্রকার জন্তুর মুখযুক্ত। তাহাদের বেশ, আয়ুধ, ক্রীড়া ও কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ একরূপই হইবে। তাহারা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাসুদেবগণ বাসুদেবের সমানাকৃতি; সঙ্কর্ষণগণ তৎসমানাকৃতি; প্রদ্যুম্নগণ তৎসমানাকৃতি; এবং অনিরুদ্ধগণ তাহার সমানাকৃতি। বাসুদেবগণের বর্ণ নীলোৎপলের মত শ্যামবর্ণ; সঙ্কর্ষণগণের উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ; প্রদ্যুম্নগণের মরকত-মণির বর্ণ ও অনিরুদ্ধগণের সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ।

বেশ্যাদিগকে রুচকের পরিমাণানুসারে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহা-দিগের বেশ উৎকট-শৃঙ্গারভাব-ব্যঞ্জক করিতে হয়।

কুলস্ত্রীদিগকে মালব্যের মানানুসারে লজ্জাবতী রূপে অঙ্কিত করিতে হয়। তাহাদের গাত্রে অলঙ্কার দেখাইতে হইবে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সমুন্নত হইবে না। দৈত্য, দানব প্রভৃতির স্ত্রীও তাহাদের অনুরূপ। বিধবা স্ত্রীদিগের আকৃতি পক্বকেশযুক্ত, সর্ব্বালঙ্কাররহিত ও শুক্লবস্ত্রপরিহিত রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে।

প্রায় প্রত্যেক জাতিরই আকার প্রভৃতির নিয়ম কথিত হইয়াছে। এই প্রকরণের উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, যাহা বলা হইল, উহা কেবল অদৃষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অর্থাৎ, যাহা সর্ব্বদা দেখা যায় না, তাহারই এই নিয়ম। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তদাকারেই অবিকল চিত্রিত করিতে হয়। চিত্রাঙ্কনে সাদৃশ্যই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। * বিশেষ-রূপে বিবেচনা করিয়া দেশ, নিয়োগ, স্থান, কর্ম্ম, আসন, শয়ন, যান ও বেশ দেখাইতে হয়। আকাশের চিত্র বিবর্ণ ও পক্ষিগণাকুল দেখাইতে হইবে। কিন্তু রাত্রিকালের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল দেখাইতে হয়। জাঙ্গল, আনূপ প্রভৃতি ভূমিকে তত্তৎলক্ষণযুক্ত করিতে হইবে। ছয় ঋতু, নব রস প্রভৃতি প্রত্যেকের লক্ষণ চিত্রকর্ম্মে অভিহিত হইয়াছে।

চিত্রে কোন কোন পদার্থ বর্ণক অর্থাৎ রঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ আছে। এই প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, স্বর্ণ, রজত, তাম্র, অভ্র, রাজবর্ত্ত (?) (রাজপট্ট মণিবিশেষ), সিন্দুর, সীসক, হরিতাল, সুধা (চূণ), লাক্ষা, হিঙ্গুল ও নীল, এবং আরও অনেক প্রকার পদার্থ রঞ্জন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। † লৌহ পদার্থের, অর্থাৎ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু পদার্থের পত্রবিন্যাস ও রসক্রিয়া, এই দুই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে। (অত্যন্ত পাতলা পাত করিয়া তদ্দ্বারা চিত্রের স্থানবিশেষ আবৃত করা 'পত্র-বিন্যাস' শব্দে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়) লৌহের বিন্যস্তক্রিয়া অর্থাৎ পত্ররূপে ব্যবহার কঠিন; কিন্তু দ্রাবণক্রিয়া সহজ; দ্রাবণ হইলে, অর্থাৎ স্বর্ণ প্রভৃতি পদার্থকে গালাইয়া তরল করিলে, তদ্দ্বারা লেখন অর্থাৎ

---

* চিত্রে সাদৃশ্যকরণং প্রধানং পরিকীর্ত্তিতম্ ।

† রঙ্গদ্রব্যাণি কনকং রজতং তাম্রমেব চ ।
অভ্রকং রাজবর্ত্তং (রাজপট্টং) চ সিন্দুরং ত্রপুরেব চ ॥
হরিতালং সুধা লাক্ষা তথা হিঙ্গুলকং নৃপ ।
নীলং চ মনুজশ্রেষ্ঠ তথান্যে বস্তবোনেকশঃ ॥

চিত্রে অঙ্কন অনায়াসে হইতে পারে। * এই উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে গালাইয়া, তাহাদিগকে তরল করিয়া, তদ্দ্বারা লেখন অর্থাৎ অঙ্কন করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তরলতা-সম্পাদন ও তাহার স্থায়িত্ব-রক্ষার প্রণালী 'বন্তনা' শব্দের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। † রঙ্গ পদার্থের স্থায়িত্ব-রক্ষার উপায়ও বন্তনা শব্দে সূচিত হইয়াছে। বন্তনার কতকগুলি উপকরণও কথিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের এই স্থলটি এতই অশুদ্ধিবহুল যে, উহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রকরণের উপসংহারে কথিত শ্লোকার্দ্ধের অর্থ হইতে এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, উপযুক্ত-বন্তনা-যুক্ত চিত্র জলের দ্বারা ধৌত হইলেও নষ্ট হয় না, এবং অনেক বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে। ‡

সাধারণতঃ চিত্রের চারি প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে। § তন্মধ্যে প্রথম 'সত্য'; দ্বিতীয় 'বৈণিক'; তৃতীয় 'নাগর'; এবং চতুর্থ 'মিশ্র'। দীর্ঘাকার ফলকে (ফ্রেম্) উপযুক্ত প্রমাণানুসারে, অবিকল অবস্থার ব্যঞ্জক মনোরম লোকসাদৃশ্য অঙ্কিত হইলে, ঐ চিত্র 'সত্য' নামে কথিত হয়। ঐ শ্রেণীর চিত্রই যদি চতুরস্র ফলকে উপযুক্ত প্রমাণাদিযুক্ত হইয়া অনুল্বনাকৃতি অর্থাৎ 'জাঁকজমক'-রহিত রূপে অঙ্কিত হয়, তবে উহা 'বৈণিক'। গোলাকার ফলকে অঙ্কিত দৃঢ়াবয়বব্যঞ্জক অল্পমাল্যভূষণযুক্ত চিত্র 'নাগর'। মিশ্রলক্ষণান্বিত চিত্র 'মিশ্র।' চিত্র-নির্ম্মাণে তিন প্রকার বর্ত্তনা (তুলির টান বলিয়া মনে হয়) কথিত হইয়াছে। ইহা যথাক্রমে পত্রা, হৈরিক ও বিন্দুজ নামে অভিহিত। তন্মধ্যে পত্রাকৃতি-রেখাবিশিষ্ট বর্ত্তনা 'পত্রা'; সূক্ষ্ম রেখা 'হৈরিক'; বন্তনাযুক্ত 'বিন্দুবর্ত্তনা।' [স্থায়িরূপে বিন্দু বিন্দু দাগ দেওয়া বিন্দুবর্ত্তনা বলিয়া মনে হয়।] প্রথমতঃ রেখাপাত; তৎপরে বর্ত্তনা; উপযুক্ত ভূষণবিন্যাস ও বর্ণক (বর্ণ-প্রলেপ) চিত্রের ভূষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে গৃহে নানা প্রকার চিত্র রাখিবার রীতি দেখা যায়। কিন্তু

---

* সম্পুটং লোহবিন্তস্ত মত্রকং (সুকরং) দ্রাবণং ভবেৎ।
এবং ভবতি লোহানাং লেখনে কর্ম্মযোগ্যতা॥

† দেশে দেশে মহারাজ কার্য্যাস্তে বন্তনাযুতাঃ।

‡ ধৌতং জলেনাপি ন নাশয়েৎ, তিষ্ঠত্যনেকানি চ বৎসরাণি।

§ সত্যং চ বৈণিকঞ্চৈব নাগরং মিশ্রমেব চ।
চিত্রং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং তস্য বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

পূর্ব্বকালে সকল গৃহে সকল প্রকার চিত্র রক্ষিত হইত না। শৃঙ্গারাদি নব রসের ব্যঞ্জক চিত্রের মধ্যে কেবল শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্ত রসের চিত্র গৃহে স্থাপিত হইত। * বিধান এই যে, রাজার সভাগৃহে ও দেবালয়ে সমস্ত রসের চিত্র অঙ্কিত করিবে; কিন্তু রাজার ও সাধারণের বাসগৃহে যুদ্ধ, শ্মশান, দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি, কুৎসিতাকৃতি ও অমঙ্গল-ব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কিত করিবে না। আরও একটী বিশেষ উপদেশ এই যে, নিজের হাতে নিজের গৃহে কখনও চিত্র অঙ্কিত করিবে না। †

রুচিভেদে চারিটী বিষয় চিত্রে প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আচার্য্যগণ অর্থাৎ চিত্রবিদ্যাবিশারদগণ রেখাপাতেরই প্রশংসা করেন। অন্যান্য বিচক্ষণগণ বর্ত্তনার প্রশংসা করেন। স্ত্রীলোকেরা ভূষণের বাহুল্য পছন্দ করে, এবং সাধারণ মানবগণ বর্ণের চাকচিক্য ভালবাসে। ‡

সমস্ত কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্র প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের প্রদায়ক। § চিত্রসূত্র-কার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পর্ব্বতের মধ্যে যেমন সুমেরু শ্রেষ্ঠ, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড় শ্রেষ্ঠ, এবং মানুষের মধ্যে যেমন রাজা প্রধান, তেমনই সমস্ত কলার মধ্যে চিত্র প্রধান। ¶ পূর্ব্বে যুদ্ধ প্রভৃতির চিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত হইত যে, তাহা দেখিয়া অতীত ঘটনাও প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। মহাভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে কংসের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রেও কংসের ও কৃষ্ণের উদগূর্ণ (যাহার উদ্যম করা হইয়াছে) ও নিপতিত প্রহার দেখিতে পাওয়া যায়। ‖ অর্থাৎ, চিত্র দেখিয়া মানুষ বুঝিতে পারে যে, কৃষ্ণ ও কংস উভয়ে প্রহারের উদ্যম ও প্রহার করিতেছেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

* শৃঙ্গারহাস্যশান্তাখ্যা লেখনীয়া গৃহেষু তে।

† চিত্রকর্ম্ম ন কর্ত্তব্য মাত্মনা স্বগৃহে নৃপ।

‡ রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাং চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্য মিতরে জনাঃ।

§ কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।

¶ যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাম্ যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশঃ তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ।

‖ চিত্রেষ্বপি উদগূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য কৃষ্ণস্য চ।—মহাভাষ্য ৩।১।২

তরজমা।

১

কেহ কেহ 'তর্জমা'কে 'অনুবাদ' কহিয়া থাকেন। কিন্তু তর্জমার সহিত অনুবাদের একটু তফাৎ আছে। 'অনুবাদ' শব্দের ভাব আমরা 'বাদানুবাদ' নামক পুরাতন কথার মধ্যে পাই। অর্থাৎ, অনুবাদ করিতে গেলে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 'তরজমা'র মধ্যে বিসংবাদের লেশমাত্র নাই।

উদাহরণ। 'ম্যাও' নামক বিড়ালের ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ইহার অনুবাদ হয় না। ভাষান্তর করিলেও ইহা মিউ (Mew) কিংবা 'ম্যাও' থাকিয়া যায়। তবে তরজমা করিলে ইহা The peculiar sound uttered by cats এইরূপে দাঁড়ায়। সেইরূপ 'ব্রহ্ম' এই শব্দের 'God' বলিলে ঠিক অনুবাদ হয় না। তবে 'Immanent' oversoul of the Hindu Vedanta philosophy'—ইহা বলিলে অনেকটা 'তরজমা' হয়। সেই রকম 'বাবু, মিন্‌সে, মুখপোড়া, ড্যাক্‌রা, ম্যাড়াকান্ত প্রভৃতি অনেক কথার অনুবাদ অসম্ভব। ঠিক অনুবাদ কিংবা এক কথায় ভাষান্তর করিতে গেলে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। অনেক ইংরাজী কথা আছে, যাহার অনুবাদ করা কঠিন। যেমন 'Shades of thought', 'Ethical conception of State', 'Psychological Hedonism' প্রভৃতি।

এক একটা কথার মধ্যে জাতীয় জীবন সংগঠিত, এবং সম্বদ্ধ। সুতরাং এক ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করিতে হইলে হয় ত একটা কিম্ভূতকিমাকার নূতন কথার সৃষ্টি করিতে হয়; নচেৎ তাহার ভাবের তরজমা করিতে হয়। আর একটা উপায়, কথাটাকেই নিজের ভাষার মধ্যে গ্রহণ করা।

প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত যে, ভাবের উদয়ের পূর্ব্বে কোনও ভাষার উৎপত্তি হইতে পারে না। বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির ন্যায় ভাষা স্বভাবতঃ মানসিক ক্ষেত্র হইতে অঙ্কুরিত হয়। জাতীয় জীবনের সহিত ভাষার ক্রমবিকাশ। ঈশ্বর দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, কিংবা ঈশ্বরের মধ্যেই জগৎ গজাইয়া উঠিয়াছিল, এই কথা লইয়া যেমন বাজে তর্ক বিতর্ক, মানব দ্বারা ভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল কি না, তাহা লইয়াও সেই প্রকার তর্ক বিতর্ক। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা দর্শন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বেদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়

নাই, লাঙ্গূলের পূর্ব্বে বানরত্বের সৃষ্টি হয় নাই; তবে পরবর্ত্তী যুগে লাঙ্গূল খসিয়া যাইতে পারে। এইরূপ নানাবিধ বাক-বিতণ্ডা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, ভাষা যদিও মূর্ত্তিমন্ত মানবের পরবর্ত্তী লক্ষণ, তথাপি আমরা বলিতে পারি না যে, মানব ঘরে বসিয়া কাঁথার মত ভাষা রচনা করিয়াছে।

এ ত গেল ভাষার সৃষ্টি সম্বন্ধে মতভেদ। কিন্তু তরজমা এবং অনুবাদ আমাদিগের সমসাময়িক প্রণালী। সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কোনও বিদেশীয় গ্রন্থ দেশে উপস্থিত হইলে তাহা আমরা অনুবাদ করিতে বসি। ইহার প্রণালী কি?

মনে করুন, একটা গ্রন্থ না আসিয়া এক জন বিদেশীয় লোক এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আমাদিগের কি রকম মনে হয়? হুয়েন্ সাং, সার টমাস্ রো, মাহমুদ গাজনী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে যে রকম মনের ভাব হয়, ঠিক সেই রকম। প্রথমে আমরা তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঠিক করি যে, এটা একটা মনুষ্য জাতিবিশেষ। ইহাতে খুব আনন্দ হয়। জগৎ দেখিয়া তত আনন্দ হয় না; কেন না, জগৎ মনুষ্যের মত নয়, এবং ক্রমাগত তাহার কেন্দ্রস্থলে কোনও মনুষ্যের মত জীব কিংবা ঈশ্বর আছে কি না, তাহাই সাব্যস্ত করিতে আমাদিগের বহু যুগ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য দেখিলেই আমরা মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারি। যদি তাহার নাসিকা উন্নতও না হয়, কিংবা হস্তে ছয়টা অঙ্গুলি থাকে, তথাপি আমরা স্থির জানি যে, সে একটা 'বিচারশক্তিবিশিষ্ট জীব' (Rational animal)।

অতঃপর আমরা তাহার কথা শুনিতে চাহি। কথা না শুনিলে মনুষ্যত্বের পরিচয় হয় না। মনে করুন, কেহ নববধূকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলে প্রথমে তাহার কথা শুনিতে চাহে। হয় ত সে কথা ভাল করিয়া কহে না, কিন্তু অর্দ্ধপরিস্ফুট সলজ্জ কথার জন্যই সকলে কত পাগল! সেই প্রকার বিদেশী কোনও লোক আসিলে আমরা তাহার কথা শুনিতে ভালবাসি।

সে কথা কহিল। 'Good morning, dear sir, I have come here for a prospecting lease'। তখন আমরা উৎফুল্ল হইয়া খোরজা মহাশয়কে বলিলাম, 'খোরজা, এ লোকটা অতিথি। ইহার বক্তব্য কি, বুঝিয়া লও।' খোরজা বলিলেন, আমি একটু ইংরাজী জানি বটে, কিন্তু অতিথির

মনের কথা আমি অনুবাদ করিয়া দিলে তোমরা বুঝিবে না। *'Prospecting lease'* এই শব্দের অনুবাদ হয় না। যদি কোনও দেশে খনিজ পদার্থ থাকে, এবং তাহা যদি ভূগর্ভ খনন করিয়া পাওয়া যায়, এবং প্রাপ্ত হইলে তাহার কারবার করিয়া কত লাভালাভ সম্ভব, তাহা বিচার করা যায়, এবং মালিকের সহিত তাহার ঠিকাচুক্তি করিয়া একটা লেখা-পড়া হয়, এবং তাহা রেজেষ্ট্রী করা হয়, তাহা হইলে সেই দলীলকে আমরা Prospecting lease বলিতে পারি। ইহা এক প্রকার তরজমা। কিন্তু অনুবাদ অসম্ভব। কারণ, আমাদের এ তল্লাটে কোনও খনিজ পদার্থ নাই, সুতরাং তাহার কারবারও নাই, লাভালাভও নাই। দলীল দস্তাবেজও নাই।

অতিথির সঙ্গে আমার মিল হইল না। সে মনুষ্য বটে, তবে তাহার কথা আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু অনুবাদ না হউক, তর্জ্জমা না হউক, তাহার কথা মানবের কথা। অতিথি মানব। অতএব অতিথির ভাব গ্রহণ না করিতে পারিয়াও তাহাকে আমরা গৃহে অভ্যর্থনা করিলাম। সে বাস করিল। তাহার উদ্দেশ্য, কর্ম্ম ও কর্ম্মপ্রণালী, সকলই ক্রমে বুঝিলাম। খনিজ পদার্থের অন্বেষণ করিয়া পাইলাম। কারবারে প্রবেশ করিলাম। এবং অবশেষে অতিথির সঙ্গে মিশিয়া তাহার Prospecting lease কথাটা হুবহু স্বীয় ভাষায় গ্রহণ করিলাম।

এখন ভাবিয়া দেখুন, যদি বিদেশীর পরিবর্ত্তে তাহার রচিত একখানা গ্রন্থ এ দেশে আসে, তাহা হইলে বিদেশীর কথার ন্যায় সেই গ্রন্থ আমরা অনুবাদ করিতে বসি। যতটুকু তাহার মধ্যে আমার জীবনের সহিত মিলিয়া যায়, তাহার অনুবাদ করি।

অনুবাদ না হইলে তর্জ্জমা করি। কিন্তু তর্জ্জমা করিতে হইলে যদি আমার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান তাহার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে একটা অভাবের উৎপত্তি হয়। কথাটা মনে থাকে, কিন্তু ভাবটা মনে উদয় হয় না। তাহার কারণ, বিদেশী স্বয়ং মানব-রূপে আমার গৃহে উপস্থিত নাই। সুতরাং ঠিক জায়গায় আমরা কথাটা খাটাইতে পারি না। যদি খাটাই, তবে বিদেশীর নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি।

এই জন্য 'I love you' এ কথাটা কোনও বিদেশীয়া অবিবাহিতা কুমারীকে বলিলে তাহার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং সে যদি তোমাকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তবে তোমার আতঙ্ক উপস্থিত হওয়া খুব

সম্ভব। অনেক দিন একত্র সমাজে থাকিয়া পরস্পরের ভাব গ্রহণ ও প্রতিগ্রহণ করিয়া, এক জন অন্য জনের সহিত মিশিয়া না গেলে, ভাষার সংমিশ্রণ অসম্ভব। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন অনুবাদ অসম্ভব। তর্জ্জমা কতকটা সম্ভব। তর্জ্জমা কি? কেবল ভাষারই তর্জ্জমা নহে, মানবের ব্যক্তিগত ভাবের, তাহার আচার ও ব্যবহারের, তাহার প্রাণবৃত্তির, এমন কি, পূর্ব্বসংস্কারের এবং ধর্ম্মের পর্য্যন্ত তরজমা হইতে থাকে।

২

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, অনুবাদ এক প্রকার 'বিবাহ'। দারপরিগ্রহ। প্রথমে গলগ্রহ, অবশেষে বন্ধন। তবে তরজমার মধ্যে দাম্পত্য কলহ এবং দ্বন্দ্ব কম। অনুবাদের মধ্যে মহা গোলযোগ। যেমন একটা বিদেশী স্ত্রী ঘরে আনিলে প্রথমে মাতার সহিত কলহ উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিদেশী ভাষা স্বীয় মাতৃভাষায় অনুবাদ করিলে, মাতৃভাষা হরিনামের মালা লইয়া রন্ধনশালায় গিয়া বসিয়া থাকে। নব পুত্রবধূর ভাবভঙ্গী অবাক হইয়া দেখে, এবং তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া মুখ বিকৃত করে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ পরিণাম। ক্রমে অনুবাদের পরে তরজমা আরম্ভ হইলে বধূ ঘরের মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

রঘুনাথপুর নামক গণ্ডগ্রামে পূর্ব্বে বালিকাদিগের বিদ্যালয় ছিল না। তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ম্যাকার্টিস্ সাহেব এবং সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী মিস্ ত্রৈলবিলা পাকড়াশী উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রাম্য সমাজ ইতিপূর্ব্বে বক্তৃতা নামক পদার্থ দুই একবার শুনিয়াছিল। সমবায়-সমিতির, কৃষিকার্য্যের উন্নতির, পঞ্চায়েতী কমিটীর বহুবিধ বক্তৃতা, দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের চাষাভুষা, মহাজন ও জমীদার ও তদীয় গৃহলক্ষ্মীগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাহেব ও 'গুরুমা'র আবির্ভাবে কেহ বিচ(লিত) হয় নাই। দলে দলে সকলে আসিয়া মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত বৃত্তিগুলির সাহায্যে বক্তৃতার ভাব গ্রহণ করিল। যথা—Differentiation, assimilation, integration, conception, এবং তৎপরে পরস্পরের লব্ধজ্ঞান Judgment নামক ন্যায়শাস্ত্রান্তর্গত সূত্রে প্রকাশ করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে আমরা সেই সময় উপস্থিত ছিলাম।

বিস্তীর্ণ মণ্ডপ। গ্রামের জমীদার নৃসিংহ রায়। তদীয় পুত্র রাখাল রায় সবুজ বর্ণের কোট পরিধান করতঃ উপবিষ্ট। গ্রাম্য স্কুলের বনওয়ারী মাষ্টার।

তস্য ভগ্নী ক্ষেমঙ্করী। গোমস্তা হরিচরণ। প্রজা নকুল মণ্ডল। ভট্টাচার্য্য দক্ষিণেশ্বর। নাপিত, ধোপা, কলু এবং চতুর্ব্বর্ণের সহিত ছত্রিশ জাতি এবং তাহাদের সহিত জোলা ও মুসলমান সকলেই উপবিষ্ট। বিষয় 'Compulsory Education'।

ম্যাকার্টিস্ সাহেব তাঁহার বক্তৃতার লিপি অনুবাদপূর্ব্বক প্রচার করিতে-ছিলেন, এবং মিস্ পাকড়াশী তাহা তর্জ্জমা করিতেছিলেন। পরস্পরের সাহায্যে বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইল।

ম্যাকার্টিস্ সাহেব বলিলেন—'হে মণ্ডলীযুক্ত বর্ণাশ্রম জাতি, সম্প্রদায় ও বিশ্বাস! (assembled castes, sects and creeds) আপনারা নিরাপদে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি-গহ্বরে বাস করিতেছেন (peaceful seclusion)। অদ্য আপনাদের সমক্ষে একটা প্রচার (mission) লইয়া উপস্থিত। তাহার নাম 'বলপূর্ব্বক শিক্ষা' (Compulsory education)।

'শিক্ষা তিন তরহ (kinds),—শারীরিক (physical), মেধাবিশিষ্ট (intellectual), এবং আবধৌতিক (moral)। আপাততঃ তোমরা উর্দ্ধবর্ণিত ত্রিগুণেরই বাহ্য (wanting in all the three qualities)। কিন্তু মনে কর, আপনারা এই রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের নাগরিক (citizens of the state), এবং রাজনৈতিক প্রজা (political subjects)। একটা সুন্দর উদাহরণ দেখুন। সাম্রাজ্যরাষ্ট্র একটা গাছ। প্রজা তাহার শাখা প্রশাখা। তাহাদের মধ্যে পরস্পরের ঘাতিক-প্রতিঘাতিক-কর্ম্ম-প্রণালী (coordination) আছে। গাছ নড়িলে প্রজা নড়ে। প্রজা নড়িলে গাছ নড়ে। প্রজার স্বাস্থ্য গাছের স্বাস্থ্য। প্রজার মেধা গাছের মেধা। প্রজার নীতিও গাছের নীতি। ইহার নামই ত্রৈরাশিক শিক্ষা (three-fold education)। ইহা পাইতে তোমরা বাধ্য।

'কিন্তু বাধ্যের মূলে বাধক বেদনা আছে। (the pain of restraint)। সেই জন্যই 'বলপূর্ব্বক' (compulsory) এই কথা পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়াছে। তাহাও সুন্দর উদাহরণ উপস্থিত করিয়া তোমাদের ভ্রমকে বায়ু দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছি (shattering to the winds)। যেমন মাতৃস্তন্যপায়ী বালক। সে যদি অষ্ট ঘটিকা পর্য্যন্ত নাসিকা গহ্বরের মধ্যে নিদ্রা যায়, (snoring) তবে তাহার বলবান জননী বেণীকণ্টক (hair pin) দ্বারা পুত্রকে খোঁচা মারিয়া শয্যা হইতে উত্থান করে। ইহাতে বালক মনে করে যে, তাহার

স্বাধীনতা কিংবা ইচ্ছাশক্তির অরাজকতা (freedom of will) নষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু মাতা তৎক্ষণাৎ কহে, "হে বৎস! ইহাতে তোমার স্বাধীনতার হীনতা হয় নাই, বরং তন্দ্রাভিভূত অসৎপ্রবৃত্তির সহিত সম্মুখ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া তুমি সেনাপতির তালিকার মস্তকে আরোহণ করিয়াছ (at the top of the list of military men)।" এই কথা শুনিয়া পুত্র কহে, "মা! বলপূর্ব্বক আমাকে এই শিক্ষা দ্বারা আঘাত করাতে আমার জ্ঞান-চক্ষুর আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে (insight has increased)।" ইহা কহিয়া সে কৃতজ্ঞতার গরম চক্ষুজল (warm tears of gratitude) প্লাবিত করে, এবং পুনঃ পুনঃ কহে, "ভালবাসাই স্বাধীনতা, ভালবাসাই স্বাধীনতা।" ইহাতে মাতা পুনর্ব্বার বলে, "আবশ্যকীয়তা আবিষ্কারের জননী (necessity is the mother of invention)"।'

যদিও ম্যাকার্টিস্ সাহেব বঙ্গভাষায় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং যদিও তাঁহার সরল অনুবাদ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তথাপি, 'মা'র কথা শুনিয়া এবং 'ভালবাসা'র কথা শুনিয়া সকলের চক্ষু জলাকীর্ণ হইয়া পড়িল। মিস্ পাকড়াশীর মনে একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। 'মাতৃত্ব' ভাবটাই সুন্দর। যে মাতৃত্ব পদে বরণীয়া নহে, সে রমণীর সংসারে স্থান কোথায়? পরহিতে জীবন কাটাইলেও জননীর মত পুত্রের উপর জোর থাকে না।

ম্যাকার্টিস্ সাহেব প্রজাদিগের চক্ষুজল দেখিয়া বলিলেন, 'তোমাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া আমি আত্মাকে ধন্য মনে করিতেছি। যদিও বঙ্গভাষায় আমার মনের উৎপত্তি হয় নাই (grown in the Bengali language), কিন্তু ভাষাতে ব্যুৎপত্তি আছে, এবং তাহা দ্বারাই তোমাদিগের চক্ষু আক্রমণ করতঃ জল বাহির করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার অদ্যকার প্রচারের মুকুটধারী গৌরব (crowning glory)!

'এক্ষণে আমি কি করিয়া সজোরে শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে, তাহার একটি ভূগোলবৃত্তান্ত (graphical description) তোমাদিগের চক্ষুতে উপহার দিব (present to your eyes)। তোমাদের জীবিকানির্ব্বাহ কৃষিকার্য্য। কৃষিক্ষেত্রই তোমাদের ভূগোল। যেমন জনক রাজা, সীতার পিতা, কৃষিকার্য্য করিতে গিয়া কন্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেই উদাহরণ দ্বারা আপনারা শিক্ষা নামক সীতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের মহিমান্বিত কীর্ত্তি

পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া যাইবেন (leave a glorious fame behind you), এবং ইতিহাসে মৃত্যুহীনতা লাভ করিবেন (immortal in history)। সকলে একটা সমিতি করিয়া অঙ্গীকার উচ্চারণ করুন (utter a vow) যে, অদ্য হইতে শিক্ষার নিমিত্ত কোনও প্রস্তরই উল্টাইয়া রাখিব না (no stone unturned), এবং যদি কেহ যোগ না করে, তবে সেই অধম ব্যক্তিকে জাতিবহির্ভূত করিয়া দিব (outcasted)। গর্দ্দভের প্রভু, (washerman), ক্ষৌরকর্ম্মকারক (barber), তৈলনিষ্পেষণকারক (oilman), কুম্ভকর্ণ (potter), চর্ম্মপাদুকানির্ম্মাণক (cobbler), সকলেই শিক্ষালাভ করিয়া চরম হইবেন (attain perfection), এবং যত দিন না হন, তত দিন বিদ্রোহিনী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তর্ক বিতর্ক করিতে থাকিবেন। এই আমার বক্তৃতা। এখন মিস্ পাকড়াশী সরল ভাষায় ইহার তর্জ্জমা করিয়া দিবেন।'

৩

মিস্ পাকড়াশী রুমাল দ্বারা নয়ন ও মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করিয়া সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—'ম্যাকার্টিস্ সাহেব তাঁর বক্তব্যের সারাংশ আপনাদের উপহার দিয়েছেন। আমি তাঁর মনোবিজ্ঞানটুকু বুঝিয়ে বলব।

'শিক্ষা অনেকটা দারপরিগ্রহের মত। পাশ্চাত্য রেনাসেঁর সময় এটার উত্তালতরঙ্গমালা ইউরোপ প্লাবিত করেছিল, তার পরেই অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু আপনারা ইতিহাস জানেন না বলিয়া তাহার ভাবটুকু "তরজমা" করিয়া দিব।

'এখন তরজমাটুকু সুরু করি। আমার বক্তৃতা তৈরী করিয়া আসি নাই, সে জন্য আপনাদের হৃদয়গ্রাহী না হ'তে পারে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের কোনও একটা উদাহরণ লইয়া কথাটা বুঝানো যেতে পারে। সেই উদাহরণটা আপাততঃ দারপরিগ্রহ বলিয়া ধরা যাক্।

'কথাটা এই। শিক্ষা সম্বন্ধে সকলেরই একটা চৈতন্য আছে। মূর্খ থাক্‌লে মনে স্বতঃই একটা কষ্ট হয়। তাই, মা সন্তানকে বলে, "ওরে মূর্খ থাকিসনে, লেখা পড়া শিখে বিয়ে কর।" আবার ভেবে দেখুন, 'জগৎটা কি?' এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার প্রবৃত্তি আমাদের অতিশয় বলবতী। কেবল লেখা পড়া শিখ্‌লেই জ্ঞান লাভ হয় না, 'জগৎটা কি' এই কথা ভালরকম ক'রে বুঝতে হ'লে গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিষ্ঠা দরকার। এক একটা দ্বন্দ্ব, কোলাহল, সম্পদ, বিপদ, আত্মীয়বিয়োগ ও কলহের মধ্যে এত ভাবনা

উপস্থিত হয় যে, আমরা তা হতেই অনেক জ্ঞান লাভ করি। শেষে দেখতে পাবেন যে, ইচ্ছাশক্তি প্রচালনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করা শক্ত কাজ। মানুষ স্বাধীনতা ভালবাসে, কিন্তু স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝে না। তাই ম্যাকার্টিস্ সাহেব বলেছেন, যে স্বাধীনতার মূলে প্রেম। যেটাকে আমরা অধীনতা মনে করি, প্রেমের রাজ্যে তাহাই স্বাধীনতা। কতকগুলি নৈতিক পথ আছে, তাহাই অনুসরণ না কর্‌লে প্রেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। এই 'অনুসরণ করাটুকু' প্রথমতঃ অধীনতা বলে মনে হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে আমরা স্বাধীন হয়ে পড়ি। স্ত্রী এই প্রেমটুকু শিখিয়ে দেয়। যত দিন তা না ঘটে, দ্বন্দ্ব কলহের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ স্বামী স্ত্রীকে দমন কর্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রেমের বলে সে স্বাধীনভাবে থাকে। আমি সতীর কথা বল্‌ছি। যার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে যতই মূর্খ হউক না কেন, স্বামীকে সৎপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ সতীর প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে ভরা। তবে আপনারা তাদের উপর অত্যাচার কেন করেন? এতে বুঝা যায় যে, আপনারা এখনও স্বাধীনতা লাভ করেন নি। অত্যাচার করা স্বাধীনতা নহে। নৈতিক পথের, ধর্ম্মের পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই স্বাধীনতা। ক্রমে আমাদের চৈতন্য হয়, "আমরা একটা অন্যায় কাজ করেছি।" শিক্ষা যে মানবজীবনের পক্ষে দরকার, তাহা এখানেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

'এখন উদাহরণটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। শিক্ষা সকলের পক্ষে দরকার। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই পক্ষে। স্বামী একখানা পুস্তক, স্ত্রী তাহা লইয়া 'তরজমা' করে। স্ত্রী একখানা পুস্তক, স্বামী তাহা লইয়া 'তরজমা' করে। উভয়ে উভয়ের মনোভাব একত্র করে' তার পার্থক্য দেখে। যত দিন মনের মিল না হয়, তত দিন ঝগড়াঝাঁটী হয়। এ ঝগড়াঝাঁটীর মূলে 'অনুবাদ'। স্বামী পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে লাঙ্গলটা ধপাস্ ক'রে ফেলে দিয়ে, হয় ত মদের ভাঁটীতে চ'লে গেল, কিংবা শয্যাগত রুগ্ন স্বামীকে ফেলে স্ত্রী যাত্রা শুন্‌তে চ'লে গেল, তখন এক জন আর এক জনকে অভিশপ্ত করে। সেই ভাবটুকু, যা দিয়ে তারা অভিশাপ দেয়, তার ঠিক কথা নাই। কিন্তু তর্‌জমা করে দেখ্‌লে তার মধ্যে অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে যে সব বহি পড়িয়া থাকি, তার মধ্যে প্রেমের কিছু না থাক্‌লে দূর করে ছুঁড়ে ফেলি। সেই রকম স্বামী স্ত্রীকে অনুবাদ ক'রে ফেলে দেয়। কিন্তু প্রেমের সঞ্চার হ'লে তারা পরস্পরকে তর্‌জমা করে খুসী হয়।

'জাতীয় জীবনের মধ্যে সেটা বুঝতে পারা যায়। যাহারা টেবিলে বসে' কাঁটা চামচ দিয়া খায়, ফ্লানেলের পাজামা ও কোট পরিধান করে' দিন রাত্রি কাটায়, তাদের ভাবভঙ্গী অনুবাদ করে' আমরা চটিয়া উঠি। মনে করি, তারা অল্পদিন পূর্ব্বে বৃক্ষে থাক্‌ত, তাদের বড় বড় নখ ছিল, তারা গাছের ডাল্‌কে চেয়ার করে', এবং কাঁটা চামচ স্বরূপ নখর দ্বারা কদলী বিদ্ধ করে' অন্ন গ্রাস করত। ফ্লানেলের পরিবর্ত্তে তাদের লোম ছিল। আবার তারা মনে করে, আমরা পূর্ব্বে মাটীর উপর আসন পেতে খাস খেতুম, এবং রৌদ্রতাপে আমাদের লোম উঠে যেত। এগুলো অনুবাদ। অর্থাৎ, বানরের অনুবাদ "monkey", এবং গরুর অনুবাদ "cattle"। কিন্তু তরজমা করে দেখ্‌লে এ দ্বন্দ্ব চুকে যায়। তরজমা কর্‌তে গেলেই আমরা বল্‌ব, "ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, সেই জন্য ওটা ওদের স্বভাব।" তারা বল্‌বে, "এরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক, তাই এটা এদের স্বভাব।" এই শিক্ষাটুকু লাভ হ'লে তাদের "Dinner table" আমরা "আসন" এই কথা দিয়েই বুঝাব, এবং তাহারা আমাদের "কুশাসন"কে "dinner table" দিয়াই বুঝাবে।

'একটা দৃষ্টান্ত লউন। যদি কেহ বলে, "Mr. Pickwick cried from his dinner table "let me have your bill, waiter. I must see to Mrs. Wardly now." ইহার অনুবাদ করিতে গেলে একটা কিম্ভূত-কিমাকার রকম হয়ে পড়ে। পিকউইক সাহেব নৈশ ভোজনের দারুনির্ম্মিত আধারের পার্শ্ব হইতে বলিলেন, "হে হোটেলের অনুচর! তোমার প্রদত্ত খাদ্যের মূল্যের হিসাব আন, আমি এখন শ্রীমতী ওয়ার্ডেলের দিকে মনসংযোগ করিব।"

'এখন দেখুন, অন্য রকমে অনুবাদ করা যায় কি না। আমাদের দেশে "Dinner table", "Waiter", "Bill" এবং "Mrs. Wardle" নামক পর-স্ত্রীর আবির্ভাব, এ সকলের কোনটাই পূর্ব্বে ছিল না। যদি নিতান্ত পক্ষে অনুবাদ কর্ত্তে হয়, তবে আমাদের মনে এই ভাবটুকু আসবে। "আসন" হইতে প্রফুল্ল বাবু বলিলেন, "ওহে রঘুনাথ ঠাকুর! কত লাগ্‌বে বল, আমি শীগ্‌গির চুকিয়ে দিয়ে একবার প্যালারামের মার অবস্থাটা দেখি।" কিন্তু ভেবে দেখুন, এটা তরজমার মত। অর্থাৎ, আমি আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার আচার ব্যবহার ভুলে গিয়ে স্বীকার কর্‌ছি যে, টেবুল্‌ ও আসনে বাস্তবিক কোনও

প্রভেদ নাই, এবং "রঘুনাথ ঠাকুর" ও waiter একই দরের লোক, এবং প্যালারামের মাকে হোটেলে নিয়ে আসা ও তার অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যে খুব নীতিবিরুদ্ধ, তা নয়। যদি উদারভাবে দেখেন, তবে ইহার মূলে প্রেম বই আর কিছু নাই। ফলে এই দাঁড়াবে যে, আপনারা আর এক পদ অগ্রসর হ'লে হোটেলে গিয়ে খাবেন, এবং প্যালারামের মার হাত ধ'রে বেড়াবেন।'

৪

এই দৃষ্টান্ত দিয়া মিস্ পাকড়াশী একটু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, 'আমি এতে এ কথা বল্‌ছিনে যে, আপনারা হোটেলে খাবেন, কিংবা নিজের আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করবেন। আমার মত তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু তাহার অনুবাদ "Female education এবং Female emancipation" কথাগুলি দ্বারা হয় না। বরং "Male education এবং Male emancipation" কথাগুলিতে তাহার অনেকটা তরজমা হয়।

'কথাটা খুব দুরূহ। শিক্ষা (Education), ও বিদ্যালাভ (learning), ঠিক এক কথা নয়। এক জন লোক খুব বিদ্বান হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা হয় ত কিছুই নাই। শিক্ষার মধ্যে নৈতিক ভাব আছে। এক জনের চরিত্র দেখে তাহার শিক্ষার বিচার হয়। এক জন বিদ্বান যদি নাস্তিক ও ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়ে, তবে আমি বলি, তার কোনও শিক্ষা হয় নাই। ভারতবর্ষে যত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা হ'য়েছে, তত অন্য কোনও দেশে হয় নাই। তবে তারা মূর্খ; অর্থাৎ, বাহ্য জগতের জ্ঞান তাদের খুব কম।

'নৈতিক উৎকর্ষের প্রধান কথা এই যে, নিজের ভাষা, নিজের আচার ব্যবহার, নিজের ধর্ম্ম ও ভাবের মধ্যেই সেটা হয়। শিক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, তবে বিদ্যালাভের পক্ষে অন্য ভাষার দরকার হয়। এইখানে অনেকের সহিত মতভেদ হয়। আমি বলি যে, নৈতিক উৎকর্ষ ও সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ নিজের সমাজ, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ভেঙ্গে ফেল্‌লে কখনই হয় না। পুরুষের নৈতিক বিকাশ রমণীর সমাজে হয় না; রমণীর চরিত্র পুরুষের সমাজে সংগঠিত হয় না; যাহার আদর্শ তাহারই মধ্যে। ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের মধ্যে বৈশ্যের, বৃক্ষের মধ্যে বৃক্ষের, তৃণের মধ্যে তৃণের। রমণীর

মধ্যে পুরুষের ভাব আসিলে আদর্শ নষ্ট হয়; পুরুষের মধ্যে রমণীর ভাব ঘৃণাকর; ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের ভাব অসম্ভব। আবার সকলেই যে নিজে নিজের আদর্শ, তাহা নয়; ঈশ্বরের আদর্শ। আপনারা বোধ হয় শুনেছেন যে, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র নৈতিক জগতে কেবল আদর্শ খুঁজে বেড়ায়! মিল, কোমৎ, স্পেন্সর, বেন্থাম, কান্ট, হেগেল, এক এক জন লোক তাঁহাদের এক এক রকম আদর্শ খাড়া করেছেন, এবং অবশেষে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শেষ আদর্শ যে কি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং কোনও আদর্শ আছে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। আমি বলি যে, আদর্শ জিনিসটা কোনও বাহ্য রূপের মধ্যে গড়িয়া লওয়া যায় না। এক জন সদ্ব্রাহ্মণও যেমন ঈশ্বরের আদর্শ, শূদ্রও তাই। কথাটা তাদের নৈতিক উৎকর্ষ নিয়ে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভেঙ্গে দিয়ে নূতন কোনও আদর্শ খাড়া করা যায় না। সেই রকম, নিজের আচার ব্যবহার, খাদ্য, বেশভূষার মধ্যেই আমাদের নৈতিক উৎকর্ষ হয়, সেটা ভেঙ্গে দিলে হয় না। ভাষার মধ্যেও তাই। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, এঁদের ভাষার মধ্যে আমরা আদর্শের অনেকটা ছায়া পাই, কিন্তু ভাঙ্গাচূরা বর্ণসঙ্কর সাহিত্যের মধ্যে বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্বের এক তিলও বাড়ে না। সেই জন্য অনেকে বলেন যে, অচল ঠাট্ বরং ভাল, কিন্তু গতিশীল ঠাট্ বড়ই ভয়ানক। দণ্ড যদি নড়ে, তবে অন্ধের পথ বিপদসঙ্কুল হয়। যেটা অবলম্বন করতে হবে, যাহার মধ্যে সহস্র বৎসর দিয়া আমাদের প্রাণবায়ুর চলাচল, সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য মিশ্রিত ঠাটে যোগ অবলম্বন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবে না। এক এক জন পরমহংস, কিংবা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেনের মত লোক জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঠাটের বাহিরে, অর্থাৎ, অবতারবিশেষ। তাঁরা ক্রমবিকাশের ফল নয়, ভাঙ্গাচূরার ফল নয়। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্বাধীনতা দেখানো হয় ত অপগণ্ড শিশুর কিংবা সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর কাজ। উভয়েই প্রলয়ের পক্ষপাতী, উভয়ের পক্ষে সংসার খেলার সামগ্রী। সমাজ রক্ষা করতে হলে উভয়েরই গলা আমাদের টিপিয়া ধরা উচিত। যে পথে সকলে পরম সুখ পায়, সে পথ সকল জাতিরই মধ্যে, তাহাদের আচার ব্যবহারের মধ্যে, ধর্ম্মের মধ্যে, সনাতন সময় হতে নির্দ্দিষ্ট। অন্য ধর্ম্ম, অন্য ভাষা, অন্য আচার ব্যবহার অবলম্বন করে', কিংবা নিজের নিজের আশ্রম ভেঙ্গে কোনও জাতিই যে নৈতিক জগতে উন্নতি লাভ করেছে, তা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। একটা কৃষককে ভেঙ্গে চুরে কলকারখানায় নিয়ে গেলে তার অধঃপতন হবে।

'তবে আমরা হীন হয়ে পড়েছি কেন? তার কারণ, নির্দ্দিষ্ট পথ আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা সেই পথ নামে অনুসরণ করি মাত্র। এই নির্দ্দিষ্ট পথের অধীনতা স্বীকার না ক'রে যে দিন হতে আমরা "স্বাধীন" হ'তে চেষ্টা করেছি, সেই দিন হতেই আমাদের পরাধীনতা। আমাদের শ্রমসহিষ্ণুতা নাই; ভালবাসার লোক নাই। যারা জোর করে' আমাদের গন্তব্য পথে রাখবে, আমরা স্বাধীন হয়ে তাদের পদদলিত করেছি। আমাদের শিক্ষাটুকু আমরা হারিয়েছি, তবে বিদ্যালাভের চেষ্টাটুকু বলবতী হয়েছে। এখন কি করে' বলপূর্ব্বক সেই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, এবং তাহার সঙ্গে বিদ্যালাভও সম্ভব, তাহা বল্‌তে চাই। আমার কথা তিনটি—

১। বলপূর্ব্বক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা।

২। বলপূর্ব্বক চরিত্রসংগঠন ও ঈশ্বরের আরাধনা।

৩। বলপূর্ব্বক বিদ্যাচর্চ্চা।

এই বল সমাজই প্রয়োগ করবে। সমাজ নিজের কর্ত্তব্য না করলে, রাজা তা ক'রবেন।

'এরই নাম Compulsory education. প্রথমটা শারীরিক, দ্বিতীয় নৈতিক, তৃতীয় মানসিক।

'এই তিনটীর মধ্যে সম্বন্ধ দেখুন। অন্নবস্ত্রের সংস্থান জগতের প্রধান কর্ম্ম। কৃষিকার্য্য নহিলে অন্নের সংস্থান হয় না। কায়িক পরিশ্রম না করিলে কৃষিকাজ হয় না। রোগ হইলে কায়িক পরিশ্রম অসম্ভব। রোগমুক্ত হইতে গেলে ঔষধের দরকার। নৈতিক উৎকর্ষ না হইলে ইন্দ্রিয়ের দোষে রোগ হয়। বিদ্যালাভ না হ'লে কৌশলে রোগ মুক্ত হওয়া, এবং জীবনরক্ষার উপযোগী উপায় উদ্ভাবন অসম্ভব। আবার দেখুন, ধর্ম্মের আদর্শ না থাকিলে উদ্যম হয় না, কর্ম্মে শিথিলতা হয়। অতএব প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাপেক্ষ, কোনটা বাড়াইয়া দিলে চলিবে না।

'এই জন্য গ্রামে একটা স্কুল খুলিয়া বিদ্যার চর্চ্চা করিলেই যে জাতীয় উন্নতি হবে, তা নয়। বিদ্যার ফল বহু দিনে ফলে। পরিশ্রমের ফল হাতে হাতে ফলে। সে পরিশ্রম কৃষিকার্য্য ও জীবনের উপযোগী শিল্প। আপনারা যে সব দুর্দ্দিন ও মহামারী দেখ্‌ছেন, তার মূলে দৈব বিভ্রাটই বেশী। নিজের অন্নের সংস্থান কেবল পরিশ্রমেই হয়। সেই পরিশ্রম এককালে বলপূর্ব্বক সাধিত হ'ত, এবং তাহা ইতিহাস "দাসত্ব" ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু

ভেবে দেখুন, পরিশ্রমটা দাসত্ব নয়, আমার পরিশ্রমের ফল অন্য লোকে জোর করে' কেড়ে নিলে তাকেই দাসত্ব বল্‌তে হয়। এখন সে দিন অনেকটা গিয়েছে, এখন হঠাৎ কেউ কাড়্‌তে পারে না। তবে কৌশলে কিংবা আইনের দোহাই দিয়ে একটা ভাগ কেউ কেউ নিয়ে থাকে। আমাদের ভবিষ্যতের কাজ সেই কৌশলটুকু ও সেই আইনটুকু রদ্ করা। কিন্তু এই আইনগুলোও আমাদের দুর্নীতির ফল। যদি আমরা পরিশ্রম করে' নিজের জমীর উপজাত অন্ন ঘরে নিয়ে বসি, এবং এক বৎসরের জন্য তার সংস্থান করে' নিজের বস্ত্রের নিজেই সংস্থান করি, এবং সৎপথে থেকে প্রাণপণে সকলে সমবেত হয়ে সেগুলো রক্ষা করি, তবে তিন বৎসরের মধ্যেই আইন ও আদালত ও ব্যবসা বাণিজ্য ছোটখাটো হয়ে পড়বে, সহরগুলো ভেঙ্গে গ্রামে এসে পড়বে। এক একটা গ্রামের অধিবাসিগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে যে, আমাদের দুই বৎসরের জীবনধারণের উপযোগী শস্য ঘরে না থাক্‌লে আমরা কোনও শস্য বেচিব না, কোনও মামলা মোকদ্দমা করিব না, কোনও বিলাসের দ্রব্য কিনিব না, এমন কি, নিজের বস্ত্রের সংস্থান নিজের পরিশ্রম দ্বারা না করতে পার্‌লে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাক্‌ব। তা' প্রথমতঃ একটা মহা বিপ্লব হয়ে পড়বে। পৃথিবী সেই বিপ্লবের সম্মুখীন। বাস্তবিক পক্ষে কোনও দেশেই প্রচুর অন্ন নাই। কৌশলে পরস্পরের মুখের অংশ কেড়ে নেয়। আজকাল্‌কার শিল্প বাণিজ্যের কোনও অর্থ নাই। কেবল ফাঁকি! এই অন্নের সংস্থান না থাকাতে পৃথিবী জুড়িয়া জুয়াচুরী চল্‌ছে। স্বামী ও স্ত্রী নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে। দেশাত্মবোধ ও বিশ্বাত্মবোধের দোহাই দিয়া একাকার হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে অরাজকতা ও সমাজের ধ্বংস।

'ধর্ম্মের পথে থেকে এই প্রতিজ্ঞাটুকু যে দিন করতে পারবেন, সেই দিন হ'তে আপনারা স্বাধীন। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা সনাতন পথে না থাক্‌লে করতে পারবেন না। পুরাতন ইতিহাসের 'দাসত্ব' এখন 'প্রভুত্বে' পরিণত হইবার সময়। কিন্তু আপনাদের সে পথে বলপূর্ব্বক রাখিবার লোক কোথায়? স্ত্রী সেই উপায়। স্ত্রী প্রেমের বশে স্বামীকে বশে রাখিয়া জগতে তাহাকে স্বাধীন করে। স্ত্রী ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দেয়। অলস হ'তে দেয় না। এখনও যে ভারতবর্ষ টিকিয়া আছে, সে কেবল সহধর্ম্মিণীর জোরে। সেই সহধর্ম্মিণী-গুলি বিগড়াইয়া গেলে পরে অন্ন বস্ত্রের কোনও সংস্থানই থাক্‌বে না। এই জন্য স্ত্রীশিক্ষার দরকার। কারণ, স্ত্রীশিক্ষার অর্দ্ধ পুরুষের শিক্ষা। স্ত্রীর বল

পুরুষের বল। স্ত্রীর ধর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম। যাহাকে আমাদের শাস্ত্রে 'দৈবীপ্রকৃতি' বলে, তাহা লইয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।

'এই জন্যই ম্যাকার্টিস্ সাহেব বলেছেন যে, শিক্ষালাভ ও বিদ্রোহিণী সহধর্ম্মিণীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ, একই প্রকারের কথা। বালিকা-বিদ্যালয় তাহার একটা উপায়। কেবল নিজের বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বালিকা-বিদ্যালয় নয়। আপনাদের মধ্যে অনেকে বিদেশী ভাষার চর্চ্চা করিয়া নূতন কথা শিখেছেন, সেগুলির চর্চ্চা স্ত্রীলোকে করিতে পারে না। তাহাদের বিদ্যাচর্চ্চা হইলে আপনাদিগকে তাহারা তর্কে পরাস্ত করিবে, এবং ধর্ম্মের পথে রাখিবে। এ সকল বালিকা-বিদ্যালয়ে, আমাদের ইচ্ছা যে, বিজ্ঞানচর্চ্চা হয়। এবং ছোট ছোট বালক তাহাদের সঙ্গে থাকে। স্ত্রীলোক ও শিশু স্বভাবসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তাহারা দর্শনশাস্ত্রের ও কূট সাহিত্যের কিংবা সমালোচনার পক্ষপাতী নয়। বিজ্ঞান তাহাদের মন শীঘ্র আকর্ষণ করে। আপনারা অন্নের সংস্থান করুন, তাহারা বস্ত্রের ও জীবনধারণোপযোগী অন্যান্য উপাদানের সংস্থান করুক। তাহারা গৃহগুলি সম্মার্জ্জিত রাখুক, আপনার রোগ শোক দূর করুক। সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র বসিয়া ভবিষ্যতের মঙ্গল চিন্তা করুন। চাঁদা করিবার দরকার নাই। সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একটা বালিকা-বিদ্যালয় খুলিয়া দিন, আমি বিনা ব্যয়ে শিক্ষয়িত্রী জুটাইয়া দিব।'

৫

মিস্ পাকড়াশীর বক্তৃতায় সমবেত গ্রাম্য সমাজ মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা বালিকা-বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। ইহাতে মিষ্টার ম্যাকার্টিস্ ... আনন্দিত হইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দণ্ডায়মান হইয়া শেষ কথা বলিলেন—

'হে সমবেত জাতিমণ্ডলী, বর্ণ, এবং বিশ্বাস! আপনারা প্রায় এক ঘটিকার ... অংশ কাল নির্ব্বাকপূর্ব্বক আমার সহকর্ম্মার (colleague) বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, তাহা অতিশয় উপাদেয়। আপনারা বুঝিলেন যে, নীতিশিক্ষাই ... শিকড় (root)। এখন কি প্রণালীতে নীতিশিক্ষার সহিত বিদ্যাচর্চ্চা ..., তাহার ভূগোলবৃত্তান্ত আমি কহিব।

'প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপযুক্ত আবাহন (repentance and prayer)। বসুন্ধরা শস্যশালিনী হইতে গেলে, হুতাশন তাহার পক্ষে ব্যাঘাত। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, কি করিয়া সূর্য্যদেবের হুতাশনযুক্ত রশ্মিজাল (fiery rays)

পৃথিবীর মেরুদণ্ডে (equator) মধ্যমহাসাগরের লাবণ্যময়ী (salty) অম্বুরাশি শোষণ করিয়া বাষ্প নামক উদ্ভিদ পদার্থের সৃষ্টি করে, এবং কি করিয়া সেই বাষ্প উত্তর-পশ্চিমবাহিনী ঋতুবায়ু (monsoon) দ্বারা বিতাড়িত এই জম্বুদ্বীপাখ্য ভারতমাতার দক্ষিণ দিকের হৃদয়ে (Deccan) বৃষ্টিরূপে পরিপ্লাবিত হয়! ইহারই নাম অনুতাপযুক্ত উপাসনা। মানব নামক উচ্চশ্রেণীর জন্তুর অশ্রুসম্পন্ন উপাসনার মহিমা যে কত, তাহা চর্ম্মচক্ষে কি করিয়া বলিব? আপনারা এক সময় এই ধর্ম্মবলে বলবতী হইয়া প্রচুর ধান্য উৎপাদন করিতেন। অহো! এখন সে দিন নাই!

'নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন যে, মনুষ্যজাতীয় কর্ম্মই (human actions) নীতি-শাস্ত্রের বিষয় (subject), এবং যে কর্ম্ম আদর্শজাতীয় (according to standard), তাহাই পুণ্যবান (good)। আমাদিগের নীতি-দর্শন পুস্তকে (Ethics) তিন প্রকার আদর্শ বর্ণিত করিয়াছে। প্রথম, বিচার-বিভ্রাট (Reason); দ্বিতীয়, আনন্দ-বিভ্রাট (Hedonism); এবং আত্মা-বিভ্রাট (Endæmonism)। এখন দেখিব, কোন কর্ম্মের ফলে সকল প্রকার বিভ্রাট হয়; অর্থাৎ, মানব পরম সুখে মগ্নবান (highest happiness) হয়। ইহা লাঙ্গল দ্বারা চাষ। অন্ন চাষ হইতে বাহির হয়। অন্ন লইয়া মামলা এবং বিচার, অন্ন দ্বারাই পরম সুখ, এবং অন্নহীন আত্মাই দুর্ভিক্ষ। আবার দেখুন, অন্ন-বিতরণই অসংখ্য লোকের গুরুতর-সুখের আদর্শ (utilitarian standard)। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, চাষকর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যবান।

'চাষ দ্বারা মাংসপেশী গর্ব্বিত হয় (develop)। অতএব ইহা শারীরিক শিক্ষা। তবে আপনারা কহেন যে, ইহাতে মেধা নাই। কিন্তু আমি দেখাইব যে, বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা লাঙ্গলের কল বাহির করিয়া আপনারা মেধাবিশিষ্ট হইতে পারিবেন (intellectual)। ইহা হইয়া গেলে আপনাদের ঘোরতর স্বাস্থ্য (health) এবং সমৃদ্ধি (wealth) একাধারে বাহির হইবে।

'আর কি কহিব? পরম জগদীশ্বরের প্রতি আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনাদের দীর্ঘজীবিকা (long life) হউক, এবং উত্তর দিকে (উত্তরোত্তর gradually) উন্নতির মুকুট (crowning prosperity) লাভ হউক। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।'

ম্যাকার্টিস্ সাহেব এই প্রকারে বক্তৃতা শেষ করিয়া গ্রাম্য মিড্ল ভার্ণেকুলার স্কুলের পণ্ডিত বনওয়ারীলালকে লইয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলেন, এবং তদবসরে মিস্ পাকড়াশী বালিকাগণকে ডাকিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিলেন।

যদিও ম্যাকার্টিস্ সাহেবের অনুবাদ এবং মিস্ পাকড়াশীর তরজমা সকলের বুদ্ধিগম্য হয় নাই, তথাপি সকলে উভয়ের স্নেহ ও সহানুভূতির মধ্যে তাঁহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। মিস্ পাকড়াশীর যত্নে কৃষকপত্নীদিগের গৌরব বাড়িয়া গেল, এবং ম্যাকার্টিস্ সাহেবের উপদেশে কৃষকমণ্ডলী তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা যত্ন করিল।

কৃষকবধূমণ্ডলী প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা স্বামীকে 'বলপূর্ব্বক' শিক্ষা দিবে, এবং তাহাদিগের বালিকাদিগকে 'বলপূর্ব্বক' স্কুলে পাঠাইবে। 'যদি কোনও বালক কিংবা বালিকা লেখাপড়া না শিখে, তবে তাহাদিগের খোরাক অর্দ্ধেক করিয়া দিবে'। ইহা শিখাইয়া দিয়া মিস্ পাকড়াশী কহিলেন, 'যে দেশে শিক্ষা নাই, সেই দেশেই দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ একটা দৈব উৎপীড়ন ব'লে আপনারা জানবেন। লেখাপড়া শিখলে পুরো খোরাক আপনিই মিলবে। তবে মনে রাখবেন যে, কেবল বিদ্যালাভ শিক্ষা নয়। কেবল বিদ্যালাভ করলে খোরাক জুটবে, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম ও সুনীতি, এই দুটোই আসল। স্ত্রীই কেবল তাহা দিতে পারে, অন্য কেহ নয়।

নির্ব্বিবাদ।

উদ্বোধন।*

আজ নব বর্ষের আরম্ভ। নূতনকে পুরাতন বরণ করিয়া লইয়াছে, পুরাতনে যে নূতন ছিল, তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শুভমস্তু।

জগৎ বস্তুতঃ পুরাতন হয় না, নিত্য নূতন থাকে। পুরাতন বাঁচে না, মরিয়া যায়। নব কলেবর গ্রহণ করিয়া পুরাতন নূতন রূপে নিত্য প্রতিভাত হইতেছে। আমরা যাহা নূতন মনে করি, তাহা পুরাতনের রূপান্তরমাত্র, পরিণামমাত্র।

অচেতন ও সচেতনের পরিণাম এক প্রকার নহে। অচেতনের জীবন ক্ষণিক, এই আছে, এই নাই। ইহার জন্ম ক্ষণে ক্ষণে, মৃত্যুও ক্ষণে ক্ষণে। বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর অট্টালিকা; সুরম্য সজ্জায় শোভিত, নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, যেখানে যেটি সেখানে সেটি নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার উৎপত্তি সে দিন

* কটকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষে।

হইয়াছে, বিনাশও পর দিন হইতে পারে। ইট-কাঠের যোগে উৎপত্তি, ইট-কাঠের বিযোগে বিনাশ। কিন্তু সচেতনের উৎপত্তি ইট-কাঠের যোগে নহে, মৃত্যুও ইট-কাঠের বিযোগে নহে। কোনও সচেতন এক দিনে জন্মে নাই, এক দিনে মরিবেও না। সচেতনের কুল আছে, বংশ আছে। দেহের ইট-কাঠের পরিণাম হইতেছে, নূতন আসিতেছে, পুরাতন যাইতেছে। দেহের পুরুষটি পুরাণ, শাশ্বত। এই ক্ষণে যে 'আমি' আছি, তাহা আজি-কালির 'আমি' নই। 'আমার' ইতিহাস অতিশয় দীর্ঘ, কেহ জানে না। পুরাতন 'আমি' নূতন 'আমি'তে মিলিত হইয়াছি। 'আমার' সমস্ত পূর্ব্ব, এক্ষণকার 'আমা'তে বর্ত্তমান। জানি না, 'আমার' উৎপত্তি কবে হইয়াছে। দিন বৎসর ধরিয়া অচেতনের বয়স গণিতে পারি, সচেতনের পারি না। জীবনের ধারা বহিয়া যাইতেছে; কত কাল হইতে বহিতেছে, কে জানে; কত কাল বহিবে, তাহাই বা কে জানে। পুরাণ পুরুষের বয়স গণিবে কে?

কোন্ অতীত কালে, কোন্ পুরাণ পুরুষের প্রেরণায় বাঙ্গালী নামক জাতির বিকাশ হইয়াছিল, কে জানে। সে জাতির কত ব্যক্তি আসিল গেল, আসিতেছে যাইতেছে। ব্যক্তি প্রথমে প্রবাসী, পরে নিবাসী, আবার প্রবাসী, আবার নিবাসী হইতেছে, আসিতেছে যাইতেছে, আবার আসিতেছে আবার যাইতেছে। এত আনা-গনায়, জাতি-পুরুষের নিবাস বলিবে কে, বয়স গণিবে কে? জাতি-পুরুষ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রবেশ করিতেছে, এ দেশে সে দেশে, এখানে সেখানে নানা আকারে প্রকট হইতেছে, কালে কালে ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। কিন্তু পুরাণ পুরুষটি শাশ্বত, অবিনাশী। যাবতীয় জীব-জাতির পুরুষটি এইরূপ। দেশে ও কালে পুরুষটিকে বদ্ধ করিতে পারা যায় না।

কিন্তু মানব-জাতির বিশেষ আছে। মানব জাতি-স্মর; অন্য জীব জাতি-স্মর নহে। কিংবা অন্য জীব জাতি-স্মর হইয়াও আত্ম-বিস্মৃত। মানুষ জাতি-স্মর; আত্মবিস্মৃত নহে। জাতির ধর্ম্ম তাহার স্মরণ আছে। প্রবাসে নিবাসে, একালে সেকালে জাতি-স্মৃতি লুপ্ত হয় না। কোন্ অতীত কালে আর্য্য-ঋষি কোন্ দেশ হইতে আসিয়া সপ্ত-সিন্ধু দেশে নিবাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে থাকিয়া 'পুরা' ভুলিতে পারেন নাই। কত যুগ গিয়াছে, এখনও ব্রাহ্মণ গো-ত্র ভুলিয়া যান নাই। যে বেষ্টনের মধ্যে গো রক্ষিত হইত, তাহার নাম ছিল গো-ত্র। কাশ্যপ বংশের একটা গো-ত্র ছিল, বশিষ্ঠ বংশের

একটা ছিল ; এইরূপ অনেক বিখ্যাত ঋষির এক একটা গো-ত্র ছিল। এখন সে দেশ নাই, গোবৃন্দ নাই, গোরক্ষণ নাই, বৃকাদি শ্বাপদ পশুর আক্রমণ নাই ; কিন্তু জাতি-স্মর মানুষ গো-ত্র স্মরণ করিতেছে। কেহ বলিতেছে কাশ্যপের গোত্র আমার গোত্র, কেহ বলিতেছে বশিষ্ঠের গোত্র আমার গোত্র। আধুনিক সকল ব্যক্তির দেহে কাশ্যপের শোণিতকণা প্রবাহিত হইতেছে কি না, কে জানে। তবু বলিতেছে গোত্র কাশ্যপ! শুধু ব্রাহ্মণে বলিতেছেন, এমনও নয়। পুরাতন ঋষির গো-বেষ্টনে যে কেবল তাঁহার গোধন রক্ষিত হইত, এমন নহে। সে ঋষির অনুচর সহচর, নিবেশী প্রতিবেশী, তাহাদেরও সেই এক গোত্র ছিল। এই হেতু শূদ্রেও বলিতেছে, কাশ্যপের যে গোত্র, তাহারও সে গোত্র। কেহ বলিতেছে, তুমি ও আমি তুল্য-গোত্রীয় ; কেহ বলিতেছে, তুমি ও আমি অতুল্য-গোত্রীয়। কেহ বলিতেছে, আমি আর্যসন্তান, আমি আর্য। আশ্চর্য্য এই, হিন্দু নামের কেহ বলে না সে আর্যসন্তান নয়, সে আর্য নয়। ইহার কারণ, সেই পুরাণ-পুরুষ। দেহে দেহে প্রতিবিম্বিত হইয়া 'পুরাতন ঋষি' অগ্রে চলিয়া যাইতেছেন ; বলিতেছেন পশ্চাৎ নয়, অগ্রে চল ; অগ্রগামী হও ; পশ্চাৎকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রগামী হও, অগ্রগামী হইতে পারিবে বলিয়া পশ্চাৎ স্মরণ কর।

কারণ যাহার পশ্চাৎ নাই, তাহার অগ্রও নাই। জাতি-স্মৃতি পশ্চাৎ পুরাতন স্মরণ করাইয়া অগ্রে নূতনে প্রেরিত করে। যে জাতি পুরাতনের মোহে মগ্ন, সে জাতির চক্ষু তমসাচ্ছন্ন, অগ্র দেখিতে পায় না, অগ্র দেখিতে পাইলেও পদক্ষেপে ভীত হয়। সে জাতিকে আলস্য জড়ীভূত করে, তাহার চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত হয়, দেহ-মন-বুদ্ধি নিশ্চেষ্ট হয়। সে জাতি মনে করে, তাহারা যাউক আমি সুখে আছি, আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইও না। মোহাচ্ছন্নের ধর্ম্ম এই, মোহ কাটাইতে চায় না, যে কাটাইতে যায়, তাহার প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়। কারণ আলস্যের অবসাদ আছে।

কিন্তু যে জাতির স্মৃতি পশ্চাৎকে অবলম্বনমাত্র মনে করাইয়া অগ্রে ধাবিত করায়, সে স্মৃতিই জাতি-স্মৃতি। প্রত্যেক জীব জাতির জাতি-স্মৃতি আছে। আম গাছে জাম ফলে না, জাম গাছে আম ফলে না ; বিড়াল কুকুর প্রসব করে না ; কুকুর বিড়াল প্রসব করে না। আমে জামে বিড়ালে কুকুরে স্ব স্ব জাতি-স্মৃতি নিহিত আছে। তেমনই, আমি তুমি সে, সকলেই স্ব স্ব স্মৃতিবশে কর্ম্ম করিতেছি। যখন মনে করি, আলস্য ভোগ করি, আর

একটু শুইয়া থাকি ; পুরাণ পুরুষটি পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া বলে, এই পথে এইটুকু আসিয়াছ, বহু পথ আছে, দূরপথ আছে, কখন চলিবে।

মানুষের ভাষা তাহার জাতি-স্মৃতির কিয়দংশ জাগাইয়া রাখিয়াছে। পিতামহের মুখে পিতা, পিতার মুখে পুত্র শুনিয়া আসিতেছে তাহার গো-ত্র কোথায়। শুনিয়া আসিতেছে, সে গো-ত্র পঞ্চনদ প্রদেশে ছিল। তার পর ব্রহ্মাবর্ত্তে, তার পর আর্য্যাবর্ত্তে, তারপর অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র কলিঙ্গে ছিল। কত কাল গিয়াছে, কত বিপদের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, প্রাণের আশঙ্কায় গ্রামান্তর দেশান্তর দর্শন ঘটিয়াছে, তথাপি সে বলে গো-ত্র কাশ্যপ! তুমি ভূখণ্ডের যে খণ্ডেই থাক, যুগের যে বৎসরেই থাক, তোমার গোত্র আছে, যায় নাই। এই যে গোত্র-জ্ঞান, ইহা জাতি-স্মৃতিমাত্র। পিতায় পুত্রে অণুপ্রবাহ চলিতেছে, তেমনই জাতি-স্মৃতি-প্রবাহও চলিতেছে। পুরাণ পুরুষটি প্রবাহ চালাইয়া দিয়া প্রবাহে প্রবাহে স্বয়ং চলিতেছেন। শাক্ত বলে, তিনি শক্তি, তিনিই সৃষ্টি, তিনিই জাতি, তিনিই স্মৃতি।

কিন্তু এ কথা ঠিক, তিনিই বুদ্ধিরূপে মানবকে রেখা-চিত্র লিখিতে শিখাইয়াছেন। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে এবং অতীতকে বর্ত্তমানে প্রেরণ করিতে শিখাইয়া জাতিস্মৃতি শতসহস্র গুণে বাড়াইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে দশপুরুষান্তরে যাহার বিস্মরণ হইত, এখন শতপুরুষান্তরেও তাহার বিস্মরণ হইতেছে না। সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আমরা স্মরণ করিতেছি অঙ্গাধিপতি কর্ণ, পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা জানিতেছি, উত্তরাপথ হইতে দক্ষিণাপথে আসিবার দুইটিমাত্র পথ ছিল। এক পথ মালব ও সৌরাষ্ট্র দিয়া, অপর পথ গঙ্গারাষ্ট্র (রাঢ়) ও উৎকল দিয়া। এ কালের ন্যায় সে কালেও বিন্ধ্যাচল পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া শুইয়াছিল, এ কালের ন্যায় সে কালেও নিবিড় দণ্ডকারণ্য জিগীষু রাজবাহিনীর গতি রোধ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন যতি রাঢ়পথে উৎকলে আসিয়া থাকিবেন, অশোকের দুর্জ্জয় সেনা সে পথে আসিয়া ওড্র-বিষয়ে লোমহর্ষণ প্রাণিহিংসা করিয়া সেই অশোকের প্রেরিত ভিক্ষু "ধবলী"-পৃষ্ঠে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের উৎকল আক্রমণে, কিংবা কালিদাসের রঘুর দিগ্‌বিজয়ে, কিংবা চীন-পরিব্রাজক হুএনসাঙ্গের দেশভ্রমণে সেই পূর্ব্বপথ দেখিতে পাই। অন্য দিকে, দক্ষিণ দেশের চোল-রাজ রাজেন্দ্র ওড্র-বিষয় দিয়া বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সম্পদে ও বিপদে উৎকল ও বঙ্গের ভাগ্যচক্র ঘূর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গ ও ওড়িষ্যা

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাদশাহ আকবরের এক সুবায় পরিগণিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব বঙ্গে দীক্ষিত হইয়া প্রেমরসের বন্যায় উৎকলকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এ দিকে, ভবসংসার হিংসার প্রতিমূর্ত্তি বর্গীর উৎপীড়ন কেবল উৎকল সহ্য করে নাই, বঙ্গও করিয়াছিল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে শাহআলম্ বঙ্গ বিহার ও ওড়িষ্যা ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেন। যে কালের ইতিহাস দেখি, সম্পদে ও বিপদে, প্রেমে ও অপ্রেমে, সুখে ও দুঃখে, যুগযুগান্তর হইতে উৎকলের প্রতিবেশী বঙ্গ, বঙ্গের প্রতিবেশী উৎকল। ইহার সাক্ষী মৃত মৃত্তিকার যোগ নহে, মসীর রৈখিক চিত্র নহে। ইহার সাক্ষী স্বয়ং মানুষ। মানুষের অন্তর্নিহিত পুরাণ পুরুষ। পুরীর পুরুষোত্তম ভারতের হিন্দুকে স্ব-সমীপে আকর্ষণ করিতেছেন; বঙ্গীয় কত নরনারী শ্রীক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; সতীদেহের খণ্ডবিখণ্ডে বাহান্ন পীঠ হইয়াছে; অধিকাংশ বঙ্গে, কিন্তু উৎকলের বিরজাক্ষেত্রও এক পীঠ হইয়াছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তে যে ব্রহ্মাক্ষর ধ্বনিত হইয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্তে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, আকুমারিকা হিমাচলের হিন্দু বলিতেছে, সে ধ্বনি তাহার পূর্ব্বপুরুষের কর্ণে শ্রুত হইয়াছিল। কোন্ হিন্দুর কোথায়, বসুন্ধরার কোন্ খণ্ডে জন্ম ও স্থিতি, কে জানে; কিন্তু এক পুরাণ পুরুষ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই বাঙ্গালী-জাতি-পুরুষ, তিনিই ওড়িয়া-জাতি-পুরুষ; তিনিই বিহারী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মরাঠা প্রভৃতি জাতি-পুরুষ বহুধা হইয়া বিরাজিত। সংস্কৃত সাহিত্য আর কিছু নহে, ভারতের পুরাণ পুরুষের কিঞ্চিৎ বহির্বিকাশ। এইরূপ, বঙ্গীয় সাহিত্যে, বঙ্গীয় পুরাণ পুরুষের যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি। ক্ষেত্রভেদে আত্মার স্ফুরণে ভেদ হয়। বৃক্ষে যে স্ফুরণ, প্রাণীতে সে স্ফুরণ নহে। যাবতীয় প্রাণীতে একই স্ফুরণ নহে। একই স্ফুরণ হইলে প্রাণী এক জাতি হইত। এইরূপ, এক দেশের সকল মানুষে স্ফুরণ সমান নয়। সমান হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদ হইতে পারিত না। এইরূপ, উৎকলের স্ফুরণ বঙ্গে নাই, বঙ্গের স্ফুরণ পঞ্জাবে নাই। এই যে নাই, এই যে আছে, এই যে এক হইয়াও বহুধা প্রকাশ, এই যে বহুত্বের মধ্যে একত্ব; যিনি দেখিতেছেন, তিনি ধন্য।

জড়বুদ্ধি বলে, সব এক হউক। হিন্দু মুসলমান সব এক হউক, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণবাসী সব এক হউক; সকলের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার; সকলের ভাষা, সকলের সাহিত্য; সব এক হউক। 'এক' অর্থে

সাম্য, সমানরূপতা, আকাঙ্ক্ষা করে। বাস্তবিক সে জানে না, সে কি চায়। ভাবিয়া দেখে না, সব সমান একাকার হইলে সে কোথায় দাঁড়াইত। মনে করে, তাহা হইলে সংসারে কলহ বিরোধ থাকিত না। ভুলিয়া যায়, বিরোধের অভাবে আনন্দ নহে, বিরোধের অবসানে মিলনে আনন্দ। সাম্যে শক্তি নহে; সাম্যে শক্তির অভাব; শক্তির অভাবের নাম লয়। শক্তি-প্রকাশে সৃষ্টি, সৃষ্টিতেই আনন্দ। সাম্যে শক্তি-প্রকাশের অবকাশ নাই, সৃষ্টি হয় না, বৈষম্যে শক্তি-প্রকাশে সৃষ্টি। অচেতনে সচেতনে যাহাতে শক্তির স্পন্দন দেখি, তাহাতেই দেখি সাম্যে শক্তি নাই, বৈষম্যে নাই, সাম্যের সংহতিতে নাই, বৈষম্যের সংহতিতে শক্তি। বাঙ্গালী শক্তির উপাসক, কিন্তু শক্তিতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। দেবাসুরের সংগ্রামে জগন্মাতা শক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দেবতারা যত দিন কুশলে ছিলেন, তত দিন হন নাই। প্রশান্ত সাগরে অগাধ জল থাকিলেও তাহাতে শক্তি নাই। সাগরের ঊর্মিতে শক্তি; ঊর্মির পর ঊর্মি, এ পাশে ঊর্মি সে পাশে ঊর্মি; এই ঊর্মিতে শক্তি, ঊর্মিতে শোভা, ঊর্মিতে সাগরের জীবন। প্রশান্ত বায়ুর, প্রশান্ত তাপের, প্রশান্ত তাড়িতের, শক্তি নাই। স্থির যে জীব, তাহা মৃত। নিশ্চল পদ নিশ্চল হস্ত মৃত, যেন পাষাণ। হস্তের সমান পদ হইলে, মস্তকের সমান হস্ত হইলে জীবন থাকিত না। গাছে পাতা ও ফুল দুই না থাকিয়া সব পাতা কিংবা সব ফুল হইলে গাছ বাঁচিত না। পদের কর্ম্ম হস্তের নয়, হস্তের কর্ম্ম মস্তকের নয়, পাতার কর্ম্ম ফুলের নয়, —এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের যথাযোগ্য সমাবেশে জীবের জীবন। সমাজেও তাই। সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে সমাজ-যন্ত্র অচল হইত। সকল ভাষা এক হইলে সে ভাষা পুষ্ট হইত না, সকল সাহিত্য এক হইলে জীবনের যাবতীয় বিকাশ এক পথে রুদ্ধ হইত।

জগদ্ধাত্রীকে ছাড়িয়া জড়বুদ্ধি নিজের সৃষ্টি দেখিতে চায়। বোঝে না, ধাত্রী সব দেখিতেছেন; যেখানে যেটি মঙ্গলকর সেখানে সেটি বসাইয়াছেন। তিনি মানুষকে এক পায়ে চলাইতে কিংবা এক হাতে কাজ করাইতে পারিতেন। তথাপি দুই পা দুই হাত দিয়া তাঁহার মানব-পরিবার গড়িয়াছেন। এক প্রাণের স্পন্দনের তরে তিনি কি না করিয়াছেন! অষ্ট-অঙ্গ একাদশ-ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ করিয়াও তুষ্ট হইতে পারেন নাই, চক্ষু দুই কর্ণ দুই ইত্যাদি যুগ্ম ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক চক্ষু দ্বারা বিষয়গ্রহণ হইত না, এমন নহে। কিন্তু বাম ও দক্ষিণ চক্ষু এক চক্ষুর অতিরিক্ত কিছু দেখে। এই হেতু দৃষ্টি

পরিপূর্ণ হয়, দৃষ্ট বস্তুর পরিমাণ, দূরত্ব, ঘনত্ব বিষয়ে জ্ঞান হয়। অধিকন্তু একের ন্যূনতা অন্তের দ্বারা পূর্ণ হয়, একের উদ্যমে অন্যের উদ্যম উদিত হয়। আমি চাই বহুত্ব; বিশ্বজননীকে বলি, তিনি সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষ সহস্রশীর্ষ হইয়া আবির্ভূতা হউন।

বস্তুতঃ তিনি তাহাই হইয়া আছেন, আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছি না। বঙ্গীয় সাহিত্য ধরুন। ইহা কেবল বঙ্গদেশবাসী কয়েক জন বাঙ্গালীর সাহিত্য নহে। কত মুসলমান কবি বঙ্গীয় সাহিত্যকে স্ব স্ব হৃদয়ের রস দিয়া পুষ্ট করিয়াছেন, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেবল বৌদ্ধ তান্ত্রিক নহে, কেবল হিন্দু তান্ত্রিক নহে; কেবল শাক্ত নহে, কেবল বৈষ্ণব নহে; কেবল পণ্ডিত নহে, কেবল মূর্খ নহে; কেবল ধনী নহে, কেবল দরিদ্র নহে;— এ সকলকে কে ডাকিয়া তাহাদের আত্মার চরিতার্থতা করিতে বলিয়াছিল? কে তাহাদিগকে গান গায়িতে বলিয়াছিল, কে প্রশংসার ডালা লইয়া বরণ করিতে গিয়াছিল? প্রাচীন কবিরা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না, কে যেন স্কন্ধে ভর করিয়া লিখাইয়া দিয়াছেন। ক্রৌঞ্চমিথুনহত্যা বহু লোক দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহা দেখিয়া বাল্মীকি মুনি গান ধরিলেন কেন? কেহ কেহ মনে করে, এস, দশ জনে বসিয়া যাই, সাহিত্য সৃষ্টি করি। মূর্খ যেমন মনে করে, গান গায়িতে গায়িতে বাল্মীক হইয়া বসিবে। বস্তুতঃ পরাণ-পুত্তলী না নড়িলে সাহিত্য রচনা হয় না। আর, নড়াইবার কর্ত্তা সেই পুরাণ মানুষটি। এই কারণে লোকে বলে, সাধনা নইলে সাহিত্য হয় না, যোগ নইলে সাধনা হয় না।

ইদানী ইয়ুরোপীয় সাহিত্য বঙ্গের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে নব নব পুষ্পে সুশোভিত, নব নব ফলে সু-সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। স্রোতে বহু আবর্জ্জনাও ভাসিয়া আসিতেছে। বিধাতাপুরুষ নিদ্রিত নাই, তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন এবং অযোগ্যকে অন্তর্হিত করিয়া ফেলিতেছেন। বয়োধর্ম্মে বঙ্গীয় সাহিত্য নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, শব্দালঙ্কারের প্রবল তাড়নে কাব্যের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মিলনে ও বিরোধে প্রাচ্য সজীব হইয়া উঠিতেছে। বিধাতার বিধানই এই। একই ক্ষেত্রে বহুকাল বিচরণ করিলে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি স্ফূর্ত্তিহীন হয়, কিছু বিকশিত হইয়া রুদ্ধগতি হয়। তখন নূতন মৃত্তিকায় নূতন রস যোগ করিতে হয়। যে কোরক মুকুলিত হইতেছিল, তাহা এখন নূতন তেজে বাড়িয়া উঠিয়া

নূতন সুষমা ও সৌরভে ধন্য হইয়া উঠে। নূতনের প্রবেশে ভয় নাই; ভয়, নূতনের নামে বিষাক্ত রসের প্রয়োগে। নূতনে ভয় নাই; নূতন চাই; বঙ্গীয় সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের অগাধ জলধিজলে ডুবিয়া পড়ুক, যেখানে যে রত্ন আছে, সব কুড়াইয়া মহামহিমময় হইয়া উঠুক।

আমি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীকে বলি, স্বদেশী বিদেশীর বৃথা দ্বন্দ্বে যাইবেন না, যেখানে যাহা উত্তম পাইবেন, তাহা আত্মস্থ করুন, পুরাণ পুরুষের নিকট বলি প্রদান করুন। কেবল দেহস্থ করিবেন না, তাহাতে বিস্ফোটক জন্মিতে পারে, আত্মস্থ করুন। তখন কোথায় স্বদেশী, কোথায় বা বিদেশী! এই আত্মস্থ-করণের শক্তিই সাহিত্যের শক্তি, জাতির শক্তি, জীবের শক্তি। শক্তি-তন্ত্রে দেখিতে পাইবেন, একেবারে শিবের উপাসনা হয় না। শিবের উপাসনা অতি দুরূহ; বহু পুণ্যের প্রভাবে অন্নের ভাগ্যে মঙ্গলময় শিবের সাক্ষাৎ লাভ হয়। তমোগুণ কাটাইয়া গেলে রজোগুণের উপরে সত্ত্ব অধিষ্ঠিত বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে। হিন্দুর মন্দিরে কোথাও কেবল শিব দেখিতে পাইবেন না; যেখানে শিব, সেখানে শক্তি আছেন, আর যেখানে শক্তি, সেখানে শিবও আছেন।

শক্তি-প্রকাশের নাম কর্ম্ম। ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী এক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। শুভমস্তু। কারণ,যদ্দ্বারা আত্মার উন্মেষ হয়, তাহা শ্লাঘ্য। সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা আপনারা পুরাণ পুরুষের উপাসনা করিতে যাইতেছেন, আপনারা চরিতার্থতা লাভ করুন। বঙ্গীয় সাহিত্যে মানবাত্মার বিকাশ-বিশেষ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আপনারা সেই অভিব্যক্তি ধ্যান করিতে যাইতেছেন। আপনারা শ্লাঘ্য। যিনি যে অভিব্যক্তি ধ্যান করুন, তিনিই শ্লাঘ্য। জগতের সৃষ্টির মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ; মানবের শ্রেষ্ঠের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ। মনের প্রবৃত্তি দ্বারা কর্ম্ম হয়। কর্ম্মের শুভাশুভ আছে। কোষকার কীট নিজের রচিত সূত্রে আপনি বদ্ধ হয়, হত হয়। অন্য দিকে উর্ণনাভ নিজের রচিত সূত্রে জাল নির্ম্মাণ করে, কিন্তু নিজে বদ্ধ হয় না, অপরকে বদ্ধ করে। অতএব, বিষম জ্ঞান ও বিষম প্রবর্ত্তন হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিবেন। উর্ণনাভের উদ্‌ভূত রসে স্নেহ পদার্থ আছে। বালুকার পিণ্ড হয় না। বালুকায় স্নেহ মিশ্রিত করিলে বালুকার পিণ্ড রচনা করিতে পারা যায়। জগদ্ধাত্রী বহু যন্ত্র চালাইতেছেন; বহু চক্র, চক্রের মধ্যে চক্র ঘুরিতেছে, স্বচ্ছন্দে ঘুরিতেছে; পরস্পর ঘর্ষণে কোনটার গতি মন্দ হয় নাই, কোনটায় তাপের উৎপত্তি হয় নাই। কারণ, তিনি চক্রে অনুচক্রে প্রতিচক্রে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্নেহ ঢালিয়া দিতেছেন। স্নেহাক্ত

হইয়া কর্ম্ম করিবেন, চক্রের গতি রুদ্ধ হইবে না, সন্তাপও উৎপন্ন হইবে না। দশ জনে মিলিয়া কর্ম্ম; 'পরিষৎ' অর্থে বহুর গোষ্ঠী। বহুর গোষ্ঠীতে স্নেহ-রসের অভাব বা ন্যূনতা হইলে কর্ম্ম হইবে না, পরন্তু কুকর্ম্ম হইবে।

বহু বৎসর হইল, কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনেক উদ্যমশীল সদস্য কটকে পরিষদের এক শাখা রোপণের নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইতে বলিয়াছিলেন, আমি সম্মত হই নাই। কারণ, সে কালে অন্তরের প্রেরণার কোনও লক্ষণ পাই নাই। বাহিরের প্রেরণায় লোক-দেখানিয়া কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের অনুরূপ ফল হয় না।

আপনাদিগের সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। (১) বঙ্গের উত্তম সাহিত্য ওড়িষ্যায় প্রচার, (২) ওড়িষ্যার উত্তম সাহিত্য বঙ্গে প্রচার। এই আদান-প্রদান দ্বারা এক দিকে পরিষদের সদস্য লাভবান হইবেন, অন্য দিকে বঙ্গ ও ওড়িষ্যাও হইবেন। মৈত্রী স্থাপিত হইবে, দেশের বৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী মধ্যস্থ হইবেন। বঙ্গের বাঙ্গালীর যাহা কষ্টসাধ্য অথচ অভিপ্রেত, তাহা মধ্যস্থের দ্বারা অনায়াসে হইতে পারিবে। ওড়িয়া কোন্ সাহিত্য উত্তম, তাহা বঙ্গের বাঙ্গালী সহজে বুঝিতে পারিবেন না। এই-রূপ, বঙ্গের কোন্ সাহিত্য ওড়িষ্যার পক্ষে হিতকর হইবে, তাহাও মধ্যস্থ বাঙ্গালী সহজে অবধারণ করিতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যসাধন নিমিত্ত আপনারা ওড়িয়া ও বাঙ্গালা সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করুন। ভাষা দ্বারা সাহিত্যে প্রবেশ করিতে হয়। আপনারা সকলেই ওড়িয়া ভাষা জানেন। না জানিলেও আপনাদের পক্ষে শেখা কঠিন হইবে না। আপনারা বাঙ্গালা ভাষাও জানেন। না জানিলেও আপনাদের পক্ষে শেখা কঠিন হইবে না। পারিলে নিকটবর্ত্তী তেলুগু ভাষা ও তেলুগু সাহিত্যও শিক্ষা করিবেন। যিনি যত ভাষা শিখিয়াছেন, তিনি সে সে ভাষায় রচিত তত সাহিত্যে প্রবেশের সামর্থ্যলাভও করিয়াছেন। ভাষা দ্বারা, মাতৃভাষা দ্বারা প্রজার ভেদ হয় না। সুইট্‌জর্লণ্ড কতটুকু দেশ, কতই বা লোক। লোকসংখ্যায় ওড়িষ্যার অর্দ্ধেকও নহে। কিন্তু গোটা চারি ভাষা, বিভিন্ন ভাষা চলিতেছে। আমেরিকায় 'যুক্ত রাজ্য'সমূহের লোকের মাতৃভাষা একটী নহে। যে ভাষা যে শিখিতে চায়, শিখিতে সহজ বোধ করে, তাহাকে তাহা শিখিতে দিলে, তাহার হিত হয়; অন্যের অহিত হইতে পারে না। আমি সুস্থ হই, বলবান্ হই; তুমিও সুস্থ হও, বলবান্ হও। বরং আমি অসুস্থ দুর্ব্বল হইলে তোমার অহিতের

সম্ভাবনা আছে। সাহিত্য-সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রত্যেক সাহিত্য পুষ্ট হউক, উত্তম হউক। কেবল এইটুকু দেখিবেন, যেখানে যাহা উত্তম পাইবেন, তাহা একা ভোগ করিবেন না, পরিজন-প্রতিবেশীকে বাঁটিয়া দিয়া ভোগ করিবেন। ইহাই মানব ধর্ম্ম।

আমরা দেশে আছি বটে, কিন্তু দেশ চিনি না। দেশের প্রাণ কোথায়, পুরাণ-পুরুষ কোথায়, তাহা অন্বেষণ করি না। ইহার তুল্য দুঃখের কথা কি আছে! মানবের কত ইতিহাস, কত কাহিনী, কত পুরাণ, ওড়িষ্যায় বিক্ষিপ্ত আছে, আপনারা সে সব অন্বেষণ করুন। মানুষ যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, সে ক্ষেত্রের সাগর-নদী, প্রান্তর-গিরি, গ্রাম-নগর, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা ক্ষেত্রস্বামীর সুখ দুঃখ জড়িত আছে। অতএব, ক্ষেত্র-অনুসন্ধানও কর্ম্মের মধ্যে হইবে। পরিষদের কর্ম্মের অন্ত নাই। আপনারা কর্ম্মী হউন; ওড়িষ্যার কল্যাণ হইবে, দেশের কল্যাণ হইবে। ভারতের পুরাণ পুরুষ মঙ্গল করুন, ওড়িষ্যার পুরাণ পুরুষ মঙ্গল করুন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

রায় পরিবার।

৬

বিধাত্রী দেবী গঙ্গাস্নানের পরই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—সে দিন আর দেবদর্শনে যান নাই। সে দিন তাঁহার পক্ষে বড় বেদনার—তাঁহার পুত্রের মৃতাহ। তাঁহার আশ্রিতারা গঙ্গাস্নানের পর শতাধিক 'শিবে'র 'মস্তকে' গঙ্গাজল দিয়া মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি আপনার কক্ষে বসিয়া আছেন—দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সম্মুখে যে পত্র পড়িয়াছিল,তাহার সঙ্গে যে তাঁহার অশ্রুপাতের কোনও সম্বন্ধ ছিল, বা থাকিতে পারে, আশ্রিতারা তাহা অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু সেই পত্র আজ তাঁহার পক্ষে পুত্রশোকের স্মৃতির অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়াছিল। তিনি বারাণসী-বাসে আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি যেন প্রতি দিন দুইখানি পত্র পান। একখানি বৈষয়িক ব্যাপারের—দেওয়ানের সেরেস্তা হইতে সে পত্র লিখিত হইত; আর একখানি সাংসারিক—তাঁহার রমা-গৌরীর কথার—সে পত্র হয় রমাকে, নহে ত রমার মাকে লিখিতে হইত। পুত্রবধূঃপ্রায়ই রমার উপর

সে পত্র লিখিবার ভার দিয়া দায় এড়াইতেন। আজ যে পত্র বিধাত্রী দেবীকে বিচলিত করিয়াছিল, সেখানি পুত্রবধূর লেখা। সুশীল মাসহারা লইবে না, বলিয়া যাইবার পর তিনি বুঝিয়াছিলেন—এ সংবাদ বিধাত্রী দেবীর কাছে গোপন করা সম্ভব হইবে না, সুতরাং, তাঁহাকে জানানই ভাল। সেই জন্য তিনি শাশুড়ীকে সে সংবাদ দিয়াছিলেন, এবং পত্রে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তিনি গৌরীর ও সুশীলের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সুশীল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে—দোষ সুশীলের। দোষ গুণ বিচার করিয়া অপরাধ কাহার, তাহা বিচার করিবার প্রবৃত্তি বিধাত্রী দেবীর ছিল না—পত্র পাঠ করিয়া তিনি কেবল মনে করিতেছিলেন, এ ব্যাপার—এ দুর্ঘটনা ঘটাই অনুচিত, তাহা ঘটিতে দেওয়াই অসঙ্গত হইয়াছে; কিন্তু যখন তাহা ঘটিয়াছে, তখন যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। মান-অপমানের কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার মনে কেবল আশঙ্কা জাগিতেছিল—পাছে এই ব্যাপারে কোনরূপে গৌরীর সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়। গৌরীর সুখের অপেক্ষা কি মান-অপমানের বিবেচনা বড়? সেই আশঙ্কায় তিনি বিচলিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন।

সাধারণতঃ সরকার তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পত্র লিখিত—তিনি সহি করিতেন। আজ কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। তিনি স্বয়ং তিনখানি পত্র লিখিলেন—পুত্রবধূকে, গৌরীকে, সুশীলকে। পুত্রবধূকে তিনি লিখিলেন—

'মা, এ কি করিলে? বড় আশা করিয়াছিলাম, যে কয় দিন বাঁচিব, বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার চরণে রমা-গৌরীর মঙ্গল প্রার্থনা করিব—কাশীবাসে আসিয়া আর ফিরিব না। আজ আমাকে কাশীছাড়া করিলে! তুমি রাগ করিয়াছ—সুশীল তোমার কথা শুনেন নাই। আমাদের কি রাগ সাজে? তুমি আমি কি সুশীলের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারি? আমরা যে গৌরীকে তাহার হাতে দিয়াছি। রমার উপর, গৌরীর উপর যেমন, সুশীলের উপরও যে, মা, তেমনই রাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব! তুমি রাগ করিলে কেন? এ ভুল কেন করিলে? সবই আমার অদৃষ্টের দোষ!

'তুমি মনে করিয়াছ, এ অবস্থায় সুশীলের পক্ষে ভাগিনেয়কে বিলাতে পাঠান বুদ্ধির কাজ হইবে না। তুমি, বোধ হয়, তাহাকে সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছ। যদি তাহাতেও সে না বুঝিয়া থাকে, তবে তুমি তোমার স্নেহগুণে তাহার জিদ একটা খেয়াল বলিয়া মনে কর নাই কেন? সে ত ভাল হইবে

বলিয়াই ভাগিনেয়কে পাঠাইতে চাহিয়াছে—তাহা ত দোষের নহে। আর যখন সে কথা শুনিল না, তখন তুমিই কেন তাহার ভাগিনেয়ের বিলাতের খরচ দিতে চাহিলে না? মাসে দুই শত টাকা—তাহাতে আমার রমা গরীব হইয়া যাইত না। গৌরী যদি মেয়ে না হইয়া ছেলে হইত, তবে সে ত রমার সঙ্গে সমান ভাগে সম্পত্তি পাইত। আমরা সে হিসাবে তাহাকে কি দিয়াছি? রমা যদি একটা জিনিসের জন্য খেয়াল করে, তবে সে জন্য যেমন, সুশীলের এই খেয়ালের জন্যও তেমনই ভাবিলে, কোনও গোলই হইত না।

'আমি যখন ছেলে দেখিয়াই গৌরীর বিবাহ দিয়াছিলাম, টাকশাল দেখিয়া দিই নাই—তখন সে ব্যবস্থা তোমার মনের মত হয় নাই। আমি তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তুমি যখনই টাকার কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলে, আমি তখনই সে কথা চাপা দিয়াছিলাম। কেন তাহা করিয়াছিলাম, তাহা এত দিন তোমাকে বলি নাই। গৌরীপুর জমীদারীর আয় আমার শ্বশুর বরাবরই স্বতন্ত্র রাখিতেন; বৎসরান্তে পুণ্যাহের পূর্ব্ব দিন হিসাব নিকাশ করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মী, তোমার বাপের বাড়ীর আয়ে যে টাকা মজুদ,তাহা শুন।" তাহার পর তোমার শ্বশুরও কোনও দিন সে টাকা সাধারণ তহবিলে মিশান নাই। এই এক বিষয়ে তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনেন নাই—সে টাকায় নূতন সম্পত্তি কিনিলে তাঁহার নামে কিনিবার জন্যই আমি জিদ করিব বলিয়া সে টাকায় কখনও সম্পত্তি কেনেন নাই। ভাল ভাল সম্পত্তি কিনিবার সুযোগ তিনি ত্যাগ করিয়াছেন—আমি রাগ করিয়াছি, কিছুতেই শোনেন নাই। শেষে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, সে টাকা বাড়ীতেই থাকুক—টাকা যাহার, সে-ই বড় হইয়া হিসাব দেখিবে। কিন্তু হায়, আমার পোড়া কপালে আমাকে রাখিয়া সে—আজিকার এই দিনেই—চলিয়া গিয়াছিল। সে টাকার হিসাব আমি কখনও দেখি নাই। কিন্তু আমার অনুমান, এত দিনে সে টাকা প্রায় সাত লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে টাকার অর্দ্ধেক গৌরীকে দিব। যখন 'মানুষ' দেখিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, না হয়, সে টাকা সবই গৌরী লইবে।

'আজ মনে করিতেছি, হয় ত আমিই ভুল করিয়াছি, তখনই তোমাকে এ কথা বলিলে ভাল হইত। তাহা হইলে তোমার মনে কোনরূপে কোনও বিরুদ্ধ ভাব, অশ্রদ্ধার ভাব স্থান পাইত না। হয় ত সেই ভাব ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এই ঘটনা ঘটাইয়াছে; নহিলে তুমি মা হইয়া ছেলের ব্যবহারে অপমান দেখিলে

কেমন করিয়া? কিন্তু আমি অনেক ভাবিয়া তখন সে কথা কাহাকেও বলি নাই। আমি যৌতুকের লোভ দেখাইয়া ধনীর ঘরে গৌরীর বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলাম। যৌতুকের লোভে যাহারা আমার ঘরে কাজ করিবে, তাহাদের ঘরে কাজ করা আমি অপমান বিবেচনা করি। তাহার পর যখন সুশীলের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত হইল, তখন দেখিলাম,তাহারা ধনীর ঘরে কাজ করিতেই নারাজ। তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িল। আমি যে চেষ্টায় সুশীলকে মাসহারা লইতে সম্মত করিয়াছিলাম, তাহাও তুমি জান না। টাকা লওয়াই সে অপমানজনক মনে করিয়াছিল; আমি অনেক কষ্টে তাহাকে রাজি করাইয়াছিলাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর অধিক টাকা দিতে চাহিলে সে কোনও টাকাই লইবে না। টাকা লইতে তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছায় সে টাকা লইয়াছিল।

'সুশীল যে তোমাকে অপমান করিবে, এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেছি না। তুমিও সে বিশ্বাস মনে স্থান দিও না। টাকার কথায় তাহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে, তাই তাহার ব্যবহারে তুমি বিরক্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছ। যদি সে অপরাধই করিয়া থাকে—'ছেলেমানুষ' বুঝিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলেই কি, মা, তুমি তাহার উপর রাগ করিতে পার? রমা আর সুশীল কি ভিন্ন?

'যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতীকার করিতেই হইবে। তুমি তাহাকে ডাকাইয়া বুঝাইতে পারিবে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার অদৃষ্ট-দোষেই তোমাকে এ সব ঝড় ঝাপট সহ্য করিতে হইতেছে। আমি কলিকাতায় যাইতেছি। কবে যাইব, কাল লিখিব।'

বিধাত্রী দেবী সুশীলকে লিখিলেন. 'তোমার শাশুড়ীর পত্রে জানিলাম, তুমি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ। আমরা বুড়া মানুষ, যদি ভুলই করি—তোমার কি তাহাতে রাগ করিতে আছে? তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তোমাকে আমি কি বুঝাইব? তোমার শাশুড়ীকে আমি কোনও দিন সংসারের ভার দিই নাই, তাই তাঁহার পক্ষে ভুল করিবার সম্ভাবনা ঘটে। কিন্তু সে জন্য দায়ী আমি। তুমি সে জন্য রাগ করিও না। তুমি মাসহারা লইবে না, বলিয়াছ। কেন? তুমি কি পরের টাকা লইতেছ? রমা আর গৌরী কি সমান নহে? ও মাসহারা তোমার উপযুক্তও নহে। যাহাই হউক, তুমি রাগ করিয়াছ শুনিয়া আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি—আমি কলিকাতায় যাইতেছি।'

তিনি গৌরীকেও পত্র লিখিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে গৌরী এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ে। তাই তিনি লিখিলেন—

'দিদিমণি, তোমার মার পত্রে জানিলাম,সুশীল আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। আমি কলিকাতায় যাইতেছি। তোমরা বুড়ীকে কাশীবাস করিতেও দিবে না। আমার কথা শুন—তুমি এ ব্যাপারে কোনও পক্ষ লইও না। যদি লইতেই হয়,সুশীলের পক্ষ লইও; কারণ,স্ত্রীলোকের পক্ষে মা বাবা অপেক্ষাও স্বামী বড়; স্বামীর দোষকেও স্ত্রীর গুণ দেখিতে হয়। আমি যাইয়া সুশীলকে বুঝাইয়া বলিব—তিনি বুড়ীর উপর রাগ করিতে পারিবেন না। তুমি কিন্তু ইহার মধ্যে জড়াইও না।'

পত্রগুলা পাঠাইয়া বিধাত্রী দেবী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই দিনই তিনি বলিলেন, 'রমা গৌরীকে দেখিতে মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।'

তাঁহার আশ্রিতাদিগের মধ্যে এক জন তাঁহার কাছে বসিয়া থলির মধ্যে হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'তাহা আর করিবে না? বলে—ঐ দুই গুঁড়াই ত তোমার সব—উহাদিগকে লইয়াই সব ভুলিয়া আছ।'

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'মনে করিয়াছিলাম, মায়া কাটাইব। কিন্তু পারি কই?'

'মায়া কি কাটান যায়, মায়াবদ্ধ জীব—মায়াই সব। তা লিখিয়া দাও না কেন, বৌমা একবার তাঁহাদের লইয়া এখানে আসুন।'

'রমার পড়ার ক্ষতি হইবে। স্কুল বন্ধ না হইলে তাহাদের আসা হয় না—আবার সে সময় বাড়ী যাইতে হয়।'

আশ্রিতা কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, 'তাহাও বটে।'

তখন বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'মনে করিতেছি, একবার যাইয়া ঘুরিয়া আসি।'

আশ্রিতা সাগ্রহে বলিলেন, 'সে ত ভালই।'

'কাশীবাসী হইয়া ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না—ফিরিতেও নাই। কিন্তু মন প্রবোধ মানিতেছে না—একবার যাইয়া দেখিয়া আসি। তোমরা সব থাক, আমি একাই যাইব—পাঁচ সাত দিন পরেই ফিরিয়া আসিব।'

অনেকেরই ইচ্ছা হইল, এই সুযোগে বাড়ী দেখিয়া আসিবেন। কিন্তু

তাঁহাদের মনের ইচ্ছা মনেই মিলাইল—মুখে আর ফুটিল না; কারণ, বিধাত্রী দেবীর এই কথার পর আর কেহ সে প্রস্তাব করিতে সাহস করিলেন না।

যাত্রার আয়োজন হইল।

বিধাত্রী দেবী শঙ্কাকুল মনে কাশী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি ষ্টেশনে রমাকে দেখিলেন, তখন আনন্দে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সব দুর্ভাবনা বিস্মৃত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রমা ট্রেণ স্থির হইবার পূর্ব্বেই ব্যস্ত হইয়া তাঁহার কামরার সন্ধান করিতেছে। কামরা দেখিতে পাইয়া সে ছুটিয়া তথায় আসিল, এবং পিতামহী কর্ত্তৃক মুক্ত দ্বারপথে তাহাতে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে ও চক্ষুতে হর্ষের দীপ্তি। সে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই বিধাত্রী দেবী তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—যেন বুকের জ্বালা জুড়াইল।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে বসিয়া তিনি রমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; রমা কত কথা বলিতে লাগিল—কত দিন সে পিতামহীর কাছে তাহার কথা বলিতে পায় নাই! কখন যে পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া স্থির হইয়াছে, তাহা দুই জনের কেহই জানিতে পারেন নাই; সহিস গাড়ীর দ্বার খুলিলে জানিতে পারিলেন।

বাড়ীর কর্ম্মচারীরা ও দাস দাসীরা দ্বারের কাছেই ছিল—সকলেই আসিয়া বিধাত্রী দেবীকে প্রণাম করিল। সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুত্রবধূর প্রণাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পরই তিনি রমাকে বলিলেন, 'রমাবাবু, তুমি যাইয়া দিদিকে ও জামাই বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস—দিদিমণির জন্য বারটার পরই এবং জামাই বাবুর জন্য সন্ধ্যার সময় গাড়ী যাইবে।'

বধূ বলিলেন, 'সুশীল ত এখানে নাই।'

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রের দৃষ্টি বধূর মুখে স্থাপিত করিয়া বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি?'

'সে পশ্চিমে গিয়াছে।'

'কবে?'

'আজ দুই দিন হইল।'

'কেন?'

'শুনিলাম, "বিদেশে" রোজগারের সুবিধা হইবে বলিয়া।'

'শুনিলে! তবে কি তুমি তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর নাই?'

'সে ত আর আইসে নাই।'

'কিন্তু সে যাইবে শুনিয়াও কি তুমি গৌরীর বাড়ী যাও নাই?'

বধূ নিরুত্তর রহিলেন।

বিধাত্রী দেবী হতাশভাবে বলিলেন, 'মা, এমন কাজও করিয়াছ!'

তাহার পর বধূ যতই আপনার কার্য্যের সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বিধাত্রী দেবী ততই ভাবিতে লাগিলেন—উপায় কি? বধূর কথায় তিনি বুঝিলেন, তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে—বধূ উদ্ধতভাবে টাকার খোঁটা দিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এখন উপায়?

মধ্যাহ্নের পরই তিনি গৌরীর গৃহে গমন করিলেন, এবং সুশীলের মাতার নিকট তাহার 'বিদেশে' যাইবার কারণ অবগত হইলেন। সুশীলের দিদি তাঁহার কাছেও বলিলেন, 'ঠাকুরমা, আমারই জন্য ভাই আমার এ কষ্ট সহ্য করিতে গেল। আমি কত বারণ করিলাম, কিন্তু শুনিল না।' বিধাত্রী দেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'এই ত ভাইয়ের মত কাজ। এ কি আর 'বিদেশ'—কত লোকই ত এমন স্থানান্তরে যায়। তবে আমার বিশ্বাস, সে এখানে থাকিলেও পসার করিত—তাহার ব্যস্ত হইয়া 'বিদেশে' যাইবার দরকার ছিল না।'

ফিরিবার সময় তিনি গৌরীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

সুশীলের যাইবার কথা যে গৌরী পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই, তাহাতে তাঁহার মনে নানা আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল। স্বামীর পক্ষে এমন একটা সঙ্কল্প স্ত্রীর কাছে গোপন করা তাঁহার একান্তই অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। ভালাবাসার যে নিবিড়তা সুখের কারণ, তাহা স্বামী স্ত্রীকে পরস্পরের সঙ্কল্প জানাইতেই প্ররোচিত করে—গোপন করিতে দেয় না। তবে সুশীল তাহার সঙ্কল্প গৌরীকে জানিতে দেয় নাই কেন? তিনি মনে করিলেন, হয় ত গৌরী আপত্তি করিবে, এই আশঙ্কায় সুশীল তাহাকে জানায় নাই—হয় ত গৌরী সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলিয়া সে জানায় নাই। কিন্তু কোনও অনুমানই মনের মত হইল না।

পর দিন তিনি কথায় কথায় গৌরীর কাছে যত কথা জানিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা ততই বাড়িতে লাগিল। তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না।

তাহার পর দিন তিনি সুশীলের পত্র পাইলেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে সুশীল তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাই কাশী ঘুরিয়া আসিল। পত্র পাঠ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন—

'আপনার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় আমি পদে পদে পাইয়াছি, কিন্তু আপনি কেমন করিয়া এ ভুল করিলেন? যেখানে টাকারই আদর, সেখানে আপনি অর্থহীনকে বরণ করিয়া আনিলেন কেন? আপনি কি আপনার বধূর ও পৌত্রীর মনের ভাব জানিতে পারেন নাই? আমি ধনী নহি; কিন্তু ধনের অপ্রাচুর্য্য যে ইতরত্বের নামান্তর—এমন কথা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। দরিদ্র ইতর নহে। আর যে স্থানে সে মত গৃহীত হয়, সে স্থান ত্যাগ করাই দরিদ্রের কর্ত্তব্য। ধাতুপাত্রের ও মৃৎপাত্রের পরস্পরের সান্নিধ্য মৃৎপাত্রের পক্ষেই বিপদের কারণ। তাই আমি স্থান ত্যাগ করিলাম। আপনি টাকা দিয়া ভুল করিয়াছেন; আমি টাকা লইয়া ভুল করিয়াছি। সে ভুলের ফল ভোগ করিতেই হইবে। ভ্রমক্রমে বিষ পান করিলে কি কখনও বিষক্রিয়া রোধ করা যায়? টাকা আমি ফিরাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে ত শান্তি পাইব না। সেই অর্থে যদি কোনও উপকার লাভ করিয়া থাকি, তবে সে উপকার ত মুছিয়া ফেলিতে পারিব না! আর সর্ব্বোপরি আপনার স্নেহের ঋণ ত কখনও শোধ করিতে পারিব না! ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়া পরাভূত করা যায়; কিন্তু স্নেহকে কেমন করিয়া পরাভূত করিব? আপনার স্নেহের কাছে যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।'

বিধাত্রী দেবী পুনঃ পুনঃ পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, পত্রে অভিমানের বেদনার অপেক্ষা অপমানের জ্বালা তীব্রতরভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। অভিমানকে স্নেহে পরাভূত করা যায়; কিন্তু অপমান যুক্তি তর্কে দূরীভূত করা দুষ্কর। এ স্থলে কি করিলে ভাল হয়? পত্রের মধ্যে 'ইতর' শব্দটা লইয়া নাড়াচাড়া দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল—সে শব্দটা বধূ ব্যবহার করেন নাই ত? আর পত্রের মধ্যে গৌরীর মতের প্রতিও ইঙ্গিত বিদ্যমান। সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যত সহজে এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিবেন, আশা করিয়াছিলেন, তত সহজে তাহা হইবে না। সুশীল চলিয়া গিয়াছে; যাইবার কথা গৌরীকেও বলে নাই; সে পত্রে লিখিয়াছে, গৌরীও তাহার মাতার মত পোষণ করে, এবং দারিদ্র্য ইতরত্বের নামান্তর, এ কথা সহ্য করিতে অসম্মত বলিয়াই সুশীল গৃহত্যাগ করিয়াছে।

যে যৌবনে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে নিকটে পাইতেই ব্যস্ত হয়, সেই যৌবনে সে স্থানত্যাগ করিয়াছে—গৌরী কি তবে তাহার মাতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে?

তিনি বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীলের সঙ্গে কথায় তিনি কি কোনও রূপে ইতর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন? বধূ বলিলেন, 'না।'—কেন না, সে শব্দ-প্রয়োগের কোনও অবসরই হয় নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া বিধাত্রী দেবীরও তাহাই বোধ হইল।

তখন তিনি গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌরী বলিল, সে তেমন কোনও কথাই বলে নাই। কিন্তু তাহার সহিত এ সম্বন্ধে সুশীলের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জানিয়াই বিধাত্রী দেবী শঙ্কিতা হইলেন। কেন সে ও সব কথা বলিতে গিয়াছিল? তিনি বুঝিলেন, মাতার মতে দুহিতার মত অনুরঞ্জিত হইয়াছে—সত্য সত্যই সে ধনের গর্ব্বে মত্ত হইয়াছে। আর সুশীল তাহার মতের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। বিধাত্রী দেবী দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইলেন।

তাহার পর গৌরী যখন মনে করিয়া বলিল, তাঁতিনীর সঙ্গে কথায় সে ইতর শব্দের ব্যবহার করিয়াছিল, এবং সুশীল বোধ হয় তাহা শুনিতেও পাইয়াছিল, তখন তিনি গৌরীর মুখে কাতর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন—'দিদিমণি, এমন সর্ব্বনাশও করিয়াছ!' তাঁহার মনে হইল, গৌরী মঙ্গলঘটে পদাঘাত করিয়াছে—অমঙ্গল ঘটিবেই।

কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার কথায় গৌরীর নয়নে ভীতিভাব ফুটিয়া উঠিল, এবং অকালজলদোদয় যেমন রবিকর আবৃত করে, অশ্রুর উচ্ছ্বাস তেমনই সে ভাব আবৃত করিল, তখন তিনিই আবার তাহাকে প্রবোধ দিলেন—পুরুষের ভালবাসা সাগরের মত; অভিমানের বাতাসে তাহাতে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠে—সমুদ্র অস্থির বোধ হয়; কিন্তু তাহার গভীর প্রদেশে সে চাঞ্চল্য প্রবেশ করিতে পারে না—তথায় সব স্থির। সে ভালবাসা কখনও বিচলিত হয় না। সত্য বটে, সুশীল রাগ করিয়াছে; কিন্তু সে রাগ কখনও স্থায়ী হইবে না—কেন না, তাহাতে ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বিধাত্রী দেবী গৌরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু আপনি আপনাকে বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি গৌরীর কথা ভাবিয়া একান্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তবে তিনি বুঝিলেন, দিন কতক না যাইলে এ ব্যাপারের কোনও রূপ প্রতীকার সম্ভব হইবে না। তাই তিনি আবার কাশীযাত্রার আয়োজন করিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি গৌরীকে অনেক বুঝাইয়া গেলেন—যাহাতে তাহার মনে সুশীলের প্রতি কোনও বিরুদ্ধভাব স্থান না পায়, সেই জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন, সুশীল যাহা করিয়াছে, তাহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। দৃঢ়তাই পুরুষের গুণ। ভাঙ্গিবে, কিন্তু মচকাইবে না, ইহাই পুরুষের স্বভাব। যে পুরুষ নত হয়, সে দুর্ব্বল। পুরুষ দৃঢ় ও সবল হইলে তবে সে বহু জনের আশ্রয় ও পত্নীর অবলম্বন হয়। ভালবাসার কোমলতা দিয়া পুরুষের দৃঢ়তা জয় করিতে হয়—কঠোরতায় সে দৃঢ়তা জয় করা যায় না। সুশীল যে বিধবা ভগিনীর জন্য স্বয়ং কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে ত তাহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কয় জন তেমন ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে? তাহার সেই ত্যাগের জন্য গৌরী গর্ব্বানুভব করিবে।

তিনি গৌরীকে বলিয়া গেলেন, 'দিদিমণি, সুশীল বাড়ী আসিলে আপনার দোষ স্বীকার করিও—স্বামীর কাছে আর দেবতার কাছে দোষ স্বীকার করিতে লজ্জা নাই; তাহাতে ক্ষমার সঙ্গে আদর লাভ করা যায়। আর সুশীলের বাড়ী আসিবার সংবাদ জানিতে পারিলেই আমাকে জানাইও। আমি আবার আসিব। যত দিন এই ভুল সংশোধিত না হইবে, তত দিন আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না।'

নূতন করিয়া বিদায়ের কাল আসিল। বিধাত্রী দেবী বেদনাভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আবার কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, যদি বুকের রক্ত দিয়াও গৌরীর এই ভুলের চিহ্ন মুছিয়া দিতে পারিতেন! তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল—কিন্তু সেই অশ্রুও তাঁহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার জ্বালা প্রশমিত করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

টেলিগ্রাম।

১

বিপিনচন্দ্র মিত্র দিল্লীর ডাকঘরের হিসাব আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনে চাকরী করেন। পুত্র নরেশের বি. এ. পাশ করা পর্য্যন্ত বিদেশে অল্প আয়ে তাঁহাকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হয়। এখন তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। তাঁহার শ্যালক হেমচন্দ্র ঘোষ মীরাটের মিলিটারী অফিসের বড় বাবু।

তিনি সম্প্রতি সাহেবকে বলিয়া নিজের আফিসেই নরেশের এক শত টাকা বেতনের একটি চাকরী করিয়া দিয়াছেন। বিপিন বাবুর অবস্থা ভাল হইলে কি হয়, তিনি কৃপণতা করিয়াই হউক, অথবা ব্যয়বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়াই হউক, তাঁহার সেই গন্ধনালার ক্ষুদ্র বাড়ীটি এখনও পরিত্যাগ করেন নাই; স্ত্রী ও একটি দশম বর্ষীয়া কন্যা লইয়া, সাবেক কালেই দিন পাত করিতেছেন।

আজ শনিবার। আফিস হইতে আসিয়া বিপিনবাবু সবেমাত্র জলযোগ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় সদর দরজায় সজোরে ঘা পড়িল। লাল সাইকেল হইতে নামিয়া টেলিগ্রাফ পিয়ন ডাকিল, 'বাবুজী, তার হ্যায়, দেখ্‌না কিস্‌কা।'

'এখন আবার কে টেলিগ্রাম করলে?' বলিতে বলিতে বিপিনবাবু অর্দ্ধভুক্ত জলখাবার পরিত্যাগ করিয়া ব্যগ্রভাবে ছুটিলেন। বিপিনবাবুর স্ত্রী ডিবে হাতে কক্ষান্তরে পান আনিতে যাইতেছিলেন, টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিনবাবু কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেই তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার টেলিগ্রাম এল?'

বিপিনবাবু টেলিগ্রামের আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন, 'Your son attacked with plague, come sharp, Hem.' বিপিন বাবুর স্ত্রী উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'ল?' বিপিনবাবু কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া, উত্তর করিলেন, 'মীরাট থেকে হেম তার করেছে, নুরুর প্লেগ—শীগ্‌গির এস।'

কথাটা শুনিবামাত্র বিপিনবাবুর স্ত্রীর হাত হইতে পানের ডিবেটি সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না; পার্শ্বস্থ শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন।

বিপিনবাবু নীরব। তাঁহার মনে প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল। তিনি টেলিগ্রাম হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখে একটি মার্জ্জার তাঁহার জলখাবারের পাত্র হইতে ভুক্তাবশেষ কচুরীগুলি নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিতে লাগিল; আর তিনি টেলিগ্রামের কাগজখানি ভাঁজ করিতে করিতে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

২

'সেই ভোর সাড়ে চারিটার সময় মীরাটে যাবার একখানা গাড়ী

আছে। সেখানা কাল সকালে সাড়ে সাতটার সময় গিয়ে পঁহুছিবে, এর আগে আর কোনও গাড়ী নেই দেখ্‌ছি যে।' বিপিনবাবু বিমর্ষবদনে একখানা 'টাইমটেবলে'র পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন।

যথাকালে বর আসিয়া উপস্থিত না হইলে কন্যাকর্ত্তা যেরূপ উদ্বিগ্ন হন, সেদিন মীরাটে যাইবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, বিপিনবাবুর স্ত্রীও সেইরূপ উতলা হইয়া পড়িলেন; কহিলেন, 'যাও না একবার ষ্টেশনওয়ালাদের কাছে, যদি বলে' কয়ে এখনি যাবার একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে পার।'

কন্যা হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ গৃহের এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। উপস্থিত ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি না করিলেও, পিতার মলিন বদন ও মাতার সাশ্রু-নয়ন দেখিয়া তাহার মনে কি এক ভাবের উদয় হইল। সে পিতার ক্রোড়ে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, 'এখনি মীরাটে যাব বাবা, গাড়ী ডাক।'

কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিপিনবাবুও অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, 'মীরাট কি এখানে মা—যে ঘোড়ার গাড়ী করে যাব? সেখানে রেলের গাড়ী করে যেতে হয়।'

'তবে রেলের গাড়ী করে'ই আমাদের নিয়ে চল।' হেমাঙ্গিনী পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল।

বিপিনবাবুর স্ত্রী এতক্ষণ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, কর্ত্তব্যের কশাঘাতে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে দীপ জ্বালিবার জন্য উঠিলেন, এবং কহিলেন, 'আমার প্রাণ কেমন করছে, আমিও নরুকে দেখ্‌তে যাব।'

বিপিনবাবু সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না, নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী দীপ-হস্তে টেবিলের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে, তিনি ধীরভাবে বলিলেন, 'এখন আমিই যাই। সেখানে গিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করব, কি বল?'

'যা ভাল বোঝ, তাই কর।' বলিয়া তাঁহার স্ত্রী দীপটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, অবসাদভরে পুনরায় শয্যার উপর গিয়া বসিলেন।

বিপিনবাবুর মনে নানারূপ দুশ্চিন্তা একত্র জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। তিনি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মনের ভাব কতকটা হাল্কা করিয়া, আপন মনে বলিলেন, 'এখন একবার ষ্টেশনে গিয়ে ভাল ক'রে গাড়ীর খবরটা নি।'

বিপিনবাবু চটী পায়ে গেঞ্জী গায়ে ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে, শার্টটি পর্য্যন্ত গায়ে দিতে তাঁহার মনে হইল না। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমে Enquiry Officeএ খবর লইলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একবার ষ্টেশনমাষ্টারকে, একবার টিকিট-কলেক্টারদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলেরই এক উত্তর,—রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় ৫নং প্ল্যাটফরম্ হইতে মীরাটের গাড়ী ছাড়িবে; তার আগে আর কোনও গাড়ী নাই। অগত্যা তিনি হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

'ওরে হিমি, দেখ্ আমার ব্যাগটা কোথায়। কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে রাখি। এর পর শেষরাত্রে কাপড় গুছতে গিয়ে দেরী হয়ে পড়্‌বে।'

তাঁহার স্ত্রী এতক্ষণ মনে মনে ঠাকুর দেবতাদের ডাকিতেছিলেন। যত দেবদেবীর নাম তাঁহার মনে পড়িতেছিল, কাহাকেও বুক চিরিয়া রক্ত দিবার অঙ্গীকার করিয়া, কাহাকেও বা যোড়া পাঁঠা বলি দিবার কামনা করিয়া, সকলেরই নিকট কিছু না কিছু মানসিক করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'সেখানে চিকিৎসার জন্যে যদি কিছু টাকার দরকার হয়, আমার বালা যোড়াটাই সঙ্গে নিয়ে যাও না; এখন ত আর পোষ্ট-আফিস থেকে টাকা আনা যাবে না।'

'হাঁ, তাই দাও।' বিপিনবাবু কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিলেন। পরে আপন-মনে বলিতে লাগিলেন, 'এখনি কাপড় জামা সব পরে রাখি, এর পর শেষ রাত্রে সাজ-গোছ করতে গিয়ে ট্রেণ ফেল হ'ব।'

বিপিনবাবুর ব্যস্ততা দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'তুমি একটু শোও না, আমি হাতের কাছে সব গুছিয়ে রাখ্‌ছি।'

স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বিপিনবাবু শয্যায় উপবেশন করিলেন; কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁরে হিমি, আমি সকালে ঘড়ীর দম দিয়ে ছিলুম ত? যদি ঘড়ী বন্ধ হ'য়ে যায়, তা হলে ত রাত্রে সময় ঠিক করতে পারব না, ট্রেণ ফেল হ'ব।'

বিপিনবাবু টেবিলের উপর হইতে তাঁহার ছোট 'ক্রুরভাইসার' ঘড়ীটা গ্রহণ করিয়া একবার খুলিয়া দেখিলেন।

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'না হয় এখন একবার দুই এক পাক দম দিয়েই রাখ না।'

কথাটা বিপিনবাবুর যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল। তিনি ঘড়ীর পিছনের ডালা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে কয়েক পাক দম দিলেন, এবং ঘড়ীটি সযত্নে শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া শয়ন করিলেন।

৪

'ও গো, জেগে আছ? আলোটা জ্বালো না, দেখি, কটা বাজলো।'

বিপিনবাবুর স্ত্রী আলো জ্বালিলেন। বিপিনবাবু ঘড়ী খুলিয়া দেখেন, সাড়ে তিনটা। তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। টিকিট-ঘরে গিয়া মীরাটের একখানা টিকিট চাহিলেন। বুকিং-ক্লার্ক তাঁহার পরিচিত বাঙ্গালী। সে অবিলম্বে তাঁহাকে মীরাটের টিকিট দিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন সময় মীরাটের টিকিট কি করবেন?'

'এই বিকালে তার পেলম, নরুর অসুখ।'

'কি অসুখ?'

'প্লেগ।'

এমন সময় বিপিনবাবুর পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি লাহোরের টিকিট চাহিল। বাঙ্গালী বাবুটি লাহোরের টিকিট দিতে অগ্রসর হইবামাত্র, বিপিনবাবু আর অপেক্ষা না করিয়া একেবারে প্লাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্লাটফরমে একখানি ট্রেণ যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আরোহীর ঠেলাঠেলিতে, ফিরীওয়ালার 'চা গরম', 'গরম হালুয়া' প্রভৃতি চীৎকারে, লগেজপূর্ণ ঠেলাগাড়ী-বাহকের 'হঠ না,—হঠ যাইয়ে' প্রভৃতি রবে প্লাটফরম বেশ সরগরম।

বিপিনবাবু কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, একটা অপেক্ষাকৃত খালি গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তিনি ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বার বার ঘড়ী খুলিয়া দেখেন, আর নিজের মনে বলিতে থাকেন, 'তাই ত, ট্রেণ লেট হয়ে যাচ্ছে না কি!'

তাঁহার সম্মুখের বেঞ্চীতে এক জন বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তিনি কহিলেন, 'না মশায়, ট্রেণ লেট হয় নি, আপনার ঘড়ী বোধ হয় পাঁচ মিনিট ফাষ্ট আছে।'

এমন সময় টিকিট-কলেক্টার আসিয়া টিকিট দেখিতে চাহিল। গাড়ীর অপরাপর সকলে টিকিট দেখাইল। বিপিনবাবুকে আর টিকিট দেখাইতে হইল না। তাঁহার হস্তস্থিত টিকিটের হলদে রঙ দেখিয়াই টিকিট-কলেক্টার তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

৫

দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে বিপিনবাবু বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ক্ষুদ্র কম্বলখানি বিছাইয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিলে কি হয়, নিদ্রা কি সহজে তাঁহাকে জয় করিতে পারে! তিনি আপনার চিন্তায় বিভোর। গাড়ী চলিতেছে, মাঝে মাঝে থামিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কত আরোহী নামিয়া যাইতেছে, কত নূতন নূতন আরোহী গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেছে। বিপিনবাবুর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি একবার উঠিয়া বসেন, জ্যোৎস্নালোকে দেখেন, মাঠের সমচতুর্ভুজাকৃতি (Square) আলগুলি সব রম্বস্ (Rhombus) আকৃতি ধারণ করিয়া একে একে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। মাঠের উপরিস্থিত গাছগুলি সব ম্রিয়মাণ; তাহাদের প্রাণে যেন কতই বেদনা! তাহারা জ্যোৎস্নার অযাচিত পরিহাসে বিরক্ত হইয়া নির্জ্জন অন্ধকারের আশ্রয়ে কাঁদিবার জন্য যেন দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে। বিপিনবাবুর এ দৃশ্য ভাল লাগিল না। তিনি আবার শয়ন করিলেন। শয়নেও তৃপ্তি পাইলেন না, উঠিয়া বসিলেন।

'তাই ত, সাড়ে তিনটে বেজে গেল, এখনও যে সকাল হ'ল না!' বিপিনবাবু ঘড়ী খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি সম্মুখের বেঞ্চিতে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। বিপিনবাবুর উক্তিতে তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'সাড়ে ছ'টা কি মশায়! এখন সবে তিনটে বেজে পঁচিশ মিনিট্।'

বিপিনবাবু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তিনটে বেজে পঁচিশ মিনিট? সাড়ে চারিটার সময় ত দিল্লী থেকে গাড়ী ছেড়েছে!'

ভদ্রলোকটি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি কি বল্‌ছেন, তা বুঝতে পার্‌ছি না। কোথায় যাবেন, বলুন দেখি?'

'কেন? মীরাট।'

'কিন্তু চলেছেন যে অন্য রাস্তায়; এ গাড়ী ভাটিণ্ডা হ'য়ে লাহোরে যাচ্ছে যে।

'কি রকম! সাড়ে চারিটার সময় দিল্লীর ৫নং প্ল্যাটফরম থেকে দু'খানা গাড়ী ছাড়ে না কি?'

'আজ্ঞে না। এ গাড়ীখানা দিল্লী থেকে রাত দেড়টার সময় ছেড়েছে।'

বিপিনবাবু হঠাৎ ভদ্রলোকটির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না; অপর দুই এক জন আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই যখন এক উত্তর দিল, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে অতীতের সকল কথা তড়িৎপ্রবাহের মত সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাকে কি এক ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, একেবারে গাড়ী থামাইবার শিকল ধরিয়া টানিবার জন্য ধাবিত হইলেন।

ভদ্রলোকটি ব্যাপার ঠিক উপলব্ধি না করিলেও, বিপিনবাবুর মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে, এমন একটা কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে ইঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। সুতরাং তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ক্ষিপ্রগতিতে যাইয়া বিপিনবাবুর হাত ধরিলেন, বলিলেন, 'করেন কি মশায়, পাগল হ'লেন নাকি!'

'আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল মশায়। আর বুঝি আমি নরুকে দেখ্‌তে পাব না।' বিপিনবাবু বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটি উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; 'ব্যাপার কি, খুলেই বলুন না।'

বিপিনবাবু কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রকৃতিস্থ হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'আপনার ঘড়ী নিশ্চয় ভুল ছিল।'

'তা কি করে' হবে? আমি সন্ধ্যাবেলা ষ্টেশন থেকে ঘড়ী মিলিয়ে নিয়ে-গেছি। যদি সকালে ঘড়ীর দম দিয়ে না থাকি, এই ভেবে, শোবার সময় দশ বারো পাক দমও দিয়েছি।'

ভদ্রলোকটি কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিলেন; পরে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি শোবার সময় ঘড়ীতে দম দিয়ে শুয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'দেখি আপনার ঘড়ীটা।'

বিপিনবাবু তাঁহার ঘড়ীটী ভদ্রলোকটির হাতে দিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ঘড়ীটা ক' পাক দম খায়, জানা আছে? আপনি কখন দম দেন?'

'পঁচিশ ছাব্বিশ পাক। সকালেই দম দি।'

ভদ্রলোকটি ঘড়ী খুলিয়া চাবী দিয়া দম দিতে আরম্ভ করিলেন।

'আপনি রাত্রে, কি রকম দশ-বারো পাক দম দিয়েছিলেন? এই ত বাইশ তেইশ পাক দম দিলুম। আপনি নিশ্চয়ই ঘড়ীর পাশের গর্ত্তটায় চাবী না দিয়ে মাঝের গর্ত্তটায় চাবী লাগিয়ে দম দিয়েছিলেন; আর তাইতেই ঘড়ীর কাঁটা ঘুরিয়া গিয়াছে।' তিনি বিপিনবাবুকে ঘড়ী ফিরাইয়া দিলেন।

বিপিনবাবু তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন, 'এখন কি করি বলুন।'

'যা হবার, তা হয়ে গেছে। এখন বিপদকালে অধৈর্য্য হবেন না।' ভদ্রলোকটী একখানি টাইম-টেবিল দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'দেখুন, এই সাম্‌নের ফিরোজপুর ষ্টেশনে নেমে পড়ুন। সেখান থেকে, সকাল দশটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দিল্লী যাবে। সেখানা দিল্লী পঁউছবে বেলা আড়াইটার সময়। তা হলে চারটার সময়ের মীরাটের গাড়ী ধরতে পারবেন।'

রাত্রি আটটা। বিপিনবাবু তাঁহার কম্বলাবৃত ক্ষুদ্র ব্যাগটি বগলে করিয়া মীরাটে তাঁহার শ্যালক হেমচন্দ্র ঘোষের বাসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীটী নিস্তব্ধ। বিপিনবাবু কাহাকেও ডাকাডাকি না করিয়া, একেবারে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একটি অপরিচিত ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। বিপিনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হেমবাবু কোথায়?'

'তিনি শ্মশানে দাহ করতে গেছেন। তাঁর আসবার সময় হয়েছে। বসুন।' ভদ্রলোকটি উঠিয়া তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকটির কথা বিপিনবাবুর মনে এরূপ সজোরে আঘাত করিল যে, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকটিকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু শত চেষ্টাতেও মুখে কথা বাহির করিতে পারিলেন না; কেবল একদৃষ্টে ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেই করুণ ও বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি ভদ্রলোকটির অন্তস্তল ভেদ করিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় হেমবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিপিনবাবুকে তদবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হেমবাবু

স্তম্ভিত হইলেন। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে একবার ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া বিপিনবাবুর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, 'মিত্তির মশায়! এ ভাবে! কখন এলেন? ব্যাপার কি?'

বিপিনবাবু তখন মূর্চ্ছিত। হেমবাবুর কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল না।

•   •   •   •

হেমবাবুর বৈঠকখানা প্রত্যহ সকালে তামাক, চা ও গল্প গুজোবে বেশ একটু জমাট থাকে। আজ সকালে দুই এক জন ভদ্রলোক আসিয়া জুটিয়াছেন। খোস গল্পও আরম্ভ হইয়াছে। এমন সময় হেমবাবু ভগ্নীপতি বিপিন বাবুর সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দেখুন ভুবনবাবু, আমাদের এই মিত্তির মশায় ভারি হুঁসিয়ার লোক!'

'কি রকম?'

'পটুলাদের মেসে কাল যে ছেলেটি প্লেগে মারা গেল, তার বাপ বিপিন মৈত্রকে আমি সেই খবর জানিয়ে দিল্লীর গন্ধী গলীর ঠিকানায় একখানা তার করি। আমাদের এই মিত্তির মশায় এমনি পণ্ডিত যে, ঠিকানার বিপিন মৈত্রকে বিপিন মিত্র, আর গন্ধী গলীকে গন্ধনালা পড়ে টেলিগ্রামটা নিজের বলে নেন; আর হন্তদন্ত হয়ে কাল রাত্রে আমার বৈঠকখানায় এসে মূর্চ্ছা যান। আহা! বেচারীর ছেলেটা মারা গেল, খবরটা পর্য্যন্ত পেলে না।'

বিপিনবাবুর পুত্র নরেশ ওরফে নরু ঘরের এক কোণে বসিয়া ছিল। সে বলিল, 'মামা, এই ন'টার গাড়ীতেই আমি বাবার সঙ্গে দিল্লী যাই। মা সেখানে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—'

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'মিস্‌টিক কবি' নামক প্রবন্ধটিও 'মিস্‌টিক্' বটে। ইহাও 'সূক্ষ্ম জগতের কথা'; এত সূক্ষ্ম যে, ধরা যায় না। লেখক ইহাকেও 'অতীন্দ্রিয়ের দিকে চালাইয়া দিয়াছেন'। ইহাতে অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু বোধ হয়, লেখক বহুং অন্ততঃ তাহাদের দুই চারিটির প্রকৃত অর্থের সহিত অপরিচিত। যথা,— 'তাঁহারা দেখিতে চাহিয়াছেন * * ইহাকে অমূত্রের আভায়।' 'অমুত্রে'র অর্থ 'পরলোক' নয়, 'পরলোকে'। উহাতে একটা বিভক্তি আছে, তাহা লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধটি খুব উঁচু

তরের intellectual gimnastic বা বুদ্ধির কসরৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সাহিত্যিক হঠযোগের মর্ম্ম বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে না। এক স্থলে দেখিতেছি, 'Mysticism আর-এক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততখানি আর-এক জগতের কথা নয় যতখানি আর-এক জগতের ভঙ্গিমায় কথা বলা।' 'আর-এক জগৎ' আছে, তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু সে জগতের 'ভঙ্গিমা' কি, তাহা এ জগতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে বিষয়েও বোধ করি, এই মতান্তরের দেশেও মতান্তরের সম্ভাবনা নাই। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', তাঁহার দেশের 'ভঙ্গিমা'ও বোধ করি অজ্ঞেয়। পরকালের 'ভঙ্গিমা'ও নিশ্চয়ই মূকাস্বাদনবৎ। লেখক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন।' আমরা জানিতাম, এ পারের পরে ও পার, ইহলোকের পর পরলোক, ঐহিকের পর-পারে আধ্যাত্মিক, এবং অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, রবীন্দ্রনাথ ও পারের কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে 'আধ্যাত্মিকতার ওপারে'র কথা বলিয়াছেন, বা বলেন, এ আবিষ্কার নিশ্চয়ই মৌলিক। তবে 'আধ্যাত্মিকতার ও পার' কি বস্তু, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহা নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয়! লেখক তাহা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের শরীরে সকলের পক্ষে সেরূপ অনুভূতি সম্ভব নহে। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বেচারীর বেচাল' স্পর্দ্ধ হইয়াছে। ফুটনোটে প্রকাশ,—'লেখকের অনুসরণে।' দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রকরণ ও অনুকরণের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অনুসরণ ও চন্দ্রসংগ্রহের পার্থক্য কে বুঝাইয়া দিবে? লেখকও রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারেন,—'জানই আমার সকল কাজে Originality!' অন্ততঃ তাঁহার 'মৌলিকতা' তাঁহার একচেটে,' তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী যে স্থলে 'ক্যাল-ক্যাল করিয়া' চাহিয়া থাকে, সে স্থলে লেখকের গল্পের 'কর্ত্তা হেঁট-মাথায় মাটির দিকে ফ্যাসফেসে চোখ মেলিয়া রহিলেন।' শ্রীসুশীলকুমার দের 'বক্রোক্তি' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। কিন্তু লেখক খাস্-খাস্ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,—'ভামহের মতে, সংকাব্য 'নাতি-সমস্তার্থ' 'মধুর' 'শ্রব্য' এবং 'আবিদ্বদঙ্গনাবালপ্রতীতার্থপ্রসাদবৎ' হইবে।' ইহা কি বাঙ্গালী পাঠক বুঝিতে পারিবে? 'ভামহের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত' না-সংস্কৃত, না-বাঙ্গালা; তবে 'বাংলা' হইতে পারে। 'নিকট'কে ভামহের নিকটে না ধরিয়া লইয়া না গেলে কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর 'বর্ষ-মঙ্গল' নামক গানটি মনোরম। ইহার ঝঙ্কার উপভোগ্য।—'কিরণে কিরণে বরণ-বরণা ঝলকে গগনে গগনে!' শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আলোর ফুলকি'তে আধুনিক যুগের পঞ্চতন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মানব দেহের আদর্শ' ছবিগুলির বাহনমাত্র। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভোরমান্' সুখপাঠ্য। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 'মিস্টিক্ কবি'তে গদ্যে যে অবোধ্য হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্যে তাহার ঢেউ তুলিয়াছেন। কবি প্রশ্ন করিয়াছেন,—'হরিদ্বারে গঙ্গাসাগর উথলে ওঠে জান্তো কে?' সমগ্র বাঙ্গালী এক-কণ্ঠে উত্তর দিতে বাধ্য, কেউ না, এক প্রাণীও এ রহস্য জানিত না। ইহা যেমন উদ্ভট, তেমনই মৌলিক; অতএব, ইহা কবিতাও বটে, কবিত্বও বটে। এই রকম আজগুবী, অসম্ভব, অসংবদ্ধ প্রলাপই আজ কাল বাঙ্গালা 'কাব্যে'র প্রধান মশলা হইয়া উঠিয়াছে। আগে আমাদের

যাত্রার সং-এর মুখে এই রকম উদ্ভট কল্পনার গান দিবার রীতি ছিল। সেগুলি ছিল ridiculous, নব্যবঙ্গের বালখিল্য কবিরা তাহাদিগকে sublime করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'স্বপ্নের মতন' আটাশে ছেলের মত অপুষ্ট।

প্রবাসী। বৈশাখ।—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তানপুরা' নামক ছবিখানির তানপুরার নীচে খানিকটা লাল রঙের প্রবাহ দেখিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, বুঝি বা তানপুরা খুন হইয়াছে, তাহার রক্তস্রোত বহিয়া বাজিমটা রঞ্জিত করিতেছে। অবশেষে 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির'—উহা খেয়োর গেলাপ্ হইতে পারে। কল্পনাটি প্রতিভার দান। চিত্রে সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু 'ম্যানারিজমে'—মুদ্রাদোষে তাহার অধিকাংশ গ্রাস করিয়াছে। ইঁহাদের প্রতিভা মুদ্রাদোষমুক্ত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।—এবারকার 'প্রবাসী' প্রবন্ধ-সম্পদে খুব সমৃদ্ধ। সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর 'আহত উদ্ভিদ।' ফুটনোটে প্রকাশ,—'সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা, সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।' 'স্বত্ব' না 'সত্ব'? জগদীশ বাবুই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কৃত শব্দের সংস্কার বা সংকার আরম্ভ করিলেন, না 'প্রবাসী'? সাহিত্য-পরিষদের ত্রৈমাসিক সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি স্যর জগদীশের পরিষদে বহুপূর্ব্বে পঠিত এই প্রবন্ধটি তাহাতে দেখিলাম না। পরিষদের কেবল শুনিয়াই সুখ! বাস্তবিক, ব্রাহ্ম লেখকগণের স্বসম্প্রদায়-প্রীতি দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না!—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সহজ ভাষায় উপন্যাসের মত মনোরম করিয়া দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যগুলি বুঝাইয়াছেন। জগদীশ বাবুর ইচ্ছা ছিল, কলের নাম 'ক্রেস্কোগ্রা'ফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখেন। কিন্তু অপভ্রংশে 'বৃদ্ধিমান' হইতে 'বর্দ্ধমান', এবং তাহা হইতে 'বারুদোমান' হইবার ভয়ে তাহা পারেন নাই। এ কৈফিয়ৎ দিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ইহা জগদীশ-ভক্ত হইলেও আমরা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিব না। তাঁহার নামটাও 'জ্যাগ্ডাইশ্ চ্যাণ্ডার' হইতে পারে, হয় ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য কি ইউরোপের বিকৃত উচ্চারণের ভয়ে তাহাও ইউরোপের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দিবেন—Universe-King-Moon? 'সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত' না হইলে আমরা তাঁহার উপসংহার—'জন্মভূমি'টুকু উদ্ধৃত করিতাম।—'প্রবাসী'র দ্বিতীয় প্রবন্ধ, 'বিজ্ঞানচর্চ্চা—প্রাচীন ও নব্য ভারতে একনিষ্ঠ সাধনা' আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রচনা। ইহা তাঁহার ইংরেজী রচনার অনুবাদ। ভাষাতে তাহা সুস্পষ্ট। অনুবাদক কি খোদ্ প্রফুল্লচন্দ্র? 'প্রবাসী'তে অবশ্য তাহার কোনও উল্লেখ নাই। প্রবন্ধের নীচে লেখকের হিসাবে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বাক্ষর আছে। কিন্তু ভাষা দেখিয়া তাঁহাকে লেখক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁহার যে রচনা-রীতির সহিত আমরা পরিচিত, অনুবাদে তাহার সাদৃশ্য নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আক্ষেপ করিয়াছেন,—'কোথায় আজ গুডিভ্ ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্ত বরাহমিহির আর কোথায় বা সেই রাসায়নিকবৃন্দ—নাগার্জ্জুন যশোধর বজ্রকভৈরব প্রভৃতি? আবার কি এই অভাগা দেশে সে প্রকার মানুষ জন্মিবে না? আমাদের জাতি যেন নিদ্রিত অসাড় জড়বৎ হইয়া রহিয়াছে। অনেকে বলেন, সুযোগের অভাব। কিন্তু আমার তাহাও ত মনে হয় না—১৮৩৫ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—এই ৮৩ বৎসর যাবত[ৎ?] তথায় উদ্ভিদ্-প্রাণী-অস্থি-শারীর বিদ্যা প্রভৃতি অধীত হইতেছে, কিন্তু কই এমন কাহাকেও দেখি

না যিনি নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন। একবার ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ফরাসী দেশের এক জন ব্যবহারাজীবী লিয়োনে সারাজীবন শুঁয়াপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কি প্রকারে দাঁত বসাইয়া কঠিন কাঠের ভিতর ছিদ্র করে এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী ছিলেন। হবর নামক এক জন প্রাণীবেত্তা আজীবন মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা (Life history) লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যৌবনকালেই অন্ধ হইয়া পড়েন। এই কারণে তিনি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে অপারগ হইলেন! কিন্তু তাঁহার বিদুষী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী তাঁহার জন্য মৌমাছির আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমুদয় যত্নে অধ্যয়ন করিতেন। এবং তাঁহার স্বামী এই সমস্ত শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। হবর এই প্রকার একাগ্রতা ও অধ্যবসায়সহকারে এক বৃহদায়তন পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং এক জন অসামান্য মক্ষিকা-চরিত্র-বেত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। জিয়োভার্ট নামক এক জন বিনেমার চিত্রকর পতঙ্গ জাতির অদ্ভুত জীবন-রহস্য অধ্যয়ন করিবার জন্য ৩০ বৎসর যাবত তন্ময় ছিলেন। রাজারাজড়ার সভায় নিমন্ত্রিত হইলে তিনি এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন "আপনারা অকারণ নানা রঙের মহামূল্য বেশভূষা করেন কেন? আপনাদের কি লজ্জা হয় না যে একটি অতি হেয় প্রজাপতিকে ঈশ্বর যে প্রকার সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন আপনারা তাহার শতাংশের এক অংশও নকল করিতে পারিবেন না"।'— এই সূত্রে আমরা আর একটি কথার অবতারণা করিব। সংস্কৃত শব্দই যদি ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে সে শব্দগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিয়া চলিবে কি না? প্রাণী ও তত্ত্বে সমাস হইলে 'প্রাণিতত্ত্ব' হয়। আর 'প্রাণী'কে দীর্ঘ ঈকারে অগত্যা বঞ্চিত হইতে হয়। যদি সংস্কৃত সমাস চলে, তাহা হইলে তাহার ব্যুৎপত্তির নিয়মগুলি আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইবে কেন?—অনেকে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার আভিধানিক অর্থ বর্জ্জন করেন। যে শব্দের যে অর্থ নয়, সেই অর্থে তাহার প্রয়োগ করেন। ইহারই বা প্রয়োজন কি, হেতু কি? 'তাঁহার সহধর্ম্মিণী * * আচার ব্যবহার, রীতিনীতি * * অধ্যয়ন করিতেন' এবং 'পতঙ্গ জাতির অদ্ভুত জীবন-রহস্য অধ্যয়ন করিবার জন্য', এই দুইটি পদের 'অধ্যয়ন' শব্দে 'অনুশীলন'ই বোধ করি লেখকের উদ্দিষ্ট। 'পর্য্যবেক্ষণ করিতে অপারগ হইলেন', এই বাক্যে 'অপারগ' শোভনও নহে, তাহার মৌলিক অর্থের সন্নিহিতও নহে। এগুলি কি ইচ্ছাকৃত, না অনবধানের ফল? উপসংহারে আচার্য্য রায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—'কিন্তু আমাদের দেশের উকিল মহাশয়গণ তাস, পাশা, আড্ডা, খোসগল্প ও পরচর্চ্চা লইয়াই অধিক সময় যাপন করেন।' আশা করি, আচার্য্যের আক্ষেপ বাঙ্গালীর মর্ম্মে প্রবেশ করিবে।—কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র শুধু উকিলের তাস পাশায় দৃষ্টি দিলেন কেন? বাঙ্গালায় ইহাই যে সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন—এমন কি, 'বিশ্ব' শব্দ দিয়াও ইহার ব্যাপকতা প্রকাশ করা যায়! আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ নহি। অতএব, 'বিশ্ব' দিয়া কোনও শব্দ 'করেন' করিতে পারিলাম না। মুখটা রাধাকুমুদকে ভার দিলাম। 'বিশ্ব' আজকাল তাঁহারই একচেটে। —মনসামঙ্গলে আছে,—'যার জয় কর তুমি, সেই দেবী আমি।' তাই। বিশ্বের নাম করিতে না করিতে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'বিশ্ব-সাহিত্য' সমাগত! প্রবন্ধটি লেখকের 'মিস্‌টিক্ কবি'র মত সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ নহে। ইহার কিছু কিছু বুঝা যায়। 'ক্রমে ফুলে মধু আসে।'

ভবিষ্যতে নলিনীবাবুর রচনা-পদ্ধতি 'খিতাইলে' আমরা নিশ্চয়ই রসভোগ করিব। বিশ্ব-সাহিত্যের পরে 'বিশ্ব-ক্রীড়ার আহ্বান' নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। ইহা শ্রীঅজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা।—'সধবার একাদশী'র একটা সং ক্রমাগত 'father-in-law' বলিয়া ইয়ার-বৃন্দের মাথা ধরাইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যেও আজ কাল সেইরূপ 'বিশ্বে'র ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, অনুধ্বনি শুনিতেছি। অবশ্য, তোমার মাথা ধরিতে পারে। কিন্তু সে জন্য এ ব্যবসা অর্থাৎ এ যুগের রীতি বন্ধ হইতে পারে না। 'এক জন দরদী'র 'আদালত হইতে বাংলা উঠাইয়া দিবার সাংঘাতিক প্রস্তাব' আমরা সকল বাঙ্গালীকে অবহিত হইয়া পড়িতে বলি। আশা করি, সমগ্র বাঙ্গালী এই উদ্ভট প্রস্তাবের প্রতিবাদে অগ্রসর হইবেন। ইহাও বঙ্গভঙ্গের মত বাঙ্গালীর জাতীয়তায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিবে। সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি কি করিতেছেন?—শ্রীনন্দলাল বসুর 'নৃত্যোৎসব' নামক ছবিখানি চিত্রকরের নিপুণতার পরিচায়ক। আমরা কর্মাটাঁড়ে ও দুবকায় সাঁওতাল-নাচ দেখিয়াছি। সাঁওতাল ও সাঁওতালনীদের ধানকাটা প্রভৃতি নাচে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। চিত্রকর কটীর উর্দ্ধে আজানু উলঙ্গ সাঁওতালনীদের যে নগ্ন সৌন্দর্য্য ছবির কাঁধে ধরিয়াছেন, তাহাই যে নাচের বিশেষত্ব, এবং একমাত্র আঁকিবার বস্তু, তাহা ত মনে হয় না। নন্দ বাবুর 'নৃত্যোৎসবে' নৃত্যের ছন্দ অপেক্ষা পিপিতপিণ্ডের গুচ্ছিত রূপই বেশী ফুটিয়াছে। কিন্তু একটা কথা স্বীকার না করিলে নয়, 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র মামুলী ধড়কে কড়িকের আদর্শ অনুস্থিত হইয়াছে। নন্দ বাবু যে পীবর পিপিতপিণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা স্বভাবের অপেক্ষাও প্রচুর। 'মাধবিকা'র কবি বলেন্দ্রনাথের জন্য দুঃখ হইতেছে। তিনি এ ছবি দেখিতে পাইলেন না। মনে হয়, নন্দ বাবু রবীন্দ্রনাথের 'স্তন' ও কাব্যবিশারদের 'বাটখারা' হইতে 'নৃত্যোৎসবে'র inspiration লাভ করিয়াছেন।—'ভারতী'র 'মানব দেহের আদর্শে'র ছবিগুলি ও 'প্রবাসী'র 'নৃত্যোৎসব' বাঙ্গালী ক্রেতাদিগকে মুগ্ধ করিবে, এবং সাধারণ বাঙ্গালী উচ্চ আর্টের না হউক, কামের স্বাদ লাভ করিবে, এবং শূর্পণখা লালসার সাধ মিটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।—যে কেনে, সে নিশ্চয়ই বাহাদুর। আর যে বেচে? সে বেসাতীর হিসাবে নিশ্চয়ই ক্রেতা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর।—আজ কাল বাঙ্গালায় 'আর্টে'র গুরুর ছড়াছড়ি! বিদ্যাসাগর একবার রাজনারায়ণ বাবুকে একটা ছড়া শুনাইয়াছিলেন,—

'পৃথিবীতে যত বেটা, সব বেটা গরু,
যে যারে ঠকাতে পারে, সেই তার গুরু!'

ছড়াটা 'অশ্লীল'—অন্ততঃ নব্য রুচির রাজ্যে অশিষ্ট হইলেও, আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য, পিপিতপিণ্ডপন্থী পয়োধর-প্রিয়দিগকে গালাগালি দিবার আমাদের ইচ্ছাও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। ছড়ার শেষটাই আমাদের উদ্দিষ্ট। আর, ঠকাইবার কথা এ ক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা আর্টের 'আ' জানে না, তাহারাও ইহার ফলভাগী হইতেছে। কিন্তু যাহা গুরুজাতির সনাতন পেশা, আর্টের গুরুরা কিশোর কিশোরীদের কল্যাণ নাশক তুচ্ছ বস্তুর জন্য তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? বাঙ্গালী মনীষীরা আজকাল আর্ট, বিশ্ব-সাহিত্য, ও-পার, অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি অনেক বড় বড় ও ভাল ভাল পণ্যের কারবার

করিতেছেন। ইহা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র'ও ভুলিয়া যাইতেছেন। পীন-পয়োধরের ছবি কলাভবনে ভাবুকের চোখে আর্টের স্থান অধিকার করিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্ববর্ত্তী 'প্রবাসী'র সর্ব্বজনগম্য পাতায় ত শোভা পায় না। কেন না, 'প্রবাসী' সর্ব্বত্র-সঞ্চারী মাসিকপত্র, বিশেষজ্ঞের জন্য কল্পিত কোনও বিশিষ্ট পত্র নহে। নন্দলালের 'নৃত্যোৎসবে' আর্টের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া বাঙ্গালার অনেক কিশোর কিশোরী কেবল ভাবের কলার করিয়া আসিবে, তাহা কি সম্পাদক মহাশয়ও অস্বীকার করিতে পারেন? তাহা কি বাঞ্ছনীয়? তাহা কি দেশের পক্ষে কল্যাণকর?—'দরবেশে'র 'ধূমের গানে' আদৌ কোনও বিশেষত্ব নাই। কবি ইহা গদ্যে লিখিলেন না কেন? ইহার পর কি আমরা মুদীর দোকানে গিয়া বলিব,

আয় মুদী আয়!
পাঁচ সের চাল ঢাল্ আমার থামায়।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'মোগল চিত্রের আমদানী' সুলিখিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। শ্রীরমেশচন্দ্র বসুর 'গৈবীনাথ' সুখপাঠ্য। শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসুর 'রেণু' রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত পদ্য-গল্প। রবীন্দ্রনাথই এই শ্রেণীর রচনায় শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'অন্যে পরে কা কথা।' তবে কবি কৃষ্ণদয়াল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনুকারীদের অপেক্ষা অনেকটা সফল হইয়াছেন। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাণ্টের অভিপ্রেত উৎপাদিকা এবং প্রত্যুৎপাদিকা মনোবৃত্তি'র নামের গর্জ্জন শুনিয়া শঙ্কিত না হইয়া যদি, ভিতরে প্রবেশ কর, তাহা হইলে দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পার আর না পার, রচনার রস ভোগ করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করিবে। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'ভগ্নলগ্ন' সুখপাঠ্য কবিতা। কিন্তু ইহাকে নব্য কবিরা বোধ হয় 'কবিতা' বলিয়াই স্বীকার করিবেন না। কারণ, ছন্দে গ্রথিত হইলেও ইহার আদ্যন্ত বুঝা যায়।—ভরসার মধ্যে এই যে ইহাতেও 'সাঁঝের পোড়ানো বুকে' প্রভৃতির অভাব নাই। শুধু সেই দলীলে ইহা কি 'কবিতা' বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংজীকা বাঙ্গালা জীবনচরিত।—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দশম শিখ গুরুগোবিন্দ সিংহের সচিত্র জীবনচরিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৬২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ২৲।

পুস্তকখানি গুরুগোবিন্দ সিংএর বিস্তৃত জীবনচরিত হইলেও, ইহাতে শিখ জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রথম নয় অধ্যায়ে নানক হইতে নয় জন গুরুর চরিত বিবৃত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দশম গুরুগোবিন্দ সিংএর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মহাপুরুষদের জীবনচরিতপাঠ—তাঁহাদের উপদেশাবলী ও কার্য্যপ্রণালীতে ভগবৎ-প্রেরণার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া জীবনে তাহার অনুশীলন করিবার চেষ্টাই জাতীয়-জীবন-উন্মেষের একমাত্র উপায়। কাজেই বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ জীবনচরিত যত অধিক লিখিত হয়, ততই মঙ্গল।

মুসলমান-আগমনের পরে ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে ইস্লাম-ধর্ম্ম-প্রচার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা উত্তর-পশ্চিম ভারতেই তীব্রতর হইয়াছিল। জন্ম-বিরাগী নানক বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্য করিতেন, 'দেশমধ্যে দুই প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী লইয়া লোকে গণ্ডগোল করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভোগ-সুখেই লিপ্ত রহিয়াছে।' 'এরূপ লোকদিগকে উদ্ধার করিতে উভয় ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্যবিধান এবং ভোগসুখনিবারণের জন্য বৈরাগ্য আশ্রয় ভিন্ন আর কি উপায় আছে?' 'কিসে অসার গণ্ডগোল ত্যাগ করিয়া লোকে ঈশ্বর-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিবে, সেই জন্য নানকের মন ব্যাকুল হইল।' হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণশীল, অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের হিন্দু হওয়া অসম্ভব, অথচ মুসলমান রাজশক্তির ছায়ায় ইস্লাম ধর্ম্মের প্রভাব কম নয়, তাহার বিস্তৃতি অনিবার্য্য বুঝিয়াই, 'উভয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে পারে—' এরূপ মহাপুরুষের যে সময়ে পাঞ্জাবে জন্ম হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। প্রথম গুরু নানকই সেই মহাপুরুষ।

নানক 'সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে অংশটিতে মুসলমান ধর্ম্মের ধরণের কথা আছে, তাহাই সমুজ্জ্বল করিয়া উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিলেন।' নানক-প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ 'গুরুভক্তি'। নানকের শিষ্য লেহনা (পরে গুরু অঙ্গদ) বুদ্ধা ও গোবিন্দ সিংএর শিষ্য দয়াসিং, ধর্ম্মসিং প্রভৃতি পাঁচ জন তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুর গুরুই সম্মিলনের মহৎ উপায়, এবং গুরুভক্তিই জীবের উন্নতির একমাত্র উপায় স্বরূপ', ইহা নানক দেখাইয়া গেলেন।

কালক্রমে এই গুরুভক্তির সহিত অসীম সংযম ও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া প্রায় দুই শত বৎসরে নূতন খালসা জাতি গঠিত হইলে, দশম গুরু গোবিন্দ সিংএর সময় দিল্লীর সম্রাটও তাঁহার প্রভাবে কিরূপে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

যে জাতি 'গুরু অপেক্ষা গুরু আজ্ঞা বলবান', এই মহাবাক্য সিদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের চরিত্র বাঙ্গালীর পাঠ্য। এরূপ জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত করিবে।

পুস্তিকাতে অনাবিল আনন্দসম্ভোগ ঘটে না। এই পুস্তকে ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গতি থাকিলেও চরিত্রগুলির বেশ স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গুরুগোবিন্দ সিং এক জন মহাপুরুষ। তিনি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন ক্রমাগত একের পরে অন্য যুদ্ধ করিয়াই চলিয়া গেলেন। দেশের বা সম্প্রদায়বিশেষের তদানীন্তন অবস্থার চিত্র বড় পাওয়া যায় না। কোনও লোককে ঠিক বুঝিতে হইলে তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবৃত—সামাজিক, নৈতিক ও রাজনীতিক—জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ, মহাপুরুষের জীবনচরিতে তাহার কিছু আশা করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ গ্রন্থে সে কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। দুর্ব্বোধ্য গুরুমুখী ভাষায় লিখিত 'শ্রীগুরু প্রতাপ সূর্য্য প্রকাশ', 'গ্রন্থ প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনূদিত হওয়ায় বোধ হয় এই ত্রুটী থাকিয়া গিয়াছে। তথাপি শিখ জাতির ইতিহাস জানিবার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অমূল্য গ্রন্থ।

অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে। ভাষাও সংস্কার ও প্রসাধনের অতীত নয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে, বিশেষ প্রথম সংস্করণে এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু যে কারণেই ইহা ঘটিয়া থাকুক, আজকালকার দিনে আমাদের এটুকু ঔদাস্য বা অক্ষমতাও অমার্জ্জনীয় নহে কি? বিশেষতঃ জীবনচরিত বা ঐতিহাসিক গ্রন্থে। নিদর্শন, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নানকের জন্ম ১৮০৯ খ্রীঃ লেখা হইয়াছে। তাহা ১৫০৯ হওয়া উচিত। এরূপ ভুল মারাত্মক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

সুদাস।

২

বিশ্বামিত্র ঋষির সিন্ধুতীরে গমনের উদ্দেশ্য কি? আমাদের মনে হয়, তিনি সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন। নানা দেশের আর্য্যদিগকে লইয়া দলপুষ্টি করিয়াছিলেন। পরে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিয়া বিপাশ ও শুতুদ্রীর সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপনীত হন। শকট ও রথ লইয়া ভরতগণ গোলাভ-মানসে বিশ্বামিত্রের সহিত আসিয়াছিল, তাহা ৯ম, ১১শ ও ১২শ ঋকে বর্ণিত হইয়াছে।

যৎ। অঙ্গ। ত্বা। ভরতাঃ। সংতরেয়ুঃ। গব্যন্। গ্রামঃ। ইষিতঃ। ইন্দ্রজূতঃ।

অর্ষাৎ। অহ। প্রসবঃ। সর্গতক্তঃ। আ। বঃ। বৃণে। সুমতিম্। যজ্ঞিয়ানাম্॥ ১১

তোমাকে ভরতগণ নিশ্চয় উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক; (তাহাদের) দল গো-ইচ্ছুক হইয়া ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত ও অনুজ্ঞাত। গমনে প্রবৃত্ত স্রোত যেন গমনের উপযুক্ত হয়। যজনীয়া তোমাদিগের সুমতি প্রার্থনা করি।

[গব্যন্ গা আত্মন ইচ্ছন্। সায়ন এই স্থানে গা অর্থে উদকানি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, বিশ্বামিত্র ঋষি যমুনাতীরে গোলাভের জন্যই গমন করিতেছেন। অতএব গব্যন্ অর্থে— 'জল-উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক' করিবার আবশ্যকতা নাই। পর ঋকে কিন্তু সায়ন গব্যবঃ অর্থে গো-ইচ্ছুক করিয়াছেন।]

অতারিষুঃ। ভরতাঃ। গব্যবঃ। সম্। অভক্ত। বিপ্রঃ। সুমতিম্। নদীনাম্।

প্র। পিন্বধ্বম্। ইষয়ন্তীঃ। সুরাধাঃ। আ। বক্ষণাঃ। পৃণধ্বম্। যাত। শীভম্॥ ১২

গো-ইচ্ছুক ভরতগণ পার হইয়া গেলেন, বিপ্র (বিশ্বামিত্র) নদীদিগের সুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শোভন ধনযুক্তা অন্নকারিণীদিগকে (অর্থাৎ ক্ষেত্রদিগকে) পূর্ণ কর, বক্ষণাদিগকে (অর্থাৎ কাটা খালদিগকে) পূর্ণ কর—শীঘ্র গমন কর।

উৎ। বঃ। ঊর্ম্মিঃ। শম্যাঃ। হন্তু। আপঃ। যোক্ত্রাণি। মুঞ্চত।

মা। অদুষ্কৃতৌ। বি এনসা। অঘ্ন্যৌ। শূনম্। আ। অরতাম্॥ ১৩

তোমাদিগের তরঙ্গ শম্যাদিগকে (অর্থাৎ যুগকীলদিগকে) ঊর্দ্ধে ধারণ করুক; জল সকল যোক্ত্রদিগকে ত্যাগ করুক। হে দুষ্কৃতহীন, অহননীয়দ্বয়। অপাপ দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধিতে প্রেরণ কর।

বসিষ্ঠ ঋষিও একটী ঋকে বর্ণনা করিয়াছেন, ইন্দ্র সুদাসের জন্য নদীর জল

স্তম্ভিত করিয়া অগভীর করিয়া সুখে পার হইবার উপযুক্ত করেন। (১) অপর এক ঋকে নদী পার হইয়া গমন করিয়া ভেদকে সংহার করার উল্লেখও বসিষ্ঠ করিয়াছেন। (২) পরুষ্ণী নদীতীর হইতে যমুনাতীরে যাইতে হইলে বিপাশ ও শুতুদ্রীর সঙ্গম পড়ে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

বিশ্বামিত্র ঋষি জলরোধ করিয়া সুদাসকে লইয়া যান, অপর এক ঋকেও উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) এই জলরোধ যে বিপাশ ও শুতুদ্রীর, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। আমরা বিশ্বামিত্রের নিকট আর একটী ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হই। ইহা সুদাসের অশ্বমেধ যজ্ঞ। রাজা সুদাস বৃত্রদিগকে সংহার করিয়া এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) অতএব ইহা 'ভেদের সহিত যুদ্ধ' জয়ের পর হইয়াছিল। কারণ, ভেদের যুদ্ধই দাস, দস্যু, বৃত্রদিগের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। বিশ্বামিত্র ঋষি নিজে কুশিকদিগের সহিত অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত ঋকে দেখা যাইতেছে।

---

(১) অর্ণাংসি। চিৎ। পপ্রথানা। সুদাসে। ইন্দ্রঃ। গাধানি। অকৃণোৎ। সুপারা।—৭।১৮।৫
ইন্দ্র সুদাসের নিমিত্ত জল সকল প্রথিত করেন; (উহাদিগকে) অগভীর ও সুখে পার হইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন।

(২) এব। ইৎ। নু। কম্। সিন্ধুং। এভিঃ।
তত্তার। এব। ইৎ। নু। কং। ভেদং। এভিঃ। জঘান।
এব। ইৎ। নু। কং। দাশরাজ্ঞে। সুদাসম্।
প্র। আবৎ। ইন্দ্রঃ। ব্রহ্মণা। বঃ। বসিষ্ঠাঃ।—৭।৩৩।৩

ইহাদের দ্বারা (অর্থাৎ বসিষ্ঠদিগের দ্বারা ইন্দ্র) কাহাকে শীঘ্র নদী পার করিয়াছিলেন? ইহাদিগের দ্বারা কোন্ ভেদকে শীঘ্র সংহার করিয়াছেন? হে বসিষ্ঠ! দাশ রাজার নিমিত্ত কোন্ সুদাসকে তোমাদের স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছেন?

(৩) মহান্। ঋষিঃ। দেবজাঃ। দেবজূতঃ। অস্তভ্নাৎ। সিন্ধুম্। অর্ণবম্। নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্। অপ্রিয়ায়ত। কুশিকেভিঃ। ইন্দ্রঃ।—৩।৫৩।৯

মহান্, ঋষি, দেবজাত, দেব-প্রেরিত, নৃচক্ষা বিশ্বামিত্র জলপূর্ণ নদীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, যখন সুদাসকে বহন করিতেছিলেন; ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়বৎ আচরণ করিয়াছিলেন।

(৪) উপ। প্র। ইত। কুশিকাঃ। চেতয়ধ্বম্। অশ্বং। রায়ে। প্র। মুঞ্চত। সুদাসঃ।
রাজা। বৃত্রং। জঙ্ঘনৎ। প্রাক্। অপাক্। উদক্। অথ। যজাতে। বরে। আ।
পৃথিব্যাঃ।—৩।৫৩।১১

হে কুশিকগণ! সুদাস (রাজার) অশ্বকে ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত (তোমরা) ইহার নিকট গমন কর, উত্তেজিত কর, প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত কর। রাজা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দিকের বৃত্রকে সংহার করিয়াছেন, অনন্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে যজ্ঞ করিতেছেন।

বিশ্বামিত্র ঋষি কুশিক-বংশীয় হইয়া কিরূপে ভরতদিগের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, এবং এই ভরতগণই বা কাহারা, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। বিশ্বামিত্র একটী ঋকে ভরতগণকে 'ভারত জন' আখ্যাও দিয়াছেন। (১) আমরা ভরত নামক ঋষির দুই পুত্রের নাম একটী ঋকে প্রাপ্ত হই। (২) এই ঋক্ তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত। অতএব ভরত ঋষি বিশ্বামিত্রের এক জন পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন, প্রতিপন্ন হইতেছে। ভরত-পুত্র দেবশ্রবা ও দেববাত ঋষিদ্বয়-রচিত সূক্তে মানুষ দেশের মধ্য দিয়া দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী নদী প্রবাহিত বলিয়া উল্লেখ আছে। (৩) আপয়া ও দৃষদ্বতী কোন্ নদী, তাহা ঠিক জানা যায় না। ভরতের পুত্রদ্বয় বিশ্বামিত্র অপেক্ষা পূর্ব্ব কালের ঋষি বলিয়া অনুমান করি। কারণ, তাঁহাদের কালের এই দুই নদীর নাম পরবর্ত্তী কালে অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র-পুত্রগণকে গাথি-বংশীয় বলা হইয়াছে। (৪) সায়ন পুরাণের মত গ্রহণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে গাথীর পুত্র ও কুশিকের পৌত্র বলেন। আমরা দেখিয়াছি, বিশ্বামিত্র আপনাকে 'কুশিক-সূনু' অর্থাৎ কুশিক-পুত্র বলিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রকে 'ভরত-ঋষভ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (৫) ঋগ্বেদেও দেখা যাইতেছে, তিনি ভরতদিগের অগ্রণী হইয়া বিপাশ ও শুতুদ্রী নদী পার হন।

---

(১) যঃ। ইমে। রোদসী। উভে। অহম্। ইন্দ্রং। অতুষ্টবম্।

বিশ্বামিত্রস্য। রক্ষতি। ব্রহ্ম। ইদং। ভারতম্। জনম্॥—৩৫৩।১২

যে আমি (বিশ্বামিত্র) এই উভয় রোদসীকে (ও) ইন্দ্রকে স্তব করিলাম; বিশ্বামিত্রের স্তোত্র এই ভারত জনকে রক্ষা করে।

(২) অমন্থিষ্টাং। ভারতা। রেবৎ। অগ্নিম্।

দেবশ্রবাঃ। দেববাতঃ। সুদক্ষম্॥—৩।২৩।২

দেবশ্রবা ও দেববাত ভরত পুত্রদ্বয় সুদক্ষ, ধনবান্ অগ্নিকে মন্থন করিয়াছেন।

(৩) দৃষদ্বত্যাং। মানুষে। আপয়ায়াম্। সরস্বত্যাং। রেবৎ। অগ্নে। দিদীহি॥—৩.২৩।৪

হে ধনবান্ অগ্নি! দৃষদ্বতী, আপয়া, সরস্বতীর তীরে মানুষের জন্য প্রজ্বলিত হও।

(৪) তে সম্যঞ্চো বৈশ্বামিত্রাঃ সর্ব্বে সাকং সরাতয়ঃ।

দেবরাতায় তস্থিরে ধৃত্যৈ শ্রৈষ্ঠ্যায় গাথিনাঃ॥—ঐঃ ব্রাঃ, ৩৩ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

সমীচীনবুদ্ধিযুক্ত সেই সকল বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ ধনে সমভাগী; গাথিগণ দেবরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও পালকত্ব স্বীকার করিয়াছে।

(৫) যথাহং ভরতঋষভো পেয়াং তব পুত্রতাম্।—ঐঃ ব্রাঃ, ৫ম খণ্ড, ৩৩ অধ্যায়।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যাহাতে তোমার পুত্রতা প্রাপ্ত হই।

রাজা সুদাসকে একটী ঋকে পুরুবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। (১) উহা কিন্তু বসিষ্ঠ ঋষির ঋক্‌ নহে। বসিষ্ঠ তাঁহাকে একটী ঋকে মানুষ বা মনুবংশীয় বলিয়াছেন। কিন্তু সে কালে সকল আর্য্যই মনুবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

রমেশ বাবু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনুসরণ করিয়া মনে করেন, 'ভারত প্রভৃতি দশ জাতি সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিবার সময় বিপাশ ও শুতুদ্রী নদী পার হয়। তখন তাহাদের পুরোহিত বিশ্বামিত্র ঐ নদীদ্বয়কে ৩।৩৩ সূক্ত দ্বারা স্তব করেন।' রমেশ বাবু এই মতের সমর্থন জন্য Max Duncker's India, Translated by Abbot. Chap. III. হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধার করিয়াছেন,—

'The Bharatas, Matsyas, Anus, and Druhyoos must have crossed the Vipasa and the Satadru in order to attack the Tritsus. The Rigveda mentions a prayer addressed by Visvamitra to these two streams.........After the two rivers were crossed, a battle took place.'

'ঐ যুদ্ধে সুদাস জয় লাভ করেন, ভারত প্রভৃতি জাতি পরাভূত হয়। তখন সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ যে জয়গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ৭ম মণ্ডলের ১৮ ও ৮৩ সূক্তে দ্রষ্টব্য।' (২)

আমরা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ ভরতগণ ও বসিষ্ঠপ্রমুখ তৃৎসুগণ সুদাসের সহায় হইয়া যমুনার তীরে 'ভেদের যুদ্ধে' অযাজ্ঞিক দশ জন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আমাদের মতের সহিত স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয়ের মতের মোটামুটি মিল আছে। তাঁহার বেদ-প্রবেশিকা হইতে কিছু উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে :—

'সুদাস এক জন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ও সেনানায়ক ছিলেন। তিনি নানা দেশ পরাজয় করিয়া এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।...... গুণগ্রাহী রাজা সুদাস......ব্রাহ্মণজাতীয় ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের সহিত তাঁহাকে (বিশ্বামিত্রকে) স্বীয় যজ্ঞে ঋত্বিকের পদে বরণ করিয়াছিলেন।'

বটব্যাল মহাশয়ের মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বিরোধী। কেন না,

(১) বর্হিঃ। ন। যৎ। সুদাসে। বৃথা। বর্ক্‌। অংহোঃ। রাজন্‌। বরিবঃ। পূরবে। কঃ।

—১।৬৩।৭

হে রাজন্‌! পুরুবংশীয় সুদাসের জন্য অনায়াসে অংহের ধন কুশের মত কর্ত্তন করিয়া দিয়াছ।

(২) রমেশ বাবুর ঋগ্বেদের ৩।৩৩।১ ঋকের পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত। ৭।৮৩।৭ ঋকের পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।

বিশ্বামিত্র যদ্যপি সুদাসের শত্রু হন, তবে কিরূপে তাঁহার যজ্ঞের ঋত্বিকের পদে বৃত হইতে পারেন? কিন্তু বটব্যাল মহাশয়ও সায়নাচার্য্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় বিপথে গমন করিয়া সুদাসের ইতিহাস ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তাহার উপর তিনি পৌরাণিক ও আধুনিক ইতিহাস ও ভূগোল বৈদিক যুগে আরোপ করিতে গিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, পরে তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

সুদাসের ইতিহাস সম্যক নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তাঁহার দুইটী প্রধান যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। একটী যুদ্ধ অযাজ্ঞিক দশ জন রাজার সহিত সংঘটিত হয় যমুনাতীরে; আর একটী হয় আর্য্য নরপতিদিগের সহিত পরুষ্ণীতীরে। পরুষ্ণী নদীর কূল ভেদ করিতে আসেন আর্য্যবংশীয় নরপতি-সমূহ; ইহাদিগকে বসিষ্ঠ ঋষি 'দুষ্ট মিত্র' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আর্য্যগণ কেন দুষ্ট মিত্র হইল, আমরা তাহার সন্ধান করিবার চেষ্টা করিব; এবং কোন্ কোন্ রাজা এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া সুদাসের রাজ্য আক্রমণ করেন, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমরা যমুনাতীরে 'ভেদের যুদ্ধে'র বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে 'পরুষ্ণী নদীর কূলভেদের যুদ্ধে'র বিষয় পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিব।

বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে ক্ষিতিগণকে 'দুষ্ট মিত্র' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১) বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণও একটী ঋকে ক্ষিতিগণকে 'দ্রোহযুক্ত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঋক হইতে আমরা আরও অবগত হই যে, এই ক্ষিতিগণ পশ্চিম দিকে বাস করিত। (২) যখন ক্ষিতিগণ দুষ্ট মিত্র হইয়াছিল, তখন বিশ্বামিত্র ঋষি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া অনুমান করি। বিশ্বামিত্রের অপত্যগণ সেই জন্য সূক্ত রচনা করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (৩)

---

(১) এভিঃ। নঃ। ইন্দ্র। অহভিঃ। দশস্য। দুর্মিত্রাসঃ। হি। ক্ষিতয়ঃ। পবন্তে।

—৭।২৮।৪

হে ইন্দ্র! দুষ্ট মিত্র ক্ষিতিগণ আগমন করিতেছে; এই সকল দিবসের দ্বারা (তাহাদের ধন) আমাদিগকে দাও।

(২) পুরুদ্রুহঃ। হি। ক্ষিতয়ঃ। জনানাং। প্রতি। প্রতীচীঃ। দহতাৎ। অরাতীঃ।—৩।১৮।১

ক্ষিতিগণ জনদিগের প্রতি অত্যন্ত দ্রোহযুক্ত। পশ্চিমদিকস্থ অরাতিদিগকে দহন কর।

(৩) বৃহৎ। বয়ঃ। শশমানেষু। ধেহি। রেবৎ। অগ্নে। বিশ্বামিত্রেষু। শং। যোঃ।—৩।১৮।৪

হে অগ্নি! স্তবকারী বিশ্বামিত্র বংশীয়গণের মধ্যে ধনযুক্ত প্রচুর অন্ন, আরোগ্য ও অভয় ধারণ কর।

এই ঋকগুলি ভাবী যুদ্ধের সুস্পষ্ট সূচনা-রূপে জানাইতেছে যে, সুদাসের রাজ্যের পশ্চিম দিকের ক্ষিতিগণ (অর্থাৎ আর্য্যগণ) দুষ্টমিত্র হইয়াছে। উহাদিগকে দহন করিবার জন্য বিশ্বামিত্র পুত্র অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে, ক্ষিতিগণ জনদিগের ঘোর শত্রু দাঁড়াইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, বিশ্বামিত্র ভারতদিগকে 'ভারতজন' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, 'জন' অর্থে এখানে ভারত জন বুঝাইতেছে। বিশ্বামিত্রের মৃত্যুর পরও তাঁহার পুত্রগণ সুদাসের মিত্র ছিলেন, এই ঋকে দেখা গেল। বসিষ্ঠ ঋষি এত দৃঢ় ইন্দ্র-বিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, ক্ষিতিদিগের ধন ঐশ্বর্য্য সুদাসের হউক্। তাহারা যে সুদাসের রাজ্য নষ্ট করিতে পারিবে, এরূপ ভয়ও তাঁহার হয় নাই।

আমরা দেখিয়াছি, ভেদের যুদ্ধে বিশ্বামিত্র যেমন ভরতদিগের অধিনায়ক ছিলেন, বসিষ্ঠ সেইরূপ তৃৎসুদিগের নেতা ছিলেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য বসিষ্ঠ-রচিত পরুষ্ণী নদীর কূলভেদের যুদ্ধ-বর্ণনায় যেখানে তৃৎসু নাম পাইয়াছেন, সম্ভব হইলে সেইখানেই তাহাদিগকে দুষ্ট মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে স্পষ্ট বলিয়াছেন* যে, যখন হইতে তিনি তৃৎসুদিগের অগ্রগামী হইয়াছেন, তখন হইতে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আর ভরতগণ অল্পসংখ্যক ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। বসিষ্ঠ যে তৃৎসুদিগকে কখনও ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ ঋক ত কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। বরং ৭।১৮ সূক্তে পরুষ্ণী নদীর কূলভেদকারীদিগকে, এবং অন্য এক সূক্তে ক্ষিতিদিগকে দুষ্ট মিত্র আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

* দণ্ডা ইব। ইৎ। গো। অজনাসঃ। আসন্। পরিচ্ছিন্নাঃ। ভরতাঃ। অর্ভকাসঃ।
অভবৎ। চ। পুরঃএতা। বসিষ্ঠঃ। আৎ। ইৎ। তৃৎসূনাম্। বিশঃ। অপ্রথন্ত।—৭।৩৩।৬
গো-তাড়নায় পাঁচনবাড়ি যেমন (ডাল-পালা-শূন্য হয়), ভরতগণ সেইরূপ অল্পসংখ্যক ও অকিঞ্চন হইয়াছে; এবং বসিষ্ঠ যখন হইতে অগ্রগামী হইয়াছেন, তৎপর হইতে তৃৎসুদিগের বিশগণ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

মানরক্ষা।

১

বলরাম পাল ছেলের বিবাহের সময় যখন মহেশ আকুলির নিকট সাড়ে এগার গণ্ডা টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, তখন একবারও ভাবে নাই, এই টাকার জন্য এক দিন তাহার ঘর ভিটা নীলাম হইয়া যাইবে। কিন্তু তিন বৎসরেও যখন সে সুদের একটী পয়সাও দিতে পারিল না, তখন মহেশ আকুলি তামাদীর ভয়ে অগত্যা সুদের সুদ হিসাব করিয়া এক শত একুশ টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন, এবং মায় খরচা এক শত সাড়ে বত্রিশ টাকার ডিক্রী পাইয়া বনমালীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিলেন। বনমালী আসল লইয়া অব্যাহতি দিবার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। আকুলি মহাশয় কিন্তু তাহার এই কাঁদাকাটার বিচলিত হইলেন না; তিনি তমস্তকের মুসাবিদাটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'বুড়া হয়ে সত্যের অপলাপ ক'রো না পালের পো, তুমি নিজেই লিখে দিয়েছ, "এক বৎসরের মধ্যে এই টাকা মায় সুদ শোধ দিতে না পারিলে বৎসরান্তে ইহার সুদ আসল মধ্যে গণ্য হইবে, এবং যাবৎ টাকা শোধ দিতে না পারি, তাবৎ এই হারে টাকাপ্রতি অর্দ্ধ আনা হিসাবে সুদ চলিতে থাকিবে।" এখন নিজের কথার নিজে খেলাপ ক'রো না। মহাভারতে লেখা আছে, সত্যের উপরেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।'

মূর্খ বনমালী মহাভারতের কথার উপর কথা কহিতে পারিল না, এবং সত্যের অপলাপ করিতেও সাহসী হইল না। সে ক্ষুন্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সত্যের অপলাপ করিতে গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু দুঃখও অনুভব করিল।

বুড়া হইলেও বলরামের বয়স এত বেশী হয় নাই, যাহাতে নিজের ঘর ভিটার উপর তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু বয়সের গুণে যাহা হয় নাই, অবস্থার প্রভাবে তাহা হইয়াছিল। একমাত্র উপযুক্ত পুত্র কেনারাম বৃদ্ধ পিতার বুকফাটা চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া যে দিন ইহলোকের পরপারে চলিয়া গেল, সেই দিনই বলরামের সংসার-বন্ধনটা এমনই শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কেনারামের চিতা-নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে রূপনারায়ণের গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সংসারের সহিত জীবনের অবশিষ্ট আকর্ষণটুকুকে

ভাসাইয়া দিবে কি না, তাহা চিতার পার্শ্ববর্ত্তী বটগাছটার তলায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়াছিল। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্বেও সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না; সদ্যোবিধবা অনাথা বধূ সুখদা তাহাকে আবার সংসারের বন্ধনের মধ্যে টানিয়া আনিল।

কেনারাম এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইলে অনেকেই বলরামকে দ্বিতীয় বার সংসারধর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিল। কিন্তু সেই এক বছরের ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সে তাহাদের উপদেশগুলা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিল। তার পর কত কষ্টে সেই এক বছরের মা-মরা ছেলেকে একুশ বছরের করিয়াছিল, তাহা বলরাম ছাড়া আর কেহ জানে না। ছেলে উপযুক্ত হইলে বলরাম পাঁচ গাঁ খুঁজিয়া ভাল মেয়ে পছন্দ করিয়া ছেলের বিবাহ দিল। বিবাহে একটু জাঁকজমক করিয়া, পাঁচ গাঁয়ের কুটুম্বের পায়ের ধূলা লইল। পুরোহিতকে গরদের জোড় কিনিয়া দিল। এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কেবল সঞ্চিত টাকায় কুলাইল না, মহেশ আকুলির নিকট তমশুক লিখিয়া দিয়া সাড়ে এগার গণ্ডা টাকা হইল।

টাকাটা লইবার সময় বলরাম একবারও ভাবে নাই যে, এই কয় গণ্ডা টাকার জন্ত মহেশ আকুলি ঢোল বাজাইয়া তাহার সম্পত্তিতে ক্রোক দিবে। কেনারামের গতর বজায় থাকিলে তিন বিঘা জমীর ধানে এক বৎসরেই সুদ আসল টাকা শোধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে বৎসর ভাদ্রের শেষে রূপনারায়ণের জোয়ারে ফসলগুলা যখন ভাসিয়া গেল, তখনও বলরাম দমিল না। পুত্রের চিন্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া জোর গলায় তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'হয় কি, না হয় আর একটা বছরের সুদ দিতে হবে।'

পুত্রের চিন্তাভার লঘু করিবার জন্য বলরাম অগ্রহায়ণ মাসে ভাল দিন দেখাইয়া বধূ সুখদাকে ঘরে আনিল। বধূকে আনিয়া বিশ বৎসরের শ্রীভ্রষ্ট সংসারের মধ্যে যে লক্ষ্মীশ্রীর আবির্ভাব দেখিতে পাইল, তাহাতে বৃদ্ধ এত কষ্ট ও পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মানিয়া লইল, এবং সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাকে আপনার মাতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া সে যেন পুনরায় নিশ্চিন্ত বাল্য-জীবনকে ফিরাইয়া আনিতে উদ্যত হইল।

পর বৎসর আষাঢ় মাসের নূতন জলের সঙ্গে ম্যালেরিয়া আসিয়া এমনই জোরে চাপিয়া বসিল যে, প্রবল ভূকম্পনে অট্টালিকার ন্যায় অনেক

বড় বড় জোয়ানকেও শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তাহাদের সঙ্গে কেনারামও বিছানায় পড়িল। সুতরাং চাষ ভাল হইল না, বুড়া যতটা পারিল, চাষ করিল, বাকী জমী পড়িয়া রহিল। কেনারাম অসুস্থ অবস্থাতেই উঠিয়া চাষের কাজে লাগিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বলরাম তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল, 'ফসল লক্ষ্মী, কিন্তু সে লক্ষ্মীকেও আমি চাহি না কিছু, তুই সেরে উঠলে আমার সব হবে।'

কেনারাম কিন্তু সারিয়া উঠিতে পারিল না। ম্যালেরিয়ার সহচর প্লীহা আসিয়া উদরের অধিকাংশ ভাগ অধিকার করিল। বলরাম ধান বেচিয়া সুধাসিন্ধু, ডিঃ গুপ্তর বোতল আনিয়া ঘর পূর্ণ করিল, কিন্তু কেনারামের প্লীহার আয়তন কিছুমাত্র কমিল না। এইরূপে এক বৎসর ভোগের পর অবশেষে একবার নিউমোনিয়া আসিয়া এমনই জোরে চাপিয়া ধরিল যে, কেনারামের বাঁচিয়া উঠিবার এবং বলরামের তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া মৃত্যু আপনার বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া দিল।

২

'বাবা!'

'কেন গা বৌমা?'

'ঘর বাড়ী গেলে থাকবে কোথায়?'

'চুলোয়।'

শ্বশুরের উগ্র কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া সুখদা বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল। বলরাম উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, 'কেনা হতভাগা যাদের পথে বসিয়ে গেছে, তাদের আবার থাকাথাকি কি বল তো?'

একটা দীর্ঘশ্বাসে সুখদার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; সে মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। বলরাম ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি এক কাজ কর বৌমা, বাপের বাড়ী যাও।'

সুখদা নতমুখেই বলিল, 'তাই না হয় যাব, কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়?'

বলরাম যেন অতিমাত্র বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হ'ল না বৌমা? আমি থাকব কোথায়? আমাকে কি আবার সংসারে থাকতে হয়?'

বৃদ্ধের স্বরটা যেন জড়াইয়া আসিল। সুখদা বলিল, 'কিন্তু থাকতে তো হচ্ছে বাবা।'

বাষ্পগুড়িতস্বরে যেন ক্রোধের একটু তীব্রতা আনিয়া বলরাম বলিল, 'থাকতে হচ্ছে সে শুধু তোমার তরে। কেনা ছোঁড়া তো শুধু চলে যায় নি, আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে গেল। উঃ, আমার বিশ বছরের কষ্টের শোধ বেশ দিয়ে গিয়েছে! কি নিষ্ঠুর! নরকেও তার ঠাঁই হবে না।'

পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে শ্বশুরের এই তীব্র অভিসম্পাত সুখদার বড়ই কঠোর বোধ হইল। সে অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, 'তা আমিই যদি তোমার এত ভার হ'য়ে থাকি বাবা—'

সুখদা আঁচলে মুখ ঢাকিল। বলরাম মাথা নীচু করিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; তার পর শোক-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, 'আমি কি ভারের কথাই বলছি বৌমা, তুমি আছ ব'লেই আমাকে এখনও সংসারে বদ্ধ হ'য়ে থাকতে হ'য়েছে। নয় তো—'

নয় তো বৃদ্ধ যে কি করিত, তাহার কোনও স্থিরতা না থাকায় নিঃশব্দে কয়েকবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া, তার পর ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি বুঝছো না বৌমা, কেনা আমার বুকে কি বাজ মেরে গেছে। তোমার শাশুড়ী যখন মারা যায়, লোকে বললে—বলরাম, বিয়ে কর। কিন্তু ছিঃ, আমার কিনু বেঁচে থাক। এক বছরের ছেলে, সারা রাত বুকে শুয়ে ঘুমাত, একবার পাশ ফেরবার যো ছিল না। এমনি বিশ বছর। উঃ ভগবান্! এততেও মানুষ বেঁচে থাকে!'

বলরাম দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল।

ঘর ভিটাটুকু রাখার সম্বন্ধে সুখদারই জেদ বেশী ছিল। এটুকু যদি যায়, তাহা হইলে বুড়া শ্বশুরকে লইয়া সে কোথায় দাঁড়াইবে? তাহার বাপের বাড়ী আছে সত্য, এবং বাপও তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত বটে, কিন্তু বুড়া শ্বশুরকে ফেলিয়া সে তো যাইতে পারে না। সে গেলে বুড়া যে একটা দিনও বাঁচিবে না, হয় তো রূপনারায়ণের জলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে, ইহাতে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং শুধু ঘরটুকুও যদি মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার পায়, তাহা হইলেও সে গতর খাটাইয়া কোনরূপে শ্বশুরের মুখে এক মুঠা অন্ন দিতে পারিবে।

বলরাম পালের এই ঘর ভিটাটুকু লইবার জন্য মহেশ আকুলিরও যে তেমন জেদ ছিল, তাহা নহে; তবে তাঁহার বিশ্বাস, বুড়ার হাতে লুকান টাকা

আছে, ঘর ভিটা ধরিয়া টান দিতে না পারিলে বুড়া সহজে তাহা বাহির করিবে না। এই জন্য বলরাম যখন তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর ভিটাটুকু ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন আকুলি মহাশয় বেশ নিশ্চিন্তভাবেই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'লোককে বাসচ্যুত করার চেয়ে আর অধর্ম্ম নাই পালের পো, তোমার ঘর ভিটে নিয়ে আমি ধুয়ে খাব না। আমার হক্কের টাকা, ফেলে দিলেই সব ছেড়ে দিচ্ছি।'

এমন অনেক লোক থাকে, যাহাদের ক্রুদ্ধ ভাব অপেক্ষা হাসিটা বেশী ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। আকুলি মহাশয়ের মুখে সেই হাসি দেখিয়া বলরাম হতাশ-চিত্তে ফিরিয়া আসিল, এবং ঘর ভিটা রাখিবার যে কোনও উপায় নাই, ইহা বধূকে জানাইয়া দিল।

বলরাম হতাশ হইলেও সুখদা কিন্তু হতাশ হইল না। জমার জমী তিন বিঘা ছিল, তাহা শ্বশুরকে বেচিতে বলিল। জমী বেচিয়া বার গণ্ডা টাকা পাওয়া গেল। সুখদার পিতৃপ্রদত্ত রূপার তাবিজ এক জোড়া, মল চারি গাছা ছিল, তাহা সাড়ে তের গণ্ডা টাকায় বিক্রয় করিল। বাকী আর ত্রিশ টাকা। এই টাকাটা কি আর মহাজন ছাড়িবে না? আকুলি মহাশয় কিন্তু এত টাকা ছাড়িতে পারিলেন না; তিনি স্পষ্ট বলিলেন, 'পালের পো, আমার এত টাকা ছাড়লে চলবে কি রকমে? আমার বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে; এই হাতে হাতে অন্নপূর্ণা পূজা আসছে। তাতে দশ জন ব্রাহ্মণসজ্জন খাওয়াতেই হবে। আমার তো অন্য জমীদারী নাই, এই সুদই আমার জমী-দারীই বল, বেটা পুত্রই বল, সব।'

কিন্তু বলরাম কিছুতেই ছাড়ে না। তখন আকুলি মহাশয় অনেক ভাবিয়া দাবী এক শত সাড়ে বত্রিশ টাকার মধ্যে খুচরা আট আনা ছাড়িতে রাজি হইলেন, এবং এই আট আনা ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহাকে যে দুই দিনের বাজার-খরচ কম করিতে হইবে, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বলরাম শুনিয়া অবাক্ হইল, এবং হাতে না থাকায় এই আট আনা সমেত টাকাগুলা ব্রাহ্মণের মুখের উপর ফেলিয়া দিতে না পারিয়া সে যেন মনে মনে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া সংগৃহীত টাকা সমেত তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

সুখদা তখন শ্রীদাম মাইতির মাকে ধরিল। শ্রীদামের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলেও মহাজনী করিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। তথাপি সে

ধান বেচিয়া টাকাটা দিল। বলরাম টাকা লইয়া আকুলি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। আকুলি মহাশয় টাকাগুলি গুণিয়া ও নগদ টাকা বেশ করিয়া বাজাইয়া লইয়া বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাকী টাকাটা কোথায় পেলে হে পালের পো?'

বলরাম বলিল, 'আজ্ঞে, ছিদাম ধার দিয়েছে।'

আকুলি বলিলেন, 'ছিদাম মাইতি? ছিদামও মহাজনী কারবার কচ্চে না কি?'

বলরাম বলিল, 'আজ্ঞে না, বৌমার কাঁদাকাটায় দিয়েছে।'

ঈষৎ হাসিয়া আকুলি বলিলেন, 'বেশ। সুদ কত?'

বলরাম বলিল, 'সুদ নেবে না।'

বিস্ময়ে চমকিত হইয়া আকুলি বলিলেন, 'সুদ নেবে না?'

বলরাম বলিল, 'বলে—সুদ খাওয়া মহাপাপ।'

আকুলি মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বটে, জগা মাইতি, যে চিরকাল পাঁচ দোরে মজুর খেটে মরে গেল, তার ছেলে ছিদাম মাইতি, সে হলো ধার্ম্মিক, সুদ খাওয়া মহাপাপ! অধার্ম্মিক রয়ে গেলাম শুধু আমি!'

বলিয়া তিনি তীব্র শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টিতে বলরামের মুখের দিকে চাহিলেন। বলরাম কিন্তু ইহার কোনও উত্তর দিল না। তখন আকুলি মহাশয় টাকা বাক্সে তুলিয়া রসীদ লিখিয়া দিলেন। বলরাম রসীদ লইয়া ঘরে ফিরিল।

ঘর ভিটা রহিল, কিন্তু খাওয়া পরার কোনও সংস্থান থাকিল না। যে তিন বিঘা জমী ছিল, তাহা বিক্রয় করা হইয়াছে। বৃদ্ধ বড় ভাবনায় পড়িল। কিন্তু সুখদা বলিল, 'তুমি ধান এনে দাও বাবা, আমি ধান ভেনে যে লাভ পাব, তাইতেই দু'টো পেট বেশ চলে যাবে।'

বলরামকে অগত্যা এই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইল। ইহা ছাড়া বাড়ীর আশে পাশে যে জায়গা ছিল, সুখদা সেখানে শাক পাত তরিতরকারীর গাছ বসাইল। তাহা বেচিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যাইত। এইরূপে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিতে লাগিল।

৩

'তামাক খেয়ে যাও হে পালের পো!'

বলরাম তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া হাট হইতে ফিরিয়া

আসিতেছিল ; এ সময়ে তামাক খাইবার আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেও আকুলি মহাশয়ের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া আকুলি মহাশয়কে প্রণাম করিল ; তার পর আকুলি মহাশয়ের হাত হইতে প্রসাদী কলিকা লইয়া তাহাতে টান দিল। কলিকায় তখন একটু আগুন ছাড়া তামাকের অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। সুতরাং তাহার মুখবিকৃতি লক্ষ্য করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, 'কিছু নাই বুঝি ? একটু তৈরী কর না।'

নিকটেই তামাক কয়লা ছিল ; বলরাম কলিকার আগুন ঢালিয়া পুনরায় তামাক সাজিতে বসিল। আকুলি মহাশয় হাতের হুঁকাটা পাশে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে ? হাটে বুঝি ?'

বলরাম ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, 'আজ্ঞে।'

'কি নিয়ে গিয়েছিলে ?'

'চাট্টি শাক, আর দু'টো কুমড়ো।'

'কত হ'লো ?'

'সাড়ে দশ পয়সা।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, 'এই পয়সায় দু' জনের চলে ?'

কয়লায় ফুঁ দিতে দিতে বলরাম বলিল, 'এক রকমে চালিয়ে দিতে হয়।'

বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, 'বল কি হে, এক সের চালের দামই তো আট পয়সা। তার পর—'

বলরাম বলিল, 'চালের দাম, ডালের দাম জানি নে বাবাঠাকুর, সে সব জানে বৌমা।'

'তা হলে বৌটাই সংসার চালায় ?'

'তা বৈ কি।'

'বৌটাকে তো লক্ষ্মী বল্‌তে হয় তা হ'লে ?'

বলরাম একবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে বলিল, 'সে কথা আবার দু'বার বল্‌তে। আজ কালের বাজারে এমনটী তো দেখা যায় না।'

আকুলী মহাশয় বলিলেন, 'ভাগ্যে বৌ ছিল, তা নইলে তোমার—'

বলরাম বলিল, 'তা নইলে কোন্ দিন আমার হাড়ে দুব্বো গজাত।'

আকুলী মহাশয় বলিলেন, 'বটে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে শ্লেষের হাস্যরেখা দেখা দিল, তাহা বলরাম লক্ষ্য করিল না ; সে কলিকায় দুইটা টান দিয়া সেটা আকুলি মহাশয়ের হাতে দিল। আকুলি হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইতে বসাইতে গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, 'তাই তো বলি, এক পয়সা আয় নাই, অথচ সংসার চলে কিসে ! তোমার যে উপযুক্ত বৌ আছে, সেটা আমার খেয়ালেই ছিল না। বেশ বেশ !'

শেষের প্রশংসাসূচক 'বেশ' কথাটা এমনই একটা জোর দিয়া উচ্চারিত হইল যে, তাহাতে বলরাম চমকিয়া উঠিল। সে আর আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না ; তাড়াতাড়ী ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আকুলি মহাশয় বসিয়া গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

বলরাম ঘরে পঁহুছিয়া ঝুড়িটা দাবার উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল। দাবাবই এক পাশে সুখদা রাঁধিতেছিল ; শ্বশুরকে এমন অবসন্নভাবে বসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি কাছে ছুটিয়া আসিল, এবং ব্যগ্র-স্বরে ডাকিল, 'বাবা !'

বলরাম নিরুত্তর। সুখদা অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো বাবা' ?

বলরাম মাথা তুলিয়া তীব্রদৃষ্টিতে বধূর মুখের দিকে চাহিল ; রোষ-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল, 'হ'য়েছে আমার ছরাদ !'

সুখদা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলরাম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা বৌমা, আমারই না হয় কোনও চুলোয় ঠাঁই নাই, কিন্তু তোমার তো আছে। তোমার বাপের গোলা ভরা ধান, সেখানে গেলে কি এক মুঠো খেতে পাও না ? অথচ এক বেলা এক সন্ধো আধপেটা খেয়ে এখানে কেন প'ড়ে আছ বল তো ?'

সুখদা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বলরাম মাথা নাড়িয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, 'তুমি বলবে, আমার তরেই পড়ে আছ। কিন্তু আমি কি তোমায় থাকতে ব'লেছি ? নাঃ, আমি কাউকে থাকতে বলি না। যখন নিজের ছেলে এই বয়সে ফেলে পালাল, তখন পরের মেয়ে তুমি, তুমি থেকে আমার কি করবে ? নাঃ, আমি কাউকে চাই না।'

তাহার স্বরে ক্রোধের তীব্রতা থাকিলেও চোখ দুটা যেন এমনই জলে

ভরিয়া আসিয়াছিল যে, বলরাম তাহা গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করিয়া বসিল। খানিক এই ভাবে থাকিয়া যখন মাথা তুলিল, তখন দেখিল, সুখদার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইতেছে। বলরাম তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, 'এই দেখ, মেয়েমানুষ কি না, এক কথায় কেঁদে ফেললে। ভাল বাছা, আমি তোমাকে কি কিছু বলেছি? আমি বলছি, ভগবান্ যাকে মেরেছে,—না, আর বেশী কথায় কাজ নাই, তেলের বাটীটা দাও।'

তেল মাখিতে মাখিতে বলরাম রন্ধননিরতা বধূর দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিল, 'আমি মনে কচ্ছি—কি জান বৌমা, আর এ সব ভাল লাগে না। এই বয়সে ঝাঁকা মাথায় হাটে যাওয়া আর কি ভাল দেখায়? তুমি দিন কতক বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, আমি একবার ঘুরে ফিরে আসি।'

সুখদা বলিল, 'আচ্ছা, সে যুক্তি পরে হবে, এখন ডুবটা দিয়ে এস। বেলা কি আর আছে?'

হাসিতে হাসিতে বলরাম বলিল, 'বেলা—এখনও অনেক বেলা আছে বৌমা, সন্ধ্যার এখনও ঢের দেরী। ভাল কথা, এই নাও তোমার হাটের পয়সা।'

কাপড়ের খুঁট হইতে পয়সা খুলিয়া বলরাম বধূর হাতে দিল। সুখদা তাহা গণিতে গণিতে বলিল, 'সাড়ে দশ পয়সা? কুমড়ো দু'টোর দামই তো চার গণ্ডা পয়সা হ'বে।'

বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া বলিল, 'তুমি বললে চার গণ্ডা পয়সা, কিন্তু ঝাঁকা নামাতেই অ'কুলি ঠাকুর এসে বড় কুমড়োটা ধরলে। কি করি, বামুন, কাজেই তিন পয়সাতেই দিলাম।'

সুখদা বলিল, 'আর ছোটটা দিলে আড়াই পয়সায়?'

হাসিতে হাসিতে বলরাম বলিল, 'ঠিক ধরেছ বৌমা, সেটা নিলে মদন চক্কোত্তি। যাক্, ব্রাহ্মণভোজন তো হবে। তোমার গাছ পোঁতা সার্থক হ'ল বৌমা।'

সে হাসিতে হাসিতে ডুব দিতে গেল। সুখদা পয়সা কয়টা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। রাধুর মা চাউলের এক টাকা পাইবে। আজ তাহাকে অন্ততঃ আট আনা না দিলেই নয়। সুখদা চারি আনা সংগ্রহ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, বাকী চারি আনা কুমড়া দুইটা হইতে পাওয়া যাইবে। আর

শাকের পয়সায় তেল নুনের খরচ চলিবে। কিন্তু শ্বশুর যে হাটে গিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া আসিবে, তাহা সে জানিত না। এখন রাধুর মাকে কি বলিবে, তাহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইল।

৪

খানিক রাত্রে একটা খস্‌-খস্‌ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বলরাম চাহিয়া দেখিল, উঠানে একটা লোক। বলরাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, 'কে?'

লোকটা যেন একটু থতমত খাইয়া উত্তর দিল, 'আমি রাখাল—রাখাল আকুলি।'

মহেশ আকুলির ছেলে রাখালকে বলরাম চিনিত, এবং সে যে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে অবসর লইয়া গ্রামের যাত্রাপার্টিতে যোগ দিয়া আবগারী বিভাগের আয়বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল, তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। বলরাম ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং রুক্ষস্বরে বলিল, 'এত রাত্রে এখানে কেন গা দাদাঠাকুর?'

রাখাল বাঁ হাত দিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'না, এই এলাম। বলি তোমাদের ঘরে কুমড়ো আছে?'

নিতান্ত বিরক্তির সহিত তর্জ্জন করিয়া বলরাম বলিল, 'এমন সময় কুমড়ো?'

রাখাল যেন থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল, 'আমাদের পার্টির একটা ফীষ্ট আছে, তাই বলি—'

বাধা দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলরাম বলিল, 'না, কুমড়ো নাই, যাও।'

হঠাৎ খড়াস্‌ করিয়া ঘরের খিল খুলিয়া সুখদা বাহির হইল, এবং রাখালকে লক্ষ্য করিয়া বেশ সহজ স্বরেই বলিল, 'কুমড়ো আছে একটা, কি দাম দেবে?'

বৃদ্ধের তর্জ্জন গর্জ্জনের মধ্যে সহসা সুখদার আবির্ভাবদর্শনে রাখালের ভীতি চকিত মনটা যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, 'দাম, তা যা বল।'

সুখদা বলিল, 'আচ্ছা, এস।'

এই আহ্বানে রাখাল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, এবং অগ্রসর হইয়া দাবার উপর থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। বসিবামাত্র সুখদা হাত বাড়াইয়া তাহার পৈতাটা ধরিয়া ফেলিল, এবং এমন ত্বরিতহস্তে সেটা তাহার গলা হইতে খুলিয়া লইল যে, রাখাল বাধা দিবার বিন্দুমাত্র অবসর পাইল না। সে শুধু বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে সুখদার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু পর-

ক্ষণেই সুখদা অদূরপতিত সম্মার্জ্জনীর দিকে হস্তপ্রসারণ করিতেছে দেখিয়া সে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না, এক দৌড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বলরাম এতক্ষণ অবাক্ হইয়া সুখদার কাণ্ড দেখিতেছিল; এক্ষণে বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'এ কি কল্লে বৌমা?'

সুখদা বলিল. 'বামুনের ঘরের গরুটা জ্বালিয়ে মেরেছে বাবা, নাছে ঘাটে বের হ'বার যো নাই।'

বলরাম একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, 'কিন্তু বামুনের পৈতা—'

সুখদা হাসিয়া বলিল, 'বামুনের পৈতা নয় বাবা, ঢোঁড়া সাপের খোলস।'

সুখদা ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল; বলরাম গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

৫

রাখাল পলায়ন করিয়া যাত্রার আড্ডায় উপস্থিত হইল। অধিকাংশ দিন সেইখানেই সে রাত্রিযাপন করিত। সে দিনও গিয়া এক পাশে পড়িয়া রহিল। ভাবিয়াছিল, আর সকলের উঠিবার আগে খুব ভোরে উঠিয়া বাড়ী পলাইবে, এবং পৈতার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না; তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই অন্য দুই একটা ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তাহারা রাখালের উপবীতশূন্য স্কন্ধ দেখিয়া হৈ চৈ বাধাইয়া দিল। তখন রাখাল তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য একটা অদ্ভুত ভূতের গল্পের অবতারণা করিল, কিন্তু সে আষাঢ়ে গল্পে কেহই বিশ্বাস করিল না। ক্রমে সংবাদটা সমস্ত পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

আকুলি মহাশয়ও শুনিলেন। তিনি ছেলেকে ডাকিয়া, ধমক দিয়া উপবীতহরণের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। অগত্যা রাখালকে আসল কথা প্রকাশ করিতে হইল। সে কথা শুনিয়া আকুলি মহাশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কি, একটা শূদ্রের মেয়ের এত দূর সাহস, সে ব্রাহ্মণ-তনয়ের অঙ্গে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তাহার যজ্ঞোপবীত হরণ করে! আকুলি মহাশয় তখন গ্রামের পাঁচ জন প্রধানকে ডাকিয়া ইহার বিহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি যে অভিযোগ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—তাঁহার পুত্র যাত্রার দলে ঘুরিয়া বেড়াইলেও এখনও বালক, এবং তাহার স্বভাব চরিত্রও যে নির্ম্মল, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতে পারেন। কিন্তু বলরাম পালের বিধবা পুত্রবধূ

তাঁহার এই সচ্চরিত্র পুত্রকে অসৎপথে লইয়া যাইবার জন্য নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে; কিন্তু রাখাল তাঁহার পুত্র, সুতরাং সে কুচরিত্রার এই প্রলোভন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে থাকে। এ সকল কথা তিনি কিছুমাত্র জানিতেন না। পরিশেষে গত কল্য রাত্রে তিনি রাখালকে একটী কুমড়া সংগ্রহ করিতে বলেন। রাখাল কুমড়া কিনিবার জন্য বলরামের বাড়ীতে যায়। তখন এই দুষ্টা রমণী স্বীয় অসদভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য রাখালের অঙ্গে হস্তার্পণ করে, এবং রাখাল তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এই চেষ্টার ফলে রাখাল তাহার হস্তচ্যুত হইলে দুষ্টা তাহার উপবীত চাপিয়া ধরে। পরিশেষে টানাটানিতে পৈতাটা তাহার হাতে থাকিয়া যায়, রাখাল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া এই কুচরিত্রা রমণীর হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

এই অভিযোগ-শ্রবণে সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। একে স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ, তাহার উপর ব্রাহ্মণের উপবীত-হরণ! এই গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বলরামকে আহ্বান করা হইল, এবং আকুলি মহাশয়ের অভিযোগ তাহাকে শুনাইয়া তাহার দুশ্চরিত্রা পুত্রবধূকে অচিরে দূর করিয়া দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। বলরাম এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করিল, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ আকুলি মহাশয়ের উক্তিকে অসত্য জ্ঞান করিয়া বুড়া বলরামের কল্পিত প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিতে কেহই সাহসী হইল না। প্রধানগণ একবাক্যে আদেশ দিল, হয় সুখদাকে দূর করিয়া দাও, নয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং সামাজিক দণ্ড দিয়া শুদ্ধ হও। যত দিন বলরাম এই উভয় আদেশের একতম পালন না করিবে, তত দিন বধূর সহিত সে নিজেও সমাজচ্যুত হইয়া থাকিবে। যে কোনও কারণেই হউক, ব্রাহ্মণের অপমান হিন্দু হইয়া কেহ সহ্য করিতে পারিবে না।

বলরাম কিন্তু বধূকে ত্যাগ করিতে পারিল না; প্রায়শ্চিত্তও করিল না। সুতরাং সমাজচ্যুত হইয়া রহিল। ইহাতে শোকার্ত্ত বলরামের রুক্ষ মেজাজটা আরও বেশী রুক্ষ হইয়া উঠিল, এবং তাহার মত হতভাগা বুড়াকে ত্যাগ করিয়া না যাওয়াতেই যে বৌটাকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে, ইহা বুঝিয়া বলরাম দিন রাত নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

৬

রাস্তার পাশের বড় গাছটা ঝড়ের বেগে পড়িয়া গেলে পথিক যেমন তাহার

দিকে সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, লোকে তেমনই সমাজচ্যুত বলরাম পালকে করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়াও তাহাকে একটু দূরে রাখিয়া চলিতে লাগিল। বলরাম কিন্তু লোকের এই করুণাটুকুর মধ্যে উপহাসের তীব্রতাই প্রবল দেখিত, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। গাছটা যখন ভূশায়ী হয়, তখন সে আপনার সকল শাখা পল্লবকে মাটীর দিকেই নত করিয়া দিয়া যেন সম্পূর্ণ ভাবেই মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়, প্রকৃতির নিকট উত্তাপ বা আলোক পাইবার আশায় একটী পল্লবকেও উন্নত করিয়া রাখে না। লোকে যদি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিত, 'আহা, পালের পো, শেষ বয়সে এই লাঞ্ছনা!' তাহা হইলে বলরাম হাসিয়া বেশ সহজ স্বরেই উত্তর দিত, 'সংসারে থাকতে হ'লে সুখ দুঃখ দু'টোই ভোগ কত্তে হয়। কথাতেই আছে—না পর গাড়ী, গাড়ী পর না।'

এমন লাঞ্ছনার পরও এতটা গর্ব্ব দেখিয়া লোকে শুধু বিস্মিত হইত না, এই গর্ব্বিত লোকটার উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়াও উঠিত। বলরাম কিন্তু তাহাদের বিরক্তি বা সন্তোষ কোনটাকেই আমলে আনিত না। সে যেন মানুষের বিচারকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভগবানের বিচারের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল।

কিন্তু লক্ষ্মীপূজার দিন সুখদা যখন লক্ষ্মী পাতিয়া পুরোহিতের অভাবে লক্ষ্মীর সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে থাকিত, তখন বলরাম ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িত; সে গ্রামের লোকগুলাকে গালাগালি দিত, বধূকে তিরস্কার করিত, এবং শেষে ভগবানের বিচারের উপর দোষারোপ করিয়া লক্ষ্মীকে রূপনারায়ণের জলে ফেলিয়া দিতে চাহিত।

সে দিন চৈত্র মাসের লক্ষ্মীপূজা। সকাল হইতেই সুখদা শ্বশুরকে সকাতরে অনুরোধ করিতে লাগিল, 'এক জন বামুন দেখ না বাবা, শুধু একটা ফুল ফেলে দিয়ে যাবে। গাঁয়ে এত বামুন আছে, এক জনও কি আসবে না!'

বলরাম কিন্তু এক জন ব্রাহ্মণও পাইল না। অবশেষে সে গিয়া আকুলি মহাশয়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু আকুলি মহাশয় দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন যে, যে ব্রাহ্মণের উপবীত ছিন্ন করিয়াছে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাহার পৌরোহিত্য করিলে ধর্ম্মের অবমাননা হইবে, সুতরাং এরূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না।

রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে বলরাম ফিরিয়া আসিয়া বধূকে কতকগুলা

তিরস্কার করিল। তাহার তিরস্কারে বধূ কাঁদিতে লাগিল। বলরাম মিথ্যাবাদী মহেশ আকুলিকে গালাগালি দিয়া ভগবানের নিকট তাহার বিচার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৭

সে দিন যখন বলরাম হাট হইতে ফিরিতেছিল, তখন সহসা এমন ঝড় বৃষ্টি আসিল যে, সে পাশের বাড়ীখানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। সেখানে আরও এক জন আশ্রয় লইয়াছিল, সে পরাণ কামার। তাহারা যে বাড়ীতে আশ্রয় লইল, সে বাড়ীখানা এক পতিতা চণ্ডাল-রমণীর। গ্রামপ্রান্তে থাকিয়া সে গণিকাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বিপদের সময় বলরাম সেই পতিতার ঘরের রোয়াকে আশ্রয় লইতে ইতস্ততঃ করিল না।

বৃষ্টি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই পরাণ কামার বলরামকে এমন একটা দৃশ্য দেখাইল যাহাতে বলরাম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ঘরের রোয়াকের দিকে একটা জানালা ছিল। জানালাটা বন্ধ থাকিলেও যে একটু ফাঁক ছিল, সেই ফাঁকে চোখ রাখিয়া পরাণ তাহাকে দেখাইল যে, ঘরের ভিতর যিনি আছেন, তিনি মহেশ আকুলি! বলরাম যেন আকাশ হইতে পড়িল! ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া সে তীব্রদৃষ্টিতে গৃহের অভ্যন্তর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

পরাণ বলিল, 'দেখ্‌লে পালের পো, বামুনটার আক্কেল।'

বলরাম কোনও উত্তর করিল না, শুধু ঘৃণায় তাহার নাসা কুঞ্চিত হইল। আর পরাণের চোখে মুখে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। জাগিবার কারণও ছিল। আকুলি মহাশয় ত্রিশ টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদের সুদে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত ও ভিটাছাড়া করিয়াছিলেন। এ জন্য আকুলি মহাশয়ের উপর তাহার দারুণ রাগ থাকিলেও এ পর্য্যন্ত পরাণ তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পায় নাই, আজ সহসা সে সুযোগ পাওয়ায় তাহার জিঘাংসাবৃত্তি যেন ফণা উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি থামিলে সে গ্রামে গিয়া গ্রামের ঘরে ঘরে আকুলি মহাশয়ের এই কলঙ্ককাহিনী প্রচার করিতে লাগিল।

রক্তপিপাসু বাঘকে লোকে যে শুধু ভয় করে, তাহা নহে, তাহার রক্তপানের জন্য এমনই লালায়িত হইয়া থাকে যে, সুযোগ পাইলেই তাহার উপর নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং রক্তশোষণকারী শার্দ্দূলের ন্যায় মহেশ আকুলিকে শাসন করিবার জন্য গ্রামের এত লোক

উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, আকুলি মহাশয় কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারেন নাই যে, গ্রামের এত লোক তাঁহার শত্রু।

গ্রামে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। পরিশেষে সমাজ-প্রধানগণ সমবেত হইয়া আকুলি মহাশয়ের বিচার আরম্ভ করিলেন। পরাণের সাক্ষ্য গৃহীত হইল। কিন্তু কেবল তাহার একার সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং বলরাম পালকে দ্বিতীয় সাক্ষীরূপে উপস্থিত করা হইল। বলরামকে দেখিয়া আকুলি মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল; বৃদ্ধের নিকট যে কিছুমাত্র করুণা-লাভের প্রত্যাশা নাই, সে আজ তাঁহাকে সমাজে লাঞ্ছিত করিয়া সকল অত্যাচার, সকল লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবে, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি শুধু বিবর্ণ মুখে সকাতর দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু বলরাম যে সাক্ষ্য দিল, তাহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে বলিল, পতিতা রমণীর ঘরের ভিতর যাহাকে দেখিয়াছিল, সে দেখিতে কতকটা আকুলি মহাশয়ের মত হইলেও সে যে আকুলি মহাশয় নহে, ইহা সে শপথ করিয়া বলিতে পারে। কেন না, সে খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াও সে লোকটার গলায় পৈতা দেখিতে পায় নাই।

বলরামের সাক্ষ্যে আকুলি মহাশয় নিষ্কৃতি পাইয়া সগর্ব্বে ঘরে ফিরিলেন। পথে হারাণ কামার সক্ষোভে বলরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো পালের পো, এমন ডাহা মিথ্যেটা তুমি বল্লে কেমন ক'রে?'

মৃদু হাসিয়া বলরাম উত্তর করিল, 'আমার মত লোককে জব্দ করতে যদি এক জন বামুন ডাহা মিথ্যে বলতে পারে, তবে এক জন বামুনের মান রাখতে আমি কি এই মিথ্যেটুকু বলতে পারি না?'

ইহার উত্তর পরাণ দিতে পারিল না। আকুলি মহাশয় কিন্তু দিয়াছিলেন। তিনি ইহার পর কোনও কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন, 'বলা পালের মত মিথ্যাবাদী দুনিয়ায় নাই। ও বুড়ো গঙ্গার এ পারে ডুবে ও পারে উঠতে পারে।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

সংস্কৃত-শিক্ষার প্রভাব।

বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলাবিন্যাস-অনুষ্ঠান উপলক্ষে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. মহোদয় 'The Educative Influence of Sanskrit' নামক যে অমূল্য-তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, সুচিন্তিত, উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন যে—'Sanskrit Education closes the eyes and English Education opens them': সংস্কৃত-শিক্ষায় লোকের দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হয়, এবং ইংরাজী শিক্ষায় উন্মীলিত হয়। উল্লিখিত পণ্ডিতপ্রবর ভারতের সর্ব্বত্র জনহিতৈষী, বিদ্বৎপ্রধান ও শিক্ষাসংস্কারক-রূপে সুপরিচিত, সুতরাং তাঁহার মত সাবধানে আলোচ্য।

তদানীন্তন অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে এরূপ মন্তব্য নিতান্ত অযথা বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃতের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য, গভীরতা ও প্রভাব অল্প লোকেই বুঝিতেন। পণ্ডিতগণ বহু বর্ষ ব্যাপিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কোষ কণ্ঠস্থ করিতেন, এবং দীর্ঘকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েক খণ্ড দর্শন বা স্মৃতির নিবন্ধ আয়ত্ত করিতেন। পক্ষান্তরে, ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক রহস্যপুঞ্জ, এমন কি, মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে আনন্দ উপভোগ করিতেন। অবশ্য ইংরাজী পণ্ডিতগণ শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য ও প্রসারে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ অধিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত গভীরতায়ও সেইরূপ তৃপ্তি বোধ করিতেন সত্য; কিন্তু জীবিতকাল ক্ষণবিধ্বংসী, এরূপ কঠোর শ্রম ও মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে এবংবিধ গভীরতা-লাভের চেষ্টা যুক্তিসহ কি না, তাহাও সংশয়াধীন।

তাহার পর ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে। শিক্ষা-পদ্ধতির উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ করিবার উপলক্ষে বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট Sir Richard Temple বলিয়াছিলেন—'The Education of a Hindu gentleman can never be said to be complete without a thorough mastery of Sanskrit Language and Literature': সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি-লাভের পূর্ব্বে কোনও হিন্দু বিদ্যার্থীরই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় না।

তৎকালে পাণ্ডুলিপি অন্বেষণ করিবার প্রয়াস কেবল আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও তদিতর ঐহিক বহুবিধ বিচিত্র বিষয়ান্তর্গত রাশি রাশি সাহিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের

সর্ব্বপ্রকার অবস্থাভেদের প্রতিবিম্বস্বরূপ সাহিত্যসমষ্টি পাওয়া গিয়াছে, এবং উহা এক উন্নত সুসভ্য জাতির জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে সাফল্য ও কৃতিত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ জাজ্বল্যমান।

প্রথমেই যে সমালোচকের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সময়ে প্রচলিত বিদ্যার্জ্জন-রীতির বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে সংস্কৃতশিক্ষা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ তিনি লোকান্তরের অতিথি; পরিবর্ত্তনশীল পদ্ধতি-প্রবাহের ফলে আশঙ্কা করিয়া সনাতন সংস্কৃত-শিক্ষার সাফল্যে যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, সন্দেহ নাই। আপাততঃ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ফরাসী আচার্য্য টেন (M. Taine) ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কারণ ইংরাজী সাহিত্যের অপূর্ব্ব ক্রমবিকাশ, পূর্ব্বাপর অবিচ্ছিন্ন সংযোগ। ইউরোপীয় অপরাপর সাহিত্যের ধারা বহু স্থলে ছিন্ন, সূত্র খণ্ডিত ও লুপ্ত। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের গতি—চসারের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে ও অবিচ্ছিন্ন-ধারায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত। এই সংযোগই তাঁহাকে মোহিত ও উক্ত কার্য্যে প্রণোদিত করে।

অপূর্ব্ব পূর্ব্বাপর-সংযোগ।

যদি কেবল পাঁচ শত বৎসরের ব্যাপ্তিতেই ইহাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্য নিশ্চয়ই বিস্ময়কর বলিয়া গণ্য হইবে। অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে অদ্যাবধি সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা অবিচ্ছিন্ন ও অবিলুপ্ত গতিতে প্রবাহিত। অধ্যাপক মোক্ষমূলার এক সময়ে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা 'নিদ্রাভিভূত' হইয়া থাকে; পরে খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বহুতর অকাট্য প্রমাণের বলে আচার্য্য মহোদয়ের মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই 'নিদ্রাকালে'ই সংস্কৃত ভাষার গৌরবস্বরূপ প্রভাবশালী উৎপত্তি। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কালিদাস-প্রশংসিত ভাসের নাটকাবলী, ভরতের পূর্ব্ববর্ত্তী কোহল, শাণ্ডিল্য, ধূর্ত্তিল, বৎস প্রভৃতির নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়া জ্ঞানের প্রভায় জগতের ইতিহাসে সংস্কৃত সাহিত্যকে কালজয়ী করিয়াছে। আবার খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট্ কনিষ্কের গুরু অশ্বঘোষ, বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানশাখার প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন ও তাঁহার শিষ্যবর্গ আর্য্যদেব ও মৈত্রেয়নাথ, কল্পনার প্রভায়, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অসামান্য শক্তিতে ও দুঃখকাতর মানব জাতির প্রতি সার্ব্বভৌম সহানুভূতিতে উত্তম পুরুষের জন্য শাশ্বত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই অবিচ্ছিন্নক্রম, সম্বন্ধ, সংযোগ,—রাজনীতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও অবস্থাগত, জাতিসম্বন্ধীয় ও শিক্ষামূলক সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের সংঘর্ষেও অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিয়া বিরাজমান। বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রাবল্যে স্থানবিশেষে সাময়িক ব্যাঘাত লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মূলস্রোতের ধারা কোথাও ছিন্ন হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আকস্মিক-

স্থানের পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিক্ষুব্ধ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তখনও গুজরাট ও মালবে জৈনগণ, পশ্চিম-ভারতে মাধবাচার্য্যের শিষ্যগণ, দাক্ষিণাত্যে রামানুজের অনুচরবর্গ, এবং মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সংস্কৃতচর্চ্চা অবাধ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে সমগ্র ভারত মোগল ও পাঠানের বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু কর্ণাটে মাধবাচার্য্য, দ্রবিড়ে বেদান্তদেশিক, মিথিলায় চণ্ডেশ্বর, এবং উড়িষ্যায় প্রথিতনামা পণ্ডিতবৃন্দ দৈবগতি সংস্কৃতের স্বাতন্ত্র্য সমানে রক্ষা করেন।

শিক্ষাত্মক প্রভাব।

এরূপ আশ্চর্য্যজনক অবিচ্ছিন্ন ক্রমযোগের ফলও কি অপূর্ব্ব নহে? ইহাতে কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়, অভিমান ও আভিজাত্য-বোধ জাগরিত হয়, এবং একটা হিতকর স্বাধিত্বের ভাব উপস্থিত হয়। বাগ্‌-বিজ্ঞানের চক্ষেও ইহার মূল্য অসীম। বিস্ময়বিমুগ্ধ মানবের আদিম সারল্যপূর্ণ বচনবিন্যাস হইতে ইহার আরম্ভ, নব নৈয়ায়িকের কূটতর্ক ও দুর্ব্বোধ্য বাকচাতুরীতে ইহার পরিণতি। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতেও ইহার উপযোগিতা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাতে দেখিতে পাই, ভারতের বিভিন্ন অংশের কথোপকথনের ভাষা শতাব্দীর পর শতাব্দীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও—প্রবাহিণী সরিৎমালা ও পরিবর্ত্তনশীল বনরাজির মধ্যস্থিত ভূধর-শ্রেষ্ঠের ন্যায়—একই রূপে বিদ্যমান। আবার চিন্তাপ্রণালীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলেও ইহার সহায়তা আবশ্যক—আদিম আর্য্যগণের প্রকৃতি-পূজা হইতে জগতের উৎপত্তি, এবং মানবের শেষ মুক্তি সম্বন্ধে অসমসাহসিক বিচারবিতর্কের অমর ইতিবৃত্ত ইহাতে লিখিত রহিয়াছে।

বিশাল আয়তন।

মিশ্র সংস্কৃত, পালি, দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, জৈন, প্রাকৃত অপভ্রংশ ও বর্ত্তমান বহুবিধ কথিত ভাষা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষাগত সাহিত্যের বিস্তৃতি ও আয়তন যথার্থই বিস্ময়কর। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে থিওডোর অফ্রেক্ট (Theodor Aufrecht) কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রসিদ্ধ সূচীপত্রে (Catalogus catalogorum) ৪০,০০০ সহস্র গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি Taklamakan ও Gobi মরু প্রান্তর হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের বহুরাজি লোকলোচনের গোচরে আসিয়াছে। চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, ও মঙ্গোলিয়া হইতেও অনেক নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় বৌদ্ধগণ মনীষিশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীককে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করেন; তিনি তদীয় গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, রোম, নাইল প্রদেশ, পারস্য দেশ, চীন ও মহাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মালাপাক্কার হইতে কামস্কাটকা পর্য্যন্ত প্রচলিত শত সহস্র ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দান গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু উপরি উক্ত গ্রন্থাবলীতেই যে সংস্কৃত সাহিত্য শেষ হইয়াছে, ইহা বলা যায় না; কারণ, ভারতের বহু প্রদেশ ও বহু পুস্তকালয়ে রক্ষিত গ্রন্থনিচয় এখনও অপরীক্ষিত ও অজ্ঞাত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রাপ্ত সংস্কৃত সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, দর্শন বা কলাবিশেষের চরম পরিণতিই আমরা পাই, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী

অসংখ্য চেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ পুস্তকাবলী লুপ্ত ও বিস্মৃত সাগরে নিমগ্ন। পাণিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চদশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বৈয়াকরণের নাম করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের পূর্ব্বে অর্থনীতির দশ বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান ছিল। কোহল তাঁহার নাট্যসূত্রে বহুতর পূর্ব্বতন নাট্যশাস্ত্রকার, তাঁহাদের সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক, নিরুক্ত, সংগ্রহ ও কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন। কামসূত্র-কার বাৎসায়নের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের বহু গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। শ্রৌত, গৃহ্য, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ বা ছন্দঃ, সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ চমৎকার বিস্তৃতি—দেশে বিস্তৃতি, কালে বিস্তৃতি, আয়তনে বিস্তৃতি, সর্ব্বোপরি বিষয়ের বিস্তৃতি ও গুরুত্ব সংস্কৃতশিক্ষার্থীর উপর যে হিতকারী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা অমূল্য। অনেকের অভিযোগ এই যে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ ইতিহাস রচনা করেন নাই—'But the history of the influence of Sanskrit is written large on the whole face of the earth': সংস্কৃত-প্রভাবের ইতিহাস ধরণীর বক্ষের উপর জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত। ইহাতে রক্তপাত ও হিংসা ব্যতিরেকে কিরূপে জ্ঞানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তাহার ইতিহাস সুপরিস্ফুট।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত-শিক্ষার দুর্দ্দশাবশতঃ ইউরোপ ও ভারতের অনেকের বিশ্বাস, সংস্কৃত হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাহিত্য মাত্র। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈনগণের ধর্ম্ম-সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বটে, এবং এই হেতু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এসিয়ার কোটী কোটী লোকের জীবনের উপর ইহার প্রভাব অতুলনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মেতর বিষয়ের সাহিত্যও অল্প নহে। সংস্কৃতের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। ঐহিক বা ধর্ম্মেতর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচ্য।

অনন্ত বৈচিত্র্য।

প্রথমতঃ অর্থনীতির আলোচনা করিব। ভারতের বিজ্ঞান প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রথম তিনটী ঐহিক, শেষোক্তটী পারত্রিক, বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। প্রথম তিনটীর ভিতর আবার অর্থশাস্ত্র বিশিষ্টরূপে ঐহিক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী দশটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের সার সঙ্কলন করিয়া কৌটিল্য খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে স্বীয় গ্রন্থের রচনা করেন। সাম্রাজ্যপ্রয়াসী উন্নতিশীল জাতির পক্ষেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্ভবপর। ইহাতে রাজনীতিক অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিক দর্শন, রাজনীতি, সমরবিদ্যা, যুদ্ধোদ্যোগ, শাসনতন্ত্র, বিচারবিধি, রাজস্বব্যবস্থা, বাণিজ্য, ব্যবসায়, খনিকার্য্য ইত্যাদি মানব-জীবনের রাজ-নিয়ন্ত্রিত সর্ব্ববিধ ব্যাপারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। বাৎসায়নের কামসূত্রের ভার্য্যাধিকরণ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য-জীবনের সুন্দর চিত্র রঞ্জিত হইয়াছে। বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতার ন্যায় সঙ্কলিত গ্রন্থসমূহের ভিতর কৃষিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার ইতিহাস পাওয়া যায়। গো-পালন সম্বন্ধে কোনও পুস্তক আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু বহু পুস্তকে প্রাপ্ত অশ্ব ও হস্তিপালনের আভাস হইতে অনুমান হয় যে, গো-পালন-বিদ্যাও অপরিজ্ঞাত ছিল না। পালকপ্যের হস্তিশাস্ত্র ও শালিহোত্রের অশ্বশাস্ত্র সুপরিচিত। উদ্ভিদ ও মাংস-রন্ধনার্থ পাকপ্রণালীর বহুতর পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

অর্থনীতি।

বিজ্ঞান দুইটী কষতার উপর নির্ভর করে; পর্য্যবেক্ষণ (Observation), এবং প্রত্যক্ষানুভূতি বা পরীক্ষা-প্রমাণ (Experiment)। প্রাচীন ভারতীয়গণ দুইটারই সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

বিজ্ঞান।

গণিতশাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরাকালে ভারতীয়গণ গণিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারাই পাটীগণিতের দাশমিক রীতি ও বীজগণিতের Quadratic Equationএর প্রবর্ত্তক। ইহারা ত্রিকোণমিতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নাইল নদীর বন্যার জন্য ক্ষেত্রের পরিমাণ-নিরূপণ আবশ্যক হইয়া উঠে; তাহার ফলে মিসরে জ্যামিতি ও পরিমিতির সৃষ্টি। ভারতীয়গণ যজ্ঞের জন্য বহু-ইষ্টকখণ্ডে যাগভূমি নির্ম্মাণ করিতেন; ইহা হইতে জ্যামিতি ও পরিমিতি বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়। যজ্ঞের সময়নির্দ্দেশের জন্য জ্যোতিষের উৎপত্তি, পরে গ্রীকগণের সংস্পর্শে ইহার সমৃদ্ধি সাধিত হয়। কালক্রমে তাঁহারা পৃথিবীর দৈনন্দিন গতি, শূন্যে অবস্থান, গোলাকৃতি ও ক্ষুদ্রতর পদার্থকে আকর্ষণ করিবার শক্তির আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান ইউরোপ উহা পুনরাবিষ্কার করিয়া গৌরব লাভ করিয়াছে। ইঁহারা সূক্ষ্ম ও নৈপুণ্যপরিচায়ক খবিদ্যা-সম্পর্কীয় বহু যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয়গণের প্রত্যক্ষানুভূতি বা Experimentএর প্রমাণ তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্র। ভারতের বিভিন্ন দেশে, এমন কি, হিমালয়ের দুর্গম গহ্বরে উৎপন্ন ভেষজ-লতাসমূহ পরস্পর মিশ্রিত করিয়া তাহাদের শক্তির ক্ষয়, পরিবর্ত্তন বা বর্দ্ধন করিয়া, তৈল ও ঘৃত সংযোগে নানা প্রকারের ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। এক জন সম্রাটের রোগশান্তির জন্য অস্ত্রোপচারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-রচনার কালে [অর্থাৎ খ্রী: পূ: ১০০০] ভারতীয়গণ মনুষ্যদেহের সমুদয় অস্থিরই সংখ্যা, আকৃতি ও অবস্থা, এবং যজ্ঞীয় পশুসকলের শিরা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত অস্ত্রোপচারের উপযোগী শস্ত্রসমূহ হইতে তাঁহাদের অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। ডাক্তার পি. সি. রায় মহাশয়, তাঁহাদের রসায়ন, বিশেষতঃ পারদবিদ্যা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন; এবং বৈশেষিক দর্শন, কারিকাবলী, ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ পদার্থবিদ্যা (Physics) ও আলোকতত্ত্বে-(Optics)-ও পারদর্শী ছিলেন।

আর্য্য দেবের (খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী) চতুঃশতিকার চন্দ্রকীর্ত্তি-(খ্রী: ৬ষ্ঠ শতাব্দী)-কৃত ব্যাখ্যার প্রাপ্ত—'পরাশর ও বৌদ্ধ ভিক্ষু', এবং 'গৃহস্থ-বৌদ্ধ ও ভিক্ষু'র উপাখ্যান হইতে নির্ম্মাণ-বিদ্যার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়।

শুক্রনীতি, মূলকলা প্রভৃতি কলা-সংগ্রহে, কলা চতুঃষষ্টি সংখ্যায় বিভক্ত। মূলকলা—বাস্তুকলা, দ্যূতকলা, শয়নকলা প্রভৃতিতে বিভক্ত। ঔপায়িকী কলায় বৃত্তিকারের মতে, কলার সংখ্যা ৫১৮। দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলের

কলাবিদ্যা।

নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সমস্ত কলারই যে পৃথক সাহিত্য ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। শের শাহের সমসাময়িক বাঙ্গালাদেশের ভুবনমোহন কবিকণ্ঠাভরণ হিন্দুসঙ্গীত প্রসঙ্গে পুরাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সময় পর্য্যন্ত বহু সঙ্গীতাচার্য্যের নাম নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। কোহল তাঁহার নৃত্যশাস্ত্রে নৃত্যের বিভাগ করিয়াছেন—করণ, অঙ্গহার ও নৃত্য। দশরূপকে নৃত্য ও নৃত্তের পার্থক্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোহলের পুস্তক রচিত হয়, এবং নাট্যশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়। কোহল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায়, তাঁহাদের সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক, নিরুক্ত, সংগ্রহ ও কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এতাবৎকাল ভরতকেই একমাত্র নাট্য-শাস্ত্রকার বলিয়া জানিতাম, কিন্তু কোহল তাঁহাকে দ্রষ্টা রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহারই মুখে নিজের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চিত্রবিদ্যা-সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর চিত্র পাওয়া গিয়াছে। মন্দির-গুহায়, প্রাচীর-গাত্রে, এবং তালপত্র পাণ্ডুলিপির উপর প্রাপ্ত সুচারু চিত্রাবলী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রস্তরশিল্প (Sculpture) বুদ্ধের সময় হইতে প্রচলিত, আজও জগতের চক্ষে প্রশংসিত। পশ্চিম-ভারতে গ্রীক প্রভাব স্বীকার করিলেও, অন্যত্র ভারতীয় আদর্শেরই উৎপত্তি ও উন্নতি লক্ষিত হয়। স্থাপত্য শিল্পেও ভারতীয়গণ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দন্ত ও অঙ্গচিত্র, বস্ত্ররঞ্জন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের গঠন, কারুকার্য্য প্রভৃতিতেও তাঁহাদের নৈপুণ্য প্রকট।

ইতিহাস ও তদন্তর্গত বিষয়সমূহ।

অনেকেরই ধারণা, সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস লিখিত হয় নাই, কিন্তু এরূপ ধারণা বিচারসহ নহে। মহাপুরাণগুলির বহু অধ্যায়ে রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা আজ কাল সর্ব্বজনবিদিত। ইহা ব্যতীত সমসাময়িক লেখকের রচিত রীতিমত ইতিহাসও বিরল নহে। উত্তর-ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস, নবসাহসাঙ্কচরিত, নববিক্রমাঙ্কচরিত, রামচরিত, গৌড়বহো প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। পৃথ্বীরাজ-চরিত ও রাজতরঙ্গিণী বর্ত্তমান কালের আদর্শেও ইতিহাসরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। এমন কি, দেশাবলীবিবৃতি (Gazetteer) সাহিত্যেরও অভাব নাই। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনস্থ এক জন চৌহান জায়গীরদারের সাহায্যে জগন্মোহন কর্ত্তৃক প্রণীত এইরূপ একটী দেশাবলী বিবৃতি পাটনায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বতন অনেক দেশাবলী-কারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর আর একটী গ্রন্থ—ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকই লুপ্ত। এইগুলি হইতে অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়। বংশাবলী-রক্ষণ ভারতীয়গণের বৈশিষ্ট্য। মালবের জগাই, আজমীরের বদয়ে, রাজপুতানার ভাট ও চারণ, এবং বাঙ্গালা ও মিথিলার ঘটকগণের নিকট ইতিহাসের বহু উপাদান সুন্দররূপে সংগৃহীত রহিয়াছে।

দর্শন।

ভারতের দর্শন সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান প্রাচীনতম লেখকের মতে ঐ ছয়টীর ভিতর দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য বরং আরও অতিরিক্ত দুই তিনটি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ লেখকগণ মুখ্যতঃ ছয়টী বিভাগ স্বীকার করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বর্ণন করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য দর্শনকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত

করিয়াছেন। তিনিও দাক্ষিণাত্যদেশীয় সংস্কারবশতঃ কাশ্মীরের দুইটী শৈব-সম্প্রদায়ের নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা সুপরিচিত, এবং অল্পপরিসরে উহা সম্ভবপর নহে; এই বিবেচনায় ইহার বিশ্লেষণে আপাততঃ বিরত রহিলাম।

কাব্য ও নাটক।

মনুষ্যমাত্রই অল্পবিস্তর কবিতার অনুরাগী; দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ সংসার-মরুর বক্ষে স্বচ্ছসলিল প্রস্রবণের ন্যায় ইহা প্রীতি ও শান্তির আশ্রয়। কবিতার বিভিন্ন বিকাশ ও রূপভেদ আছে; সকল জাতি সমস্ত রূপের পক্ষপাতী নহেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ মহম্মদীয়গণের নাম করা যাইতে পারে; ইঁহারা নাটকের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে কবিতা সর্ব্ববিধ রূপেই সমাদৃত হইয়াছিল। রামায়ণের ন্যায় লোকরঞ্জক আদিকাব্য, মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপাখ্যান, রঘুবংশের ন্যায় মনোহারী মহাকাব্য, বহুতর সুললিত গীতি ও খণ্ডকাব্যের গৌরবে সংস্কৃত সাহিত্য মণ্ডিত। ভাস, কালিদাস প্রভৃতির রচিত ভারতের নাটকসম্পৎ বিশ্বের ইতিহাসে তুলনারহিত।

অপরাপর বিষয়।

জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্যপরম্পরার চিত্র-অঙ্কনই যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অংশের ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। এমন কি, চৌর্য্যশিক্ষারও বিস্তৃত সাহিত্য বর্ত্তমান। ভাসের অবিমারকে ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে দুইটী পৃথক কিংবদন্তী বা শিক্ষক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে ইহা বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু তাহার পর 'চৌরশাস্ত্র' নামক একটি রীতিমত পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে চৌর্য্যবিদ্যার বুৎপত্তিলাভের উপায়, নানাপ্রকার রাসায়নিক গুপ্ত প্রক্রিয়া, মন্ত্র, এবং বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাজপক্ষিপালন ও শিকারে শিক্ষাদান, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ—শিক্ষাহিসাবে সপ্রয়োজন হইলেও, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক—সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম।

সংস্কৃত-শিক্ষার হিতকারী প্রভাবের বিষয় পুনরায় স্মরণ করাইয়া প্রবন্ধ শেষ করি। যে সমস্ত বিষয়-পাঠে কল্পনা উদ্রিক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, উহা অজ্ঞাতসারে মানসিক বৃত্তিসমূহকে কমনীয় করিয়া উন্নতির পথে চালিত করে। সংস্কৃত-সাহিত্য-অধ্যয়নে এই উদ্দেশ্য বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশুদ্ধস্পর্শ; অপবিত্র মলিনতা সুদীর্ঘ শতাব্দীর আবর্ত্তনে ধৌত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রীতি অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। চরিত্র-গঠনের পক্ষে ইহার উপযোগিতা উপমারহিত—উচ্চতম পূত উপদেশাবলী বিরাজমান, উপদেশকগণের জীবনের ভুলভ্রান্তি কালের স্রোতে প্রক্ষালিত, বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে—তাহা বৈচিত্র্যে ও গৌরবে অপূর্ব্ব, শিক্ষাশক্তি ও হিতকর প্রভাবে অপরাজেয়। *

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* The Educative Influence of Sanskrit; MM Haraprasad Shastri.

রায় পরিবার।

৭

নৌকা চলিতে চলিতে 'মাঝ দরিয়া'র যদি তুফান উঠে, তবে কোনরূপে নৌকা বন্দরে ভিড়ানই মাঝির লক্ষ্য হয়—তাহার পর, নৌকা ভিড়াইয়া, সে নৌকার অবস্থা লক্ষ্য করে, ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করে। যখন গৌরীর কথায় শাশুড়ীর কথা প্রতিধ্বনিতে আরও স্পষ্ট ও গভীর হইয়াছিল, তখন কোনরূপে দূরে যাওয়াই সুশীল কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। নূতন কর্ম্মস্থলে আসিয়া সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবার সময় পাইল—আপনার জীবনের অবস্থা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল। আপনার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সে যে ব্যথিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। সে সুখের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, স্নেহের অমৃতে বর্দ্ধিত হইয়াছিল—জীবনে সুখের ও সাফল্যের স্বপ্নই দেখিয়াছিল। সে কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, এমন ভাবে তাহাকে সে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে, সে জীবন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাহাই হইয়াছে। সহসা তাহার সব আশা অসার স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে; তাহার পক্ষে সংসারের খেলাঘর ঘটনার তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। ভালবাসা, সুখ, শান্তি—এ সব হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাকে ব্যর্থ জীবন যাপন করিতে হইবে। তবে কি জন্য জীবনযাপন? সুশীল আপনাকে বুঝাইল, যখন সুখ শান্তি মিলিল না, তখন আর এক দিকে আপনার সকল শক্তি প্রযুক্ত করাই ভাল—সে সম্মান ও অর্থ অর্জ্জন করিবে। তাহাতে সুখ না থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে দেখাইতে পারিবে, সে অর্থ অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা ধারণ করে—সে হেয় নহে, সে সংসারে সম্মান পাইতে পারে। তাহার প্রতিভায় তাহার বিশ্বাস ছিল—সে প্রতিভার অসম্মান সে কখনই সহ্য করিবে না।

কাজেই সুশীল একনিষ্ঠ হইয়া ব্যবসায়ে মন দিল। ভাগ্যদেবী এক দিকে তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বোধ হয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাই আর এক দিকে প্রসন্নচিত্তে তাহাকে প্রসাদ দিয়া ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিলেন। এক দিকের ক্ষতি আর এক দিকের লাভে পূর্ণ হয় না। কিন্তু লাভের হিসাবে সুশীলের লাভ যেমন অতর্কিত তেমনই অপ্রত্যাশিত হইল। তিন মাস না যাইতেই সে মাকে লিখিল, দিদির বাড়ী ভাড়ার টাকা হইতে

সুধীরকে কিছু পাঠাইতে হইবে না—সে-ই মাসে মাসে সুধীরের খরচ পাঠাইয়া দিবে। তাহার পর সে অনেক ভাবিল; কিন্তু প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রহৃত করিতে পারিল না। মাসে মাসে গৌরীর জন্য এক শত করিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। মা ভাবিলেন, শ্বশুরবাড়ীর মাসহারার টাকা লইতে তাহার আপত্তি ছিল—সে কেবল দিদিশাশুড়ীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহা লইতে সম্মত হইয়াছিল, এখন উপার্জ্জনক্ষম হইয়াই সে টাকা যেমন পাইতেছে, তেমনই গৌরীর জন্য পাঠাইয়া দিতেছে। কিন্তু পুত্রের এই ব্যবস্থার মূলে যে দারুণ মর্ম্মপীড়া ছিল, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র অনুমান করিতে পারিলেন না।

গৌরীর পত্রে বিধাত্রী দেবী গৌরীর মাসহারার সংবাদ পাইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—হায়, কবে সুশীলের অভিমান-ক্ষত দূর হইবে? তিনি সুশীলকে পত্র লিখিতেন। নিপুণ চিকিৎসক যেমন রোগীর নাড়ীর গতি দেখিয়া তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে, তিনি তেমনই তাহার পত্রে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন—বুঝিয়া কেবল চিন্তিত হইতেন। সুশীল যে দৃঢ়তাসহকারে আপনার আঘাত-বেদনাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহাতে সহজে তাহা দূর হইবে না—বিধাত্রী দেবী তাহাই বুঝিয়াছিলেন। এবার তিনি গৌরীর মাসহারার কথা উল্লেখ করিয়া সুশীলকে লিখিলেন,—'তুমি কেন যে গৌরীকে মাসে এক শত টাকা করিয়া পাঠাইতেছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু আমার অনুরোধ, টাকার কথা তুমি আর মনে করিও না। তোমার পক্ষে অর্থার্জ্জন অবহেলায় হইতে পারে, তাহা আমি জানি। সে বিশ্বাস না থাকিলে আমি তোমার হাতে গৌরীকে দিতাম না। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও—চিরজয়ী হও—তোমার সকল কামনা পূর্ণ হউক। আমার একটা কথা রাখ—গৌরী যদি অপরাধ করিয়া থাকে, বালিকার সে অপরাধ তুমি নিজ গুণে ক্ষমা কর। ইহকালে পরকালে যাহার তুমিই গতি ও আশ্রয়, তাহার অপরাধ তুমি ছাড়া আর কে ক্ষমা করিবে? সাগরের উদার বক্ষই নদীর শেষ গতি। সেই নদীর জল যদি কখনও মলিন হয়, তবে সাগর কি তাহাকে আশ্রয় দিতে কাতর হয়? সাগরের বিশাল বক্ষে মিশিলে সে জলের আর আবিলতা থাকে না। গৌরীর অপরাধে আমিও অপরাধী। সে পিতৃহীনা —পিতার কাছে সুশিক্ষার অবসর পায় নাই। তাহাকে শিক্ষা দিবার ভার আমাকেই লইতে হইয়াছিল। সে আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি তাহাকে সুশিক্ষা দিতে পারি নাই; তাই সে অপরাধী হইয়াছে। আমার অনুরোধ,

তাহাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না—তুমি তাহা হইতে গৌরীকে বঞ্চিত করিও না। আর ভাবিয়া দেখ, এ শাস্তি কি কেবল তাহারই? আমাদের কথা বলিতেছি না। তোমার নিজের কথা ভাবিয়া দেখ। এই বয়সে বিদেশে—একা থাকা কি তোমার পক্ষেই সুখের? তোমার মার মনে ব্যথা দিয়া—তোমার দিদির মনে ব্যথা দিয়া, তুমি নিজের বুকে নিজে এ শক্তিশেলের ব্যথা ভোগ করিতেছ কেন? এ টাকা তুমি বাড়ীতে থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সে জন্য তোমাকে বিদেশে যাইতে হইবে না, সে জন্য তুমি বিদেশে যাও নাই। আর টাকাতেই কি সুখ? স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার বন্ধন যদি একবার শিথিল হয়, তবে সে বন্ধন আবার দৃঢ় করা বড় কঠিন কাজ। তোমাকে বুঝাইতে পারি, এমন বিদ্যা বা বুদ্ধি—স্ত্রীলোক আমি—আমার নাই। তুমিই বুঝিয়া দেখ। আর বুঝিয়া দেখিতে চাহ বা না চাহ, আমার এই একটা অনুরোধ রাখ।'

পত্র পাঠ করিয়া সুশীল বিচলিত হইল। তাহার যৌবনের অনাবিল ভালবাসা—বুকভরা প্রগাঢ় প্রেম—সে ত তাহাকে ক্ষমা করিতেই প্ররোচিত করিতেছিল। কেবল অভিমানসঞ্জাত, শুষ্ক, কঠোর যুক্তি ভালবাসাকে দৌর্ব্বল্য বলিয়া উপহাস করিতেছিল, আর সে সেই উপহাসেরই ভয় করিতেছিল। ভালবাসা যখন অভিমানের ফলে জীবনে মরুভূমি দেখাইয়া তাহাকে ক্ষমার পথে আনিতে উদ্যত হইল, তখন অভিমান যুক্তির আশ্রয় লইয়া বলিল—এ পত্র বিধাত্রী দেবীর, গৌরী ত অনুতাপের কোনও প্রমাণই দেয় নাই। এ অবস্থায় ক্ষমা কেবল আপনার অপমানের ক্ষত আপনি গোপন করিয়া আঘাতকারীর কাছে হীনতা-স্বীকার। গৌরী হাসিবে। সুশীল যুক্তির কথাই শুনিল—বুঝিল না, গৌরীর মনের ভাব জানিবার কোনও পথই সে রাখে নাই—রাখিলে সে ভাব জানিতে পারিত। সে যে গৌরীর মনের ভাব জানিবার কোনও উপায়ই করে নাই, তাহার যুক্তির ঘন বিন্যাসের মধ্যে সেই ছিদ্রটি একবারও তাহার নয়নগোচর হইল না। বিধাত্রী দেবীর পত্রে যে গৌরীর মনের ভাব প্রতিবিম্বিত হইতে পারে—সে যে পিতামহীর কাছে আপনার বেদনা ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারে, সে কথাও সুশীলের মনে হইল না।

তাঁহার পত্রের উত্তর পাইয়া বিধাত্রী দেবী আশার কোনও অবকাশই পাইলেন না। তাঁহার আরও ভয় হইতেছিল, এ কথা গোপন থাকিবে না—

গোপন থাকিবার নহে ; যখন সুশীলের মাতা এই ব্যাপার জানিতে পারিবেন, তখন শ্বশুরবাড়ী যে গৌরীর পক্ষে সুখদ হইবে না, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তাঁহার বড় আদরের নাতিনী—পিতৃহীনা গৌরী কি শেষে অনাদরে কষ্ট পাইবে? স্বামীর ভালবাসা হারাইলে নারীর জীবন ব্যর্থ হয়, তাহার উপর অবহেলা! গৌরী কি সহ্য করিতে পারিবে?

বিধাত্রী দেবী যাহা ভয় করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাই হইল। সুশীলের মাতা প্রথমে সুশীলের গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ অনুমানও করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সে কারণ তাঁহার কাছে শেষে আর গোপন রহিল না। সুশীলের 'বিদেশে' যাওয়া তিনি কিছুতেই ভাল মনে করিতে পারিতেছিলেন না। মেয়ের বিবাহের পর বিধবা হইয়া তিনি দুইটি ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহাদিগকেই সর্ব্বস্বজ্ঞানে জড়াইয়া ছিলেন—কখনও তাহাদের দূরে যাইতে দেন নাই। এত দিন তিনি যেন কর্ত্তব্যই পালন করিতেছিলেন। তাহাদের বিবাহ দিয়া তিনি পরম সুখ ভোগ করিবেন, আশা করিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, এইবার নূতন করিয়া সংসার সাজাইলেন। এই সময় কন্যার বৈধব্য তাঁহার বক্ষে শোকের শেল বিদ্ধ করিল—সে ব্যথা ত যাইবার নহে। তাহার পর সুশীল চলিয়া গেল—সংসারের এক দিক যেন শূন্য হইয়া গেল। সুশীল চলিয়া গেলে তিনি গৌরীকে অধিক দিন পিত্রালয়ে থাকিতেও দিতেন না; বলিতেন, 'আমার ছেলে কাছে নাই, আবার তুমিও না থাকিলে সুশীলের ঘরের দিকে আমি চাহিতে পারিব না।' সুশীল তাঁহার কাছে থাকিবে, ইহাই তাঁহার আশা ছিল। তাহা হইল না—সে একা 'বিদেশে' গেল; যদি গেল, তবে গৌরীকে সঙ্গে লইয়া গেল না কেন? এই বয়সে তাহার পক্ষে এমন কঠোর ভাবে অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তিনি যখন গৌরীকে লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন সে বুঝাইয়াছিল, পশার হয় কি না দেখিয়া তাহা করা সঙ্গত নহে। তিনিও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিন মাস পরে যখন সে মাসে তিন শত টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিল, তখন তিনি কেবলই লিখিতে লাগিলেন, তিনি গৌরীকে লইয়া তাহার কাছে যাইবেন। সে প্রস্তাবে তাহার আপত্তির যে কোনও কারণ থাকিতে পারে, মা তাহা বুঝিলেন না।

ছয় মাস পরে যখন আদালত দীর্ঘ কালের জন্য বন্ধ হইল, তখন সুশীল বাড়ী না আসিয়া কাশ্মীরে বেড়াইতে গেল। মা বুঝিলেন, ইহার কোনও কারণ

আছে। তিনি সুশীলের মা—তিনি তাহাকে যেমন জানেন, তেমন ত আর কেহই জানে না। এমন কাজ যে তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ছয় মাস 'বিদেশে' থাকিবার পর ছুটী পাইয়াও সে বাড়ী আসিল না! পুত্রের কর্ত্তব্য, ভ্রাতার কর্ত্তব্য, পতির কর্ত্তব্য—সে সব অবহেলা করিল!

তখন সুশীলের মা আর তাহার দিদি পরামর্শ করিলেন। যখন আর সব দিক দেখিয়া কোথাও তাহার ভাবান্তরের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন উভয়ে গৌরীর দিক্‌টায় দৃষ্টিপাত করিলেন। এই ছয় মাসের মধ্যে তাঁহারা ত একবারও সুশীলের নিকট হইতে গৌরীর নামে কোনও পত্র আসিতে দেখেন নাই! মা বলিলেন, হয় ত সুশীল গৌরীর বাপের বাড়ীর ঠিকানায় পত্র লেখে। দিদি বলিলেন, তাহা হইতে পারে না। সুশীল যখন এই ঠিকানায় গৌরীর জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠায়, তখন পত্র লিখিতেই তাহার আপত্তি কি? মা ভাবিতে লাগিলেন—ভাবনার কূল না পাইয়া শেষে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কি জানি, বাছা! সবই আমার অদৃষ্টের ফল।' তাহার পর মা ও মেয়ে আবার অনেক পরামর্শ করিলেন। তাহার ফলে স্থির হইল, সুশীল কাশ্মীর হইতে কর্ম্মস্থলে ফিরিলেই মা তাহার কাছে যাইবেন। তিনি একা যাইবেন, কি গৌরীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এই বিষয়ে অনেক বিবেচনার পর স্থির হইল, এ অবস্থায় গৌরীকে লইয়া না যাইয়া তাঁহার একা যাওয়াই ভাল। মা সুশীলের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন গণিতে লাগিলেন—দিন যেন আর ফুরায় না!

তাহার পর সুশীলকে বারণ করিবার অবসর না দিয়া, পত্র লিখিয়া তাহার পর দিনই মা বড় ছেলেকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

সুশীল ষ্টেশনে ছিল; মা গাড়ী হইতে নামিতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'এমন তাড়াতাড়ি কি আসিতে আছে? আমার এ লক্ষীছাড়ার আস্তাকুড়—একটু সময় না পাইলে কি সাফ করিয়া রাখা যায়?'

মা বলিলেন, 'বাবা, যেখানে তুমি থাকিতে পার, সেখানে আমিও থাকিতে পারিব। কিন্তু আমি তোমাকে এমন "বনবাসে" থাকিতে দিব না।'

বলিতে বলিতে মার গলা ধরিয়া আসিল। সুশীল মেঘের অন্তরালে চন্দ্রের মত সেই ব্যথার অন্তরালে মার আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সে আর কোনও কথা বলিল না—মাকে ও দাদাকে গাড়ীতে তুলিয়া বাসায় চলিল।

ছেলে যাহাকে আঁস্তাকুড় বলিয়াছিল, মা আসিয়া দেখিলেন—সে সাজান বাগান। সুশীল ফুল ও পাখী ভালবাসিত; কিন্তু কলিকাতার বাড়ী কেবল ইট কাঠের সমষ্টি, তাহাতে স্থানাভাব; তাই তাহাকে টবে গাছ রাখিয়া বারান্দায় গোটাকতক খাঁচা টাঙ্গাইয়া তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এ বাসার হাতা অনেকটা—সবই বাগান, ফুলে ভরা, বারান্দায় বড় বড় খাঁচায় নানারূপ পাখী। যে কুকুরটিকে সে কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে মাকে ও দাদাকে দেখিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল, দাদার হাত চাটিয়া দিল। বাড়ীর সাজসজ্জা উৎকৃষ্ট, সব পরিচ্ছন্ন, কোনও আসবাবে কোথাও এতটুকু ধূলা নাই। মা সব দেখিয়া বলিলেন, 'এ কি করিয়াছিস? এই বুঝি তোর আঁস্তাকুড়?' সুশীল হাসিয়া বলিল, 'তুমি আসিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি সব সাজাইয়া রাখিয়াছি, নহিলে তোমার পরিশ্রমের সীমা থাকিত না—সব পরিষ্কার না করিয়া তুমি ত জলগ্রহণ করিতে না!'

কিন্তু তখনও মার সব দেখা হয় নাই। সুশীল মার জন্য দুইটি ঘর ধৌত করাইয়া মুছাইয়া রাখিয়াছিল—মার পূজার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া, মার রন্ধনের সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এই ব্যবস্থায় মার চক্ষুতে জল আসিল, যে ছেলে এমন করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছে, সে কোন্ দুঃখে দেশত্যাগী হইয়াছে! এ রহস্য তিনি ভেদ করিবেনই।

সেদিনও সুশীলকে একবার আদালতে যাইতে হইল, একটা জরুরী মোকর্দ্দমা ছিল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তাহার পর মা বলিলেন, 'বাবা, হয় তুই আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল—সুখে হউক, দুঃখে হউক, এক সঙ্গে থাকিব; নহে ত বল, আমি তোর কাছে থাকি।'

সুশীল বলিল, 'মা, জানই ত কত খরচ। সুধীর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তুমি ব্যস্ত হইও না—তত দিন আমাকে খরচের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।'

বড় দুঃখেও মার হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, 'বাবা, আমাকে কি ভুলাইবি? আমি যে তোকে পেটে ধরিয়াছি। এই সাজসজ্জা, এই বাসের ব্যবস্থা, এ সব কি খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রমাণ?'

'ও সব দোকানদারী; আজ কাল ভেক না হইলে ভিক মিলে না।'

'ভাল, তাহাই না হয় হইল। গত মাসেও যে আমাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়াছিলি—সে কি ভিক্ষার জন্য ভেক, না লোকদেখান?'

সুশীল দেখিল, প্রকৃত কথা আর অধিকক্ষণ গোপন করা চলিবে না। সে বলিল, 'সে ঝগড়া ত তুমি বরাবরই করিতেছ, সে পরে হইবে। এখন যখন এত দূর আসিয়াছ, তখন এ দিকের তীর্থগুলা করিয়া যাও—আমি সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।' সে রেলের কেতাব প্রভৃতি লইয়া সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

কথাটা কয় দিন চাপা রহিল। সুশীল মাকে লইয়া সে অঞ্চলের তীর্থস্থান-গুলিতে গেল। কিন্তু তাহার পর? ফিরিয়া আসিয়া মা যখন আবার সেই কথার উত্থাপন করিলেন, তখন ত আর উত্তর না দিবার পথ রহিল না! মা বলিলেন, 'তোর উন্নতি হয়, তোর ভাল লাগে, তুই এখানেই থাক। কিন্তু আমি তোকে এমন ভাবে থাকিতে দিব না। আমি থাকি; তোর দাদা ফিরিয়া যাউক, ছোট বৌমাকে পাঠাইয়া দিউক। সংসার পাতাইয়া আমি যাইব—কখনও তোর কাছে, কখনও কলিকাতায় থাকিব।'

সুশীল কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল; তাহার পর বলিল, 'না, মা, তাহা হইবে না।'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'

'ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের মিলন কেবল অসুখের কারণ।'

মা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'বাবা, দোষ আমারই, তুই প্রথম হইতেই বলিয়াছিলি, "বড়মানুষে"র ঘরে কাজ করিয়া কাজ নাই।'

'কিন্তু, মা, তুমি ত ভাল ভাবিয়াই কাজ করিয়াছিলে।'

মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, 'কিন্তু, বাবা, ছোট বৌমা ছেলেমানুষ—সে কি এমন অপরাধ করিল যে, তাহার জন্য তুই তাহার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিলি?'

সুশীল বলিল, 'মা অপরাধের অপেক্ষা অপরাধের ভয়কেই আমি অধিক ভয় করি। যাহাতে তাহার সম্ভাবনা না হয়, সেই জন্য দূরে আসিয়াছি।'

এই কথায় মা যেন একটু আশার অবকাশ পাইলেন। তিনি সুশীলকে অনেক বুঝাইলেন, সে হয় ত ভুল বুঝিয়াছে—যদি সে ভুল না-ও বুঝিয়া থাকে, তবুও তাহার পক্ষে এমন কঠোর হওয়া ভাল নহে। ভালবাসা মানুষের দৌর্ব্বল্য ও ত্রুটী দূর করে—ভালবাসার ঔষধে মানুষের হৃদয়ের যত ব্যাধি দূর হয়, তত আর কিছুতেই হয় না। সুশীল বলিল, 'ভাল, দেখা যাউক কি হয়। তুমি ব্যস্ত হইও না।' মা বলিলেন, তিনি গৌরীকে বুঝাইয়া তাহার মনের ভাব

পরিবর্ত্তিত করিবেন—তিনি তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা করিবেন, সুশীল যেন তাহাতে আপত্তি না করে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কিছুতেই সুশীলকে সম্মত করিতে পারিলেন না।

শেষে মা বলিলেন, 'তবে আমি তোর কাছে থাকি। আমরা মা ছেলে, এত দিন যেমন আমাদের আর কেহ ছিল না, না হয় তেমনই আর কেহ থাকিবে না।'

সুশীল বুঝিল, মা কাছে থাকিলে তাঁহার প্রতিদিনের চেষ্টায় শেষে তাহাকে পরাভব মানিতেই হইবে। সে বলিল, 'মা, তাহা হইলে লোকে কি মনে করিবে? তা কি কখনও হইতে পারে?'

শেষে মাকেই পরাভব মানিতে হইল।

যাইবার দিন মা কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'বাবা, তোরা দুঃখিনীর সম্বল। আমাকে ত ফেলিতে পারিবি না! তুই ফিরিয়া চল। এ শাস্তি যে আমার—আর এ যে তোর নিজের!'

সুশীলের মনে হইতে লাগিল, সে যেন আর আপনার দৃঢ়তা অনাহত রাখিতে পারিতেছে না। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, অভিমান—অপমান—বিচার—বিবেচনা সব ভুলিয়া সে কেন ফিরিয়া যাইতে পারে না? মার স্নেহ, পরিবারের স্মৃতিবন্ধন, পুরাতন জীবন তাহাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আরও একটা আকর্ষণ ছিল, সে যুবকের প্রেম। তাহা উপলব্ধি করিয়াই সুশীল ফিরিয়া দাঁড়াইল—আপনার দর্পে আপনার দৌর্ব্বল্য দলিত করিয়া কঠোর হইল—সে ফিরিবে না। ফিরিলে সে কেমন করিয়া আপনার কাছে আপনি মুখ দেখাইবে?

মা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন—ছেলের জন্য বুক-ভরা—বুক-ভাঙ্গা বেদনা বহিয়া লইয়া গেলেন। এ শাস্তি তাঁহার, আর এ শাস্তি তাহার।

আর সুশীল? মাকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সে যেন যন্ত্রচালিতবৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার শুষ্কনেত্রে অশ্রু আসিল না; কিন্তু যাতনার বহ্নিদাহে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রিয়জনের চিতানলের উপর দাঁড়াইলে যেমন হয়, তাহার তেমনই বোধ হইতে লাগিল। জীবন মরুভূমি, আশা ভস্মাবশেষে পরিণত, এ অবস্থায় জীবন কি কেবল দুঃখের নহে? হায় ভালবাসা, তুমি মানুষকে কত দুঃখই দিতে পার! রমণীর প্রেম সাধনার ধন—কিন্তু যে

সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিয়া ব্যর্থকাম হয়, তাহার মুষ্টিতে স্বর্ণখণ্ড ধূলিতে পরিণত হয়, তাহার মত দুঃখ কাহার? সুশীল সেই দুঃখ ভোগ করিতেছিল। আজ মার প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্মৃতির আলোড়নে, আলোচনার আন্দোলনে দুঃখ কেবলই বাড়িতে লাগিল। সুশীল ব্যবসায়ে কাজে মন দিয়া বিস্মৃতিলাভের চেষ্টা করিল, সাফল্য লাভ করিতে পারিল না। সে দিন সেই ভাবে গেল—সে রাত্রি অনিদ্রায় কাটিল।

পর দিন সুশীল আপনাকে আপনি বুঝাইল—এমন করিয়া স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়া লাভ কি? সুখের হউক, বা দুঃখের হউক, কর্ত্তব্য-পালনই তাহার নিয়তি। কাতর হইলে চলিবে কেন? সে তাহার সঙ্কল্পে দৃঢ় হইল—অর্থ যে তাহার করতলগত হইতে পারে, সে তাহা দেখাইবে। এইটুকু প্রতিহিংসায় তাহার তৃপ্তিলাভসম্ভাবনার মূলে যে তাহার বুকভরা ভালবাসাই ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল কি? যে ভালবাসা সে যাতনার কারণ মনে করিতেছিল, সে যে কিছুতেই তাহার বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছিল না, তাহা সে অনুভব করিতে পারিল কি?

সুশীল অধিকতর আগ্রহে ব্যবসায়ে মন দিল—সাফল্যের স্রোতে স্বর্ণের প্রবাহ তাহার আয়ত্তাধীন হইল। কিন্তু তাহাতে কি সুখলাভ হইতে পারে?

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

'শব্দ-কথা।'

[সমালোচনা।]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রণীত 'শব্দ-কথা' নামক গ্রন্থখানির পরিচয় গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহার মুখবন্ধ-মুখে এইরূপ দিয়াছেন—

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; প্রবন্ধগুলি এতকাল পরিষৎ-পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল; শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম। প্রায় সকল প্রবন্ধই সংশোধন করিয়াছি। ধ্বনি-বিচার নামে প্রবন্ধটির কলেবর বাড়িয়া গিয়াছে। ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধটির প্রতি আমার একটু মমত্ব আছে। বোধ হয়, আমি উহাতে কিছু নূতন কথা বলিয়াছি। এইরূপে বাঙ্গালা শব্দের আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, জানি না।'

'ধ্বনি-বিচার' গ্রন্থের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। এই কারণেই ইহা গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম স্থান পাইয়াছে। আড়াই শত পত্রে সম্পূর্ণ পুস্তকখানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই জ্যেষ্ঠ প্রবন্ধ অধিকার করিয়া আছে। ইহাতে বিজ্ঞানবিৎ গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় 'ধ্বন্যাত্মক' বা 'অনুকার' (Onomatopoetic) শব্দগুলির উৎপত্তি ও অর্থনিষ্পত্তির জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শব্দ-বিজ্ঞানের আশ্রয়ে বাঙ্গালা বর্ণমালার ধ্বনি-বিচার করিয়াছেন। ইহাতে তিনি স্বকীয় চিন্তাবলে বাঙ্গালার অনুকার শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান-পথে নূতন আলোক দিয়াছেন। স্বাভাবিক বিনয়বশে তিনি বলিয়াছেন—'বোধ হয়, আমি উহাতে কিছু নূতন কথা বলিয়াছি।' 'বোধ হয়' নহে—বস্তুতঃ তিনি উহাতে বহু নূতন কথা কহিয়াছেন। এই প্রবন্ধে নিবন্ধ-কারের 'মমত্ব' বা স্বত্ব (Originality) যেরূপ ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে 'প্রবন্ধটির প্রতি' তাঁহার 'একটু মমত্ব' থাকুক আর নাই থাকুক, ইহার প্রতি বঙ্গজাতির গভীর মমত্ব চিরদিনই থাকিবে। নবসিদ্ধান্তযুক্ত এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সমালোচনা আমরা পৃথকভাবে করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। জ্যেষ্ঠের সম্মাননার জন্য আমরা পৃথক্ আসন পাতিব, স্থির করিয়াছি।

অবশিষ্ট নয়টি প্রবন্ধের মধ্যে শেষের পাঁচটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-বিষয়ক, এবং তাহাদের অধিকাংশই রসায়নাদি শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের তালিকাময়। আমরা এ গুলিরও এ স্থলে সমালোচনা করিব না। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার নামকরণ এখনও সার্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা ও সর্ব্ববাদিসম্মত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ধীমান্ গ্রন্থকার মুখবন্ধের শেষে স্বয়ংই বলিয়াছেন—'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা-সমিতিতে কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, কাগজ কলম হাতে লইয়া কোনও একটা বিজ্ঞানবিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্ত্তার এবং অনুবাদকের হাতে।......রাসায়নিক পরিভাষা প্রবন্ধের শেষে রসায়ন শাস্ত্রের কতকটা পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম; তাহা এখন প্রকাশের যোগ্য বোধ করিলাম না।' আমরাও তজ্জন্য এই প্রবন্ধগুলি উপস্থিত ক্ষেত্রে সমালোচন-যোগ্য মনে করিলাম না।

অবশিষ্ট চারিটী প্রবন্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয়। তন্মধ্যে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ও 'কারক প্রকরণ' এই দুইটী দীর্ঘ ও সবিশেষ আলোচন যোগ্য। অপর

দুইটী ক্ষুদ্র বলিয়া তেমন উপভোগ্য নহে। স্বাদ গ্রহণ করিতে না করিতেই সমাপ্তির বিষাদ আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ 'বাঙ্গালার কৃৎ ও তদ্ধিত' নামক প্রবন্ধটি অন্য দুই জন লেখকের (শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর) মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে, অত্যল্প 'সম্পাদকীয় মন্তব্য'মাত্র। মূলের অভাবে শুধু তাহার টিপ্পনীর সমালোচনা সঙ্গত হইবে না। 'না' প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে চলিবে না।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দুইটি বিশেষ কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। (১) বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণের কার্য্যের সন্ধান ও পরিচয় যথোচিত ভাবে রাখেন নাই। (২) তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইবার পরে—কিন্তু সংশোধিত হইয়া পুনঃপ্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, * বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে এমন দুই একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার দ্বারা তাঁহার লিখিত বহু কথা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি ও কবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ বঙ্গভাষাতত্ত্বানুশীলন আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বে কয়েক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺শ্যামাচরণ শর্ম্মা, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় হৃষীকেশ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামাচরণ শর্ম্মা কৃত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বর্ত্তমান সময়ের ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। † নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার কৃত 'নববোধ ব্যাকরণ' ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে রচিত। নকুলেশ্বর

---

* রামেন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধগুলি সন ১৩০৮ ও ১৩১২ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং সংশোধিত হইয়া, সন ১৩২৪ সালে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।

† ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দাদির আলোচনা বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তাহার উল্লেখ এ স্থলে অনাবশ্যক। আত্ম-সমর্থনের জন্য এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন—'বাঙ্গালা ভাষা যত দিন বদ্ধ-মূল না হইতেছে, তত দিন ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর 'ব্যাকরণ' রচিত হওয়া কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে।'

প্রণীত 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' শাস্ত্রী মহাশয়ের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নব্য ভাষালোচকগণের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া সকলেই সন ১৩০১ সাল ও তাহার পর হইতে বাঙ্গালা শব্দতত্ত্বের ক্ষেত্রে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর-যুগের রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ১৩০১ সালের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা পুনরারম্ভ করিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন। 'সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধের রচয়িতা—বঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'কৌমুদী'-প্রচারকর্ত্তা ও বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের যে এক তালিকা সঙ্কলন করেন, তাহা যে তাঁহার একখানি বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যমূলক, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অবসর ও স্বাস্থ্যের অভাবে তাঁহার সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছুদিন এ বিষয়ের অনুশীলন মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ের পুনরুদ্বোধন করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন।

বঙ্গভাষানুশীলনকারী এই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ব্যোমকেশ, রামেন্দ্রসুন্দর ও বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি মহাশয়গণের বঙ্গশব্দতত্ত্বের কার্য্য, অবসর-কৃত বলিয়া অল্প ও অশৃঙ্খলাবদ্ধ। বাঙ্গালায় 'শব্দকোষ' ও ব্যাকরণ প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় ও 'ভাষাতত্ত্ব'-রচয়িতা শ্রীযুত শ্রীনাথ সেন মহাশয় এ বিষয়ে সম্যক্ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।* বিশেষতঃ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কৃত 'বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ', বঙ্গীয় শব্দতত্ত্ব-ক্ষেত্রে তাঁহার পরিশ্রম, অনুশীলন ও সিদ্ধান্তের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। এ কথা, আমরা তাঁহার সহিত বহুবিষয়ে একমত না হইলেও, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রও দুই জন পূর্ব্বাচার্য্যের গ্রন্থের সন্ধান রাখেন নাই। আমরা এ কথা অনুমান করিয়া বলিতেছি না। অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা'র তৃতীয় অধ্যায়ের অর্থাৎ 'ব্যাকরণ' প্রকরণের আরম্ভে কহিয়াছেন—

---

* যোগেশ বাবুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ' সন ১৩১৯ সালে, এবং শ্রীনাথ বাবুর 'ভাষাতত্ত্ব' সন ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়।

'মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার প্রায় আড়াই শত ব্যাকরণ আছে। দুঃখের বিষয়, এই অধ্যায় লিখিবার সময় তিন চারিখানির অধিক দেখিতে পাই নাই। প্রথমখানি, রাজা রামমোহন রায় কৃত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (শক ১৭৫০); দ্বিতীয়খানি শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (বঙ্গাব্দ ১২৫৯); তৃতীয়খানি, শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৫ সাল); এবং চতুর্থখানি শ্রীলোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (সংবৎ ১৯৩৩)। রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত, ব্যাকরণের আরম্ভ মাত্র। অন্য তিনখানি কিঞ্চিৎ বৃহৎ।'

ইহা হইতে স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র নীলমণি মুখোপাধ্যায় কৃত 'নববোধ ব্যাকরণ' (সংবৎ ১৯২৮ অব্দে প্রকাশিত) এবং হৃষীকেশ শাস্ত্রী প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৭ সনে প্রকাশিত) এই দুইখানি গ্রন্থ দেখেন নাই। ত্রিবেদী মহাশয়ও এই দুইখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখেন নাই। আমরা যত দূর সংবাদ রাখি, তাহা হইতে জানি— উক্ত পুস্তক দুইখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে নাই।

সে যাহা হউক, শ্যামাচরণ শর্ম্ম প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে'র পর প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলির ভিতরে, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কারের 'নববোধ ব্যাকরণ', হৃষীকেশ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ও নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—শুদ্ধ এই তিনখানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 'পণ্ডিত শ্যামাচরণ শর্ম্মা ও নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণ হইতে সাহায্য পাইয়াছি'—অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র, তাঁহার প্রণীত ব্যাকরণ-গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ শর্ম্মার ব্যাকরণের সবিশেষ প্রশংসাও তিনি করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণ-প্রকরণ হইতে উপরে যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি লিখিয়াছেন—

'সাতাত্ন (?) বৎসর পূর্ব্বে শ্যামাচরণ শর্ম্মা বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচনায় যে অনুসন্ধান-ফল দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার পরিপক্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হইলে সমুদয়টি উদ্ধার করিতাম। তিনি লিখিয়াছেন, "শব্দমাত্র আদৌ দুই ভাগে বিভক্ত, অব্যয় ও সব্যয়।"......এই ব্যাকরণে "অনাদর-সূচক সংজ্ঞা"র সাধন, "অনুকার শব্দ", "অনুরূপ শব্দ", "টা-আদির প্রয়োগ" ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা আছে।'

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় যদি ন্যায়ালঙ্কার ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখিবার সুযোগ পাইতেন, তবে

তিনি এই দুইখানি পুস্তক হইতে স্বকীয় ব্যাকরণ রচনা বিষয়ে বহু সাহায্য পাইতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাকরণ 'নববোধ ব্যাকরণ' অপেক্ষা বৃহত্তর, উৎকৃষ্টতর ও গভীরতর গবেষণায় পূর্ণ। এই গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য ভাষা হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দের, তাহাদের প্রয়োগের, এবং বাঙ্গালা ভাষার বাক্যবিন্যাসের বিশেষত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও (১৩০৭ সনের পূর্ব্বাপরবিদিত) আধুনিক বাঙ্গালা-বৈয়াকরণদিগের মতের সম্যক্ আলোচনা করিয়া স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিশতাধিক পত্রপৃষ্ঠে মুদ্রিত এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণখানি দেখিলে শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর নিশ্চয়ই উল্লসিত হইবেন।

নীলমণি ন্যায়ালঙ্কারের 'নববোধ ব্যাকরণ'খানিও সুন্দর। তবে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ব্যাকরণখানিকে তিনি যথোচিত পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করিতে পারেন নাই। এই কথার প্রমাণস্বরূপ ও পুস্তকখানির রচনা-প্রকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য আমরা এ স্থলে 'নববোধ ব্যাকরণে'র বিজ্ঞাপনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

'ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীস্থ সমুদায় ভাষাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, সাংশ্লেষিক ও বৈশ্লেষিক......বাঙ্গালা ভাষা এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী; ইহা (সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মত) কতক সাংশ্লেষিক ও (ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার মত) কতক বৈশ্লেষিক।......সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উপরি-উক্ত উভয়বিধ ভাষারই নিয়মাধীন।...সত্য, সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার প্রধান উপজীব্য, কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি যে নিতান্ত বিসদৃশ, তাহা স্থূলদৃষ্টিরও অগোচর নহে।...উক্ত সর্ব্বাভিজ্ঞতাবী সাধারণ বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রবন্ধখানি সঙ্কলিত হইল। অবিগীত শিষ্টাচারই ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়ামক; প্রধান প্রধান গ্রন্থকারেরা উহাকে আদর্শ করিয়া চলেন।...সেই শিষ্টাচার এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারগণের রচনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সঙ্কলন করা বৈয়াকরণদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কে এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। সংস্কৃত ভাষার সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ। কিন্তু কেবল সংস্কৃতজ্ঞেরা ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নন। 'সৎলোক', 'চন্দ্রলজ্জা', 'অনন্ত চিন্তা', 'মনদুঃখ', 'মনান্তর', 'কপেক', 'পিতা কর্ত্তৃক' প্রভৃতিকে তাঁহারা অপপ্রয়োগ বলেন। 'কর্ত্তায় দ্বিতীয়া ও সপ্তমী হইতে পারে', 'উভক্রিয়ার কর্ম্মে সপ্তমী হয়'...'ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদেও কর্ম্মপদ প্রযুক্ত হইতে পারে' ইত্যাদি নূতন নিয়ম সকল শ্রবণ করিলে তাঁহারা ভাষাবিপ্লব উপস্থিত হইল বলিয়া শঙ্কিত হইবেন।*

---

* ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের এই উক্তির পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলেও এই 'খাঁটি সংস্কৃতবাদী'র দল আজিও বর্ত্তমান। ইঁহাদের বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার জন্যই রামেন্দ্রবাবুর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ লিখিত। প্রবন্ধারম্ভেই তিনি বলিতেছেন—'সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা

'এতাদৃশ নূতন ভাষার ইতিবৃত্ত সমালোচনা করা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে পরম কৌতুকাবহ হইবে সন্দেহ নাই, এই বিশ্বাসের পরবশ হইয়া উপকরণ সামগ্রীর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু উহার এত অসদ্ভাব এবং মাদৃশ লোকের পক্ষে ঈদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে যথোচিত উপকরণ সমাহরণ করা এরূপ দুরূহ যে, অগত্যা নিবৃত্ত হইতে হইল।

'শ্যামাচরণ কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বিদ্যাসাগর কৃত কৌমুদী এবং সাহিত্যদর্পণ এই পুস্তকের প্রধান অবলম্বন; এতদ্ভিন্ন পাণিনি, মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী; লোহারাম ও রামগতি কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, নীলাম্বর কৃত ব্যাকরণ, লালমোহন কৃত কাব্যনির্ণয়, ফর্ব্বস্ কৃত উর্দ্দু ব্যাকরণ, হাইলি কৃত ইংরাজী ব্যাকরণ, এবং ক্যাম্বেল কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ হইতেও স্থানে স্থানে অনেক আনুকূল্য গ্রহণ করা গিয়াছে।...

'গ্রন্থারম্ভ করিবার অগ্রে নূতন বাঙ্গালা রচনার প্রবর্ত্তয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় কৃত প্রায় তাবৎ পুস্তক অধ্যয়ন করি। পাঠকালে যেমন ভাষা সম্বন্ধীয় নানা রহস্যের উন্মেষ হইতে লাগিল, অমনি তৎসমুদয় একটী নোটবহিতে লিখিতে লাগিলাম। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে যদৃচ্ছালব্ধ অনেকানেক প্রমাণ প্রয়োগ তুলিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রকারে ঐ নোটবহিতে যে সকল বিষয় সংগৃহীত হইল, তৎসমস্ত হইতে অনেকানেক সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত করিয়া এই প্রবন্ধের যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।......পদ্যপ্রকরণ-সঙ্কলনকালে...শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হইতে কতিপয় মহার্ঘ নূতন নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।'...

'নববোধ ব্যাকরণে'র এই সারগর্ভ বিজ্ঞাপনটি বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। শুধু এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাইলেও ত্রিবেদী মহাশয় প্রীত হইতেন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামক প্রবন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

'বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে যে কয়েকখানি শিশুবোধক পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোনখানিও প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। নহে, কেন না বাঙ্গালা ব্যাকরণই এখন নির্ম্মিত হয় নাই, কোন্ ভবিষ্যতে হইবে তাহাও কেহ জানে না।...উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ।...ভাষার ভিতর কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আগে আবিষ্কার করিতে হইবে।...বাঙ্গালা ভাষায় সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেন না, বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না আছে,

---

ব্যাকরণ আলোচনার ফলে সাহিত্যসমাজে অনেকের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। অনেকে ভাবিতেছেন বুঝি বা বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধিনাশই এক দল লেখকের অভিপ্রায়।' শেষের দিকেও ঐ কথা—'এক দল পণ্ডিত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝি বা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে স্বেচ্ছাচার অবলম্বিত হয়।'

তাহার কেহই আলোচনা করেন নাই।...বাঙ্গালার ব্যাকরণ কি পদার্থ তাহা কেহই জানেন না।...খাঁটি বাঙ্গলার ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন।...খাঁটি বাঙ্গালার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য।...বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম সকল অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। সেই সকল নিয়ম যখন আবিষ্কৃত হইবে তখন বাঙ্গালার পাণিনি নিজ প্রতিভা দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবিষ্কার সকলের সমন্বয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণশাস্ত্র সম্পূর্ণ করিবেন। তার পরে সেই ব্যাকরণ বালকদিগের জন্য প্রচারিত হইবে। সেই পাণিনির জন্মে এখনও অনেক বিলম্ব।'......

ত্রিবেদী মহাশয়ের এই বাগ্মিতা প্রশংসনীয় ও উপভোগ্য বটে। কিন্তু হৃদয়ের আবেগে তিনি প্রকৃত ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের কার্য্যের সম্যক্ সন্ধানের অভাবে তিনি সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া পাত্রা-পাত্রনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালার বৈয়াকরণবর্গের উপর বাগ্‌বাণ বর্ষণ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ শর্ম্ম কৃত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার কৃত 'নববোধ ব্যাকরণ', হৃষীকেশ শাস্ত্রী প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', শ্রীনাথ সেন রচিত 'ভাষাতত্ত্ব' এবং যোগেশচন্দ্র রায় রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ' বিদ্যমান থাকিতে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের ঐ উক্তির অধিকাংশই নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। যে 'খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ গড়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য', সেই সাহিত্য-পরিষদ্ হইতেই প্রকাশিত, যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা' যে তাহার পরিণতির মহৎ পরিচয় দান করিতেছে—অন্ততঃ এ কথাটা সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর কিরূপে বিস্মৃত হইলেন! এই গ্রন্থ-প্রকাশে তাঁহার 'বাঙ্গালার পাণিনি'র স্বপ্ন অংশতঃ সফল হয় নাই কি?

ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধ কয়েকটির সমালোচনার স্থান ও সময় এবারে আর নাই। বারান্তরে সে কার্য্য সম্পন্ন করা যাইবে।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রমণী-হৃদয়।

১

ও হৃদয় যতটুকু জানিয়াছি—বুঝিয়াছি,
সে কি নারি, সমগ্র তোমার?
চেয়ে চেয়ে মুখ পানে মিটেনি আঁখির তৃষা,
শত হলে দেখি শতবার!

কত কথা—কত হাসি, কত মান-অভিমান,
রমণী রে, সে কি অভিনয়?
অধরে অধর দিয়ে হৃদয়ে হৃদয় চাপি'—
বুঝি নাই তোমার হৃদয়!

২

জগতে বাসিতে ভালো তোমরাই জান শুধু—
এ কি সত্য—অথবা কল্পনা ?
তোমাদের প্রেম বুঝি নয়নে অধরে ভাসে,
পূর্ণ নাহি প্রকাশে আপনা !
নাহি জানি কি যে চাও,প্রেম বিনিময়ে প্রেম—
সে ত ভবে তুচ্ছ অভিনয় ;
জন্ম জন্ম—যুগ-যুগ রমণি, তোমারে পূজি'
কে পেয়েছে সমগ্র হৃদয় ?

•

হৃদয়ের এক দিক্— ওই শশাঙ্কের মত
চির দিন দেখি কি তোমার ?
কে জানে অপর দিক্ হয় ত, মোদের মত,
ধূ ধূ মরু—শুষ্ক পারাবার।
তবু শশী—সুধাকর, অমৃত কিরণ ঢালে
ধরণীর অন্ধকার বুকে !
তবু জানি, রমণী রে, ও মুখের স্নিগ্ধ আলো
লাগে ভালো সুখে আর দুখে।

থাক্ তবে চিরদিন হৃদয় রহস্য তব,
আমাদের একান্ত গোপন !
যতটুকু অপ্রকাশ, তাই নিয়ে টানাটানি,
তারি তরে দিছে প্রাণপণ !
যতটুকু আলো পাই আধখানা চাঁদ কাছে,
তাহে যদি অন্ধকার হরে,—
কাজ কি উল্কার শিখা, দাহ করে—দগ্ধ হয়,
জ্বলে—নিবে, নহে কারো তরে !

•

কুটীরের প্রান্ত দিয়া যে তটিনী বহি যায়,
কে পেয়েছে সমগ্র তাহার ?
স্নানে পানে তৃপ্ত হই, তাহার অধিক কিবা
আমাদের আছে অধিকার।
যতটুকু পাওয়া যায়— সেই আমাদের ভালো,
ছুটিব না আলেয়ার পাছে ;
মুখে হাসি—বুকে প্রেম, নিয়ে, নারি, চিরদিন
সুখে-দুখে থাক কাছে-কাছে !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

কায়রো।

১

'অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, চিত্রে,'[ইতিহাসে' যাহার বিবরণ বিদ্যমান, যাহার রূপের বহ্নিশিখায় বিশ্ববিজয়ী সিজারের বিজয়-গর্ব্ব পতঙ্গেরই মত দগ্ধ হইয়াছিল, যাহার জীবনান্ত বিস্ময়কর জীবনের অপেক্ষাও বিস্ময়কর, যিনি বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ বহু অঙ্কে সমাপ্ত জীবন-নাটকের নায়িকা, সেই ক্লিওপেট্রার লীলাস্থলী ; জগতের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি ও বিকাশক্ষেত্র ; শিল্পসাহিত্য-বিজ্ঞানের অন্যতম রাজধানী মিশরের মণিহারে দুইটি রত্ন সমধিক সমুজ্জ্বল—আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রো। আলেকজান্দ্রিয়া সাগরকূলে অধিষ্ঠিত। কায়রো সাগর হইতে দূরে অবস্থিত। কিন্তু যে স্থানে কায়রো অবস্থিত, সে স্থান উষর মরু নহে, পরন্তু নীল নদের স্নিগ্ধসলিল-সঞ্চারে উর্ব্বর, শ্যামশোভাময়। নীলনদ

আফ্রিকার মরুভূমিতে উর্ব্বর প্রদেশের সৃষ্টি করিয়াছে—বর্ষে বর্ষে তাহার জলরাশি কূল ছাপাইয়া সমগ্র প্রদেশে উর্ব্বরতার বিস্তার করে। তাই আমাদের দেশে গঙ্গা যেমন দেবতার আসন লাভ করিয়াছে, মিশরে তেমনই নীলনদ দেবপদবীতে উন্নীত হইয়াছে। এই নীল নদকে অবলম্বন করিয়া কবি-কল্পনা প্রাকৃত ঘটনাকে অতিপ্রাকৃতের রূপ প্রদান করিয়াছে—মিশরের কিংবদন্তীর পুষ্টিসাধন করিয়াছে। নীলনদের সলিলসঞ্চারে উর্ব্বর প্রদেশে নীলনদের কূলে কায়রো নগর অবস্থিত। অদূরে প্রাচীন নৃপতিদিগের সমাধিমন্দির পিরামিড, স্ফিংস। নগরের মধ্যে দুর্গ, কারুকার্য্যমনোজ্ঞ বহু মসজেদ, বহু সমাধিমন্দির, প্রাচীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। কায়রোয় প্রাচীনে ও নবীনে—প্রাচীতে ও প্রতীচীতে অদ্ভুত সম্মিলন। অমিতব্যয়ী খদিব ইসমাইল বহু অর্থব্যয়ে কায়রোকে আফ্রিকার প্যারিসে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা যে একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে, এমন বলা যায় না। তবে আফ্রিকা যেমন য়ুরোপ নহে, কায়রো তেমনই প্যারিস হয় নাই। য়ুরোপের সভ্যতা ও মিশরের সভ্যতা এক নহে—দুই দেশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। সেই সব প্রভেদ রাজার বা শাসকের আদেশে মুছিয়া ফেলা যায় না—সংস্কার সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাকৃতিক অবস্থা ও সংস্কার জাতির স্থাপত্য নির্দ্দিষ্ট করে। তাই কায়রো প্যারিস হয় নাই। কিন্তু কায়রোর হিমঋতু কঠোরতাবর্জ্জিত বলিয়া শীতের সময় য়ুরোপের নানা স্থান হইতে লোক শীতযাপনের জন্য কায়রোয় আসিয়া থাকেন। সেই সব যাত্রীর বাহুল্যে এবং মিশরের এই রাজধানীতে ইংরাজ সেনাদলের প্রধান কেন্দ্র থাকায়, কায়রোয় য়ুরোপীয় প্রভাব দিন দিনই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই প্রভাবে কায়রোর প্রাচীন বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—আর কায়রোর রাজপথে মরুবাসী বেদুইন আরবের দল, ভারবাহী উষ্ট্রের শ্রেণী, উল্কী-পরা কাফ্রির বাহুল্য, সুদর্শন তুর্ক, বোরকায় আবৃত মহিলাবৃন্দ, বহুমূল্য-আস্তরণাবৃত অশ্বতরের পৃষ্ঠে মণিমুক্তা-পরিহিত ধনীর সদর্প দৃষ্টি—আরব্য উপন্যাসের দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয় না। প্রাচীর বর্ণবাহুল্য ও দৃশ্য-বৈচিত্র্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

তবুও কায়রো নানা রূপে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাচীন ইতিহাস কিংবদন্তীর দূর রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তুর্ক সাম্রাজ্যে জনসংখ্যার হিসাবে ইহাই নগরসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল; ইহা সেনানিবাস; ইহা প্রাচীর অন্য

তম রাজধানী; ইহার অনতিবিস্তৃত পরিসরমধ্যে নানাজাতীয় প্রায় ছয় লক্ষ অধিবাসী; ইহার বিলাসপ্রিয়তা; ইহার পণ্যশালাসমূহ—এ সবই কায়রোর প্রসিদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়াছে। কায়রো জগতের নানা স্থান হইতে পর্য্যটকদিগকে আকৃষ্ট করে, এবং কেহই কায়রো দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরেন না। বিশেষ কায়রোর যে প্রত্নাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা না দেখিলে প্রাচীন মিশরের প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সেই গৃহে মিশরের ভাস্কর-কীর্ত্তি, মিশরের প্রাচীন বেশ-ভূষা, মিশরের পূর্ব্বকালের যান, মিশরের 'মামী' (সংরক্ষিত শব) এই সকল সযত্নে সংরক্ষিত। সে গৃহ মিশরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার—মিশরের সভ্যতার নিদর্শন। বিবিধ দ্রব্যের সংগ্রহে সমৃদ্ধ এরূপ চিত্রশালা সচরাচর লক্ষিত হয় না।

আবার এই কায়রোর প্রাচীর—কেবল প্রাচীর কেন, সমগ্র জগতের, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। সারাসিনিক স্থাপত্যকীর্ত্তি বিশাল ভবন—প্রায় চারি শত স্তম্ভের উপর ছাত গঠিত। তাহাতে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে, এমন কি, বঙ্গদেশ হইতেও, মুসলমান বিদ্যার্থীরা বিদ্যালাভ করে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দশ সহস্র; শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চারি শত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করে।

ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা কায়রোয় গমন করেন, তাঁহারা সচরাচর পোর্ট সইদ হইতে যাইয়া থাকেন। পোর্ট সইদ হইতে কায়রো পাঁচ ঘণ্টার পথ। মিশরের রেলওয়ে সরকারের সম্পত্তি। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে আরামে ভ্রমণ করা যায়। কেবল মরুদেশে ধূলাবালুর বাহুল্যে বিরক্তি জন্মে, কিন্তু তাহা নিবারণ করা যায় না। পোর্ট সইদ ছাড়াইয়া কিছু দূর শ্যামশোভাময় প্রদেশমধ্য দিয়া রেলপথ। স্থানে স্থানে রেলপথের এক দিকে হ্রদ—জলচরবিহঙ্গসঞ্চার-চঞ্চলিত, অপর দিকে খাল—এই খালে নীল নদ হইতে 'মিঠা' জল আনিয়া সহরে সহরে সরবরাহ করা হয়। খালের দুই কূল তৃণলতাগুল্মঘনশ্যাম। কোথাও রেলপথ সুয়েজ খালের কূল দিয়া যাইতেছে—খালের মধ্যে জাহাজ, নৌকা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে গ্রাম—বাঙ্গালার পল্লীতে যেমন কদলী ও কুমড়া দেখা যায়, তেমনই দেখা যায়—কুমড়ার লতা বেড়ার উপর, চালের উপর লতাইয়া গিয়াছে—ঘরের চাল টিনের, খোলার, টালির। স্থানে স্থানে ইক্ষুর চাষ—ইক্ষুদণ্ড দীর্ঘ ও পত্রবহুল। আর প্রায় প্রতি গৃহেই দ্রাক্ষালতা ও দাড়িম্বরৃক্ষ। দ্রাক্ষালতায় রসাল ফল ফলিয়া আছে; দাড়িম্বশাখা ফলভারে নত

হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশে দুই প্রকার দাড়িম্ব জন্মে—মিষ্ট ও টক; টক দাড়িম্বের শস্ত মাংসরন্ধনে ব্যবহৃত হয়। মেসোপোটেমিয়ায় আমারা ব্যতীত আর কোথাও এমন দাড়িম্ব বৃক্ষ দেখি নাই। এই প্রদেশে আর এক প্রকার ফলেরও বাহুল্য—সে ফিগ, কোমল, রসাল, সুমিষ্ট, মুখরোচক। প্যালেষ্টাইনে যেমন ফিগ জন্মে, তেমন জগতে আর কুত্রাপি জন্মে না। এ সেই ফিগ। রেলের ষ্টেশনে ষ্টেশনে ফিরিওয়ালারা আঙ্গুর, ফিগ ও দাড়িম্ব ফিরি করিতেছে—মূল্যও অতি অল্প, এক পিয়াস্তারে (প্রায় দশ পয়সা) যে ফল পাওয়া যায়, তাহাতে এক জনের প্রাতরাশ সম্পন্ন হইতে পারে। মিশরকে ফলের রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিয়াছি, ফলের বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে কোনও সহরই দামাস্কসের সমকক্ষ নহে। কিন্তু মিশরের সহরে আসিলেই বাঙ্গালীর বিস্ময় জন্মে, এ দেশে এত ফলও ফলে! স্থানে স্থানে আম্রও দেখা যায়, কিন্তু সে আম্রের স্বাদ আমাদের দেশের আম্রের স্বাদের মত মুখরোচক বলিয়া মনে হয় নাই।

ইস্মালিয়া হইতে ফল আরও অধিক পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পর আবার কিছু দূর মরুভূমি, বালুবিস্তার—পশু পক্ষীও কচিৎ দৃষ্ট হয়—কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রামের মসজেদের গম্বুজের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত উড়িতেছে, বসিতেছে, ভূমিতে নামিয়া শস্যকণার সন্ধান করিতেছে।

টেলেলকবির পর্য্যন্ত জমী এইরূপ। নব্য মিশরের ইতিহাসে এই টেলেলকবির প্রসিদ্ধ। তাহার পর সমতল ক্ষেত্র; সহসা বঙ্গদেশের প্রান্তর বলিয়া ভ্রম হয়। এই বিশাল প্রান্তর যেন এক অবিচ্ছিন্ন কার্পাসক্ষেত্র। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আমাদের দেশে যেমন, মিশরেও তেমনই কৃষকের ক্ষেত্রের আয়তন বৃহৎ নহে—বড় বড় ক্ষেত্র প্রায়ই নাই। কিন্তু দূর হইতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবধান লক্ষিত হয় না; মনে হয় যেন একখানি ক্ষেত্র। আমি যখন কায়রোর পথে গিয়াছিলাম, তখন তুলা হইবার সময়। সমগ্র প্রান্তর যেন একখানি সবুজ গালিচা—তাহাতে নীল ও শ্বেত পুষ্প—নীল পুষ্পই বটে, শ্বেত তুলা—খোলা ফাটিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে শ্বেত তুলা দেখা যাইতেছে। দেখিয়া শব্দশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উড়িষ্যা-বর্ণনা মনে পড়িল—'চারি দিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী।' এই তুলার চাষেই আজ মিশরের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি। মিশরে নানাজাতীয় তুলা জন্মে—আব্বাসী,

আসমানী, মেটাফিফি প্রভৃতি। মিশরের তুলা লম্বা-আঁকড়া, তাহাতে সহজে সরু সূতা প্রস্তুত হয়। সেই জন্য বিলাতের কাপড়ের কলে তাহার বড় আদর। মার্কিণে ও মিশরে লম্বা-আঁকড়া তুলা ভাল জন্মে। মার্কিণের তুলা পূর্ব্বে অধিকাংশই—মোটামুটি হিসাবে তিন ভাগের দুই ভাগ—বিলাতে যাইত, সেই তুলা ল্যাঙ্কাসায়ারের কলে ব্যবহৃত হইত। এখন মার্কিণ আপনার কৃষিজ উপকরণে আপনি পণ্য প্রস্তুত করিতেছে—এখন তিন ভাগের দুই ভাগ তুলা মার্কিণের কলেই ব্যবহৃত হয়; এক ভাগ মাত্র বিলাতে যায়। সেই জন্য মিশরের তুলার আদর বিলাতে দিন দিন বাড়িতেছে; কারণ, এখন মিশরের তুলা না পাইলে বিলাতের কাপড়ের কল অচল হয়। ভারতবর্ষেও লম্বা-আঁকড়া তুলার চাষ বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু মার্কিণে যাহা হইয়াছে, মিশরে ও ভারতেও কি তাহাই হইবে না? ইহারা কি চিরকালই বিদেশের কলে কারখানায় পণ্যের উপকরণ যোগাইয়া কৃষির অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে? মিশরের কৃষকদিগের (ফেলাহীন) অবস্থা আমাদের দেশের কৃষকের অবস্থারই মত শোচনীয় ছিল। তাহার উপর আবার শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী। বিশেষ, খদিব ইস্‌মাইল ঋণগ্রস্ত হইয়া যখন বিদেশী মহাজনদিগের করতলগত হয়েন, তখন তাহাদের দুরবস্থার আর সীমা ছিল না। সেই সময় মিশরে কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। সে ব্যাঙ্কে কৃষকেরা যে বিশেষ লাভবান হইয়াছিল, তাহা নহে; লাভ অধিক হইয়াছিল ব্যাঙ্কারদিগের—কৃষকরা কেবল কিছু অল্প সুদে টাকা ধার পাইত; কিন্তু সে টাকা আদায়ের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাও ভয়ানক—রাজস্বের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের টাকা কাটিয়া লওয়া হইত,খাজনা বাকি থাকিত। ইহাতে কৃষকেরা বিরক্ত হইত। ক্রমে যখন তাহাদের চক্ষু ফুটিল, এবং তাহারা বুঝিল, তাহারা খতে লিখিয়া দিয়াছে বটে যে, ব্যাঙ্কের টাকা রাজস্বের সঙ্গে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহারা খাজনা বলিয়া টাকা দিলে ব্যাঙ্ক তাহা আপনাদের পাওনার হিসাবে কাটিয়া লইতে পারে না—তখন তাহারা বাকি খাজনার নালিশে 'ওয়াশীল ছাঁট' হইয়াছে বলিয়া জবাব দিতে লাগিল। লর্ড ক্রোমার ব্যাঙ্কারদিগের সহায় ছিলেন। তাঁহার পর লর্ড কিচনার কর্ত্তা হইয়া গেলেন; তিনি এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া ব্যবস্থা করিলেন—খাজনার সঙ্গে ব্যাঙ্কের পাওনার কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। আমাদের বঙ্গদেশে যেমন প্রজার হালের গরু বিক্রয় করা যায় না—তিনি তেমনই নিয়ম করিলেন, দেনার

দায়ে প্রজার খানিকটা জমী (৫ ফাদান) বিক্রীত হইবে না। তাহাতে ব্যাঙ্কের খুচরা কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এখন ব্যাঙ্ক বড় বড় জমীদারদিগকে টাকা ধার দিতেছেন। নূতন নিয়মে কৃষকের কতটা সুবিধা বা অসুবিধা হইয়াছে, তাহার আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে করিব না। কিন্তু মিশরের পল্লীগ্রাম দেখিলে কৃষকের অবস্থা ভাল বলিয়াই বোধ হয়। পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন গৃহ—গ্রামে গ্রামে মসজেদের গম্বুজ ও মিনার, গ্রামবাসীদিগের বেশও প্রাচুর্য্যের পরিচায়ক। তবে এই স্থানেই বলিয়া রাখা ভাল, মিশরের বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝিলে অনেক সময়ই ভুল করিতে হয়। মিশরের লোক বেশভূষার আড়ম্বর ভালবাসে—ঘরে অন্ন থাকুক আর না থাকুক, মূল্যবান ও সুদৃশ্য বেশে সজ্জিত না হইয়া ঘরের বাহির হয় না। আবার তাহাদের বাড়ীর বাহির দেখিলে ভিতর বুঝা যায় না। পোর্ট সইদে যেমন, কায়রোতেও তেমনই অনেক মিশরীর গৃহের অতি সাধারণ ও দীন বহির্ভাগ দেখিয়া ভিতরের শিল্প-সমৃদ্ধির ও সাজসজ্জার সৌন্দর্য্যের কল্পনাও করা যায় না। ইহা কুশাসনের ফল, কি কুসংস্কারের পরিচায়ক, তাহার অনুসন্ধান করিবার অবসর আমি পাই নাই। যে দেশে শাসক যথেচ্ছাচারী, তথায় প্রজা আপনার ঐশ্বর্য্য গোপন করিবার চেষ্টা করে; কোনও কোনও জাতি বিনয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবশেও আড়ম্বর গোপন করে। তবে প্রাচীর প্যারিস কায়রোয় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকারও অভাব নাই।

সে যাহা হউক, আমরা যতই কায়রোর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মিশরের মেঘলেশহীন—রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলাম্বর সুন্দর; দিগন্তবিস্তৃত—বিকশিত-কুসুম-খচিত—উদ্ভিদাবরণমধ্যবর্ত্তী তূলায় শোভাময়—হরিত তূলার ক্ষেত্র সুন্দর; চক্রাকারে উড্ডীয়মান পারাবতসঙ্কুল গ্রাম্য মসজেদের গম্বুজ ও মিনার সুন্দর; তূলার ক্ষেত্রে কার্য্যতৎপর পুরুষদিগের পার্শ্ববর্ত্তী বিচিত্রবর্ণ বেশসজ্জিত বালক বালিকারা সুন্দর; তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গী মিশর-নারীর স্বাস্থ্যলাবণ্যময় দেহের পরিপূর্ণ কমনীয়তা সুন্দর; মিশরের প্রান্তরে রোমন্থরত পুষ্টদেহ গাভীর অলস ভাব সুন্দর। সেই সৌন্দর্য্যবাহুল্য আমার মনে সৌন্দর্য্যের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি ভাষায় তাহা ফুটাইয়া তুলিব কেমন করিয়া?

ক্রমে দূর হইতে অদূরে কায়রোর সৌধচূড়া—মসজেদের মিনার প্রভৃতি মকাটম পর্ব্বতের পার্শ্বে—নীলাম্বরের কোলে ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর ট্রেণ

কায়রোর বৃহৎ ষ্টেশনে যাইয়া স্থির হইল। কুলীরা জিনিস তুলিয়া লইল— দর করিবার হাঙ্গামা বড় নাই। কেন না, কুলীরা যাহা পায়, সে সবই এক স্থানে জমা দিতে হয়; যে টাকা জমা হয়, তাহা সব কুলীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা এক প্রকার socialism.।

ষ্টেশনেই হোটেলের গাড়ী, যাত্রী ও মাল লইবার জন্য উপস্থিত থাকে। আরও নানারূপ যান—কোনটির অশ্বই আমাদের দেশের ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত অস্থিচর্ম্মাবশেষ নহে। ধনবানদিগের যানের বাহনের ত কথাই নাই। মিশরের ধনীরা বহুমূল্য হাঙ্গেরিয়ান অশ্ব ভালবাসেন—আরবী অশ্বেও তাঁহাদের মন উঠে না। হাঙ্গেরিয়ান ও আরবী, উভয়-জাতীয় অশ্বই দ্রুত-গামী, দেখিতে সুন্দর।

ষ্টেশনের বাহিরে গেলেই সহরের শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। বিস্তৃত রাজপথ—উভয় পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা মধ্যে মধ্যে উদ্যান ও বিখ্যাত ব্যক্তি-দিগের মূর্ত্তি। রাজপথ পরিচ্ছন্ন। মিশরের রাজপথে দুইটি বিরক্তিকর ব্যাপারের অভাব—কুকুর নাই, ভিখারী নাই। কুকুর মারিয়া ফেলা হইয়াছে; এখন কাজের অভাব নাই—কাজেই ভিখারীর অভাব। পূর্ব্বে সহরের মধ্য দিয়া একটি খাল প্রবাহিত হইত, তাহাতে সহরের আবর্জ্জনা বাহিত হইত. কাজেই তাহার জল সর্ব্বদাই সমল থাকিত। এখন তাহা বুজাইয়া ফেলিয়া বিস্তৃত রাজপথ রচিত হইয়াছে। সেই পথে ট্রাম চলিতেছে। গাড়ীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই গাড়ীর তুলনায় কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ট্রাম গাড়ী দীন বলিয়া বোধ হয়। এই বৈদ্যুতিক ট্রামের একটি শাখা কায়রো হইতে নগরোপকণ্ঠে উদ্যান-নগর হেলিপলিজের দিকে গিয়াছে; আর একটি শাখা নীল নদীর উপরিস্থিত সেতু পার হইয়া পীরামিডের কাছে গিয়াছে।

বড় বড় রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় দোকান—নানাপ্রকার পণ্যে পূর্ণ। এই সব দোকানের মধ্যে কয়খানি ভারতবাসীর। অধিকারীরা প্রায় সকলেই হায়দ্রাবাদ সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী; আফ্রিকার নানা স্থানে বাণিজ্য করেন। এই দূরদেশে ভারতীয় বণিকদিগকে দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহারাও ভারতবাসীকে পাইলে অতিথিসৎকারের সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহেন না। কায়রোয় পঞ্জাবী দর্জ্জিও আছে। আর, মধ্যে মধ্যে রাস্তার ধারে পানগৃহ বা কফিখানা। রাস্তার উপর চেয়ারে বসিয়া লোক গল্পগুজব করিতেছে—কফি ও অন্যান্য

পানীয় পান করিতেছে - কুল্পী বরফ সেবন করিতেছে—আর ধূমপান করিতেছে। মিশরে কফি ও চুরুট উভয়েরই বিশেষ চলন—উভয় দ্রব্যই সুঘ্রাণ ও জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। রাস্তায় স্থানে স্থানে ফুলের দোকান; আর সর্ব্বত্র দৃশ্য এবং শ্লীল অশ্লীল নানারূপ ফটোগ্রাফের—প্রবাল, আম্বার প্রভৃতির মাল্যের —মিনাকরা অলঙ্কার প্রভৃতির ফিরিওয়ালা। আর হোটেলগুলির সম্মুখে 'পাণ্ডা'র অর্থাৎ 'প্রদর্শকে'র প্রাচুর্য্য। ইহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সব দ্রষ্টব্য স্থানের ইতিহাস বিবৃত করে; সর্ব্বত্র আরম্ভ করে—The history of this place is—অর্থাৎ, 'এই স্থানের ইতিহাস এইরূপ'—ইহা তাহাদিগের 'বাঁধা গৎ'।

রাজপথে অশ্বযান ও মোটরই অধিক। মধ্যে মধ্যে দুই একটি উষ্ট্র দেখা যায়—গর্দ্দভ-পৃষ্ঠারোহীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। পথে নানা-জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ। আমি যখন কায়রোয় গিয়াছিলাম, তখন সামরিক প্রয়োজনে তথায় বহু ইংরাজ সৈনিক ছিল। তাহারা সকলেই খাকী-উর্দ্দী-পরিহিত। তদ্ভিন্ন গ্রীক, ফরাসী, তুর্ক, ইহুদী ও মিশরী বাসিন্দার সংখ্যাই অনেক। মধ্যে মধ্যে সুদানী ও কাফ্রিও যে দেখা যায় না, এমন নহে। সুদানীদিগকে দেখিলেই চেনা যায়—তাহাদের গণ্ডে অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন—সুদানে শিশু জন্মগ্রহণ করিলেই তাহার দুই গণ্ডে তরবারি দিয়া তিনটি করিয়া রেখা কাটিয়া দেওয়া হয়। গ্রীকরা এ দেশে বড় ব্যবসায়ী—ফরাসীরাও কিছুদিন হইতে আসিয়াছে। ইহুদী সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী—তুর্করা শাসক-সম্প্রদায়-ভুক্ত; কেন না, মিশর তুর্কী-সাম্রাজ্যের অংশ ছিল—খদিব তুর্কীর সুলতানের অধীন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদালত—ভিন্ন ভিন্ন বিচার-পদ্ধতি! দেশের বিচার-পদ্ধতি একরূপ না হইলে যে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুদানীদিগের বর্ণ মলিন—কাফ্রিরা কৃষ্ণকায়। নহিলে কায়রোয় আর সকলেই গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গী। মিশরী পুরুষের বর্ণ কতকটা হস্তিদন্তের বর্ণের মত। মিশরী স্ত্রীলোকের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বোরকায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত না করিয়া পথে বাহির হয় না। কপালের উপর হইতে নাসিকার নিম্ন পর্য্যন্ত অনাবৃত। বিবাহিতা রমণীদিগের নাসিকার উপর এক খণ্ড হরিদ্রাবর্ণ গোলাকার কাষ্ঠ—তাহার মধ্যস্থ ছিদ্রপথচালিত সূত্রে অবগুণ্ঠন ও বোরকা বদ্ধ। কর চরণ অনাবৃত—কেহ কেহ পাদুকা ব্যবহার

করে। নয়ন কৃষ্ণতার—আঁখিপত্রে সুরমার রেখা টানা। গ্রীক রমণীর বর্ণ দুগ্ধফেনশ্বেত। ফরাসী নারীর শ্বেত বর্ণে একটু স্বর্ণাভা লক্ষিত হয়। তুর্ক রমণীর বর্ণে দুগ্ধফেনশ্বেতের মধ্য দিয়া অলক্তকের রক্তাভার আভাস দেখা যায়—তাহারাও বোরকায় অঙ্গ আবৃত করে, তবে চিবুকের নিম্নে কৃষ্ণ বসনের পরিবর্ত্তে কোমল শ্বেত নেটের অবগুণ্ঠন। ইহুদী পুরুষের রূপের ও ইহুদী রমণীর রেশমী সজ্জায় বর্ণের বৈচিত্র্য—ইহুদী রমণীর গোলাপী গণ্ডে রক্তাভা যেন ফুটিয়া থাকে। মিশরী, তুর্কী, ইহুদী রমণী অলঙ্কারপ্রিয়—ধনীর অলঙ্কার স্বর্ণের, মুক্তার, হীরক-খচিত; দরিদ্র ঝুটা মুক্তার অলঙ্কার পরিধান করিয়াই সাধ মিটায়। এ দেশের মিশরী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিলাসী—সকলেরই বেশে বর্ণের বৈচিত্র্য—সকলেই সাজসজ্জায় বিশেষ মনোযোগী। মরুবাসী মিশরীদিগের বর্ণ রৌদ্রে একটু মলিন হয় বটে, কিন্তু তাহাদের বেশের বর্ণবৈচিত্র্য আরও অধিক। কায়রোয় নাট্যশালা—বায়স্কোপ চিত্রশালা অনেকগুলি। সে সকলে কখনও দর্শকের অভাব হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে সর্ব্ব-প্রধান রঙ্গালয়ে স্পেন, ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে বিখ্যাত বিখ্যাত নর্ত্তকী ও গায়িকা আনা হইত। খদিব সে রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কায়রোয় মিশরের অন্যান্য নগরের মত জুয়াখেলার আড্ডাও অনেক ছিল—জুয়াখেলা গোপনে হইত না, ধনীরা—এমন কি রাজকর্ম্মচারীরাও সেই সব আড্ডায় যাইয়া জুয়া খেলিতেন। নীল নদের কূলে উদ্যানমধ্যে অবস্থিত বৃহৎ জুয়াখেলার গৃহটি কায়রোর ধনিগণের সমাগমস্থল ছিল। মিশরী নৃত্যের কথা অনেকে শুনিয়াছেন—তাহাতে অশ্লীলতার অংশ অল্প নহে। বিলাসী মিশরী ধনীরা সে নৃত্যের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহাদের গৃহে মধ্যে মধ্যে সে নৃত্য হয়। কিন্তু প্রতীচ্যবাসীদিগের নিন্দার ফলে প্রকাশ্য রঙ্গালয়াদিতে তাহার অনুষ্ঠান আর হয় না। প্রাচীর ও প্রতীচীর অশ্লীলতার আদর্শও ভিন্ন। তবে যাহা অশ্লীল, তাহা প্রাচীরই হউক—আর প্রতীচীরই হউক, সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। যে আমোদ বিশুদ্ধ নহে—যাহাতে মানুষের মনে কুভাব উদ্রিক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা জাতীয় জীবন হইতে নির্ব্বাসনই সমীচীন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি।

ফরাসী রণাঙ্গনের কথা।

ট্রেঞ্চে যুদ্ধ।

পূর্ব্বে লড়াই হইত দুর্গে, পাহাড়ে ও সুরক্ষিত সহরে। এখন তাহা উল্টাইয়া গিয়াছে; দুর্গ ও সহর সামনে রাখিয়া আর যুদ্ধ হয় না, সেনানী-গণের মাথায় শত্রুর এই উঁচু উঁচু ঢিপিগুলি অনবরত দুঃস্বপ্নের মত ভোঁ-ভোঁ করে না। মানচিত্র দেখিতে দেখিতে ছোট ছোট মঠের মত, তারার মত চিহ্নগুলি অনেক সময় উপেক্ষা করিয়াই যাওয়া হয়। আজ যুদ্ধ-বিজ্ঞানের সার কথা—ট্রেঞ্চ বা খাত। এই সরু সরু আঁকা বাঁকা অনন্তবিস্তৃত সাদা রেখাগুলিকে মনে বেশ করিয়া না দাগিয়া কাহারও একটী পা নড়াচড়া, এমন কি, একটী ছোট চিন্তা পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয় না। দুর্গ যতই সুদৃঢ় হউক না, তাহা ধূলিসাৎ করিতে দুই তিন দিনের বেশী লাগে না। সহর দূরের কথা, পর্ব্বতও আজিকার কামানের সামনে আর্ত্তকে রক্ষা কবিতে পারে না; তাই আজ সকলে উঁচু উঁচু দুর্গ বা পাহাড় ছাড়িয়া নীচু মাটীর ভিতর খাতে মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। গোলা সোজাসুজি লাগিলে বড় ক্ষতি করে; কারণ, ওরূপে আসিলে গোলা দুর্গের ভিতর অনেকটা আসিয়া তবে ফাটে; কিন্তু উহা যদি উচ্চে উঠিয়া তার পরে মাটীতে পড়ে, তাহা হইলে ততটা ক্ষতি করে না; মাটীর উপর বিস্তৃত ও উচ্চ কোনও কিছু সহজে আঘাত করা যায়, কিন্তু মাটীর নীচে অল্প-বিস্তৃত যে খাত, তাহা আঘাত করা বড় কঠিন; কাজেই আজকালকার যুদ্ধক্ষেত্র ক্রোশের পর ক্রোশ খাতে পূর্ণ। বর্ত্তমানে এ প্রকারের ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ জার্ম্মাণেরা প্রথম আরম্ভ করে। মার্ণের যুদ্ধে ফরাসী-আক্রমণে জার্ম্মাণেরা ক্রমে ক্রমে পিছু হটিতে লাগিল; জার্ম্মাণ বাহিনী খাত কাটিয়া তাহাতে আশ্রয় লইবার পর ফরাসীরা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। যুদ্ধে খাত কাটিয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়,জার্ম্মাণের Military literarutete এ কথা লেখা ছিল; কিন্তু ইহা যে সত্য, জার্ম্মাণেরা মার্ণের যুদ্ধে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইল, এবং আপনাদের বুদ্ধি ও বিজ্ঞানবলে খাত নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল। বালুর বস্তা, পাথর ইত্যাদির তাগাড় গাঁথিয়া ও কাঁটাওলা তার দিয়া খাত রক্ষা করা হয়। ট্রেঞ্চ-আক্রমণের পূর্ব্বে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া, তাগাড় প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত, শত্রুর খাতের

উপর গোলা ছুড়িয়া পদাতি সৈন্যের অগ্রসর হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যে স্থান আক্রমণ করিলে বিশেষ কোনও সুবিধা হইতে পারে, গোলন্দাজ সৈন্য সেরূপ জায়গায় গোলাগুলি ছুড়িয়া থাকে। এই পথ দিয়া পদাতি সৈন্য কাতারে কাতারে আগাইতে থাকে। এ রকম করিয়া অগ্রসর হইবার সময় জার্ম্মাণেরা ফরাসী অপেক্ষা এক সঙ্গে বেশী লোক পাঠায়। শত্রুর খাত দখল করিবার জন্য আক্রমণের প্রথমাবস্থায় যে সকল সৈন্য আগাইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের কাছে Grenadeএ পূর্ণ দুটী থলি থাকে। Grenade ঢালাই করা লোহার গোলা,—ইহার ভিতরে Picric acid-সম্ভূত বারুদ (milinite); একবার ইহা ফাটিলে ইহার হাজার হাজার টুকরা চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; ইহার একটী কণা এক জন মানুষকে মারিবার পক্ষে যথেষ্ট। দেহে প্রবেশ করিলে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। ইহা যে এত মারাত্মক, তাহার কারণ, ইহা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে কোনও দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং দেহের যে অংশ স্পর্শ করিয়া যায়, মনে হয়, যেন সে অংশ কে করাত দিয়া কাটিয়া দিল।

ট্রেঞ্চ আক্রমণ করিবার প্রথমাবস্থায় যে সব সৈন্য আগাইয়া থাকে, তাহারা খাতে ছুড়িবার জন্য এই প্রকার সাংঘাতিক শস্ত্র-বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় যে সব সৈন্য অগ্রসর হয়, তাহাদের সঙ্গে থাকে 'তরল অগ্নি'—Liquid Fire। এ অগ্নি অন্য কিছু নয়,—ইহা এক প্রকার তরল দহনশীল গ্যাস,—দেখিতে বালতির মত পাত্রের ভিতর চাপ দিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা পিঠে ঝুলান থাকে, এবং গ্যাস ছুড়িবার জন্য একটী পম্প (Pump) ও গ্যাস বাহির হইবার জন্য একটী নল ইহাতে সংলগ্ন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে একবার পম্প করিতে পারিলে এ অগ্নি ৩০ হইতে ৫০ গজ পর্য্যন্ত দূরে যায়, এবং সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই পোড়াইয়া দেয়। তার পর তৃতীয় অবস্থায় আর এক শ্রেণীর লোক অগ্রসর হইতে থাকে—ইহারা সঙ্গে লয় কোদাল, কুড়ুল,Mine করিবার ও খুঁড়িবার অন্যান্য যন্ত্র সকল। প্রথম দুই তরঙ্গে যে সব সৈন্য অগ্রসর হয়, তাহারা খাত অধিকার করে, এবং তৃতীয় অবস্থায় যাহারা যায়, তাহারা বালুর বস্তা, পাথর প্রভৃতির তাগাড় তৈয়ারী করিয়া শত্রুর পুনরাক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় করিয়া দেয়। এই তিন শ্রেণীর লোক সাধারণ সৈন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া শত্রুর নৈতিক বল (moral) ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাদের Section of the Shock বলা হয়। ভাল ভাল খেলোয়াড় ও কর্ম্ম-

পটু লোকদের মধ্য হইতে এ সব সৈন্য বাছাই করিয়া লওয়া হয়; ইহাদের খুব চটপটে হওয়া দরকার; কারণ, অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুর খাত দখল করিতে হইবে। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ বেশ ভাল, এবং ইহারা থাকেও রাজার হালে। খাত অধিকার করা ভিন্ন ইহাদিগকে অন্য কোনরূপ যুদ্ধে নিয়োজিত করা হয় না। আক্রমণের পনের দিন পূর্ব্ব হইতে ইহারা সময়োপযোগী নকল যুদ্ধক্ষেত্র করিয়া Rehearsal দেয়। আক্রমণের জন্য যে সব সৈন্য ইহাদের অনুগমন করে, তাহাদের Companies of attack বলা হয়। ইহারা দল বাঁধিয়া ছুটিয়া চলে। প্রথম দল যখন অগ্রসর হয়, দ্বিতীয় তখন পশ্চাতে রহে। কিছু দূর আগাইয়া প্রথম দল মাটীতে শুইয়া শত্রুর উপর গুলি ছুড়িতে থাকে, এবং সেই সুযোগে দ্বিতীয় দল ইহাদিগকে ছাড়াইয়া আরও আগাইয়া যায়। এইরূপে সৈন্যেরা দলের পর দলে শত্রুর খাতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে সময়ে এ সব ঘটিতে থাকে, সে সময় গোলন্দাজ সৈন্যরা নীরব থাকে না; শত্রুর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় লাইনে গোলা গুলি বর্ষণ করে। ইহার উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত শত্রু-সৈন্য নিজেদের প্রথম লাইন পুনরায় অধিকার করিতে কোনরূপে যাহাতে সাহায্য করিতে না পারে। শত্রুর ব্যাটারীও আমাদের আর্টিলারী ধ্বংস করিবার জন্য অগ্নিবৃষ্টি করিতে থাকে। এরূপ যুদ্ধে যদি শত্রুর বেশী সংখ্যক ব্যাটারী খোঁজ করিয়া বাহির করা যায়, এবং শত্রু যদি আমাদের অল্পসংখ্যক ব্যাটারী দেখিতে পায়, আর আমাদের যদি বেশী কামান থাকে, তবেই বিশেষ সুবিধা হইয়া যায়। এই রকমে ট্রেঞ্চ যুদ্ধ চলিয়া থাকে। এ যুদ্ধে উড়ো জাহাজ খুব ব্যবহৃত হয়; তবে দূর হইতে কামান দাগিয়া ট্রেঞ্চ ধ্বংস করা যেমন শক্ত, আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া খাতে আঘাত করাও ঠিক সেই রকম কঠিন কাজ। খাতের প্রস্থ অল্প, তাহার উপর ইহা মাটীর নীচে; তাহা ছাড়া আবার Laws of Dispersion আছে। এই সকল কারণে নিক্ষিপ্ত বোমা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। *

সৈন্যদের আরামের জন্য কোনও কোনও জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চ বেশ সুন্দরভাবে

* হাজার গজ উচ্চ হইতে শতকরা যদি একটী বোমা খাতে পড়ে, তাহাতে আঁকা বাঁকা ট্রেঞ্চে হতাহতের সংখ্যা অল্প হইয়া থাকে। পদাতি সৈন্য আক্রমণে বাহির হইলে দুই এক শত গজ উঁচু হইতে অনায়াসে ইহাদের ধ্বংস করা যায়। কিন্তু ছুটিতে ছুটিতে একবার শুইয়া পড়িতে পারিলে হতাহতের সংখ্যা পূর্ব্বের অর্দ্ধেক হইয়া পড়ে।

পরিপাটী করিয়া সজ্জিত; তাহার মধ্যে শুইবার ঘর আছে, শৌচাগার, রান্না-ঘর, এবং সুখে জীবনযাপন করিবার জন্য অন্যান্য নানা উপকরণ আছে। ধীরে ধীরে এগুলি সব মিত্রপক্ষের (Allies) হস্তগত হইতেছে।

সোমবার, ২রা জুলাই, ১৯১৭।—অদ্য বেলা ৫-২০ মি. সময়ে আমরা ৬ষ্ঠ Heavy Artillery সেনাদলের এম্ ব্যাটারীতে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মধ্যাহ্নভোজন,—সিদ্ধ মাংস, আলুর চপ ও কফি এদিনকার খাদ্য। সৈনিকগণ আমাদের পাঁচ জনের জন্য একটী খাত খালি করিয়া দিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ গজ, প্রস্থে ২ গজ, এবং উচ্চতায় ২ গজ ৯ ইঞ্চি। ছাদটি কন্‌ক্রিট করা,—'কড়িকাঠ' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তক্তা, সিমেন্ট করা পাথরের থলি ও মাটী দিয়া আচ্ছাদিত; এই সমস্তের উপর একখানা ঘন ইস্পাতের পাত; ইহাও আবার গাছের সবুজ ডাল পালার আড়ালে প্রচ্ছন্ন। আমাদের সম্মুখে ২০ গজ দূরে গোলাগুলি পাহাড়ের শ্বেত প্রস্তররাজি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া তুলিতেছে। আমরা দ্রুতগমনে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাথার উপর একখানি ব্যোমযানের আবির্ভাব!—ব্যাটারীর বন্ধুগণ বলিলেন—উহা একখানি জার্ম্মাণ উড়োকল; থামিয়া থামিয়া উহা একটা বিশিষ্ট রকমের গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছিল।

আমাদের নূতন ছোট ভূগর্ভস্থ কুঠুরীখানির তক্তায় দেওয়ালগুলির একটীর মধ্যে একটী ছোট চিম্‌নী বসান। আমাদের শয্যা দুটী দুটী, একটী অপরটীর উপর,—এক দিকে দেওয়াল ও অন্য দিকে দুইটী খুঁটীর উপর সংস্থাপিত; তারের জাল দিয়া নির্ম্মিত দেবদারু কাঠের খাট—তাহার খোলা দিকটাতে এক ফুট উচ্চ একখানি কাঠের আবরণ—নিদ্রাকালে জানালার ভিতর দিয়া পাছে কোনও ছট্‌কা লোহার টুকরা আমাদের লাগে—এই জন্য এই ব্যবস্থা। শয্যার উপরে ও চারি দিকে ছোট খাট জিনিসপত্র ও বন্দুক রাখিবার জন্য সেলফ্ বা তাক্,—মোটের উপর সমস্তটা দেখিতে একটী বৃহৎ পায়রার খোপের মত। চারিটী খুঁটীর উপর একখানা তক্তা পাতিয়া একটী বেঞ্চ, আর ঐরূপেই আর একখানি টেবিল প্রস্তুত হইয়াছিল। টেবিল ও বেঞ্চ লইয়া দুইটী জিনিস হইল; দেওয়ালে চিম্‌নীর উপরে সকল রকমের কার্ড, ফটো, আমাদের পূর্ব্বতন সেনাদলের দৃশ্যচিত্র প্রভৃতি ঝুলান; পূর্ব্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, তাহারা তাহাদের প্রিয় গৃহ ও পরিচিত স্থানগুলির চিত্রপটসমূহ ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে,—এ সব দেখিয়া কত দিন তাহারা নয়ন তৃপ্ত করিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল দেখিবার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া দিবানিশি

কাটাইয়াছে। মাটীতে দুইটী গড়ান গর্ত্ত করিয়া গবাক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং একখানি কাঠের সিঁড়ী দিয়া ঘুরিয়া আমাদের ঘরে নামিবার পথ। আজ খড় পাওয়া গেল না; কাজেই সেই জালের বিছানায় কোট জামাগুলি বিছাইয়া আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৩রা জুলাই।—আমাদের ব্যাটারীর কামানের গর্জ্জন আমাদের জাগাইয়া দিল। তখন ভোর পাঁচটা। রান্নাঘরে গেলাম—তাহা আমাদের খাতটীর মত আর একটী খাত। সেখানে কফি, রুটী ও রম আমাদের দেওয়া হইল। মধ্যরাত্রে আমাদের গর্ত্তে কয়েক আঁটী খড় ফেলিয়া দেওয়ায় সকালে উহা তাঁবুর কাপড়ের ভিতর ভরিয়া, দুই পাশ মুড়িয়া বোতাম দিয়া একটী বিছানা করিয়া লইলাম। দৈর্ঘ্যে উহা আমাদের দেহের পক্ষে অতি খাটো হইল। তাই আমরা খালি জামা কাপড় পাতিয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়া লইলাম। এক গজ লম্বা একখানা কম্বল আমাদিগকে দেওয়া হইল। এইটী ও আমাদের ওভার-কোট শীতনিবারণের পক্ষে যথেষ্ট। সকালে ১১টার সময় আমরা শিককাবাব, আলু, জ্যাম ও মদ্য, এবং ৫ টার সময় ঝোল সিদ্ধ মাংস, সার্ডিন ও কফি পাইলাম। লৌহ-শিরস্ত্রাণ ও মুখস না লইয়া কোথাও বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। আজ হইতে পাজামা ও কোট ছাড়িয়া আমরা নাবিকগণের মত নীল ঝল্‌ঝলে পাজামা পরিধান করিতে লাগিলাম।

৭ই জুলাই।—সচরাচর যেরূপ হয়, ঠিক সেই রকমেই আজ প্রাতে ব্যূহের পশ্চাতে জার্ম্মাণ সৈন্যশিবিরে গোলা গুলি বর্ষিত হইল। আজ আমাদের বিশ্রামের সময়। কাজেই নিকটে সেণ্ট জুলিয়ান গ্রামে গিয়াছিলাম। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও লোক নাই,—আছে কেবল গির্জ্জাটী।—এক একটী বাড়ী এক এক জন সৈনিকের অধীন। তিনি সেখানে প্রভু। স্নিগ্ধ উদ্যান ও শ্যামল প্রান্তর পরিত্যক্ত। একটা উৎসের নিকট জার্ম্মাণ গোলায় (Shell) দুটী গহ্বর করিয়াছে—রন্ধ্রদ্বয় প্রকাণ্ড ও আশ্চর্য্য রকমের,—এক একটীর ব্যাস ৯ গজ, এবং গভীরতা ২ গজ।

৮ই জুলাই।—আজ কাল সকালে ৭টা হইতে ১১টা, এবং বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া থাকি। কাজের মধ্যে করিতে হয়,—নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করিবার জন্য, বপ্রাদি-নির্ম্মাণ, মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ-খনন, এবং ব্যাটারীর জীর্ণাংশের সংস্কার। দুই রাত্রির পাহারা, ছয় দিনের কাজ ও এক দিনের ছুটী আমাদের সপ্তাহ সমাপ্ত হয়। কামান লইয়া কাজ করিতে হইলে দিনেরও শেষ নাই, রাত্রিরও শেষ নাই।

গত কল্য আমরা পদাতি সৈন্য-শ্রেণীতে ছিলাম। একটী সীমান্তরাল-প্রসারিত পরিখার উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল—তাহার নিম্নদেশে বৃষ্টির জল—জলের উপর দেখিতে মইয়ের মত কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত; ইহা প্রস্থে ২৪ হইতে ৩৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। পরিখার উভয় পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণরাজি না থাকিলে সেতুর উপর দিয়া অগ্রসর হইবার সময় আমাদের স্কন্ধদেশ সাধারণে দেখিতে পাইত, এবং অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইত। আমরা নিঃশব্দে চলিলাম। যে স্থানে তটদেশ গোলায় ভগ্ন, সেখানে উপুড় হইয়া হাত ও পা উভয়ের সাহায্যে পার হইতে হইল। প্রাকার-সংলগ্ন টেলিফোনের তার লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইল—স্থানে স্থানে এক একটী চিরকুট লেখা,—তার উদ্দেশ্য, গন্তব্য স্থানের দিক-নির্দ্দেশ।

অন্যান্য স্থানের সহিত যোগাযোগের পথ,—এই পরিখা; ইহা পার হইয়া একে একে ৩য়, ২য় ও ১ম পরিখাও উত্তীর্ণ হইতে হইল। পরিখাসমূহ একটী আর একটী হইতে দুই তিন শত গজ দূরে। পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের পথ হইতেছে,—মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ, অথবা ভিন্ন একটী পরিখা। এই সকল খাত ৩০ কিংবা ৪০ গজ অন্তর ত্রিকোণাকার বা গোলাকার।—এরূপ করিবার সুবিধা এই যে, গোলা গুলির বিস্ফুরিত ভগ্নাংশ সৈন্যশ্রেণীকে একেবারে ঝাঁটাইয়া লইতে পারে না। এক ঘণ্টার মধ্যে এমন স্থানে আসা গেল যে, সেখান হইতে শত্রুব্যূহ ২০০ গজ মাত্র দূরে অবস্থিত। সম্মুখে কিছু দূরে দেখা গেল, শত্রুসৈন্য তাহাদের, তোয়ালে, টুপি ও বুট রোদে দিয়াছে। আমাদের তরফের শান্ত্রীর সেখানে দেখা পাওয়া গেল—সে উপন্যাস-পাঠে মগ্ন;—পদতলে দুইটী বন্দুক পড়িয়া আছে। তখন বেলা দুপুর। নিভৃতে থাকিয়া উচ্চ ভূভাগ দেখিবার জন্য বালুর বস্তার ভিতর কাঠের চোঙ ঢোকান ছিল। বাক্স রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছিদ্র করাও ছিল—ইহার বহির্ভাগ বেশ ভাল করিয়া আচ্ছাদিত—শত্রুব্যূহে লোভনীয় তেমন কিছু দেখা গেলে সুনিপুণ লক্ষ্যভেদকারী যোদ্ধৃগণ এগুলির সদ্ব্যবহার করেন। পরিখার দেওয়ালের বরাবর তাক ও মাঝে মাঝে গর্ত্ত—দুই মুখওয়ালা দোয়াত কিংবা বড় ডিমের মত দেখিতে বোমায় এ সব পূর্ণ; বোমাগুলি সকল সময়ে সকলের কাজে লাগিয়া থাকে। খাতের গায়ে গর্ত্ত ও সুড়ঙ্গ খোদা আছে—লুকাইবার নিভৃত সুড়ঙ্গ এক একটী ৭ গজ পর্য্যন্ত গভীর; ভীষণ আক্রমণের সময় এগুলি আশ্রয়ের নিরাপদ স্থান। পরিখার বিস্ফোরণ-যন্ত্রের (Torpedo) নিক্ষেপের জন্য ছোট ছোট কামান চারি দিকে লক্ষ্য করিতেছে। এ সব ছোট কামানকে সাধারণতঃ ফ্রগ (Frog) বলা হয়।

প্রত্যেক জায়গায় Torpedo যন্ত্র প্রচুর—ইহার শরীরে চারিটী পাখা লাগান—পাখাগুলি কিছু মোচড়ান, যাহাতে আকাশে উড়িবার সময় গন্তব্য দিক ঠিক থাকে। ইহার পিছনের দিক সম্মুখ দিয়া কামানে দেওয়া হয়, এবং ক্যাপ (Cap) দিয়া আগুন ধরাইয়া টিপকলের সাহায্যে কামানটী ছোড়া হয়। আর ছিল, বড় বড় রিভলবার; আক্রমণের সময় চিঠি পাঠাইবার গোলা (Messenger Shell) এবং সঙ্কেতের জন্য দাহ্যপদার্থপূর্ণ নানা রঙ্গের fuse; টেলিফোণের তার নষ্ট হইলে এই সব বিচিত্র পলিতা ব্যবহার করিতে হয়। Messenger Shellএর উপরিভাগ কিছু খোলা। ইহার মধ্যে চিঠি পূরিয়া প্যাঁচ ঘুরাইয়া বন্ধ করিতে হয়। এই গুলি ছুড়িবার জন্য যে সকল রিভলবার ছিল, সেগুলি যে স্থান হইতে General বা Colonel আদেশ পাঠান, যথাযথভাবে সেই দিকে লক্ষীভূত করা ছিল। সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল, শত্রু-সৈন্যের পুরোভাগে অনেক জায়গায় আত্মরক্ষার জন্য কাঁটাওয়ালা তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। তারের তলার দিকে ভার ঝুলান। শত্রুর তারের বেড়া বড় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দেওয়া ও বেশী শক্ত। কিন্তু আক্রমণের পূর্ব্বে গোলাবৃষ্টিতে তার-জড়ান খুঁটীগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে উড়িয়া যায়। কিন্তু আমাদের বেড়ার তার কাটিয়া গেলেও তলদেশে যে ভার ঝুলান থাকে, তাহা অক্ষত রহিয়া যায়; এই জন্য এই সব তার সময়ে কিছু না কিছু বাধা দিয়া থাকে,—ঠিক যেন বাঁশ-ঝাড়ের কঞ্চি—অনেক কাটিয়া ফেলিলেও কিছু রহিয়া গিয়াছে। আমাদের খাতের যে অংশ সব চেয়ে অধিক আগাইয়াছে, শত্রু তাহা হইতে ১৫ গজ মাত্র দূরে। প্রাচীরের বেশী উচ্চে আমরা অবলোকন করি না; কারণ, এক দিন বন্ধু মল্লিক এইরূপ দেখিতে গিয়া দেখিতে পায়—মাথার উপর একটী বোমা! তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সে যাত্রা সে রক্ষা পাইল,—যে মুহূর্ত্তে হিস্ শব্দ শোনা, সেই মুহূর্ত্তেই মাটীতে শুইয়া পড়া!

গহন কাননের কিছুই ছিল না—গাছের গোড়াগুলি ১ গজ প্রমাণ লম্বা,—শুকনো বাঁশঝাড়ের মত পড়িয়া আছে যেন যুধ্যমান সৈন্যের মধ্যে মস্তক-হীন প্রেত দাঁড়াইয়া আছে।

ফিরিবার সময় পথ ভুলিয়া যাওয়ায় আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। আমার বন্ধুরা ভুল করিয়া জর্ম্মণ সুড়ঙ্গ ধরিয়া কিছু দূর গিয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহারা জানিতেন না, ইহার কিয়দংশ আমরা এইমাত্র অধিকার করিয়াছি, এবং এখনও শূন্য পড়িয়া আছে। স্থানটী জনহীন,—এই নির্জ্জনতা তাঁহাদের

মনে সন্দেহ উপস্থিত করে; সময় থাকিতে পলাইয়া এই ফাঁদ হইতে তাঁহারা রক্ষা পান।

১০ই জুলাই।—Shrapnelএর ঘন ঘন শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; একটী উড়ো-কলের উপর হইতে এ সব ছোড়া হইতেছিল। আমাদের ব্যাটারীর অগ্নিবৃষ্টি বন্ধ করিবামাত্র আকাশে আর একটা কল উপস্থিত; দুইটীতে মিলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। কোমারসিতে (Comercy) সে দিন নিশ্চয় আমাদের পক্ষের সবে একটী উড়োকল ছিল; কারণ, জর্ম্মণ কল দুটী নির্ব্বিঘ্নেই কাজ সারিতেছিল। একটী কল পাহারায় নিযুক্ত; মাথার কয়েক শত গজ উপরে শান্ত্রীর মত সেটী এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ইঙ্গিতস্বরূপ আমাদের উড়োকল মাথার উপর দিয়া যাইবার সময় রণক্ষেত্রের চারি দিক হইতে প্রায় ১৫টী ব্যাটারী যুগপৎ শত্রুর উড়োকলের উপর গুলিবৃষ্টি করিল। ইহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, জর্ম্মণ কল নগরের ভিতর অনেক দূর গেলেও ইহা যেন জর্ম্মণ কলের কর্ণধারকে দেখিতেই পাইতেছে না। তার প্রতি হয় ত ঐরূপ আদেশ ছিল, কিংবা ওটা তার কাজ নয়। ব্যাটারীর লোকেরা জর্ম্মণ কলের বক্রদৃষ্টি সহ্য করিল না। তাহার অবস্থান ঠিক না থাকায় প্রত্যেকে প্রত্যেক দিক হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া তাহাকে আবৃত করিল—গোলা-গুলি যেন একেবারে তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। ছটকা লৌহচূর্ণ দ্বারা আকাশে আহত হওয়া উড়ো-জাহাজের কর্ণধারের পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের কথা। ৭৫ ও ৬৫ মিলিমিটার হাজার হাজার গোলা ও দুই তিন লক্ষ মেশিন-গনের গুলি (Machine Gun) ছোড়া সত্ত্বেও জর্ম্মণেরা তিন ঘণ্টা ধরিয়া উড়িয়া আপনাদের কাজ শেষ করিয়া লইল; কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের ব্যূহের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া তাহারা পুনরায় আর এক নূতন দিক দিয়া আসিয়া হাজির!

সন্ধ্যার সময় তাহারা আবার আসিলে, তাঁহাদিগকে গুলি করা হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; কাজেই আকাশে Trajectory ঠিক থাকে কি না দেখিবার জন্য Anti aviation gun হইতে এক প্রকারের ('Tracing' shell) ছোড়া হইল। বিভিন্ন উচ্চতায় আকাশের বাতাস বিভিন্ন রকমে সিক্ত থাকায়, সাদা Trajectory তরঙ্গবৎ সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাও দেখা গেল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের দুটী উড়োকল আসিয়া হাজির হইল, এবং খুব নিকটে আসিয়া জর্ম্মণ কলটীকে দুই দিক হইতে ঘিরিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

বঙ্গের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

আমাদের সমাজের এখন যেরূপ অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কথার আলোচনা প্রথাবহির্ভূত ব্যাপার বলিতে হইবে। সমাজে এখন আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উচ্চ আসন নাই, সম্মান বা সমাদর নাই। পদ ও অর্থই অধুনা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠী হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তাঁহারা এই দুই কাম্যবস্তু হইতেই বঞ্চিত, সুতরাং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথা হইতে আসিবে? যখন দেশে ধর্ম্মের আদর ছিল, তখন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা দরিদ্র হইলেও সমাজে প্রভূত সম্মান ও যথেষ্ট সমাদর পাইতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখন মাপকাঠী অন্যরূপ। এই দেশেরই কথা ছিল,

> 'এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
> শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।'

অর্থাৎ, ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু; কেন না, ইহা নিধনসময়েও সঙ্গে যায়। মানুষের অন্য ধন সম্পদ যাহা কিছু, তাহা শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এখন আর এ কথার বিশেষ সার্থকতা নাই। নিধনের পরে কি হইবে, সে বিষয়ে এখন আমরা অত্যন্ত অল্প চিন্তা করি; ইহলোকে কিসে সুখ সচ্ছন্দে কাটাইয়া যাইতে পারি, তাহাই আমাদের ভাবনা; আর এই ভাবনা দূর করিবার পক্ষে অর্থই প্রধান সহায়। সুতরাং অর্থচিন্তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অনেকের মতে হয় ত বর্ত্তমান সময়ে এক জন বিত্তবান্ বিনামা-ব্যবসায়ীর জীবনের উন্নতির কথা শুনিলে লাভ আছে, এবং ইহাতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় থাকিতে পারে, কিন্তু অর্থহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জীবনকথা আলোচ্য বা শ্রোতব্য নহে।

সমাজের সকলেই এই মতানুযায়ী হইলে, আমরা যাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহার বিষয়ে কিছুই বলা চলে না; কেন না, তিনি অর্থবান লোক ছিলেন না, এবং কি রূপে ধনসঞ্চয় করিতে হয়, তাহাও জানিতেন না।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা কিন্তু এই অর্থহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জীবনকে অতি শ্লাঘ্য, এমন কি, আদর্শ জীবন বলিয়া মনে করি, এবং সেই জন্যই এই দুঃসাহসে

প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি রূপে অর্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া শাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিয়া শান্তিময় দীর্ঘ জীবন যাপন করা যায়, আমরা যাঁহার কথা বলিতে চাহিতেছি, তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। এক সময়ের সংযমের দেশ, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের দিনে এমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবন-কথা শ্রুতিসুখকর না হইলেও, ইহাকে ঔষধস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। কটু কিংবা বিরস হইলেও উহা গ্রাহ্য।

আর বর্ত্তমানকালে আমাদের শিক্ষা যেরূপ পথে যাইতেছে, তাহাতে স্বদেশী ধার্ম্মিক লোকের জীবন-কথার আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হয়; কেন না, বিদ্যালয়ে ইহা শুনিবার কিংবা জানিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের দেশীয় অনেক প্রকৃত বড়লোক বা মহাপুরুষের কথা জানি না বলিয়া বিদেশী রাজপুরুষগণও সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গের বর্ত্তমান গবর্ণর বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় বলিয়াছিলেন যে, ইহা আশ্চর্য্য বিষয় বলিয়া মনে হয় যে, মহাত্মা শঙ্করের নাম না জানিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিষয়ক সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়!

শিক্ষার বিড়ম্বনা ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? আধুনিক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয় জন বঙ্গদেশের গত শতাব্দীর দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সকলের নাম জানেন? জীবনবৃত্তান্ত ত পরের কথা!

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্রাহ্মণত্ব নাই। তাঁহারা সকলেই অধঃপতিত, ভ্রষ্টচরিত্র, এবং লোভপরায়ণ, সুতরাং তাঁহাদের জীবন-কথা আলোচ্যই নহে। সত্য সত্যই বর্ত্তমান যুগে আমাদের সমাজে নির্লোভ নিষ্ঠাবান সত্যবাদী ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে। কিন্তু এখনও যে দুই চারি জন আছেন, বা অল্প দিন পূর্ব্বে গতায়ু হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-কথা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কেন না, এ কালে সত্য পথে থাকা বা অর্থলোভ সংবরণ বড় সহজ ব্যাপার নহে। মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন:—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

অর্থাৎ— সম্মুখে বিকার-হেতু থাকিতে যাঁদের
রহে চিত্ত অবিকৃত, ধীরত্ব তাঁদের।

এই অর্থসর্ব্বস্ব সমাজে এখন এমন অবিকৃতচিত্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত একবারে বিরল নহেন। বারো বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমরা যখন হুগলীতে ছিলাম, সেই সময়ে খানাকুল-কৃষ্ণনগর-নিবাসী এক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নামটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কি না, স্মরণ নাই। শুনিয়া থাকিলেও উহা ভুলিয়া গিয়াছি। কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার টোল ছিল। দুই এক কথার পর তিনি কহিলেন, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব অধ্যয়ন-সমাপন এবং বাড়ীতে টোলস্থাপন করিবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করেন, এবং তাঁহার ঔরসে আমরা নয় ভাই জন্মগ্রহণ করি। এখনও আমরা আট ভাই বর্ত্তমান। আমি পঞ্চম। আমারই বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছে। আমরা সকলেই শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এক দিন বাবাকে বলিয়াছিলাম, 'আমরা সকলেই সংস্কৃত পড়িব, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইব, আমাদের সংসার চলিবে ত? এক বাড়ীতে আর ক'খানি পত্র হইবে?' বাবা শুনিবামাত্র কহিলেন, —'কি,

'আবদ্ধমুক্তাং গণিকাং বিলোক্য গৃহাঙ্গনাঃ কিং কুলটা ভবন্তি।'

অর্থাৎ, মুক্তাশোভিতা বেশ্যাকে দেখিয়া কুলবধূ কি কুলত্যাগ করিবে?

কথাটী এখনও আমার কানে বাজিতেছে। এমন কথা বলিবার লোক বাঙ্গালায় এখন বোধ হয় অধিক নাই। বলিতে ও ভাবিতে কষ্ট হয় যে, অনেক ব্রাহ্মণই এখন মুক্তার লোভে স্ব-বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, এবং করিতে-ছেন। যাঁহারা করেন নাই, তাঁহাদের অনেকেই সাধারণের অপরিচিত, এবং দরিদ্র অবস্থার লোক। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা যাঁহার জীবনের দুই একটী কথা বলিতে যাইতেছি, তিনি দেশে একবারে অপরিচিত নহেন।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। পাঠক ক্ষমা করিবেন। আমরা যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা অবতারণা করিতেছি, তিনি পূর্ব্বস্থলীর অলঙ্কার স্বর্গীয় মহামহো-পাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। আমরা ইঁহার জীবন-কথা অতি সংক্ষেপে বলিব। বাঙ্গালা ১২৪০ সালে কৃষ্ণনাথের জন্ম হয়, এবং ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে (ইংরাজী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে) ইনি কাশীপ্রাপ্ত হন। সুতরাং মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

কৃষ্ণনাথ পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। অতি উচ্চবংশে তাঁহার জন্ম। মহাভারতের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরমভাগবত মহাত্মা অর্জ্জুনমিশ্র তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ। ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহারই ভক্তি সম্বন্ধে ভগবৎকৃপাবিষয়ক এক সুন্দর

আখ্যায়িকা আছে। কৃষ্ণনাথের পিতার নাম ৺কেশবচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি রত্নাবলী নাটিকার টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। কৃষ্ণনাথ আজীবন বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া অপুত্রক অবস্থায় এক দত্তকপুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

বাল্যকালে কৃষ্ণনাথের জিহ্বায় জড়তা ছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে কোনও বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের অনেকের মনে ধারণা হইল যে, জ্যেষ্ঠ শিবনাথই পণ্ডিত হইবেন, কনিষ্ঠ কৃষ্ণনাথের কোনও আশা নাই। পিতা কেশবচন্দ্র পুত্রের জন্য পুরশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুকাল পরেই সুব্রাহ্মণের পুরশ্চরণের ফল ফলিল। কৃষ্ণনাথের জিহ্বার জড়তা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল, এবং তিনি স্বগ্রামনিবাসী স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক স্বর্গীয় পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। এখানেই তাঁহার অধ্যয়ন শেষ। কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন উপাধি লইয়া চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। এই উপাধি সম্বন্ধেও বোধ হয় এখনকার দিবে একটী কথা বলা আবশ্যক। উপাধিপরীক্ষার ভার সরকার বাহাদুরের হাতে আসিবার পর ন্যায়ের পণ্ডিত ন্যায়তীর্থ বা তর্কতীর্থ, স্মৃতির পণ্ডিত স্মৃতিতীর্থ, বেদান্তের পণ্ডিত বেদান্ততীর্থ, এইরূপই উপাধি পাইয়া আসিতেছেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সময়ে এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কৃষ্ণনাথের অধ্যাপক স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপাধি ছিল ন্যায়রত্ন। কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতির পণ্ডিত ছিলেন টাঙ্গাইল-নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন। কৃষ্ণনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে দুইটীমাত্র কথা বলিব। অধ্যাপকের নিকট কৃষ্ণনাথ কেবল স্মৃতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের যত্নে ও চেষ্টায় তিনি কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি বহু বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ, এক সময়ে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন কৃষ্ণনাথকে প্রায়ই বলিতেন, 'কৃষ্ণনাথ, তুমি ত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র, স্মৃতি এবং জ্যোতিষ ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনও শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। তুমি এমন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলে কিরূপে?' বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় শকুন্তলা নাটকের সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, 'পূর্ব্বস্থলীনিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা সহিত অভিনব সংস্করণ প্রচারিত

করিয়াছেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কাব্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণ। তদীয় যত্নে ও পরিশ্রমে এই নাটকের অনুশীলনে সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।' কৃষ্ণনাথ যখন শকুন্তলার টীকা লেখেন, তখন তাঁহার বয়স ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। বলা বাহুল্য,ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মুখ হইতে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী হইতে এরূপ প্রশংসা পাওয়া সামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে। কৃষ্ণনাথ শকুন্তলার টীকা ব্যতীত দায়ভাগের টীকা, মলমাসতত্ত্বের টীকা, সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, অর্থসংগ্রহের টীকা, ন্যায়প্রকাশের টীকা, কর্পূরাদিস্তোত্রের টীকা, একখানি খণ্ডকাব্য, এবং তিনখানি স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্যামাপূজাদিবিষয়ক শ্যামাসন্তোষ নামক পুস্তকও তাঁহার লিখিত। সবগুলির নাম ঠিক বলিতে পারিলাম কি না, জানি না। ইহার প্রত্যেক পুঁথিতেই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে।

এই অসাধারণ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ একান্ত বিনয়ী, মিষ্টভাষী, এবং কোমল গুণের আধার ছিলেন। একবার শান্তিপুরে এক পণ্ডিত-সভায় কৃষ্ণনাথ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিলে, এক জন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেন, ঠিক যেন কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর বক্তৃতা শুনিলাম। কৃষ্ণনাথ কহেন, তাঁহার ন্যায় মহাকবি ও মহাপণ্ডিত এ কালে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার তুলনা করা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি।

একবার কালনা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত এক কায়স্থ রাজকর্ম্মচারী পূর্ব্বস্থলী পরিদর্শন করিতে যাইয়া কৃষ্ণনাথের বাড়ীতে যান। কৃষ্ণনাথ তাঁহাকে দেখিয়া কহেন, আপনি এখানে আসিয়াছেন, আপনার যে পদ, এক জন চৌকিদার পাঠাইয়া দিলেই আমি যাইয়া দেখা করিতাম। রাজকর্ম্মচারী কহিলেন, আপনাকে চৌকিদার দিয়া ডাকাইব? আপনার দর্শনলাভ আমি দেবদর্শন বলিয়া মনে করি। কৃষ্ণনাথ হাস্যমুখে কহেন, আমার যে বাড়ীতে বসিয়াই দেবদর্শন হইয়া গেল।

কৃষ্ণনাথের গুরুভক্তি সম্বন্ধে আমরা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত 'দীন-তপস্বিনী' প্রবন্ধে একটী কথা লিখিয়াছিলাম। এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিতে পারি। কৃষ্ণনাথের গুরুপত্নী দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বর্গীয়া ত্রৈলোক্যতারিণী দেবী অলৌকিকগুণসম্পন্না ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন। আমরা ইহাকেই দীন-তপস্বিনী বলিয়াছি। কৃষ্ণনাথ এক দিন ইহার বাড়ীতে যাইয়া দেখিতে পান, এক জন অপরিচিত কায়স্থ ভদ্রলোক মা-

ঠাকুরাণীর আগমনপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কৃষ্ণনাথ, তিনি তামাক খান কি না জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়া নিজে তামাকু প্রস্তুত করিয়া দেন। আগন্তুক ভদ্রলোক ন্যায়পঞ্চাননকে জানিতেন না। এক তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে এবং 'ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! প্রণাম' এই বাক্য-উচ্চারণে, ইনিই কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন বুঝিতে পারিয়া একান্ত অপ্রস্তুত হইয়া হুঁকাটী রাখিয়া দেন। কৃষ্ণনাথ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে কহেন, 'আপনি তামাক খান, ইহাতে দোষ নাই। এ আমার তামাক সাজারই বাড়ী।'

ব্রাহ্মণপণ্ডিতমাত্রেই প্রায় একটু কবিত্ব থাকে। কৃষ্ণনাথ অনেক সময়েই অতি সরস বাক্য বলিতেন। বৃদ্ধকালে এক দিন তিনি আমাদিগকে কহিয়াছিলেন, 'আর ছাত্র পাই না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন?' কৃষ্ণনাথ বলিলেন, 'পল্লীগ্রামে আর কেহই পড়িতে চায় না। সকলেরই যেন ইচ্ছা, সহরে পড়ি। সময়ে সিগারেটটা খাওয়া চলে, থিয়েটারটাও দেখা চলে, অথচ টোলে একটু সংস্কৃত পড়াও চলে।'

কৃষ্ণনাথের স্বদেশবৎসলতা বিলক্ষণ ছিল। পূর্ব্বস্থলীর ডাকঘর, ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁহারই যত্নে স্থাপিত। সময়ের গতি তিনি বেশ বুঝিতেন, এবং বর্ত্তমান কালে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী চিকিৎসা প্রভৃতির উপযোগিতা সর্ব্বদা স্বীকার করিতেন।

কৃষ্ণনাথের বাক্যে এবং ব্যবহারে এত মিষ্টত্ব ছিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শেষবয়সে তাঁহাকে প্রায়ই পণ্ডিত-সভায় মধ্যস্থতা করিতে হইত, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহার মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা করা তাঁহার এক প্রধান কার্য্য ছিল।

এইবার কৃষ্ণনাথের লোভহীনতা, সত্যপ্রিয়তা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। তাঁহার এই গুণগুলিই আমাদের প্রবন্ধের লক্ষ্য বিষয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, দেশে সংস্কৃতবিদ্যাশিক্ষার প্রচার বিষয়ে সরকার বাহাদুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা, পূজ্যপাদ পণ্ডিত স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার পূর্ব্বস্থলীতে যাইয়া ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে অনুরোধ করেন, 'আপনি সংস্কৃত কলেজের একটী অধ্যাপকতা গ্রহণ করুন।' ন্যায়পঞ্চানন বলেন, 'এমন কথা বলিবেন না। বিদ্যা দান করিয়া অর্থ-গ্রহণ? আমি বিদ্যাবিক্রয়ী

হইতে পারিব না।' ন্যায়রত্ন মহাশয় এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া কহেন, 'তাহা হইলে একটী বৃত্তি গ্রহণ করুন। যাঁহারা টোল রাখিয়া ছাত্র পড়াইতেছেন, এবং তাহাদের আহারব্যয় প্রভৃতি বহন করিতেছেন, গবর্মেণ্ট তাঁহাদের অনেককেই মাসিক বৃত্তি দিতেছেন। আপনার যখন টোল আছে, তখন আপনি ইহা অনায়াসেই লইতে পারেন। আর রাজদত্ত বৃত্তি লইতে আপত্তিই বা বিশেষ কি?' কৃষ্ণনাথ উত্তর করিলেন, 'মাপ করিবেন, ইহা আমার কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধ। যে ক'দিন পারি, দুটী অন্ন দিয়াই ছাত্র পড়াইব, না পারি বন্ধ করিয়া দিব, বিদেশী রাজার অর্থসাহায্য গ্রহণ করিব না।' ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কৃষ্ণনাথ সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা বোধ হয় উচ্চতর হইল।

একবার বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত উড্‌বরণ্‌ প্রধান সেক্রেটারী বক্‌ল্যাণ্ডকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে গমন করেন। রাজবাটীতে একটী সভা হয়। মহারাজ কর্তৃক আহূত হইয়া কৃষ্ণনাথ ঐ সভায় আসিয়া গবর্ণর সাহেবের অভ্যর্থনাসূচক একটী সুমধুর সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন। গবর্ণর ন্যায়পঞ্চাননের নাম জানিতেন, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা অবগত ছিলেন। তিনি শ্লোকের অনুবাদ শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বক্‌ল্যাণ্ডকে বলিলেন, 'আপনি পণ্ডিত-জীকে বলুন, একটী টোল-পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করিবার কথা হইতেছে। ঐ পদের বেতন এক শত বা দেড় শত টাকা হইবে। পণ্ডিতজী উহা গ্রহণ করিতে চাহিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।' ন্যায়পঞ্চানন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'ক্ষমা করুন, আমি উহা গ্রহণ করিতে পারিব না।' গবর্ণর মহোদয় পুনরায় মহারাজ বাহাদুরকে দিয়া কৃষ্ণনাথকে এই পদ লইতে অনুরোধ করিলে কৃষ্ণনাথ পূর্ব্ববৎ অস্বীকার করিলেন। তখন গবর্ণর মহারাজাকে কহিলেন, 'আপনি জিজ্ঞাসা করুন, পণ্ডিতের এই পদ-গ্রহণে অসম্মতির কারণ কি? তাহা জানিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।' মহারাজার কথা শুনিয়া কৃষ্ণনাথ করযোড়ে উত্তর করিলেন, 'আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসরের কাছাকাছি। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করি নাই। এ বৃদ্ধ বয়সে শ্ববৃত্তি-অবলম্বন বা বিদেশী রাজার অন্ন গ্রহণ করিতে চাহি না।' সহৃদয় উড্‌বরণ সাহেব এই কথার অনুবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন নাই।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর এই সভায় শান্তিপুরের প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী

বংশের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ইনি সম্ভ্রান্ত ও অর্থবান লোক ; অনেক দিন হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক জন সুব্রাহ্মণের সন্ধানে ছিলেন। কৃষ্ণনাথের বাক্য শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, এই ত ব্রাহ্মণ, ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব। ইহার কিছু দিন পরেই পাগলা গোস্বামীদের বাড়ীতে এক ক্রিয়া উপলক্ষে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় শান্তিপুরে যান। শরৎবাবু সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন, এবং সস্ত্রীক দুই দিন পরে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনাথের চরিত্রের মহত্ত্ব ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বুঝাইবার জন্য শরৎবাবু আমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। কেবল একটীমাত্র কথার উল্লেখ করিব। কৃষ্ণনাথ শরৎবাবুর বাড়ীতে গেলে শরৎবাবু তাঁহার ব্রাহ্মণীকে বলেন, 'একটী মোহর দিয়া উঁহাকে প্রণাম কর।' ব্রাহ্মণী সেইরূপ করিলে কৃষ্ণনাথ কহেন, 'আমি ত ইহা লইতে পারি না। এখনও ত আপনার আমাকে প্রণাম করিবার কোনও সম্বন্ধ হয় নাই। শরৎবাবু যাহা বলিতেছেন, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাকে প্রণামী দিতে পারিবেন। এখন আমি ইহা কিছুতেই লইতে পারি না।' শরৎবাবু বলেন, 'ব্রাহ্মণের এই কথায় আমার স্ত্রীর চক্ষে জল আসিয়াছিল, এবং যদিও তিনি প্রণামী ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার এবং আমার মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের এই ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, অনেক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিত দুইটী টাকার লোভে অর্দ্ধ ক্রোশ পথ রৌদ্রে হাঁটিয়া আসেন, আর ইনি অর্থবান না হইয়াও একটী স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইনি সুব্রাহ্মণ বটেন।'

কৃষ্ণনাথ যে সুব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তিনি জীবনে কখনও অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই। অর্থকে লোষ্ট্রের ন্যায় মনে করিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার অর্থপ্রাপ্তি হইত। একান্ত সংযমী ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধিক অর্থের প্রয়োজন ছিল না। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে বা দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে কখনও তাঁহার অর্থের অভাব ঘটে নাই। ইদানীং তিনি দেশের বহু স্থলে একচ্ছত্রী পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, অর্থাৎ কোনও ক্রিয়ায় এক জন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিতে হইলে লোকে কেবল তাঁহাকেই নিমন্ত্রণ করিত। আর কৃষ্ণনাথ যদিও নবদ্বীপ-

নিবাসী বা নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন না, তথাপি শেষ বয়সে দেশের সর্ব্বত্রই তিনি সর্ব্বোচ্চ বিদায়ের সমান অর্থ পাইতেন; কর্ম্মকর্ত্তা নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে বিদায় কিছু অধিক দিয়া কৃষ্ণনাথকে প্রণামী বলিয়া সেই পার্থক্য পূরাইয়া দিতেন। ইহা ভিন্ন সময়ে সময়ে লোকে ইচ্ছা করিয়া প্রণামী বলিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ দিত। একটী ঘটনার উল্লেখ করি।

একবার কৃষ্ণনাথ ও পশ্চিম বঙ্গের বহু পণ্ডিত পূর্ব্ব-বঙ্গের এক ধনবান্ গৃহস্থের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। 'বিদায়' দিবার পর গৃহস্বামী পণ্ডিতদিগকে পাথেয় ব্যয় দিতেছেন। প্রথমতঃ এক প্রধান পণ্ডিতকে তাঁহার পাথেয় কত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। কর্ম্মকর্ত্তা একটু মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, আমরা ত কলিকাতায় যাই, এবং ফিরিয়া আসি, তাহাতে ত এত লাগে না। আপনি ত কলিকাতা অপেক্ষা অল্প দূর হইতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত অনায়াসে কহিলেন, আমার ছাত্র ভৃত্য শুদ্ধ ইহাই লাগিয়াছে। গৃহস্বামী ৫০৲ টাকাই দিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ৪২৲ টাকা। তাহাও দেওয়া হইল। তৃতীয় পণ্ডিত ৩৬৲ টাকা বলিয়া তাহাই পাইলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, 'আমি বাড়ী থেকে স্বরূপগঞ্জ অবধি একখানা ডিঙ্গিতে আসি, তা'তে লাগে।৴০ আনা, সেখান থেকে গোয়াড়ী আস্‌তে ভাগের ঘোড়ার গাড়ীতে লেগেছে।/০ পাঁচ আনা, গোয়াড়ী থেকে বগুলা আস্‌তে।৶০ সাত আনা, এই ১৵০ আঠার আনা, আর রেলগাড়ী ও জাহাজে লেগেছে ২॥০ আড়াই টাকা, এই ৩॥৵০ তিন টাকা দশ আনা লেগেছে, যাবার সময়েও এইরূপই লাগ্‌বে।' কর্ম্মকর্ত্তার মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি ভাবিলেন, এইবার খাঁটী ব্রাহ্মণ পাইয়াছি। টাকা বাহির করিয়া কৃষ্ণনাথকে কহিলেন, 'আপনার পাথেয় এক শ' টাকা।' কৃষ্ণনাথ 'সে কি, সে কি!' বলায় গৃহস্বামী কহিলেন, 'পাথেয় হউক, বা প্রণামী হউক, আপনি ইহা গ্রহণ করুন, আমি কৃতার্থ হই।' দাতার চক্ষে জল আসিল, এবং তিনি ভক্তিভরে কৃষ্ণনাথের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

অর্থলোভ ছিল না বলিয়াই কৃষ্ণনাথ জীবনে কখনও অব্যবস্থা বা কুব্যবস্থা দেন নাই। নিজে যাহা বুঝিতেন, অন্তকে তাহাই বুঝাইতেন। কাহারও অনুরোধে উপরোধে কোনও ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতেন না। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থা-প্রদানই স্মার্ত্তপ্রধান কৃষ্ণনাথের জীবনের মুখ্য কার্য্য ছিল। এখনকার দিনের একটী সহজ উপমা দিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, লোকে

মোকর্দ্দমাদি বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ আইনজ্ঞের ব্যবস্থা বা পরামর্শ লয়, তেমনই দেশদেশান্তরের হিন্দুসন্তানগণ ধর্ম্ম কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্তাদি সম্বন্ধে কৃষ্ণনাথের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইতেন। অবশ্য আইনজ্ঞের ব্যবস্থার মূল্য পণ্ডিতের পারিশ্রমিক অপেক্ষা অনেক অধিক।

কৃষ্ণনাথের এক পরমাত্মীয় পুত্রস্থানীয় যুবক বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার কিছুকাল পূর্ব্বেই কৃষ্ণনাথ দেশত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। কৃষ্ণনাথ যদিও ইহা স্পষ্টতঃ কাহাকেও বলেন নাই, তথাপি পূর্ব্বস্থলীনিবাসী সকল ব্রাহ্মণই বলেন যে, কৃষ্ণনাথ কখনও বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তির সমাজে পুনঃপ্রবেশের ব্যবস্থা দেন নাই, নিজের আত্মীয়ের বেলায়ও তাহা দিবেন না; অথচ পরম স্নেহের পাত্র আত্মীয় যুবককে ত্যাগ করাও কষ্টকর ও বিসদৃশ হইবে বলিয়াই তিনি সুস্থশরীরে কাশী চলিয়া যান, এবং প্রায় দুই বৎসরকাল কাশী বাস করেন।

কৃষ্ণনাথ যখন কাশীবাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৯১০ সালে বঙ্গের এক ব্যবস্থা লইয়া কাশীধামে বিলক্ষণ আন্দোলন হয়। কাশীবাসী বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত প্রণামী লইয়া সেই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। অনেকে উহার বিরুদ্ধে ছিলেন। ন্যায়পঞ্চানন উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। ব্যবস্থাপ্রার্থী ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যখন শুনিলেন যে, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ই বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত, এবং ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও দেশের সর্ব্বত্র আদরণীয়, তখন তিনি ন্যায়পঞ্চাননের শরণাপন্ন হইলেন। ন্যায়পঞ্চানন উহাতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে, ব্যবস্থাপ্রার্থী তাঁহাকে কহিলেন যে, তিনি তাঁহাকে প্রণামীস্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছেন। কৃষ্ণনাথ ইহা শুনিয়া কহেন, 'আমি গরীব হইতে পারি, কিন্তু আমার মন ত গরীব নহে। আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশের সন্তান, যখন উহাতে স্বাক্ষর করিব না বলিয়াছি, তখন কয়েক সহস্র কেন, কয়েক লক্ষ টাকা দিলেও কিছু হইবে না।' ব্যবস্থাপ্রার্থী ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরে কয়েক জন লোকে ঐ ব্যবস্থাপ্রার্থীকে পরামর্শ দিল, 'আপনি ন্যায়পঞ্চাননের নিকটে আবার যাইয়া বলুন যে, 'অর্থ দিবার কথা বলায় আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আপনি বিচার করিয়া আমাদের অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক, একটী ব্যবস্থা দিন। কৃষ্ণনাথ অর্থলোভে বাধ্য হই-

বার লোক নহেন, আর উঁহার ব্যবস্থা না পাইলেও কিছু হইবে না।' ব্যবস্থা-প্রার্থী ব্যক্তি এই পরামর্শ অনুসারে পুনরায় গেলে কৃষ্ণনাথ কহিলেন, 'আমি মুক্তিকামনায় এই মোক্ষধামে আসিয়াছি, এখানে কোনও বিচার করিতে বা ব্যবস্থা দিতে আসি নাই। কোনরূপ প্রতিগ্রহও করিব না, ইহাই ইচ্ছা।' কৃষ্ণনাথের এই ব্যবহারে ব্যবস্থাদাতা অনেক পণ্ডিত তাঁহাদের প্রাপ্ত প্রণামী প্রত্যর্পণ এবং প্রদত্ত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথ কাশীবাসসময়ে অপ্রতিগ্রাহীই ছিলেন। ১৯১১ সালে কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব স্বর্গীয় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রাহ্মণীর কাশীপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্রগণ কৃষ্ণনগরে মহাসমারোহে মাতার শ্রাদ্ধ করেন, এবং পণ্ডিতবিদায় হিসাবে কৃষ্ণনাথকে একখানি নিমন্ত্রণপত্র এবং কিঞ্চিৎ প্রণামী পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণনাথ টাকাটা ফিরাইয়া দিয়া বিনীতভাবে লিখিয়া পাঠান, 'এ সৎ প্রতিগ্রহ বটে, কিন্তু অধুনা আমি কাশীবাসী অপ্রতিগ্রাহী, প্রণামী লইলাম না বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।' কৃষ্ণনাথের অর্থ-প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে আরও বহু ঘটনার সন্নিবেশ করিতে পারি, কিন্তু তাহা বোধ হয় অনাবশ্যক, এবং তাহাতে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

উপরে ইঙ্গিত করিয়াছি যে, কৃষ্ণনাথ দেশে একবারে অপরিচিত লোক ছিলেন না। পাণ্ডিত্যের হিসাবে বঙ্গের বহু বড়লোক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সংস্কৃতবিদ্যার্থীরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে জানিতেন। তিনি প্রতি বৎসর উপাধি-পরীক্ষার পরীক্ষক হইতেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি ও রচিত ব্যাখ্যাগুলিও অতি আদরণীয়; আর এখনও তাঁহার বহু ছাত্র জীবিত আছেন, এবং ইঁহাদের কেহ কেহ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। এই সকল কারণেই কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর শোক-প্রকাশার্থ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে একটী সভা হইয়াছিল, এবং উহাতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, সার্ আশুতোষ সরস্বতী প্রভৃতি লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র বঙ্গের বহু বরেণ্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ বয়োবৃদ্ধ শাব্দিক কবি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ সভায় স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণনাথের গুণগান করিয়াছিলেন।* এই সময়ে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রে কৃষ্ণনাথের একটী

* ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কতকটা এইরূপ।—কৃষ্ণনাথ পাশ্চাত্য বৈদিক হইয়াও দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী হইয়াও লোকোত্তরগুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এক দিকে লোকোত্তর, অন্য দিকে লোকের অন্তরস্থ হইয়াছেন।

নাতিদীর্ঘ জীবনচরিতও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণত্বেই কৃষ্ণনাথের জীবনের বিশেষত্ব অধিক। আমরা তাঁহার জীবনের যে দুই চারিটী কথা বলিয়াছি, তাহাতেই পাঠক দেখিবেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে আধুনিক সময়ের সম্মানের পদলাভ ও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া সতত সৎপথে থাকিয়া, এবং নিজে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাই পালন করিয়া, তিনি যে বিমল শান্তি উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, মানব-জীবনে উহা অমূল্য। এই নিমিত্তই তাঁহার পবিত্র চরিত্র-কথা সাহিত্যে স্থান পাইবার একান্ত উপযুক্ত। আমরা দুই চারিটী ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহার পুণ্য চরিত্র অতি সামান্যভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবৃত্তি-লালসার প্রাবল্যের দিনে এমন নিবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের জীবনকথা শুনিলে কি কিছুই লাভ নাই? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা ঔষধ।

বিবেক বৈরাগ্যের জন্মভূমি যে দেশে শঙ্করসদৃশ মহাজ্ঞানীর উপদেশ এই যে, ধনাগমতৃষ্ণা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, যে দেশে বহু কাল ধরিয়া কামনাবর্জ্জিত কৌপীনপরিহিত মৃৎপাত্রসম্বল মুমুক্ষু ভিক্ষুক বিষয়ানুরক্ত মণিমুক্তাশোভিত বস্ত্রালঙ্কারভূষিত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ভূপতি অপেক্ষা সমধিক ভাগ্যবান বলিয়া সমাদৃত ও পূজ্য, সে দেশের লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন যতই হউক না কেন, এখনও বোধ হয় কেহই সমাজে কৃষ্ণনাথের ন্যায় নিঃস্পৃহ ধর্ম্মনিষ্ঠ মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণের অস্তিত্বলোপ হয় ইহা কামনা করেন না।

ধন্য কৃষ্ণনাথ! ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, এবং সংযমী ও সদাচারী হইলে, কিরূপে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন, কেমন ভাবে পদ ও অর্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কখনও মিথ্যা আচরণ বা কাহারও তোষামোদ না করিয়া কত উচ্চ, কত পবিত্র থাকিতে পারেন, এই অধঃপতিত দেশে তুমি তাহা দেখাইয়া গিয়াছ।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। জ্যৈষ্ঠ।—'তত্ত্ববোধিনী' সাধারণ মাসিকের মত নানাবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বতন বৈশিষ্ট্যে ও গভীরতায় বঞ্চিত হইয়াছে।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অনন্ত ও অমৃতের উপলব্ধি' উপাসনায় বিবৃত হইয়াছিল। ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের সনাতন সাহিত্যের অন্তর্গত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'সবুজ পত্রে'র

ভাষার আমদানী করিয়াছেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র বক্ষে ভাষাগত মুদ্রাদোষের তাণ্ডব! 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?' শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেবের 'মহাভারতীয় নীতিকথা' উপাদেয় সংগ্রহ—'হিতং মনোহারি চ।' কুমার অনাথকৃষ্ণ বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার রামায়ণের নির্ঘণ্ট, প্রাচীন ভারতের বলি, সুরা প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। সমগ্র মহাভারতের নীতিকথাসমূহ একত্র সঙ্কলিত হইলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন।—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়ালের 'আনন্দ-সন্ধ্যা নামে' একটি গান। ধুয়াটি মন্দ নয়—'আজি আনন্দ-সন্ধ্যা নামে, পবন মুখর কর গানে'। তার পরই 'এস যুগে লয়ে কম-কান্তি!'—এইখানেই ভাবের অবসান। কিন্তু অত্যন্ত 'থেলো' হইলেও এ অনুরোধেরও অর্থ বুঝা যায়। তাহার পরই,—'এই তারা-ভরা আকাশে গানটি ভরি লও তব প্রাণে!' বিস্ময়ের চিহ্নটি আমাদের নহে। কিন্তু আমরাও বলিতে বাধ্য,—একমাত্র উহার প্রয়োগই সার্থক হইয়াছে। বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'পুরাতন ও নূতনে' পুরাতন আছে, নূতন খুঁজিয়া পাইলাম না। আদি ব্রাহ্মসমাজের এই শ্রেণীর রচনার যেন 'প্যাটেন্ট' আছে। সব এক ছাঁচে ঢালা। সে ছাঁচে বহু পূর্ব্বে অনেক উপদেশ, প্রার্থনা, উপাসনা, নববর্ষ, বর্ষশেষ, ১১ই মাঘ ও ব্যাখ্যান প্রভৃতি ঢালা হইয়াছে। এখনও সেই পদ্ধতিই চলিতেছে। গত মাঘোৎসবে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি সার আশুতোষের অভিভাষণে এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, চর্ব্বিতচর্ব্বণ, গতানুগতিকতা, ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ধর্ম্মসাহিত্যেও অসহ্য। 'রাণাডের স্মৃতি-কথা' সুখপাঠ্য অনুবাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বারাণসী-কথা' অত্যন্ত সাধারণ রচনা; 'তত্ত্ববোধিনী'র যোগ্য নহে। এই শ্রেণীর একঘেয়ে ভ্রমণকাহিনীর অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছি। 'আদর্শ দা দাদাঠাকুর' নাটক ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ভারততিলক বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতা রহস্যে'র অনুবাদ অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হয় না কেন?

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীদ্বিজদাস বসুর 'বেদমাতা'র দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 'বেদে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের বীজাবস্থা' বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সারগর্ভ, পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, এবং সংক্ষেপে লিখিত। বোধ হয়, আর একটু বিস্তৃত হইলে সাধারণ পাঠকের অধিকতর উপযোগী হইত। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'লীলাময়ী' 'হিরার মণি' হইলেও 'কাচের খনি', কবি তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি অসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছেন,—'কে সে বিধিল মোদের দোঁহে, কুসুম-শরে। দেহে সুখ না ধরে!' সেই মদন-সুখ উথলিয়া 'ভারতী'র মন্দির প্লাবিত করিতেছে! শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরীর 'প্রকৃতির ভোগ' চলনসই ছোট গল্প। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'হরকুমারী' ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের অনুবাদ। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'বসন্ত শেষ' চল্তী ভাষার গদ্য কবিতা। শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্যের 'ইলেকট্রণ বা তড়িৎকণা' উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রারম্ভে নিবিষ্ট ইলিস মাছের গল্প অপ্রাসঙ্গিক। ইলিস মাছের দাগা হইতে অবিভাজ্য অণুর অবতারণা—টানিয়া বোনা, এ রকম উদ্ভট কল্পনায় বৈজ্ঞানিক রচনা popular হয় না। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার রায় 'ভারত-শিল্প ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে যুগপৎ ভাষার শ্রাদ্ধ ও ভারত-চিত্র-

কলার ওকালতী করিয়াছেন; এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন। ইনি খুব শিকারী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? লেখক বলেন, 'ভারতীয় আর্টিষ্টকে সকলে পোটো বলিয়া ডাকে এবং * * * প্রকাশ্যভাবে তাঁদের গালাগাল দিতেও অনেকে লজ্জিত নন।' অশিক্ষিত-পটু আর্টিষ্ট, না-আঁকিয়া-র‍্যাফেল ও না-খুঁদিয়া-রোঁদে হেমেন্দ্রকুমার যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে সত্য। প্রশংসার বিপরীতকে অনেক ক্ষেত্রেই 'গালাগাল' বলিয়া মনে হয়। 'পোটো'কে লোকে 'পোটো'ই বলে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উপদেশ—'কাণাকে কাণা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই। দুঃখের বিষয় এই যে রক্ত-মাংসের শরীরে সব সময়ে মহাজনের উপদেশ লোকের মনে থাকে না।—এই সংখ্যার ভারতীয় প্রথমে 'প্রসাধন' নামক যে ছবিখানি আছে, তাহার চিত্রবস্তু আঁকিবার মত; তাহা 'ভারতীয়'ও বটে। এই ভারতীয় সৌন্দর্য্য সার্ব্বভৌমিকও হইতে পারিত। কল্পনায় উহা সুন্দর, তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে। কিন্তু যাহা কল্পনার কল্পলোকে থাকে, তাহাই চিত্র নয়। তাহাকে কাব্যে, পটে, বা পাষাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিল্পী সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন। যাহাতে সেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহাই শিল্প। যাহা সৌন্দর্য্যকে, এবং সৌন্দর্য্যের আধার 'প্রকৃতি' বা 'স্ব-ভাব'কে নির্ব্বাসিত করিয়া সৌন্দর্য্যের বিপরীত ভাবের সৃষ্টি করে, তাহা 'ভারত চিত্র-কলা'র, এমন কি, বর্ত্তমান কলার চরম উৎকর্ষ হইলেও, চিত্র নহে। চিত্রকর শ্রীযামিনীপ্রকাশ রায় 'প্রসাধনে'র কল্পনায় বিষয়-নির্ব্বাচন-নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার তুলিকায়, অঙ্কনে, বর্ণরাগে সে নিপুণতার পরিচয় নাই। ইহা 'গালাগাল' নহে, সত্য। ছবিখানি যাহা হইতে পারিত, চিত্রকর আমাদিগকে কল্পনায় তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অবকাশ দিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার তুলিকা সুসম্পূর্ণ চিত্রে তাঁহার অনুভূত সৌন্দর্য্য সত্য-রূপে প্রতিফলিত করিতে পারিবে। আপাততঃ 'লোক' যদি তাঁহার 'অঙ্কনে' তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে আশা করি, সেই অতৃপ্তিকে 'গালাগাল' কল্পনা করিয়া হেমেন্দ্রবাবুর মত 'সম্প্রদায়'বর্গ তাহাদের কণ্ঠী ছিঁড়িবেন না। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রণসঙ্গীত' যাত্রার দলের যুদ্ধের উপযোগী। শ্রীপ্রিয়ংবদা দেবীর 'যে গেল সঙ্গে করে কিছুই নিল না' একটি কবিতার শিরোনাম, এবং উক্ত কবিতার প্রথম ছত্রও বটে। অতএব 'গদ্য'। 'ঘষে মেজে রূপ হয় না' বটে, কিন্তু কবিতায় একটু ঘষা মাজা দরকার।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ।—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা' আমরা সকল বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীসীতাদেবীর 'স্পর্শমণি' নামক গল্পটি সুখপাঠ্য। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর 'অধ্যাত্মবাদ' খুব গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'আত্মানন্দিক' নামক 'কাব্যিরসে'র পার্শ্বে শ্রীঅনিলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর 'ভাবরসরসিক' নামক ছবিখানিকে যত্নি বলিয়া মনে হয়। শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী-নিকেতন' গড়মান্দারণের সুলিখিত ইতিহাস। 'কুমুদিনীর নিশিজাগরণ' বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।—এবারকার 'প্রবাসী'র শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর 'প্রকৃতির পুরুষ-পূজা' পড়িয়া 'কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন' মনে পড়ে। শিরো-

নাকের ঘটা খুব। পূজার মন্ত্রের নমুনা,—'বিশ্ব নাচে ব্যাকুল বেয়াড় ' আবার, 'কান্না-হাসির ঘণ্টা-কাসির বাজ বাজিয়ে!' কান্না হইল ঘণ্টা, হাসি হইল কাসী, উভয়ের মিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জন্মিল বাজ;—তাহাকে বাজিয়ে!—কবিত্ব নয়? 'বাঙ্গালা লিখন-যন্ত্র বা টাইপ-রাইটারে' ময়মনসিংহ ধনকুড়া নিবাসী শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বাঙ্গালা টাইপ-রাইটার যন্ত্রের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীসত্যচরণ লাহা 'ভতুসংগ্রহ' নামক উপাদের প্রবন্ধে উক্ত খণ্ডকাব্যে বর্ণিত বিহঙ্গকুলের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীঅমৃতলাল শীলের 'কালুরার বিবাহ' সুলিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'ব্যাধি, শ্রম ও শ্রান্তিমোচন' জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত,—'কাযের পরিবর্ত্তনই শ্রান্তির ঔষধ।'

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য —স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র প্রণীত। তদীয় পুত্র শ্রীশরৎকুমার মিত্র প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা।

'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ ও সমাদৃত গ্রন্থ। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে দিয়াই সারদাবাবু শয্যাগত হন। শেষ ফর্ম্মা ছাপা হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। সারদাবাবুর বিয়োগের স্মৃতি এই সংস্করণে বিষাদের শুচিতার আরোপ করিয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রকাশ, বাঙ্গালায় এই গ্রন্থের সমাদর হইয়াছে। গ্রন্থকার তিন মাস শয্যাগত ছিলেন; সুতরাং তিনি ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও প্রসাধনের অবকাশ পান নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তিনি দেশবাসীকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একনিষ্ঠ সাধকের মাতৃপূজার পুষ্পাঞ্জলি। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার এই দানে ধন্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' চৈতন্য-যুগের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যে পূর্ণ। সারদাবাবু প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ হইতে গোদাবরীর শাখা গৌতমী নদীর তীরবর্ত্তী রাজমহেন্দ্রী নগর পর্য্যন্ত ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

গ্রন্থকার দ্বিতীয় খণ্ডে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শরৎবাবু দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—'পিতৃদেব দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার হস্তলিপি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। তজ্জন্য পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, এবং এখনও হইল না।' সারদাবাবুর সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল। এই জন্য তিনি তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 'তজ্জন্য' শরৎবাবুও তাহা 'অপ্রকাশিত' রাখিলেন কেন? এই সংস্করণের পরিশিষ্টে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত করিলে ভাল হইত। আশা করি, অচিরে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব, এবং সেই ভাবী সংস্করণে সারদাবাবুর অপ্রকাশিত রচনা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিব।

বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের ও তথ্য-নিবন্ধের শ্রেণীতে এই গ্রন্থ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানের মঞ্জুষা। উৎকলে ভ্রমণকালে ভ্রমণকারী এই গ্রন্থখানিকে 'সেথো' করিলে উপকৃত হইবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্যও অল্প। আশা করি, 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'—মনস্বী, দেশভক্ত, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত উপাসক সারদাচরণের স্নেহের দান ও স্মৃতির সম্বল 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' বাঙ্গালা দেশে চিরকাল সমাদর লাভ করিবে। এ পর্য্যায়ের সাহিত্যে ইহা প্রথম, এবং এখনও অদ্বিতীয়, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

সাহিত্য, ২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

সুদাস।

৩

৭।১৮ সূক্তের ৭ম, ১৩শ ও ১৫শ ঋকে তৃৎসু নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) সায়নাচার্য্য ৭ম ও ১৫শ ঋকের ব্যাখ্যায় তৃৎসুদিগকে হিংসক, দুষ্টমিত্র বলিয়াছেন। কিন্তু ১৩শ ঋকে সেরূপ অর্থ হইতেই পারে না। কারণ, তথায় আছে,—'ইন্দ্র ইহাদের দৃঢ় সপ্তপুরী বিদারণ করিয়াছিলেন। অসুর পুত্রের

(১) ৭।১৮ সূক্তের আবশ্যক ঋক্‌গুলি উদ্ধার করা গিয়াছে। পাঠকগণ নিম্নে এই ঋকগুলি দেখিতে পাইবেন।

পুরোড়া। ইৎ। তুর্বশঃ। যক্ষুঃ। আসীৎ। রায়ে। মৎস্যাসঃ। নিশিতাঃ। অপীব।

শ্রুষ্টিং। চক্রুঃ। ভৃগবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ। সখা। সখায়ং। অতরৎ। বিষূচোঃ॥—৭।১৮।৬

যজ্ঞকুশল তুর্বশ ধনলাভের নিমিত্ত (জলে) দলবদ্ধ মৎস্য সকলের (গমনের) মত অগ্রগামী হইয়াছিল। ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ শীঘ্র পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। সখা (ইন্দ্র) সখা (সুদাসকে) নানা দিকের (আক্রমণ হইতে) রক্ষা করিয়াছিলেন।

আ। পক্‌থাসঃ। ভলানসঃ। ভনন্ত। আ। অলিনাসঃ। বিষাণিনঃ। শিবাসঃ।

আ। যঃ। অনয়ৎ। সধমাঃ। আর্য্যস্য। গব্যা। তৃৎসুভ্যঃ। অজগন্। যুধা। নৄন্॥—৭।১৮।৭

সুন্দর নাসিকা (বা ভদ্র-মুখ-যুক্ত) পক্‌থগণ, অলিনগণ, বিষাণযুক্তগণ ও শিবগণ শব্দ করিতে করিতে আসিয়াছিল। যে (ইন্দ্র) সোমপানে মত্ত হইয়া আর্য্য (সুদাসের) গো সকল আনিয়াছেন; যুদ্ধ দ্বারা তিনি নরদিগকে (অর্থাৎ আর্য্যশত্রুদিগকে) তৃৎসুদিগের নিমিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

[এই ঋকে সায়ন তৃৎসুভ্যো হিংসকেভ্যঃ (হিংসকদিগের হইতে) অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বসিষ্ঠ ঋষি তৃৎসুদিগের পুরোহিত ছিলেন। তাহারা সুদাসের লোক, পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। অতএব সায়নের অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তৃৎসুভ্যঃ অর্থে তৃৎসুদিগের নিমিত্ত।]

দুঃ আধ্যঃ। অদিতিং। সেবয়ন্তঃ। অচেতসঃ। বি। জগৃভ্রে। পরুষ্ণীম্।

মহ্না। অবিব্যক্। পৃথিবীম্। পত্যমানঃ। পশুঃ। কবিঃ। অশয়ৎ। চায়মানঃ॥—৭।১৮।৮

দুষ্টমতি, অজ্ঞানগণ অদিতি পরুষ্ণীর (কূলভেদ করিয়া) জল ছাড়িয়া দিয়াছিল। (নদী) মহিমা দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। পলায়মান চয়মানের পুত্র কবি পশুর মত শয়ন করিয়াছিল।

[সায়ন পত্যমানঃ অর্থে পাল্যমানঃ পশুঃ যাগে সংজ্ঞপ্ত পশুরিব করেন।]

ঈয়ুঃ। অর্থং। ন। ন্যর্থং। পরুষ্ণীম্। আশুঃ। চন। ইৎ। অভিপিত্বম্। জগাম।

সুদাসে। ইন্দ্রঃ। সুতুকান্। অমিত্রান্। অরন্ধয়ৎ। মানুষে। বধ্রিবাচঃ॥—৭।১৮।৯

গৃহ তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দিলেন।' তৃৎসুগণ যদি দুষ্টমিত্র হইবে, তবে অসুর পুরী জয় করিয়া ইন্দ্র কেন তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দিবেন? আমরা মনে করি, সায়নাচার্য্য এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

অর্থসদৃশ পরুষ্ণীকে (শত্রুগণ) অনর্থে (অর্থাৎ নিম্নদেশে) লইয়া গিয়াছিল। সেও (অর্থাৎ পরুষ্ণীও) আশুগামী (অশ্ব) সদৃশ সেই দেশের অভিমুখে গিয়াছিল। ইন্দ্র সুন্দর অপত্য-যুক্ত, জল্পক, অমিত্রদিগকে মানুষ সুদাসের বশে আনিয়াছিলেন।

একং। চ। যঃ। বিংশতিং। চ। শ্রবস্যা। বৈকর্ণয়োঃ। জনান্। রাজা। নি। অস্তঃ॥

—৭।১৮।১১

বৈকর্ণ জনপদদ্বয়ের ২১ জনকে রাজা (সুদাস) যশ ইচ্ছা করিয়া সংহার করেন।

অধ। শ্রুতং। কবষং। বৃদ্ধং। অপ্‌সু। অনু। দ্রুহ্যং। নি। বৃণক্। বজ্রবাহুঃ।

বৃণানাঃ। অত্র। সখ্যায়। সখ্যম্। ত্বা যন্তঃ। যে। অমদন্। অনু। ত্বা॥—৭।১৮।১২

অনন্তর বজ্রবাহু (ইন্দ্র), শ্রুত (অর্থাৎ বেদজ্ঞ) কবষকে (ও) বৃদ্ধ দ্রুহ্যকে জলসকলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বধ করিয়াছেন। এইখানে সখার জন্য, সখ্যবরণকারী তোমাগত (প্রাণ) যাহারা, তোমার সম্মুখে মত্ত হইয়াছিল।

বি। সদ্যঃ। বিশ্বা। দৃংহিতানি। এষাং। ইন্দ্রঃ। পুরঃ। সহসা। সপ্ত। দর্দঃ।

বি। আনবস্য। তৃৎসবে। গয়ং। ভাক্। জেষ্ম। পুরুম্। বিদথে। মৃধ্রবাচম্॥—৭।১৮।১৩

ইন্দ্র বল দ্বারা ইহাদিগের দৃঢ় সপ্তপুরী সদ্যঃ বিদারণ করিয়াছিলেন। অসুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দিলেন। যজ্ঞে মিথ্যা-বাক্য-উচ্চারণকারী পুরুকে (আমি ইন্দ্র) জয় করিব।

নি। গব্যবঃ। অনবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ। ষষ্টিঃ। শতাঃ। সুষুপুঃ। ষট্। সহস্রা।

ষষ্টিঃ। বীরাসঃ। অধি। ষট্। দুবঃ যু। বিশ্বা। ইৎ। ইন্দ্রস্য। বীর্য্যা। কৃতানি॥

—৭।১৮।১৪

গো লাভ করিতে ইচ্ছুক অনু ও দ্রুহ্যগণ ৬ হাজার, ৬ হাজার চির নিদ্রা গিয়াছিল। ৬৬ জন বীর (সুদাসের) পরিচর্য্যা করিয়াছিল। ইন্দ্রের বীর্য্য দ্বারা এই সকল সাধিত হইয়াছিল।

ইন্দ্রেণ। এতে। তৃৎসবঃ। বেবিষাণাঃ। আপঃ। ন। সৃষ্টাঃ। অধবন্ত। নীচীঃ।

দুঃমিত্রাসঃ। প্রকলবিৎ। মিমানাঃ। জহুঃ। বিশ্বানি। ভোজনা। সুদাসে॥—৭।১৮।১৫

যুদ্ধার্থে মিলিত এই তৃৎসুগণ ইন্দ্র দ্বারা আনীত নিম্নদেশগামী জলের মত ধাবিত হইয়াছিল। অজ্ঞান, দুষ্ট মিত্রগণ নষ্ট হইয়া সুদাসকে সকল ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিয়াছিল।

[সায়ন মনে করেন, তৃৎসুগণই দুষ্ট মিত্র। তাহারা এক সময়ে ইন্দ্রকে বাধা দিতে যায়; এবং নিম্নাভিমুখী জলের মত পলায়ন করে। আমরা কিন্তু এই অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ, এই ঋকে ইন্দ্রকে বাধা দিবার কোনও রূপ উল্লেখ নাই। যে উপমা

পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধের বিষয় বসিষ্ঠ ঋষি একটী সূক্তে (৭।১৮) বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সংক্ষেপে আমরা প্রদান করিতেছি।

জলমধ্যে মৎস্যগণ যেমন দলবদ্ধ হইয়া গমন করে, এবং তাহাদের অগ্রভাগে বৃহৎ মৎস্য নেতার মত যাইতে থাকে, সেইরূপ যজ্ঞকুশল তুর্বশ দুষ্টমিত্র আর্য্য-দিগের পুরোভাগে আসিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ শীঘ্র আগমন করিয়াছিল। পক্থগণ, অলিনাগণ, বিষাণযুক্তগণ ও শিবগণ শব্দ করিতে করিতে আসিয়াছিল। দুষ্টবুদ্ধিগণ আসিয়া পরুষ্ণীর কূল ভেদ করিয়া পৃথিবী জলময় করিয়া দিল। চয়মানের পুত্র কবি পলায়ন করিতে গিয়া হত হইল। বৈকর্ণ নামক জনপদদ্বয়ের ২১ জনকে সুদাস একাকী বধ করেন। বেদবিৎ কবষ ও বৃদ্ধ দ্রুহ্যকে ইন্দ্র জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া সংহার করেন। পরে সুদাস অনুর পুত্রের পুর আক্রমণ করিয়া জয় করেন। তৃৎসুগণ উহা লাভ করে।

অনুগণ ও দ্রুহ্যগণ সুদাসের গোধন কামনা করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু উহাদের প্রত্যেকের ছয় সহস্র করিয়া লোক হত হয়। পরে ৬৬ জন বীর-পুরুষ সুদাসের পরিচর্য্যা করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, বোধ হয়, অবশিষ্ট রক্ষা পায়। সুদাস রাজা এই যুদ্ধে তৃৎসুদিগের বীরত্ব দ্বারা জয় লাভ করেন। ঋষি অতি সুন্দর তুলনা দ্বারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বতীয় নদীতে যখন জল নামিতে থাকে, তখন তাহার বেগ প্রচণ্ড; সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। তৃৎসুগণ যখন পার্ব্বতীয় নদীর স্রোতের ন্যায় দুষ্ট-মিত্রদিগের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা উহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সায়ন এই সুন্দর ঋকের অর্থ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই।

পরুষ্ণী নদীর কূলভেদকারী দুষ্টমিত্রগণের মধ্যে আমরা তুর্বশ, চয়মান-পুত্র কবি, ভৃগু, দ্রুহ্য, অনু, শ্রুতকবষ প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হই। ভরদ্বাজ ঋষি চয়মানের আর এক পুত্রের নিকট দান-প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন। (১) ইহাঁর নাম অভ্যাবর্ত্তী; ইনি মঘবান্ ও সম্রাট

রহিয়াছে, তাহাতে তৃৎসুদিগের পলায়ন বুঝায় না; ইন্দ্রের দ্বারা আনীত প্রচণ্ড জলস্রোতের মুখে যেমন সকল ভাসিয়া যায়, সেইরূপ যুদ্ধার্থে সংগত তৃৎসুগণ যখন ধাবিত হইয়াছিল, দুষ্ট মিত্রগণ সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নষ্ট হইয়াছিল।]

(১) দ্বয়ান্। অগ্নে। রথিনঃ। বিংশতিং। গাঃ। বধূমতঃ। মঘবা। মহ্যং। সম্রাট্। অভ্যাবর্ত্তী। চায়মানঃ। দদাতি। দূণাশা। ইয়ং। দক্ষিণা। পার্থবানাম্ ॥—৬।২৭।৮

ছিলেন। ইহাঁরা পৃথবা বা পৃথু-বংশীয়। অনুমান করি, এই চয়মানেরই কবি নামক পুত্র পরুষ্ণী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিতে গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অভ্যাবর্ত্তীর এই যুদ্ধে স্বার্থ ছিল। তিনি সম্রাট ছিলেন। সুদাস যমুনা-তীরে ভেদের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ইহাতে তিনি সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়েন। মনে হয়, পরুষ্ণী নদীর কূল-ভেদ-যুদ্ধের ইহাই প্রকৃত কারণ। অভ্যাবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন বলিয়া অপরাপর রাজগণ তাঁহার সহিত এই যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল।

যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু ও পূরু, এই পাঁচ বংশ ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ ছিল। (১) ভৃগুগণ ঋষি-বংশীয় ছিলেন। তাঁহারা আয়ু নামক রাজার পুরোহিত-বংশ। (২) আয়ু নহুষের পিতা; নহুষ-বংশ সরস্বতীতীরে রাজত্ব করিত, বসিষ্ঠ-ঋষি-বিরচিত একটী ঋকে দেখিতে পাই। (৩) তাহা হইলে ভৃগুগণ সরস্বতী অর্থাৎ সিন্ধু নদীর তীরবাসী ছিলেন, প্রমাণিত হইতেছে। ক্ষিতিগণ সুদাসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় উরুলোক বা সমগ্র ক্ষিতিদেশ সুদাসের অধীন হইয়াছিল। ইহা বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন। (৪)

হে অগ্নে! মঘবান্, সম্রাট, চয়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তী রথ সহিত, বধূযুক্ত দুই কুড়ি গাভী আমাকে দান করিতেছেন। পৃথবা-বংশীয়দিগের এই দক্ষিণা কেহ নষ্ট করিতে পারে না।

(১) যৎ। ইন্দ্রাগ্নী। যদুষু। তুর্বশেষু। যৎ। দ্রুহ্যুষু। অনুষু। পূরুষু। স্থঃ।
অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতম্। অথ। সোমস্য। পিবতম্। সুতস্য॥
—১।১০৮।৮

হে ইন্দ্রাগ্নি! যদ্যপি যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু (বা) পূরুদিগের মধ্যে থাক, এই সকল স্থান হইতে হে বৃষদ্বয়! এখানে আইস, অনন্তর সুতসোম পান কর। (আঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।)

(২) ইমম্। বিধন্তঃ। অপাম্। সধস্থে। দ্বিতা। অদধুঃ। ভৃগবঃ। বিক্ষু। আয়োঃ॥—২।৪।২
ভৃগুগণ আয়ুর বিশদিগের মধ্যে ইঁহাকে (অগ্নিকে) দুই ভাগ করিয়াছিলেন, এবং জল সকলের নিকট পূজা করিয়াছিলেন।

(৩) একা। অচেতৎ। সরস্বতী। নদীনাম্। শুচিঃ। যতী। গিরিভ্যঃ। আ। সমুদ্রাৎ।
রায়ঃ। চেতন্তী। ভুবনস্য। ভূরেঃ। ঘৃতং। পয়ঃ। দুদুহে। নাহুষায়॥—৭।৯৫।২
নদী সকলের মধ্যে শুভ্রা, গমনশীলা সরস্বতী একাই গিরি সকল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন। বহু ভূতজাতের ধনপ্রদানকারিণী (সরস্বতী) নাহুষের নিমিত্ত ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

(৪) উৎ। দ্যাম্ইব। ইৎ। তৃষ্ণজঃ। নাথিতাসঃ। অদীধয়ুঃ। দাশরাজ্ঞে। বৃতাসঃ।
বসিষ্ঠস্য। স্তুবতঃ। ইন্দ্রঃ। অশ্রোৎ। উরুম্। তৃৎসুভ্যঃ। অকৃণোৎ। উঁ। লোকম্॥
—৭।৩৩।৫

বসিষ্ঠ ঋষি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ প্রভৃতিকে পরাজয় করা সুদাসের পক্ষে 'ছাগ দ্বারা সিংহ-বধের সদৃশ ও সূচিকা দ্বারা যূপকাষ্ঠ কর্ত্তনের সদৃশ' হইয়াছিল। (১) ঋষি মনে করিতেন, এই অসম্ভব সাধন শুধু ইন্দ্রের কৃপায় সিদ্ধ হইয়াছে।

সুদাস রাজা সিন্ধুদিগের তীরে শিমু্য নামক দস্যুদিগেরও শাসন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে উচথের স্তব শিমু্যদিগের অকল্যাণ সাধন করে। (২) অর্ধ নামে এক ইন্দ্র অবিশ্বাসী সুদাসের রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু ইন্দ্রের কৃপায় তিনি তাহাকেও তাড়াইয়া দেন। (৩)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

আতৃপ্তক, বৃষ্টিপ্রার্থনাকারী, (যজ্ঞে) বৃতগণ (অর্থাৎ ঋত্বিকগণ) দাশ রাজাকে দিব্যলোকের মত উন্নত স্থান দান করিয়াছিলেন। স্তোত্রকারী বসিষ্ঠের (স্তব) ইন্দ্র শ্রবণ করিয়াছিলেন; তৃৎসুদিগকে উরুলোক প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) আধ্রেণ। চিৎ। তৎ। উঁ। একং। চকার। সিংহ্যং। চিৎ। পেত্বেন। জঘান।
অব। স্রক্তীঃ। বেশ্যা। অবৃশ্চৎ। ইন্দ্রঃ। প্র। অযচ্ছৎ। বিশ্বা। ভোজনা। সুদাসে॥
—৭।১৮।১৭

ইন্দ্র দরিদ্রের দ্বারা সেই অদ্বিতীয় দান কর্ম্ম করিয়াছেন, ছাগের দ্বারা সিংহ বধ করিয়াছেন, সূচির দ্বারা যূপকাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়াছেন। সকল ভোগ্য সুদাসকে দান করিয়াছেন।

(২) অর্ণাংসি। চিৎ। পপ্রথানা। সুদাসে। ইন্দ্রঃ। গাধানি। অকৃণোৎ। সুপারা।
শর্ধন্তম্। শিম্যুং। উচথস্য। নব্যঃ। শাপম্। সিন্ধূনাম্। অকৃণোৎ। অশস্তীঃ॥—৭।১৮।৫

ইন্দ্র সুদাসের নিমিত্ত জল সকল প্রথিত করেন; (উহাদিগকে) অগভীর ও সুখে পার হইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। উচথের স্তব সিন্ধুদিগের শাপ (রূপ) প্রবল শিম্যুকে অকল্যাণযুক্ত করিয়াছে।

[শিম্যুগণ যে দস্যুদিগের মত জাতি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকে দেখা যায়—

দস্যূন্। শিম্যূন্। চ। পুরুহূতঃ। এবৈঃ। হত্বা। পৃথিব্যাং। শর্বা। নি। বর্হীৎ॥—১।১০০।১৮

বহুলোকের দ্বারা আহূত (ইন্দ্র) গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা দস্যু ও শিম্যুদিগকে বজ্র দ্বারা হনন করিয়া পৃথিবীতে (আর্য্যদিগকে) স্থাপন করিয়াছেন।]

(৩) অর্ধম্। বীরস্য। শৃতপাং। অনিন্দ্রম্। পরা। শর্ধন্তম্। নুনুদে। অভি। ক্ষাম্।
ইন্দ্রঃ। মন্যুম্। মন্যুভ্যঃ। মিমায়। ভেজে। পথঃ। বর্তনিম্। পত্যমানঃ॥—৭।১৮।১৬

ইন্দ্র অবিশ্বাসী হবিঃপানকারী অর্ধকে, বীর (সুদাসের) ভূমির অভিমুখে স্পর্দ্ধাকারীকে (ইন্দ্র) দূর করিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্র ক্রুদ্ধদিগকে ক্রোধ (দিয়া) বাধা দিয়াছেন; পলায়নপর পলায়ন পথ ভাগ করিয়াছিল।

[অর্ধ ও নেম পণিবংশীয়, তাহা অন্য প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে।]

দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্র।

১

দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট কিসে দূর হইতে পারে, তাহার সদুপায়-নির্দ্ধারণই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এই কষ্ট। মাসিক পত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। তথাপি কতকগুলি কথা সংক্ষেপে বলিলে, সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এই বিষয়ের আলোচনা সহজ হইতে পারে।

১। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খাদ্যাভাব উপস্থিত। ভারতবর্ষের খাদ্য সচরাচর তিন প্রকার। প্রধানতঃ—

১। খাদ্য শস্য, এবং দুগ্ধ।

২। বনজাত ফল মূল। ইহার অধিক ভাগ ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য বন্য ও পার্ব্বতীয় প্রদেশের অধিবাসিগণ আহার করে। বনের পশু পক্ষীও তাহাদিগের আহার্য্য।

৩। নদীর মৎস্য ও গৃহপালিত পশু পক্ষী।

খাদ্যাভাবের তিনটি কারণ প্রধান।

১। প্রাকৃতিক কারণ—যেমন অনাবৃষ্টি, কীট-পতঙ্গের দৌরাত্ম্য। জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস।

২। শ্রমের অপব্যয় ও শ্রমহীনতা, কিংবা আলস্য। যুক্ত পরিশ্রমই শ্রেষ্ঠ পরিশ্রম। রোগ শোকে ব্যক্তিগত শ্রমের হ্রাস হইয়া পড়ে। অন্ন উৎপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, অপদার্থ দ্রব্যের সৃষ্টি করিলে, শ্রমের অপব্যয় করা হয়।

৩। খাদ্য-সঞ্চয়ের অভাব।

সুতরাং খাদ্যসংগ্রহ করিবার তিনটিমাত্র উপায়।—

১। প্রাকৃতিক কিংবা দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান। যেমন, বন-সংরক্ষণ, মৎস্য ও পশু পক্ষীর পালন, কূপ ও জলাশয়ের অনুষ্ঠান, গোজাতির সংরক্ষণ। ইহাতে যুক্ত পরিশ্রম আবশ্যক। পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বত্বের দিকে দৃষ্টি পড়িলে, যুক্ত পরিশ্রমের চেষ্টা থাকে না। আর একটা কথা। খনিজ

পদার্থ, জলাশয়, বন উপবন, গোচারণের মাঠ প্রভৃতির উপর সাধারণের স্বত্ব থাকা প্রয়োজনীয়। নচেৎ কায়িক কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারাই হউক, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কারবার অনুষ্ঠিত হইলে, দরিদ্রের কোনও সুবিধা হয় না।

২। কাল্পনিক অভাব হইতে নিবৃত্তি। অভাব বাড়িয়া গেলে ক্রমশঃই দারিদ্র্যের ভাব মনে আসে। ব্যক্তিগত অবস্থার তুলনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে আক্রোশের ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। প্রীতি, সখ্য ও ঈশ্বরভক্তি না হইলে কাল্পনিক অভাবের হ্রাস হয় না, নতুবা যুক্ত কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভক্তি ও যুক্ত কর্ম্ম, পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। বাসনা, মানবকে ক্রমে অত্যন্ত প্রবৃত্তির পথে লইয়া যায়, কিন্তু আদর্শ পথ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যগামী। ধর্ম্ম সেই পথে বিকাশ পাইয়া, যুক্তপরিশ্রমকেই মূলধন-রূপে পরিণত করে, এবং তাহা হইতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

৩। সঞ্চয়শীলতা।

অন্ন সঞ্চয় করিয়া রাখাই প্রধান উপায়। অন্ন বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলে, সে টাকার অপব্যয় অত্যন্ত সম্ভব। যাহাদের নিকট আমরা শস্য বিক্রয় করি, তাহারাও অনেক কারণে দর বাড়াইয়া দেয়, কিংবা লাভের আশায় হস্তান্তর করে। সুতরাং, অবশেষে হয় ত টাকা দিলেও অন্ন পাওয়া যায় না, কিংবা আবার ক্রয় করিতে অনেক টাকার দরকার হয়।

কাল্পনিক অভাব বাড়িয়া গেলে দারিদ্র্যের কষ্ট গুরুতর হইয়া পড়ে। দারিদ্র্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। পূর্ব্ব কালে, সামান্য বাসস্থান ও মোটা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান থাকিলেই আমরা আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতাম। পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আমাদিগের কাল্পনিক অভাব বাড়িয়া গিয়াছে, এখন আমরা পরস্পরের 'সমৃদ্ধি'র তুলনা করি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে. সকল দেশের অন্নবস্ত্রের ও গৃহের আদর্শ এক প্রকার হয় না। শীতপ্রধান দেশে যাহা দরকার, আমাদের তাহা নয়। আবার, সহরের পত্তন, রেল ও কলকারখানার আড়ম্বর, বিলাস-দ্রব্যের স্তূপ, এমারত ও প্রাসাদ, বেশভূষার ছটা ও বারনারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি ও মাদক-দ্রব্য-সেবন, ইহাই যে বাস্তবিক 'সমৃদ্ধি'র চিহ্ন, তাহা নহে। আমেরিকা, চীন, ইংলণ্ড ও অনেক প্রদেশই এই সকল আদর্শ অবলম্বন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ঘোরতর দারিদ্র্যের সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কি স্বাধীন, কি পরাধীন, সকল দেশেই এই ব্যাপার। সুতরাং অন্য দেশের

সমৃদ্ধির তুলনায় ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের নির্দ্ধারণ করিতে বসিলে আমরা ভ্রমে পতিত হইব।

দেশের উপযোগী অন্ন-বস্ত্রের উদ্ভব মানবের যুক্তপরিশ্রম দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহারই অভাব মনীষিগণের মতে দারিদ্র্য বলিয়া অভিহিত। তাহার অধিক অভাবের সৃষ্টি করিলেই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সুনিশ্চিত। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই যে উর্ব্বর, তাহা নহে। এক প্রদেশের অধিবাসিগণের অভাব তাহারা অন্য প্রদেশের অন্ন দ্বারা নানা উপায়ে মিটাইয়া লয়। তাহার প্রণালী কি, তাহা বিশেষরূপে না বুঝিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, এক প্রদেশ অন্য প্রদেশকে অযথা 'শোষণ' করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা বিদেশী বাণিজ্য-প্রথারও দোষ দিয়া থাকি। কিন্তু দারিদ্র্যের যথার্থ কারণ কি, তাহা সবিচারসাপেক্ষ।

১

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত, অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় কি, এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে জৈবনিক সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। পরে আমরা উপজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৩ কোটী। তাহার মধ্যে—

১। শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ১৭ কোটী, চাষী ও তাহাদিগের মজুর। চাষীদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী। (ক) যাহারা দরিদ্র, অর্থাৎ নিজেই পরিশ্রম করিয়া চাষ করে। সাধারণতঃ এই শ্রেণী বাৎসরিক দশ টাকার কম খাজনা দেয়। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। ইহারা সুবৎসরে খাইতে পায়, দুর্বৎসরে ঋণগ্রস্ত হয়, মরিয়া যায়, কিংবা চা-বাগান প্রভৃতিতে গিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে। (খ) যাহাদের অবস্থা ভাল, এবং যাহারা মজুর খাটায়।

২। শতকরা ১ ভাগ, অর্থাৎ ৪০ লক্ষ, ভূস্বামী ও তাহাদিগের অনুচর ও কর্ম্মচারিবর্গ।

৩। শতকরা ২ ভাগ, অর্থাৎ ৮০ লক্ষ গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী, সৈন্য ও পুলিস, এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ।

৪। শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ ৫ কোটী ব্যবসাদার, দোকানদার, শিল্পী, কলকারখানা ও খনির লোক, এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ ও মজুর।

৫। শতকরা ২ ভাগ, অর্থাৎ ৮০ লক্ষ ডাক্তার, উকীল ও অন্যান্য স্বাধীন বৃত্তি যাহাদিগের অবলম্বন, এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ।

এই বিপুল লোকসংখ্যা কেবল ভারতবর্ষজাত শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য আহার করিয়া জীবনধারণ করে। পূর্ব্বসঞ্চিত কোনও ধন সম্পত্তি থাকিলেও, কিংবা স্বদেশজাত কোনও খনিজ কিংবা অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিলেও, এখন আর অন্য দেশে খাদ্যশস্য মিলিবে না; কারণ, সর্ব্ব স্থানেই খাদ্যের অভাব। সুতরাং এই খাদ্যশস্য চাষীদিগকে চাষ করিয়াই সকলের জন্য যোগাইতে হইবে। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে ১৭ কোটী চাষীর পক্ষে ২৩ কোটী লোকের খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ১৭ কোটীর মধ্যে ৫ কোটী চাষী খুব সামান্য পরিশ্রমই করে। কিংবা খাদ্য-শস্যের চাষ না করিয়া অন্যান্য ভূমিজাত দ্রব্য—যেমন পাট, তুলা, চা, তামাক প্রভৃতির চাষ করে। বাকি ১২ কোটীর মধ্যে ৮ কোটী স্ত্রীলোক ও বালক। ফলে, ৪ কোটী শ্রমজীবী পুরুষ চাষীই ২৩ কোটী লোকের খাদ্যশস্য চাষ করে। ভারতবর্ষে এখন রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, এবং গ্রামে বাস করা যেরূপ কষ্টকর, তাহাতে তাহাদের পক্ষে এ পরিশ্রম দুঃসাধ্য। সুতরাং ব্যবসাদার ও কল-কারখানার মজুরের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, এবং খাদ্যশস্যের অনাটন হইতেছে। পাঁচ কোটী ব্যবসাদার ও মজুরের মধ্যে যদি এক কোটী পুরুষও আবার কৃষিকর্ম্মে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলেও অনেকটা রক্ষা হয়।

উপরোক্ত ১৭ কোটী চাষী, তাহাদিগের পরিশ্রমজাত শস্য কিংবা ভূমিজাত দ্রব্যের এক অংশ খায়, এবং বীজশস্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। এক অংশ ব্যবসাদারের নিকট বেচিয়া তাহারা বস্ত্র ও জীবনের উপযোগী দ্রব্য ক্রয় করে। আর এক অংশ বেচিয়া তাহারা ভূস্বামীকে নগদ টাকায় খাজনা দেয়।

ভূস্বামী যে টাকা খাজনা স্বরূপ পায়, এবং যে টাকা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন খনিজ পদার্থ ও জঙ্গল প্রভৃতি ব্যবসাদারকে বিক্রয় করিয়া পায়, তাহার এক অংশ রাজস্ব-স্বরূপ রাজাকে প্রদান করে। বাকি টাকা দিয়া ব্যবসাদারের নিকট খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে, এবং স্বীয় অনুচরবর্গ ও কর্ম্মচারিগণের ভরণপোষণ করে।

রাজস্ব ও অন্যান্য কতিপয় করের টাকা দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রতি-পালিত হয়। রাজ্য-রক্ষা, স্বত্ব-রক্ষা ও পাপের দমন তাহাদিগের কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য ও স্বত্বের রক্ষার্থ ডাক্তার ও উকীল প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়িগণ সর্ব্বশ্রেণীর নিকটেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের ও অনুচরবর্গের ভরণপোষণ করেন, এবং বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন।

এই কারবারের মধ্যে ব্যবসাদারের স্থান অত্যন্ত জটিল। বাস্তবিক পক্ষে দরিদ্র চাষী ও সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া সকল শ্রেণীর লোকই এক প্রকার ব্যবসাদার। তাহারা বহু উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া পরস্পরের সহিত আদান প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়ে, ঋণ-দানে ও ঋণ-গ্রহণে, এবং বিদেশের ও স্বদেশের বাণিজ্যে লাভ করিয়া মূলধন নামক অলীক পদার্থের সৃষ্টি করে। খাদ্যশস্যের অভাব হইলে, তাহার ফলে, সকল জিনিসই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে।

আপাততঃ কয়েকটী কথা মনে রাখিলেই চলিবে।

(১) ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বেশী বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু তাহার অনুপাতে খাদ্যের অনাটন হইয়াছে।

(২) রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী, কিন্তু সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সহজ ও সস্তা উপায় এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। খাদ্যাভাব প্রযুক্ত দরিদ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

(৩) ব্যবসার ও কলকারখানার ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া সমাজবন্ধন শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

(৪) ব্যক্তিগত স্বত্ব ও তাহার পৃষ্ঠপোষক আইন কানুন ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া যুক্ত পরিশ্রম, সখ্যতা ও প্রীতির উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে।

(৫) দরিদ্র চাষীর জীবন এত কষ্টকর হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য অতিশয় কম মনে করে। কিন্তু তাহা বাড়াইলে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও বস্ত্র প্রভৃতির মূল্য আরও বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং যাহাতে প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং সমাজের সর্ব্বসাধারণের হিতের উপযোগী পরিশ্রমগুলির মূল্য যথাসম্ভব নির্দ্ধারিত হয়, তাহারই উপায়-নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

এখন গোটাকতক অঙ্কপাতপূর্ব্বক এই কথাগুলি বুঝাইলে হয়।

৩

ভারতবর্ষের উপজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও তাহার মূল্য, আমদানী ও রপ্তানীর মূল্য, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর আয়-ব্যয়ের হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। দশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও ইদানীং মনস্বী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সকল হিসাব দিয়াছেন, তাহাই ও অন্যান্য বাৎসরিক রিপোর্টগুলি ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিম্নের অঙ্কপাত। মনে রাখা উচিত যে, মূল্যের হার ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং চাষীরা যে মূল্যে বিক্রয় করে, সে মূল্যের সহিত বাজারের দরের কোনও সম্বন্ধ নাই। অঙ্কগুলি বহু বৎসরের গড়পড়তায় খুব স্থূলভাবে দেখান হইয়াছে।

লোকসংখ্যা ২৩ কোটী।

	দ্রব্য	কোটী বিঘা	মণ (কোটী)	মূল্য কোটী টাকা	রপ্তানী (কোটী মণ)	রপ্তানীর মূল্য কোটী টাকা	মন্তব্য
খাদ্য শস্য	চাউল	১৮	৮০	৪০০	১½	৭	গত কয়েক বৎসর যুদ্ধের
	গোধূম	৬	২৫	২০০	৪	৩২	বিভ্রাটে ইহার অনেক
	ভুট্টা	১	৬	৩০ }	৩	১২	ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।
	বজরা, জোয়ার, ছোলা প্রভৃতি	২৪	৯৩	৩০০ }			
তৈল ও বস্ত্রোপযোগী	তৈলোপযোগী	৩	৬	৩৬	১	৬	গত কয়েক বৎসর প্রায়
	কার্পাস	৩½	১½	২৬	½	১০	ইহার অধিক ভাগই
	পাট	১½	৫	৩০	৩¾	২৫	রপ্তানী হইতেছে।
অন্যান্য	চা	⅓	¼	১০	×	৮	ভাল শস্য হইলে কার্পাস
	অন্যান্য ভূমিজাত ও অরণ্য	১২	×	২০	×	১৬	প্রায় ৩ কোটী মণ উৎপন্ন হয়।
	কয়লা ও খনিজ	×	৩২৪	১০০	×	২০	কাষ্ঠ, চর্ম্ম ইত্যাদি।
						১৩৬	

প্রত্যেক প্রদেশে চাষ কত, তাহার বিবরণ যদি কেহ দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বশেষে আর একটি তালিকা প্রদত্ত হইবে।

এখন দেখিতে হইবে—

খাদ্যশস্যের চাষ প্রায় ৫০ কোটী বিঘা, উপজাত শস্য ২০৪ কোটী মণ। তাহার মধ্যে প্রায় ৯ কোটী মণ রপ্তানী বাদ দিলে ১৯৫ কোটী মণ থাকে। ইহাই ২৩ কোটী লোকের আহার। অর্থাৎ, প্রত্যেক লোকের গড়ে প্রায় ৯ মণ বৎসরে, কিংবা দৈনিক ১ সের। কিন্তু ইহার মধ্যে বীজধান্য রাখিতে হয়, এবং কতকগুলি সৌখীন পশু পক্ষী, যেমন ঘোড়া, হাতী, উষ্ট্র প্রভৃতি অংশীদার। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক লোকের ½ সেরের বেশী জুটিয়া উঠে না। সুবৎসরে চলিয়া যায়, কিন্তু দুর্বৎসরে দরিদ্র চাষী ও মজুর মারা পড়ে। দেশে যদি প্রচুর খাদ্য না থাকে, তবে টাকা দিয়াও তাহাদিগের জীবনরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ বৎসর আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। যাহা কিছু ব্যবসাদারের হাতে থাকে, তাহার এত দর বাড়িয়া যায় যে,দরিদ্রের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব, এবং তাহাতে টানাটানি পড়িলে ধনী ও ব্যবসাদারের পক্ষে সঙ্কট। অন্য দেশ হইতেও পাওয়া যায় না। সুতরাং যে খাদ্যশস্য রপ্তানী হয়, তাহাতে ব্যবসাদারের যতই টাকা লাভ হউক না কেন, সেই রপ্তানীটুকু না করিলে অন্ততঃ কিছু অন্ন ঘরে থাকে। কিন্তু খাদ্যশস্য প্রচুরভাবে উৎপন্ন ও সঞ্চয় না করিলে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জীবনরক্ষা দুষ্কর।

কার্পাস ও পাট যাহা রপ্তানী হয়, তাহার মূল্য ৩৫ কোটী টাকা। ইহার লাভ ব্যবসাদারগণই পায়, এবং রপ্তানীর পরিবর্ত্তে বিদেশ-নির্ম্মিত বস্ত্র আসে। ঘরে থাকিলে কৃষকদিগের মোটা বস্ত্রের অভাব হইতে পারে না। তাহারা গবর্মেণ্টের সাহায্যে এখানেই তাঁতীর দ্বারা বস্ত্র বুনিবার বন্দোবস্ত করিতে পারে।

অন্যান্য ভূমিজাত দ্রব্যের উপর কৃষকের স্বত্ব নাই। তাহা বিক্রয় করিয়া ভূস্বামিগণ অট্টালিকা, রেলভ্রমণ এবং রেশমী ও পশমী বস্ত্র, জুতা ও বিলাস-দ্রব্যের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আমদানীর সহিত রপ্তানীর সম্বন্ধ নিম্নলিখিত ভাবে দেখান যাইতে পারে—

(যুদ্ধের পূর্ব্বে কতিপয় বৎসরের গড়ে)

রপ্তানী (যে মূল্য পাওয়া যায়)		আমদানী টাকা (যে মূল্য দিতে হয়)	
খাদ্যশস্য	৫০ কোটী টাকা	চিনি	১০ কোটী টাকা
তৈলোপযোগী শস্য, কার্পাস ও পাট	৪১ " "	কেরোসিন	৬
		কাপড়	৩৮
ভূমিজাত অন্যান্য ও		রেশমের ঐ	১½
আরণ্য এবং খনিজ	৪৪ " "	পশমের ঐ	২½
	১৩৫	খণ্ডবস্ত্র অন্য প্রকারের	১½
		জুতা	½
		তাম্রের বাসন প্রভৃতি	১½
		দেশলাই	১
		সাবান	½
		সুপারী	১
		লৌহের কল	৩
		ও অন্যান্য বিলাসের দ্রব্য	৪২
			১১০

আমদানী ও রপ্তানী সম্বন্ধে ইহা বলিয়া রাখা উচিত যে, ইহার লাভ লোক্‌সান ঠিক বুঝা যায় না। প্রথমতঃ, অনেক হাত দিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে চাষীর লাভ বড় কম। শস্যের দর বাড়াইয়া দিয়া তাহারা যাহা পায়, তাহা দ্বারা উচ্চশ্রেণীর চাষী কেবল কতকগুলি সখের দ্রব্য ও ধাতুময় বাসন ও গহনা সংগ্রহ করে।

চাষীদিগের একটা মোটামুটী হিসাব দেওয়া গেল।—

জমা—		খরচ—	টাকা (শস্য বেচিয়া)
খাদ্যশস্য	৯৩০ কোটী টাকা		
কার্পাস, পাট, প্রভৃতি	৯২	খাজনা	১৩৮ কোটী
	১০২২ "	লবণ	৪
			১৪২ "

জের জমা—১০২২ কোটী টাকা

বাদ খরচ—	৩৮৩
	৬৩৯ ”

[চাষীর সংখ্যা ১৭ কোটী; অর্থাৎ, প্রত্যেক চাষীর গড়পড়তা বৎসরে ৩৭৲ টাকা খাদ্যের জন্য থাকে। ৩৭৲ টাকায় বাৎসরিক ৬ মণ কিংবা দৈনিক প্রায় অর্দ্ধ সেরের কিছু উপর।]

জের খরচ—১৪২ কোটী

ষ্ট্যাম্প	৬
উকীল ও মোক্তার	৫
আবকারি	৫
চৌকিদারি ও অন্যান্য কর	২
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ	½
রেলওয়ে-ভ্রমণ	½
চিনি (বিদেশীয়)	৬
কেরোসিন তৈল	৪
বস্ত্র	৩০
তাম্র ও লৌহদ্রব্য	৪
সুপারী	১
(বীজধান্য প্রভৃতি)	১৭০
	(ঘরের শস্য)
স্বাস্থ্যরক্ষা ও ডাক্তার	৫
শিক্ষা	১
অন্যান্য ব্যয়	১
	৩৮৩

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনিকলিপি।

দুই তিন মিনিট ধরিয়া জার্ম্মাণ ও ফরাসী উড়ো জাহাজ ধীরে ধীরে একটী চক্র দিল। ইহারা যে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ মনে হইল না। একটী অপরটীকে আক্রমণ করিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে যখন এই আশঙ্কা হইতেছে, হঠাৎ তখন একটী উড়ো কল নীচের দিকে মুখ করিয়া দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়টী ইহার অনুসরণ করিল। তাহার পশ্চাতে তৃতীয়টী আসিল। এ সব ঘটিতে এক সেকেণ্ডের বেশী লাগিল না। জার্ম্মণ কল প্রথমে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। আকাশে যেখানে তাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, সেই line of attack তিন সেকেণ্ড ধরিয়া Machine gunএর গোলাগুলি ছোড়ায়, ধূম্রাকৃতি ধারণ

করিল। ক্রমে তাহারা এক লাইনে এত কাছাকাছি আসিল যে, মনে হইল, তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ইহার পর এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি একটা ফাটার শব্দ শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীর যে কলটী প্রথমে অনুসরণ করে, তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে নামিতে লাগিল, আর দুটী কল আহত অবস্থায় ফরাসী উড়ো কলটীর মরণের সাথী হইতে চলিল। মোট কথা, যুদ্ধে কেহ কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিল না। এক জন নাবিক তাহার আগুনধরা উড়ো জাহাজ হইতে শূন্যে লাফাইয়া পড়িতেছে, দেখা গেল। পদাতি সৈন্যের খাতে পড়ায় তাহার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

১৮ই জুলাই।—সকাল হওয়া সত্বেও আমাদের উঠিতে বেলা হইল। কিছু দূরের কামানের গর্জ্জন সহজে আমাদের জাগাইতে পারে না; অভ্যাস এমন হইয়াছে যে, কান এ সব শব্দ শুনিতে পায় না, এবং মন এ সব শব্দ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—কাজ করি, কিংবা বসিয়া থাকি, জার্ম্মাণ কামানের ধ্বনি দিনের যে কোনও সময়ে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। জার্ম্মাণ উড়ো জাহাজের গোঁ গোঁ শব্দ অস্ফুট হইলেও কানে আসিয়া পঁহুছায়, কিন্তু নিজেদের উড়ো জাহাজ মাথার উপর দিয়া আকাশ তোলপাড় করিয়া গেলেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আজ একটী সুড়ঙ্গে কাজ করিতে হইয়াছিল; ইহা ব্যাটারীর কামান হইতে গোলাগুলি প্রভৃতির মালগুদামে যাইবার জন্য মাটীর নীচে নির্ম্মিত একটী আবৃত পথ। সুড়ঙ্গটী ৭ গজ মাটীর নীচে; ইহার দেওয়ালে খাট, বিছানা ঝুলাইয়া রাখা যায়। দিনের পর দিন যখন গোলাগুলি বর্ষিত হইতে থাকে, তখন ইহার ভিতর এই খাটে ঘুমাইতে হয়। চারি জন লোক দুই বৎসর Mine করিলে এইরূপ একটী সুড়ঙ্গ তৈয়ারী করিতে পারে। ভিতরের হাওয়া এমন যে, নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। এ বাতাসে Carbon oxide, phosphoratted hydrogen, Dynamite ও Millenite হইতে উদ্ভূত গ্যাস; acetyline ল্যাম্পের গন্ধে ভিতরের হাওয়া দূষিত; কাজেই এখানে তিন ঘণ্টা কাজ করিয়া বাহিরে আসিলে বড় গরম বোধ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ মাথা ধরিল।

সন্ধ্যার সময় Meuse নদীর তটে ভীষণ আক্রমণের সূচনা হইল। শব্দের পর শব্দ তরঙ্গায়িত হইয়া অনন্ত কোটী বজ্রধ্বনির সৃষ্টি করিল। সেখানে কিছু একটা হইতেছে বুঝিতে পারিয়া আমরা সজাগ হইয়া ঘুমাইতে লাগিলাম।

শয্যায় শুইয়া আছি, দুই ঘণ্টাও হইবে না, এমন সময়ে ঘণ্টা শোনা গেল; তাড়াতাড়ি উঠিতে হইল—বুটের ভিতর পা ভরিয়া দিলাম, এবং কোনও মতে নীল Pant পরিয়া এক হাতে Mask ও আর এক হাতে Helmet লইয়া Dugout হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পর মুহূর্ত্তে সবুজ জাল সরাইয়া কামানগুলির উপর যন্ত্রাদি বসাইয়া যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী করা হইল। চাতালে (Platformএ) Shell, fuse, detonater ইত্যাদি জড় করা হইল। 'খ' চিহ্নিত স্থানে আমাদিগকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি Chart দেখিয়া mark করা হইল; নির্দ্দেশমত shellএ বিশিষ্ট ফিউজ দিলাম। ২৷৩ মিনিটের মধ্যে একটী ৭৫ মিঃ-মিঃ কামানের কড় কড় ধ্বনিতে গভীর নীরবতা ভঙ্গ হইল,—পর মুহূর্ত্তে সহস্র কামান—শত্রুর পরিখা ও ব্যাটারীর উপর ভীষণ অগ্নি বর্ষণ করিল; গোলার পর গোলা ছুটিল; Torpedo ফাটিল; এবং Fuseএর নানা রঙ্গে আকাশ রঙ্গিয়া উঠিল। এক ঘণ্টা পরে আমরা আক্রমণ বন্ধ করিবার আদেশ পাইলাম,—শব্দগুলি তখন একটীর পর আর একটী করিয়া যেন আকাশে মিশিয়া গেল। যে আসল জায়গায় শত্রু আমাদের প্রতিরোধ করিতেছিল, সে স্থান হইতে শত্রুর দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য অন্য জায়গায় এমনতর আক্রমণ করা হয়।

২০শে জুলাই।—আমাদের প্রত্যেককে এখন পাঁচ দিনের জন্য ৬০০ গ্রাম তামাক, দুই সপ্তাহের জন্য একটী বাতি নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। দুই ঘণ্টা মাত্র কাজ করিয়াছি, এমন সময় মাথার উপর ভুম্ ও হিস্ শব্দ শোনা গেল। একটী খাত তৈয়ারী হইতেছিল, তার দেওয়ালে ঠেসান দিয়া সতর্কিতভাবে উৎকর্ণ হইলাম—একটী গোলা (Shell) মাথার উপর দিয়া ২০০ গজ পিছনে মাটীতে পড়িল—আমাদের দিকেই ইহা ছোড়া হইয়াছিল, কিন্তু পড়িল কিছু দূরে। আধ সেকেণ্ড পরে আবার দম্ শব্দ—গোলা ঠিক কোন্ স্থানে পড়ে দেখিবার জন্য মাথায় Helmet পরিয়া হাতে Mask লইয়া তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলাম। প্রত্যেক বার আমাদের লক্ষ্য করিয়া এ সব ছোড়া হইতেছিল। গোলা ফাটিয়া গর্ত্ত করিয়া চারি দিকে মাটী ছড়াইবামাত্র আমি বলিলাম, 'সুড়ঙ্গে চল', এবং কামানটীর দিকে ছুটিলাম। ঠিক সেই সময়ে একটী গোলা আমাদের উপর দিয়া গিয়া উঁচু তাগাড়ের কিছু দূরে ফাটিল। আর গোটাকয়েক গোলাগুলি ছোড়ার পর এ গোলাবৃষ্টি থামিল। কাজ করিতে পুনরায় বাহিরে আসিতে হইল। খুব সতর্ক রহিলাম; কারণ, জানিতাম,

তখনও আক্রমণ শেষ হয় নাই; হিস্ শব্দ শুনিবামাত্র সুড়ঙ্গের ভিতর আশ্রয় লইতে হইবে। গাঁতিটী রাখিয়া দুই এক মিনিট বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি, এমন সময় আকাশে একটী গোলার গগনভেদী গর্জ্জন,—যেখানে খাটিতেছিলাম, সেখান হইতে দশ হাত দূরে পড়িয়া গোলাটী ফাটিল; এরূপ দ্বিতীয় গোলা ফাটিবার পূর্ব্বে আমরা সুড়ঙ্গে উপস্থিত। একে একে প্রায় কুড়িটী গোলা এইরূপে ছোড়া হইল। ইহাদের উদ্দেশ্য, কেমন করিয়া কামান ছুড়িলে ঠিক জায়গায় লাগে, তাহাই দেখা। গোলা ছোড়ার ভাবগতিক হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, শত্রু আমাদের ব্যাটারী দেখিতে পাইয়াছে।

২১শে জুলাই।—দুই দিন ধরিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জর্ম্মণ ও ফরাসী উড়ো কল সদলে চারি ধারের জমীর ফটো লইতেছিল। Anti-aviation gun তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিময় শেল বৃষ্টি করিতে লাগিল। নাবিকেরা উড়ো কল লইয়া মেঘের আড়ালে আড়ালে ঘুরিতেছিল, এবং একটী মেঘখণ্ড হইতে আর একটীতে যাইবার সময় নিজেদের কাজ সারিতেছিল। আমেরিকান কল একটু বিচিত্র—সামনে একটী নল নীচু দিকে মুখ করিয়া আছে, ঠিক মশার হুলের মত; বোমা ফেলিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এরূপে নির্ম্মিত। ফরাসীদের পিছনে আপনাদের কল লইয়া উড়িয়া আমেরিকানরা এক এক স্থানের দৃশ্যগুলি কিরূপ, এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন কি কি, এই সকল বিষয়ে ফরাসীদের অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিতেছিল—মুরগীর পিছনে যেন সব ছানা ছুটিতেছে!

রাত্রে সাত গাড়ী গোলাগুলি আমাদের ব্যাটারীর নিকট উপস্থিত। মাল খালাস করিতে গেলাম; এমন সময় শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য ঘণ্টার শব্দ করিয়া আমাদিগকে ডাকা হইল। গাড়ীর প্রহরীরা অগ্নিবৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গাড়ীগুলি লইয়া দূরে সরিয়া গেল। আকাশ আলোকিত করিয়া জার্ম্মাণের দ্বিতীয় লাইনে বেশ করিয়া গোলাগুলি ছোড়া হইল। ক্রমে শেষ বোমাটীর শব্দ আকাশে মিশিয়া গেল। এমন হঠাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্য, শত্রু কতখানি সতর্ক, তাহা দেখা। পুনরায় কাজে ফিরিয়া গাড়ী হইতে গোলাগুলি নামাইয়া লইলাম। তার পরেই নিদ্রা।

৩রা অগষ্ট।—আমাদের জরীপ করা জায়গার মধ্যে থাকিয়া বিপদের সময় যাহাতে রাত্রে গোলাগুলি ছোড়া যায়, সে জন্য আজ সব কামান [illegible] করিয়া যথাযোগ্য স্থানে রাখা হইল। আগে যে স্থানে কামান থাকিত, তাহ

লক্ষ্য করিয়া এই সব নূতন chart করা হইল; কারণ, আক্রমণের সময় কিছু ভাবিবার বা চাহিবার উপায় নাই। আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জরীপ করিয়াছিলাম—প্রায় বারো কিলোমিটার পরিমিত বিস্তৃত স্থান। এ জায়গায় কোন্‌খানে কত angle করিয়া কোন্ দিকে ছুড়িলে লক্ষ্য অব্যর্থ, তাহা উড়ো জাহাজের নাবিকের সাহায্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ঠিক করা ছিল; কাজেই যে স্থানে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা চিহ্নিত করিয়া দিলেই ব্যাটারীর অধ্যক্ষের কাজের শেষ। সারা খাতটা A হইতে X পর্য্যন্ত অক্ষরে চিহ্নিত, এবং কোন্ চিহ্নিত স্থানে আক্রমণ করিতে কোন্ দিকে কত angle করিয়া কিরূপ Shell ব্যবহৃত হইবে কোন্ রকম Fuse কতখানি ফলপ্রদ, এমন কি, কি ওজনের গুলি বারুদ ইত্যাদির প্রয়োজন, তাহা সমস্তই Chartএ লিখিত। শত্রুর কামান ছোড়া বন্ধ করিবার জন্য কেমন ভাবে, কত কত, কি কি ছুড়িতে হইবে, কিংবা শত্রুর ভীষণ আক্রমণ কি ভাবে উল্টা আক্রমণ করিলে ব্যর্থ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কাগজে কলমে সব বলিয়া দেওয়া আছে; কারণ, শত্রুর ব্যাটারী ধ্বংস করিতে হইলে যাহা Batteryকে রক্ষা করে, তাহার উপর নজর দিতে হয়, এবং আক্রমণসময়ে শত্রু যাহাতে উল্টা আক্রমণ করিতে না পারে, সে জন্য Shropnell কিংবা লাল রঙ্গের Instantaneous Fuse লাগান D. Shell ছোড়া হয়।

১৪ই অগষ্ট।—গত কল্য মধ্যরাত্র হইতে ভার্দ্দনের সামনে ভীষণ আক্রমণের সূচনা হইয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে এই প্রসিদ্ধ নগর হইতে আরম্ভ করিয়া আরগন (Argon) পর্য্যন্ত সব স্থান ব্যাপিয়া যুদ্ধ বাধিল। 2nd. Armyতে আর পাঁচটা Army corps যোগ করিয়া দেওয়া হইল। সারা দিন ধরিয়া গোলাগুলি বর্ষণ —যেটুকু ক্ষণ বন্ধ না রাখিলেই নয়, ঠিক ততটুকু ক্ষণ বন্ধ রাখা হইল; এবং নিজেদের দারুণ ক্লান্তি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে আঙ্গুরের লাল রস পান করিতে লাগিলাম। খাত হইতে বাহির হইবার সময় একটা হিস্ শব্দ শুনিয়া থমকিয়া গেলাম; প্রথমে ঠিক করিতে পারি নাই, ইহা কি; উপরে চাহিয়া দেখি, এক শত গজ দূরে কাল মেঘের মত কি একটা অস্পষ্ট জিনিস। যেমন দেখা, অমনই খাতের ভিতর লাফাইয়া প্রবেশ! ঠিক সেই সময় ভীষণ কড় কড় শব্দ হইল, গোলা ফাটিয়া কুচি লাগিয়া জামার ছেঁদা হইয়া গেল। এরূপ ছুড়িবার অভিপ্রায়, আমাদিগকে বিধ্বস্ত করা—যাহাতে আমরা আর গোলা ছুড়িতে না পারি। আমাদের

ব্যাটারীর উপর শত্রুর আক্রমণ থামিল না—গোলা গুলি রাখিবার স্থান, গ্রাম ও নগরের হাট বাজার, কিছুই বাদ গেল না। দূরে দূরে নগর-আক্রমণেও শত্রুর বিরতি নাই। তাহাদের কামানের প্রত্যুত্তরে আমাদের গোলা-বর্ষণে বিশেষ কোনও লাভ হইল না। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া Marine guns আনিয়া শত্রু পদাতি সৈন্যের লাইনে বসাইয়া ছিল; এ সব কামান বহু দূরের লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে; ইহার অব্যর্থ সন্ধান চারি দিকে মৃত্যুবাণ ছড়াইতে লাগিল। আমাদের অনুমান যে সত্য, উড়ো জাহাজের নাবিকেরা নির্ব্বিঘ্নে যে সব ফটো লইয়াছিল, তাহা হইতে জানা গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যে সব নগরে আমাদের বিশ্রামের দিনগুলি সুখে কাটিয়াছিল, সে স্থানের শিশুর সরল মুখ ও রমণীর সুন্দর কান্তি স্মরণ করিয়া আমরা আজিকার কাজে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

১৫ই অগষ্ট।—একটী ব্যাটারীর আশপাশ কেমন ভাবে তৈয়ার হইলে যুদ্ধের উপযোগী হইতে পারে, এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট তাহা বুঝাইতেছিলেন ;—

যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে কিছুদিন ধরিয়া এগোন পিছান হয় নাই, সেখানে একটী ব্যাটারী চৌষট্টি গজ বিস্তৃত ; তাহাতে সাধারণতঃ চারিটী কামান থাকে, তাহা যদি ঠিক মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে চারিটী কামানের ত্রিশ জন লোকের জন্য চারিটী মাটীর নীচের ঘরের (Dugout) প্রয়োজন ; এই চারিটী হইবে কামানের সামনে। আর পিছনে Sub-officerএর জন্য একটী, C. O.র জন্য একটী, এবং Telephone ও wirelessএর জন্য একটী। যন্ত্রপাতির জন্য দুইটী কামানের সামনে ও দুইটী পিছনে, আর বারুদের জন্য দুই পাশে দুইটী ঘর। ব্যাটারীর ১০০ মিঃ পিছনে আর একটী Dugout—গ্যাস-উৎপাদনকারী গোলা, বিস্ফোরক, এবং Mine করিবার যন্ত্র সকল একটু দূরে রাখিবার জন্য। প্রথম কামানের নিকট আট গজ নীচু একটী সুড়ঙ্গ, চতুর্থ কামানের কাছেও ওই রকম আর একটী খাত, এবং যে সব Dugoutএর কথা বলা হইল, সেগুলি এবং ২য় ও ৩য় কামান ১ম ও ৪র্থ কামানের সহিত খাত কাটিয়া যোগ করা—এই খাত গমনাগমনের পথ ; গাছের ডাল পালার উপর একটু আধটু মাটী রাখিয়া পরিখার উপরে আড়াল দেওয়া হয়। ছটকা টুকরার আঘাত হইতে রক্ষা করিতে ইহা যথেষ্ট। উঁচু মাটীর স্তূপ কিংবা আত্মরক্ষার অন্য কিছু উপায় করা হয় না। কামানের কাছে ছোট Magazine মাটীর নীচে থাকে ; তাহার উপর একটী concrete করা ছাদ করিয়া দেওয়া

হয়। ব্যাটারীর দুই ধারে দুইটী রান্না ঘর, এবং সামনে ও পিছনে দুইটী শৌচাগার।

১৭ই অগষ্ট।—আমরা যে স্থানে ছিলাম, সে জায়গায় রাত তিনটা হইতে আবার যুদ্ধ বাধিয়াছে। ২৪mএর বদলে এ স্থানের নাম এখন ১৩০। উড়ো জাহাজের সাহায্য পাইয়া শত্রু যেখানে যেখানে আগাইয়া আসিয়াছে, সেখানে কামান দাগিলাম; পদাতি সৈন্যের আক্রমণের সুবিধা করিয়া দিতে উড়ো জাহাজ সদলে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; নামিবার সময় এই সব Aeroplane মাটীর ঊর্দ্ধে দশ গজ পর্য্যন্ত আসিয়া পদাতি সৈন্যসজ্ঘ বিধ্বস্ত করিয়া আবার আকাশে উঠিল। সন্ধ্যা তখন ছয়টা। আমাদের বলা হইল, ব্যাটারী লইয়া যাইতে হইবে; গন্তব্য স্থান কেহ জানিল না। প্রলয়ের সময় মহেশ্বর সব সংহরণ করেন। আমাদের জিনিসপত্র আমরাও সেই ভাবে এক জায়গায় করিলাম। তার পর রাত দশটা পর্য্যন্ত খালি খাটে ঘুম। Hill ৩০৭এ সৈন্য সংখ্যা বাড়াইতে C. O. আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিয়া গেলেন। আমাদের ঘরকন্না সব পিঠের উপর লইয়া C. O.র নিকট বিদায় লইলাম; বন জঙ্গল ও কাঁটার উপর দিয়া চলিলাম, যাহাতে সোজা পথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে একটী বাগানের কাছে উপস্থিত—একটী ছোট কুটীর,—সৈন্যদের মদের দোকান, দেখিতে বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। একটী শান্ত বালিকা যুদ্ধের বর্ব্বরতা উপেক্ষা করিয়া, সুন্দর মুখের মধুর হাসি হাসিয়া সৈন্যদিগকে এক এক গেলাস লাল আঙ্গুর-রস দিবার জন্য দোকান খুলিয়াছিল। সৈন্যদের কাছে বালিকার নামেই দোকানটী পরিচিত।

অসংখ্য Fuse ও Projecterএর আলোকে আকাশ উজ্জ্বল—অন্ধকার নাশ করিয়া একটীর পর আর একটী হাউই ছুটিল—আলোকমালায় গিরিগাত্র বিভাসিত—কালীপূজার রাত্রির দীপালোক মনে পড়িল। চাকা ও শিকলের শব্দ শোনা গেল। প্রথমে দেখি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আটটী ঘোড়া আসিতেছে। ইহার পিছনে আর কতকগুলি। এমনই অসংখ্য ঘোড়া দেখা গেল। কামান সব ছিল দুইটী সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে, এবং যুদ্ধের সরঞ্জামের জিনিসগুলি ছিল পিছনে পিছনে। Shell, বারুদ, Detonater ও রসদখানার অন্যান্য দ্রব্যে গাড়ীগুলি পূর্ণ। আমাদের অস্ত্র শস্ত্র, জিনিসপত্র, সামনে যে সব গাড়ী ছিল, তাহাতে দেওয়া হইল। প্রত্যেক ব্যাটারীতে চারিটী করিয়া বড় বড়

কামান, ১১০ মিঃ মিঃ ও ১৫৫ মিঃ মিঃ করিয়া কামানের গর্ত্ত, আটটী গাড়ী লইয়া দুইটী ট্রেণ—সর্ব্বসমেত দলটী (Battery) পাঁচ শত গজ লম্বা। রাত্রি অন্ধকার—বেশ কুয়াশা রহিয়াছে; দেশলাই জ্বালিতে কিংবা ধূমপান করিতে আমাদের বারণ করিয়া দেওয়া হয়। কোনরূপ আলো জ্বালাও সম্ভবপর নয়। কারণ, কোনও যুদ্ধের গাড়ীতে আলো থাকে না। ঘোড়ায় পিঠে, গরুর গাড়ীতে, কিংবা কামানের গাড়ীতে সৈন্যরা সকলেই কোনও রকমে সুবিধা করিয়া লইয়াছে। পাহাড়ের গা দিয়া নামিবার সময় গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে চাকার শব্দ, চেনের শব্দ হইতেছে—আমরা অতীতের কথা ভাবিলাম; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও সে যুগে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্নিগ্ধ রজনীতে অসংখ্য গাড়ী লইয়া, কামান টানিতে বলদ লাগাইয়া দিয়া কিরূপে তাঁহারা রণ-যাত্রা করিয়াছিলেন, একে একে তাহা মনে পড়িল—মাড়বারের কথা, শিবাজীর গৌরবের দিন, তার সঙ্গে প্রতাপাদিত্য, সিরাজ, মীর কাশেম, একে একে সব স্মরণ হইল। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রায় ও শাস্ত্রী ভারতের সে গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন,—তার এক একটী জলন্ত পৃষ্ঠা কে আমার চক্ষুর সামনে খুলিয়া ধরিল। ঐতিহাসিক বীরদিগের স্মৃতি, অতীত যুগের কত সুন্দর মুখ স্মরণ করাইয়া দিল; ইঁহাদের জীবনের কথা বিচিত্র হইলেও বাস্তব। আঁকা বাঁকা ঘোরান পথ দিয়া যাইতে যাইতে কল্পনায় গা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হইলেও আমাদের থামিবার স্থান আসিল—কারণ, তখন ঘুমাইবার সময়। আমরা বড় একটা কল্পনাপ্রিয় নহি; এমন গা-ঢালার ধার ধারি না। বড় ঠাণ্ডা, পা কন্ কন্ করিয়া উঠিতেছে। লাইনের কাছাকাছি থাকিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথের ডান দিকে নূতন করিয়া সবুজ জাল টাঙ্গান—শত্রু যাহাতে আমাদের সহজে দেখিতে না পায়। সারা রাত ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলাম—কেবল তিন ঘণ্টা অন্তর ঘোড়াগুলিকে একটু বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইতেছে। প্রাতে চক্ষু মেলিয়া দেখি, প্রায় সব সৈন্য শীতের ভয়ে দ্রুত হাঁটিয়াছে—আর এখানে বাদাম, ওখানে আপেল পাড়িতেছে। আমরা চক্ষু খুলিলাম না, কারণ আমরা একটী গভীর বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সেখানে দেখিবার কিছুই নাই।

বেলা আটটার সময় 'নিগ্রো গাঁ' বলিয়া একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামের ফটকে দুইটী কিম্ভুতাকার আমেরিকান নিগ্রোর কাল ছবি ঝুলান—তাহারা আমাদের প্রথম সম্ভাষণ করিল। কফি, এক টুকরা রুটী ও কিছু

সার্দিন মাছ খাইয়া কাম্পে গেলাম। আধ মিঃ চওড়া রেলওয়ে দ্বারা স্থানটী আচ্ছন্ন। একটী যন্ত্র (Drelick) দিয়া কামান সব নামাইয়া, এবং গাড়ীগুলি খালি করিয়া দিয়া, এ সব জিনিস ট্রলিতে তুলিয়া দেওয়া হইল— গড়ানে পথ পাইয়া ট্রলি অবাধে রাস্তা ধরিয়া চলিল।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে, যেখানে ব্যাটারী স্থাপিত হইবে, সেখানে পঁহুছিলাম। একটি উঁচু পথের ধারে বনের নিকট কাঠ ও পাথর দিয়া চারিটী চৌকা চাতাল করা হইল। দুই চাতালের মধ্যে ষোল গজ পরিমিত স্থানের ব্যবধান। ইহার সামনে গাছের ডালপালা পুতিয়া আড়াল দেওয়া হইল। Installed position যেমন সুখদায়ক ও নিরাপদ, ইহা তেমন হইল না। আগাইবার বা পিছাইবার সময় যেমন ভাবে ব্যাটারী সাজাইবার ব্যবস্থা করা হয়, ইহাও তেমনিতর এক ব্যবস্থা। কামান সব নামাইয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এক দিকে খাওয়া, শোয়া, আগুন করা, রান্না করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল, অপর দিকে Magazineএ গোলা ভরা, বারুদ আনা, যন্ত্রপাতি রাখিবার কুলঙ্গি খোঁড়া, চাকায় Caterpillar লাগান, ব্রেক ফিট করা, গনোমিটার বসাইবার জন্য horizontal রুল বসান ও টেলিফোন ফিট করা হইল। সকাল দশটার সময় Regaling আরম্ভ হইল। হঠাৎ জর্ম্মণ উড়ো জাহাজ আসিয়া পড়ায় আমাদের থামিতে হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

বাঁশের চাষ।

যাঁহারা বাঁশের চাষ করেন, তাঁহারা বাঁশের কলম (Cutting) হইতেই ঝাড় জন্মাইয়া থাকেন।

কলম বর্ষার প্রারম্ভেই করা উচিত। ইহাতে সুবিধা এই যে, সারা বর্ষায় প্রচুরপরিমাণে জল পাইয়া উহা ভালরূপে লাগিয়া যায়।

কলম হইতে ঝাড় জন্মাইতে হইলে, বর্ষার প্রারম্ভে একটী পূর্ণায়তন বাঁশের (Old shoot) গোড়ার দিক হইতে ৪।৫ ফুট কাটিয়া লইয়া তাহার মূল ও তৎসংলগ্ন একটী মোটা মূল (Rhizome) খুব সাবধানে তুলিয়া লইতে হয়। তৎপরে সেই কর্ত্তিত অংশ যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়। বৃষ্টির

দিনে এইরূপে কলম কাটিয়া রোপণ করাই বিধেয়। যে কয়েক দিন উক্ত কলমটী ভালরূপে লাগিয়া না যায়, বৃষ্টি না থাকিলে, সে কয়েক দিন উহাতে জল দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কলম লাগিয়া গেলে সেই অঙ্কুরোন্মুখ মোটা মূল হইতে নূতন ডগা বাহির হইবে।

বাঁশ আরও এক প্রকারে কলম করা যাইতে পারে।

'A cutting containing at least three nodes is cut from the lower end of a two years old culm, and placed standing in the ground with two nodes covered.'

দুই বৎসরের একটী বাঁশের ডগার নিম্নের দিক হইতে অন্ততঃ তিন গাঁট পর্য্যন্ত কাটিয়া লইয়া সেই কর্ত্তিত অংশের দুই গাঁট পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হইবে।

ইহাও বর্ষার মধ্যে করা উচিত। উপযুক্তপরিমাণ জল পাইয়া উক্ত রোপিত ডগার নিম্নের গাঁট হইতে ক্রমে অঙ্কুরের উদ্গম হইবে, এবং উপরের গাঁট হইতে ধীরে ধীরে ডাল পাতা জন্মিতে থাকিবে। (১)

বাঁশের কেবলমাত্র মোটা মূল (Rhizome) হইতে কলম হইতে পারে।

'Bamboos can also be raised from rhizome. A piece of rhizome with its shoot (which may if necessary, be slightly lopped to diminish transpiration) is separated from a young clump and planted horizontally about three inches below the ground in the spot required. New shoots will be sent up from the rhizome.'

বাঁশের একটী নূতন ঝাড় হইতে মোটা ফুলের সহিত একটী নূতন ডগা সাবধানে কাটিয়া আনিয়া, ইঞ্চি তিনেক মাটীর নীচে, উক্ত মোটা মূলটি সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া, উহা রোপণ করিতে হইবে। এই সময়ে বাঁশের ডগাটীর ডাল পাতাগুলি ছাঁটিয়া দেওয়া ভাল। এরূপ করিবার একটী বিশেষ কারণও আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গাছের পাতা বায়ু হইতে অঙ্গারজান লইয়া থাকে। কিন্তু উহা অঙ্গারজান লইলেও, উহার অগ্রভাগ দ্বারা বৃক্ষ হইতে জলীয় অংশ (Moisture) নির্গত করিয়া দেয়। (২) কোনও চারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়িয়া বুনিলে উহার মূলগুলি সদ্যঃ সদ্যঃ মাটী হইতে রস টানিয়া লইতে পারে না। স্থানান্তরিত করিবার ধাকাটী সামলাইয়া লইয়া চারা যখন

(১) 'New shoots are thrown out from the dormant buds and a crown of adventitious roots springs from the node underground.'

(২) Transpiration.

প্রকৃতিস্থ হয়, তখনই উহা মূল দ্বারা রস টানিতে পারে। কাজেই চারা স্থানান্তরিত করিলে পর, যত দিন উহা প্রকৃতিস্থ না হয়, তত দিন যদি উহার পত্র দ্বারা জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে উহা নিতান্ত দুর্ব্বল হইবে, এবং অবস্থা-বিপর্য্যয়ে হয়ত বা প্রকৃতিস্থ নাও হইতে পারে। চারা প্রকৃতিস্থ হইতে না পারিলে বাঁচিবে না।

পত্র না থাকিলে চারার জলীয় অংশ আর এরূপ ভাবে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মোটা মূল সহ বাঁশের গাছটী ঝাড় হইতে উঠাইয়া যখন অন্যত্র বোনা হইবে, তখন উহার ডাল পালা ছাঁটিয়া দিয়া পত্রাদি না রাখাই কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে উহার জলীয় ভাগ আর বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না, এবং স্থানান্তরিত করিবার চোট্ সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রকৃতিস্থ হওয়া পর্য্যন্ত উহা সরস থাকিবে। তার পর সেই মোটা মূলের সঞ্চিত খাদ্যপ্রভাবে ক্রমে উহা বাড়িতে থাকিবে।

যে স্থানে জল দাঁড়াইতে পারে না (well drained), সেরূপ স্থানে বাঁশ ভালরূপে জন্মিয়া থাকে। বাঁশ-বনে দেখা যায় যে, উচ্চ-ভূমিতে, পাহাড়ের উপর, কিংবা পাহাড়ের ঢালুতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে বাঁশ জন্মিয়া থাকে। সেরূপ স্থানে ছোট ছোট স্রোতস্বতীর দুই ধারেও খুব বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্নভূমি কিংবা স্রোতস্বতীর কূলে, যেখানে জল দাঁড়ায়, এমন স্থানে বাঁশ হয় না।

বাঁশ জন্মাইয়া তাহার ঝাড়টীকে ঠিক মত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে ঝাড়ের মধ্যে বাঁশ ঠাসাঠাসি হইয়া উহা বাঁকা, ছোট ও একটীর গায়ে আর একটী লাগিয়া গিয়া খারাপ হইয়া যায়।

বাঁশের ঝাড় ক্রমশঃ বাহিরের দিকে বাড়িতে থাকিলেও, উহার ভিতরেও কিছু কিছু বাঁশ জন্মিতে থাকে। যে জাতীয় বাঁশের মোটা মূলগুলি (Rhizome) ছোট হয়, সেই সমস্ত বাঁশই ঝাড়ের ভিতরের দিকে বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যে জায়গায় বাঁশ বোনা যায়, সে জায়গার মাটী যদি খুব শুষ্ক ও সারহীন হয়, তাহা হইলে সে জায়গার বাঁশগুলির মোটা মূল সাধারণতঃ ছোট হইয়া থাকে। প্রচুর খাদ্যাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। কাজেই সে জায়গার বাঁশগুলি কেবলই ভিতরের দিকে ঠাসাঠাসি হইতে থাকিবে, এবং ঝাড় বাহিরের দিকে তেমন ছড়াইয়া ভাল হইবে না।

এরূপ স্থলে বাহিরের দিকে কিছু কিছু বাঁশ জন্মিলেও, তাহা ক্রমশঃ হেলিয়া

পড়িয়া ভিতরের দিকে চলিয়া যায়, এবং অপর একটী বাঁশের উপর পড়িয়া উহাদের সমস্ত ডালপালা একত্র জড়াইয়া গিয়া ঝাড়টীকেই ক্রমে খারাপ করিয়া ফেলে। (১)

ঝাড়ে বাঁশ ঠাসাঠাসি হইলে তাহাতে আর ভাল বাঁশ জন্মে না। তখন সেই ঝাড়ের পাকা, বাঁকা বাঁশগুলি কাটিয়া ফেলিয়া ঝাড়টীকে পাতলা করিয়া দিতে হয়। মাটী শুষ্ক ও সারহীন হইলে এইরূপ ভাবে বাঁশ কাটিয়া ঝাড় পাতলা করার নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে খাদ্যাভাব প্রযুক্ত সেখানকার ঝাড় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঝাড় ছোট হইলে বাঁশ কাটার পর তাহাতে মাটী ফেলান যাইতে পারে। বাঁশের গোড়ায় উপযুক্ত-পরিমাণে মাটী দিতে পারিলে বাঁশ বেশ ভাল হয়। ঝাড়ের এক পাশ হইতে প্রণালীর মতন করিয়া মাটী কাটিয়া লইলে, বর্ষার জলও সেই পথে ভালরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে বাঁশের গোড়ায় মাটী ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার জল নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত হইয়া যায়।

বাঁশের চাষ খুব লাভজনক। ইহাতে সেরূপ কোনও খরচ নাই বলিলেই চলে। কিছু বেশী পরিমাণ জমীর উপর বাঁশ জন্মাইয়া, সেই জমী ২।৩ অংশে বিভক্ত করিয়া, এক এক অংশ হইতে এক এক বৎসর বাঁশ কাটিলে, বেশ লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভালরূপ বাঁশ জন্মিলে, এক একর জমীতে প্রায় ৫০০০ ডগা পাওয়া যায়। অবশ্য বাঁশের প্রকারভেদে ইহার কম বেশী হইয়া থাকে। ৫০০০ বাঁশের মধ্যে অন্ততঃ ২০০০ কাটা যাইতে পারে। আজ কাল বাঁশের যেরূপ দাম, তাহাতে ২০০০ বাঁশে মন্দ লাভ হইবার কথা নহে। তার পর একরূপ বিনা খরচেই এই লাভটা পাওয়া যায়।

বনবিজ্ঞানবিদেরা (২) বাঁশ কাটা সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মাবলী স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে বাঁশ কাটিলে ঝাড়ের কিছুমাত্র অপকার না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধি পাইবে।

---

(১) 'Even when the shoots are produced along the outside of the clump, they often tend to grow inwards towards the middle, and to get there entangled among the older culms ; this is due to the rhizome bending upwards which causes the stem growing out of its turned-up end to slope backwards towards the centre of the clump.'

(১) Sylviculturists.

তাঁহারা বলেন, এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর অন্তর ঝাড় হইতে বাঁশ কাটা উচিত। সেই জন্য বাঁশের ঝাড়টীকে দুই কিংবা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া উচিত। দুই বৎসর অন্তর বাঁশ কাটিতে হইলে, নিম্নলিখিত রূপে ঝাড়-টীকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

প্রথম বৎসর ক অংশ হইতে, দ্বিতীয় বৎসর খ অংশ হইতে, এবং তৃতীয় বর্ষে গ অংশ হইতে বাঁশ কাটিতে হইবে। চতুর্থ বৎসরে ক অংশ পুনরায় বাঁশ কাটার উপযুক্ত হইবে। এইরূপে ৫ম বৎসরে খ এবং ৬ষ্ঠ বৎসরে গ অংশ হইতে যথাক্রমে বাঁশ কাটা যাইতে পারিবে। এই নিয়মে প্রত্যেক অংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর কাটা চলিবে, এবং সেই সময়ে উহাতে প্রচুরপরিমাণে কর্ত্তনোপযোগী বাঁশ পাওয়া যাইবে।

যে ঝাড়ের বাঁশ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, সেই ঝাড় হইতে কখনও বাঁশ কাটা যাইতে পারে না। যাহাতে অন্ততঃ তিন বৎসর হইতে পূর্ণ মাপের বাঁশ জন্মি-তেছে, সেই ঝাড় হইতে বাঁশ কাটা যাইতে পারে। তিন বৎসরের না হইলে বাঁশ কখনও প্রকৃতপক্ষে কার্য্যোপযোগী হয় না। সময়ে সময়ে দুই বৎসর ও তিন বৎসরের বাঁশ চেনা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই স্থানে দুই বৎসরের বাঁশ কাটা যাইবার আশঙ্কা-নিবারণের জন্য এক উপায় আছে। ঝাড়ে যে কয়েকটী এক বৎসরের নূতন ডগা আছে, তাহা গুণিয়া লইয়া, তাহার দ্বিগুণসংখ্যক পুরা-তন বাঁশ রাখিয়া, অবশিষ্ট বাঁশ কাটিলে, আর সেরূপ কোনও আশঙ্কা থাকে না। ঝাড়ে যদি ১০০টা প্রথম বৎসরের নূতন ডগা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২০০টা পুরাতন বাঁশ সেই ঝাড়ে রাখিয়া, আর সমস্তই কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে।

যে বাঁশ বাঁকা কিংবা অন্য কোনও প্রকারে খারাপ হইয়া যায়, তাহা যে বয়সেরই হউক না কেন, কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এই কারণে যে কয়েকটী এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের বাঁশ কাটা যাইবে, তাহার সমানসংখ্যক পুরাতন বাঁশ অতিরিক্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ঝাড়ের আর কোনও লোকসান হইবে না।

ঝাড়ের মধ্য হইতে বাঁশ কাটাই উচিত। তাহা হইলে ঝাড়ের মধ্যে বাঁশ

ঠাসাঠাসি হইতে পারে না, এবং ঝাড়টীও ধীরে ধীরে চারি দিকে বাড়িতে থাকে।

বাঁশের গোড়া খুব উঁচু রাখিয়া কাটা বিধেয় নহে। (১) প্রথম গাঁটের ঠিক উপরিভাগেই কাটা উচিত। এরূপভাবে কাটিতে হইবে, যেন তাহার উপরে বাঁশ না থাকে। গাঁটের উপরে খানিকটা বাঁশ থাকিলে, বর্ষার জল সেই কাটা বাঁশের মধ্যে জমিয়া গাঁটটীকে পচাইয়া, ক্রমে সেই বাঁশের মোটা মূলটীকেও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে সেই কর্ত্তিত বাঁশের সন্নিহিত মোটা মূল হইতে আর নূতন বাঁশের উদ্গম হইবে না। বাঁশ কাটিবার সময় কলম-কাটার ন্যায় তেরছা করিয়া কাটাই বিধেয়। তাহা হইলে উহাতে জল জমিবার আশঙ্কা আরও কমিয়া যায়।

আমাদের দেশে গৃহস্থেরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে বাঁশ কাটে না। উহা কেবল কুসংস্কার বলিয়াই বোধ হয়। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন, হয় ত বা সেই সময়ে বাঁশের ভিতরে বেশী পরিমাণে রস (Sap) উৎপন্ন হয়, এবং সেই হেতু উহা কাটিলে তেমন কার্য্যোপযোগী হয় না। বায়ুমণ্ডলের শৈত্যভাব বাঁশের উপর যেরূপ ক্রিয়া করে, তাহাতে এ অনুমান একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে।

বাঁশের ভিতরে যে রস থাকে, তাহা বহির্গত করিয়া দিতে পারিলে, উহাতে ঘুণ ধরিবার আশঙ্কা থাকে না। বাঁশকে যে সব পোকায় ধরিলে তাহাকে ঘুণে ধরা বলে, সেই সব পোকা উক্ত রসের মিষ্ট স্বাদে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরের দিক্ হইতে বাঁশ কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। সেই জন্য ঘুণে-ধরা বাঁশের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়। বাঁশ হইতে নিঃশেষ করিয়া রস বাহির করিয়া দিতে পারিলে, ঐ পোকাগুলির উহাতে আকৃষ্ট হইবার আর কোনও কারণ থাকে না। এরূপ করিতে হইলে বাঁশ-গুলি কাটার অব্যবহিত পরেই উহাদিগকে জলে ফেলিতে হয়, এবং প্রায় এক পক্ষ কাল উহাদিগকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে বাঁশের সমস্ত রস মূলের সহিত মিশিয়া বাহির হইয়া যায়। তৎপরে বাঁশগুলিকে

(১) ইহাতে মতভেদ আছে।

'It is customary to cut the culms as low as possible in order to prevent conglation. Until further experiments are carried out, however, it is impossible to say if this will not be found to do more harm than good, in causing the drying up of the rhizomes.'

উঠাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইলেই উহাতে আর ঘুণ ধরিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বাঁশকে প্রথমে জলে ডুবাইয়া না রাখিয়া শুষ্ক করিলে উহার রস বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ইহাতে কেবলমাত্র রসের জলীয় অংশ-টুকুই বাহির হইয়া যাইবে।

বাঁশগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া আগুনের ধূমের উপর রাখিয়া শুষ্ক করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। এইরূপ বাঁশ দ্বারা কাজ করিলে তাহা পাঁচ সাত বৎসর টিকিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন।

রায় পরিবার।

৮

মা যত চেষ্টাই কেন করুন না, ছেলেকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে গৌরীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, ছেলেকে দেখিয়া ফিরিবার পর আর সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। ঘটনার কুজ্ঝটিকায় আমাদের দৃষ্ট পদার্থের রূপান্তর হয়—মারও তাহাই হইল। গৌরী তাঁহার পুত্রের দেশত্যাগী—গৃহত্যাগী হইবার কারণ। এ অবস্থায় গৌরীর প্রতি তাঁহার স্নেহ সহানুভূতিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু অবিকৃত থাকিতে পারে না। তিনি স্বভাবতঃ স্নেহশীলা ও মৃদু—বিশেষ সুশীল তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল, যেন গৌরীর কোনরূপ অযত্ন না হয়—কাহারও কোনও ব্যবহারে তাহার প্রতি অবহেলা প্রকাশিত না হয়, সে যদি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার প্রতি অপরের কর্ত্তব্য বিচলিত হইতে পারে না। কিন্তু মার ব্যবহারে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব আত্মপ্রকাশ না করিলেও, সে ব্যবহারের পরিবর্ত্তন গৌরী সহজেই অনুভব করিতে পারিল। বিশেষ তাঁহার আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি তাহাকে বিশেষ ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই নূতন অবস্থায় সে তাহার মাতার কাছে বিশেষ সান্ত্বনা পাইল না। তিনি তখনও আপনার গর্ব্বের শিখরে সমাসীন থাকিয়া কেবলই সুশীলের দোষ দেখিতেছিলেন। কত বড় বেদনার তাড়নায় সে যে আপনার জীবন ব্যর্থ করিতে বসিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে চাহিলেন না—কাজেই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখে সুশীলের নিন্দাবাদ গৌরীর ভাল লাগিত না।

তাহার ভালবাসা—বিরহের ব্যবধানে ও হারাইবার আশঙ্কায় যে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সে স্বামীর দোষও গুণ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। এ বিষয়ে বিধাত্রী দেবীর শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। তিনি গৌরীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সুশীলের যে ব্যবহার সে দোষ মনে করিয়াছিল—সে গুণেরই নামান্তর। গৌরী তাহা বুঝিয়াছিল। তাই মার মুখে স্বামীর নিন্দা তাহার ভাল লাগিত না—সেই আলোচনার ভয়ে সে বড় বাপের বাড়ী যাইতে চাহিত না। তাহার মাতা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, মেয়েও তাঁহাকে পর ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে যাহাই কেন ভাবুক না—'মাসী বল, পিসী বল—মায়ের বাড়া নয়।' এই কথার মধ্যে শ্বাশুড়ীর প্রতি তাঁহার সঙ্কিত অসন্তোষের ইঙ্গিত বুঝিয়া গৌরী আরও ব্যথা পাইত। কেন না, এই অবস্থায় সে যে কিছু সান্ত্বনা পাইত, সে পিতামহীর কাছে—আর সুশীলের দিদির কাছে। পিতামহীর পত্রের ছত্রে ছত্রে সে তাহার জন্য তাঁহার বেদনার আর্ত্তনাদ বুঝিতে পারিত।

তবুও পিতামহী দূরে। দিদি নিকটে। বৈধব্যবেদনা দিদির হৃদয়ে সহানুভূতির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল—হারাইয়া তিনি হারাইবার আশঙ্কায় কাতর হইতেন। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীলোকের ভালবাসার একটা পরিমাণ থাকে—তাই যখন সন্তানের প্রতি স্নেহে তাহার অধিকাংশ প্রযুক্ত হইয়া যায়, তখন স্বামীর জন্য আর অধিক অবশিষ্ট থাকে না—তখন স্বামী স্ত্রীর জীবনের কেন্দ্র হইতে ক্রমে পরিধিরেখায় স্থানান্তরিত হয়েন। দিদির কাছে কিন্তু স্বামী পুত্রকন্যার অধিক ছিলেন—তিনি ইহকাল—পরকাল—হৃদয়সর্ব্বস্ব—জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া দিদির পক্ষে জীবন কেবল কর্ত্তব্যের ভারমাত্র হইয়াছিল। তাই গৌরীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি ব্যথা পাইতেন—গৌরীর যৌবনলাবণ্যমধুর মুখে বিষাদের ছায়াপাত দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রবল সহানুভূতির আরও একটা কারণ ছিল। তিনি এই ব্যাপারের কারণ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌরী তাঁহাকে সব কথা বলে নাই। তবুও তিনি বুঝিয়াছিলেন, অতি সামান্য কারণে এত বড় ব্যাপার ঘটিয়াছে—আর সুধীরকে বিলাতে পাঠান হইতেই ইহার সূত্রপাত। তাই তিনি আপনাকেও কেমন একটু অপরাধী মনে করিতেন।

দিদি অনেক ভাবিলেন, কিন্তু ভাবিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে

পারিলেন না। শেষে এক দিন তিনি বলিলেন, 'গৌরী, স্বামীর কাছে স্ত্রীর ত পদে পদেই অপরাধ—স্বামী সব অপরাধ ভুলিয়া থাকেন বলিয়াই আমরা স্বামীর ভালবাসা পাই—সে স্বামীর গুণে। তুমি সুশীলকে পত্র লেখ—আপনার ভুল স্বীকার কর। সে রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না।' গৌরী সব শুনিল; ভুল স্বীকার করিতেও তাহার আগ্রহ, কিন্তু সে ত কখনও পত্র লিখে নাই! দিদি তাহার অবস্থা বুঝিলেন। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন।

তবুও নিশীথে গৌরী পত্র লিখিতে বসিল—কত বার লিখিল, কোনও পত্রই মনের মত হইল না—কোনও পত্রেই তাহার মনের কথা ফুটিয়া উঠিল না। সে পত্র লিখিল, আর ছিঁড়িল। সকালে দিদি আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। দিদি মেঝের উপর ছিন্ন পত্রের স্তূপ দেখিলেন—গৌরীর জাগরণচিহ্নাঙ্কিত নয়নে অশ্রুধারা দেখিলেন—আপনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

মা, দিদি, গৌরী—কেহই ভাবিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

বিধাত্রী দেবীরও ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি পূর্ব্বেই ভয় করিয়াছিলেন, সুশীলের স্থানান্তর-গমনের প্রকৃত কারণ তাহার মাতার অজ্ঞাত থাকিবে না। তখন কি হইবে, ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন। গৌরীর পত্রে তিনি যখন তাহার শাশুড়ীর প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানিলেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ করিয়া সুশীলের কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে সুশীলকে তাঁহার গমন-সংবাদ দিয়াছিলেন; যাইয়া দেখিলেন, সুশীল চলিয়া গিয়াছে—তাঁহার জন্য পত্র রাখিয়া গিয়াছে—'মা আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কাঁদাইয়া ফিরাইয়াছি। সে আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁহার বেদনা দ্বিগুণ হইয়া আমার বুকে বাজিয়াছে। আজ আপনাকে ফিরাইতেছি। ইহাও আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু উপায়ান্তরবিহীনের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি স্নেহকে বড় ভয় করি—পাছে তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হয়, সেই ভয়ে আমি পলায়ন করিলাম।'

বিধাত্রী দেবী প্রমাদ গণিলেন—এত দিন পরিবার হইতে দূরে নিঃসঙ্গ প্রবাসের অজস্র অসুবিধাও সুশীলের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না! সে যখন ক্রমে এই জীবনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে—যখন নূতন আদর্শই তাহাকে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে, তখন তাহাকে ফিরাইবার যে আর কোনও উপায়ই

থাকিবে না! ভালবাসার প্রবাহ-বেগ একবার প্রতিহত করিতে পারিলে তাহাকে যে পথে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

এমনই ভাবে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। দুইটী সংসারে দুর্ভাবনার নিবিড় ছায়া দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল; সে ছায়া অপসৃত করিবার কোনও উপায় কেহ করিতে পারিলেন না।

এই সময়ের মধ্যে সুশীলের পরিবারে দুইটি ঘটনা পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যাপৃত রাখিল। প্রথম—সুশীলের জ্যেষ্ঠের প্রথম সন্তানের আবির্ভাব; দ্বিতীয়—তাহার তিন মাস পরে সাফল্য লাভ করিয়া সুধীরের প্রত্যাবর্ত্তন। পরিবারে এই নূতন শিশুর আবির্ভাব মাকে ব্যস্ত রাখিল। সুশীল তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—এত দিন পরে গৃহে নূতন শিশু আসিল। বিধবা হইয়া তিনি যে দুই পুত্রকে লইয়া সংসারী হইয়াছিলেন—তাহাদেরই এক জন নূতন সংসার পাতাইল। কিন্তু আর এক জন? মা অশ্রুমোচন করিলেন। দূরগত পুত্রের জন্য তাঁহার দারুণ বেদনা যেন আরও দারুণ হইয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে বলিলেন, 'মা, সুশীলকে সংসারী করিতে পারিলাম না!' কন্যাও অশ্রুমোচন করিলেন—উত্তর দিবার কিছুই নাই। গৃহে আনন্দোৎসবের মধ্যে উভয়েরই হৃদয় সুশীলের জন্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। গৃহে আরও এক জন অহরহঃ বক্ষে বেদনা লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল—সে গৌরী। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার জীবনের ব্যর্থতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল! তাহার অভাবের পরিমাণ ততই অধিক বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তাহার ভালবাসা ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া স্বামীকে দেবতার আসনে বসাইয়া সার্থকতা-লাভের প্রয়াস পাইত বটে, কিন্তু তবু মানবের—যৌবনের ভালবাসার উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হইত, তখন সে যেন আর আপনাকে শান্ত করিতে পারিত না। ভালবাসা যে ভক্তিতে পরিণত হয়—সে ঘটনার বা সাধনার শৈত্যে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ব্যাকুল বাসনার—আশা-তৃষ্ণার উত্তাপে যখন সেই ভক্তি আবার বিগলিত হইয়া ভালবাসার খাতে প্রবাহিত হয়, তখন সে প্রবাহের বেগ কে রোধ করিতে পারে?

সুধীর ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিবার পথে সুশীলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু সুশীলের গৃহত্যাগের কারণ অনুমান করিতে পারে নাই। সে ফিরিবার পর আর একটা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়িল—তাহার বিবাহ। সুধীরের পিতা বড় বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার সঙ্গে

সুধীরের বিবাহ দিবেন, বলিয়া রাখিয়াছিলেন—মেয়েটিকে বরাবরই 'মা লক্ষ্মী' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যার পিতা সে বিষয়ে সুধীরের মাতার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন—মেয়ের বাপের পক্ষে পাকা কথা নহিলে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নহে। সুধীরের মাতা সে বিষয়ে আপনার মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, 'ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ—শেষে ছেলের মত চাহি, সে কথাও ভাবিয়া দেখ। আমাদের যে কপাল—শেষে যদি কথা দিয়া কথা রাখিতে না পারি?' মেয়ের কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না—স্বামী যে কথা দিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না; তবে ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল। তিনি সুধীরকে ডাকিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। সব শুনিয়া সুধীর বলিয়াছিল, 'মা, আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? বাবা যে কথা দিয়া গিয়াছেন, সে কথা রাখা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়—তবে তাহা কি আমারই কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারা আমাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিচার করিয়া দেখুন। দেখিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের কথায় অবিচলিত থাকেন, আমরা বাবার কথার অন্যথা করিব না।' সুধীরের মাতা কন্যাপক্ষকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা বিচার করিয়াও কন্যার পিতা সেই সম্বন্ধের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কেন না, সুধীরের মত ছেলে পাওয়া সহজ নহে—বিশেষ সুধীরের মাতাকে তাঁহারা জানিতেন, মেয়ের তেমন শাশুড়ী পাইবার প্রলোভনও সংবরণ করা তাঁহারা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুধীর ফিরিলে তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন।

বিবাহে সকলেরই মত ছিল। সুশীলের জ্যেষ্ঠ এখন বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, 'এ বিষয়ে আর কথা কি? মেয়ের পক্ষের ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আমি সুশীলকে পত্র লিখি।' দাদার পত্র পাইয়াই সুশীল উত্তর দিল, 'মেয়ের পক্ষকে অকারণে আর বিলম্ব করিতে বলা ভাল দেখায় না! দিন স্থির করিয়া ফেলুন।'

বিবাহের উদ্যোগ—আয়োজন হইতে লাগিল। মার ও দিদির বিশ্বাস ছিল, সুধীরের বিবাহে সুশীল না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। তবুও দিদি তাহাকে পত্র লিখিলেন—'ভাই, তোমাকে আর কি লিখিব? তুমি আসিয়া না দাঁড়াইলে এ বিবাহে আমার কোনও আনন্দই হইবে না। আমার এই কথা মনে করিয়া—তোমার পিতৃহীন ভাগিনেয়ের কথা ভাবিয়া, তুমি আসিবে। আমাকে এ আশায় হতাশ করিও না।'

দিদির পত্র পাইয়া সুশীল বিচলিত হইল। এ আহ্বান সে কেমন করিয়া অবহেলা করিবে? কর্ত্তব্য যে তাহাকে যাইতেই বলিতেছে। সে না যাইলে দিদি চক্ষুর জল ফেলিবেন ভাবিয়া তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। যুক্তি তর্কের পাষাণ দিয়া স্নেহ ভালবাসার উৎস-মুখ রুদ্ধ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—বুঝি সে পরাভব মানিল। তাহার পর সে ভাবিল—জীবনের যে অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, তাহা আবার আরম্ভ করিব কেমন করিয়া? সে আপনার প্রতি করুণায় আপনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুশীল স্থির করিল বটে, সে সুধীরের বিবাহে যাইবে না, কিন্তু সে কথা দিদিকে লিখিতে সাহস করিল না।

বিবাহের দিন পর্য্যন্ত দিদির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুশীল তাঁহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সে দিন তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল। তিনি দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন—সে কথা ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু যখন বর যাত্রা করিল, তখন তাঁহার সমস্ত বেদনার সঙ্গে এই বেদনাও তাঁহাকে বিচলিত করিল। এই উৎসবের মধ্যে তাঁহার স্বামি-বিয়োগ-বেদনা যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। বর যাত্রা করিবার পর তিনি মাকে বলিলেন, 'সুশীল আসিল না!' কন্যা কি বেদনা বক্ষে লইয়া কাজ করিতেছিল, মা তাহা অন্তরে বেদনায় অনুভব করিতেছিলেন। তাই আজ সুশীলের ব্যবহারে তাঁহার মনে একটু অভিমানের আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন, 'আমরা তাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, সে তোর ব্যথাও বুঝিল না?' দিদির মনে কিন্তু অভিমানের স্থান ছিল না। তিনি বলিলেন, 'মা সে-ই কি ইহাতে ব্যথা পাইতেছে না?'

গৌরী তথায় ছিল। মাতা পুত্রীর এই বেদনা যেন বৃশ্চিক-দংশন-যাতনার মত তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সব অপরাধ তাহার। সে কেমন করিয়া সংসার হইতে এ বেদনার চিহ্ন মুছিয়া দিবে? তাহার ব্যর্থ জীবন স্বামীর ভালবাসায় সার্থক করিবার আশা তাহার পক্ষে দিন দিন দুরাশা মনে হইতেছিল। কিন্তু দিদি ত সত্যই বলিয়াছেন—'সেও কি ব্যথা পাইতেছে না? সে-ই ত সে বেদনার কারণ। সে তাহার ব্যবহারে কেবল আপনার জীবনই ব্যর্থ করে নাই, স্বামীর জীবনও ব্যর্থ ও বেদনাময় করিয়াছে।' গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল। দিদি তাহা লক্ষ্য করিলেন—তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনা প্রবল হইয়া উঠিল।

ও দিকে দিদি যাহা মনে করিয়াছিলেন, সুশীলের তাহাই হইল। সুধীরের বিবাহের দিন সে কোনও কাজেই মন দিতে পারিল না। সে আদালতে গেল না —সমস্ত দিন আপনার বক্ষে বেদনা লইয়া যাপন করিল—অপরাহ্নে পাছে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া, নদীর কূলে চলিয়া গেল—সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল।

তাহার পর সে দাদার পত্র পাইল—বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে না আসায় মা ও দিদি বড় দুঃখিত হইয়াছেন। দিদির কোনও পত্র সে পাইল না। দিদি যদি তাহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিতেন—তাহা হইলে ভাল হইত; কিন্তু তিনি যে তাহাকে কোনও পত্র লিখিলেন না—তাহাতে সে তাঁহার হতাশা বেদনার পরিমাণ বুঝিয়া কষ্ট পাইল। আপনার অবস্থায় আপনার উপর তাহার বিরক্তি ও করুণা জন্মিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, স্নেহ ভালবাসার নির্দ্দিষ্ট সরল পথ ত্যাগ করিয়া —বুদ্ধি-বিবেচনা-দর্শিত বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া সে ভুল করে নাই ত? কে বলিবে?

সুশীল দাদাকে লিখিল, 'দিদির কথা না রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি—তাঁহাকে আর পত্র লিখিতেও আমার সাহসে কুলাইতেছে না।' দাদা কেবল লিখিলেন—'দিদিকে তোমার কথা পড়িয়া শুনাইয়াছি।' কিন্তু দিদি শুনিয়া কিছু বলিয়াছেন কি না, সুশীল জানিতে পারিল না।

দুই মাস দিদির কথা যখন তখন সুশীলের মনে হইতে লাগিল। তাহার পর সে সুধীরের পত্র পাইল—সে আসিতেছে! সুধীরের আগমনের কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না, সুশীল তাহার আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু আলোচনার বিশেষ সময় ছিল না—কারণ পর দিনই সুধীর আসিবে।

সুশীল ভাগিনেয়কে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গেল। সুধীর মনে করিয়াছিল, মামা তাহার জন্য ষ্টেশনে আসিবেন—সে কামরার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ছিল—সুশীলকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—'ছোট মামা!' সুশীল যাইয়া কামরার দ্বার মুক্ত করিল—সুধীর নামিয়া আসিল। সুশীলের ভৃত্য সঙ্গে ছিল—সে জিনিস নামাইতে কামরায় উঠিল। জিনিসের মধ্যে একটা বড় বাক্স। সেটা নামান হইলে সুধীর হাসিয়া বলিল, 'আরও একটা জিনিস আছে।' সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায়?' 'এই যে' বলিয়া সুধীর কামরায় প্রবেশ করিল।

সুধীরের সঙ্গে নামিয়া আসিয়া এক কিশোরী সুশীলকে প্রণাম করিল। সুশীল বিস্মিতনেত্রে ভাগিনেয়ের দিকে চাহিলে সুধীর হাসিয়া বলিল, 'মা বলিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তোর বিবাহে সুশীল আসিবে। সে আমার সে বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি আর তাহাকে কখনও কিছু বলিব না। তবে তোর কর্ত্তব্য—তুই তাহাকে বৌ দেখাইয়া আন।'

সুশীল সস্নেহে কিশোরীর মস্তকে করতল স্থাপিত করিল; বলিল, 'তাই ত মা, ছেলেকে দেখিতে আসিয়াছ! বড় দুষ্ট ছেলে—না? কিন্তু কথায় বলে—"কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কখনও নয়।" সে কথা ঠিক।' তাহার পর সে সুধীরকে বলিল, 'আমাকে একটু লিখিতে হয়! মার যে বড় কষ্ট হইবে।' সুধীর বলিল, 'লিখিলে কি আপনি রাজী হইতেন?'

সুশীল সুধীরকে ও তাহার বধূকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'বাসায় যাও। আমি একটু ঘুরিয়া এখনই যাইতেছি।'

একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সুশীল সহরে গেল, এবং একখানি মূল্যবান অলঙ্কার কিনিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল। সে ভাগিনেয়-বধূকে ডাকিয়া অলঙ্কার দিল। সুধীর বলিল, 'এই জন্য বুঝি ঘুরিয়া আসিলেন?' সুশীল উত্তর দিল, 'তোর যেমন বুদ্ধি! শুধু হাতে কি বৌ দেখিতে আছে। দেড় বৎসর বিলাতে থাকিয়া তুই যে একেবারে মোচাকে "কলার ফুল" বলিতে শিখিয়াছিস!'

তাহার পর সুশীল বধূকে বলিল, 'মা, আমার এ তাম্বুতে বাস। মা একবার আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে সব গুছাইয়া লইতে হইয়াছিল। তুমি আসিয়াছ—তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে। তবে বিরক্ত হইতে পারিবে না—এ সব ছেলের উপর স্নেহের জন্য মার শাস্তি।' প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে-ই সব গুছাইয়া দিল, এবং যত্নের আতিশয্যে বধূকে প্লাবিত করিয়া দিল।

সেই দিন অপরাহ্নেই সুধীর তাহার সঙ্গে আসল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। এইবার দিদি তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহেন। সুধীর বলিল, 'এখন পশার করাই কঠিন; কেন না—গলিতে গলিতে ডাক্তার। কিন্তু পশার হইলে সে পাড়া ছাড়িয়া যাইলে ক্ষতি অনিবার্য্য। তাই আমি একেবারে বাড়ীতেই বসিতে চাহি।' উভয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে সুশীল বলিল, 'তুই যাহাই কেন বলিস না, আমি তোর কথায় রাজী হইতে পারিব না। দিদি চলিয়া গেলে মার বড় কষ্ট হইবে। সেই যখন

কেবল আমরা দুই ভাই আর মা বাড়ীতে ছিলাম, তেমনই হইবে। দাদার ছেলেকে লইয়া মা ব্যস্ত হইলেও না হয় হইত। দাদা লিখিয়াছেন—সে তাহার পিসীর কোল দখল করিয়াছে। এখন তোর যাওয়া হইবে না। এ যুক্তি নহে—তর্ক নহে, ইহাই আমার মনের কথা।'

তাহার পর সুশীল মার কথা—দিদির কথা—সংসারের কত কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সুধীর দুই দিন পরে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল। সুশীল বলিল, 'তাহাও কি কখন হয়! তোর কি—তুই সাত সমুদ্র পার হইয়াছিস, তোর সব সহ্য হয়। মার যে কষ্ট হইবে—আরও দুই দিন বিশ্রাম করিয়া পরে যাইবার কথা।' সে আপনি সঙ্গে যাইয়া ভাগিনেয়-বধূকে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইল। আর বাড়ীর সকলের জন্য কত জিনিসই কিনিতে লাগিল। সুধীর বলিল, 'আপনি কি সহরের সব দোকান উজাড় করিবেন?'

দুই দিনের পর দুই দিন—তাহার পর আরও দুই দিন গেল। তখন সুশীল আর সুধীরকে রাখিতে পারিল না।

ভাগিনেয়কে ও ভাগিনেয়-বধূকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সুশীল যখন 'সুখহীন ভবনে' ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনে তাহার দূরস্থ পরিবারের চিত্র কি মনোরম বর্ণেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সে কি কেবল দূরত্বের ব্যবধান-হেতু? না—তাহার তৃষ্ণা—তাহার বাসনা বিচিত্র বর্ণলেপে সে চিত্র চিত্তাকর্ষক করিতে লাগিল? কে বলিবে? কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল—গত দুই বৎসরের জীবন যদি সত্য সত্যই স্বপ্নমাত্র হইত! যদি সে জাগিয়া দেখিত, দুই বৎসর পূর্ব্বে সে যে স্থানে ছিল, এখনও সেই স্থানেই আছে! মার সেই স্নেহ—দিদির সেই ভালবাসা—ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগের প্রতি সেই স্নেহ। আর—!

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।*

রামেন্দ্রবাবু যে সত্যসত্যই আমাদের ছাড়িয়া অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা এখনও বিশ্বাস হয় না। এই সে দিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি কত রকম বিষয়ের আলোচনা করিলেন! এখনও সর্ব্বদা মনে হয়, যেন সেই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সরল ব্যাখ্যা শুনিতেছি। বাস্তবিক, কতকগুলি লোকের এমন একটা অমরত্ব, এমন একটা অবিনশ্বরতা থাকে যে, মৃত্যু যে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপ লোক ছিলেন। অথচ তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। আমি ত তাঁহাকে গত এগার বৎসরের মধ্যে কখনও পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে দেখি নাই। তাঁহার চোখের দীপ্তিতে ও হাসিতে এমন একটা অজর অমর ভাব ছিল, যাহা দেহের সহস্র দুর্ব্বলতা ভেদ করিয়া নিজকে প্রকাশ করিত। রামেন্দ্র-বাবুর সমস্তটাই দেহী ছিল, দেহের অংশটা দেহীর মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার দেহ শীঘ্রই কাজে ইস্তফা দিল।

তাঁহার হাসির কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ হাসি আমার জীবনে আর কাহারও কখনও দেখি নাই। সকল প্রকার বৈষম্য, সকল প্রকার সন্দেহ, তাঁহার হাসির সাম্‌নে পলাইয়া যাইত। একবার মনে পড়ে, কতকগুলি নবীন সাহিত্যিক 'হিতবাদী' পত্রে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমি ত্রিবেদী মহাশয়কে এ সমালোচনা দেখাইলে তিনি কেবলই হাসিতে লাগিলেন। সে হাসিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, বাক্যের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। সে হাসি সমালোচকের তীব্র প্রতিবাদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিল। সে হাসি স্পষ্টই সকলকে অনুভব করাইয়া দিয়াছিল যে, তুচ্ছ জগতের প্রশংসা বা নিন্দার কত উর্দ্ধে তাঁহার চিত্ত ভ্রমণ করিত। সে রাজ্যে পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর দ্বন্দ্ব কোলাহল নাই, সে রাজ্যে বিশুদ্ধ মৈত্রীভাব ও সার্ব্বজনীন প্রীতি ভিন্ন আর কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল হাসিতে নহে, ত্রিবেদী মহাশয়ের

---

* বিগত ১০ই আষাঢ় সাউথ সাবার্ব্বান স্কুলের হলে ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সকল ক্রিয়াকলাপে এইরূপ একটী অশরীরী লোকের আভাস পাওয়া যাইত। আমার বেশ মনে পড়ে, আজ দুই বৎসর হইবে, সাহিত্যপরিষদের একটী অধিবেশনে ভীষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইবার পর এক দল লোক সক্রোধে পরিষৎ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ত্রিবেদী মহাশয় কিন্তু ইহাতে একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি যে নিত্যবুদ্ধশুদ্ধমুক্ত চৈতন্যের উপাসক ছিলেন, সেই চৈতন্যের ন্যায় তিনিও নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্পভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে কিছু যে সে দিন ঘটিয়াছে, তাহা একেবারেই বোধ হইতেছিল না।

তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও মনের জোর খুব বেশী ছিল। তাঁহার মত তিনি হঠাৎ ব্যক্ত করিতেন না, কিন্তু যখন করিতেন, তখন খুব দৃঢ়তার সহিত করিতেন, এবং খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতকে পোষণ করিতেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একগুঁয়েভাবে তিনি কোনও মতকে ধরিয়া থাকিতেন। বয়সের ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাঁহার মতেরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। দেহ যত দিন সজীব থাকে, তত দিন যেমন বাহিরের পরিবর্ত্তনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, সেইরূপ মানুষের বুদ্ধিও যত দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহাও বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বজায় রাখে। ত্রিবেদী মহাশয়ের মন নূতন সত্য গ্রহণ ও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অসাধারণ পটু ছিল। আমার নিকট তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ কয় বৎসর অসাধারণ যত্নের সহিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নের ফল আমরা তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, কর্ম্মকথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধাবলীতে দেখিতে পাই।

রামেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিতেন। কখনও তাঁহার মুখে তাঁহার নিজের কীর্ত্তির সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাই নাই। পরের যদি কোনও গুণ দেখিতেন, অথবা কোনও সৎকার্য্যের খবর পাইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহা সাধারণের গোচর করিতেন। নিজের বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত করিতেন। তিনি যে কখনও কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মনেই হইত না, অন্যের নিকট তাহা বলা ত দূরের কথা। আমার এই সংস্রবে একটী ঘটনা মনে

পড়িয়া গেল। আজ নয় বৎসর হইল, আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া জর্ম্মাণীর কোনও দার্শনিক পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য প্রেরণ করি। প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে ত্রিবেদী মহাশয়কে অনুবাদটী একবার দেখাই, এবং তাঁহার মত লই। তিনি তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিয়ে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

'আমার প্রবন্ধ যে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই......স্বদেশের ও বিদেশের আচার্য্যগণের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমার আর কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও ছিল না। রচনাগুলির মধ্যে আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে বলিয়া কখনও কোনও স্পর্দ্ধা আমার মনে উপস্থিত হয় নাই; কোনও নূতন কথা কখনও বলিয়াছি বলিয়াও ধারণা জন্মে নাই।'

ইহা অপেক্ষা অহঙ্কারশূন্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আর কি হইতে পারে? অহঙ্কারকে তিনি যেমন দমন করিয়াছিলেন, অন্যান্য রিপুগুলিকেও তিনি সেইরূপ নাশ করিয়াছিলেন। ক্রোধ তাঁহার একেবারেই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যতই বিরক্তিকর ব্যাপার তাঁহার ঘাড়ে পড়ুক না কেন, তিনি কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। এ বিষয়ে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল তাঁহার হাসি। তাঁহার সহাস্য বদনের সম্মুখে বিরক্তি যেন আসিতেই সাহস পাইত না।

এই সকল কারণে মনে হয় যে, তিনি গীতার আদর্শ পুরুষ ছিলেন—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি।'

কিন্তু গীতার এই আদর্শ মনে করিলে আমাদের যেরূপ কর্কশ কঠোর লোকের চিত্র মানসচক্ষুতে উদিত হয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্তরে সেরূপ কর্কশতা, সেরূপ নির্ম্মমতা আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। রামেন্দ্রবাবুর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। পরের দুঃখ তিনি একেবারেই সহিতে পারিতেন না। বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুসংবাদে তাঁহাকে শোকে বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভিতরে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না।

বাস্তবিক ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাব একেবারে মধু ঢালা ছিল। এই জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—'তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার সকলই সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।' সে কালের আর্য্য ঋষিগণ সমস্ত পৃথিবীকে

মধুময় দেখিতেন। 'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।' ত্রিবেদী মহাশয় আর্য্যদিগের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তিনি নিজে মধু ছিলেন, এবং সমস্ত জগৎটাকে মধুময় দেখিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া থাকিত।

এইবার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাল্যজীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার চরিত্রগুণে ও পাণ্ডিত্যে সে অঞ্চলের এক জন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ২৫৲ বৃত্তি পান। পরে তাঁহার খুল্লতাতের সহিত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান, এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক পেডলার এই পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি রামেন্দ্রবাবুর কাগজ সম্বন্ধে বলেন, 'আমি এ পর্য্যন্ত রসায়নের যত কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই out and out the best'। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষা দেন, এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরে কিছু দিন প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার পর রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

রামেন্দ্রবাবুর কর্ম্মজীবনের কথা বলিলেই, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-পরিষদের নাম মনে পড়ে। সাহিত্য-পরিষৎটী ত্রিবেদী মহাশয়ের হাতে-গড়া জিনিস। ইহার জন্য তিনি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহার ফল আমরা সাহিত্য-পরিষদের সুন্দর ভবনে ও বহু বিস্তৃত কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অবশ্য আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একমাত্র ত্রিবেদী মহাশয়ই সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টিকর্ত্তা। এ কথা বলিলে যে সকল মহাত্মা তাঁহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা সাহিত্য-পরিষৎকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি

অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তবে ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ কিছুতেই তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। তিনি সাত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে তিনি উহার সভাপতি মনোনীত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম দুর্ভাগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ উন্নতি হইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রিপণ কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়ের কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইবার অল্প দিন পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধ তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত বরাবর চলিয়াছিল। প্রথমে তিনি অধ্যাপক ভাবে এবং পরে অধ্যক্ষ হিসাবে রিপণ কলেজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। এরূপ এক কলেজে জীবনের সমস্তটা যাপনের উদাহরণ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপণ কলেজে ঢুকিবার পূর্ব্বে তাঁহার গবর্মেণ্টের চাকরী পাইবার একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী লন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি এক দিন আমার নিকট বড় মজার গল্প করিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবর্মেণ্টের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে চাকরীর জন্য ডিরেক্টারের নিকট আবেদন করেন। তাহার ফলে ডিরেক্টার তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টারের আফিসে উপস্থিত হন, এবং চাপরাশীর দ্বারা কার্ড পাঠাইয়া দেন। কার্ডটী ডিরেক্টারের নিকট লইয়া যাইবার সময় চাপরাশীটী তাঁহার নিকট বখশিস্ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী মহাশয় এত বিরক্ত হইয়া যান যে, তিনি ভাবেন, 'দূর ছাই, গবর্মেণ্টের চাকরী, যাহার গোড়াতেই এই রকম, তাহার পরে না জানি কত রকম গোলমাল।' এই ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টারের সহিত দেখা করিলেন না। এই ঘটনা হইতে ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও প্রকার বক্রমার্গ দ্বারা কোনও রকম সুবিধা পাইবার চেষ্টা করা, তিনি যে মতে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, সে মতের বিরুদ্ধ ছিল। সরল সহজ পথে চলিয়া যতটা সাংসারিক উন্নতি সম্ভবে,

তাহার বাহিরে অন্য কোনও প্রকার সুবিধার চেষ্টা করাকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি নিজে যেমন কোনও প্রকার কুটিলমার্গ পছন্দ করিতেন না, অন্যকেও তিনি তেমনই কোনও প্রকার কুটিলতা অবলম্বন করিতেও প্রশ্রয় দিতেন না। কোনও প্রকার তোষামোদ বা অনুরোধ, উপরোধ তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার অধ্যক্ষতায় রিপণ কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। কাহারও কখনও মনে হইত না যে, প্রিন্সিপ্যালকে খোসামোদ করিবার বা তুষ্ট রাখিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে।

কেহ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া কোনও অনুরোধ করিলে বলিতেন, 'এ কথা ত আমাকে কলেজেই বলিতে পারিতেন, এত কষ্ট করিয়া বাড়ীতে আসার কি দরকার ছিল?' তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের মধ্যে এরূপ মধুর সম্বন্ধ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রামেন্দ্রবাবু 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্ত' ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু এক দিন আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবুর উৎসাহ ব্যতীত তিনি কখনও কিছু লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ত্রিবেদী মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের কথা বলিতে গেলে তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মের কথা না বলিয়া পারা যায় না। কেন না, সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গ সাহিত্যে রামেন্দ্রবাবুর স্থান অতি উচ্চ—এ কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমাণ্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টম্যানকে ছাড়িয়া realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে, এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস বিভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গালায় যে কয় খানি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট

দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ, এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ, বাঙ্গালাতে অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বে অনেক রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন, ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তিবলে ও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার গুণে তাহা অতি সরল বলিয়া প্রতিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মত নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক বলা উচিত, এ বিষয় অনেক তর্ক হইয়াছে। আমার মতে, এ তর্কের কোনও প্রমাণ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে। Aristotle এই জন্য দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metaphysics, অর্থাৎ যাহা Physicsএর জ্ঞানলাভের পর, Physicsএর মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জর্ম্মাণ ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে nachdenken বলে, (অর্থাৎ denken বা বস্তু-চিন্তার পর যাহা উদিত হয়)। দার্শনিক চিন্তা সকল সময়েই nachdenken, অর্থাৎ, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার বিষয়ের পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর চিন্তা করিতে থাকেন, 'কিরূপ পথ দিয়া এত দূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহুছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য?' 'প্রকৃতি' শীর্ষক গ্রন্থে আমরা বিজ্ঞানের পুরা জোয়ার দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে দুই যায়গায় যেন ভাঁটার টানের আভাস পাওয়া যায়। 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্ত্তি' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকারের যেন একটু খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছে। বুঝি বা বিজ্ঞান চরম সত্যে লইয়া যাইতে অক্ষম। বুঝি বা এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরাশ্যের বিরাট শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়। এই খটকা হইতেই 'জিজ্ঞাসা'র উৎপত্তি। যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য না হয়, তাহা হইলে কোথায় সত্যকে খুঁজিতে হইবে? জিজ্ঞাসার প্রথম প্রবন্ধ 'সত্য'তে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। বিজ্ঞান ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভূয়োদর্শনের বাহিরে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ভূয়োদর্শন

ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্যমাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটী বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের সত্য কাজে কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে ঘেঁষিয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহারিক সত্য, জীবন-যাপনের সুবিধার জন্য গৃহীত সত্য। 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং রিপণ কলেজে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ অশাশ্বততা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। 'আমি আছি'—এ সত্য কিন্তু অন্য প্রকার সত্য। ইহা অপর কোনও সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। ত্রিবেদী মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

'আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।'

ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করেন। এক হইতেছে ব্যাবহারিক বা Pragmatic সত্য, জীবনধারণের সুবিধার জন্য মানিয়া লওয়া সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য, Absolute Truth.

ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'আমি আছি' ইহাই চরম সত্য। কিন্তু এই আমি কি? আমি কখনও পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশৃঙ্গ অবলোকন ও নিম্নে বেগবতী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি নিভৃত কক্ষে শান্ত স্তব্ধ ভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেছি। এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও হাসিতেছি, কখনও কাঁদিতেছি, সর্ব্বদাই বিচলিত হইয়া আছি; আর এক আমি নির্ব্বিকার শান্তশুদ্ধস্বভাব। প্রথম 'আমি'কে জীবাত্মা বা phenomenal self, এবং দ্বিতীয় 'আমি'কে পরমাত্মা বা transcendental self বলা হয়। এই দুই 'আমি' কিন্তু মূলতঃ

একই। যে আমি পরমাত্মা, সে আমিও আবার জীবাত্মা। ইহা Kantও যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরাও সেইরূপ বা ততোধিক জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ও ইঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া এই বিরাট সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করেন।

আমি আপনাদিগকে এই সকল দার্শনিক technicalities লইয়া বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু এই দুই প্রকার 'আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী চৈতন্য 'আমি' থাকিলেই ত হইত, এই দুই 'আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর ঋগ্বেদে আছে। 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের সৃষ্টি-হেতু। অর্থাৎ, ইহা কামনা করিলাম—সেই কামনা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমি কামনা করিয়া নিজকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দরুণই আমার সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ।

এই নিক্ষেপণের আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে।

'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্রতঃ'; 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ'—সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সহিত সম্বন্ধ।

এই জন্য ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন,—

'এই বিশ্ব ব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। বাস্তবিক জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—সংসার করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল।'

জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন,—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। ভোগ্য বস্তুই যখন ত্যাগের দ্বারা লভ্য, সমস্ত জগতের—এবং কাজে কাজেই সকল ভোগ্যবস্তুরই—যখন ত্যাগেতে সৃষ্টি, তখন ত্যাগের সহিত ভোগের কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহা ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্ম্মকথার 'যজ্ঞ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

'ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল; জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ।'

পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞ, অর্থাৎ ত্যাগাত্মক—ইহা দেখান ও বোঝানই ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্ম্মকথা' গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথার ঠিক মানে কি, একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ, অর্থাৎ, তাহা ethical, আবার কর্ম্মমাত্রই ঋত, অর্থাৎ Cosmic process, কাজেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারই নৈতিক (Ethical), অথবা সমস্ত নৈতিক ব্যাপারই জাগতিক। সুতরাং Cosmic process এবং Ethical process মূলতঃ এক। 'ধর্ম্মের জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঐক্যটী ত্রিবেদী মহাশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

'যে নিয়তি সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন রাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝা বায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎ কর্ম্মে ও অসৎ কর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুশে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে।'

এইখানে একটু খট্‌কা বাধে। নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিলে, নৈতিক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা ঘটিতেছে, এবং যাহা ঘটা উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, 'উচিত' শব্দের আর কোনও অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু morality লোপ করা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান যে, এই সাংসারিক বা ব্যাবহারিক জীবনে Moralsএর কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্ম্মের জয় হয় না, নিয়তির জয় হয়। ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভাসিক জগতে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজের নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অনুভূতি ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হই। ধর্ম্ম এই প্রাতিভাসিক বা intuitive রাজ্যে বিচরণ করে। ইহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব সামগ্রী। আমার সহিত অনন্তের সম্বন্ধ, প্রতি দিনের মেশামিশি, প্রতি দিনের মাখামাখির সম্বন্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিবেদী মহাশয়

প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের দার্শনিক মত লইয়া এত কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল দর্শন লইয়াই থাকিতেন। বিজ্ঞানে তাঁহার কত দূর প্রবেশ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামক পুস্তক তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির Culture-history অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা নূতন। আমাদের Culture-history এ পর্যান্ত লেখা হয় নাই। কিরূপে যে হিন্দুর আচার ব্যবহার কালের সহিত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার পরিষ্কার ছবি 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক্ শব্দের ঐতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের তাৎপর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক্ শব্দের আলোচনায় ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে বাক্‌দেবীর অর্চ্চনা ও শব্দব্রহ্মবাদ যাহা আছে, তাহার সহিত গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় Doctrine of Logosএর মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যটী রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, এবং তাহা হইতে এই অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দ-ব্রহ্মবাদ গ্রীকরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল, এবং পরে তাহা প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টানদিগকে দেয়। এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটী বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা খ্রীষ্টানরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন ছিল, তাহা, এবং খ্রীষ্টানদিগের Eucharist ভক্ষণ একই জিনিস। কৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। আবার এ দিকে সোমক্রয়ের যে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাতে বাগ্‌দেবীকে গাভী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক নৈঘণ্টুক কাণ্ডে গো শব্দের একুশটী প্রতিশব্দ দিয়াছেন, যথা ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক্, ভারতী প্রভৃতি, এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, 'এতে একবিংশতি বাঙ্‌নামানি।' এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাক্ = গো = ব্রহ্ম, এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে গাভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে গোপাল-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অনেক প্রসঙ্গ এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। সময়াভাবে সে-গুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না। যে দুইটীর উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কিরূপ গভীর ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। বাস্তবিক, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় কেন, কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। কোনও কোনও বিষয়ে Houston Stewart Chamberlainএর 'Foundations of the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। Chamberlainএর পুস্তকে ইউরোপের Culture-history দিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী dogmatic, গায়ের জোরে Chamberlain তাঁহার প্রিয় মতটী চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু dogmatic ভাবের লেশমাত্র নাই।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব লিখিবার চেষ্টা ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বনি-বিচার' নামক প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা শব্দের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার, কেহ কখনও এ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উদ্ধারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টার মূলে ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির করিবার জন্ম সাহিত্য-পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানতঃ রামেন্দ্রবাবুরই চেষ্টা।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ত্রিবেদী মহাশয় অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম কখনও ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি অসাধারণ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তিনি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় কখনও চিঠিপত্র লিখিতেন না। ধুতি চাদরও কখনও ছাড়িতেন না। শুনিয়াছি, প্রথম জীবনে কলেজে চোগা চাপকান্ পরিয়া যাইতেন, কিন্তু পরে ধুতি চাদর ভিন্ন অন্য কোনও বেশ তাঁহার দেখা যাইত না। বাহিরেও যেরূপ, ভিতরেও সেইরূপ, তিনি খাঁটী স্বদেশী ছিলেন। তিনি বিদেশীর যাহা ভাল, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনও চোখ বুজিয়া বিদেশীর অনুকরণ করিতেন না। সে দিন অপর একটী স্মৃতি-

সভার এক জন বক্তা বলিয়াছিলেন,—ত্রিবেদী মহাশয় কখনও বিশ্বাস করিতেন না যে, ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে 'intellectual orphan' হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বক্তার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা 'intellectual orphan' নহি। আমাদের নিজের জ্ঞান, নিজের বুদ্ধি, নিজের ভাষা আছে। আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার এখনও সমগ্র জগৎকে জ্ঞান বিতরণ করিতে পারে, আমাদের ভক্তিসিন্ধু এখনও জগতের সমগ্র ভক্তবৃন্দকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিতে পারে।

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র।

'শব্দকথা'।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

'শব্দকথা'-সমালোচনের প্রথম প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি যখন মুদ্রাকরের করে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছিল, এবং যখন এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটির কল্পনা রচনায় পরিণত হইতেছিল, তখন কে জানিত যে, গ্রন্থকার রামেন্দ্রসুন্দরকে লোকান্তরে লইয়া যাইবার জন্য, মহাকাল অতি ক্ষিপ্রকরে উদ্যোগ করিতেছিলেন। ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু সাধু ও সুধী জনের অকালে প্রাণহরণ যদি অধর্ম্ম হয়, তবে সে অধর্ম্ম তাঁহার মস্তকে পুঞ্জীভূত হউক! দেশমাতৃকার এমন সর্ব্বনাশ আর কেহ করে নাই। কিন্তু জাতিগত এ আক্ষেপ হইতে আমি বিরত হইতেছি। আমি ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথাও বলিতেছি না। ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃত 'শব্দকথা'র আমার এই ক্ষুদ্র সমালোচনা তাঁহার চক্ষে পড়িল না বলিয়া আমার যে ক্ষোভ, তাহার কোনও মূল্য নাই। আবার তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা ভাল হউক বা মন্দ হউক, তিনি নিজে দেখিতে পাইলেন না। 'শব্দকথা'র এই সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল নূতন সারগর্ভ কথার প্রচার করিতেন, তাহা হইতে যে আমরা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলাম, এবং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত সবিশেষ ও সম্যক্ আলোচনা করিবার সুযোগ বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ যে চিরকালের মত হারাইলেন—এই দুঃখই দুঃখ। কিন্তু দুঃখের ভার বক্ষে লইয়াই আমাদিগকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

'শব্দকথা'-সমালোচনের প্রথম প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, গ্রন্থখানির জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'ধ্বনি-বিচার' পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইবে, এবং 'কারক-প্রকরণ' প্রভৃতি বাঙ্গালা ব্যাকরণসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র বিচারিত হইবে। তদনুসারে শেষোক্ত প্রবন্ধগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

১। 'কারক-প্রকরণ'

"বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে"—এই কথা প্রবন্ধারম্ভে বলিয়া গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষার কারক ও ইংরাজি ভাষার কারকের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কারকের সাদৃশ্য ও বৈষম্যের বিচার করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত কারকের বিভক্তি ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তির সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে তিনি যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা লইয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার "কারক-প্রকরণের সংস্কার" করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি এই—

"(১) (বাঙ্গালা ভাষায়), কর্ত্তায় সাধারণতঃ বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। স্থানবিশেষে বিভক্তিচিহ্ন, এ', য়, তে। (২) কর্ম্মের বিভক্তিচিহ্ন কোথাও কে', কোথাও বা রে', কোথাও বা বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। স্থানবিশেষে চিহ্ন এ', য়। (৩) সম্বন্ধ বুঝাইবার চিহ্ন র', এর। (৪) অপাদানের বিভক্তিচিহ্ন নাই।* (৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কর্ম্ম হইতে অভিন্ন। (৬) করণ ও অধিকরণের চিহ্ন এ', য়', তে'; কিন্তু ঐ কয়টী চিহ্ন করণ ও অধিকরণের নিজস্ব নহে, অন্য কারকেও উহাদের প্রয়োগ হয়।"

অতঃপর তাঁহার প্রস্তাব এই :—

"আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান, * সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি যে সকল স্থানে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ, সেই সকল স্থলেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্তরূপ বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণীতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্ম বিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন।......কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যতীত যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন

---

* "দ্বারা, দিয়া প্রভৃতিকে বিভক্তি বলিতে আমি প্রস্তুত নহি,...'দ্বারা, দিয়া, হইতে,...চেয়ে প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে পারে না।...উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।"—(শব্দকথা, ৭৮।৮০।৮৩ পৃঃ।)

কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। পণ্ডিতেরা আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলে নামের জন্য আটকাইবে না।"......কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক প্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক :—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যাহার বিভক্তিচিহ্ন এ' এবং তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় করা দুরূহ, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান, কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিবার দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। * সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাঙ্গলা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই।"

ত্রিবেদী মহাশয়ের এই অভিনব প্রস্তাব আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না, এবং সম্প্রদান, করণ ও অপাদান প্রভৃতি কারকের বিভক্তিচিহ্ন ও অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তও যুক্তিসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা 'কারক' ও 'বিভক্তি' এই দুইটি শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ বা লক্ষণ কি, তাহা দেখিব। সংস্কৃত ব্যাকরণে "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" ইহাই সাধারণতঃ কারকের লক্ষণ। কোনও বাক্যে ক্রিয়ার সহিত যে পদের অন্বয় আছে, তাহাকে কারক বলে। এই 'অন্বয়' (অনু+ই+অল্) শব্দের অর্থ, অনুগমন। তবেই যে পদ ক্রিয়ার অনুগত, অর্থাৎ ক্রিয়া যাহাকে কোনও না কোনও প্রকারে আকর্ষণ বা শাসন (ইংরাজী ব্যাকরণে ইহাকে 'Government' বলে) করে, তাহার নাম কারক। সুতরাং কারকের এই ক্রিয়ানুগামিত্ব সামান্যতঃ অর্থের উপরই নির্ভর করে। সেই জন্য ক্রিয়ানুগামিত্বের প্রকারভেদে অর্থাৎ অর্থভেদে কারকভেদ হইয়াছে। "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" এই সূত্রের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। 'ক্রিয়ান্বয়ী' এই পদের অর্থ ক্রিয়ায়াঃ অন্বয়ঃ অস্যাস্য—ক্রিয়ার অন্বয় ইহার আছে। এ স্থলে 'ক্রিয়ায়াঃ' এই পদের বিভক্তি 'কর্ত্তরি ষষ্ঠী' অথবা 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' হইতে পারে। কর্ম্মণি ষষ্ঠী ধরিলে সূত্রের অর্থ পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই হইবে—অর্থাৎ যে পদ ক্রিয়ার অনুগমন করে, তাহার নাম কারক। কিন্তু যদি কর্ত্তরি ষষ্ঠী ধরা যায়, তবে অর্থ ইহার ঠিক বিপরীত হইবে—ক্রিয়া যে পদকে অনুগমন করে, তাহাকে কারক বলে। বিভক্তির প্রয়োগভেদে এইরূপ অর্থ-বৈপরীত্য ঘটিতেছে বলিয়া বৈয়াকরণের "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" এই সূত্রের কোনও প্রমাদ

* "বাঙ্গলায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্ব নাই। এই দুইটিকে উঠাইতেই হইবে।" (শব্দকথা ৮৬ পৃঃ।)

ঘটিবে না। কারণ যে দিক্ দিয়াই হউক, ক্রিয়ার সহিত কোনও পদের এই অনুগামিত্ব সম্বন্ধ থাকিলেই সে পদ কারক-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। কারকের এই প্রাচীন সূত্রটির ঐ রূপ অর্থ-দ্বন্দ্ব দেখিয়াই, বোধ হয়, 'কলাপ' ব্যাকরণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কারকের একটি নূতন সূত্র করিয়াছেন। "ক্রিয়ানিমিত্তং কারকং লোকতঃ সিদ্ধম্"—তিনি এই উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার এ উপদেশের অর্থ এই—"যৎ ক্রিয়ানিমিত্তমাত্রং প্রধানমপ্রধানং বা যতঃ ক্রিয়া ভবতি তৎ কারকমুচ্যতে" ইতি লোকতঃ সিদ্ধম্। অর্থাৎ, যে পদ ক্রিয়াসম্পাদনে নিমিত্ত হইবে, তাহা, প্রধানই হউক আর অপ্রধানই হউক, কারক নামে কথিত হয়, এবং ইহা লোক-ব্যবহার-(Common-sense)-সিদ্ধ। দুর্গসিংহের এই সূত্র প্রাচীন সূত্রটি অপেক্ষা সরল ও স্পষ্টতর। কলাপ ব্যাকরণের এক জন টীকাকার কারকের এই নূতন সূত্রের ব্যাপকতা এতটা সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়াছেন যে, তিনি 'সম্বন্ধ' পদকেও কারক বলিতে উদ্যত হইয়া, "সম্বন্ধস্য ক্রিয়ানিমিত্তত্বেঽপি ষট্সু কারকশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ ন কারকত্বমিতি সংক্ষেপঃ"—(সম্বন্ধ, ক্রিয়ানিমিত্ত হইলেও কারক শব্দের ষট্‌সংখ্যায় রূঢ়ত্ববশতঃ কারক সংজ্ঞার অধিকারী হইতে পারিল না) এই কথা কহিয়া আত্মসংবরণ করিয়াছেন। *

উপরে কারকের যে দুইটি সূত্র উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অর্থের প্রকার অনুসারেই কারকের প্রকার হয়। এই জন্য কোনও ক্রিয়াব্যাপারে প্রধান ও অপ্রধান যে কয় প্রকার অর্থের সংযোগ প্রতীত ও আবশ্যক হইবে, তৎসংখ্যক কারকেরও প্রয়োজন হইবে। এই হেতু কারকের সংখ্যা অর্থবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত—বিভক্তির প্রয়োগ বা অল্পাধিক্যের দ্বারা নিয়মিত নহে, এবং সেই কারণে তাহা ভাষাভেদের অধীন নহে। কারকের এই নিত্যত্ববশতঃ পৃথিবীর যে সকল সভ্য জাতির ভাষা সম্যক্ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের ব্যাকরণে কারক-সংখ্যা প্রায় একই রূপ। ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণে (প্রকৃতপক্ষে ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ নাই) যে কারক-সংখ্যা অল্পতর, তাহা সে ভাষার ত্রুটীমূলক। সে যাহা হউক, অর্থভেদে কারকভেদ বলিয়া বিভিন্ন কারক নির্দ্দেশের জন্য বিভিন্ন বা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ চিহ্নগুলির নাম 'বিভক্তি'। শব্দের উত্তর এই

---

* কোনও কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধপদকে যে সম্বন্ধ কারক বলা হয়, তাহার অনুকূল পক্ষে টীকাকার সুষেণাচার্য্যের এই উক্তি যুক্তির আভাসরূপে গৃহীত হইতে পারে।

বিভক্তিগুলি যুক্ত হইয়া অর্থভেদ ও তাহা হইতে কারকভেদ সংঘটিত করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ছয়টি কারকের জন্য ছয়টি বিভক্তি আছে। কারকের জন্যই এই বিভক্তিগুলির উৎপত্তি। বিভক্তির জন্য কারকের উৎপত্তি নহে। আবার, কারকের এই বিভক্তিগুলির আকার সর্ব্বত্রই যে একেবারে বিভিন্ন, এমন নহে। যথা—প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের বিভক্তি, তৃতীয়া-চতুর্থী-পঞ্চমীর দ্বিবচনের বিভক্তি, চতুর্থী-পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি, এবং পঞ্চমী-ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি, ক্রমান্বয়ে সাধারণতঃ একরূপ। এই কারণে বিভক্তি সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র না হইলে যে স্বতন্ত্র কারক হইতে পারিবে না, এমন নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'বিভক্তি' শব্দের লক্ষণ এইরূপ—"অর্থস্য বিভজনাদ্ বিভক্তয়ঃ" ইতি দুর্গসিংহঃ। ইহার টীকার্থ এই—"সংখ্যাকর্ম্মাদয়ো হ্যর্থা বিভজ্যন্তে যাভি স্তা বিভক্তয়ঃ"—যাহা দ্বারা সংখ্যা ও কর্ম্মাদিরূপ অর্থ বিশিষ্টরূপে বিভক্ত হয়, তাহাকে বিভক্তি বলে। 'বিভক্তি' শব্দের এই লক্ষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ত্তৃকর্ম্মকরণাদি কারকের অর্থ বিভাগ করিবার জন্যই এই জাতীয় বিভক্তির উৎপত্তি। কারকের অর্থগত নিত্যত্ব সম্বন্ধে স্ফুটতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? দুঃখের বিষয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের মত বিচক্ষণ ধীমান্ ব্যক্তি কারকের এই নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আদান প্রদান।

১

নয়ানজুলির ব্রজ সরকার নিজে বিবাহ না করিয়া যখন খুড়তুত ভাই রসিকের বিবাহের উদ্যোগ করিল, তখন পাঁচ জনে এই নির্ব্বোধ লোকটার বুদ্ধি-হীনতা-দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা শুধু বিস্ময় অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, অযাচিতভাবে মূর্খ ব্রজ সরকারকে নিজের বাপের বংশ বজায় রাখিবার জন্য অনেক উপদেশও দিল। বুদ্ধিহীন ব্রজ কিন্তু এই সকল বুদ্ধিমান্ হিতৈষীদিগের উপদেশের সার্থকতা অনুভব করিল না; সে হাসিয়া উত্তর করিল, 'রসিকের বাপের বংশ আর আমার বাপের বংশ কি আলাদা!'

আসল কথা, ছোট মুদীখানার দোকানটার আয়ে দুইটা পেট চালাইয়া

দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সে যে তিন শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাতে এক জনের বিবাহ হইতে পারে। সে এক জন ব্রজ নিজে হইলে, আবার যে অতগুলি টাকার যোগাড় করিয়া রসিকের বিবাহ দিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। বিবাহ করিলে আর একটী পেটের খরচ বাড়িবে। এই সামান্য দোকানের আয়ে তিনটী পেটের খরচ যোগাইয়া আর দশ বৎসরেও সে এতগুলি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে কি না সন্দেহস্থল। এ দিকে রসিকেরও বিবাহের বয়স হইয়াছে। অগত্যা ব্রজ নিজে বিবাহ না করিয়া সঞ্চিত টাকায় রসিকের বিবাহ দিতে উদ্যত হইল।

খুড়া ধনঞ্জয় সরকার অনেক দিন পূর্ব্বে পৃথক্ হইয়াছিল, এবং জমীদারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া মৃত্যুকালে এত দেনা রাখিয়া গিয়াছিল যে, জমী জমা ঘর ভিটা সব বেচিয়া লইয়াও মহাজন সমগ্র টাকার উশুল পাইল না। সাত বছরের ছেলে আর পাঁচ বছরের মেয়ে উমার হাত ধরিয়া খুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহত্যাগ করিলেন। ব্রজ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিল, 'ভাবনা কি খুড়ী, আমার কুঁড়ে তো আছে।'

অনেক দিন আগে ব্রজ মাতৃপিতৃহীন হইয়াছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। সে নিজে রাঁধিত, নিজে খাইত ; বাকী সময়টা তাসের আড্ডায় ও কীর্ত্তনের আখড়ায় ঘুরিয়া দিন কাটাইয়া দিত। যে দুই পাঁচ বিঘা জমী ভাগজোতে বিলি ছিল, তাহারই আয়ে কোনরূপে দিন চলিয়া যাইত। আর দিন চলিবার জন্য তাহার উদ্বেগও কিছুমাত্র ছিল না। শুধু এক এক দিন স্তব্ধ সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আপনাকে যখন নিতান্ত একা বলিয়া মনে হইত, তখন সে ঘরে চাবি লাগাইয়া কীর্ত্তনের আখড়ায় ছুটিয়া যাইত, এবং কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিতে থাকিত—

'আমি ভবে একা দাও হে দেখা, ওহে বাঁকা বংশীধারী !"

সুতরাং ব্রজ শূন্য সংসারে খুড়ীকে পাইয়া খুবই উৎসাহিত হইল। প্রতিবেশী যদু সান্যাল মহাশয় বলিলেন, 'হাঁ হে ব্রজ, এ সব আবার জড়ালে কেন ?'

ব্রজ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কও কথা দাদাঠাকুর, এ আবার জড়াজড়ি কি ? মা আর খুড়ী কি আলাদা ?'

কিন্তু দিন কতক পরে যখন দিন চলিবার ভাবনা আসিল, তখন ব্রজনাথের আনন্দের মাত্রাটা যেন কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িল। তবে সে একে-

বারে নিরুৎসাহ হইল না, মায়ের এক যোড়া কাণের পাশা আর দুই গাছা রূপার পৈঁছে ছিল। তাহা পঞ্চাশ টাকায় বেচিয়া একটী ছোট মুদীখানার দোকান খুলিল। দোকানের আয়ে কোনরূপে সংসার চলিতে লাগিল। ব্রজ রসিককে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

এক দিন ব্রজ মধ্যাহ্নে ঘরে শুইয়া শুনিতে পাইল, প্রতিবেশিনী বামার মা আসিয়া খুড়ীর দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে, এবং এখনও যদি তিনি ছেলেটীকে মানুষ করিয়া তাহার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেও যে তাঁহার যথেষ্ট সৌভাগ্য, ইহাও ব্যক্ত করিতেছে। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া খুড়ী হতাশভাবে বলিতেছেন, 'হায় মা, মাথা পেতে দাঁড়াবার জায়গা নাই, আর মাথায় জল দেব। কপাল আমার!'

ব্রজ চুপ করিয়া শুইয়া এই সকল আক্ষেপোক্তি শুনিতে লাগিল।

তার পর উমার বিবাহ হইল। খুড়ী মারা গেল। ব্রজ তিলকাঞ্চনে খুড়ীর শ্রাদ্ধ করিল। রসিক তখন পাঠশালা ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জমীদারী-কাছারীর গোমস্তা শিবু চক্রবর্ত্তীকে ধরিয়া ব্রজ তাহাকে পাটোয়ারী কাজের শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া দিল।

চারি বৎসর শিক্ষানবীশীর পর রসিকের মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনা হইল। ব্রজনাথের আনন্দের সীমা রহিল না। সে মহোৎসাহে ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। লোকে বলিল, 'ব্রজ, আগে নিজে বিয়ে ক'রে তার পর ভায়ের বিয়ে দেবে।'

ব্রজ উত্তর করিল, 'আমার কি আর বিয়ের বয়স আছে? এখন ছোঁড়াটার মাথায় এক গণ্ডূষ জল না দিয়ে নিজে টোপর মাথায় দেওয়া কি সাজে?'

তাহাই হইল। ব্রজনাথ দুই শত টাকা কন্যাপণ দিয়া রাধানগরের নকুড় ঘোষের বারো বছরের মেয়ে থাকমণিকে ঘরে আনিল। বিবাহের এক মাস পরেই রসিক নরুণচকের গোমস্তার পদে নিযুক্ত হইল। নকুড় ঘোষ গর্ব্ব-সহকারে ব্রজনাথকে বলিল, 'আমার মেয়ের আয়-পয়টা দেখলে হে সরকারের পো?'

আহ্লাদে গদগদকণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, 'ছোট বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

কিন্তু মাস কয়েক পরে যখন উমার বৈধব্য-সংবাদ আসিয়া ব্রজনাথের আনন্দটাকে ম্লান করিয়া দিল, তখন সে ছোট বৌমার লক্ষ্মীত্বের উপর সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে নিজে গিয়া সদ্যোবিধবা উমাকে

গৃহে লইয়া আসিল। রসিক বলিল, 'রায় মহাশয়ের (উমার স্বামীর) জমী জায়গাগুলার কি বন্দোবস্ত করলে?'

ব্রজনাথ উদাসভাবে বলিল, 'সে উমির দেওর যা হয় করবে।'

রসিক বলিল, 'সে একা ভোগ করবে?'

বিরক্তির সহিত ব্রজনাথ বলিল, 'ভোগ করুক, বিলিয়ে দিক্, সে তার খুসী। আমার কি অত ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে? আমার তিন তিন দিন দোকান বন্ধ!'

জ্যেষ্ঠের নির্ব্বুদ্ধিতায় রসিকের হাসি আসিল। হাসি চাপিয়া সে মনে মনে স্থির করিল, সুবিধামত এক দিন গিয়া জমীজায়গাগুলার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে। অল্প জমী ত নয়, আট দশ বিঘা লাখরাজ জমী, অন্ততঃ সাত আট শো টাকায় বিক্রয় হইবে।

২

'উমি, ও উমি, ও পোড়ারমুখী!'

'কেন গা দাদা?'

'বলি—এ সব কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে আবার?' বলিয়া উমা ছুটিয়া আসিল, এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ ত তোমার তামাক সাজা রয়েছে, ধরিয়ে খাও না।'

'আর এই গাড়ুর জল? এটাও খেতে হবে নাকি?'

রাগে চোখ মুখ ঘুরাইয়া উমা বলিল, 'না, আমার ছরাদ করতে হবে।'

ব্রজনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এই পোড়ারমুখী রেগে মরেছে।'

মুখখানা ভারী করিয়া উমা বলিল, 'তোমার কথায় মরা মানুষেরও রাগ হয়, আমি তো জ্যান্ত মানুষ। তামাক সাজা রয়েছে, খাবে; গাড়ুতে জল আছে, মুখ হাত পা ধোবে; তা নয়, এটা কি হবে, ওটা কি হবে?'

তাহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া ব্রজ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'মর পোড়ারমুখী, সাধে কি বলি? তোর আক্কেলটা কি রকম? আমি মুখ্যু মানুষ, আমার কি এই সাজা তামাক খাওয়া, গাড়ুর জলে পা ধোয়া পোষায়?'

ভ্রাতার মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উমা গাড়ুটা তুলিয়া লইল, এবং জলটা উঠানে ঢালিয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'আমার ঝকমারি হয়েছে; তুমি পুকুরঘাটে পা ধুয়ে এস; নিজে তামাক সেজে

খাও; আমি যদি আর কক্‌খনো তোমার কাজ করতে যাই, আমাকে গুণে সাত ঝাঁটা মেরো।'

ব্রজ তাহার হাত হইতে গাড়ুটা কাড়িয়া লইয়া হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'দূর পাগলী, তুই না করলে আমার কাজ করবে কে?'

'ভূতে' বলিয়া উমা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রজনাথ কিন্তু তাহার রাগ দেখিয়া একটুও শঙ্কিত বা বিমর্ষ হইল না; উমার এই তীব্র ক্রোধের ভিতর দিয়া যে একটা স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহারই মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সে প্রফুল্লমুখে কলিকায় আগুন ধরাইল। তার পর ফুঁ দিয়া আগুনটা জমকাইয়া লইয়া তামাকে টান্ দিতে দিতে ডাকিল, 'উমি, ও উমি!'

দুই তিন বার ডাকের পর উমা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, এবং ভারী মুখে গম্ভীরস্বরে বলিল, 'আবার কি? হুঁকোর বাসি জলটা চাই নাকি? কিন্তু তা তো আর পাবার উপায় নাই।'

ব্রজ এমনই জোরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসি তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়া বিষম কাশি উৎপাদন করিল। খানিকটা খুব কাশিয়া হাসিয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'নাঃ, তুই নেহাৎ হাসালি উমি।'

উমা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'তুই রাগ করিস্ কেন? আমি বলছিলাম কি জানিস্?'

'কি বলছিলে?'

'আমি বলি যে, আমার এত করবার দরকার কি? যার না করলে চলে না, তাকে একটু দেখবি শুনবি।'

'তাকে দেখবার লোক কোন নাই?'

'থাকলেও ছোট বৌমা একা, সংসারের কাজ কর্ম্ম আছে। আর আমি যেমন সব নিজের হাতে ক'রে নিতে পারি, সে তা পারে না। তার পান থেকে চূণটী খস্‌লে কি কাণ্ডটা করে, তা জানিস্ তো?'

'খুব জানি।'

'সেই ভয়েই তো বলি, তার দিকে একটু নজর রাখবি।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া উমা বলিল, 'সে হ'লো দশ টাকা মাইনের গোমস্তা-বাবু, আর তুমি দোকানদার।'

ব্রজ পুনরায় হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এই দেখ্ দেখি তোর ছেলেমানুষী! নাঃ, তোর কোনও কালেই বুদ্ধি হবে না।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না হয় না হবে।'

ব্রজনাথ মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, 'না হয় না হবে! একটু বুঝে দেখ্না। আমার তরে তো কিছু আটকায় না। আর হাজার হোক, রস্কে হ'লো তোর মার পেটের ভাই। বলে—আক চেয়ে কি সোঁদর মিঠে?'

ক্রোধতীব্রকণ্ঠে উমা বলিল, 'তাই ভেবেই তুমি বুঝি আমার কাজ পছন্দ কর না দাদা? আমাকে তুমি আজ কাল পর ভাব?'

হাসিতে হাসিতে ব্রজনাথ বলিল, 'মনে কর্ না—তাই ভাবি। আর আমার দেখাদেখি তুইও আমাকে একটু পর ভাব দেখি।'

উমা রাগে মুখ ভার করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ বলিল, 'আসল কথাটা কি জানিস্, আমার কাজ করতে গিয়ে তোকে যে লাঞ্ছনা সইতে হবে, সেটা কি ভাল?'

উমা বলিল, 'আমার আবার কিসের লাঞ্ছনা বল তো?'

মৃদু হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, 'কিসের লাঞ্ছনা, তা তুইই জানিস্ উমি, তবে আমাকে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ কেন? একে তো তোর কপাল পুড়ে আমার বুকে বাজ পড়েচে, তার উপর আমার তরে যদি তোকে দু'কথা শুনতে হয়—না উমি, তা আমার সহ্য হবে না।'

ব্রজনাথের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। উমা জোরে মাথা নাড়িয়া ভারী গলায় বলিল, 'না হয় না হবে, কিন্তু আমি কারও দাসী বাঁদী নই যে, সকলের কাজ কত্তে যাব। আমি কারও কিছু করতে পারব না, তাতে আমাকে ভাত কাপড় দাও—চাই না দাও।'

উমার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজনাথের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, সে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া আপন-মনে বলিল, 'না, মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবার যো নাই।'

সে হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিল। হঠাৎ রন্ধনশালা হইতে ছোট বোয়ের মৃদু অথচ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিল। সে মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল। শুনিতে পাইল,

ছোট বৌ উমাকে উদ্দেশ করিয়া আপন-মনে বলিতেছে, 'দরদ দেখেও বাঁচি না। আদরের বোন; একটা সংসার পেটে পূরে এসেছেন, এখন আবার এ সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্চেন।'

হুঁকাটা বাঁ হাতে ধরিয়াই ব্রজনাথ ঘরের বাহির হইয়া আসিল, এবং ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিল, 'ছোট বৌমা!'

ছোট বোয়ের কণ্ঠ নীরব হইল। ব্রজনাথ রোষক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'মুখ সামলে কথা কইবে বৌমা, উমি কারও বাবার ঘরে যায় নি, সেটা মনে রেখো।'

সে হুঁকাটা রাখিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

৩

মেয়েমানুষ বিধবা হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইলে, তাহাকে ভ্রাতার না হউক, অন্ততঃ ভ্রাতৃবধূর পাঁচ কথা শুনিতে হয়। ইহার উপর উমা যখন ব্রজনাথের উপর একটু বেশী টান দেখাইতে লাগিল, তখন এই পক্ষপাতিতার জন্য তাহাকে বেশ দশ কথা শুনিতে হইল। কথা শুনিলেও উমা কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া থাকিতে পারিত না। সে যখন দেখিল, দাদা—যে এই সংসারের স্তম্ভস্বরূপ, আপনার সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়া যে এই সংসারটীকে খাড়া করিয়াছে, এবং সে জন্য যাহার নিজের দিকে চাহিবার অবসর একটুও হয় নাই, সেই লোকটীর নিঃস্বার্থতা কাহারই সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না, অথচ সে সংসারের এই গভীর অবজ্ঞাকে এমনই অনায়াসে সহ্য করিয়া যাইতেছে, যাহা রক্ত মাংসের শরীরে নিতান্তই অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্যজনক; সময়ে এক ঘটী জল, এক মুঠা ভাত পাইলেই সে কৃতার্থ হয়, অথচ সেটাও যেন তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের মধ্যেই নয়, শুধু অপরের দয়ার উপরেই তাহার জীবনটা নির্ভর করিতেছে; যেন রাজ্যেশ্বর আপনার রাজৈশ্বর্য্য সব বিলাইয়া দিয়া ভিক্ষুকের বেশে লোকের করুণা চাহিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তখন ব্রজনাথের এই মহত্বপূর্ণ ভিক্ষা উমার হৃদয়ে সম্ভ্রম ও ভক্তির উদ্রেক করিলেও লোকের নিদারুণ অকৃতজ্ঞতা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং সে এই সকল অকৃতজ্ঞ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অন্যায়ের প্রতীকারে উদ্যত হইল।

কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিরোধ-চেষ্টাই যে কাহারও কাহারও নিকট নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইল, তাহা উমা বুঝিল না। আমার যাহা কর্ত্তব্য,

তাহা আমি পালন করি বা না করি, অন্যে আসিয়া যে আমার কর্ত্তব্যের অসম্পূর্ণতাটুকু পূরণ করিয়া দিবে, ইহা সহ্য করিতে পারি না; মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আসিয়া এখানে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে একটা বিদ্বেষ উৎপাদন করে, এবং তাহাতেই অপরের অযাচিত উপকারও শ্লেষ ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। সুতরাং জ্যেষ্ঠের উপর উমার পক্ষপাতে ছোট বোয়ের অন্তর বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিল। সে বিদ্বেষটা ব্রজনাথের উপর নয়, উমার উপরেও নয়, শুধু নিজের অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যের উপর উমা যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেইটুকুর উপরেই তাহার সকল ক্রোধ, সকল বিদ্বেষ আসিয়া পড়িল, এবং তাহার ফলে সময়ে সময়ে উমাকে বেশ দুই পাঁচ কথা শুনিতে হইল। উমা কিন্তু সে সব কথা গায়ে মাখিয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিতে চাহিত না। সে সহিষ্ণুতার সহিত আপনার কাজ করিয়া যাইত।

কিন্তু সে দিন তাহার জন্য ব্রজনাথকে বিচলিত হইতে এবং ছোট বোয়ের পিতৃ-উচ্চারণ করিতে শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর ব্রজনাথ দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে আসিলে সে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার রকম কি দাদা?'

ব্রজনাথ স্বাভাবিক মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর দিল, 'কিসের রকমটা উমি?'

উমা ঘাড় দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'তোমার উপর অন্যায় হইলে আমি কিছু বলতে পার না, তবে আমার কথায় তুমি কথা কইতে যাও কেন?'

তাহার মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব্রজনাথ বলিল, 'তুই যে ছোট বোনটী।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, 'কক্ষণো না, তুমিই বলেছ, মার পেটের ভাই নও, পর।'

উমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। ব্রজনাথ ঘাড় নীচু করিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। উমা ভারী গলায় বলিল, 'আমার তা হ'লে এখানে থাকা হবে না, দাদা।'

ব্রজনাথ মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

উমা বলিল, 'পরের জন্য কথা কইতে গিয়ে তুমি যে একটা অনর্থ বাধাবে, তা আমি দেখতে পারব না।'

মুখ তুলিয়া সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'দূর পোড়ারমুখী, তুই পর?'

উমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ব্রজনাথ

বলিল, 'সত্যি উমি, মুখের কথা আর হাতের শর, একবার ছাড়লে আর ফেরে না। ছোট বৌমাকে কথাটা ব'লে অবধি মনটা খারাপ হ'য়ে আছে।'

উমা নিরুত্তর। ব্রজনাথ বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, বোস্ না।'

উমা বসিল। ব্রজনাথ হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া ফুৎকার দ্বারা হুঁকার ধূলা ঝাড়িয়া তাহাতে টান দিল। ঘরের ভিতর রেড়ীর তেলের আলোটা মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের জিনিস-পত্রগুলা ঝাপ্সা দেখাইতেছিল। বাহিরে মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে ঝিম্-ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরের পিছনে খিড়কীপুকুরের পাড় হইতে ভেকের অশ্রান্ত চীৎকার উত্থিত হইতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাসটা রহিয়া রহিয়া উদাস-ভাবে বহিয়া যাইতেছিল।

উমা ডাকিল, 'দাদা!'

'কেন উমি?'

'আমার একটা কথা রাখবে?'

'তোর কোন্ কথা না রাখি?'

'সে ছোট খাট কথা।'

'বড় কথাই একটা ব'লে দেখ।'

'বল্লে রাখবে?'

'রাখবো।'

'তুমি বিয়ে কর।'

এই অসম্ভাবিত প্রস্তাবে ব্রজনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া চোখ দুইটা বিস্তৃত করিয়া উমার মুখের দিকে চাহিল। বিস্ময়স্তব্ধকণ্ঠে বলিল, 'বিয়ে! আমি!'

জোর গলায় উমা বলিল, 'হাঁ, তুমি। কেন, তোমাকে কি বিয়ে কত্তে নাই?'

ব্রজনাথ নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিল। উমা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আগ্রহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল?'

ব্রজনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পাগল! বিয়ে!—এই বয়সে?'

উমা বলিল, 'কত আর বয়স তোমার? জোর তিরিশ হবে।'

ব্রজনাথ বলিল, 'দূর, আট গণ্ডা সাড়ে আট গণ্ডা হবে।'

উমা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'তবে আর কি তোমার বিয়ের বয়স আছে? তোমার বোনকে কত বয়সের ছোকরার হাতে দিয়েছিলে?'

'যতই হোক, তিরিশের বেশী হবে না।'

বলিয়া ব্রজনাথ একটু ম্লান হাসি হাসিল। বাহিরে বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গড়্-গড়্ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। ব্রজনাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল দাদা ?'

ব্রজনাথ মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া বলিল, 'ছিঃ, লোকে কি বলবে ?'

'কিন্তু লোকে কি অসময়ে তোমার মুখে এক গণ্ডূষ জল দিতে আসবে ?'

'লোকে না দেয়, তুই দিবি।'

'আমার দায় পড়েছে।'

বলিয়া উমা রাগে মুখ ফিরাইয়া লইল। ব্রজনাথ গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে বলিল, 'কিন্তু বিয়ে তো মুখের কথা নয়, তিন চার শো টাকা চাই।'

উমা বলিল, 'সে সব আমি জানি না, তুমি করবে কি না, তাই বল।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'যদি না করি ?'

উমা উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, 'তা হ'লে এই ভিটের যদি তেরাত্তির পোয়াই, তবে আমার নাম উমিই নয়।'

বলিয়া উমা ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। ব্রজনাথ ডাকিল, 'শোন্ উমি, শোন্।'

উমা কিন্তু ফিরিল না। ব্রজনাথ হুঁকাটা মুখের কাছে ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দটা একটু প্রবল হইয়া আসিল।

৪

পর দিন রসিক বাড়ী আসিলে উমা তাহাকে ধরিয়া বসিল। দাদা বিবাহ করিবে শুনিয়া রসিক প্রথমে খুব খানিকটা হাসিল; তার পর বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, 'বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, রোজগারের ক্ষমতা নাই, ওকে মেয়ে দেবে কে ?'

রসিকের কথায় উমার রাগ হইল; রাগিয়া বলিল, 'দাদার রোজগারের ক্ষমতা না থাকলে আজ তুমি রোজগারী হ'তে না ছোটদা।'

রসিক এই রূঢ় উত্তরে ভ্রূকুটী করিল। উমা বলিল, 'টাকা পেলে মেয়ে দেবার অনেক লোক আছে, তুমি মেয়ের চেষ্টা দেখ।'

রসিক বলিল, 'তা যেন দেখবো, কিন্তু টাকা ? দাদার হাতে টাকা আছে ?'

'তা আমি জানি না।'

'কিন্তু সেটা আগে জানা দরকার। দেনা আমি করতে পারব না, ঋণ পাপকে আমার বড্ড ভয়।'

উমা বলিল, 'দেনাই হোক, পাওনাই হোক, বিয়ের চেষ্টা তুমি দেখ।'

উমা চলিয়া গেলে ছোট বৌ স্বামীকে বলিল, 'আসল কথাটা কি জান, ঠাকুরঝিই ওঁকে বিয়ের তরে ধরে বসেছে।'

রসিক গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উত্তর করিল, 'সেটা আমি বুঝি, তা নৈলে এত দিনের পর দাদার বিয়ের ঝোঁক উঠবে কেন। বুড়ো বয়সে চূড়োকরণ।'

ছোট বৌ বলিল, 'তা চূড়োকরণই হোক, আর যাই হোক, তুমি চেষ্টা দেখ। নয় তো ভারী লোকনিন্দে হবে। অমনই তো লোকে কত কথা বলে, নিজে বিয়ে করলে না, ভায়ের বিয়ে দিলে!'

বিরক্তিপূর্ণস্বরে রসিক বলিল, 'কেন দিলে? আমি কি বিয়ের তরে কেঁদে বেড়িয়েছিলাম?'

ছোট বৌ বলিল, 'তা তুমি কেঁদেই বেড়াও, আর হেসেই বেড়াও, উনি যেমন তোমার বিয়ে দিয়েছেন, তেমনি তুমিও দিয়ে দোষ থেকে খালাস হও।'

ক্রোধে মুখভঙ্গী করিয়া রসিক বলিল, 'বিয়ে দেব, টাকা কোথায়? তিন চার শো টাকা চাই।'

ছোট বৌ বলিল, 'তুমিও কতক দাও, উনিও কতক যোগাড় করুন। তুমি তো আমাকে দু'শো টাকার নেক্লেস দেবে বলেছিলে, সেই টাকাটাই না হয় দাও না।'

বলিয়া ছোট বৌ একটু হাসিল। রসিক কিন্তু সে হাসিতে একটুও প্রীত হইল না; রাগে হাত নাড়িয়া বলিল, 'সে টাকা আমার বাক্সে তোলা আছে কি না? পূজোর কিস্তী না এলে হবে না।'

অগত্যা ছোট বৌ নিরস্ত হইল। উমা কিন্তু নিরস্ত হইল না; সে শুধু ছোটদার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, প্রতিবেশীদিগকেও চেষ্টা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিবেশীরা সরলপ্রাণ ব্রজনাথের উপর সন্তুষ্ট ছিল, এবং সে বিবাহ না করায় তাহাদের অনেকে দুঃখিত হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রজনাথ বিবাহ করিবে শুনিয়া তাহারা মহোৎসাহে পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পাত্রীর অভাব হইল না। তিন শত টাকা পণে একটী মেয়ে স্থির হইল। বিবাহের দিনও নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সব ঠিক হইয়া গেলে রসিক জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল, 'টাকার যোগাড় আছে তো দাদা?'

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল, 'টাকার যোগাড় না ক'রে কি কাজে হাত দিয়েছি রে ভাই!'

রসিক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ঐ তো সামান্য তিন পয়সার দোকান; উহার দ্বারা সংসার চলে; তাহার উপর এক কথায় এত টাকার যোগাড় কিরূপে হইল? কথাটা বুঝিতে না পারিলেও রসিক মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, নিজেই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। রসিক জানিত না যে, সঞ্চয়ী ব্রজনাথ যে উপায়ে কিছু কিছু জমাইয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিল, সেই উপায়েই এই কয় বৎসরে সে আড়াই শত টাকা জমাইয়াছিল; বাকী শ' খানেক টাকা কর্জ্জ করিবে, স্থির করিয়াছিল।

রসিক ভিতরের কথা জানিত না, সুতরাং সে আপনার পাটোয়ারী বুদ্ধির দ্বারাও এই অর্থ-সংগ্রহের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিল না। অনেক চিন্তার পর অবশেষে সে যেন একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইল, এবং সেই সূত্র ধরিয়া সে একেবারে উমার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া রসিক যাহা দেখিল, তাহাতে সে যেন সহসা গাছ হইতে পড়িল। সে দাদাকে বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য বলিয়াই জানিত, কিন্তু সে যে এতটা বিশ্বাসঘাতক, এমন জুয়াচোর হইতে পারে, ইহা কোনও দিন কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। সে উমার দেবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জমী জায়গা-গুলার বন্দোবস্তের কথা তুলিতেই উমার দেবর তাহাকে একখানা বিক্রয়-কোবালা দেখাইয়া দিল। রসিক দেখিল, তাহাতে উমা আপনার অংশের সমস্ত সম্পত্তি ছয় শত টাকায় দেবরকে বিক্রয় করিয়াছে। দলীলে ব্রজনাথ বকলমে উমার নাম স্বাক্ষর করিয়াছে; তাহার নীচে উমা বুড়া আঙ্গুলের ছাপ দিয়া দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছে। দেখিয়া রসিকের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। এতক্ষণে সে দাদার বিবাহের টাকা যোগাড়ের গুপ্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল।

৫

গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্ব দিনে সন্ধ্যার আগে ছোট বৌ বরণডালা সাজাইতেছিল; উমা পাশে বসিয়া কাল কখন কি করিতে হইবে, ছোট বৌকে তাহারই উপদেশ

দিতেছিল। ব্রজনাথ নিজের ঘরের দাবার উপর বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে উমাকে ডাকিয়া বলিল, 'আর কি কি চাই, এই সময়ে বল্ উমি, এর পর কাজের সময় এটা চাই, ওটা নিয়ে এস ব'লে যেন জ্বালাতন করিস্ নে।'

উমা সহাস্যে বলিল, 'কত কথা দাদা, এর মধ্যেই জ্বালাতনের ভয়? এই তো কলির সন্ধ্যা। এর পর বৌ এসে যে দিনরাত জ্বালাতন করবে। কি বল বৌদি?'

ছোট বৌ ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'দূর!'

ব্রজনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সে জ্বালাতন শুধু আমি একা হব না উমি, তোরা দু'জনেও তার ভাগ পাবি।'

উমা হাসিয়া উঠিল। ছোট বৌ মৃদুস্বরে বলিল, 'মেয়ের গায়ে-হলুদের কাপড়টা কিন্তু ভাল হ'ল না।'

উমা ডাকিয়া বলিল। 'শুনছো দাদা?'

ব্রজনাথ বলিল, 'ওগো! বুড়ো বরের কনে, তার কাপড়ের ভাল মন্দ নাই।'

উমা হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি বুড়ো ব'লে কনে তো বুড়ী নয়?'

ব্রজনাথ একটু হাসিয়া হুঁকায় ঘন-ঘন টান দিতে লাগিল। হঠাৎ একবার মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বলিল, 'এ ছোঁড়া গেল কোথায়? কাল গায়ে হলুদ, আজ পর্য্যন্ত দেখা নাই। নিজের বিয়ের বাজার আপনাকে করতে হবে জানলে উমি, কখনও তোর কথা শুনতাম না। ছি ছি, লোকে বলবে কি?'

উমা বলিল, 'বলবে কেন, বলছে।'

'কি বলছে?'

'নিন্দে। পাড়ায় কাণ পাতা দায়।'

'তোর মাথা!' বলিয়া ব্রজনাথ হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির বেগ না থামিতেই রসিক ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুকিল। ব্রজনাথ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, 'এই যে, কোথায় ছিলি রে? আমাকে গাছে তুলে দিয়ে বুঝি সরে দাঁড়িয়েছিলি?'

গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' বলিয়া রসিক ধীরগম্ভীরপদে নিজের ঘরে ঢুকিল। মুখ হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া রসিক নিজের ঘরের দাবায় বসিল। ব্রজনাথ লণ্ঠন জ্বালিয়া গাত্রহরিদ্রার পান সুপারী আনিবার জন্য বাহির হইতেছিল; এমন সময় রসিক ডাকিল, 'দাদা!'

লণ্ঠনটা উঠানে রাখিয়া ব্রজনাথ উত্তর দিল, 'কি রে রসিক ?'

রসিক বলিল, 'সত্যি কথা বলবে ?'

ব্রজনাথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'সত্যি কথা ? মিছে কথাই বা বলবো কিসের তরে ?'

তীব্রকণ্ঠে রসিক বলিয়া উঠিল, 'আর তোমার সাধুতা জানাতে হবে না। বিয়ের টাকাটা কোথা থেকে যোগাড় হলো শুনি।'

বিস্ময়ের সহিত ব্রজনাথ বলিল, 'কেন বল্ তো ?'

রসিক বলিল, 'কেন কি ? বলে ফেল না।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'চুরী করেছি।'

গর্জ্জন করিয়া রসিক বলিল, 'চুরী নয়, জুয়াচুরী করেছ।'

ব্রজনাথ বিস্ময়ে নীরব। ছোট বৌ রন্ধনশালার দরজা দিয়া মুখ বাড়াইল। উমা দাবার খুঁটীটা ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রসিক বলিল, 'একটা অবীরা বিধবার সর্ব্বনাশ করে' বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জা করে না ?'

ব্রজনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ধীর-প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিল, 'তুই কি বলছিস্ রসিক ?'

রসিক বলিল, 'উমার জমীজায়গা কত টাকায় বেচে এসেছ ?'

বিস্ময়রুদ্ধকণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, 'কত টাকায় ?'

রসিক চীৎকার করিয়া বলিল, 'হাঁ, ছ'শো টাকা নিয়ে ওর দেওরকে বিক্রী-কোবালা লিখে দিয়ে এসেছ। আর সেই টাকাগুলো এ'দিন গাপ্ করে রেখে এখন বিয়ে করতে যাচ্ছ। কেমন, ঠিক কি না ?'

ব্রজনাথ এমনই জোরে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল যে, তাহাতে রসিকও চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া সে হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা চুরী তুই ধরেছিস্ রসিক। ওরে মুখ্যু, গোপাল রায় যখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এই ক' বিঘে জমীই পুঁজি দাদা, এই নিয়ে যদি তোমরা হাঙ্গামা বাধাও, তা হ'লে ছেলে পিলে নিয়ে আমি মারা যাব।" তখন আমিও ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক। কিন্তু মানুষের মন নয় মতিভ্রম। তাই উমিকে দিয়ে একেবারে সাফ বিক্রী-কোবালা লিখে দিয়ে এলাম। বাস্, হাঙ্গামার মূলোচ্ছেদ। বুঝলি ?'

রসিক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া শ্লেষ পূর্ণস্বরে বলিল, 'চমৎকার গল্প বলেছ দাদা, কিন্তু আমিও পাটোয়ারীতে ঘুণ। এখন যদি ভাল চাও, টাকাগুলি বের করে দাও।'

ব্রজনাথ জোর গলায় বলিল, 'যদি না দিই ?'

রসিক বলিল, 'মগের মুল্লুক নাকি ? কালই দশ জন ভদ্রলোক ডেকে এর বিচার করবো। আমি রসিক সরকার, সহজে ছাড়বো, মনে করো না।'

ব্রজনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'ভদ্রলোক ডাকিয়ে আমাকে অপমান করাবি ?'

রসিক মাথা নাড়িয়া বলিল, 'নিশ্চয়।'

'কিন্তু উমির টাকায় তোর কি অধিকার ?'

'সম্পূর্ণ অধিকার। কেন না, সে আমার বোন।'

ব্রজনাথের হৃদয় ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল।

রসিক বলিল, 'যদি ভাল চাও, অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আমায় দাও।'

ব্রজনাথ লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিল, এবং অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিয়া রসিকের সম্মুখে তিন শত টাকা রাখিয়া দিল। উমা চীৎকার করিয়া বলিল, 'কর কি দাদা, কাল যে গায়ে-হলুদ।'

ব্রজনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। উমা ছুটিয়া আসিয়া নোটের তাড়াগুলা তুলিয়া লইতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রসিক সেগুলাকে হস্তগত করিল। উমা চীৎকার করিয়া বলিল, 'নিমকহারাম, দাদা যে নিজের বিয়ের টাকায় তোমার বিয়ে দিয়েছে! তোমার এই অন্যায় কি ধর্ম্মে সইবে ?'

ব্রজনাথ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'ছি উমি, আমার সামনে ওকে শাপ-সম্পাৎ দিস্ নে।'

উমা বলিল, 'কিন্তু তোমার যে বিয়ে।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'আর বিয়ে নয় উমি, বিয়ে না হ'তেই যে রসিক পর হ'তে যাচ্ছিল, বিয়ে হলে সে কি হ'তো বল্ দেখি।'

ছোট বৌ অগ্রসর হইয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'সে যা হয় হবে, কিন্তু তুমি বল ঠাকুরঝি, ঐ টাকা ক'টার তরে ওঁর বিয়ে আটকাবে না।'

বলিয়া সে আপনার গায়ের গহনাগুলা খুলিয়া ব্রজনাথের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। ব্রজনাথ সবিস্ময়ে বলিল, 'এ সব কি হবে ছোট বৌমা ?'

মৃদুস্বরে ছোট বৌ বলিল, 'আপনার বিয়ে ?'

ব্রজনাথ আবার হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তবে আজ আর একবার বলি বৌমা, এগুলা কি তোমার বাবার যে, যাকে তাকে দান করতে বসেছ ? আমার বিয়ে আটক করে কে ?'

বলিয়া সে আস্তে আস্তে গিয়া রসিকের হাতটা ধরিল, এবং তাহার হাত হইতে নোটের তাড়া কাড়িয়া লইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রসিক হত-বুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কবি-তর্পণ।

[স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মরণে।]

১

গাঁথিতে গাঁথিতে মালা আজি মালাকর—
ফুল-মাঝে কোথা অন্তর্ধান?
কত ফুট, কত কলি—
গেছে যে চরণে দলি',
গেছে ফেলি' বীণা তার, কাঁদেনি অন্তর।
শুনিবে কি আকুল আহ্বান?

২

কোথা গেল রাজহংস ত্যজি' পদ্মসর—
কোন্ স্বচ্ছ মানসের তীরে?
অমরীরা কুতূহলে
ক্রীড়া করে যার জলে
উৎক্ষেপিয়া রাশি রাশি মুকুতা-শীকর!
সেথা হ'তে আসিবে কি ফিরে?

৩

মেঘের ঝঞ্ঝনা-ধ্বনি—প্রাবৃট-উৎসব
কঠোর কি বেজেছিল কানে?
তাই কি সে পিকবর
গেলা উড়ি দেশান্তর,
(অনন্ত বসন্ত যেথা কাকলী-মুখর)
মুখর করিতে মধু পানে!

৪

হে অতৃপ্ত, ফুলে ফুলে মধুপ যেমন
ভাব-মধু করিলে সঞ্চয়;
আজি কোথা গেলে উড়ি',
(পাব না ত মাথা খুঁড়ি')
কোন্ অভিনব কুঞ্জে করিতে গুঞ্জন—
হে তৃষিত হইলে উদয়?

৫

উত্তীর্ণ যে হয় সন্ধ্যা—ওগো পুরোহিত,
অর্চনার কাল বুঝি বহে।
সাঁঝের আরতি তরে
ধর গো 'প্রদীপ' করে,
তোমার মঙ্গল শঙ্খ কর গো ধ্বনিত,—
এস এস, বিলম্ব না সহে!

৬

এত ত্বরা, লীলা শেষ! হে সুহৃৎ কবি,—
সাঙ্গ কি হ'য়েছে তব গান?
প্রকৃতির বুকে মধু—
তেমনি ত আছে, বঁধু,
মালঞ্চে তেমনি ফুল, অক্ষয় সুরভি!—
নহে নহে আজি অবসান।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ঝুলন।

গৌড় মল্লার।

সখি কি বলিবি মোরে, না দুলে দোলায়
সে যে কোথা গেল চলে সারা বাদলায়।
কেমনে গো রহিবে সে মোরে আজি ভুলে,
যখন বাদল-হাওয়া বহে অনুকূলে।
যমুনার নীল জল সঘনে আনন্দে
বহিতেছে দুলে দুলে তরঙ্গের ছন্দে।
গম্ভীর গগনতল কেকারবে পুরে
ময়ূর ময়ূরী দুলে দামিনীর সুরে।
কদম্বের চারিদিকে গন্ধে পুলকিত,
দুলিছে শুনিবে বলে বাঁশরীর গীত।
যবে গরজিবে মেঘ বাদলেতে ভারী,
শূন্য দোলে বসে রব কেমনে গো নারী!
আমারি নয়ন শুধু বরষায় ঝুরে—
প্রাণ মোর মন সাধ সে রহিল দূরে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়।—প্রথমেই স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একখানি ছবি আছে। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় একটী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ কোনও তথ্য নাই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা' পড়িয়া মনে হয়, কবির প্রতিভা যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকারের 'বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি' সংক্ষিপ্ত হইলেও তথ্যপূর্ণ। শ্রীগুরুদাস সরকারের 'শ্রীমন্দির-পরিক্রমা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারীর 'শুভদৃষ্টি' অনধিকারীর অনধিকারচর্চ্চা।—প্রথমেই 'সজল জলদ ছেয়েছে বিমান, বিমানধরণী তিমিরলিপ্ত।'—'বিমান' আকাশ নয়; ব্যোমযান, যান, রাজগৃহ, সিংহাসন, এমন কি, অশ্বও হইতে পারে, কিন্তু আকাশকে প্রকাশ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'শিরোপরে অনন্ত বিমান' মনে পড়ে! তাঁহার কৈশোরের ভুল নিরঙ্কুশ কবি-প্রয়োগ নহে। 'শুভদৃষ্টি'তে প্রহেলিকাও আছে—'অতনুর তনু অণু পরমাণু বেঁধে অনুরাগ আকুল বুকে, এক হয়ে গেল দুইটী জীবন—' ইহার অর্থ, কূটার্থ—গূঢ়ার্থ আমরা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। 'শুভদৃষ্টি'তে 'অসীম ভাসিল সীমানার মাঝে', কিন্তু মানবের বুদ্ধি সসীম। সীমানার মাঝে অসীমের ভাসার কল্পনা নিশ্চয়ই 'সসীম' বুদ্ধির সাধ্য নয়। শ্রীসুষমা সিংহের 'সন্ধ্যা' সময়োপযোগী প্রবন্ধ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-বর্জ্জন উপলক্ষে 'বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে' কবিতায় যে 'নীরব নিবেদন' করিয়াছেন, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার যোগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার একমাত্র ভাবের পুষ্পাঞ্জলি। কবির কষ্টকল্পিত মুদ্রাদোষে কবিতাটি মাটী হইয়াছে। ইহাতে সত্য আছে, ভক্তি আছে, কিন্তু কবিত্ব নাই। ঘটনাটি যেমন জাতির জীবনে চিরস্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনাথের এই ভক্তির দান সাহিত্যে তেমনই চিরস্মরণীয় হইবে, এমন আশা করা যায় না। শ্রীদ্বিজদাস দত্তের 'বেদে বিশ্বমানবের আদিম ধর্ম্মবিধান' সুলিখিত, সারগর্ভ প্রবন্ধ। 'ভারতী' ইহাকে প্রথম স্থান দিলেন না কেন?

প্রবাসী। শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'রামদাস ও শিবাজী' নামক ছবিখানি উল্লেখযোগ্য, উপভোগ্য। শিবাজীর অঙ্কনে চিত্রকর ভাবকে রেখার ফাঁদে ধরিয়াছেন, শিবাজীর চিন্তাকে রূপ দিয়াছেন। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন;—অত্যন্ত আশাপ্রদ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চিত্রকরকে ধন্যবাদ করি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক 'গানে' হেঁয়ালি আছে, বিশেষত্ব নাই। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'সামঞ্জস্যের কথা' অত্যন্ত গুরুপাক, সাহিত্যের বা দর্শনের 'লচ্ছাসার'। 'শ্রীঃ' 'রাজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা ক্রমে তপোবন হইয়া উঠিতেছে। এখানকার সাহিত্যও গেরুয়া পরিয়া হিমালয়ে চলিল। 'বুড়া বয়সের আর বাকী কি?' বাঁচিয়া আর সুখ কি?—এক দিকে সচল আয়তনের ভেকধারীরা চামর ঢুলাইয়া কামায়ন গান করিতেছে; আর এক দিকে নাটিকা, কবিতা, টপ্পা প্রভৃতি জটা-বল্কল ধারণ করিয়া

'যৌবনে যোগিনী' সাজিয়া আসরে আসিয়া 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' স্মরণ করিতে বলিতেছে! 'সামঞ্জস্যের কথা' কহিতে পার, কিন্তু সামঞ্জস্য হয় না।—রচনাটির প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে যথেষ্ট লিপিচাতুরী আছে, 'মানুষের জীবনের সঙ্গে বিশ্বের একটা যোগ—তাহার আনন্দ এবং তাৎপর্য্য' আছে, কিন্তু লেখক সে আনন্দ ভোগ করিবার অবকাশ দেন নাই; সে 'তাৎপর্য্য' ধর্ম্মের তত্ত্বের ন্যায় 'নিহিতং গুহায়াম্।' ইহার কারণও সুস্পষ্ট; ব্যাখ্যাতা স্বয়ং বলিতেছেন,—'ফুল বোল পাতা আমি আমি ছিঁড়িতে পারি, চট্‌কাইতে পারি, খাইতে পারি, মাখিতে পারি,—কিন্তু এমন করিয়া বসন্তকে পাইব না।' নিশ্চয়ই 'সবুজ পাতা।' প্রবন্ধটিতে লেখকের আহারের প্রভাব সুস্পষ্ট, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীসত্যচরণ লাহার 'ঋতুসংহার' উপভোগ্য। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসবর্ণ-বিবাহ-আইনের সমর্থন করিয়া যে চারিখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, 'অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র' নামে তাহা প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রে পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—'আইন যদি বরকে জোর করিয়া বলাইতে চায় "আমি হিন্দু নহি", তবে আইনের সেই বলগর্ব্বিত কথার জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দেওয়া অধম নীচত্বের চিহ্ন। বিবাহের ন্যায় অত বড় একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অমন ধারা একটা কাপুরুষোচিত নীচত্ব স্বীকার করা বরের পক্ষে কোনো ক্রমেই শোভা পায় না।' ইহা নিশ্চয়ই নীচতা, এবং শুধু বরের পক্ষে কেন, কোনও ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না। দ্বিজেন্দ্রনাথের মত সহৃদয়, সদাশয়, বাঙ্গালীর 'ব্যথার ব্যথী', প্রেমিক মহাজন এইরূপ নীচতায় ব্যথিত হইবেন, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশে 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার' জমিয়া থাকে, যে দেশে মতে ও ব্যবহারে আদৌ সামঞ্জস্য নাই, সে দেশের উপায় কি? আইন, নীতি, মতবাদ সে দেশে মানুষকে নীচতা হইতে দূরে থাকিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারে, কিন্তু যে সুবিধাবাদী, তাহাকে উন্নত করিতে পারে না। আইন আমাদিগকে 'মনে মুখে এক' করিতে পারিবে না। সমাজ বা লোকমতের সংহত শক্তি ও শাসন ভিন্ন মানবের মনের সংস্কার হইতে পারে না। মানবের মনের সংস্কার না হইলে তাহার সমাজের সংস্কার হয় না। কেন না, পুঁথি-গত সংস্কার সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না; পবিত্র করিতে পারে না, বরং আরও কলুষিত করে। রবীন্দ্রনাথের 'বাতায়নিকের পত্র' তাঁহার যোগ্য হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমরা পড়িতে, মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে বলি। রবীন্দ্রনাথের এই যুগধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও সনাতন মানব-ধর্ম্মের নির্দ্দেশ—তাঁহার কম্বু কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এই ভারতবাণী বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিবে। ইহা ইউরোপের পক্ষেও মহৌষধ, এসিয়ার পক্ষে ও আমাদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী-সুধার কাজ করিবে। ইউরোপ যদি তাহার ভাবনা না ভাবে, বর্ত্তমানের মোহে ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা যেন বর্ত্তমানের আলোকে আমাদের অবস্থার বিচার করিতে পারি; অবস্থার মত ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতের পথে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি। রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' সেই পথের সন্ধান দিয়াছেন। শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরীর 'পাঁচমঠী' ও 'তুলসী'র 'জুয়ার' সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগের 'শিশির'কে 'সাহিত্যিক ন্যাকামী' ভিন্ন আর কি বলিব? শ্রীশান্তা দেবীর 'পরাজয়' চলনসই গল্প।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র ক্ষুদ্র সমালোচনায় 'অহং' ও সোঽহং-এর আমদানী করিয়াছেন। সমালোচকের শক্তি যে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী', তাহারই প্রমাণ; এবং বলা বাহুল্য, ইহাও উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূতন কিছু করো' বাঙ্গালার নবীন ভাবুকদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল! কিন্তু বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হয়। জয়দেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। ভারতচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার আধ্যাত্মিক ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম 'ঐশ্বরিক' ব্যাখ্যা হিমালয়ের মত উচ্চ হইয়া যোড়াসাঁকো ও বোলপুরের মধ্যে 'স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।' তাহার উপর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা!—এই ত কলির সন্ধ্যা। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধ্যাত্মিক উপন্যাসের, অন্ততঃ উপন্যাসবিশেষের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 'ফ্যাশন' হইয়া উঠিবে। তখন সত্যেন্দ্রনাথের হেনা, শরচ্চন্দ্রের চরিত্রহীন প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশে উপনিষদের স্থান অধিকার করিবে। 'নারেন সুখমস্তি।' অতএব, বাহুল্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের বহু-কথিত 'এ পার হইতে ও পারে' পাড়ী দিয়া আমরা এই সকল সনক শৌনক শঙ্কর সায়নকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিব না? শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'বাদলা-ভাঙা রাতে'র নাম শুনিয়া ভয় হইয়াছিল, কিন্তু কবিতাটি বোঝা যায়। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টো-পাধ্যায়ের 'আশ্বাসে' ভুলিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বেশ হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা। জ্যৈষ্ঠ—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'অসতো মা সদ্গময়' ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে বৈদিক ভাবের সৌরভ নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যাহা আছে, তাহা বুঝা যায়। কবি এই রচনায় কবিত্বের বিনিময়ে 'সদ্ভাব' দান করিয়াছেন। সে সদ্ভাবের আধার—সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, সুতরাং মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'হ্লাদিনী শক্তি ও তাহার বিলাস' বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রেম-লীলার ব্যাখ্যান। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরীর 'যোগে' কবিত্বও আছে, শাস্ত্রও আছে; কোনটার সীমা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীমনোরমা দেবীর 'আবাহন-গীতি' গদ্যে লিখিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। বরং ছন্দ ও কবিতা বাঁচিয়া যাইত। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে 'কাব্যি'র প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। আমরা অনেক সময়ে ভাবি, বাঙ্গালার রাজা কে? ইংরেজ, না কাব্যি? কে বড়? 'বুরোক্রাসী', না 'কাব্যি'? পাহারাওয়ালা ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানও যথেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বটে; তাহাদিগকেও আমরা ভয় করি, ইহাও সত্য; কিন্তু বাঙ্গালার নব্য কবিরা বোধ করি তাহাদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। এক এক সময়ে মনে হয়, ইহারাও যদি কলম ধরে, এবং সমস্ত দিনের রাজপাটের পর কবিতা লিখিতে বসে! বাস্তবিক, বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—ধন্য রে কাব্যি! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! জরতী 'তত্ত্ববোধিনী' এবং কাষায়পরিবীতা 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও তোর প্রতাপে জর্জ্জরিত! তুই আ-টগ্রাব্রহ্মপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র 'অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে মাসিক-পালন' করিতেছিস্। শ্রীযদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি রায় বাহাদুরের 'অদ্বৈত-তত্ত্ব' সুচিন্তিত নিবন্ধ। শ্রীমতী হরিপ্রিয়ার 'বর্ণমালা স্তুতি' 'ক্ষয়ে কৃষ্ণ'র মত; কষ্টকল্পিত রচনা। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'সাধু তারাচরণ এবং শ্রীশ্রীবুড়াকালী'

উল্লেখযোগ্য সন্দর্ভ। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' সুলিখিত।—'ব্রহ্মবিদ্যা' যথাসময়ে প্রকাশিত হইতেছে; প্রবন্ধ-বৈশিষ্ট্যেও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রতিভা। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীঅক্ষয়কুমার দাসগুপ্তের 'সারনাথে লুপ্ত বৌদ্ধকীর্ত্তি' সুরচিত নিবন্ধ। সারনাথের সৃষ্টি হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। লেখক প্রমাণ-প্রয়োগে সারনাথের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, এবং সাধারণ পাঠকের অধিগম্য করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কয় মাস পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'সারনাথ' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে এই গ্রন্থের উল্লেখ নাই। তাহার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকিবে। যাঁহারা এক পথের পথিক, তাঁহারা পরস্পরের রচনার আলোচনা করিলে সুফল ফলিতে পারে। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের 'অতিথি' একটি গান। অতিথি নারায়ণ, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। 'প্রতিভা' 'অতিথি'কে আশ্রয় দিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিবার নাই, এমন নহে। কিন্তু 'অতিথি'! 'বেঁধে মারে, সয় ভাল।'—ইতি। শ্রীবিমলাচরণ ঘোষের 'মৌর্য্য যুগের বাণিজ্য' সারগর্ভ, গবেষণাপূর্ণ, তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। আজ কাল ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও দর্শনে অশিক্ষিতপটু কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মাদের তাণ্ডব দেখিয়া বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হয়। 'মৌর্য্য-যুগের বাণিজ্যে' এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। 'প্রতিভা' এ বিষয়ে সৌভাগ্যশালিনী। 'প্রতিভা'র কৃতবিদ্য মনীষীরা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই জন্য আমরা 'প্রতিভা'র অনুরাগী। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীসতীনাথ দেবশর্ম্মা 'আলোচনা'য় 'ভারতবর্ষে'র ১৩২৪ সনের অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সকড়ি-তত্ত্বে'র সমালোচনা করিয়াছেন। 'It is never too late' সত্য বটে, কিন্তু আলোচনা এত 'বাসী' না হইলেই ভাল হয়। তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল!' ইহাও জীবনের লক্ষণ। মাসিক সাহিত্যে নানা বিষয়ের অবতারণা হয়, কিন্তু সাহিত্য-সমাজে তাহার আলোচনা হয় না। এ ঔদাস্য, এ উপেক্ষা শোচনীয়।

ভাণ্ডার। জ্যৈষ্ঠ। 'কাঙ্গালী সর্দ্দারের লিপদোদ্ধার' গল্প চলিতেছে। 'ম্যালেরিয়ার প্রতীকার' বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায়-সমিতি-সম্মেলনে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক পঠিত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।—এই প্রবন্ধ ও তাহার 'পরিশিষ্টে' বাঙ্গালীর জানিবার মত অনেক তথ্য ও সুপরামর্শ আছে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। আমাদের সংবাদপত্রসমূহে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রচার ও আলোচনা হয় না কেন? 'নানা কথা' এবার অত্যন্ত অল্প। আমরা বাঙ্গালার এই 'সবে ধন নীলমণি'র অত্যন্ত পক্ষপাতী; সর্ব্বান্তঃকরণে 'ভাণ্ডারে'র স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা করি। সেই জন্যই বলি, পূর্ব্বের তুলনায় 'ভাণ্ডার'কে রিক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। সম্পাদক মহাশয় পূর্ণ—সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন।

রামেন্দ্র বাবু।

আমরা আজ যে জন্য এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক দেখি না। রামেন্দ্র বাবু এত অল্প দিন হইল আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন যে, তিনি যে আর আমাদের মধ্যে নাই, এ কথা এখনও আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। এখনও যেন মনে হইতেছে, তিনি রোগশয্যায় শুইয়া আছেন; এখনও যেন আশা হইতেছে, তিনি আবার সারিয়া উঠিয়া তাঁহার এই প্রিয় মন্দিরে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। আমার এই ভ্রম কিন্তু ক্রমে ক্রমে বড় কষ্ট দিয়া ঘুচিতেছে। আমার নিজের পড়ার ঘর হইতে তাঁহার পড়ার ঘর দেখা যায়। ভ্রমবশতঃ, পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ যেমন দিন রাত্রে পাঁচ বার দশ বার তাঁহার বাড়ী যাইতাম, এখনও সেইরূপ যাইবার জন্য দুই তিন বার উঠিয়াছি,এবং তিনি আর নাই, এই কথা মনে পড়ায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িয়াছি। পাঁচ বৎসর সত্য সত্যই আমরা পরমানন্দে ছিলাম। সাহিত্য-সংসারে, সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে, আমরা সর্ব্বদাই মিলিত হইতাম। যে কোনও অবস্থায় রামেন্দ্র মন খুলিয়া আমাকে পরামর্শ দিত, উপদেশ দিত; সে আমাকে কতই ভক্তি করিত, ভালবাসিত। শেষ তাহার পরিবারবর্গের মুখে শুনিলাম যে, সে আমারই জন্য পটলডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল, এবং নানা বিঘ্ন সত্বেও সে এখান হইতে যাইতে চাহে নাই। এ কথা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে। কিন্তু সে শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব কাহার কাছে? সে ত আর ধরাধামে নাই!

শোক পবিত্র। শোক নির্ম্মল। শোকে মানুষকে নির্ম্মল করে। শোকে মনের অনেক মলা কাটিয়া যায়। কিন্তু শোক লইয়া ত মানুষে থাকিতে পারে না। শোক চাপা দিয়া আবার তাহাকে 'কঠোর কর্ত্তব্যে'র অনুরোধে সকল কার্য্যই করিতে হয়। আজি এ সভায়—এ পবিত্র শোকসভায়—একটা কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি; আসিয়াছি প্রকাশ্যভাবে রামেন্দ্রের জন্য শোক করিতে, নিজের মন প্রবোধ মানুক আর না মানুক, তাহার পরিবারবর্গকে প্রবোধ দিতে, হয় ত তাহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিতে। এ কর্ত্তব্য কঠোর বলিতেছি কেন? যে হেতু এ সব প্রকাশ্য ভাবে করিতে হইতেছে।

এ সভার উদ্বোধনে রামেন্দ্রের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে হয়। আমি তাহা পারিব না। আমি বক্তৃতায় এখনও এত অভ্যস্ত হই নাই যে, মনের আবেগ সংবরণ করিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইব। সেই জন্য আমি মনে করিতেছি, রামেন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তাঁহার বংশের কথা কিছু বলিয়া যাইব। রামেন্দ্রের চরিত্রে এমন অনেকগুলি বৈচিত্র্য ছিল, যে সব তাঁহারই বংশে সম্ভব, ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। একটা প্রবাদ আছে—'বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুচ্ নহী, তব্ বী থোড়া'—ইহা কত দূর সত্য, তাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

G. I. P. ও E. I. R. এই দুইটি রেল সংযোগ করিয়া ঝাঁসী হইতে মাণিকপুর পর্য্যন্ত যে একটী রেলপথ আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে হরপালপুর নামে ষ্টেশন—সে ষ্টেশন হইতে ঝট্‌কায় চড়িয়া দক্ষিণ দিকে ৮২ মাইল যাইলে খাজুরাহা বলিয়া একটী প্রাচীন নগর পাওয়া যায়। দেশের লোকে উহা অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করে। এই জন্য উহার নাম রাখিয়াছে—'পুরী'। 'পুরী'র মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড জলাশয়; দুই দিক্ পাথরের পোস্তা দিয়া গাঁথা; অপর দুই দিক্ দিয়া গড়াইয়া জল আসে। এই পুকুরের ধারেই রাজবাড়ী, রাজবাড়ীর পিছনে অনেকগুলি মন্দির। কতকগুলি মন্দির খুব মেরামত করা, তাহাতে এখনকার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির মন্দির আছে। যেগুলি মেরামত হয় নাই, সেগুলি নানা অবস্থায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। সেখান হইতে পোয়াটাক পথ দূরে আবার কতকগুলি মন্দির, কতক মেরামত, কতক বেমেরামত, সেগুলি জৈনদিগের। আরও কতকগুলি মন্দির—সব বেমেরামত—বৌদ্ধদিগের। এখানকার মন্দিরের একটু বৈচিত্র্য আছে। মন্দিরের সকল দেওয়াল হইতে পুতুলী বাহির হইতেছে। পুতুলগুলি উপর হইতে নীচ এক এক সারিতে গাঁথা। ভিতরেও তাই, বাহিরেও তাই। দেখিতে মন্দিরগুলি অতি সুন্দর। এরূপ পুতুল বা'র করা মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। বিন্ধ্য পর্ব্বতের বিশাল উদরে ছোট ছোট পাহাড়, ছোট ছোট ডেলা, ছোট ছোট ডুঙ্‌রি, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট হ্রদ, ছোট ছোট ঝরণা, এই সব বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে খাজুরা নগরে বিচিত্র মন্দিরগুলি আরও বিচিত্র দেখায়। দেশটীও বিচিত্র। গ্রামগুলিতে বসতি বিরল। বন ঘন। বসন্তে যখন বনময় পলাশ ফুল ফুটিয়া উঠে, বোধ হয় যেন পৃথিবী রাঙ্গা চেলী একখানি পরিয়া বৌ সাজি-

রাছেন। এই উঁচু নীচু, পাহাড়-বন-নদীর উপর রাত্রিতে যখন জ্যোৎস্না পড়ে, তখন যে আলো-আঁধারের খেলা হয়, সে আরও বিচিত্র। হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃতির এই প্রিয় ভূমির মধ্যে দুইটি জাতি উঠিয়াছিল—একটী ব্রাহ্মণ, জিঝোটিয়া; আর একটী ক্ষত্রিয়, চাণ্ডেল। জিঝোটিয়ারা কুমারিলের সময়ে যজ্ঞ করিতে এই দেশে আসিয়াছিলেন—দেশটির নাম জেজাভুক্তি, চলিত ভাষায় জেঝৌটি; ব্রাহ্মণদের নাম জেজাভুক্তীয়, বা জিঝোটিয়া। জিঝোটিয়ার মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় কবি, বড় বড় যোগী, বড় বড় শাসনকর্ত্তা রাজমন্ত্রী হইয়া গিয়াছেন।

জিঝোটিয়ারা বড় 'ঘরবোলা'—আপনার ঘর ছাড়িয়া বড় একটা যাইতেই চাহে না। রামেন্দ্র বাবু ১৮৭১ সালের সেন্সস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন যে, জিঝৌটি বা বুন্দেলখণ্ডে হামীরপুর, ঝাঁসি, জালোন, ললিতপুর—এই কয় জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ আছেন; কিন্তু ইহার বাহিরে পাঁচ হাজারও পাওয়া যায় না। একবার কেবল, শেরশা কালিঞ্জরের চাণ্ডেল-বংশ ধ্বংস করিয়া দিলে, দুই চারি ঘর বড় বড় জিঝৌটিয়া ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাদেরই মধ্যে এক ঘর মানসিংহের সঙ্গে জুটিয়া বাঙ্গালা দখল করিতে আসেন, এবং মানসিংহের কাছে ফতেসিং পরগণা জায়গীর পান। বাঙ্গালার জিঝৌটিয়ারা আবার তেমনই 'ঘরবোলা' হইয়া যান। তাঁহাদের মুখে এই তিন চারি শত বৎসর কেবল 'ফতেসিং' আর 'ফতেসিং'—বাঙ্গালায় যে আর সব দেশ আছে, আর আর জেলা আছে, আর আর নগর আছে, তাঁহাদের কাছে সেগুলি কিছুই নয়—সব ফাঁকা। চারি শত বৎসর ধরিয়া একটী জমীদারী এক পরিবারের হাতে প্রায়ই থাকে না। ফতেসিংএর অধিকাংশ জিঝৌটিয়াদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা সেই 'ফতেসিং'ই ধরিয়া আছে। যে সকল জিঝোটিয়ারা অল্পবিস্তর জমী জমীদারী ভোগ করিতেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন।

তিনিও বড়ই 'ঘরবোলা' ছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে তিনি একবার পুরী গিয়াছিলেন, আর একবার সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস দেখিবার জন্য বক্সারে গিয়াছিলেন। আর তীর্থ করিতে তিনি একবার গয়া আর একবার কাশী গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মধ্যেও জেমো আর কলিকাতা, কলিকাতা আর জেমো। কেবল তাঁহার সাধের সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য এ জেলা ও জেলা কয়েকবার বেড়াইয়াছিলেন। এই 'ঘরবোলা' ভাব তিনি তাঁহার বংশ হইতেই পাইয়াছিলেন।

তিনি জিঝৌটিয়াদের আরও একটী ভাব পাইয়াছিলেন। তাঁহার খুব পড়াশুনা থাকিলেও সে জন্ত তাঁহার গুমর ছিল না, বিদ্যা প্রকাশ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইতেন না। জিঝৌটিয়াদের মধ্যে পূর্ব্বেও অনেক অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, এখনও আছেন। আমি দুই চারি জন জিঝোটিয়া পণ্ডিত দেখিয়াছি। তাঁহারা সে কালের ধরণে খুব পণ্ডিত। কিন্তু সে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার তাঁহাদের কোনই চেষ্টা নাই। জিঝৌটিয়াদের বড় গৌরবের দিনে, কৃষ্ণমিশ্র নামে এক প্রগাঢ় দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি করিয়াছেন কি? লিখিয়াছিলেন এক নাটক। যে কেহ সে নাটক পড়িয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, কৃষ্ণমিশ্র কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন, তা' নয়; সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, লোকচরিত্র বেশ বুঝিতেন। রামেন্দ্র বাবুও তেমনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি কতই পড়িয়াছিলেন; যাহাই পড়িয়াছিলেন, তাহাই হজম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন কি? মাসিকপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ। একখানি বই লিখিয়াছেন—বিচিত্র প্রসঙ্গ। তাহাও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় ঠুকরাইয়া বাহির করিয়াছেন। এই যে বিদ্যাপ্রকাশে উদাস ভাব, তাহাও তিনি জিঝৌটিয়াদের নিকট পাইয়াছেন।

রামেন্দ্রবাবু বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে কথা খুব সত্য। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, হিংসা, বিদ্বেষ—এগুলি তাঁহার ছিল না। এটিও তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট পাইয়াছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়েরা বহুকাল ধরিয়া ফতেসিংএ বাস করিতেছিলেন। ফতেসিংএর জমীদারেরা অনেক সময় ঝগড়া, বিবাদ, মোকদ্দমা, মামলা করিতেন—কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়েরা ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিতেন, উস্কাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রবাবু সর্ব্বদাই বলিতেন, আমারও অল্প বয়সেই মৃত্যু হইবে। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন—'পিতা পিতামহের তুলনায় আমি ত দীর্ঘজীবী।' তিনি যে এত উদার, এত ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহার কারণ তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে ভাবিতেন—'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা।' আমি একটা জিনিস বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, যখন তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন দিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম, তিনি যেন তখন বেশী বেশী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক একবার মনে হইত, তিনি জাঁক বড়

ভালবাসিতেন। আর জেঁকো লোকের উপর সকলেরই কেমন অশ্রদ্ধা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রামেন্দ্রের কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, তাঁহার এই আনন্দের মধ্যে জাঁক নাই। 'বাপ পিতামহের চেয়ে অনেক দিন বাঁচিয়া আছি' ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ। সে আনন্দের ভিতরেও তিনি 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা—'!

রামেন্দ্রবাবু বড় কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। অল্পেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। ইহারও প্রধান কারণ এই—তিনি পুরুষের নিকট শিক্ষা পান নাই, শিক্ষা পাইয়াছিলেন স্ত্রীলোকের নিকট। বাপ দাদার চেয়ে মা ও ঠাকুরমাই তাঁহাকে বেশী শিক্ষা দিয়াছেন। আর তিনি যে সকল স্ত্রীলোকের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বড় ঘরের মেয়ে। বড় ঘরের মেয়ে হইলেই একটু উদার হইবে, একটু ধর্ম্মভীরু হইবে।

বিদ্যার উপর রামেন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই পড়িতেন, নিপুণ হইয়া পড়িতেন, হজম করিবার জন্য পড়িতেন, হজম না করিয়া ছাড়িতেন না। তাই তিনি অতি কঠিন বিষয়ও সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ইহারও মূলে দেখিতে পাই এই যে, বাঙ্গালায় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা স্বচ্ছন্দেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; অন্নচিন্তা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না। অল্পবিস্তর লেখাপড়া সকলেই শিখিতেন। পরস্পরের উপর তাঁহাদের খুব আত্মীয় ভাব ছিল, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের উপর এত আত্মীয়তা। তাঁহারা লেখাপড়া করিয়াই দিন কাটাইতেন। তাঁহার পিতা পিতামহরাও লেখাপড়া খুব করিতেন; কেহ নাটক লিখিয়াছেন, কেহ বা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। অল্পবিস্তর যে জমীদারী ছিল, তাহা সুশাসনে রাখা, আর লেখাপড়া করা—সেই তাঁহাদের ব্রত ছিল। তাঁহাদের ব্রত তাঁহারা রামেন্দ্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। রামেন্দ্র তাঁহাদের চেয়ে বেশী কাল বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেয়ে বেশী কৃতিত্বও দেখাইয়া গেলেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব জেমোর সমাজে আবদ্ধ; রামেন্দ্রের কৃতিত্বে সারা বাঙ্গালা মুগ্ধ।

রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটী অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—একটী সাহিত্য-পরিষৎ, একটী সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটী সাহিত্য-পরিষদের মন্দির। ছেলেবেলায় যাহা দেখে, লোকে বড় হইলে তাই করিতে চেষ্টা করে। রামেন্দ্র বাবু ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলেন, কাঁদির ডিস্পেন্সারি লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট

মেকেঞ্জীর সহিত জেমোর রাজার ঘোরতর বিবাদ হয়, এবং সে বিবাদে জেমোর রাজারই জয় হয়। মেকেঞ্জী লিখিয়া যান, 'বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে লোকে রাজা বলিয়া থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে রাজোপাধির যোগ্য।' কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ, প্রজারা তাঁহাকে রাজা বলে, ইহাতেই খুসী ছিলেন, তিনি রাজোপাধির জন্ত কখনও ব্যস্ত হন নাই। ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনারায়ণের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া ও শুনিয়া রামেন্দ্রেরও সেইরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি হয়। নরেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টা জেমোতেই আবদ্ধ, রামেন্দ্রের চেষ্টায় সারা বাঙ্গালা, এমন কি, সারা ভারত উপকৃত।

রামেন্দ্র উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বংশেরই অনুযায়ী ছিল। তবে কি তাঁহার নিজের কিছুই কৃতিত্ব নাই? বংশ হইতে আমরা কি পাই? বীজ পাই। বিদ্যার উপর, সৎকর্ম্মের উপর, অনুরাগ—এ সকল বংশ হইতে পাই। কিন্তু সে বীজকে অঙ্কুরিত করে কে? ফল-পুষ্পে শোভিত করে কে? সে ত নিজের চেষ্টা। রামেন্দ্র যদি নিজের চেষ্টায় ভাল করিয়া পরীক্ষা পাশ না করিতেন, তবে কাঁদি স্কুল হইতে পাশ করা শত শত ছেলের মত তাঁহারও চেষ্টা স্বগ্রামেই আবদ্ধ থাকিত। তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার উপাসনা না করিয়া মা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেন, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার সময়ের অনেক লোক ত এমন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাবীরের মত সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিলেন; করিয়া 'যেন যে পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ' সেই পথেরই অনুসরণ করিলেন।

অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য—যে দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাথামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুরী'ই বল, 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ'ই বল, আর যে কোনও প্রসঙ্গই বল, সবই যেন কবিত্বময়। এ মহা কবিত্বের বীজও তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন:—'পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী এক জন কাব্যা-মোদী লোক ছিলেন। 'মাধব-সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা

করিয়াছেন। পৌরাণিক শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বহু ব্যয়ে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ, উপপুরাণ আদির হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতেন।' আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—'বাবা একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন 'বঙ্গবালা'। কয়েক ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। উহার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না।
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর-ঘোষণা।
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহু দিন বাঙ্গালীসন্তান।
এবে বঙ্গজনস্থান নিস্তব্ধ নীরব।
কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব।
রাজনীতি-আলোচনা দুরূহ ভাবনা।
রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা সাম্রাজ্য বাসনা।
এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে।"

রামেন্দ্রবাবুর বাবা জেমোয় একটী থিয়াটার করেন; অনেক খরচ করিয়া তাহার সাজ সরঞ্জাম করেন; 'বেণীসংহার', 'অশ্রুমতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় হয়। তিনি নিজে 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একখানি ছোট নাটক লিখিয়া অভিনয় করেন। অভিমন্যুবধ অবলম্বন করিয়া আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানির আর অভিনয় হয় নাই।

এরূপ কাব্যামোদী পরিবারে যিনি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার বাল্যকাল কাব্যচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল কার্য্যেই, সকল লেখায়ই, সকল বক্তৃতায়ই যে কাব্যের গন্ধ থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

লোকে বলে, রামেন্দ্রবাবু Nationalist ছিলেন। এ দেশহিতৈষিতা তিনি নেতাদের নিকট পান নাই। কারণ, নেতাদের সহিত তিনি বড় একটা মিশিতেন না। কলেজ, ঘর আর সাহিত্য-পরিষদ, এই তাঁহার স্থান ছিল। সুতরাং তাঁহার মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার এই বীজ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। আমরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। বঙ্গবালা উপন্যাসের ভূমিকার পয়ার কয়েকটী তুলিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিতেছেন :—

"এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন।"

রামেন্দ্রবাবু জানিতেন যে, তিনি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের মত কার্য্য না করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। তাঁহার বাপদাদা দেবতার মত লোক ছিলেন, তিনিও দেবতার মত হইবার চেষ্টা করিতেন, সকল বিষয়েই তাঁহাদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই তিনি এত লোকের ভক্তির ও স্নেহের ভাজন হইয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলাম,—'বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুচ্ নহী, তব্‌ভী থোড়া।' *

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

রায় পরিবার।

৯

সুশীলের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুধীর মামার বাড়ীর প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে প্রাচীরে আপনার উপাধি-সংবলিত নামাঙ্কিত পাথর বসাইয়া পশারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তারীর পশারে একটু বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা সর্ব্বতোভাবে লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, এবং সে বিশ্বাস অনেক সময় একটা সামান্য ঘটনায় উৎপন্ন হয়—এক বাড়ীতে এক জন রোগীর আরোগ্য ব্যাপারে ডাক্তারের পশার জমিতে পারে। সুধীরের পশার জমে নাই—তবে সে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ী 'বিনা ডাকে' ডাক্তারী করিয়া বিদ্যার চর্চ্চা রাখিতেছিল। সেইরূপ ডাক্তারী সারিয়া সে যখন মধ্যাহ্নের একটু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিল, তখন দ্বারেই টেলিগ্রাফ-পিয়নের সঙ্গে তাহার দেখা হইল—সে সুশীলের দাদার নামে একখানা টেলিগ্রাম আনিয়াছিল। সুধীর সেখানা হাতে লইয়া বসিবার ঘরে গেল, এবং দুইবার নাড়াচাড়া করিয়া খুলিয়া ফেলিল। পড়িয়াই সে ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকরকে বলিল, 'ছুটিয়া আস্তাবলে যাও—গাড়ী ফিরাইয়া আন।' উপরে তাহার মা সে কথা শুনিতে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের শোক-সভায় পঠিত।

পাইয়া বলিলেন, 'কি রে সুধীর?' 'আসিয়া বলিতেছি'—বলিয়া সুধীর আবার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং আফিসে বড় মামাকে টেলিফোন করিল—'গিরিজা বাবু টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—ছোট মামার প্লেগ হইয়াছে। আপনি আসুন। আমি প্রতিষেধক রোগরস আনিতে চলিলাম।' সে বাহির হইয়া গেল।

সুশীল কাছারীতেই জ্বর অনুভব করে, এবং বাড়ী ফিরিয়া জ্বরের প্রাবল্যে সন্দেহ করে—তাহার প্লেগ হইয়াছে। তখনই সে গিরিজাকে পত্র লেখে—তাহার প্লেগ হইয়াছে; সে হাঁসপাতালে যাইতেছে। গিরিজা যেন তাহার বাড়ীতে সংবাদ না দেয়। পত্র পাইয়া গিরিজা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখে, সুশীল হাঁসপাতালে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। গিরিজা বলিল, 'তুমি হাঁসপাতালে যাইতেছ কেন?' সুশীল উত্তর করিল, 'এই সব চাকর কি কখনও প্লেগের রোগীর কাছে থাকিবে?' গিরিজা বলিল, 'না থাকে—আমি ডাক্তার—শুশ্রূষাকারী আনিতেছি। তুমি হাঁসপাতালে যাইতে পাইবে না।' সুশীল বলিল, 'তা হইবে না। আমি বাড়ী থাকিলে তুমি আসিবে।' গিরিজা বলিল, 'সে জন্য ভয় করিও না। আমি প্রতি বৎসর এ সময় প্লেগের টীকা লইয়া থাকি—এবারও লইয়াছি।' গিরিজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সুশীল বাড়ীতেই থাকিল; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিল, 'গিরিজা যেন তাহার বাড়ীতে সংবাদ না দেয়। বলা বাহুল্য, গিরিজা সে কথা রাখে নাই; ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী আনিতে যাইবার পথেই সে টেলিগ্রাফ করিত, কিন্তু যদি জ্বর—কেবল জ্বরই হয়, দেখিবার জন্য পর দিন প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল। প্রভাতে যখন ডাক্তার বলিলেন—প্লেগ, সে তখনই সুশীলের দাদাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। তখন প্রবল জ্বরে সুশীল অজ্ঞান হইয়াছে—জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে।

সুশীলের দাদা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সুধীর ফিরিয়া আসিয়াছে। উভয়ে পরামর্শ করিলেন—তাহার পর মাকে ও দিদিকে সংবাদ জানান হইল। সুধীর বলিল, 'চল, আমি তোমাদের লইয়া যাই; কিন্তু সকলকেই প্লেগের টীকা দিতে হইবে।' মা প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন—মুখে কথা সরিল না। দিদি উঠিয়া গৌরীর ঘরে গেলেন; বলিলেন, 'গৌরী, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সুশীলের প্লেগ হইয়াছে—আমরা যাইতেছি—তুমি চল।' গৌরী উত্তর দিল না। দিদি দেখিলেন, তাহার মুখে পাণ্ডুবর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি মূর্চ্ছিতা গৌরীকে ধরিয়া মেঝের উপর শোয়াইয়া তাহার চক্ষুতে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণেই তাহার চেতনাসঞ্চার হইল। দিদি বলিলেন, 'তুমি উঠিও না। আমি তোমার দুইখানা কাপড় গুছাইয়া লইতেছি।'

তাহার পর সুধীর আপনি টীকা লইয়া মাকে, দিদিকে ও গৌরীকে টীকা দিল। সুশীলের দাদা বলিলেন, 'আমাকে টীকা দিলি না?' সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিও যাইবেন?' তিনি বলিলেন, 'যাইব না?' সুধীর বলিল, 'বাড়ীতে কেহ থাকিবে না!' তিনি উত্তর করিলেন, 'সর্ব্বস্বর অপেক্ষা ভাই বড়।' বাস্তবিক, দুই ভ্রাতার স্নেহবন্ধন অসাধারণ দৃঢ় হইবার বিশেষ কারণ ছিল—উভয়ে ভ্রাতা ও বন্ধু—উভয়ে উভয়ের সাহচর্য্যে কখনও বন্ধুর অভাব অনুভব করেন নাই। সুধীর তাঁহাকেও টীকা দিল।

গৌরীর মা সংবাদ পাইয়া আসিলেন। তিনি গৌরীকে বলিলেন, 'তুই যাইয়া কি করিবি? তুই ত রোগীর সেবা করিতে পারিস না—বিশেষ তোর কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নাই।' গৌরী মার কথার কোনও উত্তর দিল না—মার কাছ হইতে যাইয়া শাশুড়ীর কাছে বসিল—তথায় সমবেদনার মৌন সান্ত্বনা ছিল। কিছুক্ষণ থাকিয়া—মামুলী সতর্কতার ও আশার কথা বলিয়া তাহার মা যখন বিদায় লইলেন, তখন গৌরী তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া বলিল, 'আমি ঠাকুরমাকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে সংবাদ দিও।' মা একটু বিরক্তিভরে বলিলেন, 'আচ্ছা।' মা চলিয়া গেলেন—মেয়ে মনে করিল, ঠাকুরঝিকে সে সংবাদ দিলেই ভাল হইত—কিন্তু সে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। তাহার বুকের মধ্যে প্রবল যাতনা তাহাকে স্থির হইতে দিতেছিল না। এমন যাতনা সে আর কখনও অনুভব করে নাই। মানুষ যতই কেন হতাশ হউক না, তাহার হৃদয়ে আশার স্থান লুপ্ত হয় না—যখন সেই আশার বিলোপশঙ্কায় মানুষ কাতর হয়, তখন তাহার যাতনা বুঝি মৃত্যু-যাতনার অপেক্ষাও প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়।

আশঙ্কায়—বেদনায়—অনাহারে—অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বিপন্ন পরিবার যখন শঙ্কা-কম্পিত-হৃদয়ে সুশীলের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন, তখন সুশীল অজ্ঞানাবস্থায় জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে। গিরিজা তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় বারান্দায় বসিয়া ছিল—গাড়ী আসিতে দেখিয়া গাড়ীর কাছে আসিল—কেহ কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই বলিল, 'অবস্থা সমান।' কেহ কোনও কথা কহিলেন না—আর সকলকে তাহার সঙ্গে যাইতে বারণ করিয়া সুধীর গিরিজার সঙ্গে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। যাঁহারা বাহিরে অপেক্ষা

করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের কাছে সময় কত দীর্ঘ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। আশঙ্কা কালের পরিমাণ দীর্ঘ করিয়া তুলে। তাই রোগীর নিঃশব্দ গৃহে দিন যেন আর যাইতে চাহে না—দিনের হিসাব ঘণ্টায়, এবং ঘণ্টার হিসাব মিনিটে করিতে হয়।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিয়া সুধীর ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, এমন ভাবে যদি থাকিবে, তবে আসিলে কেন? রোগীর সেবা করিতে আসিয়াছ, সে কথা মনে কর—যাও, স্নানাহার কর; তাহার পর আমি সময় ভাগ করিয়া দিব—এক জনের পর এক জন রোগীর কাছে থাকিব।' মা বলিলেন, 'সুধীর, আমাকে একবার দেখিতে দিবি না?' সুধীর বলিল, 'দিদিমা, চল—কিন্তু ঘরে গোল করিও না।'

মা সুধীরের সঙ্গে সুশীলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৌরী কাতর-দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিল। দিদি তাহার হাত ধরিয়া সেই ঘরে লইয়া গেলেন। গৌরীর মাথার কাপড় সরিয়া পড়িয়াছিল—সে টানিয়া দিতে ভুলিয়া গেল—যন্ত্রচালিতবৎ দিদির সঙ্গে গেল—তাহার সমস্ত বৃত্তি যেন দৃষ্টিতে পরিণত হইয়া রোগশয্যায় শয়ান স্বামীকে দেখিল। তাহার পর দিদিই তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে লইয়া আসিলেন। সে কেবল দেখিতেছিল—তাহার জীবন-মন্দিরের দেবমূর্ত্তি যেন দারুণ ভূমিকম্পে বেদী হইতে পতিত হইয়াছে—বজ্রাহত স্বর্ণশৃঙ্গের মত তাহা ভূমিতে লুণ্ঠিত।

তাহার পর সুধীর সময় ভাগ করিয়া কে কখন রোগীর কাছে থাকিবেন—স্থির করিয়া লইল। দুই জন ডাক্তার, সুশীলের দাদা ও সে—পর্য্যায়ক্রমে রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিবে; আর দুই জন শুশ্রূষাকারিণী, মা ও দিদি—পর্য্যায়ক্রমে সঙ্গে থাকিবেন। দিদি বলিলেন, 'শুশ্রূষাকারিণী দুই জনকে যদি দরকার মনে করিস্, রাখ—কিন্তু আমরা তিন জন থাকিতে আমরা পরকে সেবা করিতে দিব না। মা, আমি, গৌরী—তিন জনে থাকিব।' সুধীর সেইরূপ ব্যবস্থা করিল; বলিল, 'তবে আমি যখন থাকিব, ছোট মামী সেই সময় থাকিবেন।' বলা বাহুল্য, মা ও দিদি প্রায় সব সময়েই রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন।

রোগীর অবস্থা সমান রহিল—জ্বর সমান—অজ্ঞানাবস্থারও তারতম্য নাই। কেবল নাড়ীর গতি ও হৃদয়ের ক্রিয়া আশঙ্কার উপর আশার জয় সূচনা করিতে লাগিল। সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ক্রটী হইল না। গৌরীর মা বলিয়া-

ছিলেন, গৌরী রোগীর সেবা করিতে পারে না। কিন্তু সুধীর পরে বলিয়াছিল, তাহার মত সেবা মা বা দিদি কেহই করিতে পারেন নাই। তাহাকে ঔষধ-পথ্য-প্রদানের কোনও কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় নাই। সে যেন অনন্য-চিত্ত হইয়া সেবাই করিতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল, দীর্ঘ সাধনার পর সে তাহার আরাধ্য দেবতার পূজা করিবার অধিকার পাইয়াছে। এমনই ভাবে পাঁচ দিন গেল।

ষষ্ঠ দিন মধ্যরাত্রির পর সুশীল চক্ষু মেলিল—মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতাকাশে বালার্ক-কিরণ-বিকাশের মত অচৈতন্যাবস্থার পর তাহার জ্ঞানবিকাশ হইল। তখন তাহার পার্শ্বে বাম দিকে সুধীর; পদের দিকে দক্ষিণ পার্শ্বে গৌরী—উভয়েই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। স্বপ্নের পর নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া মানুষ যেমন চাহিয়া দেখে—যাহা দেখিতেছে, তাহা প্রকৃত—না স্বপ্ন—সুশীল তেমনই আবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। সুধীর ডাকিল—'ছোট মামা!'

সুশীল বলিল, 'তোরা আসিয়াছিস্?'

আনন্দের আতিশয্যে আপনার নিষেধ আপনি ভুলিয়া সুধীর ডাকিল—'দিদিমা!' মা হর্ম্ম্যতলে শয্যায় শুইয়া ছিলেন—জাগিয়াই ছিলেন। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন—আসিবার সময় পার্শ্বে নিদ্রিতা কন্যাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, বড় কি কষ্ট হইতেছে?'

সুশীল বলিল, 'না—আর কষ্ট বোধ হইতেছে না।'

'মাথার যন্ত্রণা নাই?'

সুধীর বলিল, 'দিদিমা, তুমি যদি অত কথা বল, তবে তোমাকে এ ঘরে থাকিতে দিব না।'

সুশীল মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, 'মা, ডাক্তার হইয়া সুধীর তোমাকেও তাড়া দিতেছে!' তাহার পর সে সুধীরকে বলিল, 'তোরা সব আসিলি কেন? এ সময় কি আসিতে আছে?'

সুধীর বলিল, 'সে তর্ক পরে করিবেন। এখন অত কথা কহিবেন না।'

দিদি পার্শ্বের কক্ষ হইতে সুশীলের দাদাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন—উভয়ে এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল দাদাকে বলিল, 'তুমিও আসিয়াছ? আর কেহ বাকি নাই!'

তাহার পর সে চক্ষু মুদিল—কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বেই আর একবার দেখিল, তাহার পদের কাছে গৌরী বসিয়া আছে—তাহার মুখ ম্লান,

শুষ্ক—কিন্তু নয়নে আশার আলোক-দীপ্তি। গৌরী তাহার সেবার সময় আসনখানি সুশীলের পার্শ্ব হইতে টানিয়া চরণের কাছেই বসিত।

সুশীল বুঝিল, তাহার বারণ না মানিয়া গিরিজা তাহার গৃহে সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু সে কিছুতেই গিরিজার উপর রাগ করিতে পারিল না। পর দিন প্রভাতে গিরিজাকে সে যখন বলিল, 'তুমি কেন খবর দিয়াছিলে?' তখন গিরিজা বলিল, 'বেশ করিয়াছিলাম। এই সেবা শুশ্রূষা ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা হইত?' সুশীল আর কোনও কথা কহিল না—হাসিল।

তাহার পর স্রোত ফিরিল—আরোগ্যের গতি দিন দিন দ্রুত হইতে লাগিল, স্বাস্থ্য আপনার অধিকার ফিরিয়া লইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুশীল ভাবিতে লাগিল।

গৌরীর অক্লান্ত ও আন্তরিক সেবা সুশীল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না। দিদি সময় সময় একটু কৌশলে সে দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেন—গৌরীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসানপূর্ব্বেই আসিয়া তাহাকে বলিতেন, 'তুমি যাও—আমি বসিতেছি। তোমার অভ্যাস নাই—এই রাত্রিজাগরণ—এই উদ্বেগ—শেষে অসুখে পড়িবে?' কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। অন্য কোনও কাজের অভাবে সুশীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গৌরীর ভাব লক্ষ্য করিত। সে লক্ষ্য করিত—আর ভাবিত। ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার বেদনাতপ্ত হৃদয় যেন স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। সে ভাবিল, পুরাতন ক্ষতমুখে শোণিতধারা নির্গত হইয়া তাহার হৃদয় প্লাবিত করিতেছে। কিন্তু সে ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল—তাহা নহে; তাহার বহু চেষ্টায় রুদ্ধমুখ ভালবাসার উৎস আবার উৎসারিত হইতেছে—সে তাহারই স্নিগ্ধ সলিলের সঞ্চার অনুভব করিতেছে। সে ভয় পাইল। দেহ দুর্ব্বল—মনও দুর্ব্বল। যদি সে সে ধারার মুখ রুদ্ধ করিতে না পারে?

দশ দিনের মধ্যে সুশীল অনেকটা সুস্থ হইল—আর তেমন সেবার প্রয়োজন রহিল না, তবে সুশীলের নির্দ্দেশক্রমে এক জন করিয়া তাহার কাছে থাকিবার ব্যবস্থা হইল—যদি কোনও দরকার হয়। বিশেষ কোনও দরকার হইত না—কেন না, সুশীল স্বভাবতঃ সেবাগ্রহণে অনিচ্ছু ছিল। তাই সে জিদ করিতে লাগিল, সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া যাউন। দাদার কাজের ক্ষতি হইতেছে—সুশীলের পক্ষে এ সময় কর্ম্মস্থল ছাড়িয়া থাকা অকর্ত্তব্য—বাড়ীতে কেহ নাই—এইরূপ নানা যুক্তি সে দিতে লাগিল। শেষে মা বলিলেন, 'ভাল,

তোর দাদা, দিদি, আর সুধীর ফিরিয়া যাউক—আমি আর ছোট বৌমা থাকি।' সুশীল কিছুতেই সম্মত হইল না। মাও ফিরিতে সম্মত হইলেন না।

সুশীল সর্ব্বপ্রযত্নে গৌরীর প্রতি তাহার প্রবল ভালবাসা অতিক্রম করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজেই গৌরীর সেবা সে তাহার প্রাপ্য বিবেচনা না করিয়া সে জন্য কৃতজ্ঞতার ভান করিতে লাগিল—আপনাকে আপনি বুঝাইয়া প্রতারিত করিবার প্রয়াস পাইল। সে গৌরীকে বলিল, 'তুমি ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে আমার একটা কথা বলিবার আছে। তুমি আমার অসময়ে যে সেবাশুশ্রূষা করিয়াছ, সে জন্য আমি তোমার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকিব। আমার জন্য এত কষ্ট করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

এত দিন সুশীল যে তাহার সঙ্গে কোনও কথা কহে নাই, তাহাতে গৌরীর দুঃখ হয় নাই; বরং সে যে সেবা করিতে পাইয়াছে—তাহাতেই সে পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। আজ সুশীলের কথায় তাহার সকল বেদনা নূতন হইয়া উঠিল—তবে সে স্বামীর কাছে যত দূরে ছিল—তত দূরেই রহিয়াছে! তাহার আশার বালির ঘর সেই কথার তরঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না; শেষে বহু চেষ্টায় বলিল, 'মা বলিতেছেন, আমি এখন যাইব না।' তাহার কথা যেন দূরাগত—গ্রামোফোনের কথার মত—তাহা অস্বাভাবিক ও ঈষৎ-কম্পিত।

সুশীলের তার্কিক বুদ্ধি ছল ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। লজ্জা যে গৌরীকে বলিতে দেয় নাই—'আমি যাইব না—আমাকে আর ফিরাইয়া দিও না', তাহার কথায় গৌরী যে সে কথা বলিতে আরও সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে, সুশীল তাহা বুঝিল না। 'মা বলিয়াছেন'—তবে গৌরীর আকাঙ্ক্ষার ত কোনও পরিচয় নাই। সে যে তাহার মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি?

সুশীল ভাবিতে লাগিল। বহু দিন পূর্ব্বে শ্রুত একটা গল্প তাহার মনে পড়িল—এক গৃহস্থের সঙ্গে এক সর্পের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। গৃহস্থ প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ লইয়া বিবরের কাছে যাইয়া ডাকিলে সর্প আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিত, এবং প্রতিদানে একটা মোহর দিত। এই ব্যবস্থায় গৃহস্থ বিশেষ উপকৃত হইত। কিছু দিন পরে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গৃহস্থকে গ্রামান্তরে যাইতে হইল। যাইবার সময় সে পুত্রকে সব কথা বলিয়া সর্পের জন্য দুগ্ধ লইয়া যাইতে ও মোহর আনিতে বলিয়া গেল। বুদ্ধিমান পুত্র পিতার

ব্যবস্থা ভাল নহে মনে করিয়া স্থির করিল, সর্পকে মারিয়া তাহার বিবর হইতে সব মোহর এক দিনে আনিবে। সন্ধ্যাকালে সর্প দুগ্ধ পান করিতে আসিলে বালক তাহাকে লগুড়াঘাত করিল। কিন্তু আঘাত সর্পের মস্তকে না লাগিয়া কোমরে লাগিল—সর্প ফিরিয়া বালককে দংশন করিল—তাহাতেই বালকের মৃত্যু হইল। গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ সব শুনিল—বালকের জন্য বিলাপ করিল, এবং সন্ধ্যাকালে যথাপূর্ব্ব দুগ্ধ লইয়া যাইয়া সর্পকে আহ্বান করিল। সর্প গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া বলিল, 'তোমার সহিত আর আমার পূর্ব্বের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তুমিও পুত্রশোক বিস্মৃত হইতে পারিবে না—আমিও আঘাত-বেদনা ভুলিতে পারিব না।' বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুশীল বলিল, 'মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইবে না। গত দুই বৎসরের স্মৃতি তুমি মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। সুতরাং পূর্ব্বের ব্যবস্থায় আর কাজ নাই।'

গৌরীর মনের মধ্যে যে কথা ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য তাহাকে পীড়িত করিতেছিল—মুখে সে কথা বাহির হইল না। সে বলিতে পারিল না—তোমাকে আমি কেমন করিয়া বুঝাইব—অনুতাপের, আত্মগ্লানির অনলে আমার অতীত—আমার ভুল পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; আমার ভবিষ্যৎ তোমার—তুমি তোমার প্রেমে তাহা সুখময়—সুন্দর কর। তোমার প্রেম-মন্দাকিনীর ধারা ব্যতীত আমার দগ্ধ আশার উদ্ধার হইবে না। আমাকে ভুল বুঝিও না—আমাকে ফিরাইও না। তোমার ভালবাসা ছাড়া আমার কামনার ও সাধনার আর কিছুই নাই। তুমি আমাকে অবসর দাও—আমি আমার ভালবাসা দিয়া তোমার স্মৃতির চিহ্ন মুছিয়া দিব।

গৌরী কোনও কথা বলিতে পারিল না। তাহার বক্ষের বেদনা এমনই অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল যে, তাহার মনে হইল,—সে আর রোদন সংবরণ করিতে পারিবে না। সে উঠিয়া চলিয়া গেল—বারান্দায় যাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল।

দাদার কাজের সত্য সত্যই ক্ষতি হইতেছিল। তাই তাঁহাকে যাইতে হইল। সুধীর কিছুতেই গেল না; বলিল, 'কত কষ্টে একটা জবর রোগী পাইয়াছি—আমি কি ছাড়িয়া যাইতে পারি?' দাদার সঙ্গে দিদি গেলেন। মার ও গৌরীর অবস্থানে সুশীল তখন আর তত আপত্তি করিল না। তাহার কারণ, সে দিদির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যই বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিল। মার দৌর্ব্বল্য

সে জানিত—তিনি ছেলেদের কথার বিরুদ্ধে জিদ করিতে পারেন না। কিন্তু দিদির সঙ্গে তর্কে তাহার ভয় ছিল। সে যাহাই কেন বলুক না, তর্কে তাহার পরাভবের সম্ভাবনা তাহার অবিদিত ছিল না।

দাদার ও দিদির যাইবার কয় দিন পরেই সে বলিল, 'মা, আমি দিন কতক পাহাড়ে বেড়াইয়া আসি। শরীর শীঘ্রই সুস্থ হইবে।' মা বলিলেন, 'বাড়ী চল।' সুশীল পাহাড়ে যাইবার সুবিধা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল। মা বুঝিলেন, সে তাঁহাদের ফিরাইয়া দিতেই ব্যস্ত। কিন্তু বুঝিয়াও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না—সে স্বাস্থ্যলাভের জন্য যাইতে চাহিতেছে, তিনি কি আপত্তি করিতে পারেন? সুধীর একবার বলিল, 'ডাক্তারের সঙ্গে থাকা দরকার।' কিন্তু সে রহস্য করিয়া।

তাহার পর সুশীল বড় দ্রুত তাহার পাহাড়ে যাইবার—অর্থাৎ মার ও গৌরীর কলিকাতায় ফিরিবার দিন নির্দ্ধারিত করিয়া ফেলিল। তত তাড়াতাড়ির জন্য মাও প্রস্তুত ছিলেন না।

ফিরিবার দিন গৌরী তাহার ঠাকুরমার এক পত্র পাইল। গৌরী যে সুশীলের কাছে থাকিল, সেই সংবাদ পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

'এই সংবাদে যে কত আনন্দ পাইলাম, তাহা আর কি বলিব। বিশ্বেশ্বর এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আমাদের পদে পদে অপরাধ—আমরা অপরাধ করিতেই জন্মগ্রহণ করি। কথায় বলে—

"পুড়ে মেয়ে উড়ে ছাই
তবে মেয়ের গুণ পাই।"

অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া সুশীলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিও যে, ইহার পর এক দিন তোমার উপর রাগ করিয়াছিল বলিয়া সে যেন লজ্জা পায়। কিন্তু এই আনন্দে যেন ঠাকুরমাকে ভুলিয়া যাইও না। তোমাদের সব সংবাদ পূর্ব্বের মত আমাকে দিও। মরিবার পূর্ব্বে একবার সুশীলকে আর তোমাকে দেখিতে যাইব—আশা করিয়া আছি।'

ফিরিবার সময় ট্রেণে বসিয়া গৌরী সেই পত্রের কথা ভাবিল। তাহার ব্যর্থ জীবনের বেদনা যেন আর সহ্য করা যায় না। আর সেই স্নেহশীলা ঠাকুরমা—তিনি এ সংবাদে কত কষ্টই পাইবেন! সে কেমন করিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবে? গৌরীর মনে হইতে লাগিল, তাহার পক্ষে জীবনের আলো নিবিয়া গিয়াছে—সে নিরাশার অন্ধকারে কেবল দুঃখের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

১০

বিধাত্রী দেবী গৌরীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইলেন। তিনি গৌরীকে লিখিলেন,—'আমি এ ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তোমার এ দুঃখ ত আর সহ্য করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় যাইতেছি—সেই পথে একবার সুশীলকে দেখিতে যাইব। রমা অনেক দিন হইতে একবার আমার কাছে আসিতে চাহিতেছে। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি বারণ করিয়াছি; তাই আমার উপর রাগ করিয়াছে। আজ তাহাকে লিখিয়া দিলাম—সে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।'

পত্র পাইয়া গৌরী লিখিল,—'আপনার আর সেখানে যাইয়া কাজ নাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ—নহিলে মন্দিরের পূজারী হইয়াও দেবসেবার অধিকারে বঞ্চিত হইব কেন? নহিলে—যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি কি কেবল আমার দুঃখ বুঝিতেই অসমর্থ হইতেন? সেবা করিবার অধিকার—সে অধিকারেও আমি বঞ্চিত হইয়াছি—আমার আর আশার অবকাশ নাই।'

এ দিকে ঠাকুরমার পত্র পাইয়াই রমা ছুটিয়া মার কাছে গেল,—'আমি আজ চলিলাম।' মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় রে?' রমা বলিল, 'ঠাকুরমা দিদিকে দেখিতে আসিবেন (আমাকে নহে), তাই আমাকে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতে লিখিয়াছেন। আমি যাইয়া খুব ঝগড়া করিব।'

মা তাহার কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে রমা বলিল, একটা হাত-ব্যাগে দুইখানা কাপড় আর একটা জামা দাও। আর কিছু দিতে হইবে না।' মা বলিলেন, 'অমন করিয়া যাইলে তিনি রাগ করিবেন।' ঠাকুরমা তাহার উপর রাগ করিবেন, এই অসম্ভব কল্পনায় রমার এমনই কৌতুক বোধ হইতে লাগিল যে, সে যাইবার সময় ব্যাগটি ফেলিয়া গেল। তাহার টেলিগ্রাম পাইয়া সরকার ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। রমা নামিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'জিনিসপত্র কোথায়?' রমা উত্তর দিল, 'জিনিসপত্রের মধ্যে আমি।' সরকার যাইয়া বিধাত্রী দেবীকে জানাইল—'বাবু একবস্ত্রে আসিয়াছেন—সঙ্গে কোনও জিনিস আনেন নাই।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'ভালই করিয়াছে—ছেলেমানুষ জিনিসপত্র লইয়া কি আসিতে পারে?' তিনি তাহার জন্য বস্ত্রাদি আনিতে দিলেন; রমাকে বলিলেন, 'আমি তোর এক প্রস্থ কাপড় চোপড় এখানে রাখিব; আসিলে কোনও অসুবিধায় পড়িবি

না।' রমা খুব হাসিয়া বলিল, 'তুমি সব মাটী করিলে। মা বলিয়াছিলেন, আমি অনেক কাপড় চোপড় না আনিলে তুমি রাগ করিবে। তাই—তুমি আমার উপর কেমন রাগ করিতে পার, দেখিবার জন্ত আমি ব্যাগটা ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি। অথচ তুমি মোটেই রাগ করিলে না!' বিধাত্রী দেবীও হাসিলেন। তিনি বলিলেন, 'এবার রাগ করিলাম না বটে, কিন্তু যখন বৌ লইয়া আসিবি, তখন যদি এমন ভাবে আসিস, তবে খুব রাগ করিব; বৌদিদিকে তোর কাণ মলিয়া দিতে বলিব।'

পর দিন বিধাত্রী দেবী কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া বিধাত্রী দেবী গৌরীর কাছে সব কথা শুনিলেন; বলিলেন, 'দিদিমণি, তবুও মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পার নাই? ভাল—আমিই বলিব।'

গৌরী বলিল, 'তুমি আবার যাইবে?'

'যাইব বই কি, দিদিমণি। আমি কি স্থির থাকিতে পারিতেছি?'

গৌরীর প্রতি দিদির স্নেহের কথা গৌরী ঠাকুরমাকে বলিয়াছিল। তিনি এ সম্বন্ধে দিদির সঙ্গেও পরামর্শ করিলেন। সুশীল যে ভাবে পুনঃ পুনঃ মাকে ফিরাইয়াছিল, তাহাতে, এবং গৌরীর প্রতি তাহার ব্যবহারে দিদি বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। এবার মাকে ও গৌরীকে সুশীলের কাছে রাখিয়া ফিরিবার সময় তিনি মনে করিয়াছিলেন, গৌরীর যে অক্লান্ত সেবায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—অন্ততঃ তাহাতে সুশীলের মত পরিবর্ত্তিত হইবে। গৌরীর এক দিনের কথার ভুল যে ক্ষমার অযোগ্য, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাহার পর তাঁহার আশঙ্কা ছিল, পাছে ছেলেকে হারাইয়া গৌরীর প্রতি মার মনে বিরক্তির বা বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই সব মনে করিয়া দিদিও ভাবিতেছিলেন, তিনি একবার সুশীলকে বুঝাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং বিধাত্রী দেবী যখন বলিলেন, তিনি সুশীলের কাছে যাইবেন, তখন তিনিও বলিলেন, তিনি যাইবেন। বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিলেন, 'ভালই হইল—'একা না বোকা।' আমরা দুই বহিন এক হইলে সুশীলকে হার মানিতেই হইবে।' তিনি একটা বাসা ঠিক করিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন; কিন্তু বলিয়া দিলেন, সুশীল কোনও সংবাদ না পায়। তিনি পাহাড় হইতে সুশীলের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কেন না, পাহাড়ে একা সুশীলের

ভাল লাগিল না। তথায় কোনও কাজ নাই—সুতরাং কেবল ভাবনা—সুশীল আপনার ভাবনার তাড়না হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। সে সংবাদ পাইয়াই বিধাত্রী দেবী দিদিকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

উভয়ে ষ্টেশন হইতে বরাবর সুশীলের বাসায় গেলেন। সুশীল তখন মক্কেলের কাগজ দেখিতেছিল। ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিল, কলিকাতা হইতে 'মা-জী' আসিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া সে বাহিরে আসিল—দেখিল, বিধাত্রী দেবী ও দিদি গাড়ীতে বসিয়া আছেন। উভয়কে প্রণাম করিয়া সুশীল দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি, তুমি ?'

দিদি প্রথম হইতেই যুদ্ধের ভাব লইলেন, 'হাঁ—ভাই, আমি আসিয়াছি। তবে তুমি ভয় পাইও না, তোমাকে বিব্রত করিব না; ঠাকুরমার সঙ্গে আসিয়াছি। কেবল তোমাকে একটা কথা বলিব—কখন তোমার অবসর হইবে জানিয়া যাইব।'

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'আমরা বাসায় যাইতেছি—তুমি দ্বিপ্রহরে আসিয়া তথায় আহার করিও।'

সুশীল বলিল, 'আপনাকেও আমার বাসায় নামিতে বলিতে পারি কি ?'

'জান ত দাদা, আমাদের অনেক হাঙ্গামা। বাসায় সব ঠিক আছে। তুমি আসিও।' তাঁহার আদেশে কর্ম্মচারী বাসার ঠিকানা বলিল।

সুশীল বলিল, 'আমায় আদালতে যাইতে হইবে।'

বিধাত্রী দেবী কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই দিদি বলিলেন, 'ভাল, যখন তোমার আদালতই বড়, তখন তুমি আদালতেই যাইও। আমার কথায় টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই; শুনিবার অবসর হইবে কি ? যখন অবসর হয়, আমি তখনই আসিব।'

'তুমি নামিবে না ?'

'না।'

সুশীল দেখিল, আর এড়াইবার উপায় নাই। সে বলিল, 'আমি মধ্যাহ্নেই যাইব।'

দিদি আর কোনও কথা বলিলেন না।

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'তবে আমরা এখন আসি।'

গাড়ী চলিয়া গেলে সুশীল যাইয়া মক্কেলের কাগজ দেখিতে বসিল; চিত্ত এমনই চঞ্চল যে, মনোনিবেশ করিতে পারিল না, বলিল, 'আজ আমার কাজ আছে, কাল কাগজ দেখিব।'

মক্কেলকে বিদায় দিয়া সে মুহুরীকে ডাকিয়া বলিল, 'আজ আমি আদালতে যাইব না ; আজ সকালে আর কাহারও কাগজও দেখিব না।' সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু আজ ভাবিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিল না। শেষে সে স্থির করিল, অবস্থা বুঝিয়া যা হয় ব্যবস্থা করিবে।

যথাকালে চিন্তাকুলহৃদয়ে সুশীল বিধাত্রী দেবীর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

তাহার আহার শেষ হইলে, বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'আমার একটা কথা তোমাকে রাখিতে হইবে।'

সে কথা কি, বুঝিতে সুশীলের বিলম্ব হইল না। সে বলিল, 'আপনি কেন আবার আসিলেন?'

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'কেন আসিলাম, সেই কথাই তোমাকে বলিব। রমা গৌরীর শুভাশুভ যাহার দেখিবার, সে থাকিলে আমি আসিতাম না। কাশীবাসী হইয়া কাশী ছাড়িয়া আসা মহাপাপী নহিলে কাহাকেও করিতে হয় না। আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে। কিন্তু কি করিব? গৌরীর এ দুঃখ দেখিয়া আমি যে কাশীতেও শান্তিতে মরিতে পারিব না! তাহার পর তাহার এই পত্র পাইয়া আমি কি স্থির থাকিতে পারি?' তিনি অঞ্চলে বদ্ধ গৌরীর শেষ পত্র লইয়া সুশীলকে দিলেন।

সুশীল পত্রখানি পড়িল; কিন্তু তাঁহাকে ফিরাইয়া না দিয়া ভুলিয়া আপনার পকেটে রাখিল। বিধাত্রী দেবী ভাবিলেন, ভালই হইল।

তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আমি স্ত্রীলোক—তুমি পুরুষ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান —তোমার সঙ্গে তর্ক করিব, এমন যোগত্যা আমার নাই। তাহাতে আমাদের অধিকারও নাই। আমাদের অধিকার স্নেহ দিতে, সেবা করিতে, অনুরোধ বা অনুনয় করিতে। আমার অনুরোধ—তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া চল। গৌরী অপরাধ করিয়াছে কি না—করিয়া থাকিলে তাহা উপেক্ষার যোগ্য কি না, তাহার বিচার আমি করিতে পারি না। কেন না, তাহার দোষও আমি উপেক্ষাই করিব। কিন্তু সে যদি এমন অপরাধই করিয়া থাকে যে, তুমি— তাহার স্বামী, তাহার ইহকাল পরকালের জন্য দায়ী—তাহা ক্ষমা করিতে পার না, তবে আমি তাহা ক্ষমা করিতে বলিতে পারি না। ক্ষমা অনুরোধে হয় না—আপনার মন না বুঝিলে আর কেউ বুঝাইয়া ক্ষমা করাইতে পারে না। আমার অনুরোধ—তুমি এমন করিয়া আপনি কষ্ট পাইও না—তোমার

মাকে, দিদিকে—সকলকে কষ্ট দিও না—বাড়ী ফিরিয়া চল। আমার আর কোনও কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখী হও।'

সুশীল কোনও উত্তর দিল না—ভাবিতে লাগিল।

সে দিদিকে বলিল, 'দিদি, তুমি কি বলিবে, বলিতেছিলে?'

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'এখনও দিদির আমার খাওয়া হয় নাই—গত দিন ত রেলেই গিয়াছে।'

সুশীল লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আমি অপেক্ষা করিতেছি।'

দিদি বলিলেন, 'তোমার কি কোনও বিশেষ কাজ—আদালতের কাজ আছে?'

সুশীল বলিল, 'না।'

'তবে তুমি এখন বাসায় যাইবে?'

'হাঁ।'

'তুমি বাসায় যাও—আমি সেখানে যাইব। তুমি সম্বন্ধ ছিঁড়িতে চাহিলেও আমি বলিব—তুমি আমার ভাই। তোমাকে আমার যাহা বলিবার, তাহা আমি হয় তোমার বাড়ীতে—নহে ত আমার বাড়ীতে বলিতে পারি। আমি তোমার বাসায় যাইব।—তুমি যাও।'

'আমি যাইয়া ঘণ্টা খানিক পরে গাড়ী পাঠাইয়া দিব' বলিয়া সুশীল বিদায় লইল।

গাড়ীতে বসিয়া সুশীল পকেট হইতে গৌরীর পত্র বাহির করিল—বারবার পড়িল। তবে কি সে ভুল বুঝিয়াছে? এত দিন একবারও তাহার মনে হয় নাই—সে হয় ত ভুল বুঝিয়াছে। আজ তাহাই মনে হইল; চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইবার নূতন পথ পাইল। তাহার পর বিধাত্রী দেবীর কথা—সে কথার যুক্তি সে কেমন করিয়া খণ্ডন করিবে? মার প্রতি, দিদির প্রতি, দাদার প্রতি, ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদিগের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যে কি টাকা ছাড়া আর কিছুই নাই? যে অর্থ সে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছে—যে অর্থের গর্ব্বই গৌরীর প্রতি তাহার বিরক্তির কারণ—সেই অর্থ দিয়াই সে ত স্নেহ ভালবাসার ঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে! সে আপনার ব্যবহারে পরস্পর-বিরোধ দেখিয়া লজ্জিত হইল। যে বিচারবুদ্ধিতে তাহার অতিপ্রত্যয়ে সে কখনও সন্দেহ করিতে পারে নাই—সেই বিচারবুদ্ধিতে তাহার বিশ্বাস বিচলিত হইল। আর কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—গৌরীর ভুল কি এমন

কঠোর শাস্তিরই উপযুক্ত? তাহার যুক্তি-তর্কের ভার-কেন্দ্র সরিয়া গেল—সব নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন হইল। যদি সে-ই ভুল করিয়া থাকে? তবে সে ভুল সংশোধন করিবার সাহস তাহার থাকিবে ত?

যখন সে এইরূপ নানা ভাবনায় বিচলিত হইতেছিল, তখন দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল টেবেলের কাছে চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল। দিদি আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া টেবেলের অপর দিকে সুশীলের ঠিক সম্মুখে বসিলেন।

কিছুক্ষণ দুই জনের কেহই কথা কহিলেন না। সুশীলের মনে ভয় হইতে লাগিল—এ স্তব্ধতা ঝটিকার পূর্ব্ব-লক্ষণ। তাহার হৃদয়েও ঝড় বহিতেছিল।

দিদিই প্রথম কথা পাড়িলেন, 'এখন তোমার আমার কথা শুনিবার অবসর হইবে কি?'

সুশীল প্রথমেই নত হইল, 'দিদি, তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিতেছ কেন?'

সুশীলের কথার কাতরতায় দিদির স্নেহ উথলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তিনি আজ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ় হইয়া বলিলেন, 'সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।'

তাহার পর দিদি বলিলেন, 'তোমার ব্যবহারে সংসারে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। সুধীর তাহার সংসারের ভার বুঝিয়া লউক—আমি বিদায় লই।'

'আমি কি করিয়াছি, দিদি?'

'তুমি কি করিয়াছ! আমার দুই ভাইকে লইয়া আমার বড় গর্ব্ব ছিল। তুমি সে গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছ। বিদ্যায়—শিক্ষায়—বুদ্ধিতে যে শ্রদ্ধা ভক্তি আমি বাবার কাছে ও স্বামীর কাছে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার ব্যবহারে নষ্ট হইয়াছে। তুমি বিদ্বান, তুমি বুদ্ধিমান, তুমি সুশিক্ষিত—কিন্তু তোমার ব্যবহারের বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি তোমার স্ত্রীর—বালিকার একটা সামান্য কথার ত্রুটী ক্ষমা করিতে পার না। যে ভালবাসার ক্ষমা করিবার যোগ্যতাও নাই—সে ভালবাসা কি ভালবাসা? তুমি তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছ—স্বামী না হইয়া বিচারক হইয়াছ। কিন্তু একবার বুঝিতে পারিয়াছ কি—সে দণ্ড কে ভোগ করিতেছে? সে দণ্ড ভোগ করিতেছ তুমি—আর ভোগ করিতেছেন তোমার মা। তাঁহার অপরাধ—

তিনি তোমার মা, তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ বিচার-বুদ্ধি বিচলিত বা বিকৃত করিতে পারে না। তুমি আপনার সুখের জন্য এত ব্যস্ত যে, যে মার তোমরা ছাড়া স্নেহের অন্য অবলম্বন নাই, সেই মাকে কাঁদাইতেছ। অথচ যে বুদ্ধির গর্ব্বে তুমি গর্ব্বিত, সেই বুদ্ধির দোষে বুঝিতে পারিতেছ না, যাহা তুমি সুখ বলিয়া মনে করিতেছ—তাহা দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে; বুঝিতে পারিতেছ না—তুমি মৃগতৃষ্ণিকায় মোহিত হইয়াছ। তুমি আপনার জিদই এত বড় মনে কর যে, সুধীরের বিবাহে উপস্থিত হইবার জন্য আমার অনুরোধও রাখ নাই!'

দিদির চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল—তাঁহার কণ্ঠস্বর বেদনায় কম্পিত হইতেছিল। এ দিকে তাঁহার তীব্র তিরস্কারে সুশীলের মস্তক ক্রমে নত হইতেছিল। সে আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া দিদি বলিলেন, 'আমার আক্ষেপ, তোমার স্বভাবের এই পরিচয় আমি পূর্ব্বে পাই নাই। পাইলে, দুর্দশায় পড়িয়া—তোমাদের গলগ্রহ হইয়া—তোমাদের আশ্রয় লইতাম না। তখন বুঝিতে পারি নাই—বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ীতে সব অধিকার গিয়াছে, মার স্নেহ কন্যাকে সে অধিকার দিতে পারিবে না। তখন মনে করিয়াছিলাম, তোমরা ভাই—আমি ভগিনী, তোমরাই আমার পিতৃহীন পুত্রকন্যার অভিভাবক। তখন স্নেহে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভুল করিয়াছিলাম। তখন তোমার প্রকৃতির পরিচয় পাইলে আমি কখনও সুধীরকে তোমার অর্থ-সাহায্য লইতে দিতাম না। আজ আমি কেমন করিয়া তাহাকে সেই স্নেহশূন্য—দয়াদত্ত সাহায্যের অপমান হইতে মুক্ত করিব? আমি তাহার মা হইয়া তাহার এই অপমান-বেদনার কারণ হইয়াছি। এ দুঃখ যে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিব না!'

সুশীলের মস্তক নত হইয়া টেবিলের উপর পড়িল। দিদির কথার দারুণ বেদনা তাহার স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা—সব নষ্ট করিয়াছিল। প্রবল বাত্যায় সাগর-সলিলের মত তাহার হৃদয় তীব্র যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না।

সুশীল যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া—দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে—তাহার মুখভাবে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দিদিও কাঁদিতেছিলেন।

সুশীল বলিল, 'দিদি, আজ ছেলেবেলার এক দিনের কথা আমার মনে

পড়িতেছে। আমরা তিন ভাই-ভগিনী এক দিন বাবার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাবা আমাদের লইয়া বাজারে খেলানার দোকানে গিয়াছিলেন। তুমি সকলের বড়। বাবা তোমাকে একটা খেলানা পছন্দ করিতে বলিয়াছিলেন। তুমি বাছিয়া লইয়াছিলে। সেটা মূল্যবান। তোমার হাত হইতে আমি তাহা দেখিতে লই। আমার হাত হইতে সেটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। বাবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি সে দিন কোনও খেলানা পাইব না; আমার খেলানার বদলে তিনি তোমাকে আর একটা খেলানা কিনিয়া দিবেন। তাহা শুনিয়া তুমি বলিয়াছিলে—"ও ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দেয় নাই। আমার আর খেলানা চাহি না—উহাকে দিউন।" সে দিন যেমন প্রসন্নচিত্তে তুমি তোমার ছোট ভাইটির অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলে, আজ তেমনই প্রসন্নচিত্তে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। সে দিন যেমন স্নেহে তুমি আমাকে বাবার রাগ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, আজ তেমনই স্নেহে আমাকে আমার বুদ্ধিবিবেচনার হাত হইতে রক্ষা কর। তোমার সরল বুদ্ধিতে যে পথ আমার কর্ত্তব্য পথ বলিয়া মনে হয়, তোমার ছোট ভাইকে হাতে ধরিয়া সেই পথে লইয়া যাও।'

দিদির স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্থির হইয়া দিদি বলিলেন, 'বাড়ী চল। তোমার গুছাইয়া লইতে যে কয় দিন লাগে, আমি তোমার কাছে থাকিব।' তাহার পর দিদি বিধাত্রী দেবীকে সংবাদ দিতে গেলেন।

বিধাত্রী দেবী গৌরীকে লিখিলেন, 'আমার ফিরিতে কয় দিন বিলম্ব হইবে। কারণ, তোমার হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়াছি—অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।'

পর দিন দিদি সুশীলের বাসায় আসিলেন। তিনি জানিতেন, সুশীলের পক্ষে একটা দারুণ মানসিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; তাঁহার পক্ষে এখন তাহার কাছে থাকাই কর্ত্তব্য। সুশীলও ভাবিল, ভালই হইল। মানুষের মনকে সে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না—সব যেন সংসারের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দিদি বলিলেন, 'এখন বাড়ী চল। সকলে বসিয়া বিবেচনা করিব—যদি তোমার এখানে আসাই ভাল বোধ হয়, আবার আসিও। বাসা এমনই থাকুক।'

পাছে তাহার মত-পরিবর্ত্তন হয়, সে ভয় দিদির ছিল।

* * * *

সাত দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া বিধাত্রী দেবী গৌরীকে বলিলেন, 'দিদিমণি, আমরা দুই বহিনে তোমার পলাতক পাখী ধরিয়া আনিয়াছি। এবার যদি খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখ, তবে কিন্তু আমরা আর ধরিতে পারিব না।'

১১

সুশীলের প্রত্যাবর্ত্তনে গৃহে সকলেরই আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু সুশীল আপনি সে আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারিল না। দিদির তীব্র তিরস্কারে সে যে ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল, সে ভাবের উচ্ছ্বাস স্থায়ী হইতে পারে না। তাহা অপনীত হইতে না হইতে তাহার হৃদয়ে আবার সংশয়ের বালুবিস্তার সৃষ্ট হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, ভাল করিলাম ত? যে আগ্রহে সে দিদির বিচারে নির্ভর করিয়াছিল—সে আগ্রহের অবসানে আবার তাহার তার্কিক বুদ্ধি নানা তর্কের উদ্ভাবন করিতেছিল। সে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু সে যে মার প্রতি ও দিদির প্রতি আপনার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল, সে কথা সে বুঝিয়াছিল। তাই সে আপনাকে আপনি বুঝাইতেছিল, সে ফিরিয়া যদি কেবল সেই কর্ত্তব্য-চ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তবে তাহাও পরম লাভ : সে কেন সেই লাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না? কিন্তু সে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না—কেন না, তর্কের শেষ হইতেছিল না।

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিকালে সুশীল আপনার পরিচিত শয়নকক্ষে যাইয়া একখানা নূতন আইনের পুস্তক খুলিয়া বসিল। কিন্তু পাঠে তাহার বিদ্রোহী মন আত্মনিয়োগ করিল না। কক্ষের সঙ্গে কত স্মৃতি বিজড়িত। এই কক্ষে শয়ন করিয়া সে ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখিয়াছে—কল্পনার তুলিকায় কত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে! তাহার মধ্যে সবই কি স্বপ্নমাত্র রহিয়া গিয়াছে? তাহা নহে। কিন্তু যে স্বপ্ন সফল হয় নাই—তাহাই যে অনন্ত বেদনার কারণ। এই কক্ষে সে গৌরীর ভালবাসায় জীবন সুখময় ও সার্থক করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছে! হায়—সে স্বপ্ন! দোষ কি তাহার? সে কথা সে স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহার হৃদয়ভরা ভালবাসা, তাহাই যে তাহাকে পীড়িত করিতেছিল! সে যে বুঝিতে পারে নাই—গৌরীর উপর তাহার বিরক্তি বিরক্তি নহে—কেবল অভিমান! তাহার ভালবাসা যে গৌরীর 'অপরাধ' অনেক দিনই মুছিয়া দিয়াছে—তাহার বুদ্ধিই সে আঘাতের চিহ্ন স্থায়ী

করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। গৌরী ক্ষমা চাহে নাই। কে বলিতে পারে? ক্ষমা কি কেবল কথা কহিয়া চাহিতে হয়? সে বাঞ্ছা কি নয়নের কাতর-দৃষ্টিতে, সেবার আন্তরিকতায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না? বিধাত্রী দেবীকে গৌরী যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা সুশীলের কাছেই ছিল। এ কয় দিনে সে কত বারই সে পত্র পাঠ করিয়াছে। সে পত্রখানি বাহির করিয়া আবার পাঠ করিল। এই পত্রের ভাবে কি কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারে? বিধাত্রী দেবী বলিয়াছেন, গৌরীর এই পত্র পাইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। গৌরী তাঁহার 'আপনার'। কিন্তু গৌরী কি তাহার আরও 'আপনার' নহে? গৌরী কি তাহার প্রেমসিন্ধুর মন্থনোদ্ভূতা নহে? বিবাহাবধি সে ভবিষ্যতের যত কল্পনাই করিয়াছে, গৌরী যে সে সকলেরই কেন্দ্র ছিল! সে কি তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারিয়াছে? পারিলে সে যে শান্তি লাভ করিতে পারিত। দিদি বলিয়াছেন, যে ভালবাসায় ক্ষমা করিবার যোগ্যতাও নাই, সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে। তাহার ভালবাসা ত ক্ষমা করিতেই ব্যগ্র। কিন্তু— কিন্তু গৌরী কি ভাবে তাহার ক্ষমা গ্রহণ করিবে? সে কেমন করিয়া গৌরীকে বুঝাইয়া দিবে, সে ক্ষমা করিল?

সুশীল যখন এইরূপ চিন্তায় চঞ্চল হইতেছিল, তখন গৌরী কক্ষে প্রবেশ করিল। সেও সারাদিন ভাবিয়াছে—আজ তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারে নাই। তবে সে মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিল—সুশীল যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাহার পরম লাভ। সে যে তাহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে—তাহাই তাহার পরম সুখ। তাহার ভালবাসা নারীর ভালবাসা। তাহা স্বভাবতঃ সংযমশীল—শান্ত—ভক্তিতে পরিণতি-লাভের জন্য ব্যাকুল। সে ভালবাসা সান্ত হইতে অনন্তে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে। গৌরী সেবার ভাব লইয়াই স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার বলিবার কোনও কথা সে খুঁজিয়া পাইল না। হৃদয়ের ভাব যখন দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়, তখন সে জন্য কি কথার কোনও প্রয়োজন হয়?

সুশীল পুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একবার স্বামি-স্ত্রীর চারি চক্ষু মিলিয়াছিল। গৌরীর নেত্রে যে শান্ত দৃষ্টি সুশীল লক্ষ্য করিয়াছিল, পুস্তকের পত্রে সে যেন কেবল তাহাই দেখিতে লাগিল!

গৌরী ধীরপদে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইল—তাহার পর নত হইয়া তাহার চরণে প্রণাম করিল।

সুশীল ভাবিল, এখন কোনও কথা বলা—কুশল জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে কি?

সুশীল তাহার চরণে দুই বিন্দু অশ্রুপাত অনুভব করিল। গৌরী কাঁদিতেছে। যুক্তি তর্কের—সংশয় সঙ্কোচের সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া সুশীলের রুদ্ধ ভালবাসার প্রবল স্রোত গৌরীর দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল—সে আর তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না।

তাহার পর সুশীল তাহার চরণে গৌরীর ওষ্ঠাধরের স্পর্শ অনুভব করিল। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, সুশীলের সব সঙ্কোচ তেমনই ভালবাসার প্রাবল্যে পরিণতি লাভ করিল। সে যে তখনও ক্ষমার কথা মনে করিয়াছে—সে যে তখনও অবিচলিত ছিল, তাহা মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিল। ক্ষমা!—যে ভালবাসা আপনাকে সার্থক করিবার জন্য এমন দীনতা স্বীকার করিতে পারে, সে ভালবাসা ক্ষমার যোগ্য, না—শ্রদ্ধার যোগ্য? যে ভালবাসা অভিমান পরিহার করিতে পারে—অপমানের আঘাতবেদনা বিস্মৃত হইতে পারে—সে ভালবাসার তুলনায় তাহার আপনার ভালবাসা কত দীন, কত ম্লান, সুশীল মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিল। সে দুই বাহু বিস্তৃত করিয়া গৌরীকে তাহার বক্ষে তুলিয়া লইল—তাহার অশ্রুপ্লাবিত গণ্ডে ও ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিল। স্বামীর বাহুপাশবদ্ধা গৌরী কাঁদিল। সে ক্রন্দন সুখের, কি দুঃখের, কি অভিমানের, তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না।

* * * *

সাত দিন পরে বিধাত্রী দেবী কাশীতে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিলেন। তিনি একবার যাত্রাপুরে যাইয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন—সেখান হইতে একবার গৌরীপুরেও যাইলেন। সকলকে বলিলেন, 'শেষ দেখা।'

যাত্রার দিন মধ্যাহ্নে তিনি সুশীলের গৃহে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 'দাদা, আর দেখা হয় কি না সন্দেহ। আমার শেষ উপহার এইবার তোমার হাতে দিয়া যাই।' তিনি যাহা দিলেন—তাহা প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

সুশীল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি?'

আমার পৈতৃক সম্পত্তির আয় আমার শ্বশুর ও তোমার দাদাশ্বশুর বরা-

বরাই স্বতন্ত্র রাখিতেন। তাহা জমিয়া যে টাকা হইয়াছিল, তাহা আলাহিদা তহবিল। আমি কাশীতে যে মন্দির ও সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাঁহার ব্যয়ের জন্য সেই তহবিলের লক্ষ টাকা দিলাম—দলীল লেখা হইলে তোমার কাছে পাঠাইব, তুমি দেখিয়া দিলে দলীল সম্পন্ন করিব। অবশিষ্ট টাকার অর্দ্ধেক রমার, অর্দ্ধেক তোমার। এই তোমার টাকা।'

'এ টাকা লইয়া আমি কি করিব ?'

বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি কি করিবে, তাহা তোমার ভাবনা। আমি দিয়া ভাবনামুক্ত হইলাম।'

'কিন্তু—'

'না, দাদা, আমি আর কোনও কথা শুনিব না। রমায় ও গৌরীতে আমি কোনও প্রভেদ করিতে পারিব না।'

গৌরীকে তিনি বলিলেন, 'দিদিমণি, এইবার হাসিমুখে ঠাকুরমাকে বিদায় দাও।' গৌরীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছিল দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'ছিঃ দিদিমণি, কাঁদিতে আছে ? আমি এইবার পরম আনন্দে আনন্দভূমি কাশীতে যাইতেছি। সুশীলকে বলিয়া যাইব, তোমার যখন ইচ্ছা, তোমাকে লইয়া আমাকে দেখিতে যাইবে। কিন্তু বুড়ীকে আর মায়ায় জড়াইও না; আর কাশীছাড়া করিও না।'

গৌরী বলিল, 'কিন্তু তোমাকে আর একবার আসিতে হইবে।'

'ও কামনা আর করিও না। আমি আর আসিব না।'

'রমার বিবাহেও না ?'

'সে উৎসবের মধ্যেও যদি তোমাদের ঠাকুরমাকে মনে পড়ে, তোমরা আমাকে বৌ দেখাইয়া আনিও।'

ঠাকুরমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া রমা বলিল, 'ঠাকুরমা, তোমার আসিতে ইচ্ছা না হয়, তুমি আসিও না। কিন্তু আমার যখন ইচ্ছা আমি যাইব—বারণ করিতে পারিবে না। আমাকে সেই অনুমতি দিয়া যাও।'

বিধাত্রী দেবী রমার মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আমার কাছে তোর আর কোনও অনুমতি চাহিবার অপেক্ষা করিতে হইবে না। কিন্তু আমার অনুমতি আর কয় দিন ? যখন বৌদিদির অনুমতি লইতে হইবে, তখন ?'

সম্পূর্ণ।

৯ই পৌষ, ১৩২০।
'সোমালী' জাহাজে—
আরব সাগর,
(সুয়েজের বন্দরে)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দুর্দ্দিনের দেবতা।

১

জলদ-গুণ্ঠিতা নিশা,—ধারা অবিরাম,
বিদারি' আঁধার-রাশি
বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ হাসি,
মেঘমন্দ্রে কাঁপে প্রাণ, ঝটিকা উদ্দাম;
ঘাট, বাট পান্থহীন,
নির্ব্বিশেষ নিশি-দিন,
রুধি' দ্বার গৃহে গৃহী যাপিতেছে যাম,
বাহিরে দুর্য্যোগ অতি,—বৃষ্টি অবিরাম।

২

শশি-তারা নাহি রেখা,
নাহি ভরসার রেখা,
ত্রস্তা ধরা বাহুপাশে বাঁধে জীবগণে!
দেবতা-মন্দির স্তব্ধ,
নাহি সন্ধ্যারতি-শব্দ,
পুরোহিত নাহি,—আজি অর্চ্চনা গগনে,
বাদলে মাদল বাজে ঘন-গরজনে!

৩

দেবতা কোথায় আজি? ভক্তের সন্ধানে—
মন্দির করিয়া শূন্য—
একি ভাগ্য,—একি পুণ্য!—
দ্বারে-দ্বারে ফিরিছেন,—দুর্য্যোগ কে মানে?
অই যে, রথের চূড়ে,
বিজলী-কেতন উড়ে,
চক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি পশিতেছে কানে,
অই দ্বারদেশে এল মেঘ-গর্জ্জ-গানে।

৪

ও নহে ত ঝঞ্ঝাবাত,—
দেবতার করাঘাত,
খুলে দে দুয়ার তোর—সে রে ভুলে ঘরে;
রথরজ্জু ধর ধর—
(শিহরুক্ কলেবর
পুলকে কদম্ব সম) প্রেমভক্তিভরে;
'এস এস, জগন্নাথ!'—ডাকি যুক্ত-করে।

৫

হে গৃহি, হে ভাগ্যবান্,
কোথা তাঁরে দিবি স্থান,
দুর্দ্দিনে দেবতা তোর অতিথি দুয়ারে!
মুছি' তোর আঁখি-নীর,
দে রে লুটাইয়া শির
অই পদতলে—আর, পাবি কবে তাঁরে?
দীনের দেবতা আজি উদয় দুয়ারে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ক্ষয়াবশেষ। *

Rudiment কথাটা জীববিজ্ঞানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে আমি 'ক্ষয়াবশেষ' শব্দ ব্যবহার করিলাম। সে অর্থ কি? জীবের দেহে ক্ষয়াবশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, [বিশেষতঃ অস্থি, পেশী, কেশ] অনেক আছে। ইহারা সমশ্রেণীর জীবের মধ্যেও কাহারও দেহে স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল, এবং কাহারও দেহে স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, অথবা প্রায় নিষ্ক্রিয়; কাহারও দেহে জীবের

* Rudiment; ইহাকে 'লুপ্তাবশেষ'ও বলা যাইতে পারে।

ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াশীল; কাহারও দেহে তদ্রূপ নহে। এরূপ হয় কেন? ইহা হইতে জীবের জন্মকথা বুঝিবার চেষ্টা করা যায় কি না? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইহারই আলোচনা করিব। একটী সর্ব্বজন-বিদিত জীবশ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই হেতু কতিপয় স্তন্যপায়ী জীবের সহিত মানবের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সকল আলোচনাতেই প্রথমতঃ পরিদর্শন, পরে মীমাংসা, অথবা সিদ্ধান্ত। প্রথমে ঘটনাগুলি দেখিয়া লইতে হয়; পরে তাহা হইতে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও এই পন্থাই অবলম্বন করিব। গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, হস্তী, বানর ও মানব, ইহারা সকলেই স্তন্যপায়ী জীব। ইহাদিগের দেহ-গঠনও একই প্রকার। বাহিরের ও ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনুরূপ। তথাপি অনেক অস্থি, পেশী, শিরা ও অন্য যন্ত্র আছে, যাহা গবাদি ইতর প্রাণীর দেহে স্বভাবতঃ ক্রিয়া করে, কিন্তু বানরের ও মানবের দেহে স্বভাবতঃ ক্রিয়া করে না; এবং এমন অস্থি, পেশী ইত্যাদিও অনেক আছে, যাহা ঐ সকল ইতর-জীবদেহে উহাদিগের ইচ্ছামত ক্রিয়া করে, কিন্তু নর ও বানরের দেহে তদ্রূপ করে না।

দৃষ্টান্তস্থলে, প্রথমতঃ বাহিরের কর্ণ-পত্রের কথা উল্লেখ করিব। ইহা শ্রবণেন্দ্রিয় নহে; ইহা কাটিয়া ফেলিলেও শ্রবণ-ক্রিয়ার বিশেষ বিঘ্ন হয় না।

কর্ণপত্র।

ইহা ফণোগ্রাফের হর্ণের ন্যায় শব্দকে কিছু বড় করে; এবং শব্দ কোন্ দিক হইতে আসে, তাহা বুঝাইয়া দেয়। শব্দের দিক নির্ণয় করিতে পারা সকল জীবেরই আবশ্যক। গবাদি ইতর জীবের কর্ণপত্র-লগ্ন পেশী * স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল, সুতরাং উহাদিগের কর্ণ-পত্র ইচ্ছানুসারে এদিক-ওদিক সঞ্চালিত হয়। উহারা কর্ণপত্র এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া শব্দের দিক নির্ণয় করে। কিন্তু নর ও বানরের শ্রেণীতে ঐ পেশী স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল নহে, এবং তাহাদিগের ইচ্ছামত কর্ণপত্র এদিক-ওদিক সঞ্চালিত হয় না। †

চারি পায়ের উপর দেহভার রাখিয়া দাঁড়াইলে, অথবা ঐ ভাবে চলা ফেরা করিতে হইলে, গ্রীবায় ও মস্তকের ভার বলপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়; নচেৎ

---

* উপরের পেশী এবং পশ্চাতের পেশী।

† আমার একটী বন্ধু কর্ণপত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক উপরে ও নীচে উঠাইতে নামাইতে পারে; এবং আর একটী সুপরিচিত ব্যক্তি কর্ণপত্রের ঊর্দ্ধভাগ ইচ্ছাপূর্ব্বক নত করিতে পারে। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে।

মস্তক মাটীর দিকে নামিয়া পড়ে। এই অবস্থায় গ্রীবা ও মস্তক এদিক-ওদিক সঞ্চালন করা সুবিধাজনক নহে, এবং উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু দণ্ডায়মান অবস্থায় গ্রীবায় ও মস্তকের ভার স্কন্ধের উপর সুরক্ষিত থাকে; সুতরাং উহাদিগকে এদিক-ওদিক ঘুরাইতে তাদৃশ বলক্ষয় হয় না, এবং ঘুরানও সহজসাধ্য। শব্দের দিক-নির্ণয়ই কর্ণপত্র-সঞ্চালনের প্রধান উপকারিতা। সে উপকার গবাদি চতুষ্পদ জীব কর্ণপত্র-সঞ্চালন দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজে প্রাপ্ত হইতে পারে; এবং তাহারা ঐরূপই করে। সুতরাং কর্ণপত্র-লগ্ন পেশী ক্রিয়াশীল হইয়াছে; এবং ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু বানর ও মানব দণ্ডায়মান হইতে পারে; মানব প্রায় এক বৎসর দেড় বৎসর বয়স হইতেই দণ্ডায়মান হয়, এবং অধিকাংশ সময় ঐ অবস্থাতেই চলা-ফেরা করে। কতিপয় উন্নত শ্রেণীর বানরও অনেক সময় দণ্ডায়মান হইয়া চলা-ফেরা করে। তাহাতে ইহাদিগের হস্ত দেহভার-রক্ষাকার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া অন্যবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। নর-বানরের দণ্ডায়মান অবস্থা হেতু গ্রীবা ও মস্তক সহজে এদিক-ওদিক সঞ্চালিত হইতে পারে। সুতরাং তাহারা শব্দের দিক নির্ণয় করিতে হইলে, সহজেই গ্রীবা ও মস্তক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন করে; কর্ণপত্র-সঞ্চালন আবশ্যক হয় না। তাহাদিগের কর্ণপত্র-সঞ্চালন-ক্ষমতা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়; অথবা বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

গবাদির ও নর-বানরের, উভয়েরই কর্ণপত্র-লগ্ন পেশী আছে; কিন্তু গবাদির পেশী ক্রিয়াশীল ও পুষ্ট, এবং নর-বানরের পেশী প্রায় ক্রিয়াহীন ও অপুষ্ট হইয়া গিয়াছে। গবাদির কর্ণপত্রের উপাস্থি * ও চর্ম্মও পুষ্ট, এবং ক্রিয়াশীল; কিন্তু নর-বানরের কর্ণপত্রের উপাস্থি ও চর্ম্ম অপুষ্ট, এবং প্রায় ক্রিয়াহীন। গবাদি যে উপায়ে শব্দের দিক নির্ণয় করিয়া উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে; এবং নর-বানর যে উপায়ে ঐ কার্য্য সাধন করিয়া উপকার লাভ করে, তাহাতে; কর্ণপত্র-লগ্ন পেশী ও উহার উপাস্থি ও চর্ম্ম একের দেহে ক্রিয়াশীল ও উপকারী, অথচ অন্যের দেহে ক্রিয়াহীন ও নিষ্ফল হইবারই কথা। এ স্থলে ক্রিয়া প্রয়োজনের ও উপকারিতার অনুসরণ করে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। †

---

* Cartilages.

† কর্ণপত্র-লগ্ন পেশী সম্বন্ধে, বার্ণার্ড-কৃত ওয়েডার সিমের Structure of Man গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ (১৮৯৫) ১০২ হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এবং Descent of Man গ্রন্থের (১৯০৬) ১৯ হইতে ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ, পৃষ্ঠচর্ম্মের নীচে যে পেশী * আছে, তাহাও গবাদি জীবে ও নর-বানর শ্রেণীতে তুলনায় আলোচনা করিলে, ঐরূপই দেখা যায়। গবাদি চতুষ্পদ জীব ঐ পেশীর কুঞ্চন প্রসারণ করিতে পারে, কিন্তু নর বানর তাহা পারে না। অর্থাৎ, পৃষ্ঠ যথাস্থানে রাখিয়া কেবলমাত্র ঐ পেশীকে কম্পিত করিবার ক্ষমতা গবাদির আছে, নর ও বানরের তাহা নাই। নর ও বানর পৃষ্ঠকে এদিক-ওদিক বাঁকাইতে, কিংবা উচ্চ নীচ করিতে পারে; সেই উপলক্ষে পৃষ্ঠের পেশীও সঞ্চালন করিতে পারে, সত্য, কিন্তু পৃষ্ঠকে এক ভাবে স্থির রাখিয়া ঐ পেশীটী মাত্র কম্পিত করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত। এই অর্থে নর ও বানর শ্রেণীতে ঐ পেশী তাহাদিগের ইচ্ছানুসারী নহে। কিন্তু গবাদি চতুষ্পদ জীব পৃষ্ঠ এক স্থানে স্থির রাখিয়াও কেবলমাত্র পেশীটী ইচ্ছামত কম্পিত করিতে পারে। এতদুভয় শ্রেণীতে এই পেশীর কার্য্য সম্বন্ধে ইহাই প্রধান প্রভেদ।

পৃষ্ঠের পেশী।

চতুষ্পদ প্রাণীর অগ্র-পদদ্বয় নর ও বানরের হস্তের সহিত তুলনীয়। গবাদি চতুষ্পদ প্রাণী উহা দ্বারা পৃষ্ঠ দেশের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না। মাছি, মশা ইত্যাদির উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় লেজ। † কিন্তু উহা ত পৃষ্ঠের সকল স্থান হইতে মাছি, মশা ইত্যাদি তাড়াইতে পারে না। সুতরাং পৃষ্ঠ-চর্ম্মের নিম্নস্থ পেশী কুঞ্চিত প্রসারিত করিয়া ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হয়। উহাদিগের এই উপকারসাধনের প্রধান উপায়ই পেশী-কম্পনের ক্ষমতা। উহারা নিমেষমধ্যে পৃষ্ঠের চর্ম্ম অত্যন্ত কম্পিত করিয়া তুলিতে পারে, এবং এই প্রকারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী ইত্যাদিকে পৃষ্ঠের উপর হইতে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বানর ও মানব, বিশেষতঃ মানব, হস্তদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠ হইতে কীট পতঙ্গাদি তাড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। তাহারা সর্ব্বদাই ঐ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত হস্ত ব্যবহার করে; পৃষ্ঠলগ্ন পেশী সঞ্চালন করিবার তাহাদের প্রয়োজন হয় না; এ ভাবে উহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। তাই উহার ক্রিয়াশক্তিও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবাদির, এবং নর ও বানর, উভয়েরই পৃষ্ঠচর্ম্মের নিম্নে পেশী আছে। কিন্তু একের প্রয়োজন অনুসারে উহা ক্রিয়াশীল; অপরের প্রয়োজনাভাবে উহা

---

* Panniculous Carnosus.

† গবাদি পশুর অনেকের লেজ বিশেষ দীর্ঘ নহে। তাহাদিগের পৃষ্ঠপেশী-সঞ্চালন ব্যতীত উপায় নাই।

ইচ্ছামত চর্ম্ম-সঞ্চালনের ক্ষমতা হারাইয়াছে। পেশী আছে; কিন্তু সে ক্রিয়া নাই। ইহাই বিবেচ্য।

বক্ষের পেশী।

বক্ষের পেশী সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য উপলক্ষে, এবং দক্ষিণে ও বামে হেলিবার সময় সমস্ত বক্ষ উচ্চ নীচ করিতে হয়, অথবা এদিক-ওদিক হেলাইতে হয়। সেই উপলক্ষে বক্ষের পেশীও সঞ্চালিত হয়। কিন্তু গবাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় বক্ষের চর্ম্ম কম্পিত করা, অর্থাৎ তন্নিম্নস্থ পেশীমাত্র সঞ্চালিত করা, নর ও বানরের সাধ্যাতীত। কেবলমাত্র এই পেশী ইচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালিত করিবার শক্তি গবাদির আছে; নর ও বানরের নাই। গবাদির পক্ষে বুকের ও পেটের চর্ম্ম কাঁপাইয়া কীটাদি তাড়াইয়া দিতে পারা, উপকারজনক। নর ও বানর ঐ উপকার হস্ত-সঞ্চালন দ্বারা লাভ করে।

মস্তকের পেশী।

মস্তকের উপরিভাগের পেশী সম্বন্ধেও এই কথা। গবাদি পশুর ঐ পেশী-সঞ্চালন দ্বারা চর্ম্ম কম্পিত করিবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু নর ও বানরের সে ক্ষমতা প্রায় নাই। ডি. কণ্ডোল ডারুইন্‌কে জানাইয়াছিলেন যে, একটী পরিবারে কর্ত্তার মাথার উপর পুস্তক রাখিলে তিনি শুধু পেশী-কম্পন দ্বারা উহা ফেলিয়া দিতে পারিতেন, এবং এইরূপে কখনও কখনও বাজি জিতিতেন।* সে যাহা হউক, মানবের এই ক্ষমতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু একটু বিস্ময়ের কথা এই যে, কপালের পেশী † মানব কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে পারে, উহাদিগের ক্রিয়া এখনও ইচ্ছার অধীন আছে।

লেজ।

উপরে প্রসঙ্গক্রমে লেজের উল্লেখ করিয়াছি। কোনও কোনও উচ্চ-শ্রেণীস্থ বানরের ও মানবের লেজ ক্ষয়াবশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গবাদির লেজ মেরুদণ্ডের শেষভাগ হইতে দেহের বাহিরেও কিয়দ্দূর গিয়া শেষ হয়। কিন্তু ওরাংওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরগণের ও মানবের লেজ মেরুদণ্ড হইতে বাহির হইয়া কিঞ্চিদ্দূর আসিয়া দেহমধ্যেই শেষ হইয়াছে। লেজ অথবা লেজের কোনও চিহ্ন শেষোক্ত জীবগণের দেহের বাহিরে প্রায় দেখা যায় না। ভ্রূণ ‡ অবস্থায়

* Descent of Man (1906) p. 18.

† Epicranius Frontalis.

‡ Gerlach records a remarkable case of tail formation in an otherwise normal human embryo in the fourth month of intra-

ইহাদিগের লেজের অস্তিত্বও স্পষ্টই দেখা যায়, কিন্তু প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরও কদাচিৎ দুই এক ব্যক্তির লেজের চিহ্ন থাকা, এবং একটী দ্বাদশবর্ষবয়স্ক লই-জাতীয় বালকের দেহের বাহিরেও লেজের মত একটী ক্ষুদ্র লম্বমান পেশীগুচ্ছ ঝুলিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল ব্যক্তির বিস্তৃত বিবরণ অধ্যাপক ওয়েডের শেমের Structure of Man নামক গ্রন্থের ২৬ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। যাহা হউক, কদাচিৎ এরূপ দৃষ্ট হইলেও, প্রসবের পর মানব-শ্রেণীতে লেজের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। তথাপি আভ্যন্তরিক ক্ষয়াবশিষ্ট চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই।……মেরুদণ্ডের খণ্ড খণ্ড অস্থিগুলির সংস্থান বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব-শ্রেণীস্থ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের নিম্ন হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত সাতখানি অস্থি আছে; পৃষ্ঠে বারোখানি অস্থি, এবং নিতম্বপ্রদেশে পাঁচখানি ও তন্নিম্নে পাঁচখানি; মোট ঊনত্রিশখানি অস্থিতে মেরুদণ্ড গঠিত। তাহার নিম্নে গুহ্যদ্বারের প্রায় নিকট পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি * অস্থি আছে, উহাই প্রকৃতপক্ষে লেজের ক্ষয়াবশেষ। গবাদি ইতর প্রাণীর ও নিম্নশ্রেণীস্থ বানরগণের ঐ অস্থি কয়েকখানির সংখ্যা অনেক অধিক। সুতরাং দেহ-মধ্যে স্থান সঙ্কুলন না হইয়া দেহের বাহির হইয়া আসিয়াছে। যে স্থান হইতে দেহের বাহির হইয়াছে, ঐ স্থান গুহ্যদ্বারের কিঞ্চিৎ উপরে। তথায় মানব-গণের একটী বৃত্তাকার ক্ষুদ্র 'খাল' আছে। † স্তন্যপায়ী ইতর জীবগণের লেজের খণ্ড খণ্ড অস্থিগুলি পেশী দ্বারা সম্বদ্ধ, এবং সেই পেশী শিরা দ্বারা চালিত হয়। তাহাতেই উহারা লেজ নাড়িতে পারে। মানবের হস্ত দ্বারাই [লেজ নাড়িবার] প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। মানবের ও উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের বাহ্য লেজ নাই, সুতরাং লেজ নাড়াও নাই। তবে উহাদিগের মেরুদণ্ডের ঊনত্রিশখানি খণ্ডাস্থির নীচে যে পাঁচখানি অতি ক্ষুদ্র, শীর্ণ, অপুষ্ট জমাট মত অস্থি আছে, তাহাতে পেশীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় কেন? যদিও সে পেশী অকর্ম্মণ্য, তথাপি ঐ অস্থিসংলগ্ন পেশী আছে কেন? ঐ পেশীর সহিত যুক্ত শিরা আছে কেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহা ভ্রূণ অবস্থায় উত্তম

---

uterine life, an age at which, as a rule, the tail-like appendage has disappeared.—*Structure of Man.—Weder Sheim. (Tr) (1895) P. 27.*

* মানব-শ্রেণীতে সাধারণতঃ পাঁচখানি।

† Vertex Coccygens.

থাকে, কিন্তু প্রসবের পূর্ব্ব হইতে আর উত্তম থাকে না, কিন্তু অপুষ্ট অবস্থায় কিছু থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় গুহ্যদ্বারের বাহিরেও বক্রভাবে যে লেজাংশ থাকে, তাহা কোনও একটী ভ্রূণের দেহের একষষ্ঠাংশপরিমিত দীর্ঘ থাকা দেখা গিয়াছে। এত বড় লম্বা লেজ নর ও বানরের ভ্রূণের প্রায় দেখা যায় না। * ভ্রূণ অবস্থায় প্রকৃত মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে জমাটমত অপুষ্ট খণ্ডাস্থিগুলির সহিত পেশী ও শিরা যুক্ত থাকাতে, এবং প্রসবের পরও অপুষ্ট পেশী ও শিরা ঐ খণ্ডাস্থিগুলির সংস্পৃষ্ট থাকাতে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, উহা অথবা উহা অপেক্ষা দীর্ঘতর লেজ মানবের পূর্ব্ববর্ত্তীর ছিল, এবং তাহা নাড়িবারও বন্দোবস্ত ছিল; নচেৎ পেশী ও শিরার আবশ্যকতা নাই। উচ্চ শ্রেণীর বানরের ও মানবের সেই দীর্ঘতর বাহ্য অংশ থাকা এখন নিষ্প্রয়োজন; কারণ, হস্ত দ্বারাই উহাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। প্রকৃত পক্ষে ঐ বাহ্য অংশ ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছেই; ভিতরের অংশ ক্ষুদ্র হইলেও আছে, কিন্তু ক্ষয়াবশিষ্ট আকারে। এ স্থলেও অঙ্গ ও তাহার ক্রিয়া প্রয়োজনের অনুসরণ করিয়াছে। যাহাদিগের লেজের প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতা আছে, তাহাদিগের লেজ দীর্ঘ, পুষ্ট, এবং বহু-অস্থি-যুক্ত; আর কর্ম্মঠ শিরা ও পেশী-যোগে ইচ্ছামত ক্রিয়াশীল। আর, যাহাদিগের ঐ অঙ্গের প্রয়োজন নাই, তাহাদিগের দেহমধ্যে উহা খর্ব্ব, অপুষ্ট ও ক্রিয়াহীন; † এবং ভ্রূণ অবস্থায় অকর্ম্মণ্য শিরা পেশী যুক্ত থাকিলেও পরে বাহিরে বিদ্যমান থাকে না। কেবল গবাদি ইতর জীবের যে স্থান হইতে ঐ লেজ বাহির হইয়াছে, উচ্চশ্রেণীর বানরের ও মানবের দেহে সেই স্থানে একটী চক্রাবর্ত্ত 'খাল' চিহ্নমাত্র থাকিয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহাদিগের মধ্যে লেজকে ক্ষয়াবশিষ্ট অঙ্গ বলা যায়; সম্পূর্ণ লুপ্ত বলা যায় না।

এক্ষণে আর একটী ক্ষয়াবশেষের উল্লেখ করিব। উহা পুংজাতীয়গণের স্তন। গবাদি ইতর প্রাণীর এবং নর ও বানরের স্ত্রীগণের ও পুংগণের

স্তন। স্তনের স্থান তুল্য আকৃতিরই থাকে। তৎপরে যৌবন কাল আগত হইলে স্ত্রীগণের স্তনগণ্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পুংগণের ঐ গণ্ড (Gland) অপুষ্ট অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। দুই এক জন মানবের স্তনগণ্ড বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছে, এবং কদাচিৎ টিপিলে একটু

* ইহার চিত্র ওয়েডার শেমের গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† কেবল নারীগণের প্রসবকালে দেহমধ্যস্থ ঐ ক্ষুদ্র লেজাংশ পশ্চাৎ ভাগে সরিয়া যায়।

দুগ্ধবৎ রসও বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীগণের স্তনগণ্ডের ন্যায় কখনই পুষ্ট হয় না, এবং দুগ্ধও ক্ষরণ করে না। স্ত্রীগণের প্রায়শঃ গর্ভাবস্থাতেই স্তনগণ্ডে দুগ্ধ সঞ্চিত হয়, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে উহা পান করে। কিন্তু কখনও কখনও বন্ধ্যার স্তনেও দুগ্ধ দৃষ্ট হয়; শিশুরা টানিতে টানিতে ঐ দুগ্ধ বাহির করে। যাহা হউক, সন্তানের সহিত দুগ্ধসঞ্চয়ের নিত্য সম্বন্ধ নাই। কারণ, নারীগণের জরায়ুতে * বৃহৎ ব্রণ হইলেও কখনও কখনও স্তনগণ্ডে দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, পুংগণের সাধারণতঃ স্তনগণ্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং দুগ্ধ ক্ষরণ করে না; ঐ গণ্ড অপুষ্ট, ক্ষীণ ও অকর্ম্মা অবস্থায় থাকে। সকল স্তন্যপায়ী জীবেরই এইরূপ। উহাদিগের সকলেরই পুংস্তন ক্রিয়াহীন ও অতি ক্ষুদ্র।

কখনও কোনও জীবের পুংস্তন সাধারণতঃ ক্রিয়াশীল থাকার প্রমাণ নাই। অথচ কদাচিৎ দুই একটী নরের স্তনগণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে এবং দুগ্ধবৎ রস ক্ষরণ করিতে দেখা যায়; ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, কদাচিৎ দুই এক জন নরের ক্রিয়াহীন বহু স্তন-চিহ্নও দেখা যায়। Schreiner Von Schonach নামক এক জন জার্ম্মাণ পুরুষের বক্ষঃস্থল হইতে পঞ্জরের নিম্ন পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে আটটী বোঁটা (Teat) ছিল; প্রত্যেক পার্শ্বে ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে স্থাপিত চারিটী করিয়া আটটী। প্রত্যেক পার্শ্বে বগলের নিকট একটী, স্বাভাবিক স্তনের স্থানে একটী, এবং তাহার নিম্নে কিছু কিছু ব্যবধানে আর দুইটি বোঁটা ছিল। এই দুইটীর চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার বেষ্টনীও ছিল। এক পার্শ্বের বোঁটাগুলি যে যে স্থানে ছিল, অপর পার্শ্বের বোঁটাগুলিও তদনুরূপ স্থানে ছিল। একটী জাপানী যুবতীর স্বাভাবিক স্তনদ্বয়ের বোঁটার উপরে দুই পার্শ্বে আর দুইটী বোঁটা ছিল। এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত বৈজ্ঞানিকগণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ডারুইন একটী নারীর উরুতে একটী বোঁটা থাকার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপ স্মরণ হয়। Schonachএর বক্ষঃস্থলে পঞ্জরের নিম্ন পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে ঊর্দ্ধাধঃ স্থাপিত বোঁটার সারি দেখিলে কুক্কুরীর, বিড়ালীর, শূকরীর বহু স্তনের সারি স্বতাবতঃই মনে উদিত হয়। পুরুষের স্তন থাকা সর্ব্বথা নিষ্ফল; স্ত্রীগণেরও দুইটী ব্যতীত অতিরিক্ত স্তন থাকা নিষ্প্রয়োজন। কুক্কুরী প্রভৃতি এক সঙ্গে বহু অপত্য প্রসব করে; সুতরাং তাহাদিগের বহু স্তন থাকা দুর্ব্বোধ্য নহে। যদিও একদা বহু-

* Tumour.

অপত্য-প্রসবিনী ছাগীর বহু স্তন নাই। কিন্তু মানব-জাতীয় স্ত্রীগণ সাধারণতঃ যুগপৎ বহু অপত্য প্রসব করেন না; তাঁহাদিগের বহু স্তন চিহ্ন থাকিবার কোনও অর্থই হয় না; বিশেষতঃ, দুইটী ব্যতীত অন্যগুলি ক্রিয়াহীন। এই সকল কারণবশতঃই বলিয়াছি যে, স্তনের সহিত অপত্যের নিত্যসম্বন্ধ নাই; দুগ্ধের সহিতও নাই। তবে ইহার অর্থ কি?

এই প্রবন্ধের সমস্ত দৃষ্টান্তগুলির যেরূপ মীমাংসা সমীচীন হয়, পরে তাহার অবতারণা করিব।

কেশ দেহচর্ম্মের বিকার। গবাদি ইতর প্রাণীর, বানরের ও মানবের—সকলের দেহেই কেশ আছে। কিন্তু মানবের দেহে কেশ অত্যন্ত অল্প। মস্তকে, বগলে ও আরও দুই এক স্থান ভিন্ন মানবের দেহে কেশ দেখা যায় না। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় মানবের দেহেও, গবাদির ন্যায় সর্ব্বত্র কেশ দেখা যায়। মাথায়, মুখে, কপালে, হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে—সর্ব্বত্রই মানব-ভ্রূণের দেহ কেশাবৃত। কেবল হাতের ও পায়ের তলা ভ্রূণেরও কেশহীন। এই অবস্থায় কেশ সাদা-মত কটা বর্ণ ও অতি কোমল ও খর্ব্ব হইয়া থাকে। জাতক ভূমিষ্ঠ হইলেও দেহের কোনও কোনও স্থানে এইরূপ কেশ দেখা যায়। গবাদির ও মানবীয় ভ্রূণের অবস্থা একই প্রকার; সর্ব্ব শরীর লোমাবৃত। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মানবের দেহ প্রায় লোমহীন। কদাচিৎ কোনও কোনও ব্যক্তির দেহে সর্ব্বত্রই লোম দেখা যায়।

কেশ, লোম।

Jeftichyeff নামক এক জন রাসিয়ান্ বৈজ্ঞানিক সমাজে কুকুর * নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মুখে কেবল নাসিকার উপরিভাগে ও ওষ্ঠাধরে কেশ ছিল না; তদ্ব্যতীত মুখে ও সর্ব্ব স্থানেই লম্বা লম্বা কেশ ছিল। তাঁহার পুত্রেরও ঐরূপ ছিল। জুলিয়া প্যাষ্ট্রানা নাম্নী যুবতীরও প্রায় ঐরূপ ছিল। ব্রহ্মদেশীয় লোকের দেহে সচরাচর অধিক কেশ দেখা যায় না; তথাপি সই-সায়ং নামক ব্যক্তি ও তাহার পুত্রগণ অত্যন্ত লোমশ ছিল।

গবাদি ইতর প্রাণী বস্ত্র অথবা ছত্র ব্যবহার করে না। তাহাদিগের শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রধান উপায় দেহস্থ কেশ। কিন্তু মানব বস্ত্র ও ছত্র ব্যবহার করে; অগ্নি জ্বালিতে পারে। সুতরাং তাহার ঐ সকল হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত কেশাবৃত থাকা নিষ্প্রয়োজন। তাহার দেহে কেশ নাই-ও। কিন্তু কদাচিৎ কাহারও দেহ অত্যন্ত কেশাবৃত

* Dog-man.

থাকে, এবং ভ্রূণের দেহ সর্ব্বত্রই কেশাচ্ছাদিত। ইহাতে ইহার প্রাণীর অবস্থা স্বতঃই স্মরণ হয়। মানবের দেহে মস্তকের কেশ ব্যতীত অন্য স্থানের কেশ বিশেষ কোনও ক্রিয়া করে না; করিলেও তাহা নিতান্তই অল্প। মস্তকেও কাহারও কাহারও জন্মাবধি কেশ উৎপন্ন হয় না। অনেক পুরুষেরও মুখে কেশ জাত হয় না। আবার কোনও কোনও স্ত্রীলোকেরও মুখে দাড়ি, গোঁফ দেখা যায়। এই সকল অবস্থা দেখিয়া মানব-দেহের কেশকেও জন্মাবশিষ্ট বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি।

৩

২০শে আগষ্ট।—Shell, বারুদের বাক্স, গ্যাসের গোলা ইত্যাদি ক্রমাগত আসিতে লাগিল; এ সব জড় করিতে সারা দিন কাটিল। কি ভাবে কামান ছুড়িলে লক্ষ্য অব্যর্থ হয়, নীচে, মাটীতে, উপরে, আকাশে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং শুনিয়া যেটুকু হয়, সেটুকু সাহায্য লইয়া কিছু কিছু কামান ছুড়িয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহা বেশ খুটিনাটি করিয়া দেখিতে (Regaling করিতে) আরম্ভ করা হইল। ইহা যেমন ঠিক হওয়া, আর শত্রুর খাতের উপর দ্রুত গোলাগুলি-বর্ষণ; তিন ঘণ্টা অন্তর এক ঘণ্টা বন্ধ রাখিয়া সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ আক্রমণ চলিল।

২১শে আগষ্ট।—রাত নাই, দিন নাই—অনবরত যুদ্ধের রসদ আসিতেছে। ভোজনের পর, তখন বেলা ১০টা, বড় বড় ব্যাটারী শত্রুর পরিখার উপর অগ্ন্যুদ্গিরণ আরম্ভ করিল—শেষ গোলা নিঃসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত। রাত থাকিতে থাকিতে পদাতি সৈন্য আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রের কামানগুলি সারা রাত গর্জ্জন করিয়া আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছে। গোলন্দাজ সৈন্যের সামনে থাকায় ঘুমের ব্যাঘাত। আজ রাত ১০টায় সবার পুনরায় আক্রমণ সুরু হইল। ভীষণ বোমা ফাটায় বুঝিতে পারা গেল, Battalion of shock যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছে, পদাতি সৈন্যেরা সাজিয়া গুজিয়া যুদ্ধের জন্য মিনিট গণিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মনের অবস্থা তখন কেমন আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। লক্ষ লক্ষ লোক নিমেষে মথিত

করিয়া ফেলা হইবে—এ মন্থনে কি অমৃত উঠিবে না। এক জন করাসী সহ- যোদ্ধা বলিল, 'জাতির নেতাদের ধিক্, নিজেদের স্বার্থ, খেয়াল ও রাজনীতির নিগূঢ় বাঁধনে পড়ে' জগৎকে অমৃত ভোগ করতে দিচ্ছে না' অমনি আর এক জন বলিল, 'ভবিষ্যতে কড়ায় গণ্ডায় এদের এ সবের প্রতিশোধ পেতে হবে।' C. O. আসিয়া আমাদের সকলের বন্দুক আছে কি না, খোঁজ করিলেন; কারণ, বিশেষ অসুবিধা ঠেকিলে অনেকে বন্দুকটা ফেলিয়া দিয়া, যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বলিয়া থাকে। কিন্তু কোনও যোদ্ধাই এত বোকা নয় যে, আত্মরক্ষার কিছু না লইয়া যুদ্ধে যাইবে। যাহাদের বন্দুক ছিল না, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট অন্ততঃ একটা রিভলবার কিংবা Hand grenade ছিল। আমাদের দেখিয়া শুনিয়া C. O. সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

২২শে অগষ্ট।—সারা রাত ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছে। তিন দিন যুদ্ধ করায় আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে, এ খবর পাইলাম। ছোট ছোট ৭৫ মিঃ মিঃ কামানেই যুদ্ধ চলিয়াছে। এই তিন দিনের যুদ্ধে আমরা কি কি করিয়াছি, তাহা যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখিলাম। ম্যাপে স্থানগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। আত্ম-রক্ষার জন্য তারা যে বেড়া দিয়াছিল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে;—এমন কি, মাটীর উপর উঁচু যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ধূলিসাৎ—কিছুর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই; প্রায় ৫০০ গজ পরিমিত স্থানের এরূপ অবস্থা। এ যুদ্ধে ৪০০০ লোককে বন্দী করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার শেষভাগে আমাদের উপর শত্রুর গোলাগুলি-বর্ষণে সকলের পলা-য়ন—অনেকে দুই দিন পরে ফিরিল। আমরা কামানের প্রহরী নিযুক্ত, কাজেই গোলা-বর্ষণ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু দূরে অবস্থান করিলাম। শত্রু ঠিক আক্রমণ করে নাই—আমাদের সৈন্যদল রাস্তা দিয়া যাহাতে যাইতে না পারে, সে জন্য শত্রুর এমনতর গোলা-বর্ষণ।

২৩শে অগষ্ট।—সেনাপতি আমাদিগকে 'সে দিনের আদেশ' (Order of the day) পাঠাইলেন। তাহাতে আমাদের ব্যাটারীর উল্লেখ আছে, আর আছে আমাদের কার্য্যপটুতার প্রশংসা—কিরূপে অল্প সময়ে বাধা বিঘ্ন পূর্ণরূপে বিদূরিত করা হইয়াছে। পর দিন প্রভাত না হওয়া অবধি জর্ম্মণের পাল্টা আক্রমণ চলিল।

২৬শে অগষ্ট।—ব্যাটারী তুলিয়া ট্রলিতে উঠাইয়া দিলাম। সন্ধ্যা ছয়টার সময় সব ঘোড়ায় জিন পরান হইল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ায় আমরা একেবারে

আর্ ; গাড়ীগুলিতে বড় বেশী জায়গা ছিল না। C. O. এবং উচ্চ সেনানায়করা হাঁটিয়া চলিল—ঘোড়া, গাড়ী ইত্যাদি সৈন্যদের ছাড়িয়া দিল।

২৭শে অগষ্ট।—বড় বৃষ্টি ; আর অগ্রসর হওয়া গেল না। এক গ্রামে আড্ডা পাতিবার জন্য তাঁবু ফেলিলাম—গ্রামটীর নাম (Melin aux Bois) মেলিন য় ব্যয়। ৫ম ব্যাটারী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, খবর পাওয়া গেল—অধিক সৈন্য ও অফিসার আহত হইয়াছে, তাহাও শোনা গেল।

৩০শে অগষ্ট।—আমরা নিজেদের ব্যাটারীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধক্ষেত্রে ছোট ছোট কামান ছিল, সন্ধ্যার সময় শত্রু সেগুলি আক্রমণ করিল ; আমরাও পাল্টা আক্রমণ করিলাম। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে কয়েক মিনিটের জন্য যেন কামানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। সাতটায় নামে যুদ্ধ থামিল ; কারণ, শত্রু রাত্রে আমাদের পুনরায় আক্রমণ করে। Dugout হইতে বাহির হইয়া ব্যাটারীতে পাহারা দিতে গেলাম। যে কামানটী আমার পাহারায় ছিল, সেটী নাই ; তাহার উপরের ছাদ চুরমার হইয়া গিয়াছে ; shell সব ছিন্ন ভিন্ন ; বারুদের বাক্স জ্বলিতেছে ; যুদ্ধের সরঞ্জাম রাখিবার স্থান, রান্নাঘর—সমস্তই ভাঙ্গা চোরা। পর দিন প্রাতে সব স্থানের সংস্কার করা হইল ; কেহ দেখিলে বুঝিতে পারিত না যে, আমরা এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

৩১শে অগষ্ট।—বড় বাতাস। কোন্‌টী হাওয়ার সাঁই-সাঁই শব্দ, কোন্‌টী বা shell আসার শব্দ, তাহা বুঝিবার যো নাই। প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই,—হঠাৎ ছাদের উপর একটা কি ফাটার ভীষণ শব্দ শোনা গেল—শ্বাস বন্ধ হইবার যোগাড়। ত্রস্ত ইন্দুরগুলি কিচ্ কিচ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় শব্দ হইবার পূর্ব্বে সুড়ঙ্গের ভিতর পলায়ন করিলাম। অফিসার ও সৈন্যরা আমাদের আগে সেখানে আশ্রয় লইয়াছে ; এবং বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে গোলা পড়া বন্ধ হইল ; আমরাও পুনরায় কাজে বাহির হইলাম।

৩রা সেপ্টেম্বর।—Light Field Artilleryতে লোকের অভাব ; আমাদের বন্ধুদ্বয় সন্তোষ ও নরেনকে সেখানে যাইতে হইল। আজ আমাদের বিশ্রামের দিন। আমরা Commureyতে যাইবার জন্য আদেশ লইতে গেলাম ; C. O. যাইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, নগর সব ঘন ঘন আক্রান্ত হইতেছে; এরূপ অবস্থায় কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক। মনে মনে একটু হাসিলাম ; কারণ, জানিতাম, সীমানার নগরগুলির অবস্থা শোচনীয়

হইলেও সে স্থান আমাদের যুদ্ধের লাইন অপেক্ষা বেশী বিপদসঙ্কুল নয়। বৃথা তর্কে সময় নষ্ট না করিয়া Boncourtএ যাইতে চাহিলাম—তৎক্ষণাৎ আদেশ পাওয়া গেল। দাড়ি কামাইয়া পরিষ্কার হইয়া, সুন্দর পোষাক পরিয়া, এসেন্স মাখিয়া, অর্থাৎ সৈনিকের জীবনে সম্ভবপর সকল রকম বাবুয়ানি করিয়া বাহির হইলাম। উপত্যকা ভূমির শেষভাগে গিয়া চাহিয়া দেখি, কি ভাবে কামান ছুড়িলে লক্ষ্য অব্যর্থ হয়, তাহা দেখিবার জন্য কামান ছুড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে। শীঘ্র পাল্টা আক্রমণও হইবে বুঝিতে পারিয়া আমরা আগাইয়া চলিলাম।

নগরের একটী মদের দোকানে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িলাম। প্যারিসের কাগজগুলি প্রত্যহ দুইটার সময় পাওয়া যাইত। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার দাম ছিল দুই পয়সা, এখন চারি পয়সা। বিখ্যাত জর্ম্মণ কাগজ-গুলির কথা লেখা রহিয়াছে। জর্ম্মণ কাগজে Wilsonএর সদিচ্ছা ও লোক-হিতৈষণার প্রশংসা আছে; আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি জর্ম্মণীর লোকদের ভাল করিয়া জানেন না। চারিটার সময় ফিরিলাম। দূর হইতে আমা-দের ব্যাটারীর নিকট গোলা ফাটার শব্দ শোনা গেল। একটু আগাইয়া দেখি, ধোঁয়া উঠিতেছে; আরও নিকটে আসিয়া shellএর হিস্ শব্দ, মাটী-পাথর তোলার শব্দ ও splinter ইত্যাদির শব্দ শুনিতে পাইলাম। এগুলি একটার পর আর একটা করিয়া আমরা অনুভব করিলাম।

ফরাসী রণাঙ্গনের কথা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর।—প্রাতরাশের সময়; আলুর খোলা ছাড়াইতেছি, এমন সময় ব্যাটারীর উপর shropnelএর ঝটিকা একটার পর আর একটা আসিল। নিকটে আশ্রয়ের স্থান নাই; এগুলি না ফাটা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। আলুর ঝোড়ার পিছনে Telephoneএর লোকেরা লুকাইল, আর জলের বালতির পিছনে C.Oর আরদালীরা মাথা ঢাকিল। মৃত্যু নিকটে, তবু এ বেচারী-দের এমনতর প্রাণের ভয় দেখিয়া না হাসিয়া থাকা গেল না। ইহারা বড় নিরীহ, কখনও এমন মারামারি, কাটাকাটির সংস্রবে আসে নাই। আশ পাশ দিয়া গোলা গুলি যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বার কামান ছুড়িবার পূর্ব্বে সব চেয়ে নিকটে মাটীর নীচে যে ঘর ছিল তাহাতে আশ্রয় লইলাম। ঘরে ঢুকিবার সময় কেহ সিঁড়ী দিয়া গড়াইয়া পড়িল,—কেহ ধাক্কাধাক্কি করিল—কিন্তু যারা চতুর, গবাক্ষ দিয়া তাহারা ঘরে প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরে

কামান ছোড়া থামিল; বাহির হইয়া দেখি, আলুর যোড়া নাই, তার পরিবর্ত্তে সেখানে হইয়াছে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত;—বোলের হাণ্ডাটা ভরিয়া আছে কাদা-মাখা কয়লার গুঁড়ায়! একটু কষ্ট হইল; কারণ, সেদিনকার আহার ঐ পর্য্যন্ত। জলের বাল্‌তির সামনে বিস্ফোরক গোলার (Rupturing shell) চারি ফিট প্রমাণ উচ্চ এক মাটীর ঢিপি তুলিয়াছে; ইহা দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এমন shell আত্মরক্ষার বেড়া ইত্যাদি ধ্বংস করিতে অব্যর্থ; সময়ে সময়ে ইট, পাথরের ভিতর ২, ৩ ও ৪ গজ অবধি প্রবেশ করিয়া সমস্ত ফাটাইয়া দেয়। ইহার বিচ্ছুরিত টুক্‌রা কখনও অমনই বাহির হয় না,—পরন্তু ঢিপির মত মাটী কাঁপাইয়া তোলে। এই সব গোলা প্রায় নিরেট ও অনমনীয়; Fuse নাই; ভিতরে অল্প কাল বারুদ দেওয়া, কিন্তু ছোড়া হয় খুব জোরে। এরূপ গোলা সবেগে মাটীর ভিতর প্রবেশ করে; গর্ত্ত করিয়া ঢুকিতে যে উত্তাপ উদ্ভূত হয়, তাহাতে ভিতরের কাল বারুদে আগুন ধরিয়া যায়, কাজেই গোলাটাও ফাটে।

একটা ভীষণ আক্রমণে Rupturing shell ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের পর উপত্যকা ভূমিতে সেই প্রথম উঁচু উঁচু ঢিপি দেখিয়া ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের কথা স্মরণ হইল;—ঢিপি উঁচু হইলেও পাহাড়ের সহিত তুলনা করা অবশ্য ভাল দেখায় না। তবে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গমনের ফল; ঢিপিগুলিও ছোট ছট্‌কার ছোট অগ্ন্যুদ্‌গমনের ছোট খাট ফল। Rupturing Shell, মাটীর উপর যারা থাকে, তাদের বড় একটা ক্ষতি করে না,—কিন্তু যারা থাকে সুড়ঙ্গের ভিতর, কিংবা Dugoutএর ভিতর, তাদের পক্ষে ইহা বিষম বিপজ্জনক। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে শেষ আক্রমণ আমরা প্রথমে সুরু করিলে এই সব Shell আমাদের সুড়ঙ্গ ধ্বংস করিয়া দেয়—জীবন্ত মানুষকে মাটী চাপা দিয়া মারে—যারা রক্ষা পায়, তাদের পরে Shropnel দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিতে শত্রু শিকারীর মত খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া সুড়ঙ্গ হইতে বাহির করে। জয় পরাজয়ের প্রবল প্রচেষ্টা চলিয়াছে; তখনকার যুদ্ধে বন্ধু বলাই আহত হয়, ষষ্ঠ রেজিমেণ্টের অর্দ্ধেকের উপর যোদ্ধা সাংঘাতিক আঘাত পায়, এবং অনেকে মরিয়াও যায়। পরিখা শূন্য রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সেই Regiment সরাইয়া লইতে হয়—বিশ্রামে যাহাতে তারা মনে বল পায়।

এমন অব্যর্থ ফলপ্রদ গোলার নাম Rupturing Shell। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে

Bizretএ সমুদ্রকূলে নৌবিভাগে প্রহরীর কাজ করিতাম। তখন বর্ম্মাবৃত সশস্ত্র নৌবাহিনীর উপরই এমন Shell ছুড়িবার আদেশ ছিল।

সন্ধ্যার সময়; আমরা কামান লইয়া পাহারায় নিযুক্ত। একটী স্থানীয় আক্রমণ দমন করিতে বলা হইল। কামানের নিকটে গিয়া দ্বিতীয় কামানে যাইবার আদেশ পাইলাম,—Pointerএর কাজ করিতে হইবে—কোন্ দিকে কামান ছুড়িতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। পরক্ষণে নিজের কামানে ফিরিবার পাণ্টা আদেশ পাইলাম! একটী Detonator লইয়াছি; কামানের ভিতর শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে বারুদ * ভিজিয়া গিয়া কামান ব্যর্থ না হয়। আমার যেমন স্বভাব, আগে কেহ কামানের গর্ত্তটী শুষ্ক করিয়াছে কি না, খোঁজ করিলাম; কারণ, প্রায় দেখা যায়, অমিতব্যয়ী যোদ্ধারা হিসাব না করিয়া সব 'ডিটোনেটার' খরচ করিয়া ফেলে, এবং যুদ্ধের শেষ সময় পড়িয়া থাকে খালি গোলা, আর বারুদ। 'ডিটোনেটারে'র অভাবে কামান ছোড়া

---

* পূর্ব্বে সোরা, গন্ধক ও কয়লার কাল বারুদে কামান ছোড়া হইত। Nitro-glycerine, Picric acid, Gun-cotton প্রভৃতি ভীষণ বিস্ফোরক আবিষ্কারের পর ইউরোপের সুধী সমাজ ভাবিতে লাগিলেন—এগুলিকে কি গোলা আরও অধিক দূরে নিক্ষেপ করার জন্য ব্যবহার করা যায় না? বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ; Gun-cottonকে Mythylated Spirit সহিত মিশাইয়া লেই (paste) করিয়া, ছাঁচে ঢালিয়া, বড় বড় মোচার খোলার মত টুকরা টুকরা করিলে, দশ বারখানি এক সঙ্গে বাঁধিয়া কাল বারুদের বস্তার স্থান অধিকার করান যাইতে পারে। ইহা অনেক রাসায়নিক গবেষণার ফল। Dynamite প্রভৃতি Picric acidএর নানারূপ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বা অস্ত্রাস্ত্র (High explosives) সাংঘাতিক বিস্ফোরক ফাটাইবার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। তাহা সত্ত্বেও বন্দুক বা কামানে ইহা Impulsive force দিবার জন্য ব্যবহার করা যায় না। বন্দুকের টোটায় যে বারুদ আছে, তার অর্দ্ধেক উল্লিখিত অস্ত্র কোনও বারুদ দিয়া ছুড়িলে বন্দুক ফাটিয়া যায়; আর গুলি দুই চার গজের বেশী দূর যায় না। ঐ সকল বিস্ফোরকের ক্ষমতা কাল বারুদের চেয়ে এক শত গুণ বেশী; কিন্তু ওগুলি শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, এবং সব আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে, কাল বারুদ বা Mythylated gun cotton আস্তে আস্তে জ্বলিয়া অনেকক্ষণ গোলা বা গুলির পিছনে কাজ করে। ইহাতে Dynamicsএর সরল নিয়ম অনুসারে গোলা বহু দূর যাইতে পারে, আর আবরণ ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। Mythylated gun cotton স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন—কাল বারুদের ২০ গুণ। ইহাকে Mythylating রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ধীরে ধীরে পুড়িবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাইয়া দেওয়া হয়। ইহা তখন Rupturing বিস্ফোরকের দল ছাড়িয়া Impulsive বিস্ফোরকের দলে আসে, এবং অন্যান্য বিস্ফোরকের চেয়ে বহু দূরে গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে।

যায় না। আমার প্রশ্নের কেহ উত্তর দিল না। এক জন বলিল, দ্বিতীয় বার শুরু করিলে ক্ষতি কি? আমারও তাই মনে হইল; Canal of light ও Detonater দিলাম—এক জন যোদ্ধা চেঁচাইয়া উঠিল, 'কামানটা ভরা।' দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাথায় গুলির ঘা খাইয়া যেমন মাথা ঘুরিয়া পড়ে, ঠিক তেমনতর ভাবে থমকাইয়া পিছাইয়া পড়িলাম। তখনই মনে হইল, Instantaneous Fuse * লাগান চালাই করা D Shell সামনে দুই ফিট দূরে তাগাড়ে লাগিয়া সহস্র টুকরায় কাটিয়া চক্ষুর পলকে আমাদের সকলকে মারিয়া ফেলিত; কারণ, কামানের মুখটা নীচু দিকে করা ছিল;—আমার একটা সাংঘাতিক

* Fuse তিন রকম;—(১) কাল (Retarded fuse) (২) লাল (Instantaneous fuse) (৩) Shropnelএর fuse। প্রথম কাল 'ফিউজ' মাটীতে পড়িয়া গোলা অনেক ভিতরে ঢুকিলে পর ফাটে। লাল 'ফিউজ' মাটীতে ঠেকিবামাত্র ফাটে। Shropnelএর ফিউজ নির্দ্ধারিত করেক সেঃ পরে গোলা শূন্যে ফাটাইয়া দেয়, কাল ফিউজ লম্বা ইস্পাতের গোলার (Elongated Shell) সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যাটারী ভাঙ্গিবার পক্ষে বড় সুবিধাজনক। লাল ফিউজ কিছু কিছু তাগাড় ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে, আর D Shell লাগাইলে মাটীর ঠিক উপরে ফাটে বলিয়া ইহা ভয়ঘাতক। Shropnel শূন্যে ফাটে—অত্যন্ত মারাত্মক; পদাতি সৈন্যের দুঃস্বপ্ন। কাল ও লাল ফিউজের নাম Percussion fuse। একটী নল, তার নীচে কোন picrate ভরা, উপরে একটু Fulminate of mercury, ইহার মধ্যে একটী লোহার হাতুড়ী (hammer) Spring দিয়া উপর হইতে নীচের দিকে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। গোলা মাটিতে ঠেকিলে একটু পরে তার গতি থামিয়া যায়, কিন্তু ভিতরের হাতুড়ীটি তখনও সংস্কারবশে (inertia) সমুখে ছুটিতে থাকে। জোরে স্প্রিং ঠেলিয়া Fulminateএ আঘাত করে। 'ফলমিনেট' বিস্ফারিত হইয়া 'পিক্রেট' আগুন দেয়, ফিউজ ফাটিয়া যায়,—একফালে Shock ও আগুনের সৃষ্টি হয়, ইহাই ভিতরের বারুদ বিস্ফারিত করে। শুধু Shockএ বা শুধু আগুনে গোলার বারুদ Milinite জিনে ঘুঁটের মত কাজ করে। Shropnelএর ফিউজের ভিতর একটী ঘুরান ঘুরান ফাঁপা তার,—বেশ একটু লম্বা; ফাঁপার মধ্যে বারুদ। এরূপ ভাবে কয় সেঃ কত দূর আগুন যায়, তাহার একটী হিসাব আছে। সেই হিসাব মত ফিউজের উপর ঘুরান দাগে সেঃ বা দূরত্ব চিহ্নিত। যত সেকেণ্ড পরে বা যত দূরে গিয়া গোলা ফাটা আবশ্যক, তত সেঃ বা দূরত্বের দাগে কাঁচি বা অন্য কোনও যন্ত্র দিয়া একটী সূক্ষ্ম গর্ত করিয়া দেওয়া হয়। গোলা ছুটিয়া যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে লোকের মাথার প্রায় পনর গজ উপরে ফাটে।

কিন্তু অনেক সময় উপরে না ফাটিয়া গোলা বিচ্ছিন্নভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকে। এই জন্য আজ কাল Shropnel fuseএ percussion fuse ও শেষোক্ত fuse উভয়ই এক সঙ্গে একটী নলের ভিতর ফিট্ করা থাকে। হাওয়াতে না ফাটিলেও অন্ততঃ মাটীর উপর পড়িয়া গোলা কিছু কিছু ক্ষতি করিতে পারে। এরূপ ফিউজকে Double effect fuse বলে।

ভ্রম হইতেছিল ভাবিয়া বড় কষ্ট হইল। সেই দিন হইতে কোনও কিছু করিতে হইলে আগে সতর্ক হইতাম।

সারা রাত ধরিয়া জর্ম্মণ গোলন্দাজ সৈন্তরা সীমান্তরালস্থিত নগর ধ্বংস করিতেছিল। তারা 'প্যারাচুট্' করিয়া সময়ে সময়ে গুপ্তচর নামাইয়া দিত। ব্যাটারীর প্রহরীরা তাড়া করিলে ইহারা আমাদের Dugoutএর ভিতর আশ্রয় লইত। পাছে কোনরূপ গণ্ডগোল হয়, সেই জন্ত ঘরে যারা নিদ্রিত থাকিত, তাদের শিরশ্ছেদ করিয়া আপনাদের কাজ নিরাপদে সাধন করিত। মাটীর নীচে ঘরে থাকিলে আমরা দ্বারে ও গবাক্ষে অর্গল দিয়া বন্দুকটাতে টোটা ভরিয়া মাথার নিকট রাখিয়া তবে নিদ্রা যাইতাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

মাঝারি গোছ্।

১

[কন্যাদায়।]

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ঘোষ, যাঁহার বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর, মস্তকের শীর্ষভাগ যতদূর সম্ভব সমতল, (এবং তাহার মধ্যভাগে বঙ্গ উপসাগরের মানচিত্রের ন্যায় টাকের ক্ষেত্র), যাঁহার স্ত্রীর নাম গিরিবালা, এবং কন্যা নিরুপমা (যে বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছিল), এবং যিনি (অর্থাৎ নীলকণ্ঠ বাবু) নিশ্চিন্তপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, সেই নীলকণ্ঠ বাবু কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া সম্প্রতি ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যতিব্যস্ত। বড় দিনের ছুটী সত্ত্বেও তাঁহার প্রফুল্ল, সুগোল, বিশাল-গোঁফযুক্ত আনন কিঞ্চিৎ বিষন্ন। অদ্য অন্য কোনও কর্ম্ম না থাকায়, কন্যাদায়ের দারুণ বিভীষিকাবর্গ তাঁহার কল্পনাক্ষেত্রে একে একে জাগিতেছিল। বেলা দশটার সময় ভাবী বিপদের আশঙ্কায় নীলকণ্ঠবাবু শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিয়া বাটীর মধ্যে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ—বেলা দশটার সময় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে অভ্যাসবিরুদ্ধ বোধ হওয়াতে নীলকণ্ঠবাবু বাহির হইতেই ডাকিলেন, 'গিরি!—ই!'

নীলকণ্ঠবাবু স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিতেন না। মনোদৌর্ব্বল্যই এই অভূতপূর্ব্ব ভ্রমের মুখ্য কারণ। দুর্ভাবনায় তাঁহার অনেকটা স্বরভঙ্গও হইয়াছিল।

রন্ধনশালায় বসিয়া গিরিবালা সেই বিকৃত স্বর ও নাম সম্বোধন শুনিয়া স্থির করিলেন যে, পাড়ার 'মাসী' বিমলা উপস্থিত। সুতরাং তিনি বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই বলিলেন, 'মাসী অন্দরে যে?—' নীলকণ্ঠবাবু যথাসাধ্য কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি নীলকণ্ঠ, 'মাসী' নহেন।

স্বামীর এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া গিরিবালা ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।

'ব্যাপার কি?'

নীলকণ্ঠ। ভেবে ভেবে স্বরভঙ্গ হয়েছে।

গিরিবালা। তোমার কোনও ভাবনা নেই; আমি মামাকে একখানা চিঠি লিখেছি, শীঘ্রই এর একটা উপায় হবে এখন। ছি! এত কাতর হয়ে পড়লে কেন?

নীলকণ্ঠ (ক্ষীণস্বরে) উপায়ের একটা আভাস আমাকে দাও। মনটা আপাততঃ স্থির হ'লেও যে বাঁচি।

গিরিবালার সম্পর্কে এক জন মাতুল কাউন্সিলের মেম্বর। তিনি মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব প্রশ্নাবলী রচনা করিয়া গবরমেণ্টকে চমৎকৃত করিতেন। তাঁহার যশ দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়াতে গিরিবালার মনে বিলক্ষণ সাহস ছিল যে, কন্যাদায় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন রচনা করিয়া তিনি নিরুপমার বিবাহের উপায় করিয়া দিবেন।—

'গবরমেণ্ট অবগত আছেন কি যে, নিশ্চিন্তপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক— সমাজের দৌরাত্ম্যে কন্যাদায়গ্রস্ত? ইহার প্রতিবিধানের কি উপায় হইতেছে?'

গিরি। এই প্রশ্ন বোধ হয় কৌন্সিলিতে এত দিনে তোলা হয়েছে।

নীলকণ্ঠবাবু ত্রস্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, এবং যত দূর সাধ্য নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তোলা হয়ে গিয়েছে?'

গিরি। এমন কি, তার জবাব পর্য্যন্ত আমি পেয়েছি।

নীলকণ্ঠ। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক! তুমি এ সব কথা লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?

গিরি। এই সকাল বেলায় ডাকে চিঠি পেয়েছি। গোটাকতক পিঠেপুলি রাঁধছিলুম, পুড়ে যাবার ভয়ে আসতে পারি নি—এই দোষ।

নীলকণ্ঠ বাবু তাঁহার মাননীয় দাদাশ্বশুরের পত্র পাঠ করিলেন,—'মা

গিরিবালা! এ রকম প্রশ্ন কৌন্সিলিতে হটাৎ 'এলাউ' করে না, তবে আমি করিয়ে নেব। আপাততঃ আমার বন্ধুগণের পরামর্শে একটি লোককে পাঠাচ্ছি, সে সদুপায় বলে দেবে' এখন।'

পত্রখানি পাঠ করিয়া নীলকণ্ঠবাবু ভীতিপূর্ণ বিবর্ণ মুখ পরিষ্কৃত হইয়া জীবন্ত মানুষের মুখের মত হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'আর একটু হলেই জাত মান ভেসে গিয়েছিল।'

গিরিবালা। কেন বল ত?

নীলকণ্ঠ। এমন কাজে আর ভবিষ্যতে হাত দিও না। কৌন্সি-লিতে এ কথা এখনও উঠে নাই, তাই রক্ষা! ভেবে দেখ, কি লজ্জার কথা!

গিরিবালার মুখ মলিন দেখিয়া যোবজা মহাশয় বলিলেন, 'তুমি মনে দুঃখ করিও না, যখন দাদাবাবু একটা লোক পাঠাচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই উপায় হবে।'

ইহা বলিয়া নীলকণ্ঠবাবু করুণাপরবশ হইয়া সহধর্ম্মিণীর হস্ত ধরিলেন, এবং পুলি ছানিয়া করতল মলিন হইয়া গিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নাসিকার ও ওষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থলে লইয়া আসিয়া প্রেমময় দৃষ্টি দ্বারা তাহা অভিষিক্ত করিলেন, এবং সেই কোমল করতল চুম্বন করিবেন, কিংবা তাহার সৌরভ গ্রহণ করিবেন, তাহার সদ্বিচার করিতে অক্ষম হইয়া, একটি অঙ্গুলি ঈষৎ টিপিয়া দিলেন।

গিরিবালা পূর্ব্বেই পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া স্বামীর নিকট অপমানিত হইয়াছিলেন; অধুনা অঙ্গুলির উপর এই অযথা উৎপীড়নে চটিয়া গিয়া বলিলেন, 'যাও! আর রসিকতা করতে হবে না', এবং দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন, 'নীরু!—'

বালিকা নিরুপমা পার্শ্বের গৃহে কাঁথা শেলাই করিতেছিল। সে মাতৃবাণীর সাড়া পাইয়া রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল যে, মাতার নয়নে অশ্রুধারার সীমা নাই।

'কেন মা? কি হয়েছে?'

জননী কাঁদিয়া বলিলেন, 'মেয়ে হওয়া কি পাপ! উনি যে উনি, তিনিও আজ আমার অপমান করেছেন।'

নিরুপমা জানিত যে, সে কথার আর উত্তর নাই।

২

[আগন্তুক]

সেই দিন সন্ধ্যার সময় হ্যাটকোট-পরিধৃত, সাহেবের মত এক জন কৃষ্ণবর্ণ, জলন্ত-চক্ষুমান লোক, ট্রেণ হইতে অবরোহণ করিয়া ঘোষজা মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত।

'এই কি নীলু মাষ্টারের বাসা ?'

কি তীক্ষ্ণ গলা! কি গর্ব্বিত প্রশ্ন! ঘোষজা মহাশয় শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নাম ? আপনিই কি কলিকাতা থেকে—?'

'হাঁ, হাঁ !—আপনি আমাকে চিন্‌তে পারবেন না, দিদি চিন্‌তে পারবে।'

অন্তরাল হইতে গিরিবালা বাহির হইয়া সস্মিত ও প্রফুল্ল মুখে—'ওমা! কি আহ্লাদের কথা! এ যে আমাদের বীরু।'

আগন্তুক (ঘোষজা মহাশয়ের প্রতি)। 'আমি Explain করে দিই—পরিচয়—আমি বীরেন্দ্র বোস—সরকার সম্প্রতি আমাকে Title দিয়েছেন—সেটা এখন আমি প্রকাশ করব না—তবে কি রকম, তা পরে বুঝিয়ে দেব। আপাততঃ এই সাব্যস্ত হ'ল যে, আপনি আমার ভগিনীপতি, এবং সেই সম্পর্কে আমি 'শালাবাবু'—briefly, আমি আপনার স্ত্রীর খুড়্‌তুত ভাই—ব্যবসা ডেপুটী—বড় দিনের ছুটী—মামা বল্লেন যে, আপনি নিরুপমাকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন—তাই আগমন—সিগারেট্ আছে ?'

নীলকণ্ঠ। তামাক আছে।

বীরেন্দ্র। অভ্যাস নেই—হুঁকোর জল চট্ করে মুখে উঠে পড়ে—গিলে ফেল্লে' গা বমি করে, বাহিরে ফেলা out of etiquette—Never mind দিদি! এক পেয়ালা চা' করগে—বড় Tired—O dear!

ইহা বলিয়া বীরেন্দ্র বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চা আসিলে বীরেন্দ্র বাবু তাহা পান করিয়া বলিলেন, 'এখন Facts of the case আলোচনা করা যাক্। আমাদের নিরুপমা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুন্দরী, আমি গেল' পূজোর সময় তাকে দেখেছি—কিন্তু বাঙ্গালীর কাপড় চোপড়ে তাকে মানায় না। পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্রমে চওড়া হ'চ্ছে। জুতো পায় না দিলে তলা ফেটে চৌচির হয়ে সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের মত দাঁড়াবে। চুল এত লম্বা হয়ে পড়েছে যে, ক্রমে ধরাতল স্পর্শ ক'রবে—বর্ষাকালে কেঁচো ও ব্যাং চুল ধ'রে মাথার উপর উঠ্‌বে। গলার স্বর খুব নম্র ও মিষ্টি, কিন্তু ছুটো একটা চোখা

ইংরেজী কথা তার মধ্যে না বেরুলে স্বামী পুছ্‌বে না—শকুন্তলার মত দুর্দ্দশা হবে। বড় ঘরে বিয়ে দিতে গেলে আজ কাল্ যে সব qualifications দরকারী, তার একটাও নাই।

নীলকণ্ঠ। আমার বড় ঘরে বিয়ে দেবার ইচ্ছা নাই। মাঝারি রকম গেরস্তর ঘরে ভাল পাত্রের হাতে পড়লেই যথেষ্ট।

বীরেন্দ্র। ওটা মস্ত ভুল। তাদের হাঁক খুব বড়, অথচ কাজে কিছু নয়। বিয়ে ক'রে দু' পয়সা যা পায়, তা উড়িয়ে দিয়ে চাকরীর জন্ত ঘুরে বেড়ায়। বড়ঘরের মধ্যেও মাঝারি ঘর আছে, তারা কলিকাতায় বাস করে—কলিকাতার মত সহর ভূভারতে নাই—মামার ইচ্ছা যে, সেই রকম ঘরে বিয়ে হয়।

নীলকণ্ঠ। সেখানে গিয়েও ত গৃহকর্ম্ম করতে হবে, গাউন প'রে ঘরে ব'সে থাকলে চলবে কি?

বীরেন্দ্র (হাসিয়া)। আপনি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ—উভয় সম্বন্ধেই অন্ধ। জল কলে আসে, আলো গ্যাস থেকে বেরোয়, ময়লা ড্রেন দিয়ে চলে যায়, ফ্যান্ খুলে দিলেই হাওয়া, খাওয়া দাওয়া হোটেলেই চলে, খোকা খুকী চীৎকার করলে ছুটো চড় চাপড়ের ওয়াস্তা, তাদের লেখাপড়া মাষ্টারের হাতে, বাজারের জিনিস সবই ফাঁকি, দরদস্তর বৃথা, কেবল একটা জিনিসের অভাব, স্বামীর অভিভাবক কেউ নাই, স্ত্রীই সেই অভিভাবক—ইংরাজি না শিখ্‌লে, বিবিয়ানি না করলে কিছুতেই শাসন হবে না। স্ত্রী স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেল্‌বে—অবাক্ করে দেবে, পৃথিবীর নূতন নূতন সমস্যা রোজ সম্মুখে এনে দেবে, জটলা পাকিয়ে পাঁচ জনকে জড়াবে—স্বামীকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করাবে—তাকেই বলা যায় democratic স্ত্রী। এখন সকলেই তাই চায়। আমি aristocratic স্ত্রীর কথা বল্‌ছি না। Democratic স্ত্রীরই দর বেশী।

নীলকণ্ঠ। এখন কর্‌তে হবে কি?

বীরেন্দ্র। একটা সন্ধান পাওয়া গেছে। এই নিশ্চিন্তপুরের নিকটেই এক জন জমীদার আছে। কয়লার খনির কাজে তার অগাধ টাকা হয়েছে। বয়স মোটে ত্রিশ। দেখ্‌তে সুশ্রী। নাম বিনোদলাল মিত্তির। মাঝারি গোছ মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ পর্য্যন্ত কাকেও পছন্দ হয় নাই। সে বলে, 'কাহারও dash নাই, poise নাই।' স্ত্রীলোকের রূপের সঙ্গে সাহস ও গাম্ভীর্য্য না

থাকলে স্বামীকে চালাতে পারে না। তার হাতে একবিংশতি শতাব্দীর সংসার নির্ভয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেও একটু Reform scheme চাই।

নীলকণ্ঠ। তবে ভায়া, চেষ্টা ক'রে দেখ।

বীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া নীলকণ্ঠবাবুর মনে অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইল। বীরেন্দ্রবাবু সেই ভাব অবলোকন পূর্ব্বক পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহার পোর্টম্যাণ্টো হইতে কতকগুলি নানা বর্ণের পোষাক বাহির করিয়া বলিলেন, 'এগুলি নিরুপমার জন্য এনেছি। এগুলো কি ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তা দিদি অনেকটা গত পূজোর সময় শিখেছিলেন। নিমু খানসামার গলির একটা ফিরিঙ্গী মেম আমাদের বাড়ীতে প্রায় আসত। সে নিরুপমাকে বড় ভালবাসে—তার জন্য দুঃখ করে' বলে, 'আহা! এমন পরীর মত মেয়ে—কোন্ দিন মাছ কুটতে গিয়ে বঁটীতে আঙুল কেটে ফেলবে।—'

৩

[রিহার্স্যাল]

নিরুপমা প্রথমতঃ বুট জুতা, গাউন ও বনেট পরিধান করিতে কান্নাকাটি করিয়াছিল, কিন্তু জননী ও মাতুল বীরেন্দ্রবাবুর যুক্ত অধ্যবসায়ের গুণে সে অচিরাৎ পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

গিরিবালা। দিন কতক দেখ্, যদি নিতান্ত সহ্য না হয়, ছেড়ে দিবি। বিয়ে হ'লে সব সয়ে' যায়।

এ কথা যে খুব সত্য, তাহা বীরেন্দ্রবাবু বুঝাইয়া দিলেন।

'মা, কোনও বিষয়ে Obstinacy ভাল নয়। গুরুজন যা বলেন, তা মঙ্গলের জন্য, এবং ভগবান গুরুজনের স্কন্ধে সদাসর্ব্বদা আরোহণ করে' থাকেন।'

এক সপ্তাহের মধ্যেই বীরেন্দ্রবাবু অবিশ্রান্ত 'রিহার্স্যাল' দিয়া নিরুপমাকে 'চলনসই' রকম তৈয়ারী করিয়া তুলিলেন।

প্রথমে পাড়ার 'বিমলা মাসী'—'ও মা এ কি দশা? নিরুপমাকে মেম সাজিয়ে এ কি কেলেঙ্কারি!'—ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিত, কিন্তু এক দিন বীরেন্দ্রবাবু চীৎকারপূর্ব্বক 'চোপ রাও সুয়ারকা বাচ্চা' বলাতে সে ভয় পাইয়া আর সম্মুখে আসিত না।

বীরেন্দ্রবাবু শিখাইয়া দিয়াছিলেন, 'মা! নূতন কিছু দেখ্লে, জানওয়ার ও

মানুষ উভয়েই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ক্যাল-ক্যাল ক'রে চেয়ে থাকে, তখন করুণাপরবশ হয়ে অতি মৃদুভাবে হাসবে, তা হ'লে তারা খুসী হবে। চা'র সঙ্গে যেমন দুধ আর চিনি, তোমাদের মুখে তেমনি মিষ্ট হাসি। তবে অনেক সময় পুরুষগুলো insulting ভাবে stare করে। তখন কি ক'রবে বল ত ?'

নিরুপমা। একটু Frown ক'রব।

বীরেন্দ্র। ঠিক তা নয়। একটু অবজ্ঞাসূচক ভাব দেখিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রবে। তাদের দিকে চেয়ে দেখবে না। চেয়ে দেখলেই তারা মনে ক'রবে —'এটা ছোট ঘরের মেয়ে।'—এ রকম অল্পবয়স্ক পুরুষ আর পশুর মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। আর এক রকম লোক আছে, তারা সাহেবানি কিংবা বিবিয়ানি দেখলে হাসে—পরস্পর গা টেপাটেপি করে। তাদের বেলা কি ক'রবে ?

নিরুপমা। দুঃখিত ভাব দেখিয়ে গম্ভীরভাবে চলে যাব!

বীরেন্দ্র। ঠিক! কিন্তু সাবধান! সেই সময় অন্যমনস্ক হ'লে বুট জুতো ত্যাড়া হয়ে পা ম'চ্‌কে যাবে।

নিরুপমা (খুব হাসিয়া)। না, তা হবে না। আমি সে বিষয়ে খুব সাবধান।

সে দিন উভয়ে স্কুলের মাঠ পার হইয়া Play-groundএর দিকে বেড়াইতে গিয়াছিল। ছোট ছোট মেয়েরা নিরুপমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, 'মেম সাহেব, সেলাম্।'

নিরুপমা খুব হাসিয়া বলিল, 'Hullo! how do ?' একটী কচি মেয়েকে কোলে তুলিয়া রুমাল দিয়া তার মুখ মুছাইয়া দিল, এবং পকেট হইতে একটী সিকি বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলিল, 'তোর মাকে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিস্।'

বীরেন্দ্রবাবু সেই রিহার্স্যালে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, 'মা, তোমার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। যারা বিবিয়ানি করে, তারা সচরাচর High circleএ ঘুরে বেড়ায়, এবং শেষে আয়েষী হ'লে তাঁদের বাতে ধরে। তারা নিজের সুখটুকুই বুঝে। কিন্তু বেশী দিন এ রকম থাক্‌বে না। সংসার ডোববার উপক্রম হয়েছে—সকলে সকলকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরছে।

ক্রমে নিরুপমার সাহস বাড়িয়া গেল। আর এক দিন বীরেন্দ্রবাবু তাহাকে

Homes of the poor দেখাইতে লইয়া গেলেন। নিশ্চিন্তপুরের অনতিদূরে বহুসংখ্যক চাষার বাস। তাহাদের রমণীবর্গ অপরূপ একটী বালিকা মেম্ সাহেব দেখিয়া পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে গ্রামের প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষতলে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন্দ্র। এরা সকলে খনিজ পদার্থ, ঘষে' মেজে' নিলে কালক্রমে চাঁদা হ'য়ে দাঁড়াবে। এদের হস্তগত করবার জন্য বিলাতের অনেক লর্ডের স্ত্রী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।

নিরুপমা তাহাদিগের নিতান্ত রুগ্ন, শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা খেতে পাও না?'

এক জন বালক। এ দেখ্‌ছি বাঙ্গালী মেম্।

এক জন স্ত্রীলোক। কে খেতে দেবে না?

বীরেন্দ্র। কেন? তোমাদের জমীদার।

বালক। জমীদার কে?

এক জন বয়স্ক চাষা। আমাদের জমীদার মিত্তির সাহেব। তিনি কল্‌কেতায় থাকেন।

নিরুপমা। লোক্‌টা বড় হতভাগা বোধ হয়। এদের খেতে দেয় না?

বীরেন্দ্র। এরা খাজনা দেয়। তিনি এদের খেতে দিতে বাধ্য নন।

নিরুপমা। অন্ততঃ উপায় করিয়া দিতে পারে না কি?

ইহা বলিয়া নিরুপমা অনেকগুলি কৃষক-বধূর সঙ্গে তাহাদের কুটীরে গেল; অনেক সুখ দুঃখের কথা কহিল। কার স্বামী কবে বিদেশে গিয়ে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, কার ছেলে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, কার কন্যা এখনও অবিবাহিতা, কোথা হইতে চাউল কিনিয়া আনে, কার ঘরে এক পয়সাও নাই, এই প্রকার তন্ন তন্ন করিয়া তদন্তপূর্ব্বক তাহাদের সমষ্টি-জীবনের চিত্র মানসপটে আঁকিল।

নবীনা মেম সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিল। পথে এক জন বৈরাগী খঞ্জনীবাদনপূর্ব্বক ভিক্ষা করিতেছিল।

নিরুপমা। মামাবাবু! আমাদের দেশের নিয়তিই এই। বোধ হয়, অন্য কোনও উপায় নেই। এ ছাই গাউন প'রে বিড়ম্বনা কেন?

বীরেন্দ্র (হাসিয়া)। খঞ্জনীর দলে মিশে গেলে কেউ নেতা বলে মান্‌বে না।

৪

[প্রতিদ্বন্দ্বী]

মিষ্টার মিত্তির একটা 'সন্‌বীম্‌' মোটরকারে আরোহণ করিয়া জমীদারী দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তহশীলদারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে নিবেদন করিল, 'সাহেব! প্রজারা খাজনা দিতে চাহে না।'

মিত্তির। কেন? What's the matter?

তহশীলদার। প্রজারা বলে, আমরা খেতে পাচ্ছি না। জমীদার অসময়ে সাহায্য না করলে সে জমীদার অনুপযুক্ত—ও—

মিত্তির। কি?

তহশীলদার। সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে। এক জন সাহেব ও মেম সম্প্রতি এসেছিলেন—সেই মেম সাহেব প্রজাদের বলেছেন, তোমাদের জমীদার 'হতভাগা'।

মিষ্টার মিত্তির তাঁহার অগ্রজা বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নির্ম্মলার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এর অর্থ কি?'

নির্ম্মলা (তহশীলদারের প্রতি)। 'আচ্ছা, তুমি যাও'—তৎপরে (ভ্রাতার প্রতি)। 'এই জমীদারীর মধ্যে শত্রু ঢুকেছে। বোধ হয়, কোনও Anarchist.'

মিষ্টার মিত্তিরের সুশ্রী মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অবিলম্বে মোটর হাঁকাইয়া তদন্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক একটি বকুল-বৃক্ষ-তলে বসিয়া এক-মনে সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

পৌষ মাসের দারুণ শীত। বহুদূরস্থিত একটি মন্দিরের ভগ্ন চূড়ার আড়াল দিয়া চন্দ্র উঠিতেছিল। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। কেবল বনিয়াদী পেচক-বংশের কোনও দীর্ঘায়ু উত্তরাধিকারী পার্শ্বস্থ বৃক্ষে তাহার অনাবশ্যক অস্তিত্ব পক্ষপুট-বিস্তারপূর্ব্বক প্রচার করিতেছিল।

মিষ্টার মিত্তির সেই নীরব উদ্যানে এই ভঙ্গুর সংসারের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে কোনও কূল-কিনারা দেখিতে পাইলেন না।

বেয়ারা চা লইয়া ফিরিয়া গেল। পুনর্ব্বার এক ঘণ্টা পরে আসিয়া বলিল, 'ডিনার্‌ তৈয়ারি।'

মিষ্টার মিত্তির কেবল বলিলেন, 'Of course.'

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমতী নির্ম্মলা আসিয়া বলিলেন, 'বিনোদ, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

মিত্তির। মোটেই না।

নির্ম্মলা। তাদের কোনও খবর পেলে?

মিত্তির। কাদের?

নির্ম্মলা। সেই Anarchistদের।

মিত্তির। ঠিক Anarchist নয়। তারা সাহেব মেমও নয়। সেই নবীনা মেম সাহেবটি 'Hon'ble —র নাত্নী, আর সেই সাহেবটি তার মামা।'

নির্ম্মলা। তারা বোধ হয় ছুটি upstart বেহায়া। তাদের দেখেছ?

মিত্তির। না। তবে এইটুকু বুঝতে পাচ্ছি যে, আস্ছে Electionএ ভোট নিয়ে গোলমাল হবে।

নির্ম্মলা। এ কি নীলু মাষ্টারের মেয়ে?

মিত্তির। হুঁ। তুমি জান না কি?

নির্ম্মলা। আগে কবার দেখেছি। মেয়েটা ডাগর, অতিশয় সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, ও যদি মেম্ সেজে প্রজাদের বিগ্ড়ে দেয়, তবে নিশ্চিন্তপুরের জমীদারীতে ইস্তফা দিতে হবে, 'ভোটে'র কথা ত দূরে থাকুক!

মিত্তির। তাই ত! আচ্ছা দেখা যাক্, কাল্কেই আমি জমীদারীতে অন্ন-সত্র খুলে দিচ্ছি, দেখি, কে কাকে বেগড়ায়!

এই কঠিন প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়া মিষ্টার বিনোদলাল মিত্র (মহাশয়) বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন; ড্রয়ার হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কত কি লিখিলেন, এবং প্রায় শেষরাত্রির প্রারম্ভে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষে সকলে জানিতে পারিল যে, নিশ্চিন্তপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরেই অন্নসত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং কৃষকদিগের পাঁচখানি গ্রামের মধ্যে সস্তা দরে চাউল বিক্রয় ও বস্ত্র বিতরণ হইতেছে।

আরও সংবাদ যে, বড়দিনে একটা 'মাঝারি গোছের' উৎসব হইবে, এবং সেই উৎসবে, ভবিষ্যতে জমীদার ও প্রজায় মিশিয়া কি করিয়া কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তাহার আলোচনা হইবে। এই উৎসবে প্রায় বিশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। তাহার ভার জমীদার বহন করিবেন।

শ্রীমতী নির্ম্মলা ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি কতকগুলি টাকার অযথা শ্রাদ্ধ ক'চ্ছ। এর চেয়ে আর একটা সোজা উপায় ছিল।'

সে উপায়টা কি, তাহা নির্ম্মলা বলিলেন না, এবং মিষ্টার মিত্তিরও জিজ্ঞাসা

করিলেন না। বরঞ্চ, তিনি ভগ্নীকে বলিলেন, 'হাবুকে লেখ—এই বেলা কলিকাতায় কার্ড ছাপাতে দিক্—Invitation card—বুঝলে ত?'

অগ্রজার প্রতি এই অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া মিঃ মিত্তির মোটরকারে আরোহণ করিয়া বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইলেন—একবার ষ্টেশনের দিকে—তৎপর গ্রামের শেষ প্রান্তে—পুনর্ব্বার স্কুলের পথে—

বোধ হইল যে, বহু দূরে একটি ক্ষুদ্রকায়া মেম্ কতকগুলি বালিকার সহিত মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, এবং পথিপার্শ্বে একটা সাহেব বৃক্ষডালে বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছেন।

মিঃ মিত্তির হঠাৎ কার থামাইয়া শাখাধিরূঢ় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি নিশ্চিন্তপুর স্কুল?'

বীরেন্দ্র। Yes—বোধ হয়—

মিত্তির। আপনিই Head Master?

বীরেন্দ্র। No—want a cigar?

মিত্তির। Thanks, No—

কার চলিয়া গেল—হেলিয়া খানিকটা পথভ্রষ্ট হইয়া গেল—মিঃ মিত্তিরের দৃষ্টি অন্য দিকে ছিল—কিন্তু বালিকা মেম্ একবারও দৃষ্টিপাত করিল না।

বীরেন্দ্রবাবু মনে মনে ভাবিলেন, 'আমাদের নীরু একটা Consummate actress। বেঁচে থাকলে হয়।'

[উৎসবের দিন]

উৎসবের দিন প্রাতঃকালে নীলকণ্ঠ মাষ্টার বহির্দ্বারে বসিয়া, প্রকাণ্ড আলবোলায় তামাকু পান করিতেছিলেন, এমন সময় একখানি পাল্কী গাড়ী হইতে এক জন অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী গৌরবর্ণা রমণী দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বাড়ী হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের?'

বিমলা মাসী শ্রীমতী গিরিবালার সহিত বাহিরে আসিয়া সেই স্ত্রীলোককে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি বলিলেন, 'আমি এই নিশ্চিন্তপুর জমীদারদের মেয়ে—কলিকাতায় থাকি—হঠাৎ আপনাদের দেশে এসে পড়েছি—একটা অনুরোধ আছে।'

গিরিবালা। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি চিরস্মরণীয় বৈকুণ্ঠ মিত্রের কন্যা। এই গরীবের কুটীরে পদার্পণ করেছেন—পরম সৌভাগ্য।

আগন্তুক নির্ম্মলা লজ্জাসহকারে বলিলেন, 'ছি! ও কথা বলিতে নাই। আপনি আমার মার সমান। আমাদের জমীদারীতে একটা উৎসব হবে, যদি অনুগ্রহ করে' পায়ের ধূলো দেন, তবে কৃতার্থ হব। হেড্‌মাষ্টার বাবুকে নিয়ে যাবেন—আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব।'

গিরিবালা। উনি বাতে শয্যাগত।

বিমলা মাসী এই কথায় সমর্থন করিয়া কহিল, 'ভয়ানক রকম মা, ভয়ানক রকম। একে এই দুর্দ্দিন, তাতে রোগ। স্কুলের চাঁদাও কেউ দেয় না। তার উপর কন্যাদায়।'

নির্ম্মলা। বোধ হয় শুনে থাকবেন, আমার ভাই বিনোদলাল তাঁর চাঁদা পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসে একশ' টাকা করে দিয়েছেন?

গিরিবালা। আহা বেঁচে থাকুন—তিনি দীর্ঘজীবী হো'ন। এই ত বড়লোকের কাজ। আপনি একটু জল খান—ওলো নিরুপমা—তুই কচ্ছিস কি?

নিরুপমা (অন্য গৃহ হইতে)। আমি কাঁথা শেলাই কচ্ছি। ব্যাপারটা কি?

নির্ম্মলা। আপনার কন্যা বুঝি এইখানে? তাকে একবার বেথুন স্কুলে দেখেছিলুম। সে এখন করে কি?

গিরিবালা। তার মামা এসে তাকে খানিকটা করে' ইংরাজি পড়াচ্ছে। এইমাত্র তারা মাঠ বেড়িয়ে আস্‌ছে। ওলো নিরু! তোর কি আক্কেল নেই?

নিরুপমা (দূর হইতে)। আমি এখন যেতে পারব না।

গিরিবালা। বড় একগুঁয়ে মেয়ে। কিছুতে কথা শোনে না।

শ্রীমতী নির্ম্মলা হাসিয়া বলিলেন, 'আমিই তাকে দেখে আসি, চলুন।' ইহা বলিয়া তিনি শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিরুপমা কাঁথা রাখিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা। ভাই ত। আমাদের নিরুপমা আর সে নিরুপমা নাই। কি রূপ! কি গঠন!

নিরুপমা খুব গম্ভীরভাবে তাহার অঞ্চলের শেষভাগ লইয়া যত্নপূর্ব্বক মস্তকের কেশগুচ্ছের এক অংশ আবৃত করিল।

নির্ম্মলা। দেখ, আজ থেকে তুমি আমার ছোট ভগ্নীর মত। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি এত দিন ভুলেছিলুম। আমি দুবার নিশ্চিন্তপুরে এসেছি, কিন্তু দেখা করতে পারি নাই। তিন বারের বার অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে এসেছি।

আমার সংসারে কেউ নাই, তা জান? সেই জন্য ক্ষমা করিও। আজ উৎসবের দিন, বোধ হয় শুনে থাক্‌বে। কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। একবার যেতে হবে।

নিরুপমা এতক্ষণ পরে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল। 'কোথায় যেতে হবে?'

নির্ম্মলা। আমাদের বাড়ী।

নিরুপমা। সেইখানেই উৎসব?

নির্ম্মলা। না—নূতন গাঁয়ে—সেখান থেকে এক ক্রোশ।

নিরুপমা। আচ্ছা, সেখানে যাব।

নির্ম্মলা। আমাদের বাড়ী হয়ে যেতে হবে।

নিরুপমা। না।

শ্রীমতী নির্ম্মলা বুঝিতে পারিলেন, এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বেশ, তবে উৎসবের জায়গাতেই নিয়ে যাব।'

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। ঘোর কলরবের মধ্যে কে কোথায় তাহার স্থিরতা ছিল না। তবে আজ প্রজাদিগের মুখ হাস্যময়, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। কত কথা, কত ভবিষ্যতের আলোচনা হইয়া গেল, তাহার সীমা নাই। বীরেন্দ্রবাবু ও বিনোদলাল একত্র তাহার সূচনা করিলেন।

আর নিরুপমা? সে জীর্ণবাসে কোনও কৃষক-গৃহের ভগ্ন বাতায়ন দিয়া তাহা দেখিতেছিল। প্রথমে তাহার নিরুপম সুন্দর মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিল—পরে চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। নিরুপমা ভাবিল, আমাদের জীবনের এক অংশ কি ইহাদের নয়?

নির্ম্মলা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, 'নীরো! এখন আমাদের বাড়ী একবার চল!'

নিরুপমা বলিল, 'না—না, আমি বড় দরিদ্র—আমরা—ইহারা—সব এক পথের পথিক—দিদি! তোমাদের বাড়ীতে যাবার অধিকার আমাদের নাই—

হঠাৎ সেই সময় দুই জন লোক গৃহে প্রবেশ করিল।

বীরেন্দ্রবাবু। বিনোদ, তোমাকে নিরুপমার সঙ্গে introduce করে দিই—নীরু, ইনি আমাদের জমীদার বিনোদলাল মিত্র—

নির্ম্মলা। আমার ছোট ভাই এই দেশের 'হতভাগা' জমীদার—

বিনোদলাল করপ্রসারণ করিয়া নিরুপমার করতল স্পর্শ করিলেন। বোধ

হইল, নিরুপমা তাঁর অনেক দিনের জানা-শুনা;—চিরশত্রু নয়—প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়—যেন জীবন-পথের পৌনঃপুনিক সঙ্গিনী, এবং—

নিরুপমারও বোধ হইল, যেন তাহার সাধ পূর্ণ করিবার লোক জগতে সেই এক জন—অন্য কেহ নাই—

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল। কৃষকের পুরাতন জীর্ণ কুটীর পবিত্র হইয়া গেল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মক্কা-ভ্রমণ। *

১

১লা শওয়াল (২২শে কার্ত্তিক, ১৩১৪) রাত্রি প্রায় আটটার সময়, আমি কলিকাতার (২০ নং কিথার ষ্ট্রীটস্থিত) বাসা ত্যাগ করিয়া, প্রায় নয়টার সময়, হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট কেনা হইল। স্নেহভাজন গোলাম হোসেন কাসেম আরেফ সাহেব, পূর্ব্বাহ্ণেই আমার জন্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে একখানি বেঞ্চ (Reserved) ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্লাটফরমে প্রবেশ করিয়া, গাড়ীর গায়ে নাম লেখা টিকিট দেখিয়া, সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। যথাসময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

এই ট্রেণে আরও অনেক মক্কা-যাত্রী ছিলেন। আমি যে কামরায় স্থান পাইয়াছিলাম, সেই কামরায় আরও চারি জন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন হিন্দু এবং দুই জন মুসলমান। হিন্দুভ্রাতৃদ্বয় বাঙ্গালী এবং মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে, এক জন বাঙ্গালী ও এক জন হিন্দুস্থানী। রাত্রি প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত নানাপ্রকার গল্প-গুজব চলিল। দুইটার পর সকলেই শয়ন করিলাম। এই স্থানে একটু বিস্তারিতভাবে বলা আবশ্যক যে, আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান বন্ধুটি, সকলেরই অপরিচিত। জিজ্ঞাসা

---

* এক বৎসর পরে, 'মক্কা-ভ্রমণ' হস্তে পুনরায় 'সাহিত্যে'র পাঠক-সমাজে উপস্থিত হইলাম। গত বৎসর—১৩২৫ সালের আষাঢ় মাসের 'সাহিত্যে' 'মক্কা-ভ্রমণে'র সূচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে পিতৃশোকে, ভ্রাতৃশোকে ['হজ্‌নামা'র লেখক হজরৎ শাহ সুফী মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিকী সাহেব মরহুম আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র।] ও পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, এক বৎসর কাল 'হজ্‌-নামা'র অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আশা করি, আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনীয় হইবে।—অনুবাদক।

করিয়া জানা গেল, তিনি গাজীপুর জেলার অধিবাসী; নাম মিঞা মোহাম্মদ আস্‌গর আলী। বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থান করেন; দীর্ঘকাল পরে মাতৃভূমির ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য যাইতেছেন।

আস্‌গর আলী সাহেবকে অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে আরও বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী জাতিকে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ জানিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

অদ্য ৩রা শওয়াল [২৪শে কার্ত্তিক]।—বহু দিন হইতে,বাঁকীপুরের খাঁ-বাহাদুর মৌলবী খোদাবখ্‌শ্‌ খাঁ মরহুম মগ্‌ফুর্‌ সাহেবের কোতবখানা (Library) দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার বাসনা ছিল। কিন্তু এত দিন, আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তাই গত কল্য বাঁকীপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া-ছিলাম এবং অদ্য প্রাতে, আমার প্রিয় বন্ধু মৌলবী মোহাম্মদ আফ্‌জল্‌ হোসেনের সহিত, খোদাবখ্‌শ্‌-কোতবখানায় উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখি-লাম, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্ত দিনেও কোতবখানার ষোল ভাগের এক ভাগও দেখিয়া শেষ করিতে পারিলাম না।

বিশেষভাবে কোতবখানা দর্শন ও অমূল্য গ্রন্থরাজির কিছু কিছু অংশ পাঠ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সুতরাং হৃদয়ের আবেগে ও বন্ধু আফ্‌জল হোসেনের আগ্রহে, আরও কয়েক দিন বাঁকীপুরে অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

৪ঠা, ৫ই ও ৬ই শওয়াল [২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে কার্ত্তিক] বাঁকীপুরে অবস্থান করিয়া, খোদাবখ্‌শ্‌ মরহুমের কোতবখানার পুস্তক সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। হাতের লেখা কোরাণ শরীফ, হাতের লেখা ইতিহাস, হাতের লেখা জীবনচরিত প্রভৃতি কত কেতাব যে দেখিলাম, এবং নীরবে অশ্রুমোচন করিলাম, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ৬ই শওয়াল তারিখে সন্ধ্যাকালে, খোদাবখ্‌শ্‌ মরহুমের পবিত্র সমাধির পদপ্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার মুক্তিকামনায় করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম। সময়কারী ঘড়ীতে ঢন্‌-ঢন্‌ করিয়া যখন নয়টা বাজিয়া গেল, তখন আমার জ্ঞান হইল এবং ধীরে ধীরে বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

বন্ধুবর আফ্‌জল্‌ হোসেনের ও অপরাপর কয়েক জন নূতন বন্ধুর অনুরোধে আমাকে আরও দুই দিন [৭ই ও ৮ই শওয়াল] বাঁকীপুরে অবস্থান করিতে হইল। এই দুই দিন বাঁকীপুরের নানা স্থান পরিদর্শন করিলাম। এই সুযোগে পুরাতন শহর পাটনাও দেখা হইল।

৯ই শওয়াল [৩০শে কার্ত্তিক] প্রাতঃকালে বাঁকীপুর ত্যাগ করিলাম এবং ১১ই শওয়াল—২রা অগ্রহায়ণ সোমবার তারিখে মুসলমানদিগের অন্যতম তীর্থস্থান বেহারশরীফে উপস্থিত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। বাঁকীপুর ত্যাগ করিবার সময়, বন্ধুবর আফ্‌জল্‌ হোসেন সাহেব তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নামে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। বেহার শরীফে উপস্থিত হইয়া, সেই আত্মীয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সুখের বিষয়, সামান্য অনুসন্ধানের পরেই তাঁহার দর্শন পাইলাম।

আমার এই নূতন বন্ধুটি যেরূপ আগ্রহের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে দিন তিনি আমাকে আদৌ বাড়ীর বাহির হইতে দিলেন না। পর দিবস প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথম বিখ্যাত পীর এবং অদ্বিতীয় পৃথিবী-পর্য্যটক, হজরত মখ্‌দুম্‌ জাহানিয়া জাহাঁ-গশ্‌ত * সাহেবের আস্তানায় তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আহা! সে কি সুন্দর স্থান! পাপীই হউক, অথবা পুণ্যাত্মাই হউন, সে পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেই হৃদয়ের সকল জ্বালা, সকল অনুতাপ, সকল ক্লেশ বিদূরিত হইয়া যায়!

বেহার শরীফে আরও অনেক পুণ্যাত্মার পবিত্র সমাধি-মন্দির আছে। একে একে প্রায় সকল মক্‌বারায় উপস্থিত হইলাম, এবং শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে সকল স্থানেই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিলাম।

১৩ই শওয়াল [৪ঠা অগ্রহায়ণ] বুধবার বেহার-শরীফের অনতিদূরে "বাইশগজী পীরে"র আস্তানায় গমন করিলাম এবং সারারাত্রি অবস্থান করিয়া যথাশাস্ত্র প্রার্থনা করিলাম।

১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই শওয়াল [৫ই, ৬ই ও ৭ই অগ্রহায়ণ] বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার পথে পথেই কাটিয়া গেল। রবিবার প্রাতে [৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭ই শওয়াল] ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের, ভারতীয় পুণ্যস্থান-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যস্থান আজ্‌মীর শরীফে উপস্থিত হইলাম। দুই দিন

* জাহানিয়া জাহাঁগশ্‌ত—অর্থাৎ একাধিক বার পৃথিবী পর্য্যটনকারী।

ও তিন রাত্রি আজ্‌মীর শরীফে অবস্থান করিয়া, ২০শে শওয়াল [১১ই অগ্রহায়ণ] বুধবার প্রত্যুষে আজ্‌মীর শরীফ ত্যাগ করিয়া, বোম্বাই যাত্রা করিলাম।

আজ্‌মীর শরীফে, সুলতানুল্‌-হিন্দ, মহর্ষি খোয়াজা মঈন-উদ্দিন চিশ্‌তী আলায়হে-রহমত সাহেবের পবিত্র সমাধি-মন্দির। ইনি, সাধকপ্রবর হজরৎ খোয়াজা ওস্‌মান হারুণী আলায়হে রহমতের প্রিয়তম শিষ্য (মুরিদ) এবং বাগদাদের সাধকশ্রেষ্ঠ পীরান-পীর হজ্‌রৎ গওসল আজম্‌ সৈয়েদ মহিউদ্দিন আব্দল কাদের জিলানী (কঃ আঃ) সাহেবের মাতৃস্বসার পুত্র।

মুসলমানদিগের মধ্যে চারিটী সাধনা-পথ প্রচলিত আছে। প্রথম—কাদে-রিয়া; দ্বিতীয়—চিশ্‌তীয়া; তৃতীয়—নথ্‌শ্‌বন্দিয়া; এবং চতুর্থ—মোজাদ্দাদিয়া। সাধক ইচ্ছা করিলে, ইহার মধ্যে যে কোনও একটি পথে সাধনা করিতে পারেন; কিন্তু উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় ব্যতীত, সাধনা ভজনা শিক্ষা করিতে পারা অসম্ভব। কোনও এক পথের, এক জন গুরুর পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, সাধনা ভজনা করিতে পারা যায়; আবার সাধকের আগ্রহ হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত চারিটি পথের চারি জন গুরুর হস্তধারণ করিয়া, মুরিদ হইতে (মন্ত্র লইতে) পারেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে চিশ্‌তীয়া তরিকার অর্থাৎ চিশ্‌তীয়া পথের (মতের) প্রবর্ত্তক, নায়েবে রসুল (১) সুল্‌তানুল্‌-হিন্দ (২) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হজরৎ খোয়াজা মঈন-উদ্দিন চিশ্‌তী আলায়হে-রহমত। ইনি পৃথ্বীরাজের সময়, ভারতবর্ষে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

আমি যদিও কাদেরিয়া মতের উপাসক, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সাধকদিগের সম্রাট, হজরৎ খোয়াজা সাহেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। কেবল আমি কেন, কোনও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানই জগন্মান্য হজরৎ খোয়াজা সাহেবকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন না। কারণ, সাধনার সকল পথই মহাপুরুষ হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লুল্লাহে আলায়-হেস্‌সালাম

---

(১) নায়েবে-রসুল—নায়েব অর্থাৎ প্রতিনিধি। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরৎ মোহাম্মদ মুস্তাফার অন্যতম উপাধি 'রসুল'; নায়েবে-রসুল, অর্থাৎ রসুলের প্রতিনিধি।—অনুবাদক।

(২) সুলতানুল্‌-হিন্দ—খোয়াজা মঈন-উদ্দিন চিশ্‌তীর উপাধি। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় সাধকদিগের সম্রাট।—অনুবাদক।

হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে পূর্ব্বোক্ত চারিটি তরিকার (পথের) মধ্যে দুইটি পথের (তরিকার) শেজ্‌রানামা (গুরু-শিষ্যের নাম-তালিকা) প্রকাশ করিলাম।

প্রথম তরিকা কাদেরিয়া।

সৈয়েদুল্‌ আম্বিয়া, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ (১) হজরৎ মোহাম্মদ

---

(১) মুসলমান-সমাজে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সর্ব্বসমেত এক লক্ষ চব্বিশ সহস্র পয়গম্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'তারিখোল্‌ খামেস্‌' প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরৎ পয়গম্বার সাহেব এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হজরৎ পয়গম্বার সাহেব দৃঢ়তার সহিত কখনও এ কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পূর্ব্বকালের লোকেরা ঐ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তিনি প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। কোরাণে খোদাতায়া'লা পয়গম্বারদিগের সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন নাই। যখনই কোনও য়ীহুদি অথবা নাসারাগণ (খ্রীষ্টান) হজরৎ পয়গম্বার সাহেবকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও পয়গম্বার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিয়াছেন, তখনই সেই পয়গম্বার সম্বন্ধে স্বর্গীয় দূত হজরৎ জীব্রাইলের মধ্যস্থতায়, সুরাহ্‌ (পরিচ্ছেদ) অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং তাহা হইতে প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) য়ীহুদী অথবা নাসারা (খ্রীষ্টান)-দিগের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং মোট কত পয়গম্বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কোরাণ শরীফে তাহার বর্ণনা দিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা ব্যতীত 'ঈমান-মোফ্‌সেলে'র মধ্যে আছে,—'অ-কোতোবেহী, অ-রাসুলেহী'। অর্থাৎ আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, সমস্ত স্বর্গীয় গ্রন্থ ও সকল পয়গম্বার,—যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাঁহাদের উপর। ইহা ব্যতীত কোরাণের আর এক স্থানে আছে যে,—খোদাতায়া'লা বলিতেছেন,—'যখনই যে উম্মতের মধ্যে, ধর্ম্মের ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে, আমি তখনই সেই উম্মতকে ধর্ম্মের পথে আহ্বান করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে পয়গম্বার প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক, আরবী ভাষায়, উম্মৎ কাহাকে বলে। আমি এ পর্য্যন্ত ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যতটুকু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, 'উম্মতে'র বাঙ্গালা বা ইংরাজী প্রতিশব্দ হইতেছে 'জাতি' বা 'নেশন'। তাহা হইলে এ কথা অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না যে, প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই সময় সময় পয়গম্বার অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে অধর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আমি যদি এ কথা স্বীকার করি যে, ভারতীয় হিন্দু জাতির মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ প্রেরিত মহাপুরুষরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। পরন্তু কোরাণ-বিশ্বাসী আমি, এ কথাও বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, যত পয়গম্বারই এ ধরাধামে অবতীর্ণ হউন না কেন, মহাপুরুষ হজরৎ মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়েহে অ-সাল্লাম, সকলের শেষে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পর পৃথিবীতে আর কোনও পয়গম্বার আইসেন নাই ও আসিবেন না। কেবলমাত্র এই কারণেই তাঁহার আর একটি উপাধি—'খাত মুন্‌ আম্বিয়া' অর্থাৎ শেষ নবী।—অনুবাদক।

মোস্তাফা সাল্লুল্লাহ আলায়হে অ-সাল্লাম। তাঁহার নিকট মুরিদ হয়েন, (মন্ত্র গ্রহণ করেন); তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ও অন্যতম জামাতা, চতুর্থ খোলাফায়ে রাশেদিন্ বীরবর হজরৎ আলী করমুল্লা অজহাহু। তাঁহার শিষ্য, তাঁহার প্রিয়তম দ্বিতীয় পুত্র (মহাপ্রভু হজরৎ মোহাম্মদ মুস্তাফার প্রিয়তমা দুহিতা ফাতেমাতুজ্জাহ্রার গর্ভজাত) দ্বিতীয় ইমাম, হজরৎ হোসায়েন (রাঃ)। তাঁহার শিষ্য, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (প্রভুকন্যা ফাতেমাতুজ্জাহ্রার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রথম ইমাম্ হজরৎ হাসান্ [রাঃ] পুত্র) তৃতীয় ইমাম্ হজরৎ জয়েনাল্ আবেদিন। তাঁহার শিষ্য, চতুর্থ ইমাম, হজরৎ মোহাম্মদ বাকের। তাঁহার শিষ্য, পঞ্চম ইমাম, জাফর সাদেক। তাঁহার শিষ্য, ষষ্ঠ ইমাম মুসা কাজেম। তাঁহার শিষ্য, সপ্তম ইমাম আলী রেজা। তাঁহার শিষ্য, শেখ্ মায়া'রুফ করখী। তাঁহার শিষ্য, শেখ্ আবিল্ হোসেন্ সরি সখ্তি। তাঁহার শিষ্য, সৈয়েদুত্তায়েফ জনায়েদ্ বাগ্দাদী। তাঁহার শিষ্য, শেখ আবিবকর শিব্লী। তাঁহার শিষ্য, শেখ আব্দুল আজিজ্ তামিমী। তাঁহার শিষ্য, শেখ আবিল্ ফজল্ আব্দুল ওয়াহেদ্ তামিমী। তাঁহার শিষ্য, শেখ আবুল ফারাহ্ তারতৌসি। তাঁহার শিষ্য, শেখ আবুল হোসেন কোরেশী। তাঁহার শিষ্য, শেখ আবু সাইদ মাখ্জুমী। তাঁহার পুত্র ও শিষ্য, হজরৎ পীরাণ-পীর গওসুল আজম শেখ (১) সৈয়েদ (২) মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (৩)।

দ্বিতীয় তরিকা চিশ্তিয়া।

যনাব সৈয়েদুল আম্বিয়া, ওয়ালমোর্‌সালিন্, মহবুবে রাব্বেল আ'লামিন্, আহমদ মোজ্তবা, মোহাম্মদ মোস্তাফা, সাল্লুল্লাহে আলায়হে অ-সাল্লাম। তাঁহার প্রিয় শিষ্য, প্রিয় জামাতা ও পিতৃব্য-পুত্র, চতুর্থ খোলাফায়ে রাশেদিন, হজরৎ আলী ইব্নে আবিতালেব। তাঁহার প্রিয় শিষ্য, হজরৎ

---

(১) শেখ—সিদ্ধ পুরুষ। যিনি ঈশ্বরের সাধনায় প্রাণপাত করিয়া, সিদ্ধি লাভ করেন, ভগবৎ কৃপায় তিনিই শেখ্ উপাধি গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন।

(২) সৈয়েদ—শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

(৩) বাগ্দাদের জিলান প্রদেশে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইনি 'জিলানী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল 'হজরৎ বড় পীর সাহেব' বলিলেও ইঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে।—অনুবাদক।

হোসেন বাস্‌রী। (১) তাঁহার প্রিয় শিষ্য হজরৎ আব্দল ওয়াহেদ্‌ বেনে জায়েদ। তাঁহার শিষ্য হজরৎ ফোজায়েল ইব্‌নে আইয়াজ। তাঁহার শিষ্য হজরৎ ইব্রাহিম আদ্‌হাম ওরফে সুলতান্‌ বাল্‌খী (২) তাঁহার শিষ্য হজরৎ

---

(১) বস্‌রা শহরে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইনি বস্‌রী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

(২) ইনি বল্‌খ্‌ দেশে রাজত্ব করিতেন। বল্‌খ্‌ শহর ইঁহার রাজধানী ছিল। 'সুলতান বাল্‌খী' বলিলেই মহাতপা রাজর্ষি ইব্রাহিম আদহামকে বুঝায়। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, সে যুগে ইঁহার ন্যায় বিলাসী আর কেহ ছিল না। ইঁহার রাজ্যত্যাগ সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম—এক দিন ইনি হারেমের কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় অট্টালিকার ছাদের উপর এমন শব্দ হইতে লাগিল যে, যেন কেহ অতি বেগে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। ঘটনা জানিবার জন্ম বাঁদীর প্রতি আদেশ হইল। বাঁদী খোজাকে আদেশ করিল। খোজা ক্ষণকাল পরে ছাদের উপর হইতে জনৈক ব্যক্তিকে আনিয়া বাদ্‌শা ইব্রাহিমের সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল যে, "এই ব্যক্তি জাঁহাপানার শয়নমন্দিরের ছাদের উপর দৌড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিল যে, আমার একটি উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে, আমি তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি।" বাদ্‌শা আদ্‌হাম, খোজার প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অপরাধী ব্যক্তিকে কহিলেন, 'তোমার এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তুমি সত্য করিয়া বল, কেন তুমি আমার শয়ন-মন্দিরের ছাদের উপর আরোহণ করিয়াছিলে?' ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি কহিল, 'জাঁহাপানার যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে, যিনি জাঁহাপানার জাঁহাপানা, তাঁহারও কি আপনার কথা বিশ্বাস হইবে? যদি ছাদের উপর উষ্ট্র পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে যিনি এই দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছেন, এবং খোদাতায়া'লাকে পাইবার আশা করিতেছেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হওয়াও কি সম্ভব?' এই কথা শ্রবণ করিয়া বাদশার মনে বিকার উপস্থিত হইল, এবং তিনি রাজ্য ও সিংহাসনের মমতা ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়—বাদ্‌শা ইব্রাহিম আদ্‌হাম্‌ যখন শয়ন করিতেন, তখন দাসীরা (প্রত্যহ এক এক জন দাসী) আপনাপন স্তন তাঁহার পদ-নিম্নে ঘর্ষণ করিত, তিনি সুখে নিদ্রা যাইতেন। এক দিন এক দাসী নিয়মিতভাবে, পদনিম্নে স্তন ঘর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার স্তনের উপর অতীদীর্ঘ লোম থাকায়, সেই লোমের আঘাতে বাদশার নিদ্রা হইতেছিল না। বাদশা বিরক্ত হইয়া দাসীর স্তন কাটিয়া লইবার জন্ম, জল্লাদকে আদেশ দিলেন। জল্লাদ তৎক্ষণাৎ এই আদেশ পালন করিল। কিন্তু দাসী কোনও প্রকার কাতরোক্তি না করিয়া, উচ্চশব্দে হাস্য করিতে লাগিল। বাদশা কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দাসী উত্তর করিল যে, 'এক বাদশার আদেশে আমার স্তন কাটা গেল, এবং আমি বিশেষ কষ্ট পাইলাম। কিন্তু আর এক বাদশার আদেশে যখন এই বাদশার হস্ত ও পদ কাটা যাইবে, তখনকার সেই যন্ত্রণার কথা স্মরণ

হোজায়েফা মারশী। তাঁহার শিষ্য হজরৎ আবু হোরায়রা (১) বাসরী। তাঁহার শিষ্য শেখ ওলুয়ে দেনওয়ারী। তাঁহার শিষ্য খোয়াজা আবু ইস্হাক্ চিশ্‌তী। তাঁহার শিষ্য খোয়াজা আবু আহমদ্ চিশ্‌তী। তাঁহার শিষ্য খোয়াজা মোহাম্মদ চিশ্‌তী। তাঁহার শিষ্য খোয়াজা ইউসুফ চিশ্‌তী। তাঁহার শিষ্য শেখ মওদুদ চিশ্‌তী। তাঁহার শিষ্য হাজী শরীফ জেন্দানী। তাঁহার শিষ্য খোয়াজা ওস্মান হারুণী। তাঁহার শিষ্য সুলতানুলহেন্দ, নায়েবে রসুল, খোয়াজা মঈন-উদ্দিন চিশ্‌তী।

উপরে দুইটি তরিকার—কাদেরী ও চিশ্‌তী—শেজ্‌রানামা অর্থাৎ সাধকদিগের গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নামের তালিকা প্রকাশিত হইল। প্রিয় পাঠক! এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে, সময় সময় এরূপ অনেক ব্যাপার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, যাহা বুঝিতে হইলে এই দীর্ঘ তালিকার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই এই তালিকা প্রকাশিত হইল।

প্রিয় পাঠক! আমার শস্যশ্যামলা জন্মভূমির বাহিরে, অন্যতম ইসলামী তীর্থ, পবিত্রভূমি বেহার শরীফ ও আজ্‌মীর শরীফ দর্শন করা হইল। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু বাঁকীপুরে খোদাবখ্‌শ্‌ লাইব্রেরী

হওয়ায়, আমি মনে করিতেছি যে, দুনিয়ার বাদশার আদেশে অদ্য আমার শরীরে যে যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, একদিন দিনের বাদশার আদেশে, এই দুনিয়ার বাদশার শরীরে যে যন্ত্রণা হইবে, সে যন্ত্রণার তুলনায় এ যন্ত্রণা কিছুই নহে। তৃতীয়—এক দিন বাদশার দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল শয্যায়, বাদশার অনুপস্থিতিকালে, এক বাঁদী শয়ন করিয়াছিল এবং নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ বাদশা আসিয়া বাঁদীকে এই অবস্থায় দেখিয়া, ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, খোজাকে বাঁদীর দেহে বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। বেত্রাঘাতে বাঁদীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সে ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে হাস্য করিতে লাগিল। বাদশা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, 'এক দিন শয়ন করার ফলে এত কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইল, আর যিনি আজীবন এই ভাবে শয়ন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছেন, না জানি বিধাতা তাঁহাকে কত শাস্তি দিবেন।' এই তিনটীর মধ্যে যে কোনও একটী যে ইব্রাহিমের সংসার-ত্যাগের কারণ, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।—অনুবাদক।

(১) হজরৎ আবুহোরায়রা (রজি:), প্রভু হজরত মোহাম্মদের অন্যতম পার্শ্বচর ছিলেন। তিনি বহু হাদিসের বর্ণনাকারী ছিলেন। বস্‌রা শহরে ইঁহার জন্ম হওয়ায় ইনি বস্‌রী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আবুহোরায়রা বলিলে যেমন তাঁহাকে চিনিতে কোনই অসুবিধা হয় না, সেই প্রকার নাম না বলিয়া, কেবল বস্‌রী বলিলে তাঁহাকে বুঝায় না!

পরিদর্শন করিয়া যে প্রকার পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সম্ভবতঃ আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে প্রকার পূর্ণানন্দ এতদুভয় স্থানের কোনও স্থানেই প্রাপ্ত হইলাম না। কারণ এই যে, পাণ্ডা বনাম মাজাওয়ারদিগের অত্যাচারে অনেককেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়িয়া, পুণ্যভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

ক্রমশঃ।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

‘শব্দ-কথা’।

[তৃতীয় প্রস্তাব]

কারক-প্রকরণ।—২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ‘কারক’ ও ‘বিভক্তি’ এই দুইটি শব্দের সংজ্ঞা বিচার করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, কারকের অর্থগত নিত্যত্ব আছে—কারকের সংখ্যা বিভক্তির প্রয়োগ বা অল্পাধিক্যের দ্বারা নিয়মিত নহে, এবং সেই কারণে তাহা ভাষাভেদের অধীন নহে। গ্রীক্, ল্যাটিন প্রভৃতি পরিণত ভাষায় কারকের সংখ্যা সংস্কৃত ভাষারই অনুরূপ। এমন কি, ‘প্রাচীন ইংরাজী’ (Old English) ভাষাতেও ছয়টি কারক ছিল। আধুনিক ইংরাজী ভাষায় আজও সেই সুপ্রাচীন *Dative Case* (সম্প্রদান-কারক) বিভক্তি-বর্জ্জিত হইয়াও স্থলে স্থলে বিদ্যমান থাকে। যেমন—‘Give the *boy* a penny’, ‘send the *captain* help’, ‘bring *me* the word’, ‘woe worth the *day*’ ইত্যাদি। উদাহৃত বাক্যগুলিতে ‘boy’, ‘captain’, ‘me’ ও ‘day’ এই পদ কয়টিকে ‘dative case’ বলিতেই হইবে। গত্যন্তর নাই। দৃশ্যতঃ কর্ম্মকারক (Objective case) বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, উহাদের প্রত্যেকটিতেই কর্ম্মকারকের অর্থের সম্পূর্ণ অভাব। তজ্জন্য উহাদিগকে কর্ম্মকারক বলা যাইতে পারে না। ইংরাজী ভাষার আধুনিক ব্যাকরণকারগণ, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যাকরণ হইতে ‘dative case’ (সম্প্রদান-কারক) উঠাইতে পারেন নাই। কারকের অর্থগত নিত্যত্বই ইহার একমাত্র কারণ। যেমন ইংরাজী ব্যাকরণ হইতে ‘dative case’ উঠে নাই, তেমনই বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে সম্প্রদান কারক উঠিবে না। এ বিষয়ে ত্রিবেদী মহাশয়ের

ও তাঁহার মতাবলম্বিগণের চেষ্টা সফল হইবার আশা নাই। নিত্যবস্তুর তিরোধান অসম্ভব।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হইতে কোনও কারকই উঠিবে না। বাঙ্গালায় কারকের সংখ্যা না কমিয়া বরং বাড়িয়া গিয়াছে। কোনও কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণকর্ত্তা সম্বন্ধ ও সম্বোধন এই দুইটি পদকেও কারক-সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা ইংরাজী ব্যাকরণের অনুকরণমাত্র। সম্বন্ধ পদকে কারক বলিবার একটা ক্ষীণ যুক্তি আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার আভাষ দিয়াছি। সম্বন্ধ পদের 'ক্রিয়ানিমিত্তত্ব', অপরিস্ফুট ও অপ্রধান হইলেও, একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের অনুমোদিত ষট্‌কারকের রূঢ়ত্ব বশতঃ * সম্বন্ধ পদকে কারক না বলাই সঙ্গত। সে যাহা হউক, ষট্‌কারকের নিত্যত্ববশতঃ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে ছয়টি কারক অমর হইয়া থাকিবে। ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষায় 'করণ', 'অধিকরণ', 'অপাদান' ও 'সম্প্রদান', এই কয়টি কারকের নাম উচ্চারণ না করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের অর্থগত অস্তিত্ব লোপ করিতে পারেন না। শাক্তমন্ত্রের উপাসক প্রাণান্তেও 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ না করিলে কৃষ্ণের অস্তিত্ব কি অসিদ্ধ হইবে? অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন—'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে, বাঘ হইতে ভয় পায়, হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিতেছে ·· (এখানে) ঘোড়া, বাঘ এবং হিমালয়ের যখন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্বয় নাই, তখন লাঠি তুলিলেও উহাদিগকে অপাদান কারক বলিতে পারিব না।' উদ্ধৃত উদাহরণের ঐ পদগুলি সংস্কৃত ভাষায় অপাদান কারক হইবে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে আসিলেই আর অপাদান থাকিবে না! বাঙ্গালা দেশের জলবায়ুর গুণে ব্যাকরণের স্থাবর পদার্থ কি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়? অপাদান কারকের সম্বন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় বলেন—(১) (বাঙ্গালায়) 'ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদানের অস্তিত্ব হীন।' (২) 'বাঙ্গালায় অপাদানের বিভক্তিচিহ্ন নাই।' (৩) '"হইতে" এই postposition (শব্দের) মূল যাহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালায় অব্যয়ের কাজ করে। উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্ত অবিচার হইবে।'

অপাদান সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবুর এই কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত নহে। বাঙ্গালা

---

* অপাদান-সম্প্রদানে করণাধারকর্ম্ম চ।
কর্ত্তারঞ্চেতি ষট্‌প্রাহুঃ কারকাণি বিচক্ষণাঃ॥

হউক, ইংরাজী হউক, সংস্কৃত হউক—যে ভাষাই হউক, অপাদানের অর্থ হইলেই, তৎসম্বন্ধীয় পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকিবেই—এ অন্বয় স্বতঃসিদ্ধ। আর এই অর্থান্বয়-প্রকাশক কোনও চিহ্ন সেই পদের উত্তর বসিবেই। এই চিহ্নের আকার যেরূপই হউক না, তাহারই নাম বিভক্তি। বাঙ্গালা ভাষায় 'হইতে' এই শব্দটিই অপাদান কারকের সাধারণ বিভক্তি। 'হইতে' অব্যয় শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহা এ স্থলে বিভক্তি। মহামহোপাধ্যায় হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে' এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— (১) 'যে সকল অব্যয় বিভক্তির চিহ্নস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে 'বিভক্তি-অব্যয়' বলা যায়। যথা—দ্বারা, দিয়া, হইতে, ইত্যাদি।' (১০৪ পৃঃ) (২) 'পঞ্চমীর চিহ্ন 'হইতে' প্রাকৃত 'হিংতো' (পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন) হইতে আসিয়াছে।' (৪০ পৃঃ)। (৩) 'কখন কখন 'অবধি' প্রভৃতি শব্দই পঞ্চমী বিভক্তির স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' (৫৯ পৃঃ)। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ও 'হইতে' প্রভৃতিকে বিভক্তিস্বরূপ গণ্য করিয়াছেন। তৎকৃত 'নববোধ ব্যাকরণে'র অব্যয়-প্রকরণে তিনি লিখিয়াছেন— 'যে সকল অব্যয় স্বতন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে 'বিভক্তিপ্রতিরূপক' অব্যয় বলে। যথা—দ্বারা, দিয়া…হইতে, চেয়ে, অপেক্ষা,…অবধি ইত্যাদি।' আবার এই 'হইতে' শব্দ যে বিভক্তিরূপে গৃহীত হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেও পাওয়া যায়। অব্যয় শব্দ সম্বন্ধে দুইটি প্রসিদ্ধ বচন আছে। প্রথম—ইয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাতানাং ন বিদ্যতে। প্রয়োজনবশাদেতে নিপাত্যন্তে পদে পদে॥ অব্যয় শব্দ, সংখ্যা দ্বারা এতগুলি এইরূপে নির্দ্দিষ্ট কিছু নাই। প্রয়োজনবশতঃ ইহারা নানা স্থানে প্রযুক্ত হয়। (অব্যয়মসংখ্যমিতি দুর্গসিংহঃ)—অতএব বাঙ্গালা ভাষায় যদি কোনও স্থলে কোনও অব্যয়ের বিভক্তিরূপে 'প্রয়োজন' হয়, তবে তাহা তৎস্বরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। দ্বিতীয় কারিকা এই—নিপাতাশ্চাদয়ো জ্ঞেয়া উপসর্গাশ্চ প্রাদয়ঃ। দ্যোতকত্বাৎ ক্রিয়াযোগে লোকাদবগতা ইমে॥ 'চ' প্রভৃতি অব্যয়গুলিকে 'নিপাত' কহে, আর 'প্র' ইত্যাদি অব্যয়ের নাম উপসর্গ। লৌকিক ব্যবহার অনুসারে ক্রিয়াযোগে তাহাদের দ্যোতকত্ব হইতে অব্যয়গুলি অবগত হওয়া যায়। অতএব 'হইতে', 'দ্বারা', 'দিয়া' প্রভৃতি বাঙ্গালা অব্যয় শব্দগুলি যে যে কারকার্থের দ্যোতক হইবে, তাহারা সেই সেই কারকের বিভক্তিরূপেই গৃহীত হইবে। আবার—বাঙ্গালায়

অপাদানের এই 'হইতে' বিভক্তির উৎপত্তির (প্রাকৃত 'হিংতো' ব্যতীত) অন্য এক মূলও অনুমিত হইতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণের 'পঞ্চম্যাস্তস্' এই সূত্রে পঞ্চমীতে যে 'তস্' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় 'হইতে' সহজেই আসিতে পারে। 'বৃক্ষতঃ' কি 'নদীতঃ' হইতে বৃক্ষ হইতে ও নদী হইতে এইরূপ পদ প্রচলিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই 'তস্' প্রত্যয়কে বিভক্তি বলিতে বা সর্ব্বনাম ভিন্ন অন্য শব্দের উত্তরও প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি হইতে পারে না। কলাপ ব্যাকরণের সূত্রকার শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য স্বয়ং এই 'তস্' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির বিভক্তিসংজ্ঞা দিয়াছেন,—'বিভক্তিসংজ্ঞা বিজ্ঞেয়া বক্ষ্যন্তেঽতঃ পরন্তু যে' ইত্যাদি তদ্ধিতসূত্র স্মর্তব্য। আর, উক্ত ব্যাকরণের বৃত্তিকার আচার্য্য দুর্গসিংহ 'পঞ্চম্যাস্তস্' এই সূত্রের বৃত্তিতে স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন—...'অসর্ব্বনাম্নোঽপ্যবধিমাত্রে তস্ বক্তব্যঃ।' সর্ব্বনাম ভিন্ন অন্য সকল শব্দের উত্তরও অবধিমাত্র অর্থে তস্ হইবে।

পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষায় 'হইতে', 'দ্বারা', 'দিয়া', 'চেয়ে' প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি কারকের দ্যোতক বিভক্তি। এই হেতু বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে অপাদান ও করণ কারক কিছুতেই নিবারিত হইবে না। সম্প্রদান ও অধিকরণ কারকও বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে না। এই চারিটি কারক সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। ফল কথা এই, কারকের নিত্যত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৃথা পরিশ্রম।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রাবণ।—চিত্রকর শ্রীবরুনজীর 'সঙ্গীত' নামক চিত্রে কোনও বিশেষত্ব নাই। প্রথমেই শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দর্শনে পথিমধ্যে কোলাকুলি' হইতেছে। শ্রীঅমৃতলাল শীলের 'অলৃহার পানে' এবার 'বাচু বুদ্ধে'র গল্প কথিত হইয়াছে। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'প্রাণ' সুইনবরণের অনুবাদ। শ্রীরজনীমোহন রায় চৌধুরীর 'কোচীন' সুখপাঠ্য। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'বারাণসীর নবাবিষ্কৃত মূর্ত্তি'র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনলিনী-মোহন চৌধুরীর 'দুর্গ—শত বৎসর পূর্ব্বে' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তীর 'অভি-

ব্যক্তিবাদ' সুলিখিত নিবন্ধ। শ্রীকিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নাক্তার' কি ? বাঙ্গালা গল্পের এমন উদ্ভট অভিধান 'মৌলিক' বটে! এ গল্প সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'তুমি' পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পাকা ঘুঁটীও কাঁচে! শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসুর 'অরুণ' ও শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাসের 'হলধরের পত্র-পত্যা' চলনসই গল্প। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্ত্তার ভূত' নূতন ধরণের রূপক। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ভূত' আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

১

"বুড়ো কর্ত্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠ্‌ল, 'তুমি গেলে আমাদের কি দশা হবে?'

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। বল্‌লে, 'আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখ্‌বে কে?'

তা' বলে মরণ ত এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বল্‌লেন, 'ভাবনা কি? লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্‌ না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের ত মৃত্যু নেই।'

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেন না, ভবিষ্যৎকে মান্‌লেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মান্‌লে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাব-দোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাব্‌তে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, 'এই চোখ বুজে চলাই হচ্চে জগতের সব চেয়ে আদিম চলা। এ'কেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চল্‌ত; ঘাসের মধ্যে গাছের মধ্যে আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।'

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এই জন্যে ভেবে পাওয়া যায় না সেটাকে ফুটো করে কি উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে-ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে একছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে,—বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তা'তে করে' ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক,—অন্ন না বস্ত্র না স্বাস্থ্য—শান্তি থাকে।

কত যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেচে।

৩

এই ভাবেই দিন চল্‌ত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগ্‌ত না; চিরকালই গর্ব্ব কর্‌তে পার্‌ত যে এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভ্যাড়ার মত ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা-ও করে না, ম্যা-ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে; যেন একেবারে চিরকালের মত মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুস্কিল বাধ্‌ল। সেটা হচ্চে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় ওদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখ্‌বার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ঙ্কর সজাগ আছে।

৪

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো।'

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষে; আর পাড়ার কথা ত বলাই আছে।

কিন্তু 'বর্গি এল দেশে।'

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে। দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল 'এমন হল কেন?'

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বল্‌লে, 'এটা ভূতের দোষ নয়, ভূতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন?'

শুনে সকলেই বল্‌লে, 'তা ত বটেই!' অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ কর্‌লে।

দোষ যারই থাক্, খিড়্‌কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। একদিক থেকে এ হাঁকে, 'খাজনা দাও!' আরেক দিক থেকে ও হাঁকে 'খাজ্‌না দাও!'

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে, 'খাজ্‌না দেব কিসে?'

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক্ ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস ছিল না। জগতে যারা হুঁসিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষ্‌তে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, 'বেহুঁস্ যারা তারাই পবিত্র, হুঁসিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁসিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।'

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না; 'খাজনা দেব কিসে?'

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে' তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।'

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে; 'ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চল্‌বে?'

শুনে ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি আর মাসতুত পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, 'কি সর্ব্বনাশ! এমন প্রশ্ন ত বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কি হবে, সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?'

প্রশ্নকারী বলে, 'সে ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু আধুনিকতম বুল্‌বুলির ঝাঁক, আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কি করা যায়?'

মাসি পিসি বলে, 'বুল্‌বুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।'

অর্ব্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।'

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, 'চুপ! এখনো ঘানি অচল হয় নি।'

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্চে বুড়ো কর্ত্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না,—তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, 'কর্ত্তা, এখনো কি ছাড়্‌বার সময় হয় নি?'

কর্ত্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়্‌লেই আমার ছাড়া।'

তারা বলে, 'ভয় করে যে কর্ত্তা!'

কর্ত্তা বলেন, 'সেইখানেই ত ভূত।' "

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র উপসংহারে 'রামেন্দ্রবাবুর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' হইতে একটু তুলিয়া দিয়াছেন। এইটুকুই উল্লেখযোগ্য। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অরুন্ধতী' একটী সুদীর্ঘ কবিতা। ইহাও রূপক। 'বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।'

উপাসনা। বৈশাখ।—শ্রাবণের দুর্দ্দিনে বৈশাখের উপাসনা! মলাটের ললাটে তিলকের মত ছাপা আছে, 'স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।' তবু এই দুর্দ্দশা?—আবার 'স্বত্ব'! মহারাজের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ত-য়ের ত অভাব নাই। সাধারণে যে বানান একটা ত-য়ে সারে, মহারাজের উপাসনায় সে স্থলে সম্পাদককে দুইটা ত উৎসর্গ করিতে হয়! সম্পাদকের 'বস্তি-সমস্যা'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখিতেছি,—'ব্যাভিচার'! 'ব্যাভিচারে' অবশ্য আতিশয্য থাকিবেই। আর যাহাই হউক, রাজার ভাণ্ডারে বর্ণমালা কখনও বাড়ন্ত হইতে পারে না! 'বস্তি "ভরাট" হইয়া আরও অস্বাস্থ্যকর হইয়েছে।'

যখন পুকুর 'ভরাট' হয়, তখন বস্তি 'ভরাট' হইবে না কেন? বস্তি-সমস্যার সমাধান ঘটে! শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশের 'বঙ্গসাহিত্যের যুগ' চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। বিশেষত্ব এই যে, এই যুগাবিষ্কারের স্রষ্টা কে, লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'কাল-বৈশাখী' ভাবের কাল-বৈশাখী বটে। ধূলায় অন্ধকার; শুকনো পাতা উড়িতেছে; কষ্টকল্পনা বজ্রের মত কড়্-কড়্ করিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে—কেবল বিদ্যুতের বিলাস নাই। বোধ হয় প্রতিভার মধ্যাহ্ন বলিয়া! শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রের 'বৈশাখী' পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি! ইহাও যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে এনাটমী নিশ্চয়ই Paradise Lost!

'ভগ্ন অস্থি, শিথিল অঙ্গ বিকল সকল সন্ধি,
ক্ষীণ প্রাণ স্রোত, রক্তে ভিসক শতেক বক্ষে বন্ধি।'

ইহাকে যদি 'উৎকট' বলি, তাহা হইলে 'বিকট' আপনাকে উপেক্ষিত—অপমানিত মনে করিবে। অতএব, ইহাকে আমরা কবিতার কমঠ-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।—কথায় বলে, অকালের ফল ভাল হয় না। 'উপাসনা' তাহারই সমর্থন করিতেছে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন 'এম্, এ, পি, আর, এস্ 'পাটীল-বিল ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যে সমাজ-সংস্কারে' অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন। স্বাক্ষরের শেষে উপাধি-সংযোগ সম্পূর্ণ মৌলিক। ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি,—'মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যে।' সর্ব্বত্রই 'বাড়্তী' ইংরেজী ভিন্ন আর কিছুরই 'কম্তী' নাই! মহারাজের কাগজের কি প্রুফ দেখিবারও লোক নাই? শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের 'নির্ব্বাক ঘোষণা'র শিরোনাম দেখিয়া ভোজবাজী মনে পড়ে! 'কাটা মুণ্ড কথা কয়' কি এ ইন্দ্রজালের নিকট দাঁড়াইতে পারে? 'ঘোষণা', কিন্তু 'নির্ব্বাক'। 'নীরব কবি'র ভায়রাভাই! মহারাজ যদি ভানুমতীকে, আত্মারাম সরকারকে, হোসেন খাঁকে, অথবা থরষ্টনকে উপাসনার ভার দিতেন, তাহা হইলেও এমন ভোজবাজী দেখিবার অবকাশ পাইতেন না। শ্রীসত্যরঞ্জন বসুর 'কবি' কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি,—'আমাদের সব চেয়ে বেশী ঠকাচ্ছে এই চোখ দুটো।' মানুষেই বা কম কি? প্রমাণ—উপাসনা। উপাসনার দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব এই যে, খোদ মহারাজ 'সাহিত্য-সভা'র সভাপতিরূপে ভাষা ও সাহিত্যের শুচিতা-রক্ষার জন্য যে যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেন, সেই যথেচ্ছাচার তাঁহারই উপাসনায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকেই উপহাস করে! যাহাকে বলে, 'যার শীল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!' দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, এক সঙ্গে এত trash আর কোনও কাগজে দেখা যায় না। মহারাজের সাহিত্য-সেবার এই দারুণ প্রচেষ্টার একমাত্র নিদারুণ ফল—'যেন তেন প্রকারেণ মণীন্দ্রন্য ধনক্ষয়ঃ!'—আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি,—'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!'

নারায়ণ। শ্রাবণ।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' সেকালের বাঙ্গালার অতুলনীয় ছবি। সেকালের ইতিহাসই একালে উপন্যাসের মত। শাস্ত্রী মহাশয় নিপুণ তুলিকায় এই উপন্যাসে সে কালের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বে ইতিহাসে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সেই অভিজ্ঞান কল্পনায় প্রতিফলিত করিয়া

শাস্ত্রী মহাশয় যে অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ হইলে, ফরাসী সাহিত্যের 'সালাম্বো'র মত বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে গৌরবের স্থান অধিকার করিবে। শ্রীসরোজনাথ ঘোষের 'সংস্কারের প্রভাবে' গল্প অল্প বটে, কিন্তু বহর চৌদ্দ পৃষ্ঠা! লেখকের ফেনাইবার আর্ট দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইনি কোনও সাবানের কারখানায় এই কৌশলের রহস্য নিবেদন করিলে তাঁহার কিঞ্চিৎ লাভ ও দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'নারায়ণে' তাঁহার 'গণিকা-তন্ত্র সাহিত্যে'র অবতারণা করিয়া রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ললিতবাবু লিখিয়াছেন,—'প্রধানতঃ "নারায়ণে" প্রকাশিত কয়েকটি গল্প পড়িয়াই প্রথমে বিরক্তির উদ্রেক হইয়াছিল এবং 'নারায়ণে'র উপরেও অভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। তাই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ "নারায়ণং নমস্কৃত্য" "নারায়ণে"র সমীপেই এই আলোচনার ফল নিবেদন করিলাম।' ইহার অর্থ কি এই যে, 'নারায়ণ' পাপ করিবে, এবং ললিতকুমার নরক ভোগ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? অথবা, 'নারায়ণ' যে পাপ করিয়াছে, ললিতবাবুর 'গণিকাতন্ত্র' প্রকটিত করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে? তাহা হইলে কি বুঝিব, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস তোবা করিলেন?

উদ্বোধন। শ্রাবণ।—শ্রীস্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' মধ্যে বন্ধ ছিল; আবার প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্বামী পরমানন্দের 'পবিত্রতা' উল্লেখযোগ্য। 'স্বামী প্রেমানন্দের পত্র' সুখপাঠ্য।

কাদম্বরী।—প্রথম সংখ্যা; আষাঢ়।—মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত, নূতন মাসিক। এ সংখ্যার মলাটে 'প্রথম সংখ্যা' ছাপা আছে, কিন্তু 'আত্মিক জগৎ' নামক প্রবন্ধে দেখিতেছি —'পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।' ইহা কোন্ ধর্ম? শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসের সংস্কৃত 'বন্দনা'র বিশেষত্ব নাই। 'জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের স্থান' শ্রীমতী বেসান্টের কোনও বক্তৃতার ভাবাবলম্বনে লিখিত ও মেদিনীপুরের তত্ত্বসভার অধিবেশনে পঠিত। 'মৃণ্ময়ী না চিন্ময়ী?' একটী গল্প। নমুনা— 'তার পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই জনের প্রাণের বিনিময় হইল।' কত ক্ষণ? 'মেদিনীপুরের ইতিকথা'য় মেদিনীপুর-রাজবংশের ইতিহাস আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু মাত্রা হোমিওপ্যাথিক। বন্দনা ও গল্পের অপচার কমাইয়া ইতিকথার মাত্রা বাড়াইলে ভাল হয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসুর 'বৌদ্ধযুগে মেদিনীপুর' এ সংখ্যায় সমাপ্ত হয় নাই। আরম্ভ আশাপ্রদ। বাজে প্রবন্ধ কমাইয়া এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়াইলে 'কাদম্বরী'র গৌরব বাড়িবে।

সুবর্ণবণিক-সমাচার। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্টের 'শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের জীবনী' ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। শ্রীনিবাস প্রভুর বংশতালিকা আছে।—এইরূপ জীবন-চরিতের সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের আধুনিক মনীষী, হিতৈষী ও প্রধানগণের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইলে দেশের একটা অভাব দূর হয়; সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের গৌরবও উজ্জ্বল হইতে পারে। আমরা শ্রীনিবাস ঠাকুরের কথা অল্পবিস্তর শুনিয়াছি, কিন্তু যে ডাক্তার চন্দ্র এককালে বাঙ্গালার চিকিৎসক-সৌর-জগতের কেন্দ্রে বিরাজমান ছিলেন,তাঁহার জীবনের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞেয়। 'সুবর্ণবণিক-সমাচার' তাঁহাদের সম্প্রদায়ের এইরূপ রত্নাবলীর সমাচার

দিল না? শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গানে' বিন্দুমাত্র বৈশিষ্ট্য নাই। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র ইতিহাসে অনেক তথ্য আছে। বাঙ্গালায় 'ব্রেণলজী'র আবির্ভাব ও প্রচারের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া নরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর উপকার করিয়াছেন।

ভারতী।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের 'বহ্নি' নামক ছবিখানির সবুজ ও ধূসরের contrast রমণীয়। ইহাতে রঙ্গের চীৎকার নাই। রেখায় ভঙ্গীও সূচিত হইয়াছে, কিন্তু নারী-মূর্ত্তি দুইটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নহে। চোখের চাউনিতে ভারতীয়-চিত্রকলা-পদ্ধতি সুস্পষ্ট। 'ক্রমে ফুলে মধু আসে'। আশা করি, এ পদ্ধতিও অদূর ভবিষ্যতে স্বভাবের অনুগত ও মুদ্রাদোষের অতীত হইতে পারিবে। ইতিমধ্যেই অনেকের চিত্রে আমরা তাহার আভাস দেখিতেছি। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার গৌরবে' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—ত্রিপুরার 'ময়নামতীর গান' ও 'রাজমালা', 'বাঙ্গালা ভাষার আদি মৌলিক রচনা'। 'ত্রিপুরার পর্ব্বতেই * * বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণ উৎস প্রথম উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান বিপুল বঙ্গসাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।' লেখক বলেন,—'গোপীচাঁদ ত্রিপুরার মেহার-কুল পাটিকাড়ার রাজা ছিলেন। * * গোপীচাঁদের গানও ত্রিপুরার নিজস্ব রচনা। বঙ্গ-সাহিত্যে ত্রিপুরার প্রথম দান হইলেও ইহা সামান্য দান নহে। কারণ, এই দানের দ্বারা বঙ্গসাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য-সমাজে বরণীয় হইয়াছে। এই প্রথম ও শ্লাঘ্য দানের গৌরব ত্রিপুরা প্রাপ্ত হইলে ত্রিপুরার সাহিত্য-গৌরবও সামান্য হয় না।' শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'বুলবুলি' বাস্তবিকই উপভোগ্য। বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরস নাই বলিলেও চলে। পরোক্ষে যাঁহারা তাহার সংস্থান করিয়া যেন, তাঁহারা নিজগুণে আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন! নমুনা,—

'ওলো আমার বুলবুলি,
আজ কেন তুই এমন করে তুললি এ প্রাণ চুলবুলি!'

কবির বুলবুলি কি উত্তর দিয়াছিল, জানি না। কিন্তু বুলবুলির উকীল হইয়া অনায়াসে বলা যায়, নহিলে তোমাতে কবিতা-বিচুটীর এ লীলা ফুটিত কি?

'সরস করি শুক্‌নো প্রাণের নালা-ডোবা সব জুলি—'

প্রাণের নালা, প্রাণের ডোবা, প্রাণের 'জুলি' অর্থাৎ নয়ানজুলি! এমন নর্দ্দমা-ঘেঁষা উপমা গৌড়ের কাব্য-সাহিত্যেও অত্যন্ত বিরল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বুলবুলির প্রিয় খাদ্য 'পিড়িং' ও 'তেলাকুচো'র সমাবেশ থাকিলেই রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বেস্পতিবারের বারবেলা' নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি, ইহাতে শকার-বকারও বাদ যায় নাই। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল' নামক সুলিখিত রচনা হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম,—'গীতকবিতার জানা-শোনা-সাধা সুর ছাড়িয়া, আর-সকলে যখন নিত্যনূতন রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র্য লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত, অক্ষয়কুমার তখনো তাঁহার সেই গুরু-মন্ত্রের মত পুরাণো পরিচিত সুরের সাধনা লইয়াই তন্ময় হইয়াছিলেন। অতীতের সেই উপভোগ্য পুরাণো সুরে এমন-একটু মধুর রস ও সরল-শ্রী ছিল, একালকার অধিক-উন্নত কাব্যের মধ্যেও প্রায়ই যাহার অভাব মনে মনে অনুভব করা যায়। কিন্তু,

অতি-বড় নিন্দুকের পক্ষেও, অক্ষয়কুমারের কবিতা পড়িবার সময়ে এমন অভিযোগ করিবার সুযোগ কোনমতেই ঘটিয়া উঠিবে না। কারদানি দেখাইবার জন্য ভাবকে তিনি কখনো সৃষ্টিছাড়া শব্দের মুখোস পরাইয়া দেন নাই, বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য তিনি কখনো গম্ভীর রসের প্রগাঢ়তাকে চপল ও বাচাল ছন্দের চটুলতায় হালকা করিয়া তুলেন নাই, কেতাবী ভক্তি দেখাইবার জন্য তিনি কখনো যথার্থ ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া, অন্যান্য অনেক কবির মত একালের কৃত্রিম আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন হন নাই। এই-সব নানা কারণে তাঁহার কবিতা পড়িবার সময়ে কেমন-একটা মুক্তির আভাসে আমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। অক্ষয়কুমার আজ পরলোকে—তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে পুরণো-দিন-কার বাঙলা গীতি-কবিতার প্রীতিময়ী জীবন্ত স্মৃতিটুকুও নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে।' শ্রীগুরুদাস সরকারের 'শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য' উল্লেখযোগ্য—সুখপাঠ্য।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। শ্রাবণ।—শ্রীগোলাম মোস্তফা 'জেবুন্নেসার পার্শি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে' 'প্রেমের সাধনা'র অনুবাদ করিয়াছেন। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো' বটে, কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান পরের মুখে ঝাল খাইবেন কেন? মূল পারসী হইতে অনুবাদ করিবেন না কেন? শ্রীমোতাহার করমচাঁদ সংক্ষেপে দার্শনিক 'ইব্‌নেসিনা'র পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি, কোনও মুসলমান দার্শনিক ভবিষ্যতে ইঁহার দর্শনের বিস্তৃত পরিচয় দিবেন। শ্রীআব্‌দুল মুমিত চৌধুরীর 'কালু ডাকাত' নামক গল্পটি মন্দ নহে। শ্রীআব্‌দুল ওয়াহেদের 'আরবগণের বিজ্ঞানচর্চ্চা' ও শ্রী এ. কে. এম্. শামসুদ্দীনের 'চীনে ইসলাম' সুলিখিত নিবন্ধ। শ্রীকাজি নজরুল ইসলাম বঙ্গ-বাহিনীর এক জন হাবিলদার। ইনি করাচীর সেনানিবাসের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও মাতৃভাষাকে স্মরণ করিয়াছেন, মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্পগুলি পড়িয়াছেন, এবং তাহার অনুকরণে 'মুক্তি' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী সৈনিক-শিবিরে যে ভাষার সাধনা করিতেছেন, সে ভাষার আশা করিব না?—অনুকরণ সম্পূর্ণ সফল হইলেও অনুকরণ। এ অনুকরণ সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না। কিন্তু এক জন নব-ব্রতী মুসলমান রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ও ভাষার এতটা সন্নিহিত হইয়াছেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। শ্রী এম্. আব্‌দুল জব্বরের 'নওয়াব আব্‌দুল লতীফ ও মুসলমান শিক্ষা-বিস্তার' তথ্যে সমৃদ্ধ, সুলিখিত সন্দর্ভ।—'কোরকে' কতকগুলি কবিতা আছে। মুসলমান কবিরা বাঙ্গালী নব্য-কবিদের কাব্যের কুপ্রভাব ও মুদ্রাদোষ হইতে মুক্ত থাকিবার চেষ্টা করুন। শিশু মসলেম-সাহিত্যেও সুকবির আদর্শ অল্প নহে। তাহাই তাঁহাদের উপজীব্য হউক।—চাঁদিমা-শোণিমা-জ্যোছনাময়ী মামুলী কাব্যিকে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে কবিমাত্রই যদি বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য দরিদ্র হইবে না, বরং সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

অতিথিগ্ব দিবোদাস।

বৈদিক যুগে অতিথিগ্ব দিবোদাস নামে এক নরপতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির ঋক হইতে জানা যায়, তিনি পূরু-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। (১) তাঁহার পিতার নাম বধ্র্যশ্ব ছিল, ইহা ভরদ্বাজ ঋষি-রচিত এক ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) সম্ভবতঃ হবির্দাতা বধ্র্যশ্ব সরস্বতীতীরে বাস করিতেন; এই জন্য সরস্বতী তাঁহাকে ঋণমোচনকারী, বলবান দিবোদাস-রূপ পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছিলেন, ভরদ্বাজের ঋকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন বলিয়া, বোধ হয়, অতিথিগ্ব উপাধি প্রাপ্ত হন। পর্ণয়, করঞ্জ, বর্চি ও শম্বর নামক দস্যুজাতীয় রাজার পুর তিনি জয় করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শম্বর দাসের ৯৯ পুরের জয় বৈদিক কালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিগণ শম্বর-জয়ের যশোগানে ঋগ্বেদ মুখরিত করিয়াছেন। ভরদ্বাজ (৩) ও তাঁহার পুত্র গর্গ (৪), বশিষ্ঠ (৫), বিশ্বামিত্র (৬), গৃৎসমদ (৭), বামদেব (৮), কুৎস (৯) প্রভৃতি

---

(১) ভিনৎ। পুরঃ। নবতিং। ইন্দ্র। পূরবে। দিবোদাসায়।—১।১৩০।৭

হে ইন্দ্র! পূরুবংশীয় দিবোদাসের নিমিত্ত নবতিসংখ্যক পুর ভগ্ন করিয়াছ। [দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির রচিত।]

(২) ইয়ং। অদদাৎ। রভসাং। ঋণচ্যুতম্। দিবোদাসম্। বধ্র্যশ্বায়। দাশুষে॥—৬।৬১।১

ইনি (অর্থাৎ সরস্বতী নদী) হবির্দাতা বধ্র্যশ্বকে বলবান, ঋণমোচনকারী দিবোদাসকে দান করিয়াছেন।

* ১।৫৩।৮, ২।১৪।৬, ৭।৯৯।৫, ১০।৪৮।৮

(৩) যস্য। ত্যৎ। শম্বরং। মদে। দিবোদাসায়। রন্ধয়ঃ।

অয়ং। সঃ। সোমঃ। ইন্দ্র। তে। সুতঃ। পিব॥—৬।৪৩।১

(৪) পুরূণি। যঃ। চ্যৌত্না। শম্বরস্য। বি। নবতিং। নব। দেহ্যঃ। হন্॥—৬।৪৭।২

যিনি শম্বরের অনেক বল ও ৯৯ পুরী নষ্ট করিয়াছেন।

(৫) ইন্দ্রাবিষ্ণূ। দৃংহিতাঃ। শম্বরস্য। নব। পুরঃ। নবতিং। চ। শ্নথিষ্টম্।

শতং। বর্চিনঃ। সহস্রং। চ। সাকম্। হথঃ। অপ্রতি। অসুরস্য। বীরান্॥

—৭।৯৯।৫

(৬) যে। ত্বা। অহিহত্যে। মঘবন্। অবর্ধন্। যে। শাম্বরে।—৩।৪৭।৪

(৭) দিবোদাসায়। নবতিং। চ। নব। ইন্দ্রঃ। পুরঃ। বি। ঐরৎ। শম্বরস্য।—২।১৯।৬

(৮) অহম্। পুরঃ। মন্দসানঃ। বি। ঐরম্। নব। সাকম্। নবতীঃ। শম্বরস্য।

শততমং। বেশ্যং। সর্বতাতা। দিবোদাসম্। অতিথিগ্বং। যৎ। আবম্।—৪।২৬।৩

(৯) যাভিঃ। মহাং। অতিথিগ্বং। কশোজুবম্। দিবোদাসং। শম্বরহত্যে। আবতম্।

—১।১১২।১৪

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঋষিগণ শম্বর-বিজয়ের উল্লেখ করিয়া ঋক্ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি ঋক্ হইতে জানা যায় যে, ভরদ্বাজ, অথর্ব্ব তৎপুত্র দধীচি ও ভরত ঋষি দিবোদাসের একটী যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন (১)। উদ্ধৃত ঋক্‌গুলির প্রতি পাঠকদিগকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে বলি। দেখা যাইতেছে, এই ঋক্‌গুলি একই সূক্তের অন্তর্গত। তাহা হইলে কোনও একটী যজ্ঞের জন্য যে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে না। এই সূক্তটী যে ভরদ্বাজ ঋষির বিরচিত, তাহার প্রমাণ ৫ম ঋকে বর্ত্তমান। চতুর্থ ঋকে ভরদ্বাজ বলিতেছেন :— 'ত্বাং। ঈড়ে। অধ। দ্বিতা। ভরতঃ। বাজিভিঃ শুনম্' ॥—'অনন্তর দুই ভাগে বিভক্ত তোমাকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) ভরত হবিঃ-রূপ অন্ন দ্বারা সুখে স্তব করিয়াছেন।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই যজ্ঞে ভরত ঋষি উপস্থিত ছিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন, একটী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সাত জন হোতার আবশ্যক হইত। এই সাত জনের মধ্যে চার জন প্রধান। তাঁহাদিগকে অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা বলা হইত। ভরত ঋষি কুশিক-বংশ-জাত এক জন প্রসিদ্ধ ঋষি। সায়ণের মতে, ভরত দুষ্মন্তের পুত্র। ঋগ্বেদে দুষ্মন্তের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু ভরত ঋষির নাম আছে। এই যজ্ঞে দিবোদাস সোমাভিষবকারী ও ভরদ্বাজ হবির্দাতা হইয়াছিলেন,৫ম ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩শ ও ১৪শ ঋকে অথর্ব্বা ও তাঁহার পুত্র দধীচির নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই যজ্ঞে অথর্ব্বা অগ্নি মন্থন করেন, এবং দধীচি অগ্নিবেদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, বর্ণিত হইয়াছে। অতএব কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না যে, দিবোদাসের যজ্ঞে এই

---

(১) ত্বং। ইমা। বার্য্যা। পুরু। দিবোদাসায়। সুন্বতে।

ভরদ্বাজায়। দাশুষে ॥—৬।১৬।৫

(হে অগ্নে!) তুমি এই সকল বরণীয় (ধন) সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে, হবির্দাতা ভরদ্বাজকে (দান কর)।

ত্বাং। অগ্নে। পুষ্করাৎ। অধি। অথর্ব্বা। নিঃ। অমন্থত॥

মূর্দ্ধ্নঃ। বিশ্বস্য। বাঘতঃ ॥—৬।১৬।১৩

হে অগ্নে! সকল বাহনের মস্তকস্বরূপ পুষ্কর হইতে তোমাকে অথর্ব্বা মন্থন করিয়াছেন।

তং। উঁ। ত্বা। দধ্যঙ্। ঋষিঃ। পুত্রঃ। ঈধে। অথর্ব্বণঃ। বৃত্রহনং। পুরন্দরম্।—৬।১৬।১৪

অথর্ব্বার পুত্র দধীচি ঋষি বৃত্রহন্তা, পুরবিদারণকারী সেই তোমাকে প্রজ্বালিত করিয়াছেন।

আ। অগ্নিঃ। অগামি। ভারতঃ। বৃত্রহা। পুরুচেতনঃ।

দিবোদাসস্য। সৎপতিঃ ॥—৬।১৬।১৯

বৃত্রহননকারী, সর্ব্বজ্ঞ, সৎপতি দিবোদাসের ভারত অগ্নি আসিয়াছেন।

সকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন না। যদ্যপি ইহাতেও কাহারও সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয়, তবে আমরা ভরদ্বাজ-পুত্র গর্গের রচনা নিম্নে উদ্ধার করিয়া আমাদের মতের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছি। (১) ২২শ ও ২৩শ ঋকে অতিথিগ্ব দিবোদাসের নাম রহিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে শাম্বর ধন ও দশটী হিরণ্যপিণ্ড ঋষি যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ২৪শ ঋকে ভরদ্বাজ-পুত্র পায়ু ও অথর্ব-বংশীয় ঋষিগণ একত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া দশ রথ ও শত গো প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। অতএব ভরদ্বাজবংশীয় ঋষিগণ অথর্ব-বংশীয় ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করিতেন, ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এই যজ্ঞ শম্বর-জয়ের পর সাধিত হয়, দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত দিবোদাসের যজ্ঞে অথর্বা, দধীচি ও ভরত যে ভরদ্বাজের সহিত মিলিত হইয়া দিবোদাসের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার অবসর থাকে না। আমরা দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত ঋকের প্রতিও পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাঠক দেখুন, ঋষি বলিতেছেন যে, তাঁহার জন্মের কথা দধীচি, প্রাচীন অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি ও মনু অবগত ছিলেন। (২) তিনি শম্বর-জয়ের ঋক্‌ও রচনা করিয়া-

---

(১) দিবোদাসাৎ। অতিথিগ্বস্য। রাধঃ।
শাম্বরং। বসু। প্রতি। অগ্রভীষ্ম॥—৬।৪৭।২২
দশ। অশ্বান্। দশ। কোশান্। দশ। বস্ত্রা। অধি। ভোজনা।
দশো। হিরণ্যপিণ্ডান্। দিবোদাসাৎ। অসানিষম্॥—ঐ ২৩।
দশ। রথান্। প্রষ্টিমতঃ। শতং। গাঃ। অথর্বভ্যঃ।
অশ্বথঃ। পায়বে। অদাৎ॥—৬।৪৭।২৪

অতিথিগ্বের অন্ন (ও) শম্বর-সম্বন্ধীয় ধন দিবোদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ২২

দশ অশ্ব, দশ কোশ, দশ বস্ত্র ভোজন দক্ষিণা। দিবোদাস হইতে দশ হিরণ্যপিণ্ড লাভ করিয়াছি। ২৩

প্রষ্টিযুক্ত দশ রথ, শত গো অথর্বদিগকে (ও) (ভরদ্বাজ-পুত্র) পায়ুকে অশ্বথ দিয়াছে। ২৪

(২) দধ্যঙ্। হ। মে। জনুষং। পূর্বঃ। অঙ্গিরাঃ। প্রিয়মেধঃ। কণ্বঃ।
অত্রিঃ। মনুঃ। বিদুঃ। তে। মে। পূর্বে। মনুঃ। বিদুঃ।
তেষাং। দেবেষু। আযতিঃ। অস্মাকম্। তেষু। নাভয়ঃ।
তেষাং। পদেন। মহি। আ। নমে। গিরা। ইন্দ্রাগ্নী। আনমে। গিরা॥—১।১৩৯।৯

দধীচি, প্রাচীন অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি, মনু আমার জন্ম জানিতেন; তাঁহারা (ও) মনু আমার পিতা পিতামহকে জানিতেন। দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ; তাঁহাদিগের

ছিলেন। (১) অতএব কেহ আর সন্দেহ করিতে পারেন না যে,দিবোদাসের যজ্ঞে দধীচি ও তাঁহার পিতা অথর্ব ঋষির উপস্থিতি অসম্ভব ছিল। সায়ণ যে ভাবে ঐ সকল ঋকের অর্থ করিয়াছেন, কোনরূপে তাহার সমর্থন করা যায় না। যে সকল ঘটনা সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লোকে চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। ঐ সকল ঘটনা যে ইহলোকে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঋষিগণ ভুলিয়া গিয়া উহাদিগকে স্বর্গলোকের ব্যাপার-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই রূপে এক কালের ঘটনা পরবর্ত্তী কালে দেবকীর্ত্তিরূপে উপাখ্যানে পরিণত হয়। বৈদিক কালে এই পরিবর্ত্তন সত্বর সাধিত হইত। বৈদিক যুগে কোনও বীর যুদ্ধে জয় লাভ করিলে, সে কালের লোকে বিশ্বাস করিতেন, বিজয়ী বীরের হোতাদিগের আহ্বান ইন্দ্র, বরুণ ও মরুৎগণ সত্যই শ্রবণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে।

শম্বর-জয়ের সম্বন্ধে আরও কি কি তথ্য ঋগ্বেদ হইতে প্রাপ্ত হই, এক্ষণে আমরা তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পরুচ্ছেপ ঋষি শম্বরের ৯০ পুর জয়ের কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য ঋষি ৯৯ পুর জয়ের উল্লেখ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শম্বর পর্ব্বতে লুকায়িত থাকে। তাহাকে চল্লিশ বৎসর পরে বাহির করিয়া সংহার করা হইয়াছিল, কোনও কোনও ঋষি ইহাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। (২) শম্বর-হত্যা-কালে দিবোদাসও জলমগ্ন

মধ্যে আমাদিগের যাজি সকল; তাঁহাদিগের মহৎ পদে স্তুতি দ্বারা নমস্কার করি; ইন্দ্রাগ্নিকে স্তুতি দ্বারা নমস্কার করি।

(১) ভিনৎ। পুরঃ। নবতিং। ইন্দ্র। পূরবে। দিবোদাসায়।
মহি। দাশুষে। নৃতো। বজ্রেণ। দাশুষে। নৃতো।
অতিথিগ্বায়। শম্বরং। গিরেঃ। উগ্রঃ। অব। অভরৎ।
মহঃ। ধনানি। দয়মানঃ। ওজসা। বিশ্বা। ধনানি। ওজসা॥—১।১৩০।৭

হে ইন্দ্র! পুরুবংশীয় দিবোদাসের নিমিত্ত, হে নর্ত্তনকারি! মহৎ দাতা (দিবোদাসের) নিমিত্ত, হে নর্ত্তনকারি! দাতা দিবোদাসের নিমিত্ত বজ্র দ্বারা নবতিসংখ্যক পুর ভগ্ন করিয়াছ; উগ্র (ইন্দ্র) অতিথিগ্বকে শক্তি দ্বারা মহৎ ধন সকল, শক্তি দ্বারা বিশ্বধন সকল দান করিতে করিতে শম্বরকে গিরি হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

(২) যঃ। শম্বরং। পর্বতেষু। ক্ষিয়ন্তং। চত্বারিংশ্যাম্। শরদি। অন্ববিন্দৎ॥—২।১২।১১

গিরি (অর্থাৎ ইন্দ্র) পর্ব্বতে লুকায়িত হইয়া অবস্থিত শম্বরকে ৪০ বৎসর শেষে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [গৃৎসমদ-ঋষি-রচিত।]

হইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন, অঙ্গিরার পুত্র কুৎস-ঋষি-রচিত ঋকে তাহা দেখিতে পাই। (১) শম্বর যে দেশে বাস করিত, তাহার নাম উদব্রজ, ইহা ভরদ্বাজ-পুত্র গর্গের রচিত ঋক্ হইতে জানা যায়। (২) শম্বরের প্রজাগণ 'অশ্মন্ময়ী' নামে অভিহিত হইয়াছে। (৩) ইহা হইতে মনে হয়, এই জাতি প্রস্তর দ্বারা পুরী ও অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিত।

বোধ হয়, আমরা পাঠকের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, দিবোদাস বৈদিক যুগের এক জন বীরপুরুষ ছিলেন ; এবং শম্বর নামক দাস এই পৃথিবীতেই বাস করিত। এই দাসের ইহলোকের রাজ্যই দিবোদাস জয় করেন। এক্ষণে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, শম্বর দাসের রাজ্য 'উদব্রজ' নামক দেশ কোথায় ছিল ?—ভারতের মধ্যে, না বাহিরে ? আমরা অনুমান করি, আরাবল্লী পর্ব্বতের নিকটস্থ ও আজমীরের অন্তর্গত শম্বর হ্রদই এই বেদ-প্রসিদ্ধ শম্বর দাসের নামে এখনও পরিচিত, এবং ঐ দেশকেই বৈদিক যুগে উদব্রজ বলা হইত। এই দেশে বহু হ্রদ বিদ্যমান আছে বলিয়া, মনে হয়, উহা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার উত্তরে মৎস্য দেশ, এবং তাহারও উত্তরে যমুনাতীরে মথুরা। যে দেশের মধ্যে মথুরা ও বৃন্দাবন অবস্থিত, তাহা প্রাচীন কাল হইতে ব্রজ নামে প্রসিদ্ধ। (৪) বৈদিক যুগে যমুনা-তীরের গো বিখ্যাত ছিল। বোধ হয়, এই জন্যই ঐ দেশকে ব্রজ বলা হইত। মহাভারতের কালে আমরা এই দেশকে যদুবংশীয়দিগের বাস-স্থান-রূপে দেখিতে পাই। কৃষ্ণপ্রমুখ অনেক যাদব জরাসন্ধের ভয়ে এই দেশ হইতে পলায়ন করিয়া দ্বারকায় রাজ্যস্থাপন করেন।

অব। গিরেঃ। দাসম্। শম্বরং। হন্।
প্র। আবঃ। দিবোদাসম্। চিত্রাভিঃ। ঊতী।—৬।২৬।৫

গিরি হইতে দাস শম্বরকে (বাহির করিয়া) সংহার করিয়াছেন ; দিবোদাসকে বিবিধ রক্ষা দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। [ভরদ্বাজ-ঋষি-রচিত।]

(১) শম্বর-হত্যা-কালে যে সকল (রক্ষার) দ্বারা জলমগ্ন মহান্ অতিথিগ্ব দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছিলে।—১।১১২।১৪ [পূর্ব্বে ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

(২) অহন্। দাসা। বৃষভঃ। বস্নয়ন্তা। উদব্রজে। বর্চিনং। শম্বরং। চ।

বৃষভ (ইন্দ্র) উদব্রজে বাসকারী বর্চি ও শম্বর (নামক) দাসদ্বয়কে বধ করিয়াছেন।

(৩) শতং। অশ্মন্ময়ীনাং। পুরাং। ইন্দ্রঃ। বি। আস্যৎ। দিবোদাসায়। দাশুষে।
—৪।৩০।২০

পাষাণময়ীদিগের শত পুর ইন্দ্র হবির্দাতা দিবোদাসকে প্রদান করিয়াছেন। [বামদেব-রচিত।]

(৪) ঋগ্বেদ—৪।৫৩।১৭

এক্ষণে দেখা যাউক্, ঋগ্বেদে আমাদের মতের সমর্থক কিছু পাওয়া যায় কি না। তুর্বশ ও যদু এই দুই নাম আমরা ঋগ্বেদের নানা স্থানে দেখিতে পাই। অগস্ত্য ও ভরদ্বাজ ঋষিদ্বয়ের ঋকে যদু ও তুর্বশ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) বামদেব ঋষির মতে, তুর্বশ ও যদু অনভিষিক্ত রাজা ছিলেন। (২) অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষির রচিত ঋক্ হইতে জানা যায়, যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু, এই পাঁচটী প্রধান আর্য্য সম্প্রদায় ছিল। ইহারা ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসক ছিল। (৩) বোধ হয়, এই সকল নামে ইহাদের রাজাদিগকেও বুঝাইত।

ভরদ্বাজ ঋষি একটী সূক্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্র দেববানের পুত্রকে বৃচীবানের রাজ্য ও সৃঞ্জয়কে তুর্বশ প্রদান করিয়াছিলেন। (৪) ইহার সরল অর্থ এই যে, দেববানের পুত্র বৃচীবানদিগের, এবং সৃঞ্জয় তুর্বশদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। আমরা 'সুদাস' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সুদাসের পিতা পিজবন দেববানের পুত্র। অতএব, ভরদ্বাজ ঋষি যে দেববানের পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সুদাসের পিতা পিজবন। ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ এক সৃঞ্জয়-পুত্রের যজ্ঞ করেন, এবং সেই যজ্ঞে দান গ্রহণ করেন। অতএব, এই দুই সঞ্জয় যে এক, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ভরদ্বাজ ও গর্গ ঋষি যে পিজবন ও সৃঞ্জয়ের সমসাময়িক, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হইল। সুদাস প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে যে, তিনি যমুনাতীরে দশ জন অযাজ্ঞিক রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে অজ, শিগ্রু ও যক্ষুগণ যে তাঁহার সহায়তা করে, তাহা বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন। (৫) তিনি আর এক ঋকে তুর্বশকে যক্ষু ও মৎস্যদিগের অগ্রণী বলিয়াছেন। (৬) ইহাতে যক্ষুগণ যে মৎস্য দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ঋগ্বেদের

---

(১) প্র। যৎ। সমুদ্রং। অতি। শূর। পর্ষি।
পারয়। তুর্বশং। যদুং। স্বস্তি ॥—১।১৭৪।৯ (অগস্ত্য); ৬।২০।১২ (ভরদ্বাজ)

হে শূর (ইন্দ্র)! যখন সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া (উদক) বিস্তৃত হইল, (তখন) তুর্বশ ও যদুকে সুমঙ্গলে পার করিয়াছিলে।

(২) উত। ত্যা। তুর্বশাযদূ। অস্নাতারা। শচীপতিঃ।
ইন্দ্রঃ। বিদ্বান্। অপারয়ৎ ॥—৪।৩০।১৭

শচীপতি, বিদ্বান, ইন্দ্র সেই অনভিষিক্ত তুর্বশ যদুকে পার করিয়াছিলেন।

(৩) যৎ। ইন্দ্রাগ্নী। যদুষু। তুর্বশেষু। যৎ। দ্রুহ্যষু। অনুষু। পূরুষু। স্থঃ।
অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ। সোমস্য। পিবতং। সুতং ॥—১।১০৮।৮

(৪) ৬।২৭।৭ (৫) ৭।১৮।১৯ (৬) ৭।১৮।৬

সর্ব্বত্র তুর্বশ ও যদু নাম যুক্ত হইয়া বর্ত্তমান। অতএব তুর্বশের মৎস্য দেশে বাস সত্য হইলে, যদুদিগের বাস তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। যমুনাতীরে যদুদিগের বাস ছিল, মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। এই নিবাস ঋগ্বেদের যুগেই যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অঙ্গিরার পুত্র অম্বরীষ ঋষি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র দিবোদাসকে প্রথমে শম্বরের পুর ও পরে তুর্বশ ও যদুদিগের রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। (১) সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ ঋষি একটী যজ্ঞে তুর্বশ যদুদিগকে অতিথিগ্বের অধীনে আনিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। (২) ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র সৃঞ্জয়কে তুর্বশ প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র গর্গ শম্বর-জয়ের পর দিবোদাস ও সৃঞ্জয়-পুত্রের যজ্ঞ করেন। ইহা হইতে অনুমান করি, সৃঞ্জয়ের মৃত্যুর পর তুর্বশগণ বল সংগ্রহ করিয়া সৃঞ্জয়-পুত্রের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করে। তখন সৃঞ্জয়-পুত্র দিবোদাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুদাসের পিতা ও সৃঞ্জয়ের জয় একত্র উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে মিত্রতার অনুমান করি। সম্ভবতঃ এই কারণে মৎস্যদিগের অগ্রণী তুর্বশ ও আয়ুর পুত্র, দ্রুহ্যু, পূরু ও ভৃগুদিগের সহিত মিলিত হইয়া সুদাসের রাজ্য আক্রমণ করে, এবং পরুষ্ণী নদীর কূল ভেদ করিয়া দেয়। (৩) এই যুদ্ধে কিন্তু তৃৎসু সুদাস আয়ুর রাজ্য জয় করেন। (৪) দ্রুহ্যু ও ভৃগু জলমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (৫)

---

(১) পুরঃ। সত্যাঃ। ইৎথা। ধিয়ে। দিবোদাসায়। শম্বরম্।
অধ। ত্যং। তুর্বশং। যদুম্॥—৯।৬১।২

সত্যবর্ম্মা দিবোদাসকে সত্য শম্বরের পুর, অনন্তর সেই তুর্বশ যদুকে (দিয়াছিলেন)।

(২) নি। তুর্বশং। নি। যাদ্বং। শিশীহি
অতিথিগ্বায়ে। শংস্যং। করিষ্যন্।—৭।১৯।৮

অতিথিগ্বকে যশস্বী (বা সুখী) করিতে তুর্বশ ও যদুদিগকে বশে আনয়ন কর।

(৩) ৭।১৮।৬

(৪) বি। আনবস্য। তৃৎসবে। গয়ং। ভাক্।
জেষ্ম। পূরুং। বিদথে। মৃধ্রবাচম্।—৭।১৮।১৩

আয়ুর পুত্রের গৃহ (বা রাজ্য) তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দেন। যুদ্ধে মৃধ্রবাচ পূরুকে জয় করিব।

(৫) ৭।১৮।১২

সিম। পুরু। নৃষূতঃ। অসি। আনবে। অসি। প্রশর্ধ। তুর্বশে।—৮।৪।১

হে শ্রেষ্ঠ (ইন্দ্র)! আয়ুর পুত্রের নিমিত্ত নেতাদিগের বহু অভিষুত (সোম) তোমাকে আনয়ন করুক; হে প্রশর্ধ! তুর্বশের জন্য (আনীত) হও।

কণ্ব-গোত্র দেবাতিথি একটী সূক্তে এই আসুর পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় দেখিতে পাই, আসুর পুত্র তুর্বশ ও যদুদিগের মধ্যে বাস করেন। আমরা মনে করি, দিবোদাস পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধে তুর্বশদিগের বিরুদ্ধে সুদাসের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মিলনের ফলে দিবোদাস তুর্বশ যদুদিগকে জয় করেন। এই জয়ের সংবাদ অমহীয়ু ও বসিষ্ঠ ঋষির ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বসিষ্ঠ ঋষির আর এক সূক্তেও আমাদিগের মত সমর্থিত হয়, দেখান যাইতেছে।

রাজা সুদাসের বিজয়-উৎসব-যজ্ঞে বসিষ্ঠ ঋষি যে সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শম্বর-জয়ের উল্লেখ ও সুদাসের পিতাকে দিবোদাসের মত রক্ষা করিবার প্রার্থনা রহিয়াছে। (১) ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, দিবোদাস ও পিজবন রাজার মধ্যে মিত্রতা ছিল। পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধ শম্বর-জয়ের পর ঘটিয়াছিল, তাহাও শম্বর-জয়ের উল্লেখ দ্বারা জানা যাইতেছে। অতএব, দিবো-দাসের তুর্বশ-যদু-জয় যে এই সময়ে সাধিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমরা এই প্রবন্ধে অতিথিগ্ব দিবোদাসের শম্বর-জয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয় সপ্রমাণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছি যে, ভরদ্বাজ, অথর্ব, বসিষ্ঠ, ভরত, কণ্ব, মনু প্রভৃতি ঋষিগণ একই কালে জীবিত ছিলেন। আরও অবগত হওয়া যায়, যমুনাতীরে ব্রজ ও তাহার দক্ষিণে মৎস্য দেশ, এবং তাহার দক্ষিণে উদব্রজ নামক দেশ বর্ত্তমান ছিল। দিবোদাস উদব্রজ

হে। বৃষ্ণঃ। অভিচক্ষ্যং। কৃতং।
পশ্যেম। তুর্বশং। যদুং॥—৮।৪।৭

কামনাপূর্ণকারী তোমার কৃত কার্য্য কীর্ত্তনীয়; তুর্বশ যদুতে (আমরা তোমার কীর্ত্তি) দেখিলাম।

ভুরং। রাধঃ। শত অশ্বং। কুরুঙ্গস্য। দিবিষ্টিষু। রাজ্ঞঃ।
ত্বেষস্য। সুভগস্য। রাতিষু। তুর্বশেষু। অমনমহি॥—৮।৪।১৯

স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু দান সকলের মধ্যে দীপ্ত ও শোভন-ধন-যুক্ত রাজা কুরুঙ্গের প্রভূত ধন, শত অশ্ব তুর্বশদিগের মধ্যে লাভ করিয়াছি।

(১) অব। স্থনা। বৃহতঃ। শম্বরং। ভেৎ॥—৭।১৮।২০

স্বয়ং বৃহৎ (শৈল) হইতে শম্বরকে বধ করিয়াছ।

ইমম্। নরঃ। মরুত। সশ্চত। অনু। দিবোদাসম্। ন। পিতরং। সুদাসঃ॥—৭।১৮।২৫

হে নেতা মরুৎগণ! সুদাসের পিতাকে দিবোদাসের মত রক্ষা কর।

জয় করিয়া আর্য্যশক্তির বিস্তার করেন। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে তুর্বশ ও যদুগণ যমুনাতীরে এবং মৎস্য দেশে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। সরস্বতীতীরে পুরুবংশীয়গণ বাস করিতেন। (১) তাঁহারা তুর্বশ যদুদিগকে, এবং শম্বর ও অর্বুদ দাসকে জয় করিয়া সাম্রাজ্যস্থাপন করেন।

আবু পর্ব্বতের নাম অর্বুদ। ইহাকে টড রাজস্থানের অলিম্পাস বলিয়াছেন। (২) অর্বুদ নাম আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। গৃৎসমদের ঋকে বর্ণিত আছে, ইহাকে ইন্দ্র ত্রিতের জন্য বধ করেন। (৩) কণ্ব-গোত্র মেধাতিথি ঋষির স্তোত্রেও অর্বুদ-বধের উল্লেখ আছে। (৪) সায়ন এ স্থলে অর্বুদ অর্থে মেঘ করিয়াছেন। গৃৎসমদ ঋষি একটী স্তোত্রে উরণ, অর্বুদ প্রভৃতি বধের উল্লেখ করিয়াছেন। (৫) আমরা মনে করি, ইহারা কোন ভীল জাতীয় লোক ছিল।

দিবোদাস শম্বর জয় করিলে পর, আর্য্যশক্তি বর্ত্তমান রাজপুতানায় যে আরও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা অর্বুদ, উরণ ও বাহুদিগের জয় নির্দ্দেশ

---

(১) উৎ। যৎ। তে। মহিনা। শুভ্রে। অন্ধসী। অধিক্ষিয়ন্তি। পূরবঃ।—৭।৯৬।২
হে শুভ্রে (সরস্বতি)। তোমার মহিমা দ্বারা পুরুগণ (তোমার) উভয় তীরে নিবাস করিতেছে। [বসিষ্ঠ ঋষি।]

(২) The celebrated Aboo, or Arboodha, the Olympus of Rajasthan, was the scene of contention between the ministers of Soorya and these Titans.—*Tod's Rajasthan, P. 76.*

(৩) অস্য। সুবানস্য। মন্দিনঃ। ত্রিতস্য।
নি। অর্বুদম্। বাবৃধানঃ। অস্তঃ।—২।১১।২০
এই সোমবান ত্রিতের (সোমপানে) মত্ত (ও) বর্দ্ধিত (ইন্দ্র) অর্বুদকে সংহার করিয়াছেন।

(৪) নি। অর্বুদস্য। বিষ্টপং। বর্ষ্মাণং। বৃহতঃ। তির।
কৃষে। তৎ। ইন্দ্র। পৌংস্যম্।—৮।৩২।৩
হে ইন্দ্র! বৃহৎ অর্বুদের শরীর ও বাসস্থান বিদ্ধ করিয়াছ, সেই বীরকর্ম্ম করিয়াছ।

(৫) অধ্বর্যবঃ। যঃ। উরণম্। জঘান। নব। চখ্বাংসং। নবতিং। চ। বাহূন্।
যঃ। অর্বুদং। অব। নীচা। ববাধে। তং। ইন্দ্রং। সোমস্য। ভৃথে। হিনোত।
—২।১৪।৪
হে অধ্বর্য্যুগণ! যিনি উরণকে, ৯৯ চরম্বাংস বাহুদিগকে বধ করিয়াছেন, যিনি অর্বুদকে অধোমুখ করিয়া বধ করিয়াছেন; সেই ইন্দ্রকে সোমপূর্ণ করিবার জন্য স্তোত্র দ্বারা প্রীত কর।

সৈন্ধব সৌবর্চ্চল......সামুদ্ররোমকৌদ্ভিদৌষর......লবণবর্গ।—চরক, বিমান-স্থান, ৮।১১৮
সৈন্ধব সৌবর্চ্চল বিড় পাক্য রোমক সামুদ্রক......লবণ-বর্গ। সুশ্রুত; সূত্র-স্থান। ৪২।১৭।
রোমক = শাম্ভরী।

করিতেছে। আমরা অনুমান করি, অর্বুদ দাস আবু পর্ব্বতে বাস করিত। এখনও সেই জন্য ঐ পর্ব্বত অর্বুদ দাসের নাম ধারণ করিয়া আর্য্য-বিজয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাঁওতাল জাতিদিগের মধ্যে যে উরাঁও নামে এক জাতি আছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহারাই বেদে উরণ নামে অভিহিত। ইহারা কোন্ পর্ব্বতে বাস করিত, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ঐ সকল জাতির সহিত আর্য্যগণ যে যুদ্ধ করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

চরক ও সুশ্রুতে রৌমক বা রোমক লবণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শম্বর হ্রদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শাম্ভরী নামে খ্যাত। রোমক নাম কেন ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ জানা নাই। ঋগ্বেদে আমরা কণ্ব-গোত্রীয় দেবাতিথি ঋষির ঋক্ হইতে জানিতেছি যে, সে কালে রুম নামে এক দেশ ছিল। (১) ঐ দেশে প্রাপ্ত বলিয়া লবণের নাম রৌমক হইয়াছে, মনে করি। তাহা হইলে, বৈদিক যুগে শম্বর হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানকে রুম নাম প্রদান করা হইয়াছিল। ইহাতেও দেখা যাইতেছে, রাজপুতানা বৈদিক যুগেই আর্য্য জাতির রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে কণ্ব-গোত্র সোভরি নামক এক ঋষির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার রচিত একটী ঋকে দিবোদাসের অগ্নির উল্লেখ আছে। (২) তিনি পুরুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুর, এবং তৎপুত্র তৃক্ষির যজ্ঞ করেন। (৩) ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সোভরি ঋষিও ত্রসদস্যু দিবোদাসের সমসাময়িক ছিলেন। অপর এক প্রবন্ধে পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যুর কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

দিবোদাসের দুই পুত্রের নাম ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। এক জনের নাম

---

(১) যৎ। বা। রুমে। রুশমে। শ্যাবকে। কৃপে। ইন্দ্র। মাদয়সে। সচা।—৮।৪।২

হে ইন্দ্র! যদ্যপি রুম, রুশম, শ্যাব ও কৃপ (রাজ্যে) তুমি মত্ত হও।

(২) প্র। দৈবঃ দাসঃ। অগ্নিঃ। দেবান্। অচ্ছ। ন। মজ্মনা।—৮।১০৩।২

বল দ্বারা (জাত) দিবোদাসের অগ্নি দেবদিগের নিকট (গমন) করেন নাই।

(৩) অদাৎ। মে। পৌরুকুৎস্যঃ। পঞ্চাশতম্। ত্রসদস্যুঃ। বধূনাম্।—৮।১৯।৩৬

পুরুকুৎস্যের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে ৫০টী বধূ দিয়াছেন।

যেভিঃ। তৃক্ষিং। বৃষণা। ত্রাসদস্যবম্।
মহে। ক্ষত্রায়। জিন্বথঃ।—৮।২২।৭

হে বৃষদ্বয়! ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষিকে মহৎ বলের নিমিত্ত যাহাদের দ্বারা প্রীত কর।

পরুচ্ছেপ ঋষি, এবং অপরের নাম ইন্দ্রোত। (১) পরুচ্ছেপ ঋষির নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ১ম মণ্ডলের ১২৭ হইতে ১৩৯ ঋক রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

স্থাপত্য শিল্প।

৯

সৌধকে শুদ্ধ বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশক হিসাবে নির্ম্মিত করিলে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এগুলিকে কোনও গভীরার্থ-জ্ঞাপক ভাবে কল্পনা করা উচিত। শব্দের যেমন অভিধা শক্তি বা লক্ষণা শক্তি দ্বারা সমস্ত তাৎপর্য্যের প্রতীতি হয় না, ইহার জন্য যেমন ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োজন, তেমনই সৌধের বিভিন্ন অঙ্গগুলির যোজনা করিলেই ইহার লক্ষ্যে পঁহুছান যায় না; স্থূলতঃ ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে, স্বীকার করি, কিন্তু যে সূক্ষ্মার্থ স্থাপত্যের ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে বোধগম্য হয়, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সৌধের অভিধা ও লক্ষণাশক্তির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা বাস করিবার বাটী, সমাধি-হর্ম্ম্য, দেবালয়, বা মন্ত্রণাগার; কিন্তু কোন শক্তির সাহায্যে মানুষ বলিবে—

'———মহাকাল পদতলে,
মুগ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধমুখে রাত্রি দিন বলে।
কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে।'

---

(১) ষট্। অশ্বান্। অতিথিগ্বে। ইন্দ্রোতে। বধূমতঃ।
সচা। পূতক্রতৌ। সনম্।—৮।৫৭।১৭

পূতক্রতু অতিথিগ্ব-পুত্র ইন্দ্রোত হইতে বধূযুক্ত ছয় অশ্ব লাভ করিয়াছি।

[অঙ্গিরা-গোত্র প্রিয়মেধ।]

পাঠকদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।—

দেববান → পিজবন বা দাশরাজা → সুদাস

বধ্রাশ্ব → অতিথিগ্ব দিবোদাস → ইন্দ্রোত, পরুচ্ছেপ

সৃঞ্জয় → প্রস্তোক

অঙ্গিরা → বৃহস্পতি → ভরদ্বাজ → গর্গ, পায়ু

অথর্ব → দধীচি

বাস্তবিক, তাজ দেখিলে এরূপ বোধ হয় না কি? তাজের কঠিন বহিরাবরণের নিয়ে যে রূপ রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয় না, এমন মানব-মন কোথায়? বহু বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রিকাস্নাত তাজের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বাস্তবিকই বোধ হইয়াছিল,—

'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা।
ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।'

ব্যঞ্জনাশক্তির প্রভাব ও সার্থকতা এই খানে সবিশেষ পরিস্ফুট।

ইংরাজী সাহিত্যসমালোচক প্যাটিসন্ (Pattison) মিল্‌টনের কবিতা-লোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, ব্যঞ্জনাশক্তি না থাকিলে কবিতার সার্থকতা থাকে না। কোনও কবিতার একটি পংক্তিতে যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, হয় ত অন্য কোনও কবিতা-নামধেয় ছন্দোবন্ধের সমগ্র অংশ অন্বেষণ করিলে তাহা মিলিবে না। এইরূপ, সকল সৌধেরই সার্থকতা নাই। দেখিতে বিশালায়তন বা বহুল প্রকোষ্ঠসংবলিত নানাকারুকার্য্যযুক্ত অট্টালিকা অপেক্ষা অনেক সামান্যায়তন সহজ সরল সৌধে যে মন দ্রব হইতে পারে, সে বিষয়ে বিস্মিত হইবার কোনও কারণই নাই। তক্ষশিলার উপকণ্ঠস্থিত জৌলিয়ান্ গিরিশৃঙ্গের উপর যে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রকোষ্ঠ বিন্যাস দেখিয়াছি, তাহা দিবসব্যাপী বৈদ্যুতিক-প্রদীপালোকিত আধুনিক কালের অনেক অট্টালিকায় মিলিবে না। ক্ষুদ্রায়তন মতি মস্‌জিদে যে স্থাপত্য-সম্পৎ বিদ্যমান আছে, বিশালাকৃতি জুম্মা মস্‌জিদ বা 'বাদশাহী' মস্‌জিদে হয় ত তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

স্থাপত্যে ভাবদ্যোতক ব্যঞ্জনাশক্তির প্রভাব দেখা গেল। এ শক্তির স্ফূরণ ব্যাপারে ইহার কোন্ অঙ্গগুলি কিরূপ সহায়তা করে, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। যেখানে জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেইখানেই ভাবের বিকাশ সম্ভবপর। গতিতেই জীবনীশক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট; যেখানে গতি নাই, বা তাহা অসম্ভব, সেখানে জীবনীশক্তির লীলা আশা করা যায় না। সকল স্থানেই শুদ্ধ গতি দেখিয়াই যে জীবন আছে মনে করিব, এমন আশা করা যায় না; এমনও হইতে পারে যে, গতিটি প্রচ্ছন্ন বা Potential ভাবে রহিয়াছে, ক্রিয়মাণভাবে বা kinetic ভাবে প্রকাশিত হইবার অবসর পায় নাই। একটি বংশখণ্ডকে বাঁকাইয়া ধনুর আকারে পর্য্যবসিত করিলে আমরা এই আকারে ধরিয়া রাখিতে বিশেষ বল অনুভব করিয়া থাকি। যদিও বাহিরে গতির কোনও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা

অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, ইহাতে শক্তি বিদ্যমান নাই। ভূতলে শায়িত বংশখণ্ডে শক্তির বিকাশ আশা করা যায় না, কিন্তু ধন্বাকারে পরিণত বংশদণ্ড শক্তিশালী, ছাড়িয়া দিলেই শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ হইবে। যে কোনও শক্তির বিকাশের সহিত জীবনীশক্তির গতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহা প্রাণশক্তিব্যঞ্জক বলিয়া কল্পনা করিলে অন্যায় হইবে না; সুতরাং বুঝিলাম যে, যে সৌধ খিলান-যুক্ত, তাহা কেন জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সৌধকে কত প্রকারে নির্ম্মিত করা যাইতে পারে, এবং ইহার কি প্রকারের অঙ্গ-সন্নিবেশ সম্ভবপর, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কোনও জানালার মাথায় খিলান দিয়া ভরাট করা যাইতে পারে, কিংবা খিলানের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ বা লৌহ বা অন্য কোনও পদার্থের কড়ি বা সরদাল্ (Lintel) দিয়াও উপরকার ভিত্তি রক্ষিত হইতে পারে। কোনও সৌধ বা প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশ কাষ্ঠ বা লৌহের কড়ি ও টালির সাহায্যে নির্ম্মিত করা যাইতে পারে, কিংবা ইহার উপর গম্বুজ বা অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার খিলান সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। কড়ি বা সরদাল্ না বসাইয়া ক্রমবর্দ্ধিত ইষ্টক বা প্রস্তর দ্বারাও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে; এ পদ্ধতির ইংরাজি নাম corbelling; এ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত সর্ব্বোপরি বিন্যস্ত ইষ্টক বা প্রস্তরখণ্ড সরদালের কার্য্য করে বলিয়া আমরা corbelling পদ্ধতির নাম রাখিলাম 'সরদাল্' পদ্ধতি। তাহা হইলে, আমরা দুই প্রকার নির্ম্মাণ-প্রণালীর পরিচয় পাইলাম—খিলান ও সরদাল্ পদ্ধতি। এই দুই প্রকার নির্ম্মাণ-প্রণালীতে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। খিলান বা গম্বুজ সজীবতার পরিচায়ক, কড়ি বা সরদাল্ নির্জীবতার দ্যোতক; শেষোক্তটি যেন চিরনিদ্রিত শবের ন্যায়। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে যে, 'an arch never sleeps'—খিলান কখনই নিদ্রা যায় না; বাস্তবিক, ইহা সততই জাগ্রত থাকে, কোনও সময়ে কোনও কিছু অসাধারণ ঘটিলেই ইহার সাড়া পাওয়া যায়। কথাটা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

কড়ি বা সরদাল্‌কে শবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; জীবনীশক্তির বিকাশ গতির প্রেরণায়; শবের কোনও অঙ্গে আঘাত করিলে অন্য কোনও অঙ্গ স্পন্দিত হয় না; কিন্তু সজীব ব্যক্তির কোনও অঙ্গে আঘাত করিলে, পেশী ও স্নায়ুর সাহায্যে অন্য অংশও কম্পিত হয়। যাঁহারা গতিবিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সুবিশেষ অবগত আছেন যে, ভার খিলানের এক অংশ

হইতে আর এক অংশে কিরূপ ভাবে প্রেরিত ও সংক্রামিত হয়। ভারের প্রেরণ বা সংক্রমণ দেখিলে বোধ হইবে যে, খিলানের অঙ্গগুলি মাংসপেশীর ন্যায় স্থিতিস্থাপক ও অথচ কাঠিন্য যুক্ত; কড়ি বা সরদালে এরূপ ভাবে স্থিতিস্থাপকতা দৃষ্ট হয় না। যেখানে সজীবতা সেইখানেই জরা, বা ব্যাধি; যাহার সজীবতা নাই, তাহার জরাও নাই, ব্যাধিও নাই। ভূমি বসিয়া যাইয়া বা অন্য কোনও কারণে ভারের ইতর-বিশেষ, বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি ঘটিলে খিলান ফাটিয়া যায়; কড়ি বা সরদালে এ অসুবিধার কোনও সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ, সজীব লোককে অধীন রাখিতে যে বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন, ইহা সাধারণের সহজেই বোধগম্য। কি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ভাবে, বা কি ব্যক্তিগত ভাবে জীব-বিজ্ঞানের এই মূল সূত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে, কি কৌশলের সহিত খিলান বা গম্বুজের উপর কার্য্যকারী বলটিকে ভূমির অংশবিশেষের উপর পাতিত করিতে হয়; ইহা না পারিলে খিলানটি অস্থায়ী হইয়া পড়ে; কোনও সামান্য কারণেই হয় ত খিলানের সহিত সৌধটি ভূমিসাৎ হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে খিলানে বা তৎসদৃশ গম্বুজে সজীবতার পরিচয় পাওয়া গেল।

খিলানের দ্বারা স্থাপত্যে অসাধ্য সাধন হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে কত বৃহদায়তন স্থানকে যে আবৃত ও সুশোভন করা হইয়াছে, তাহা বলা অসাধ্য। খিলান বা গম্বুজ না থাকিলে তাজের মত বিশাল ও সুন্দর সমাধিহর্ম্ম্যের রচনা কখনই সম্ভবপর হইত না। 'সরদাল' পদ্ধতি দ্বারা নির্ম্মাণেও অনেক সময় সুন্দর সুন্দর ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু খিলানের মত ইহা সরল, সহজ নহে।

স্থাপত্যের মূল নিয়মই এই যে, এমন অঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে, যাহা স্বয়ম্ সহজ সুন্দর হয়, এবং যাহার সাহায্যে অন্যান্য সুন্দর অঙ্গেরও যোজনা করা যাইতে পারে; খিলানের দ্বারা সৌন্দর্য্য সহজে রক্ষিত হয়, ইহা স্বীকার্য্য, এবং ইহার সমাবেশেও যে অন্যান্য সুন্দর অংশের যোজনা সম্ভবপর হয়, তাহা খিলানের চতুঃপার্শ্ব পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে। খিলানের মধ্যস্থ ও শীর্ষস্থিত প্রস্তরখানির বিষয় চিন্তা করা যাউক।

এই প্রস্তরখানির উপর নানা সুন্দর ভাস্কর্য্যের যোজনা সম্ভবপর হইতে পারে। খিলানের উপরও নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের ব্যবস্থা দ্বারা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কল্পনা করা যাইতে পারে। খিলান যে অতুল সৌন্দর্য্যের আকর,

তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, যে জাতীয় প্রাচীন লোকেরা খিলানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব স্ব নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সাহায্যে খিলানের কল্পনা করিবেন কেন? প্রাচীন হিন্দুদিগের কথা ধরিয়া লওয়া যাউক। তাঁহাদের প্রাচীন সৌধগুলির গাত্রে খিলানাকৃতি অঙ্গের সমাবেশ কেন? ইহারা প্রকৃতপক্ষে খিলান নহে; অর্থাৎ, এগুলিকে কেন্দ্রগ (Radiating) প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত করা হয় নাই। প্রস্তরখণ্ডকে ক্রমে ক্রমে বহিঃবর্দ্ধিত করিয়া খিলান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই আকৃতি মনোমোহন না হইলে এইরূপ খিলানাকারে অঙ্গের যোজনার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। শুদ্ধ তাহাই কি? যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের স্থাপত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কত অসংখ্য প্রকারের খিলান বিদ্যমান আছে। শুদ্ধ বারাণসীর মন্দিরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, 'ছিলালীদার ডার', 'পেয়ালাদার ডার', 'তোলওার' প্রভৃতি কত প্রকারের যে খিলান নয়নগোচর হইবে, তাহা বলা অসাধ্য। খিলান শোভন না হইলে অজন্তা, নাসিক, বা কার্লার চৈত্যগুলিতে ইহার এত প্রাচুর্য্য দেখা যাইত না। শুদ্ধ ইহাই নহে; ইহাদের ছাদগুলিও খিলানাকার (vaulted)। খিলান সুন্দর বলিয়াই অজন্তার ১৯ সংখ্যক চৈত্যগুম্ফার দুই পার্শ্বে চতুরস্র বা আয়তাকার কুলুঙ্গির সমাবেশ করিয়া মধ্যদেশে অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন বারহুত রেলিংএর উপরকার কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিলে আমরা যে বিহার ও চৈত্যের চিত্র দেখি, তাহাতেও অশ্বক্ষুরাকৃতি ও অন্য আকারের খিলানের প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। কলিকাতাস্থ মিউজিয়মে বারহুতের যে তোরণটি রক্ষিত আছে, তাহার দক্ষিণদিকস্থ স্তম্ভের উপরিভাগ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা খিলান নির্ম্মিত ছাদযুক্ত ও পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ বা aisle সমন্বিত চৈত্যের চিত্র দেখিতে পাই। ইহা নিশ্চয়ই ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত; ইংরাজী পণ্ডিতদিগের সাধারণ মতের অনুসরণ করিয়া কেহ এগুলিকে কাষ্ঠ ও খড় নির্ম্মিত বলিতে সাহসী হইবেন না; যাহা দ্বারাই নির্ম্মিত হউক না, খিলান যে স্থাপত্যের এক আবশ্যক অঙ্গ, এবং উহা দ্বারা যে শোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা প্রাচীন স্থপতিরা বিলক্ষণ বুঝিতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত মহাবলীপুরস্থ রথসংজ্ঞক সৌধগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা শীর্ষে বর্ত্তুলাকার বা খিলানাকার (vaulted) গম্বুজ দেখিয়া বুঝি যে, দাক্ষিণাত্যস্থ পল্লব নৃপতিদিগের অধীনস্থ স্থপতিরাও

খিলানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝিতেন। প্রথমোক্ত প্রকারের উদাহরণ-স্বরূপ ধর্ম্মরাজরথ এবং শেষোক্ত প্রকারের জন্য সহদেবরথ ও গণেশরথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে খিলান নহে, পরন্তু খিলানাকৃতি, পাঠক-গণকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত মনে করি।

স্থাপত্যে খিলানাকৃতির উপযোগিতা ভারতবাসীরা যে বহু প্রাচীন কাল হইতে বুঝিতেন, তাহা মূলতঃ পূর্ব্বোক্ত কথা হইতে বুঝা গেল। এ হিসাবে প্রাচীন গ্রীকেরা একটু পৃথক্‌মতাবলম্বী ছিলেন; তাহা হইলেও, তাঁহাদের দুই একটা প্রাচীন সৌধেও খিলানাকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ আকৃতিটি সৌধের বহির্দেশে দৃষ্ট হয় না; ইহার অন্তর্দেশেই খিলানাকারের কল্পনা করা হইয়াছিল; কেন যে হইয়াছিল, আমরা এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব না। সাধ্বী আর্টিমিসিয়ার আদেশে তাঁহার মৃত স্বামী মসোলসের (Mausolos) উদ্দেশে নির্ম্মিত সমাধিহর্ম্ম্যের অন্তর্দেশে আমরা খিলানাকারের পরিচয় পাই; আর পরিচয় পাই, গ্রীস দেশের অন্তর্গত নিডাসস্থ (Cnidus) সিংহশীর্ষ সমাধি-হর্ম্ম্যে। রোমকদিগের অভ্যুদয়ে 'ক্রমবর্দ্ধিত' সরদাল প্রণালীর (Corbelling) মূলে বিশেষ আঘাত লাগে, এবং স্থাপত্যের এক বিশেষ যুগ বা যুগান্তরের সূচনা হয়। এ যুগান্তরে স্থাপত্য নবপ্রস্ফুটিত রবিকরোদ্ভিন্ন শিশিরস্নাত প্রসূনের দিব্য কান্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; যাহা কখনই সম্ভবপর হইত না, তাহাও সম্ভাব্য হইয়া উঠিল। আমার মন্তব্যটি বুঝিবার জন্য আমি প্যান্‌থিয়নের চিত্রটির চিন্তা করিতে বলি। প্রথমতঃ মনে করিয়া দেখা যাউক, এক বিঘা দুই কাঠা পরিমাণ বৃত্তাকার ভূমি-খণ্ডের উপর মধ্যদেশে স্তম্ভ বা ভিত্তিহীন একটি প্রকাণ্ড ও অত্যুচ্চ (প্রায় ১৪১ ফিট উচ্চ) প্রকোষ্ঠের নির্ম্মাণ কি দুরূহ ব্যাপার! খিলানাকারের সাহায্য না লইয়া ও ভিতরে স্তম্ভের ব্যবস্থা না করিয়া এইরূপ বিস্তৃত স্থানকে আবৃত করা অসম্ভব। 'সরদাল' পদ্ধতিতে নির্ম্মাণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভিতরটা আপনা-আপনি গম্বুজাকার হইয়া পড়িবে; সুতরাং খিলান পদ্ধতিতে নির্ম্মিত না করিলেও আকৃতিটা খিলানের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতপক্ষে প্যান্‌-থিয়নের গম্বুজের নিম্নদেশের কিয়দংশের নির্ম্মাণে খিলান পদ্ধতির আদৌ সাহায্য লওয়া হয় নাই; সোজাসুজি ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

উপরিলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে, নির্ম্মাণ-ব্যাপারে খিলানের কিরূপ উপযোগিতা; সৌন্দর্য্যবিধানে যে ইহার তদপেক্ষা অধিকতর উপযোগিতা, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া

রাখা উচিত মনে করি। 'সরদাল্' পদ্ধতিতে নির্ম্মাণ করিলে প্রস্তর বা ইষ্টক প্রভৃতি উপকরণের অনেক অপব্যয় ঘটে; অর্থাৎ, খিলানে যে পরিমাণ মাল মশলার প্রয়োজন হয়, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রয়োজন হইবে।

বৈষম্য, বৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণদ্যোতক হিসাবে অর্দ্ধবৃত্ত বা বৃত্তাংশাকৃতি দ্বারা স্নায়বিক উত্তেজনা সাধিত হইয়া যে সৌন্দর্য্য জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাহা পূর্ব্বে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে; ইহা ভিন্ন এই সকল আকৃতির সাহায্যে অনেক জটিলাকৃতির সৃষ্টিও সম্ভবপর হয়। অর্দ্ধবৃত্ত হইতে অমুমের যে তিন, পাঁচ, বা সাত খাঁজযুক্ত খিলানের প্রচলন দেখা যায়, তাহাতে অনেক স্থানে দিব্য সৌন্দর্য্যের বিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশীয় ঠাকুরদালানের খিলানগুলি দেখিলে আমার মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। এক্ষণে চিন্তা করা যাউক যে, এই খিলানগুলির তিরোধান করিয়া যদি স্তম্ভের উপরে কড়ি বা সরদাল্ রক্ষিত হইত, তাহা হইলে দালানটি কিরূপ দেখাইত। ইহা যে নিতান্ত অশোভন হইত, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। চারিধারে কাঠের ঝিল্‌মিল্ দ্বারা বদ্ধ আধুনিক কালের ঠাকুরদালান, নাটমন্দির ও চাঁদনী দেখিয়া কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন না যে, ইহার সহিত দুই তিন শত বৎসরের পুরাতন সেকালের ঠাকুর-দালানের তুলনা হইতে পারে। শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির, বিষ্ণুপুরস্থ কৃষ্ণরায়ের জোড়-বাঙ্গলা, কিংবা শ্যামরায়ের মন্দির, কিংবা দিনাজপুরের সন্নিকটস্থ কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরের যে কোনও একটি যাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই বলিবেন না যে, ইহাদের খিলানের সৌন্দর্য্য নাই, বা ইহাদের সহিত আধুনিক কালের ঠাকুরদালানের (যেমন কলিকাতায় আনন্দময়ী বা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির) তুলনা হইতে পারে। তলদেশ মার্ব্বেল প্রস্তরে বা রক্তবর্ণ পেটেন্ট ষ্টোনে ও ইহা হইতে তিন বা চারি ফুট পরিমাণ উচ্চ গৃহভিত্তি 'মিন্টন্ টালি' দ্বারা যতই আবৃত করা হউক না, কিংবা সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-যুক্ত ঝাড়-লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা ইহাদিগকে যতই আলোকিত করা হউক না, ইহারা কখনই সৌন্দর্য্যে ও স্থাপত্য-গৌরবে সে কালের দালানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না; ইহাদের 'মিন্টন্ টালি' বা ঝিল্‌মিল ইহাদিগকে বর্ব্বরতার চিহ্নে মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া রাখিবেই।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমরা খিলানের বা খিলানাকৃতির উপযোগিতা বুঝিলাম। খিলানকে জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত রূপে কল্পনা করা হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, ভূমিতে অংশবিশেষের উপর খিলানের

উপর কার্য্যকারী বলটি প্রযুক্ত না হইলে সামান্য কারণে ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। এই বলরেখার অবস্থানকে মানুষের চরিত্রবলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের চারি দিকে প্রলোভন বিদ্যমান; এই প্রলোভন সর্ব্বদা আমাদিগকে উৎপথপ্রস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; চরিত্রবলের সংরক্ষণ করিতে পারিলে, বা ইহার ধারার রক্ষা করিতে পারিলেই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়; খিলানের বল-রেখার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থানের ব্যত্যয় ঘটিলেই ইহার স্থায়িত্বও সংশয়ের বিষয় হইয়া পড়ে। এই কারণেই এঞ্জিনীয়ারেরা খিলানের কল্পনা ও নির্ম্মাণ করিবার সময় সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, যেন ইহার বল-রেখাটি এক নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কাহারও উপর যাঁহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে, তাঁহারাও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন যে, পূর্ব্বোক্তের চরিত্রবল যেন সর্ব্বদা অব্যাহত থাকে, যেন স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট রেখা হইতে ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত না হয়। আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি; যদিও বিশেষজ্ঞ পাঠক ভিন্ন সাধারণে ইহার তাৎপর্য্য সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহার অনুল্লেখে আবার তুলনাটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। যাঁহারা ব্যাবহারিক স্থিতি বা গতিবিজ্ঞান (Applied Mechanics) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, খিলানের বল-রেখাটি যতই খিলানের মধ্য দিক দিয়া প্রযুক্ত হইবে, ততই ইহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং যতই ইহার খিলানের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিবে, ততই ইহার সাম্য ও স্থায়িত্ব-রক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের চরিত্রও এইরূপ; মানুষের চরিত্র-বলের সহিত যতই ইহার ভিতরে সম্বন্ধ ও যোগ, ততই ইহা প্রকৃত ও স্থায়ী, এবং যে চরিত্রের সহিত মানুষের ভিতরের সম্বন্ধ নাই, যাহা তাহার বাহিরে বাহিরে সামাজিক সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রকটিত হয়, তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? সামান্য প্রলোভনেই তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। ইহা আমরা প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করি। আমরা দেখি না কি, কত আপাততঃ ঋষিস্বভাব ব্যক্তি প্রলোভনের মায়াচক্রে পড়িয়া কত বিপর্য্যস্ত হইয়া চরিত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন, আর কত সমাজলাঞ্ছিত, পীড়িত ও সাধারণ চক্ষে হীন ব্যক্তি বিষম প্রলোভনে পড়িয়াও আপনার চরিত্র অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত রাখিয়াছেন; ইহার মহীয়ান্ মহিমায় সমাজকে দিব্য জ্যোতিতে মণ্ডিত করিয়াছেন। ইঁহাদের চরিত্রবলের যে ঐকতানিক প্রবাহ হৃদয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিত, তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই।

আর এক কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। যে মানুষকে যত প্রলো-

ভনের মধ্য দিয়া চলা-ফেরা করিতে হয়, তাহার স্খলনের সম্ভাবনা তত অধিক; ইহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ চরিত্রবলের প্রয়োজন, এবং চরিত্ররক্ষা ব্যাপারটি অতিশয় জটিল হইয়া পড়ে। এই প্রকার অবস্থাপন্ন মানুষের আকৃতির সহিত জটিল-আকৃতি খিলান বা গম্বুজের তুলনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা মোগল-রীতির অন্তর্গত গম্বুজ-নির্ম্মাণ-প্রণালী নিরীক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, ইহার স্থায়িত্ব-সংরক্ষণে স্থপতিকে কতই না কৌশলের অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং ইহার সামান্য ত্রুটীতে এবংবিধ কত প্রাচীন খিলান বা গম্বুজ অস্থায়ী হইয়া ভূমিশায়ী হইয়াছে। যাঁহারা গথিক্ রীতিতে নির্ম্মিত গির্জ্জা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে, মধ্যস্থ উপাসনা-গৃহের খিলানাকৃতি ছাদ ও তৎসংলগ্ন ভিত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য এক একবার খিলানাকার 'চাড়া'র (flying buttress) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং এই চাড়াকে রক্ষা করিবার জন্য বহির্ভিত্তির উপর ভারযুক্ত শেখরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা গেল যে, খিলানকে বশে আনা, বা ইহার মান্য রক্ষা করা কি কঠিন ব্যাপার। সম্প্রতি কোনও সুপ্রসিদ্ধ দাতব্য চিকিৎসালয়ের খিলানগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য আহূত হইয়া দেখিলাম, ইহার বহির্মণ্ডপের সমস্ত খিলানগুলি ফাটিয়া গিয়াছে; এগুলির নির্ম্মাণে সামান্য অনন্যসাধারণত্ব ছিল বলিয়াই এই দুর্দ্দশা। 'সরদাল্' পদ্ধতি বা ক্রমবর্দ্ধিত পদ্ধতিতে এ বিপত্তির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ইহাতে খিলানের ন্যায় দিব্য শোভা-বিকাশের সম্ভাবনা ও সুবিধাও নাই।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস।

[শ্রীযুক্ত মোনাহান মহোদয়ের সঙ্কলিত চতুর্থ প্রবন্ধের অনুবাদ।]

[অতীশের পরিচয় ও বিক্রমশিলার অবস্থান;—তিব্বত-রাজ হ্লা লামার বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারের চেষ্টা;—হ্লা লামার নির্য্যাতন ও চ্যান-চাবের সহিত কথোপকথন;—অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য চ্যান-চাবের চেষ্টা ও তজ্জন্য নাগ-চোকে ভারতে প্রেরণ;—নাগ-চোর ভারতযাত্রা ও ভ্রমণকাহিনী।]

১

মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল রাজ্যাধিকারী হয়েন। তারানাথের উক্তি অনুসারে মহীপালের রাজত্ব-কালের পরিমাণ বায়ান্ন বৎসর; তাহা

অতীশের পরিচয় ও বিক্রমশিলার অবস্থান।

হইলে, নয়পালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল ১০৩২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। প্রবীণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারক অতীশের তিব্বত-গমনই নয়পালের রাজত্বকালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়। এই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামেও পরিচিত ছিলেন। পরলোকগত রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস কতকগুলি তিব্বতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া অতীশের যে জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা হইতে অতীশের জীবনের প্রথম অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। নয়পাল কর্ত্তৃক অতীশ বিক্রমশিলা মহাবিহারের মহাস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই মহাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই; তবে, একখানি তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে উহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে একটি ক্ষুদ্র শৈলের বা টিলার উপর অবস্থিত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে ঐ স্থানকে ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জ বলিয়াই মনে হয়;—সুলতানগঞ্জে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তথাগতের অস্থ্যাধারযুক্ত একটি স্তূপও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল ভগ্নস্তূপের ভিতর ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ একটি তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং দুইটি পাষাণ-মূর্ত্তি, এবং আরও কতকগুলি বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বিহার যে বিক্রমশিলা-বিহার হইতে অভিন্ন, ইহার কোনও নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তির উপরে যে সকল লেখ আছে, তাহার লিপি গুপ্ত-যুগ প্রচলিত লিপি। তিব্বতীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বিক্রমশিলা, নালন্দা এবং বজ্রাসন বা বুদ্ধ-গয়া হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না।

তিব্বত-রাজ হ্লা লামার বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারের চেষ্টা।

তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তিব্বত-রাজ হ্লা লামা নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন; তান্ত্রিক বীরাচারের সংমিশ্রণে স্বদেশীয় বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের ধর্ম্মমত হীনতা প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি [১০২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত] থোডিং-এর বিহারে শিক্ষিত করিয়া একবিংশতি-সংখ্যক যুবক বৌদ্ধ শ্রমণকে অধ্যয়নের নিমিত্ত, কাশ্মীরে, মগধে ও ভারতের অন্যান্য যে সকল স্থানে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল—তথায় প্রেরণ করেন, এবং কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রত্নবজ্রকে ও মগধের বৌদ্ধ মহাস্থবিরকে, এবং এতদ্ব্যতীত তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যক্ষম অন্যান্য পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত শ্রমণ-

গণের প্রতি আদেশ করেন। এইরূপে তিব্বতরাজ হ্লা লামা ত্রয়োদশ জন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের সহায়তা-লাভে সমর্থ হয়েন, কিন্তু ভারতে প্রেরিত ভিক্ষু-গণের মধ্যে ঊনবিংশ জনই ভারতভূমিতে গ্রীষ্মাধিক্য, জ্বর, সর্পাঘাত প্রভৃতি নানা কারণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। অবশিষ্ট দুই জন লোচাভ—(সংস্কৃতজ্ঞ তিব্বতীয়গণ ঐ নামেই আখ্যাত হইতেন) বিক্রমশিলা দর্শন করিতে গিয়া অতীশের প্রখ্যাতি শুনিতে পান ;—অতীশ তৎকালে মগধের বৌদ্ধ সুধীবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিতেছিলেন, এবং পঞ্চশত অর্হতের মহা-সঙ্ঘিকা নামক সম্প্রদায়ের তিনি দ্বিতীয় 'সর্ব্বজ্ঞ' ছিলেন। লোচাভগণ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে সাহসী না হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং রাজসমীপে তাঁহাদিগের ভারত-যাত্রা-কাহিনী এবং মগধের বৌদ্ধ মহাবিহারের অবস্থা নিবেদন করিলেন। নৃপতি হ্লা লামা, অতীশের দর্শনার্থ অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া শতসংখ্যক অনুচর ও বহুপরিমাণ সুবর্ণ সহ গিয়াৎসন সেন্ জে নামক এক ব্যক্তিকে বিক্রমশিলায় প্রেরণ করিলেন। বিক্রমশিলায় পঁহুছিয়া গিয়াৎসন অতীশকে তিব্বতরাজের পত্র ও তৎসহ বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং অতীশকে তিব্বতে পদার্পণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। অতীশ উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন না, তিব্বত-গমনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। গিয়াৎসন তাহাতে নিরতিশয় কাতর ভাবে ক্রন্দন করি-লেন—আপনার পরিচ্ছদ-প্রান্তে অশ্রুমোচন করিলেন। অতীশ সেই নৈরাশ্যক্ষুব্ধ ভিক্ষুকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নৃপতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

গিয়াৎসন তিব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজসদনে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পুরাংএর দক্ষিণে একটি সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রাজা কিছুকাল পরে, নেপালের সেই সীমান্ত-প্রদেশে অধিকতর সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করিলেন ; সুবর্ণের পরিমাণা-ধিক্য ঘটিলে অতীশের আর তিব্বতাগমনে আপত্তি থাকিবে না, রাজার এইরূপই ধারণা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হ্লা লামার নির্যাতন ও চ্যান-চাবের সহিত কথোপকথন।

সুবর্ণখনির নিকট উপস্থিত হইয়া গারলোগ-রাজের সৈন্যগণের সহিত তিব্বত-রাজের সাক্ষাৎকার ঘটিল,—গারলোগ-রাজের অবলম্বিত ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বৈরসম্বন্ধ। এই গারলোগ স্থানটি কোথায়, অথবা ঐ সুবর্ণ খনির অধিকার লইয়া কোনও বিবাদ ছিল কি না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না ; কিন্তু তিব্বত-

রাজের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা গারলোগ-রাজের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল, তাহারা তিব্বতরাজকে বন্দী করিয়া জয়োল্লাস সহকারে আপনাদিগের রাজধানীতে লইয়া গেল। হ্লা লামাকে দেখিয়া গারলোগ-রাজ না কি বলিয়াছিলেন :— 'ইনি মগধ হইতে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার করিবেন, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের দাসত্ব স্বীকার না করিলে, আমাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, আমরা ইঁহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।' ইহা হইতেই অনুমান হয়, গারলোগ-রাজের বৈরিতা সুবর্ণখনির বিবাদঘটিত নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষজনিত বটে। সে যাহা হউক, নৃপতি হ্লা লামা গারলোগ-রাজ-কর্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। তৎপর, হ্লা লামার ভাগিনেয় চ্যান চাব তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, গারলোগ-রাজও সম্মত হইলেন ;—কিন্তু সর্ত্ত হইল, হয়—হ্লা লামাকে তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে হইবে, নয়— নিষ্ক্রয়স্বরূপ হ্লা লামার দৈহিক-আকার-পরিমিত নিরেট সুবর্ণরাশি প্রদান করিতে হইবে। প্রথমোক্ত সর্ত্ত অপেক্ষা শেষোক্ত সর্ত্তই হ্লা লামার পক্ষে গ্রহণীয় হওয়ায়, তাঁহার পুত্রগণ তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রজাবর্গের নিকট হইতে সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত অমাত্যবর্গকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু যাহা সংগৃহীত হইতে পারিল, তাহাও প্রয়োজনের পক্ষে ন্যূন রহিয়া গেল। কথিত আছে, সুবর্ণ গলাইয়া যখন বন্দীকৃত নরপতির মূর্ত্তিগঠনের নিমিত্ত ঢালাই করা হইল, তখন দেখিতে পাওয়া গেল, মস্তকনির্ম্মাণোপযোগী সুবর্ণ ন্যূন রহিয়া গিয়াছে। গারলোগ-রাজের অনুমত্যনুসারে হ্লা লামার সহিত তাঁহার ভাগিনেয় চ্যান-চাবের সাক্ষাৎকার ঘটিল, সে কাহিনী অত্যন্ত সকরুণ। চ্যান-চাব তাঁহাকে সমুদয় অবস্থা বুঝাইয়া বলিয়া পরিশেষে ব্যক্ত করিলেন, ইহা তাঁহারই (হ্লা লামার) কর্ম্মফল ; ইহাও কহিলেন—'গারলোগ-রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিলে গারলোগ-রাজ মুক্তি প্রদান করিতে সম্মত আছেন।' হ্লা লামা উত্তর করিলেন, 'এই পাপাশয় নাস্তিক নৃপতির অধীনতা-স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয়।'

চ্যান-চাব পুনরায় সুবর্ণ-সংগ্রহের নিমিত্ত যাইতে চাহিলেন, কিন্তু হ্লা লামা বলিলেন, 'বৎস, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ও চিরাচরিত অনুষ্ঠানসমূহ রক্ষা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এ কার্য্যের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমার মতে, আমাদের দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত নিয়মাবলীই পালন করা কর্ত্তব্য। আমার

যেরূপ কর্ম্ম, তাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মসংস্কার আর আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, যমের দুয়ারেই আসিয়া পড়িয়াছি। আমাকে যদি মুক্ত করিতেও সমর্থ হও, আমাকে দশ বৎসরের অধিক আয়ুঃ দান করিতে সমর্থ হইবে না। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিতে পারি নাই। অতএব এবার আমাকে ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দাও। এই নৃশংস নৃপতিকে সর্ষপপরিমিত সুবর্ণও প্রদান করিও না। সমুদয় ফিরাইয়া লইয়া যাও; ইহা দ্বারা মহাবিহারসমূহের ধর্ম্মকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিও। জনৈক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতকে তিব্বতে আনয়ন করিও। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট যদি কখনও কাহাকেও পাঠাও, আমার এই কথাগুলি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইও; 'বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যের জন্য এবং তাঁহার জন্য সুবর্ণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গিয়া, তিব্বতরাজ হ্লা লামা গারলোগ-রাজের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব পণ্ডিত মহাশয় যেন তাঁহাকে জন্মজন্মান্তরে কৃপা করেন—আশীর্ব্বাদ করেন। হ্লা লামার জীবনের প্রধান সংকল্প ছিল,—তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কারসাধন করিবেন; কিন্তু হায়! তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের দিব্য মূর্ত্তি কবে সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিবে, তাহারই সতৃষ্ণ প্রতীক্ষায় তিনি তথাগতের শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।'

অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য চ্যান-চাবের চেষ্টা ও নাগ-চোকে ভারতে প্রেরণ।

গারলোগ-রাজ এই সাক্ষাৎকার অধিকতর কাল স্থায়ী হইতে দিলেন না, কাজেই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল; চ্যান-চাব চলিয়া যাইতে যাইতে লৌহ-গরাদে বিশিষ্ট দ্বারের ভিতর দিয়া হ্লা লামার চকিত-দর্শন-লাভের আশায় ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন,—জীবন-কাহিনীতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মাতুলের মুক্তির আশা পরিত্যাগ না করিয়া চ্যান-চাব তিব্বতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় সুবর্ণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হ্লা লামার মৃত্যু হইল। মাতুলের রাজসিংহাসনে চ্যান-চাব অধিষ্ঠিত হইলেন। পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে ভাগিনেয় হ্লা লামার উত্তরাধিকারী হইলেন, ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে,—তিব্বত রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারস্বত্ব দুহিতৃবংশেই বর্ত্তিত, সুতরাং পুত্র রাজ্যাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়ই রাজ্যলাভ করিতেন। চ্যান-চাব সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই স্বর্গগত মাতুলের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার

—ভারতবর্ষের এক জন প্রধান পণ্ডিতকে তিব্বতে আনয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিবার, সঙ্কল্প করিলেন; এবং তদুদ্দেশ্যে শূলক্রিম নামক একটি তিব্বতীয় পণ্ডিতকে মনোনীত করিলেন। শূলক্রিম ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে গমন করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এক জন বিচক্ষণ লোচাভ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অধ্যাত্ম দর্শন বিনয়পিটকে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বিনয়াধার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যুবকটি নাগ-চো-বংশীয়, এবং তিব্বতীয় ইতিহাসে তিনি কখনও নিজ শূলক্রিম নামে, কখনও বিনয়াধার রূপে, কখনও বা নাগ-চো ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহাকে শেষোক্ত উপাধিতেই উল্লেখ করিব। রাজা চ্যান-চাব নাগ-চোকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন—যদি সম্ভব হয়, অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় জ্ঞানে ও পুণ্যে যিনি পণ্ডিতসমাজে অতীশের অব্যবহিত নিম্ন পদ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাকেই লইয়া যাইতে হইবে।

নাগ-চোর ভারত-যাত্রা ও ভ্রমণকাহিনী।

নাগ চো পাঁচ জন লোক সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে চলিলেন,—ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত মহাশয়কে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত একটি সুবর্ণখণ্ড তাঁহার সহিত চলিল; এতদ্ব্যতীত নাগ-চোর নিজের জন্য ১৭ ভরি স্বর্ণ, তাঁহার ব্যয়ের নিমিত্ত ১৭ ভরি স্বর্ণ, এবং মগধের থি-ভাবীকে দিবার নিমিত্ত ১২ ভরি স্বর্ণ তাঁহার সঙ্গে চলিল।

ভারত-সীমান্তে উপনীত হইয়া তাঁহারা একটি বংশনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সুবর্ণের লোভে কতকগুলি স্থানীয় লোক তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে জানিতে পাইয়া তাঁহারা সায়ংকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া প্রাতে এক নেপালী রাজকুমারের দলবলের সহিত তাঁহাদিগের দেখা হইল—তাঁহারাও বিক্রমশিলাতেই যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহযাত্রিক হইয়া, স-সঙ্গী নাগ-চো সূর্য্যাস্তকালে গঙ্গাতীরে পঁহুছিলেন। সুতরাং নয়পালের রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ হইতে গঙ্গাতীর পঁহুছিতে তাঁহাদিগের কিঞ্চিদূন অষ্ট প্রহরের প্রয়োজন হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা পদব্রজেই গমন করিয়াছিলেন, এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে স্বল্পকাল বিশ্রামও করিয়াছিলেন। তাঁহারা গঙ্গার যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, সে স্থানে একটি খেয়াঘাট ছিল, এবং যাত্রী-বোঝাই একখানি খেয়া নৌকা তখনই ছাড়িয়া দিল। খেয়ার নৌকায় তাঁহাদিগের

আর স্থান ছিল না। মাঝি বলিল, ফিরিয়া আসিয়া সে তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিবে। গোধূলির পর নৌকা ফিরিয়া আসিল। নাগ-চো ও তাঁহার পাঁচ জন সহযাত্রীকে নদীতীরে ফেলিয়া রাখিয়া মাঝি রাজপুত্র ও তাঁহার দলবলকে পারে লইয়া চলিল। যতই রাত্রি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন। নিকটে কোনও বসতি নাই; কিয়দ্দূরে যাহাদের বাস, তাহাদিগেরও দুর্ণাম ছিল বলিয়াই অনুমান হয়।

তীর্থিকগণ বা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ ও অন্যান্য বিধর্ম্মিগণ বৌদ্ধদিগের প্রতি বৈরভাবাপন্ন ছিল। সুতরাং পান্থগণ বালুকাগর্ভে তাঁহাদিগের সুবর্ণ-সম্পদ প্রোথিত করিলেন, এবং খেয়ার নৌকা আর তাঁহাদিগকে লইতে আসিতেছে না মনে করিয়া অনাবৃত স্থানেই শয়নের ও নিদ্রার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রে, দাঁড়ের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, নৌকাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগ-চো মাঝিকে বলিলেন—'আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি আর এখন আসিবে না।' মাঝি উত্তর করিল, 'আমাদের দেশে আইনের শাসন আছে। আপনার নিকট আসিব বলিয়া বাক্যদান করিয়া যদি না আসিতাম, আমার শাস্তি হইতে পারিত।' তৎপর তাঁহারা বালুকাগর্ভ হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিয়া নৌকারোহণ করিলেন, এবং গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন। নদী-তীরে বিষধর সর্পের ভয় আছে, সুতরাং তথায় যেন তাঁহারা নিদ্রা না যান, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া মাঝি বলিল,—'বরাবর বিহারে চলিয়া যান, সেখানে তোরণ-দ্বারের গম্বুজের নীচে রাত্রিযাপন করিবেন। রাত্রে সেখানে কোনও ভয় নাই। আশা করি, চোরে উপদ্রব করিবে না।' মাঝির এই উত্তরের ভিতর এমন কিছু ছিল যাহা তিব্বতীয়-গণের নিকট নূতন বলিয়া ঠেকিল। মাঝি যেন কিছু সগর্ব্বেই বলিয়া-ছিল—'আমাদের দেশে আইনের শাসন আছে'; তাহাতেই বুঝিতে হয়, ভারতবর্ষে তখনও প্রাচীন সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সুশাসনে অভ্যস্ত ছিল, ভারতবর্ষে রীতিমত আইনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—তিব্বতে হয় ত যাহার অভাব পরিদৃষ্ট হইত। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে,—ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে আইনের রাজ্য,—ইহার অধিবাসিবর্গ চির-কাল বিধি নিষেধ মানিয়া চলিয়াছে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে অশান্তি ও অরাজকতার অভ্যুদয় ঘটিলেও, ভারতবাসিগণ যে সমষ্টি ভাবে, বিধি-নিষেধের প্রচলনকর্ত্তৃরূপে স্থায়ী ও শক্তিশালী শাসনতন্ত্রকেই স্বীকার করিতে সমুৎসুক, সাধারণতঃ তাহারই পরিচয় তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন।

এই আখ্যায়িকার ভিতর নানা স্থানে চোরের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নয়পালের রাজ্যে পুলিশের ব্যবস্থা অসাধারণ কার্য্যদক্ষ ছিল না; পক্ষান্তরে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, কয়েক জন মাত্র লোক বহুল পরিমাণে সুবর্ণ সঙ্গে লইয়া বিনা বিপদ্‌পাতে সুদূর তিব্বত হইতে নেপাল অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া পঁহুছিতে পারিয়াছিলেন।

তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে,—বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার গঙ্গা-নদীর তীরে একটী ক্ষুদ্র শৈল বা টিলার উপর অবস্থিত ছিল। এই বর্ণনার সহিত সুলতানগঞ্জের অবস্থান মিলিয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

সহযোগী সাহিত্য।

মুসলমানগণ কি জাতি?

মান্দ্রাজের অধ্যাপক এন্, রঙ্গস্বামী 'Quarterly Journal of Mythic Society' পত্রিকায়, মুসলমান জাতি যখন ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কি জাতি ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার একটী চুম্বক দিলাম।

প্রায় আট শত বৎসর ধরিয়া (১০০০ খ্রী:—১৮০০ খ্রী:) মুসলমানগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মুসলমান রাজত্ব বুঝিতে হইলে, তাহাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানিতে হইলে, দেশ তাহাদের নিকট হইতে কি পাইল, এবং তাহাদের সংস্পর্শে কি হারাইল, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে বুঝিতে হইবে, এই মুসলমান জাতি, যাহারা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছে, ভারতের ধনভাণ্ডার যাহাদের লুব্ধদৃষ্টিকে বার বার প্রলুব্ধ করিয়া নিজের বিনাশের কারণ হইয়াছে, অবশেষে যাহারা এ দেশে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে এত দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা কি শ্রেণীর লোক—কোন্ জাতি। তাহারা যখন প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন তাহাদের সভ্যতা ও শিক্ষা কিরূপ ছিল, এবং তাহা তাহাদের মধ্যে কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল? বস্তুতই তাহারা সে সময় সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত কি না, বা তাহারা বর্ব্বর-শ্রেণীভুক্ত ছিল? তাহাদের উপজীবিকা কৃষি, না মেষপালন ছিল? তাহাদের যাহা ছিল, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত, না আরও চাই, আরও চাই—এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিত? নূতন কিছু ভাবের ধারা তাহাদের সমাজে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইত, না তাহারা নূতনকে বর্জ্জন করিয়া চলিত? নূতনের তরঙ্গ তাহাদের মনে কিরূপ ঢেউ তুলিত? মুসলমান রাজত্বকে ঠিক করিয়া বুঝিতে হইলে, এ সকল প্রশ্ন ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, নচেৎ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞানলাভের আশা নাই।

তাঁহারা মুসলমান ছিলেন, এইটুকু প্রথমেই আমরা দেখি। এই মুসলমানত্বই কি তাঁহাদের সব ছিল? মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়া আর কি কিছু তাঁহাদের ছিল না? ছিল বৈ কি—মহম্মদের ধর্ম্ম ছিল তাঁহাদের ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম তাঁহাদের সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কারের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা কি জাতীয় মানুষ ছিলেন, কি জাতীয় শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতায় তাঁহাদের জীবন মন গড়িয়া উঠিত, তাহা দেখিতে হইবে। যে সকল মহম্মদপন্থী মানব ভারতবর্ষে বিজয়িবেশে আসিয়াছিলেন, আরবগণই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। ৭১২ খ্রীঃ সিন্ধু প্রদেশে আরবদের বিজয়পতাকা প্রথম উড্ডীন হইয়াছিল, কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য। তাঁহাদের আগমন পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় কোনও রেখাপাত না করিয়াই ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু প্রদেশে তার পর আর যদি কোনও মুসলমান-আক্রমণ না হইত, তাহা হইলে এই আরব-আক্রমণের কাহিনী শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই থাকিয়া যাইত। দেশের স্তরে ইহার কোনও চিহ্নই তাহা রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আরবরা আর ভারত আক্রমণ করেন নাই। তার পর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ বা তুর্কী, কেহ বা আফগান। তুর্কীরাই অধিকবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গজনীর মামুদ ও তাঁহার সৈন্যগণ সবাই তুর্কী ছিলেন। যে দাসবংশ প্রায় সমস্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া দিল্লীর ভাগ্যগগনে উদীয়মান ছিলেন, তাঁহারাও তুর্কী। তোগলক-বংশ (১৩২১—১৪১৪ খ্রীঃ) ও মুঘল বংশ (১৫২৬—১৮৫৭ খ্রীঃ) উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ তুরুষ্ক দেশের লোক। আফগানেরা তুর্কীদের অপেক্ষা অল্প দিন ভারতের রাজদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। খিলিজিরা (১২৯০—১৩১৪ খ্রীঃ), সৈয়দরা (১৪১৪—১৪৫১ খ্রীঃ), লোদীরা (১৪৫১—১৫২৬ খ্রীঃ), সকলেই আফগান ছিলেন। যে শেরশাহ কিছু দিনের জন্য (১৫৩৯—১৫৫৩ খ্রীঃ) মুঘল রাজলক্ষ্মীকে ভারতের রত্নসিংহাসন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তিনিও আফগান ছিলেন। কিন্তু তুর্কীরাই বেশী প্রবল হইয়াছিল। আফগানের সৌভাগ্য-রবি অধিক দিন ভারতগগন আলোকিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। তুর্কীদের প্রভাব ভারতবর্ষে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলগু ভাষার মধ্যেও পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে তুর্কী বলিলেই মুসলমান বুঝিতে হয় (তামিলে তুলখান, তেলগুতে তুরকলু)। এই ভারতবিজয়ীরা তুর্কী বা আফগান, যাহাই হউক না কেন, ইঁহাদের সভ্যতার ধারা প্রায়ই একই রকম ছিল। তাঁহারা যে মহাজাতির অংশ হউন না কেন, যখনই যে কোনও বেশে ও উপায়ে ভারতে আসুন না কেন, যে বংশেরই লোক হউন না কেন, রাজ্যশাসনপ্রণালী, সামাজিক প্রথা, সভ্যতার বিকাশ, সকল মুসলমান রাজাদের মধ্যেই প্রায় একই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে একরূপ রাজনীতিক বন্দোবস্ত, সামাজিক নিয়ম ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম, তাঁহাদের এই আট শত বৎসরব্যাপী রাজত্বকে, তাঁহাদের জাতিগত ও বংশগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, অখণ্ড করিয়া রাখিয়াছিল। দাস বা তোগলক, আফগান বা মুঘল, সব রাজত্বেই একই আদর্শ, একই প্রথা, একই গুণ, একই দোষের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অন্যতম কারণ,—তাঁহাদের সভ্যতা ও শিক্ষা পরস্পর সংসৃষ্ট ছিল।

ভারতবর্ষের তখনকার ভাগ্যবিধাতৃগণের শিক্ষা ও সভ্যতা কিরূপ ছিল, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এ কথার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহারা যাযাবর ছিলেন। ইহাই তাঁহাদের সম্যক পরিচয়। তাঁহাদের এই যাযাবরত্বের পরিচয় শুধু তাঁহাদের দেশের শাসন ও সংরক্ষণের প্রণালী ব্যতীত সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও পাওয়া যায়। যাযাবরদের একটী বিশেষ পরিচয়—তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন। আমাদের মুসলমান সম্রাটগণ ও তাঁহাদের সঙ্গীদের মধ্যে যে কিরূপ বহুবিবাহের প্রচলন ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যাযাবরত্বের আর একটী চিহ্ন—কৃষির উপর বিতৃষ্ণা ও ধীরে ধীরে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তুলিবার উপর অনাস্থা। মুসলমানদের মধ্যে এই ভাবও তখন বেশ প্রকট ছিল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ব্যতীত আর একটী জিনিস তাঁহাদের প্রিয় ছিল—সেটী ব্যবসায়। ইহাও যাযাবরত্বের অন্যতম নিদর্শন। তাঁহারা গাড়ী গাড়ী পণ্য বোঝাই করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। তুর্কীরা যে সব দেশ জয় করিয়াছিল, সেই দেশবাসী কৃষকেরা (পারস্য ও আফগানিস্থানের তাজিকগণ ও মধ্য-এসিয়ার সারটীয়গণ) তুর্কীদের অন্ন জল যোগাইত।

আফগান গোরী, লোদী ও সৈয়দরাও এই তুর্কীদের মত ছিল। এখনও তখনকার মত এই আফগানরা গরু চরায়, মেষ তাড়ায়, এবং যখন তাহাদিগকে রাখালী করিতে হয় না, তখন মারামারি করিয়া মরে। আফগান দেশে কৃষি, শিল্প ও সমস্তই পার্শিয়ান, আর্ম্মেনিয়াণ ও হিন্দুদের হাতে। আমাদের দেশে শত শত কাবুলী দেখা যায়; তাহারা পীঠে মোট বাঁধিয়া পণ্য লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহারা স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে, এবং সর্ব্বদা সীমানা বদল করিবার প্রয়াসী। (বর্ত্তমান আফগান যুদ্ধ ইহাদের এই প্রকৃতির অনেকটা পরিচায়ক) এক বাড়ীর সীমানার সহিত অন্য বাড়ীর সীমানার গণ্ডগোল লাগিয়াই আছে। এক গ্রামের সীমানার সহিত অন্য গ্রামের সীমানার কত যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা বলা একরূপ দুঃসাধ্য। De Sacyর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'তাহারা কোনও আইনের বাঁধনের বা একটী নির্দ্দিষ্ট শাসনের অধীন থাকিতে একেবারে অক্ষম। সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত ঝগড়াঝাঁটী ও হাতাহাতীর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোনকে জনৈক আফগান বলিয়াছিল—'অমিল, অশান্তি ও রক্তপাত আমাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম—আমরা কাহারও অধীনে পরিচালিত হইয়া থাকিতে পারি না, পারিব না।'

এখন দেখা যাইতেছে, তুর্কী ও আফগান, উভয়েই জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য সত্বেও সেই এক যাযাবর জাতি। কিন্তু এই যাযাবরত্বেরও নানা স্তর আছে। এই যে অস্থিরতা, অশান্তিপ্রিয়তা, কৃষির উপর বিতৃষ্ণা, নিয়মের অধীনতার উপর ঘৃণার বিকাশ নানা স্তরের সৃষ্টি করে—এই সকল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ১৫২৬—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত যে মুসলমানবংশের লোক একের পর এক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের রাজত্বকে যে কেন মুঘলবংশ বলা হয়, ঐতিহাসিকরা সে জন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এই তুর্কীরা মুঘলদিগকে দেখিতে পারিত না। বাবর

ও তাঁহার সঙ্গীরা সবাই তুর্কী ; অথচ তুর্কী-প্রতিষ্ঠিত সম্রাজ্যের নাম মুঘল সম্রাজ্য হইয়া গেল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বহু দিন হইতে যেটা চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছার অভাব, এবং নিজেরা যে যাযাবর, সেই পরিচয়টা না ঢাকিবার চেষ্টা।

এই যাযাবর জাতিরাই ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের স্থাপয়িতা। মুসলমান শাসনপ্রণালীও যাযাবর-জাতীয়। তাঁহাদের দেশশাসন-প্রণালীতে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ব্যবহারে, ও অধিকৃত দেশবাসীর সহিত সংস্রবে তাঁহাদের যাযাবরত্ব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্টবিপর্য্যয়ে, রাজবংশের পরিবর্ত্তনে— তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাস ব্যাপিয়া এই যাযাবরত্বের ছাপ মুদ্রিত হইয়া আছে। আফগান ও তুর্কী, সকল মুসলমান রাজত্বের সময়েই এই যাযাবরত্বই তাঁহাদের ইতিহাসের কলকাঠী— ইহাই তাঁহাদের সভ্যতার অঙ্গ।

যে ইচ্ছায় তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশ আক্রমণ ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেন, সেই ইচ্ছায় হুণ ও মঙ্গলদের যাযাবরত্ব খুব বেশী ভাবে ফুটিয়া উঠিত। এই ভারতবিজয়ী আফগান ও তুর্কী মুসলমানেরাও ঠিক সেই হিসাবে যাযাবর ছিলেন। তাঁহাদের দেশে দেশে বিজয়-পতাকা বহিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তিতেই যাযাবরত্ব অধিকপরিমাণে ফুটিয়া উঠিত। ভিন্ন দেশ লুঠতরাজ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার স্পৃহা, বাণিজ্য ও শান্তি না থাকার দরুণ দেশের লোকের উগ্রতার অভাব না থাকা ও দেশ-বিজয়ের দারুণ আকাঙ্ক্ষাই মুসলমান-দিগকে ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মুসলমান রাজাদের নিযুক্ত ঐতিহাসিকদের পরে লিখিত বিবরণী প্রভৃতি হইতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এই সকল মুসলমান-আক্রমণ, বিশেষতঃ গজনীর মামুদের আক্রমণ শুধু দেশ-আক্রমণ নহে। ইহার সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার। কিন্তু এই সকল আক্রমণকারীদের চরিত্র ও তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ধর্ম্ম-প্রচার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইতে ধর্ম্ম সভয়ে পলায়ন করেন। 'আল-উটবি'তে লিখিত হইয়াছে,—'সাবক্তগীন বহুবার জেহাদ করিয়াছেন। তিনি বহু পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া বহু ধন রত্ন অধিকার করেন। ইহা ছাড়া আরও যত রকম দ্রব্য থাকিত, সবই তাঁহার অধিকারে আসিত। তিনি ভারতবর্ষের বহু নগর দখল করিয়াছিলেন।' ইহাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রশংসাপত্র। অনেক সময় মুসলমান সুলতানেরা তাঁহাদের অধীন লোকদিগের পারিবারিক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতেন। কোনও দেশ বিজিত হইবার পর প্রথম প্রথম সে দেশ সুলতানদের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহাদের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মী এই কর্ম্মচারীরা বিজয়গর্ব্বে বিজিতদের উপরে স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই যথেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার-প্রবণতাটা শেষে সুলতানদের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে এই হইয়াছিল যে, হিন্দুদের উপর কর্ম্মচারীরা যে অত্যাচার, অবিচার করিত, সুলতান আবার তাহাদের উপরও সেইরূপ অত্যাচার যথেচ্ছাচার করিতেন। যেমন দেশের সম্ভ্রান্ত আমীর ও ওমরাহ-

গণের কন্যাদের বিবাহ ব্যাপারে। এমন কি, শেরশাহের মত লোকও বলিয়াছেন,—'রাজ্যের কোনও কার্য্য রাজ-অনুমতি বিনা নিষ্পন্ন হওয়া কোনও সম্রাট রাজ্যের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে।' জাহাঙ্গীর বাদশাহ অতিশয় সুখপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যে কি হইতেছে, না হইতেছে, অত খবর রাখা তাঁহার পোষাইত না। সম্রাটের অনুমতি বিনা কোনও আমীর ওমরাহের কন্যার বিবাহ হয়—তিনিও ইহা দোষের বিষয় মনে করিতেন, যদিও তখনও তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। মহব্বৎ খাঁর কন্যার রাজ-অনুমতি বিনা বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রমাণ। অত্যাচার করিতে করিতে মানুষের স্বভাবই এমন দাঁড়াইয়া যায় যে, অত্যাচার না করিলে আর তাহার ভাল লাগে না—পাত্রমিত্র প্রিয়পাত্র সকলেরই উপরই তখন অত্যাচারের স্রোত বহিতে থাকে। মুসলমান বাদশাহেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। বিজিতদের উপর ত নির্ব্বিবাদে অত্যাচার চলিত, এবার বিজেতার জাতিদের উপরও অত্যাচার আরম্ভ হইল—'রায়ৎ' বলিলে প্রজা বুঝাইত। কিন্তু এই রায়ৎ কথার মূল অর্থ—'মেষপাল'। যাযাবর জাতি মেষ চরায়—তাহার রায়ৎ—মেষপাল। অতএব, এই প্রজার জাতি মনুষ্য হইলেও, মেষপাল।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

কায়রো।

২

কায়রোর সঙ্গে মিশরের পিরামিডের কথা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। পিরামিড বৃহৎ বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডে রচিত ত্রিভুজাকৃতি স্তূপ। যখন বর্ত্তমান কালের কলের 'কপী' বা ক্রেণ আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই পুরাতন যুগে কেমন করিয়া স্থপতিরা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উচ্চে তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া সামঞ্জস্য-সুন্দর গৃহ বা স্তূপ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উড়িষ্যার মন্দিরে ও মিশরের পিরামিডে বর্ত্তমান যুগের স্থপতিদিগের জল্পনা-কল্পনার বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সে কালের স্থপতিরা, সৌধ নির্ম্মাণ-কার্য্য যত অগ্রসর হইয়াছে, তত বালুর স্তূপ রচনা করিয়া প্রস্তর-খণ্ড যথাস্থানে লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং সৌধ-রচনা হইয়া গেলে সেই সঞ্চিত বালুরাশি সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দুর্ব্বোধ সমস্যার এইরূপ সমাধানে যে কষ্ট-কল্পনা দেখা যায়, তাহা মন্দিরচূড়াস্পর্শী বালুস্তূপ রচনার অপেক্ষাও কষ্ট-সাধ্য, সন্দেহ নাই। সে কালের অনেক বিদ্যা—অনেক কৌশল—অনেক শিল্প লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; উড়িষ্যার মন্দিরে পাষাণ সংলগ্ন করিবার 'মসলা' এবং

মিশরের পিরামিডে পাথর তুলিবার ও মিশরে শব-রক্ষার কৌশলও লুপ্ত হইয়াছে।

পিরামিড কি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা লইয়াও পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হইত। কেহ কেহ এমন মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মরুভূমির বালুকার আক্রমণ হইতে কায়রো সহর রক্ষা করিবার জন্য পিরামিড প্রাচীররূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পিরামিড কেবল নগরের উপকণ্ঠেই সংস্থাপিত নহে—অন্যান্য স্থানেও পিরামিড আছে—এ পর্য্যন্ত প্রায় সত্তরটি পিরামিড পাওয়া গিয়াছে। পিরামিড যে নৃপতিদিগের সমাধির জন্য রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কায়রোর উপকণ্ঠে অবস্থিত পিরামিডের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকার নিম্নে রাজার কক্ষ ও রাণীর কক্ষ নামে পরিচিত অন্ধকার ঘর আছে। রাজার কক্ষে বৃহৎ শবাধার বিদ্যমান। সম্ভবতঃ তাহাতেই চিয়পস নৃপতির শব রক্ষিত হইয়াছিল।

পিরামিডের ঐতিহাসিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে পিরামিড দেখিতে গেলাম। যে শেফার্ডস্ হোটেলে আমরা বাসা লইয়াছিলাম, তাহার দ্বারেই বহু প্রদর্শক যাত্রীদিগের আহ্বানের অপেক্ষা করে। তাহাদের এক জনকে আমরা সঙ্গে লইলাম। সাধারণ যাত্রীদিগের পুস্তকে যানবাহনের যত কথাই কেন থাকুক না, ট্রামই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক যান। কায়রোর ট্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তাহাতে আরামে ভ্রমণ করা যায়। ট্রামে অন্যান্য যাত্রীকে লক্ষ্য করিবার ও স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করিবারও সুবিধা হয়। কায়রোর লোক বেশ সামাজিক—অতি অল্প পরিচয়েই আচার ব্যবহারের, সামাজিক রীতি নীতির ও রাজনীতির অনেক কথা বলিয়া ফেলে।

কায়রোর জনবহুল রাজপথ অতিক্রম করিয়া ট্রাম নীল নদের সেতুর মূলে উপনীত হয়। এই সেই নীল নদ—যাহা মিশরের অলঙ্কার—মিশরের বক্ষে মণিহার—মিশরের ঐশ্বর্য্যের কারণ। আমাদের গঙ্গার বা ব্রহ্মপুত্রের মত বিস্তৃত নহে; সে বারিবিস্তার নাই, মৃদুপবনান্দোলিত সে লহরীলীলা নাই; যমুনার সে স্নিগ্ধনীল পরিসর নাই। জল আবিল—প্রবাহ চঞ্চল—বেগ প্রবল। নদীর কূল অনেক স্থলে পোস্তা বাঁধান। সময় সময় প্লাবনে বারিরাশি দুই কূল ছাপাইয়া নগরে ও প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। নদীবক্ষে বহু তরণী ও বাষ্পীয় যান। সেতু পার হইয়া পরপারে আসিলে উদ্যান, ক্ষেত্র ও বৃক্ষবাটিকা লক্ষিত

হয়—মধ্যে মধ্যে বড় বড় সিগারেটের কারখানা। মিশরের সিগারেট প্রসিদ্ধ, 'লঙ্কায় সোনা সস্তা'—মিশরে সিগারেট স্বল্পমূল্য—শুল্কে ও ব্যবসায়ীদের লাভে আমাদের দেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। সে পারেও রাজপথ সুরক্ষিত ও বিস্তৃত। পথের পার্শ্বে ঝাউ, ইউক্যালিপ্টাস্ প্রভৃতি বৃক্ষের সারি। রাজপথে বহু যান—পবনস্পর্শলোলুপ ধনীদিগকে লইয়া যাইতেছে। অশ্বগুলি উৎকৃষ্ট। আরবী ঘোড়াতেও কায়রোর ধনিগণের 'মন উঠে না', তাঁহারা হাঙ্গেরী হইতে বহুমূল্য অশ্ব আমদানী করিয়া থাকেন। কোনও কোনও যানের ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে সুন্দরী রমণীর রূপরাশি বিলয়-ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মত দেখা যায়। উদ্যানে কুসুম, ক্ষেত্রে শস্য, সবজীবাগে শাকসবজী। মধ্যে মধ্যে খাল বা নালা—তাহাতে মহিষ জলপান করিতেছে, বা দেহ ডুবাইয়া মুখটি বাহির করিয়া স্নিগ্ধ কোমল নেত্রে চাহিয়া আছে। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই মরুর বালুবিস্তারমধ্যে পিরামিড যেন পটে অঙ্কিতবৎ বোধ হয়।

যে স্থানে ট্রামলাইন শেষ হয়, তথায় কয়টি হোটেল ও এক জন ফটোগ্রাফারের কারখানা। আর তথায় বহু উষ্ট্র ও গর্দ্দভচালক উষ্ট্র ও গর্দ্দভ লইয়া অপেক্ষা করে। তথা হইতে পিরামিড প্রায় এক মাইল পথ; কেহ বা উষ্ট্রে, কেহ বা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করেন। যাত্রী বাহন ঠিক করিয়া লইলেই ফটোগ্রাফার আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—'ছবি তুলাইবেন ত?' পিরামিডের কাছে—ফিংকসের সম্মুখে ছবি-তুলান যাত্রীদিগের মধ্যে এমনই রেওয়াজ হইয়াছে যে, তাহা পিরামিড-দর্শনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা কোন্ বাহন বাছিয়া লইব, তাহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল, এ দেশের গর্দ্দভ আমাদের দেশের রজকের ভারবাহী গর্দ্দভের মত ক্ষুদ্রকায় নহে—পরন্তু আমাদের দেশের খচ্চরের মত আকারের। মেসোপোটেমিয়ার মত এ দেশেও গর্দ্দভে আরোহণ প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে ইহুদীরাও এই বাহন ব্যবহার করিত। আমরা কিন্তু উচ্চতর যানে আরোহণ করাই স্থির করিলাম, এবং আমাদের প্রদর্শক উষ্ট্রের ভাড়া ঠিক করিলে একে একে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। উষ্ট্রপৃষ্ঠে জিন, এবং তাহাতে যে গোঁজ আছে, তাহাতে বক্কেশ্বরেরও সওয়ার হইতে শঙ্কিত হইবার কথা নহে। নাসামধ্যে ছিদ্র করিয়া রজ্জু দিয়া বল্গা রচিত। চালকের ইঙ্গিতে উষ্ট্র শয়ন করিলে আরোহী আরোহণ করিতে পারে। আমরা তাহাই করিলাম। তখন সেই উষ্ট্রবাহিনী কখনও ধীর কখনও দ্রুত গতিতে মিশরের প্রাচীন

যুগের রাজারাণীর সমাধি পিরামিড অভিমুখে অগ্রসর হইল। যাঁহাদের বিলাসের উপকরণ যোগাইতে মিশরের রাজস্ব ব্যয়িত হইয়াছে, ঐ পিরামিডের অন্ধকার গর্ভে তাঁহাদের শেষ শয়ন; তথায় তাঁহাদের শব মিশরের শব-রক্ষা-কৌশলে রক্ষিত হইয়া—রেশমের ও কার্পাসের বস্ত্রাবৃত অবস্থায় কত দিন ছিল, কে বলিতে পারে?

উষ্ট্রচালকগণ প্রত্যেকেই করকোষ্ঠী দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সব ঘটনা বলিয়া দিতে পারে বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল; নামমাত্র ব্যয়ে ভবিষ্যতের রহস্য জানিবার জন্য আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। আর মরুভূমির বালুবিস্তারমধ্য হইতে সহসা যেন প্রেতের মত আবির্ভূত হইয়া বহু বালক 'পুরাতন' মুদ্রা বিক্রয় করিতে আসিল। এ সব 'পুরাতন' মুদ্রাই কৃত্রিম—পুরাতন মুদ্রার আদর্শে প্রস্তুত করিয়া আরক দিয়া 'পুরাতন' করা। অবশ্য বিক্রেতারা বলিতে লাগিল, পিরামিডের কাছে খননকালে ভূগর্ভে এই সব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ক্রমে আমরা পিরামিডের কাছে আসিলাম। প্রদর্শক মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে পিরামিডের ইতিহাস ও কিংবদন্তী বিবৃত করিতে লাগিল। সে দিকে মন না দিয়া আমি পিরামিড দেখিতে লাগিলাম। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, আমি হতাশ হইলাম। বহু পর্য্যটকের প্রশংসা-পূর্ণ বর্ণনায় আমার কল্পনা পিরামিডে অসম্ভব সৌন্দর্য্যের আরোপ করিয়াছিল বলিয়াই আমি হতাশ হইলাম কি না, বলিতে পারি না। ফার্গুসন তাঁহার স্থাপত্যের ইতিহাসে পিরামিডের গঠনকৌশলের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা যথার্থ হইলেও, ইহার বিরাটত্বই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয় না। ইহাতে কারুকার্য্যের লেশমাত্র নাই। কায়রোর নিকটস্থ মোকাটাম পর্ব্বত হইতে চূণা পাথর কাটিয়া পিরামিড নির্ম্মিত। এই চূণা পাথরের উপর যে মসৃণ করা গ্রানাইট প্রস্তর-ফলক আস্তরণের বা প্রলেপের মত ছিল, পরবর্ত্তী নৃপতিরা তাহা লইয়া প্রাসাদ, মসজেদ ও দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছেন। পিরামিড যেন অসম্পূর্ণ প্রস্তরস্তূপের মত দেখায়। মরুমধ্যে অবস্থিত এই সব স্তূপে বিশেষ গাম্ভীর্য্যও নাই। পিরামিডের কাছে মিশরী বালক ও যুবকরা থাকে—বক্‌শিস পাইলে দ্রুতপদে পিরামিডে উঠে ও আবার নামিয়া আইসে। পর্য্যটকরাও কেহ কেহ তাহাদের সাহায্যে পিরামিডে আরোহণ করিয়া থাকেন। পিরামিডে আরোহণ করিলে না কি কলধৌতশুভ্র এবং প্রসারিত খালে খচিত প্রান্তরের দৃশ্য অতি সুন্দর বোধ হয়।

পিরামিডের পার্শ্বেই স্ফিঙ্কস্। ইহা পিরামিড অপেক্ষা পুরাতন। এই বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তির আননে রবিকরের স্থানপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ইহা মিশরের রহস্য-ভাণ্ডারে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য রহস্য। এখন কোবিদগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা প্রাচীন মিশরের প্রভাত-দেবতার (অরুণ ?) মূর্ত্তি বলিয়া কল্পিত। যে অজ্ঞাত নৃপতি এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তিনি আমাদের দেশে সূর্য্যবংশীয় নৃপতির মত প্রভাত-দেবতার অবতার—এ মূর্ত্তি তাঁহার। মরুমধ্য হইতে যে প্রস্তর-বিস্তার উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই মূর্ত্তি ক্ষোদিত। অধ্যাপক পিট্রি বলেন, ইহার দেহ এক শত চল্লিশ ফিট দীর্ঘ—কপাল হইতে চিবুক পর্য্যন্ত ত্রিশ ফিট দীর্ঘ ও চৌদ্দ ফিট বিস্তৃত। এককালে ইহার একটি প্রস্তর শিরাবরণও ছিল—তাহা পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, স্ফিঙ্কসের চারি দিক খনিত হইলে ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত উপাদান আবিষ্কৃত হইবে। এই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কিংলেক অনবদ্য গদ্যে ইহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, দর্শনে তাহাতে হতাশ হইতে হয়। তিনি বলেন,—স্ফিঙ্কস্ সৌন্দর্য্যের আধার; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য এ জগতের নহে। এককালে পূজিত এই মূর্ত্তি বর্ত্তমান কালে কদাকার ও বিকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু গ্রীক সৌন্দর্য্যের আদর্শ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ স্থূল ওষ্ঠাধরই সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীক আদর্শে সে আদর্শ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যে জাতি তাহার পূর্ব্বে সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারাও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও কপ্টিক জাতীয় খৃষ্টান যুবতীর নয়নে স্ফিঙ্কসের সেই গম্ভীর দৃষ্টি দেখা যায়—স্ফিঙ্কসের ওষ্ঠাধরের সহিত তাহাদের ওষ্ঠাধরের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু আজ আর স্ফিঙ্কস্ সুন্দর বলা যায় না। কেবল যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ-পরিবর্ত্তনেই এমন হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, প্রদর্শক নেপোলিয়নকে এই মূর্ত্তি বিকৃত করিবার কলঙ্কে কলঙ্কিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে সে কলঙ্ক মুসলমানদিগের; তাঁহারাই মিশরের এই প্রাচীন দেবমূর্ত্তি বিকৃত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র তাঁহাদের এই মূর্ত্তিদ্বেষের নিদর্শন বর্ত্তমান। এখন এই ভগ্ননাসা, বিকৃতানন বিরাট মূর্ত্তি শ্রীহীন ও বিকৃত বলিয়াই বোধ হয়। কেবল ইহার প্রাচীনত্ব ও রহস্যই লোককে আকৃষ্ট করে।

স্ফিঙ্কস্ মূর্ত্তির নিকটে একটি মন্দির—বালুকায় প্রায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রাচীন মিশরের স্থাপত্যের নিদর্শন ও অবশ্য-দ্রষ্টব্য।

ফটোগ্রাফার উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আমাদের ছবি লইলে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারি দিকে সব দেখিতে লাগিলাম—প্রদর্শক সকলেরই এক একটা 'রচা কথা' বলিতে লাগিল।

ক্রমে মরুভূমির বালু-বিস্তার দিগন্তের স্বর্ণালোক শোষণ করিয়া লইতে লাগিল। আমাদিগকে ফিরিতে হইবে। কিন্তু তখনই—সেই দিনান্ত-রবিকরে পিরামিড সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

আমরা আবার ট্রামের ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম, এবং হোটেলে কুলপী বরফে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া ট্রামে উঠিলাম। যখন আমরা নীল নদের সেতুর উপর উঠিলাম, তখন অন্ধকার হইয়াছে—কায়রোর সহস্র গৃহের ও রাজপথের বিদ্যুদালোক আকাশে তারকার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। পোর্ট সঈদ সাগরকূলে অবস্থিত; তাই তথায় শত্রুভয়ে রাজপথে আলোক প্রজ্বালিত করা নিষিদ্ধ ছিল—গৃহেও আলোক জ্বালিবার পূর্ব্বে বাতায়নে পর্দ্দা টানিয়া দিতে হইত। কায়রোয় সে ভয় নাই—তাই বৈপরীত্যে আজ কায়রোর আলোকখচিত নৈশ রূপ বড় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। রাজপথের ধারে বড় বড় দোকানে আলোক—কফিখানার সম্মুখে আলোকোজ্জ্বল রাজপথে বসিয়া শত শত পুরুষ ও রমণী কফি বা কুলপী বরফ সেবন করিতেছে—গল্প করিতেছে—হাসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে কেহ বুঝিতে পারে না—অদূরে ও সুদূরে রণক্ষেত্রে সভ্য জগতের ভাগ্য-নির্ণয় হইতেছে, সে যুদ্ধের ফল মিশরকেও ভোগ করিতে হইবে।

হোটেলেও আহারের ব্যবস্থা প্রাচীর উপযুক্ত; হোটেলের পশ্চাদ্ভাগে উদ্যানে—নক্ষত্র-খচিত নীলাম্বরতলে আহারের ব্যবস্থা।

পরদিবস প্রভাতে আমরা কায়রোর বাজার দেখিতে গেলাম। কায়রোর যে অংশে ধনীদিগের বাস, সে অংশ এক হিসাবে বাজার—অর্থাৎ সে অংশে কেবলই বড় বড় দোকান। কিন্তু কায়রোর আসল বাজার কায়রোর পুরাতন পল্লীতে। প্রাচীর নানা দেশে যেমন, কায়রোরও তেমনই পুরাতন বাজার খিলানকরা ছাত আঁটা—মধ্যে ছাত-আঁটা পথ, দুই পার্শ্বে দোকান—এক এক স্থানে এক এক প্রকার জিনিসের দোকান অর্থাৎ 'পটী', বিলাস-সামগ্রীর প্রাচুর্য্য—রেশম, পশম, অলঙ্কার, কাসের জিনিস, গালিচা, মিনাকরা জিনিস, এই সকলে দোকান পরিপূর্ণ। দেখিলাম, জাপানী মাল কায়রোয় যথেষ্ট আসিতেছে। জাপানী মাল মজবুদ না হইলেও সুন্দর ও সস্তা—কায়রোর

লোক এইরূপ মালেরই ভক্ত। কাজেই এই বাজারে জাপানী মাল যথেষ্ট বিকায়। এই বাজারেও আমরা একাধিক ভারতীয় দোকানী দেখিলাম। তাঁহারা বিদেশে স্বদেশী পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং আমাদিগকে পরম আদরে আপ্যায়িত করিলেন।

বাজার ছাড়াইয়া গেলেই পুরাতন সহর বা মহল্লা। মধ্যে মধ্যে বড় বড় মসজেদ—আর সব জীর্ণ গৃহ, কুটীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—অপরিষ্কার, সংস্কারাভাবের পরিচায়ক। রাস্তার ধারে শাক সবজী ডিম্ব মাংস বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা। সবজীর দোকানে বড় বড় লঙ্কা, বেগুন, নানারূপ শাক, বড় বড় কুমড়া। ফলের দোকানে আঙ্গুর, খেজুর, সার্দ্দা প্রভৃতি। রাস্তায় গাড়ী ঠেলিয়া শাকসবজী ফিরি করাও দেখিলাম। রাস্তার উপর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে—ঘোড়ার গাড়ী বা ভারবাহী গর্দ্দভ লইয়া যাইবার সময় চালক চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিতেছে—সরাইয়া দিতেছে। মেয়েরা বোরকায় আবৃত—কিন্তু দোকানী পশারীর সঙ্গে জিনিসের দাম লইয়া ঝগড়া করিবার সময় যেরূপে 'গলা ছাড়িয়া' দেয়, তাহাতে ভারতচন্দ্রের 'শিব-বিবাহে' মেনকার বর্ণনা মনে পড়ে—'হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়।' লম্বা কাবা পরা পুরুষরা গতায়াত করিতেছে—তাহাদের চলন যেন আলস্যব্যঞ্জক। বাজারে দোকানে জিনিসের দর না করিলেই ঠকিতে হয়। বিদেশী দেখিলে দোকানীরা যেন 'পাইয়া বসে।' কায়রোর এই অংশেই 'সেকাল' এখনও বিদ্যমান—অপরাংশ হইতে সে বিতাড়িত। দারিদ্র্য ও রক্ষণশীলতা আর কত দিন পরিবর্ত্তন-প্রবাহ প্রহত করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে, বলিতে পারি না।

কায়রোয় আমরা আর যে সব অবশ্য-দ্রষ্টব্য গৃহাদি দেখিয়াছিলাম, সে সকলের কথা বলিবার পূর্ব্বে এই দিন আমাদের অন্যান্য কার্য্যের বিবরণ প্রদান করিব।

পোর্ট সঈদ হইতে আমাদের কায়রোয় আগমনের সংবাদ আর্ম্মি হেড কোয়ার্টার্সে প্রেরিত হইয়াছিল। কায়রোর সেভয় হোটেলের বাড়ীতে আর্ম্মি হেড কোয়ার্টার্স। পোর্ট সঈদের সহকারী গভর্ণর আমাদিগের এক জনকে বলিয়াছিলেন, 'এখন কায়রোয় যাইতেছেন? দেখিবেন কেবল—gray jacket'। তিনি খাকি পোষাক পরা সৈনিকদিগের কথা বলিয়াছিলেন। এই হোটেলে সত্য সত্যই কেবল খাকি পোষাক পরা সৈনিক ও সৈনিক কর্ম্ম-

চারী—কায়রোর পুরাতন মহল্লা হইতে সেভয় হোটেলে আসিলে মনে হয়, ঐন্দ্রজালিকের মায়াবলে দেশান্তরে আসিয়াছি। এই স্থানে মেজর র‍্যাটক্লিফ আমাদিগকে মিশরী প্রথায় কফি পান করাইয়া আমাদের হেলিওপলিস দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পর আমরা চীফ সেন্সরের কাছে গেলাম। তিনি মিশর সরকারের খাস দপ্তরখানায় কাছারী করেন। যুদ্ধের সময় তাঁহার ক্ষমতাও যথেষ্ট। সব সংবাদপত্রের 'প্রুফ' তাঁহার কাছে দাখিল করিতে হয়; তিনি ছাপিবার অনুমতি দিলে তবে ছাপা হয়। তিনি মিশরের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক। তবে মোট কথা এই যে, এখন প্রকৃতপক্ষে সব ক্ষমতাই ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের হস্তগত।

দপ্তরখানায় যাইবার পথে আমরা একটি শব-যাত্রা দেখিয়াছিলাম। কারু-কার্য্যখচিত আস্তরণে আবৃত শবাধারে শব বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। পশ্চাতে একখানি যান—চারিখানি চক্রের উপর তক্তা দেওয়া। সেই যানে সুবেশে সজ্জিতা মহিলারা অতি মৃদুস্বরে বিলাপ করিতে করিতে যাইতেছেন।

চীফ সেন্সর আমাদিগের কৃষি ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত এবং 'মেল' ও 'মোকাটাম' পত্রদ্বয়ের সম্পাদকদ্বয়ের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কাপ্তেন ওয়েষ্ট্রপ কৃষি ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ। এই কৃষি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ভারতে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। ইহা সমবায় নীতিতে পরিচালিত নহে; বিদেশী ধনীদিগের টাকা খাটাইবার উপায়মাত্র। ইহাতে যদি প্রথমে ঋণভার-জর্জ্জরিত ফেলার কোনও উপকার হইয়া থাকে, তবে সে উপকার ঘটনাক্রমেই হইয়াছে—তাহার উপকার করিবার জন্যই এ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সুতরাং ভারতে ইহার আদর্শ অনুসৃত হইলে যে ভারতবাসী কৃষকের কোনও উপকার হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে না।

'মেল' ইংরাজীতে ও 'মোকাটাম' দেশীয় ভাষায় পরিচালিত। উভয় পত্রই মিশরের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর সমর্থক—কাজেই বর্ত্তমান সরকারের 'নেকনজরে' আছেন। কায়রোয় জাতীয় দলের যে সব পত্র আছে, সেই সকলের প্রচার অধিক—তাঁহাদের উপর সেন্সরের খর দৃষ্টিও আছে। কিন্তু জাতীয় দলের কোনও পত্রের সম্পাদকের সহিত আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। 'মেলে'র সম্পাদক ইংরাজ। তিনি আমাদের কায়রোয় গমন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—আমরা কয় জন 'নেটিভ' সম্পাদক ইংরাজ সম্পাদক মিষ্টার হ্যাওক্রকের নেতৃত্বে পর্য্যটন করিতেছি! 'মোকাটাম'-সম্পাদক খৃষ্টান—কিন্তু মিশরের লোক।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রামেন্দ্রসুন্দর।*

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় মনীষী, মনস্বী, যশস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মার মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপ সহসা নিবিয়া গেল! দেশবাসীর মনে শোকের অন্ধকার; সাহিত্যের তপোবনে বিষাদের ছায়া। সাহিত্য-দেবতার পবিত্র মন্দিরে যে কয়টি দীপে পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আমরা মায়ের আরতি করিতাম, সেই পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বল মধ্য-দীপ রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালার সারস্বত মন্দির অন্ধকার করিয়া অকালে আলোর সাগরে অস্তমিত হইলেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য শোচনীয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র বাঙ্গালার ও সমগ্র বাঙ্গালীর আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যে কয় জন ভাগ্যবানের মধ্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। আমার প্রথম পরিচয়ের প্রীতি ভক্তিতে, এবং সেই ভক্তি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। জীবন-প্রভাতে যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি আমার অগ্রজের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে হারাইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক। কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।

রামেন্দ্রসুন্দর শৈশবে, কৈশোরে স্বীয় জনকের নিকট এই স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশী, কিন্তু দীক্ষা ছিল স্বদেশী। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেন্দ্রসুন্দর কখনও স্বদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

---

* গত ১৮ই শ্রাবণ ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে রামেন্দ্র-স্মৃতিসভায় পঠিত।

আমার মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর 'আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সে কালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্য-জীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষাকবচের মত রক্ষা করিয়াছিল। ডিরোজিও-যুগের দেশহিতৈষিণা, 'গণে'র কল্যাণকামনা, দেশহিত-ব্রতে অদম্য উৎসাহ, রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোনও অসংযম, কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোনও সঙ্কল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ। ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের মত বিশ্ব-নন্দনের নানা ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজত্ব থাকিবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম্ম-সমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদূত। নিজত্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে 'গোঁড়ামী'র স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া শিক্ষাবিভাগে যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে। সংক্ষেপে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয়দান সম্ভব নহে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা,—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে

যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম বহুদিন বাঙ্গালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালীর সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামেন্দ্র-সুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরস ভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব তিনি জলের মত বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া, তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন; তাহার পর সমাহারে স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সকল কর্ম্মের মূল—দেশাত্মবোধ। তিনি দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা'ই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদ রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে পরিষদ-মন্দিরের ইঁটের পর ইঁট গাঁথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলও তাঁহার দেশাত্ম-বোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনিও বলিতে পারিতেন,—'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!' তিনি তাঁহার দেবতার জন্য মন্দির গড়িতেন, এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এমন আন্তরিক চেষ্টা কি বাঙ্গালীর ভাগ্যেও নিষ্ফল হইতে পারে?

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু, বাঙ্গালার অবদান,—এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক

আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গা জলে', রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পূজা করিতেন, বাঙ্গালার ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে,বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন,—'ইংরাজী রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইস্-চ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোনও স্থান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরই তাহার সূচনা করিয়া বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অদূর-ভবিষ্যতে যাহা হইতে বাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিভার, মনস্বিতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিক্রয়ে বাঙ্গালীকে তাহার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'যজ্ঞ' শুধু সাহিত্যের হিসাবেই চিরস্মরণীয় নয়, এই হিসাবেও তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের আন্তরিক দেশভক্তি ও স্বাদেশিকতারও জয়স্তম্ভ বটে। রামেন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি,—
'নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং কর্ম্মী ছিলেন; এবং চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি তেমনই কর্ম্মীদিগকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি ভাবুক ও ভাবের প্রস্রবণ ছিলেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বাঙ্গালার পূজায় মজিয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর করিয়া তিনি অনেক শক্তিশালী লেখককে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু উত্তর-জীবনে দর্শন, উপনিষদ, বেদে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার সহিত ত্রিশ বৎসরের পরিচয়ে আমি তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কখনও গুরুকরণ করিতে দেখি নাই। কালিদাসের উমার শিক্ষার সেই বর্ণনা মনে পড়ে—

'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।'

লর্ড হার্ডিং যাঁহাকে 'এসিয়ার রাজকবি' বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আমরা যাঁহাকে 'এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি' বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাবযজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য্য ছিল। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনার অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েক দিন পূর্ব্বে নাইট উপাধি বর্জ্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগপত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্র বাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্র বাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাঁহার জীবনের এক-

মাত্র প্রেরণা ছিল, দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরও সুন্দর। যদি নিষ্কাম ধর্ম্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ তোমার। সেই স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর—তোমার দেশ সুন্দর হউক, বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষ সুন্দর হউক, হে সুন্দর! তোমার চিরসুন্দর আদর্শ সফল হউক, সার্থক হউক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে সময়ের ঘটনাবলম্বনে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ, তখন হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্নের বয়স ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সকলেই এক একটী করিয়া তৎপূর্ব্বেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। এখন থাকিবার মধ্যে তাঁহার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন একটীমাত্র বিধবা কন্যা আছে; তাহার নাম সুমতি।

প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগুলি একে একে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, ন্যায়রত্নকে কেহ কোনও দিন সাধারণ লোকের ন্যায় শোক দুঃখে বিচলিত হইতে দেখে নাই। তাহারা অল্প দিনের জন্য এই ভব-সংসারে খেলা করিতে আসিয়াছিল, খেলা সাঙ্গ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিয়াছে;—যিনি তাহাদিগকে সংসার-রঙ্গমঞ্চে পাঠাইয়াছিলেন, কাল পূর্ণ হওয়ায় তিনিই তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়াছেন, এই বিশ্বাসেই বোধ হয় ভগবদ্ভক্ত ন্যায়রত্ন পুনঃ পুনঃ শোকের কঠোর আঘাত ধীরভাবে সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং তিনিও ইহ-জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয়-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন তাঁহার সাধ্বী পত্নী কল্যাণী দেবী সাত বৎসরের কন্যা সুমতিকে রাখিয়া, তাঁহার সংসার অন্ধকার করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। ন্যায়রত্নের একখানি পঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি কেহ তাঁহার চক্ষে জল দেখিতে পাইল না।

মাতৃক্রোড়চ্যুতা সুমতি কাঁদিয়া অস্থির হইল। সে এ-ঘরে সে-ঘরে মাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, খাটুলিতে তুলিয়া তাহার মাকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল, 'মা তুই কোথায় গেলি' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে সেই পথ ধরিয়া কত দূর চলিয়া যায়, কিন্তু মায়ের কোনও সন্ধান না পাইয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। কখনও সদর দরজায় একাকী বসিয়া মায়ের প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকে, অবশেষে দুই চক্ষু জলে পূর্ণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্য ঘরে ফিরিয়া আসে, মেঝেয় পড়িয়া হতাশস্বরে বলে, 'মা গো মা!'

সাত বৎসর বয়সের মাতৃহীনা বালিকার মনের দুঃখ কিরূপ মর্ম্মান্তিক, তাহার হৃদয়ের হাহাকার কিরূপ তীব্র, তাহা আমাদের ন্যায় বয়স্ক পুরুষের অনুভব করিবার শক্তি নাই, এবং কোনও পুরুষ লেখকের লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই। তাহার খেলার ঘর অযত্নে পড়িয়া আছে, খেলিবার হাঁড়ি, পাতিল, হাতা বেড়ি, শিল, জাঁতা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। সুমতি আর সেখানে খেলা করিতে বসে না। পাড়ার মেয়েরাও আর তাহার সহিত খেলা করিতে আসে না। সোলার পাল্কী সাজাইয়া পুতুলের বিবাহ দিতে আর তাহার আগ্রহ নাই। তাহার পিতার সংসারের মত, তাহারও খেলার সংসার যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। মা অভাবে বাবাই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। সে আর এক দণ্ডও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে বা অন্য কাহারও সহিত কথা কহিতে আর তাহার ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা হইলে মা সুমতিকে কোলে লইয়া 'রাজা রাণী', 'সাত ভাই চম্পা', 'জীবনকাটি মরণকাটি' প্রভৃতি কত গল্প বলিয়া তাহার ঘুম পাড়াইতেন, এখন সেই সময় মাকে মনে পড়ায় সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িত। অগত্যা ন্যায়রত্ন সন্ধ্যা-আহ্নিক ত্যাগ করিয়া সুমতিকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতেন।

এক দিন সায়ংকালে ন্যায়রত্ন সুমতিকে কোলে লইয়া গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত তুলসীমঞ্চের নিকট বসিয়া আছেন। সুমতি তাঁহার বুকের উপর মুখ রাখিয়া কি ভাবিতেছে; তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভরিয়া আজ কি তুফান বহিতেছিল, তাহা কে বুঝিবে? সে তাহার প্রতিবেশীদের মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মা মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষ মরিয়া কি হয়, কোথায় যায়, তাহা সে জানে না, বুঝিতেও পারে না। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, তাহার মা অন্য কোথাও গিয়াছেন, তাহাকে ফেলিয়া অধিক দিন সেখানে থাকিতে

পারিবেন না, আবার আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিবেন, আদর করিয়া দুধ খাওয়াইবেন, 'মাসী পিসী বনগাঁবাসী'র ছড়া ব'লিয়া ঘুম পাড়াইবেন; কিন্তু কৈ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আর ত তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। তখনই তাহার মনে হইল, মা মরিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসিবেন না, কিন্তু মরিয়া কোথায় গিয়াছেন? সে কিরূপ স্থান?

বালক বালিকারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারুক আর না পারুক, কোনও নূতন জিনিস দেখিলে বা নূতন কথা শুনিলে সে সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাহাদের সেই সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া অনেক সময়েই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে।

আজ সুমতি তাহার পিতার বুকে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিল; ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে সে মুখ তুলিয়া তাহার বিষাদমাখা বড় বড় চক্ষু দুটি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, মানুষ ম'রে কোথায় যায়?'

পিতা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'ঐ স্বর্গে।'

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। মেদিনীমণ্ডল নৈশ অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকায় সমাচ্ছন্ন। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোনটি অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাহার শুভ্র জ্যোতি জল্ জল্ করিতেছে; কোনটির আলোক অত্যন্ত মৃদু, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের রশ্মির ন্যায় মিট্-মিট্ করিতেছে। সুমতি তাহার পিতাকে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রসারিত করিতে দেখিয়া ভাবিল, তাহার মা ঐ নক্ষত্র-লোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু নক্ষত্র ত একটি নহে; তাই সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ নক্ষত্তরে বাবা?'

ন্যায়রত্ন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন বুঝিয়া সমস্যায় পড়িলেন, কিন্তু কন্যার কৌতূহল ত দূর করিতে হইবে। এ অবস্থায় অন্যে যাহা বলিত, তিনিও তাহাই বলিলেন; তিনি একটি সুবৃহৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ যে, যে তারাটি জ্বল্-জ্বল্ করছে, খুব বড় তারা, ঐখানে তোমার মা আছেন।'

এ উত্তরে সুমতির কৌতূহল প্রশমিত হইল না। সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে, ঐ অত দূরে! ওখানে মা কার কাছে আছেন, বাবা?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'ওখানে তোমার মার এক মা আছেন; তিনি তোমারও মা, আমারও মা, সকলেরই তিনি মা। তোমার মা তাঁরই কাছে আছেন।'

সুমতির প্রশ্ন শেষ হইল না, সে একটু ভাবিয়া বলিল, 'তিনি কে বাবা?'

ন্যায়রত্ন বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া যে প্রচণ্ড বিদ্বেষ-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ বিরুদ্ধ ভাব ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহার বাসগৃহের অদূরবর্ত্তী বাজারে গ্রাম্য বিগ্রহ চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কত কাল পূর্ব্বে কোন্ সাধক এই দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যাইত। সুমতি কত দিন বাজারে গিয়া এই মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্ন আজ তাহাকে সেই মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, 'বাজারে মন্দিরের মধ্যে যে মা আছেন,কত দিন তাঁকে প্রণাম করেছ, তিনিই ঐ ক্ষেত্রে আছেন।'

সুমতি এবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে আর কে আছেন?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'ওখানে তোমার দাদারা আছে, দিদিরা আছে, আর তোমার সেই ছোট বোন্‌টির কথা মনে হয়,—সেই নেনা? সে-ও আছে।'

সুমতি তাহার অন্য ভাইভগিনীদের দেখে নাই, তাহার জন্মের পূর্ব্বেই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল, তবে সে নেনাকে দেখিয়াছিল, এবং তাহার কথা একটু একটু মনেও ছিল; এ জন্য তাহার নাম শুনিয়াই সে ব্যগ্রভাবে বলিল, 'ওখানে নেনাও আছে? মা বুঝি এখন তাকেই কোলে নিয়েছেন?'

হঠাৎ অভিমানে বালিকার চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল। সে ঊর্দ্ধে নক্ষত্রলোকে অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিল; যেখানে তাহার মা আছেন, দাদারা দিদিরা সকলেই যেখানে গিয়াছে, তাহার ছোট ভগিনী নেনাও যেখানে মায়ের কোলে বসিয়া আছে—সে স্থান নিশ্চয়ই বড় সুখের স্থান! সেখানে যাইবার জন্য সুমতির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; সে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া পিতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, 'বাবা, আমি ওখানে যাব।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'হাঁ, যাবে বৈ কি মা! তুমি যাবে, আমি যাব। সকলেই ওখানে যাব।'

সুমতি ব্যগ্রভাবে পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, 'কবে যাব বাবা?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'মা জগদম্বা যে দিন যেতে বলবেন, সেই দিন যাব। তিনি ডেকে পাঠালেই যেতে হবে, মা!'

সুমতি আর কোনও প্রশ্ন করিল না, জননীর সহিত পুনর্ম্মিলনের আশায় সে সন্তুষ্ট হইয়া কত কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুমতি আকাশের দিকে চাহিয়া সেই নক্ষত্রটী দেখিত, সেখানে যাইতে পারিলেই মায়ের সঙ্গে দেখা হইবে ভাবিয়া সেই নক্ষত্রলোকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু মা জগদম্বা কবে তাহাকে সেখানে ডাকিবেন, কি রূপেই বা সে অত দূরে যাইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না; তাই সে মধ্যে মধ্যে বাজারে চতুর্ভুজার মন্দিরে গিয়া দেবীমূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করযোড়ে একান্ত আগ্রহভরে বলিত, 'আমার মার কাছে আমাকে ডেকে নাও, মা! মার জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে, আমি তাঁর কাছে যাব।'

কিন্তু দেবীর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া সে ক্ষুণ্নমনে বাড়ী ফিরিত।

*   *   *   *

পত্নী বর্ত্তমানে ন্যায়রত্ন সাংসারিক সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু পত্নী-বিয়োগের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার জীবন-যাপন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। সংসারে উদাসীন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাপরায়ণ, ভগবৎচিন্তায় সদা নিমগ্ন, সংযতচেতা মুমুক্ষু ব্রাহ্মণকে এই বৃদ্ধ বয়সে বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইতে হইল! সুমতিকে চক্ষুর আড়ালে রাখিয়া তিনি এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি বাহিরে দেখেন সুমতি, পূজা করিতে বসিয়া অন্তরে দেখেন সুমতি! সুমতি তাঁহার সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিল। অপত্যস্নেহ তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিয়া তুলিল যে, সুমতির জন্য এখন তাঁহার আরও দশ বৎসর জীবিত থাকিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। মৃত্যুর জন্য পূর্ব্বে যিনি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত থাকিতেন, এবং বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহে, অবসাদগ্রস্ত প্রাণে যাহা তিনি জগজ্জননীর শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করিতেন— তাহাও যেন তাঁহার নিকট আর তেমন শীঘ্র প্রার্থনীয় মনে হইল না। মৃত্যু কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, হঠাৎ যদি তাঁহাকে ইহলোক হইতে চিরবিদায় লইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা, তাঁহার শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন সুমতির কি দশা হইবে, সে কোথায় কাহার আশ্রয় লাভ করিবে, কে তাহার মুখের দিকে চাহিবে—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ন্যায়-রত্ন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেন; তাঁহার চিত্তের সংযম যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে একটি সুপাত্র দেখিয়া এই অল্প বয়সেই সুমতির বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর প্রাণাধিকা কন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁহার অন্তিম-মুহূর্ত্ত বিষাদাচ্ছন্ন হইবে না।

ন্যায়রত্নের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, দেশপূজ্য, প্রথিতযশাঃ সুপণ্ডিতের পক্ষে সুশীলা সুন্দরী কন্যার জন্য মনের মত সুপাত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। কারণ, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বর নিলামে বিক্রয় হইত না, এবং একালের মত সেকালে একমাত্র কাঞ্চন-কৌলীন্য সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। পাত্রটি রূপে গুণে বংশ-গৌরবে—সকল বিষয়েই সুমতির 'যোগ্য বর' হইয়াছিল। শুভ দিনে শুভক্ষণে ন্যায়রত্ন শাঁখা শাড়ী দিয়া হৃষ্টচিত্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; তাঁহার বুকের উপর হইতে দুশ্চিন্তার নিদারুণ পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। 'অষ্টমঙ্গলা'র পর শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুমতি তাঁহার নিকটেই রহিল; এবং পূর্ব্বের মত হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

মনুষ্যের অদৃষ্টাকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা কত কি চিন্তা করি, কত সঙ্কল্প স্থির করিয়া বুদ্ধি বিবেচনা ও সামর্থ্যের অনুরূপ কার্য্য করি, কিন্তু আমাদের কয়টি ইচ্ছা, কয়টি সঙ্কল্প পূর্ণ হয়? এই জন্যই বুঝি কেবল কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফল ভগবানের হাতে।

ন্যায়রত্ন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁজি পুঁথি দেখিয়া, ঠিকুজী কোষ্ঠী মিলাইয়া সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, ভাবিলেন—এত দিনে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন তিনি শান্তিতেই কাটাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। কন্যার বিবাহের কয়েক মাস পরে হঠাৎ এক দিন সংবাদ আসিল, দারুণ বিসূচিকা রোগে তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইয়াছে।—সুমতি বিধবা হইয়াছে! বিবাহের পর বৎসর না পুরিতেই দুধের মেয়ে সুমতি—স্বামী কি বস্তু তাহা না বুঝিতেই বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে বিধবা হইল। নির্ম্মম কালের এক ফুৎকারে—মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। হায় বিধিলিপি!

এই দারুণ দুঃসংবাদে ন্যায়রত্নের বুক ভাঙ্গিয়া গেল; শোকে দুঃখে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। ন্যায়াদি দর্শন, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, সিদ্ধপুরুষদিগের রচিত, জীবনের অনিত্যতা-সম্বন্ধীয় শত শত কবিতা ও গাথা, কিছুই তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে পারিল না। সংসারীর পক্ষে মোহের বন্ধন কত কঠিন, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াও গদগদস্বরে অশ্রুনেত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'মা জগদম্বে! এ কি করিলে? দুধের শিশুকে বিধবা না করিলে কি তোমার

সৃষ্টিকার্য্য ব্যর্থ হইত? না, এই মহাপাপী অজ্ঞান বৃদ্ধের বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার জীবনের শেষ শান্তিটুকু কাড়িয়া লইয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল? তুমি ত মা চিরমঙ্গলময়ী, তবে কোন্ পাপে, জন্মান্তরের কোন্ অপরাধে, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি পুণ্য-প্রতিমা আমার মায়ের দশা এমন করিলে? সুমতির জীবনের সকল আশা, সকল সুখ চূর্ণ না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এই অকর্ম্মণ্য হতভাগ্য বৃদ্ধকে কেন গ্রহণ করিলেন না মা!'

ন্যায়রত্ন কেবল ছেলেটি দেখিয়াই তাহার হাতে সুমতিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন; তাহার শ্বশুরবাড়ীতে তেমন কেহ অভিভাবক ছিল না; সুতরাং পতিবিয়োগে সুমতি নিরাশ্রয় হইল। পিতা ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ অভিভাবক রহিল না; কিন্তু ন্যায়রত্নের জীবন আর কত দিন? শোকের পর শোকের কঠোর আঘাতে তাঁহার নিঃশেষিতপ্রায় জীবনের উৎস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শোক তাঁহাকে কাতর করিতে পারিত না সত্য, কিন্তু তাহার লেলিহান জিহ্বা বহ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার এক একখানি অস্থিকে অঙ্গারে পরিণত করিতেছিল;—কোন্ শক্তিতে তিনি তাহা নিবারণ করিবেন? কিন্তু তথাপি তিনি যাহা পারিতেন, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তিনি বিস্তর চিন্তা করিয়াও যখন সুমতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাহার নিবিড় অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভাগ্যগগনের কোনও প্রান্তে আশার বিন্দুমাত্র আলোকস্ফুরণ দেখিতে পাইলেন না, তখন সেই ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'ভগবান, মঙ্গলময় তুমি, তুমি যা কর, তাই হইবে' বলিয়া হতাশভাবে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার করুণায় নির্ভর করিয়া তিনি অনেকটা মনঃস্থির করিলেন; শোকের কঠোর আঘাত ক্রমে তাঁহার সহ্য হইয়া আসিল। পূর্ব্বে যে ভাবে তাঁহার দিন কাটিত, সেই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। সুমতির বিবাহের কথাটা সময়ে সময়ে তাঁহার স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইত;—কিন্তু স্বপ্ন ও সত্য একাকার হইয়া তাঁহার মনের উপর যে বিষাদ ও নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা কোনও দিন তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইল না।

*　　*　　*　　*

তারানাথ ন্যায়রত্নের অল্প কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমী ছিল; তাহাই ভাগজোতে বিলি করিয়া তিনি প্রজার নিকট যে খাজনা ও ধান্যাদি শস্য পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ভিন্ন দেশ-

মধ্যে অতি নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকায়, অনেক সময় অনেক স্থানে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, তাহাতেও তাঁহার দশ টাকা আয় হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার শূলরোগ হওয়ায় তিনি শারীরিক অসামর্থ্যবশতঃ নিমন্ত্রণে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন; ইহাতে যদিও তাঁহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে জন্য তাঁহার অভাব বোধ হইত না। সুতরাং তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য কেহ অসন্তুষ্ট দেখিতে পাইত না। কোনও বিষয়ের অভাব কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত অভাব পূরণ করিতে না পারিলেই দুঃখ অনুভব করিতে হয়। ন্যায়রত্ন মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতেন; এতদ্ভিন্ন এ সংসারে জীবনধারণের জন্য অন্য কোনও বস্তুর প্রয়োজন হইতে পারে, এ কথা তিনি কোনও দিন চিন্তা করেন নাই। এই সকল কারণে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারে অভাবজনিত দুঃখের বার্ত্তা কেহ কোনও দিন শুনিতে পায় নাই।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ন্যায়রত্নের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; গ্রামে একটি টোল ছিল, সেখানে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার শূল রোগ হওয়ায়, বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগের পর সুমতির লালনপালনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় —তিনি অনেক দিন হইতে অধ্যাপনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই; টোলটিও উঠিয়া গিয়াছে।

সুমতি বয়ঃস্থা হইয়া সংসারের ভার স্বয়ং বুঝিয়া লইয়াছে; সুতরাং ন্যায়রত্নকে এখন আর সাংসারিক কোনও বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। পূজার্চ্চনায় দিবসের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে, সে সময় তিনি লেখাপড়া করেন; কখনও সুমতিকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন। ক্রমে এই শেষোক্ত কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইহাই তিনি জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

সুমতি ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সময়ের মধ্যেই সে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ সুন্দররূপে আয়ত্ত করিল। ন্যায়রত্ন অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি টীকা লিখিতেছিলেন; এখন তাহা আর তাঁহাকে স্বহস্তে লিখিতে হয় না; তিনি মুখে বলিয়া যান, সুমতি তাহার সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিশুদ্ধরূপে তাহা লিপিবদ্ধ করে।

ন্যায়রত্নের সুশিক্ষায় স্নেহময়ী কন্যার কঠোর বৈধব্য-জীবন এইরূপে শান্তি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ন্যায়রত্ন তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ভগবান তাঁহাকে পুনর্ব্বার অতি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিবেন। ক্রমশঃ।

শ্রীদীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি।

৪

১০ই সেপ্টেম্বর।—সন্ধ্যা ছয়টা; পরিখার ভিতর বোমা ও Torpedo ফাটিতেছে; এমন এক ঘণ্টা চলিল। ৭৫ মিঃ মিঃ কামান ছোঁড়ায় এ সব থামিল। আমরা জানিতাম, শত্রুর রণোৎসাহ এত শীঘ্র থামিবার নয়। আমরা সশস্ত্র;—সতর্কে ঘুমাইলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহর; ঘণ্টা বাজিল; হাবুল ও আমি কামানের নিকট গেলাম। সে সবুজ জাল * সরাইয়া কামানের মুখটী বাহির করিল; কোন্ জায়গায় আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন জানিবার জন্য আমি C. O.এর Dugoutএ গেলাম। ইহা অবগত হওয়ায় হাবুলের পকেট-ল্যাম্পের সাহায্যে কামানের দিক ঠিক করা হইল। অস্ত্রাগারে গিয়া সে Shell, Fuse, বারুদ ইত্যাদি আনিল; চার্টের নির্দ্দেশমত কামান ভরা হইল; মাথার উপর শত্রুর গোলা পড়িতেছে; গভীর অন্ধকার; তার মধ্যেই হাবুল সব কাজ করিল। কামান কতখানি উঁচু করিয়া ছোড়া উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করা হইলে, অন্যান্য সকলে আসিয়া উপস্থিত।—শত্রুর লাইনে ভীষণ গোলা গুলি বর্ষণ করা হইল। 'মেশিন-গানে'র তেমনতর গর্জ্জন পূর্ব্বে অন্য কোথাও শুনি নাই; আট্‌কোড়েব সময় ৬০০০ ছেলের ১২০০০ কাটি দিয়া তাড়াতাড়ি কুলা পেটার শব্দের মত মনে হইল!—Grenade ফাটার বিকট শব্দ, পরস্পরে মিশিয়া আকাশ শব্দায়মান করিয়া তুলিল।

হরধনুর সাত রঙ্গে আকাশ রঙ্গিয়া উঠিল; 'ফিউজ'গুলি হাউয়ের মত ছুটিয়া উপরে চলিল—বুঝা গেল, বিভিন্ন স্থানে 'আর্টিলারী'র বিভিন্ন রকম সাহায্যের প্রয়োজন। বড় বিচিত্র দৃশ্য—সেখানে থাকিলেও যেন সুখ। যুদ্ধ থামিতে লাগিল এক ঘণ্টা। আমরাও ফিরিলাম। ফিরিলে হাবুল বলিল, 'কামান

---

* মাটির উপর দৃশ্যমান কিছুই প্রস্তুত করা হয় না। গাড়ীর চাকায়, কামানের গোলায় সাদা মাটী দেখা গেলে রোজ প্রাতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া সেখানে ছড়ান হয়, বা চাপ্‌ড়া দিয়া সেগুলি আবৃত করা হয়। ঘাস কাটা ও চাপ্‌ড়া কাটা সীমান্ত-সমরাঙ্গনে একটী বড় রকমের দৈনন্দিন কাজ। দুই এক ক্রোশের মধ্যে ঘাস প্রায় গজাইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন সুড়ঙ্গ বা খাত কাটা হয়, তখন পাথর উপরে তুলিলে মাটীর উপর সাদা দেখায়; এ জন্য সকল কর্ম্মস্থানের উপর একটী সবুজ ছত্রী টাঙ্গান হয়। তারের জালের ফাঁকে ফাঁকে নদীর ঘাস বাঁধা; সমস্তটা সবুজ রঙ্গে ছোপান। এইটী আমাদের ছত্রী।

থেকে ধূম বাহির হইতেছিল,—তাড়াতাড়ি গাদায় হাত পুড়িয়া গিয়াছে।" আমরা বলিলাম, 'হাবুল, আমাদের মত সহস্র লোক মরেছে—কারুর পা ভেঙ্গেছে—কারুর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে লোহার তারে জড়িয়ে গেছে;—কত সুন্দর যুবক—দেখ্‌তে ফুলের মত ফুটন্ত—তাদের খুলি উড়েছে, দাঁত বার হয়েছে—বিস্ফারিতচক্ষু হয়ে পড়ে আছে—কি কদাকার হ'য়েছে বল ত, তাদের কেউ রক্ষা করতে পার্‌বে না; একমাত্র কাল তাদের মৃত্যু এলে এই আধ-মরা জীবন থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিতে পারে।—তুমি কি একবার তাদের কথা ভাব্‌বে না?'

৫ই অক্টোবর :—বড় বৃষ্টি; ঝড়ো হাওয়া উঠিয়াছে; গড়পড়তা শৈত্যের পরিমাণ ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অনেক দিন পরে নগরে যাইবার অনুমতি পাইলাম। সেখানে গরম জলে বেশ করিয়া স্নান করিতে হইবে। সীমান্ত-রালে (Front) লোক পশুর মত হইয়া পড়ে। যদি তারা অনবরত বাপ, মা, স্ত্রী ইত্যাদি প্রিয়জনের পত্র না পায়,—যদি তাদের না থাকে ভাবের অফুরন্ত উৎস, কিংবা যদি না থাকে আধ্যাত্মিক জীবন। লাইনের পিছনে বড় বড় সহর, এবং নগর; সৈন্যেরা সেখানে বারো ফ্র্যাঙ্ক্‌ দিয়া কোনও Lodgeএ বসিতে, কিংবা পঁচিশ ফ্র্যাঙ্ক্‌ দিয়া Opera কিংবা Cinemaতে Reserved box ভাড়া করিতে যায় না। তারা যায় সেখানকার ভদ্রলোকদের দেখিতে; যারা সমরের কাটাকাটি ব্যাপারে আদৌ নাই, তাদের সহিত দুটা কথা কহিয়া, স্পর্শ করিয়া একটু সুখ অনুভব করিতে। তাদের এমনতর ইচ্ছা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না; তারা ভিন্ন অপর কেহ ইহা উপলব্ধি করিতেও পারে না; সন্দেশের স্বাদ যারা পাইয়াছে, তারা ব্যতীত যেমন অন্য কেহ সন্দেশের মর্ম্ম বুঝে না।

ইহাদের এই ইচ্ছার তুলনা চুম্বকের একটী বিচ্ছিন্ন Poleএর সহিত করা যাইতে পারে;—কৃত্রিম উপায়ে বিচ্ছিন্ন হইলে একটী Pole স্বধর্ম্মে যেমন অপর Poleটী পাইবার যথাসাধ্য প্রয়াস পায়;—পত্নী হইতে বিচ্যুত হইলে স্বামীর উৎক্ষিপ্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এবং ইহাকে যদি ঔৎসুক্য বলিতে হয়, তাহা হইলে, কোনও স্বদেশবৎসল পল্লীবাসীর সমস্ত I. D. F. গ্রামের পাশ দিয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিবার কৌতূহল অপেক্ষা শত গুণ প্রগাঢ়তর। সাদাসিদা জীবনের নামগন্ধ নাই, সুখ নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই, বৈচিত্র্য নাই;—মা নাই, ভগ্নী নাই, পত্নী নাই;—তাহাদের নয়নসম্মুখে সবুজ পোষাকের মেলা লাগিয়াছে কিংবা কেবল খাকি পোষাক আর খাকি

পোষাক—এক রকমের আহার, প্রত্যহ এক কাজ, মদ, এবং গানের বৈচিত্র্যবিহীন আমোদ—এই সব মিলিয়া মিশিয়া নিষ্প্রভ জড়ের জীবন সৃষ্টি করিয়া তোলে। সে জন্য Civilianদের সংস্পর্শে আসিবার অনুমতি পাইলে তাহারা জীবনে নূতন পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রাণশক্তি অনুভব করে। সে অনুমতি কত মধুর, কত সুখপ্রদ। নূতন প্রাণের নূতন অনুভূতি অজ্ঞাত উপায়ে চিত্তে শক্তিসঞ্চয় করিয়া রাখে; ফিরিয়া যুদ্ধকালে জীবনীশক্তির যেটুকু ক্ষয় হয়, এই সঞ্চয়ের উৎস বহু দিন সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারে। সৈন্যদের সহিত 'সিভিলিয়ান'দের সামান্য আদান-প্রদানে যে এমন সঞ্জীবনী-সুধা উঠিতে পারে, জর্ম্মণেরা প্রথমে তাহা টের পায়। যেমন পাওয়া, অমনি মার্ণ যুদ্ধের পর সৈন্যদের নগরে যাইবার ছাড়পত্র দিতে লাগিল। ফরাসীরাও ইহার আশু ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ঐরূপ করিতে থাকে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যবায় পূর্ণ করিবার জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক।—আমাদের ব্যাটারী কোথায় স্থাপিত, তাহা বুঝিতে যাহাতে শত্রুর ভুল হয়, সে জন্য কতক কতক কামান স্থানান্তরে পাঠান হইল; এক নূতন জায়গা হইতে সেগুলি অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল।

১২ই অক্টোবর।—আগের কয়েক রাত্রি বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল; মাথার উপর ফরাসী, আমেরিকান ও জর্ম্মাণ 'এরোপ্লেন', আর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন। নিকটের গ্রামে গ্রামে Torpedo ফাটার ভীষণ শব্দ; উভয় পক্ষ হইতে Anti-aviation gunএর মুহুর্মুহুঃ গোলা-বর্ষণে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মন্দ্র রব। কত ঘর বাড়ী, কত দোকান পাট ধূলিশায়ী—কোথাও বা অফিসারের দল স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মাটীতে প্রোথিত হইয়াছে। এ ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হাবুল আজ ব্যাটারীর প্রধান অফিসে গেল। আমাদের আর্টিলারীর সামর্থ্য শত্রু যাহাতে না জানিতে পারে, সে জন্য দুই বা ততোধিক ব্যাটারী *

---

* ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের বড় কামান (Heavy artillery) বলিতে কিছুই ছিল না। ১২০ মিঃ মিঃ পুরাণ চপের কামান 'রেজিমেণ্ট' প্রতি একটাও খুঁজিলে পাওয়া যাইত না। ছিল কেবল ৬৫,৮০,৯৫ মিঃ মিঃ পুরাণ কামান (Model st Etieune 1900); আর Army Corps পিছু ১৫৪টা ৭৫ মিঃ মিঃ কামান—পাল্লা (Range) ১৫ কিঃ মিটার; মিনিটে ৩০টা গোলা ছুড়িতে পারিত। এরূপ সরঞ্জামের অভাবের কারণ সমরসচিবের ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের দুই একটা কথা স্মরণ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়;—'ডেপুটী চেম্বারে' ঐ মাসে একবাক্যে

আমাদের ব্যাটারীর সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক একটী এমন ব্যাটারীতে চারিটী করিয়া কামান। আমাদের পুরাণ পোষাক বদলান দরকার,—হাবুলের সঙ্গে সে সব দিলাম। সে দুপুরে রওনা হইল—তখন বেলা ১টা; তাহার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "আমি নিশ্চয় মারা পড়িতাম, কিন্তু আজ যে আমার মরণের দিন নয়। জর্ম্মণের গোলার অগ্নিবৃষ্টিতে আক্রান্ত হইলাম—কে জানিত, কামানের লক্ষ্য ঠিক করার ছলে শত্রু St. Cathorine দুর্গের ৪০০ গজ সামনে যে Shrapnel ছুঁড়িতেছিল, তার আসল লক্ষ্যীভূত স্থান দূরে আমাদের অফিসটী। * ৫০ গজ সামনে যেমন প্রথম গোলা ফাটা, মাটীতে অমনই আমার সটান হ'য়ে শুয়ে পড়া। মাথার উপর Shrapnel ফাটিতে লাগিল—কতক বা আশে পাশে জমীতে পড়িয়া ফাটিল। মাঝে মাঝে আমি দৌড়িয়া পালা:, আর শুয়ে পড়ি। আমি দাঁড়িয়ে পড়ব, না শুয়ে থেকে এ দারুণ অগ্নিবৃষ্টির শেষ পশলা পড়িতে

জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ৭৫ মি: মি: কামানের যে কয়েক সহস্র অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কত দূর হইয়া উঠিয়াছে। সমরসচিব একটু বিরক্ত হইয়া বলেন—পরে উত্তর দেওয়া যাইবে। তার পর হাসিয়া কহেন,—"আপনারা কি মনে করেন,আবার সভ্য জগতে যুদ্ধ করিতে হইবে ?" —General Maitran ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দ্দিক হইতে কামান তৈয়ারী করিয়া ফ্রান্সে আনাইয়াছিলেন। তার মধ্যে প্রধানত: ছিল ১৫৫ মি: মি: বড় কামান—পাল্লা ২০ Kilo মি:, প্রায় ৩০টী গোলা ছুড়িতে পারিত। পুরাণ ব্যাটারীর সংখ্যা না বাড়াইয়া, প্রত্যেক ব্যাটারীতে তখন হইতে ২, ৪, ৬টী করিয়া আবশ্যকমত কামান যোগ করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ইহাতে শত্রুর পক্ষে আমাদের কামানের সংখ্যা জানা শক্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে আমাদের ব্যাটারীতে ৪টী করিয়া কামানের ৩টী ব্যাটারী ছিল। তার মধ্যে সকল রকমের গর্ভযুক্ত (Calibre) কামান ছিল।

* গোলাবর্ষণ কোনও লক্ষ্যের উপর নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় নানারূপ। সোজাসুজি লক্ষ্যের উপর গোলা ছুড়িয়া কত angle, কোন্ দিক, ঠিক করা যায়,—ইহাকে Direct regaling বলে। আর কখনও কখনও লক্ষ্যের সন্নিহিত জ্ঞাত চিহ্নিত স্থানের (Auxiliary point) উপর গোলা-বর্ষণ নির্দ্দেশ করা হয়; এবং যুদ্ধের সময় সেই চিহ্নিত স্থানের আর লক্ষ্যের মধ্যে যতটুকু কোণের (angle) তফাৎ, আর দূরত্বের তফাৎ, ততটুকু যোগ বা বিয়োগ করিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে, মোটামুটি গোলা লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে। এরূপ করিবার সুবিধা এই, একটা বাজে জায়গার উপর যখন গোলা ছোড়া হয়, তখন তাহা যুদ্ধের সময় কাহার উপর ফিরাইয়া ধরা হইবে, কেহ ঠিক্ ঠিক্ নির্দ্দেশ করিতে পারে না; কাজেই কোন্ কোন্ ব্যাটারী জর্ম্মণদের ফটোগ্রাফে উঠিয়াছে, তাহা না বুঝিতে পারায়, এক রকম অনির্দ্দিষ্টভাবে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়।

দিব, তার কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না। ৫০০ গজ ছুটিয়া অফিসে যাইবার গোপন সুড়ঙ্গ-পথে উপস্থিত—অগ্নিবৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিলাম। কাঁধে পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া ফিরিবার সময় এ প্রহসনের পুনরভিনয় হইল। গোলা গুলি বৃষ্টির মত পড়িতেছে, আর আমি চলিয়াছি তার মধ্য দিয়া ছুটিয়া; কিছু দূরে গিয়া মাটীর নীচে একটী ছোট ঘরে আশ্রয় পাইলাম। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, ছট্‌কা টুকরাও আমায় স্পর্শ করে নাই।"

শৈত্য বাড়িয়াছে—এখন ইহার পরিমাণ ৮ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। প্রাতে প্রায় শিশির জমিয়া যায়; দেখিলে মনে হয়, কে যেন গুঁড়া চূণ ছড়াইয়া দিয়াছে—চারিদিক সাদা ধপ্‌ ধপ্‌ করিতেছে।

১৬ই অক্টোবর।—এয়রোপ্লেন সাহায্যে ঠিক করা হইতেছে, কি ভাবে কামান ছুড়িলে লক্ষ্য অব্যর্থ * হয়। ইহার মধ্যে আমরা তিন তিন বার আক্রান্ত

---

* পূর্ব্বে ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড় হইতে দূরবীণ কষিয়া শত্রুর অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইত; গোলা ছুড়িতে ছুড়িতে দূরবীণ দিয়া দেখিয়া একটু আগু পিছু বা ডান দিকে বাঁ দিকে গোলা ফেলা হইত। অধিকাংশ সময় দৃশ্যমান লক্ষ্যের উপর আক্রমণ করা হইত। সম্মুখযুদ্ধ উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুকাইবার ব্যবস্থাটা যেমন নৈপুণ্যের মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল, তেমনই গোলন্দাজকেও ক্রমে ক্রমে দৃশ্যমান লক্ষ্য হইতে অদৃশ্য লক্ষ্যের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। লক্ষ্যের অবস্থান কোনরূপ ম্যাপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ত্রিকোণমিতির সাহায্যে তাহার দূরত্ব এবং কোণ (angle) নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপর কামান ছোড়া হইত; শত্রুর নিকটবর্ত্তী কোনও একটা গুপ্ত স্থান হইতে দূরবীণ কষিয়া গোলা কি রূপে পড়িতেছে, তাহা বলিলে, (Signal) গোলন্দাজ কামান উঁচু নীচু করিয়া এ-দিক ও-দিকে মুখ ঘুরাইয়া ঠিক ঠিক ভাবে গোলা ফেলিতে চেষ্টা করিত। ইহার পর জর্ম্মণের দেখাদেখি এয়রোপ্লেন হইতে দূরবীণ কষা আরম্ভ হইল—তখন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। কোনরূপে মাটীর উপর বড় বড় সাদা পাল পাতিয়া তাহাতে কাল কাল অক্ষর দিয়া aviaterকে সংবাদ পাঠান হইত। Aviater আলো বা নিশানের সাহায্যে গোলা কোথায় পড়িতেছে, তাহার সঙ্কেত করিত। তার পর উঠিল উড়োকলে wireless, ইহাও শত্রুর নিকট ধার করা। সেই সঙ্গে উড়োকলে আপনা-আপনি angle দেওয়া Machine gun বসান হওয়ায় অন্তরীক্ষ হইতে একমাত্র observation ও regaling সম্পন্ন হইতে লাগিল। Regale করিবার আগে উড়োকলের আড্ডায় খবর পাঠান হইত,—অমুক যায়গায় এত ঘণ্টার সময় অমুক নম্বর ব্যাটারী গোলা ছুড়িবে। যথাসময়ে জাহাজটী আসিয়া বেতারে খবর দিল—'আসিয়াছি'। কামান ধরিয়া theoretical কথা অনুযায়ী দিকে নির্দ্দেশ করা হইল। কলটী লক্ষ্যের উপর দূরবীণ কষিয়া আজ্ঞা করিল—'ছোড়'। এক মিঃ পরে কোথায় গোলায় আঘাতে ধূলি উড়িল, তাহা দেখিয়া সংবাদ পাঠাইল—যথা, ডাইনে ২০ মিলিয়াম; আগে ৩০ মিলিয়াম। যন্ত্রগুলি যথাযথ ঠিক

হইলাম। ক্রমে চারি দিক হইতে আঁধার নামিল। তখন আসল আক্রমণ আরম্ভ হইল। সারা রাত যুদ্ধ, আর যুদ্ধ। ভোর ৫টা হইলে আমরা কামান ছোড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। রাত্রে আমাদের আদৌ ঘুমের ইচ্ছা হয় নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য।—যথেষ্ট ক্লান্তি হইয়াছে, তিন ঘণ্টা অন্তর বিশ্রাম করা সত্বেও। চতুর্দ্দিকে তুমুল উত্তেজনা, কামানের অগণিত গর্জ্জন; যুদ্ধের নূতন নূতন ঘটনা-পর্য্যায়ে মন নিবিষ্ট; ঘুম আসিবে কেমন করিয়া?

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

বিদেশিনী।

১

সলিলকুমার আমার পিসতুতো ভাই হইলেও সহোদরের অধিক। বাবাই জিদ করিয়া আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন। তখন বিধবা পিতামহী পুত্র কন্যা লইয়া ভ্রাতার সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অবস্থায় বাবা যখন আশ্রয়দাত্রী মামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার ভগিনীর

করিয়া আবার কামান নির্দ্দেশ করা হইল। বেতার যন্ত্রে 'আমরা প্রস্তুত হইয়াছি', এই সংবাদ পাইয়াই কর্ণধার দূরবীণ কষিয়া আজ্ঞা করিল—'ছোড়।' আবার সংবাদ আসিল—পশ্চাতে ৬০ মিলিয়াম, ডাইনে ২০। এইরূপে ছুড়িতে ছুড়িতে যখন লক্ষ্যটা দুইটা গোলার মধ্যে পড়িয়া গেল, তখন সেই দুই দূরত্বের মাঝামাঝি একটা দূরত্ব লইয়া, এবং ঠিক ওই রকম মাঝামাঝি একটা দিক ঠিক করিয়া তাল করিয়া গোলা ছুড়িতে আরম্ভ করা হইল। যদি দেখা গেল, অধিকাংশ গোলা ঘনভাবে লক্ষ্যের উপর পড়িতেছে, তখন মোটামুটি লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, জানা গেল।

পূর্ব্বের দুই উপায় ব্যতীত আরও দুই তিনটী উপায়ে Regaling করা যাইতে পারে। কখনও কখনও পাকা সেনানায়কেরা কানে শুনিয়া কামানের দিক নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন। অনেক সময় উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গুলি দিয়া কোণ মাপিয়া কামানের দিক ঠিক করা হয়। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত একটী পরিমাপ আছে; এই দর্শনের উপর এই সূক্ষ্ম পরিমাপের উপায় প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুর উচ্চতায় মুঠা করিয়া হাতটা লম্বা করিয়া ধরিলে এক একটী অঙ্গুলি ১ হাজার গজ দূরে কতকটা করিয়া জমী আবৃত করিয়া ফেলে; এইরূপে মাপিয়া দেখা যায় যে, বৃদ্ধাঙ্গুলি—৪০; তর্জ্জনী ও মধ্যমা—৩০; অনামিকা—২৫, কনিষ্ঠা ২০ মিঃ স্থান (১ হাজার গজ দূরে) আবৃত করিয়া থাকে। বলিতে কি, এ অঙ্গুলির সাহায্যে যত তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায়, আর কার্য্যতঃ ইহা এত সূক্ষ্ম হইয়া উঠে যে, উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গুলি দিয়া অদ্ভুত কার্য্য দেখাইতে পারা যায়।

বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন—মামার বাড়ীতে তাঁহার বাস উঠিবে। তাঁহার মাও তাঁহাকে এমন ভাবে মামীর ইচ্ছা অবহেলা করিতে নিষেধ করিলেন। বাবা শুনিলেন না। মামী বাবাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'নিমকহারাম।' মামাকে বলিলেন—'দেখিলে ত

'যম, জামাই, ভাগনা—
তিন হয় না আপনা।'

ভগিনীর বিবাহ দিয়াই বাবা মামার বাড়ী ত্যাগ করিলেন—দুই বেলা দুইটা ছেলে পড়াইয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন, আর ওকালতীর পড়া পড়িতে লাগিলেন। যাহার এমন জিদ থাকে, তাহার সাফল্য লাভ হয়। বাবারও হইল। তিনি ওকালতী পাশ করিয়া বিবাহ করিলেন। ওদিকে পিসে মহাশয় ডেপুটী হইয়া চাকরী লইয়া বিদেশে গেলেন। এই সময় সংসারে সুখের প্লাবন দেখিতে দেখিতে পিতামহী লোকান্তরিতা হইলেন।

তাহার পর দুর্দ্দশার অতর্কিত আঘাত আসিল—সফরে যাইয়া পিসে মহাশয় বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিলেন। বাবা সে শোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সলিলকুমারকে লইয়া পিসীমা আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তখন সলিলকুমারের বয়স দুই বৎসর—আমার এক বৎসর। পিসীমার পক্ষে শোক একেবারে অসহনীয় হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল—বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে তিনি শয্যা লইলেন; ছয় মাস শয্যায় থাকিয়া শোকমুক্ত হইলেন। সলিলকুমার ও আমি মার কাছে দুই ছেলের মত 'মানুষ' হইতে লাগিলাম। শৈশবাবধি আমরা পরস্পরের সহচর, সুহৃদ, সখা—আমরা বাহিরে কাহারও সঙ্গে খেলা করিতে যাইতাম না, কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না—কখনও সঙ্গীর, খেলার সাথীর অভাবও অনুভব করি নাই। তাহার পর দাদা ও আমি এক সঙ্গে স্কুলে যাইতাম—পড়িতাম, খেলা করিতাম; একের কাছে অপরের কোনও কথাই গোপন থাকিত না।

এই ভাবে শৈশব ও বাল্যকাল কাটিল। তাহার পর প্রথম যৌবনে আমি মাতৃহীন হইলাম। সে শোক আমার ও দাদার সমান লাগিল—বুঝি আমার অপেক্ষাও দাদার অধিক লাগিল।

সংসারে আর কোনও স্ত্রীলোক নাই—সব বিশৃঙ্খল। সব ভার ভৃত্য-দিগের উপর থাকিলে সংসার যেমন হয়, তেমনই হইল—যেন লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। বাবা মামার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অবধি জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন; তিনি বাহিরের কাজ লইয়াই থাকিতেন, সংসারের সব ভার প্রথমে পিতামহীর ও পরে মাতার ছিল। কাজেই বিশৃঙ্খলায় বাবারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা হইতে লাগিল। কাজের ক্ষতি হইতে লাগিল—মনে অশান্তি জন্মিতে লাগিল। শেষে বন্ধুদিগের পরামর্শে বাবা আবার বিবাহ করিলেন। দাদা বলিলেন, 'এইবার মার অভাব বুঝিতে হইবে।'

কিছু দিন কিন্তু বিমাতার ব্যবহারে আমরা নিন্দা করিবার কিছু পাইলাম না। তবে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি যে আমাদের মত বয়ঃপ্রাপ্ত 'পুত্র'কে পুত্রবৎ ব্যবহার করিতে পারিতেন না—মা সাজিতে পারিতেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষ, দাদা তাঁহার আগমনাবধিই তাঁহার নিকট হইতে এমন দূরে থাকিতেন যে, দাদার ব্যবহারে আমিই সময় সময় আপত্তি করিতাম। দাদা আমাকে বলিতেন, 'মার অভাব আর পূরিবে না।'

তাহার পর বিমাতার একটি পুত্র হইল। তিনি আপনার স্নেহের অবলম্বন পাইলেন। সব স্নেহ তিনি পুত্রে দিলেন—আমাদের জন্য আর মনোযোগের বিন্দুও অবশিষ্ট রহিল না। আমারও পূর্ব্বে দাদা এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন—কারণ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই এই আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব করিলেন। পিসে মহাশয়ের জীবন-বীমার দশ হাজার টাকা সুদে আসলে বাড়িয়া গিয়াছিল। বাবা দাদাকে সে টাকা দিলেন—দাদা সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন।

দাদা যাইবার পূর্ব্বে আমি দাদাকে বলিলাম, 'আমাকেই ফেলিয়া চলিলে?' দাদা বলিলেন, 'মামা তোমাকে বিলাতে পাঠাইবেন না। তোমার পথ—তুমি কলেজের অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র—তাঁহাকে ধরিয়া ডাকবিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হও। তাহা হইলেই বিদেশে যাইতে হইবে।'

আমি দাদার উপদেশই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

২

দাদা চলিয়া গেলে মনে হইতে লাগিল, আমি একান্ত একা—হৃদয় শূন্য। আমাকে ছাড়িয়া দাদারও যে তেমনই মনে হইয়াছিল, তাহা দাদার পত্রেই বুঝিতে পারিতাম। কখনও এমন এক সপ্তাহ যায় নাই যে, আমরা পরস্পরকে পত্র লিখি নাই। আমার পত্রে আমি যেমন আমার সব কথা—পরিচিতদিগের ও আত্মীয়স্বজনদিগের সব সংবাদ লিখিতাম, দাদাও তেমনই তাঁহার পত্রে তাঁহার সব কথা লিখিতেন। পত্রে জানিতে পারিতাম, দাদা বিদেশে

থাকিয়া কেবল সাফল্য লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার জন্যই পরিশ্রম করিতে-ছিলেন—সে-ই তাঁহার ধ্যান হইয়াছিল। সাধনায় সিদ্ধিলাভও বিলম্বিত হয় নাই—দাদা সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই আমাকে সে সংবাদ তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জার্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ ভূমধ্যসাগর বৃটিশ তরীর পক্ষে বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে জাহাজ ডুবি হইত—ফলে, ডাক যথাকালে আসিত না। যে কারণে পত্র আসিল না, তাহা জানিলেও, কোনও মেলে দাদার পত্র না পাইলে যত দিন পরের মেলে পত্র না পাইতাম, তত দিন মনের অশান্তি শান্ত করিতে পারিতাম না।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও দাদাকে প্রায় এক বৎসর জাহাজে স্থানাভাবের জন্য বিলাতে অপেক্ষা করিতে হইল। সে সময়ের মধ্যে সংবাদ পাইলাম, দাদা ব্রহ্মে চাকরী পাইবেন। আমি ব্রহ্মে গিয়াছি জানিয়াই যে দাদা চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মে চাকরী লইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নাই, এবং তাহাতে তাঁহার স্নেহ-পরিচয়ে হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিয়া-ছিলাম, তাহার স্মৃতিই যেন আজ আমার বেদনা বর্দ্ধিত করিতেছে।

শেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষাও শেষ হইল। পরাভূত হইয়া জার্ম্মাণী সন্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিল—জার্ম্মাণীর নৌবাহিনী শত্রুর হস্তগত হইল—জার্ম্মাণীর জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন শেষ হইল। দাদা আসিবার জাহাজ পাইলেন। রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে সংবাদ দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিলেন, 'তিনি এক ইংরাজ কুমারীকে বাগ্‌দান করিয়া আসিতেছেন; কিছু দিন পরে আবার বিলাতে যাইয়া তাহাকে বিবাহ করিবেন।' এত বড় সংবাদটা যে দাদা আমার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন, তাহাতে মনে একটু অভিমান হইল। কিন্তু কাণ্ডটা কি, জানিবার জন্য কৌতূহল এতই বাড়িতে লাগিল যে, মনে হইতে লাগিল—দিন যেন আর যায় না!

দাদার বিদেশিনীর সঙ্গে বিবাহ নিতান্তই যেন অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। জানি—

> 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে;
> কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?'

তবুও দাদার বিবি-বিবাহ! আমাদের সমাজে ও সংস্কারে আমরা প্রণয় পরিণয়ের ফল বলিয়া জানি; প্রণয়ের ফলে পরিণয় আমাদের ধারণায় আইসে

না। অথচ সে দেশে পূর্ব্বরাগ নহিলে বিবাহ হয় না। যে দাদা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে গেলে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেন না—সেই দাদার বাগ্‌দান! বিলাতে কি সত্য সত্যই অসম্ভব সম্ভব হয়? কামরূপে যেমন মানুষ ভেড়া হয়, বিলাতেও তেমনই মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়? না জানি দাদার প্রণয়পাত্রী কেমন? নীলনয়না—না বিড়ালাক্ষী? কনককেশিনী—না কৃষ্ণ-কুন্তলা? এমনই কত কথা ভাবিতে লাগিলাম, আর দাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

৩

দাদা আসিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে বাঙ্গালায় যাইয়া বাবার সঙ্গে দেখা করিয়া ব্রহ্মে আসিলেন। আমি ষ্টীমার-ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। দাদা বিলাতে যাইয়া হ্যাটকোট পরিয়াছিলেন; আমি বিলাতে না যাইয়াই সেই বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। দাদা কিন্তু আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন। লোক বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না।

বাসায় যাইয়া দাদা এটাসী কেস খুলিয়া তাঁহার জেনের ফটো বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। বুঝিলাম—সুন্দরী বটে। পর দিন দাদাকে তাঁহার কর্ম্মস্থানে ও আমাকে আমার কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে। সেই দিনই সব কাজ রাখিয়া দাদা জেনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের কথা বলিলেন।

তখন দাদা সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকরী পাইয়াছেন, কিন্তু জাহাজের জন্য ভারতবর্ষে আসিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন হাম্‌ষ্টেডে একটি পরিবারে বাস করেন, এবং প্রায়ই ইণ্ডিয়া আফিসে আসিয়া সন্ধান লয়েন—কবে জাহাজ পাইবার সম্ভাবনা। তখন জার্ম্মাণ জেপলিন মধ্যে মধ্যে আসিয়া লণ্ডনের উপর বোমা ফেলিয়া যায়। যে দিন জেপলিনের বোমা পার্লামেণ্ট-গৃহের সম্মুখে পড়ে, সেই দিন তিনি যখন ইণ্ডিয়া আফিস হইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন অতর্কিতভাবে জেনের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি হোবর্ণ ষ্টেশনে ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ৬৮ নম্বর ডাক-গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় জেপলিনের আগমনজ্ঞাপক সঙ্কেতশব্দ শুনা গেল। সে দিন আকাশে মেঘ বা বাতাসে কুজ্ঝটিকা নাই, বৃহৎ পক্ষীর মত কয়খানা জার্ম্মাণ জেপলিন আকাশে লণ্ডনের উপর দিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা দেখিবার অবসর বা প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না। সকলেই দ্রুতপদে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে ছুটিল; অনেকেই

ষ্টেশনের মধ্যে গেল। বেপারীর ঝাঁকায় যেমন মুরগী বোঝাই হয়, তেমনই ভাবে লোকের গায়ে লোক দাঁড়াইল। ওদিকে বোমা-বিদারণের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সেই শব্দে জমী কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা দাদার মনে হইল, কাহার মস্তক তাঁহার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে রমণীর কেশের সৌরভ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এক জন কিশোরী মূর্চ্ছিতা হইয়া তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছেন। দাদা অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে ধরিলেন। ভিড়ে এমন স্থান নাই যে, তাহাকে শোয়াইতে পারেন। অগত্যা প্রায় ১৫ মিনিট কাল দাদাকে সেই অবস্থায় কিশোরীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ ধরিয়া তাহার মস্তক স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। তাহার পর জেপলিন চলিয়া গেল, সে জন্য সাঙ্কেতিক শব্দ শুনা গেল। তখন লোক বাহির হইতে লাগিল। দেখা গেল, পাঁচ ছয় জন মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। দাদা কিশোরীর দেহ লইয়া একখানি বেঞ্চের উপর শায়িত করিলেন। এক জন মহিলা পকেট হইতে এমমেলিং সল্টের শিশি বাহির করিলেন, কিশোরীর নাসাগ্রে ধরিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই কিশোরীর চৈতন্যোদয় হইল। চৈতন্য লাভ করিয়াই কিশোরী দাদাকে ধন্যবাদ দিল। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার বাড়ী কোথায়?'

কিশোরী উত্তর করিল, 'উইম্‌বলডনে।'

হার্ণহিল ও উইম্‌বলডন লণ্ডনের দুই বিপরীত দিকে—অনেক দূর। কিন্তু ভদ্রতার জন্য দাদাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, 'আপনাকে বাড়ী রাখিয়া আসিব কি?'

কিশোরী বলিল, 'যদি আপনার কাজের ক্ষতি না হয়, তবে আমাকে বাড়ী পঁহুছাইয়া দিলে আমার বড় উপকার করা হয়। কারণ, আমি বড় অবসন্ন বোধ করিতেছি।'

'আমার কোনও কাজ নাই।' বলিয়া দাদা কিশোরীকে লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে গেলেন, এবং ঘুরিয়া ট্রেণ বদলাইয়া উইম্‌বলডনে পঁহুছিলেন।

ষ্টেশন হইতে কিশোরীর বাড়ী নিকটে; তবুও দাদা একখানা গাড়ী লইলেন, এবং কিশোরীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর দ্বারে পঁহুছিয়া কিশোরী দ্বারের ঘণ্টা টিপিলে এক জন যুবতী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন; আজ যে এত দেরী?' তাহার পর জেনের সঙ্গে এক জন বিদেশীকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?'

'চল, ভিতরে যাইয়া সব বলিতেছি।' বলিয়া কিশোরী দাদাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল।

প্রবেশের দালানে ছড়ী, টুপী ও ওভারকোট রাখিয়া দাদা দুই ভগিনীর অনুসরণ করিয়া বসিবার ঘরে যাইলেন। তথায় এক জন বৃদ্ধ অগ্নিসেবন করিতেছিলেন। কিশোরী বলিল, 'বাবা, ইঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিব। ইনি আজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে।'

বৃদ্ধ উঠিয়া দাদার করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তাহার পর কিশোরী সব ঘটনা বিবৃত করিল। দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিশোরী এমন নিপুণ বর্ণনাকারীর মত —এমন মধুর ভাষায় ও মধুরকণ্ঠে বর্ণনা করিল যে, তিনিও মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন।

কিশোরীর কথা শেষ হইলে, বৃদ্ধ দাদাকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং বলিলেন, 'আমি বৃদ্ধ—বিপত্নীক; সংসারে সম্বল ছিল এই দুই কন্যা, আর এক পুত্র। পুত্রটি ফ্রান্সে গৌরবক্ষেত্রে; কন্যাদ্বয়ও জাতির জন্য ও দেশের জন্য যাহা পারে করিতেছে—যুদ্ধের কাজ করিতেছে।'

অল্পক্ষণ পরে দাদা বিদায় লইলেন। কিশোরী দাদার নাম ও ঠিকানা জানিবার জন্য তাঁহার কার্ড চাহিয়া লইল।

দাদা ফিরিলেন—দীর্ঘ পথ। কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাঁহার নাসিকায় ভায়লেটের মৃদু গন্ধ লাগিয়া আছে।

৪

পর দিন দাদা কিশোরীর সংবাদ পাইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন রবিবার। রবিবারে ইংলণ্ডের আর সর্ব্বত্র ডাক বিলি হইলেও, লণ্ডনে হয় না। তাই সে দিন কোনও পত্র আসিল না। সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া দাদার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল—তিনি বিকালে বাহির হইয়া পড়িলেন—ভূমধ্যস্থ রেলে উঠিয়া হোবর্ণ ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। ষ্টেশনে আসিয়াই গত দিনের ঘটনাগুলি যেন তিনি আবার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন—সেই জনতা, সেই আতঙ্ক, তাঁহার স্কন্ধে মূর্চ্ছিতা জেন—সব যেন তিনি আবার দেখিতে লাগিলেন—নাসারন্ধ্রে যেন সেই ভায়লেটের সুগন্ধ অনুভব করিতে লাগিলেন!

যাইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। একবার তাঁহার মনে হইল,

হাইড পার্কে খানিকটা বেড়াইয়া আসিবেন, কিন্তু তাহা হইল না, তিনি উইম্‌বলডনের দিকের ট্রেণ লইলেন।

তিনি ট্রেণের যে কামরায় উঠিলেন, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাহাতে আর কয় জন যাত্রী উঠিলেন—কয় জন মহিলা। বসিবার আর আসন ছিল না; কাজেই প্রচলিত প্রথানুসারে দাদা উঠিয়া এক জন মহিলাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। যুবতী ধন্যবাদ দিতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি!' দাদা দেখিলেন, জেনের দিদি। দাদা বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন জানিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে আবার ধন্যবাদ দিবার অবসর পাইলে জেন্ পরম আনন্দ লাভ করিবে।

দাদা অনুরুদ্ধ হইয়া যুবতীর সঙ্গে চলিলেন—তাঁহার ইচ্ছাও সেই দিকে ছিল।

জেন্ দাদাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল—ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল! চা পান করিয়া, গল্প করিয়া, দাদা বিদায় লইলেন; কিন্তু জানিতে পারিলেন না, জেন্ পূর্ব্বেই তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল।

পর দিন দাদা জেনের পত্র পাইলেন। সে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছে, এবং তাঁহাকে সোমবারে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কাজেই পর দিনও দাদাকে তাহাদের গৃহে যাইতে হইল।

দাদা কখনও মুখ তুলিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেন না—স্ত্রীজাতি হইতে বরাবরই একটু দূরে থাকিতেন। এমন লোক যখন কোনও স্ত্রীলোকের রূপে বা গুণে মুগ্ধ হয়, তখন সে আর বড় বিচার বিবেচনা করিতে পারে না—সে সকল স্ত্রীলোককেই সকল সদ্‌গুণের আধার বিবেচনা করে। দাদার তাহাই হইল।

দাদা জেনকে ভালবাসিলেন। জেনের রূপ অপেক্ষাও তাহার গুণ—তাহার সরস আলাপ—তাহার নানা বিষয়ে জ্ঞান, তাঁহাকে মুগ্ধ করিল।

দীর্ঘ ছয় মাস কাল এই ভাবে কাটিল। এ দিকে যুদ্ধের একরূপ শেষ হইল—যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সন্ধি-সর্ত্তের আলোচনা হইতে লাগিল। জলপথ জার্ম্মাণ সাব-মেরিণ-মুক্ত হইল—ইংরাজের ট্রলার সাগরে 'মাইন' তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। দাদা বুঝিলেন, এইবার তাঁহাকে ভারতে ফিরিতে হইবে। তখন 'বলি বলি' করিয়া কয় দিন পরে তিনি এক দিন জেনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

জেনের মুখে চক্ষুতে হাসি ফুটিয়া উঠিয়া—সে সেই হাসি চাপিল, তাহার মুখমণ্ডলে রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

জেন্ মুহূর্ত্তমাত্র কথা কহিল না। দাদার কাছে সেই মুহূর্ত্ত অতি দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'যদি অসঙ্গত প্রস্তাব করিয়া অপরাধী হইয়া থাকি, অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিও।'

জেন্ বলিল, 'অপরাধ! ভারতবর্ষে যাওয়া যে আমার জীবনের স্বপ্ন!' সে ওমর খৈয়মের কবিতার ইংরাজী অনুবাদের আবৃত্তি করিল—

"পূব গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।"

বলিল, 'সেই সোনার বরণ রবির কিরণের দেশ! সে কি সুন্দর!'

দাদা বাড়ী ফিরিলেন। ষ্টেশন পর্য্যন্ত জেন্ তাঁহার সঙ্গে আসিল।

দাদার কাছে জগৎ সে দিন নূতন জগৎ।

তাহার পর দাদার সঙ্গে জেনের অনেকবার সাক্ষাৎ হইল; জেনের গৃহে—তাহার দিদির কাছেও দাদার আদর যেন বাড়িয়া গেল।

প্রায় পক্ষকাল পরে দাদা সংবাদ পাইলেন, তাঁহার যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তখন তিনি জেনকে বিবাহের কথা বলিলেন।

জেন্ হাসিয়া বলিল, 'জানই ত, আমি যুদ্ধের কাজ করিতেছি। এখন সে কাজ ছাড়িয়া যাওয়া দেশদ্রোহিতা। তুমি কি আমাকে দেশদ্রোহী হইতে পরামর্শ দাও?'

দাদা লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, 'না। কিন্তু আমি একবার যাইলে, আর দুই বৎসরের মধ্যে আসিতে পারিব না।'

জেন্ বলিল, 'এই কথা! তোমার মনের ভাব আমি জানি না; কিন্তু তোমার জন্য আমি দুই বৎসর কেন, সমস্ত জীবন অপেক্ষা করিতে পারি।'

এই কথায় আনন্দ হৃদয়ে লইয়া দাদা দেশে ফিরিলেন।

৫

তিন মাস পরে দুই দিনের ছুটীতে দাদার কাছে গেলাম। দাদা যাহাই কেন বলিয়া থাকুন না, আমি দাদার বিদেশিনী বিবাহ কিছুতেই সমর্থন করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। এবার দাদা আমাকে জেনের কয়খানি পত্র দেখাইলেন। প্রতি মেলে দাদা তাহাকে পত্র লিখিতেন—তাহার পত্র পাইতেন। জেনের পত্র কয়খানি পাঠ করিয়া আমার মতের যেন একটু পরিবর্ত্তন হইল। সে সব পত্রের ভাষা ভাবেরই অনুরূপ—উভয়ই সুন্দর। ভালবাসার স্পন্দন সে পত্রে সর্ব্বত্র সপ্রকাশ। মনে হইল—এই যে ভালবাসা, ইহা যে ভালবাসা

আকর্ষণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কোথায়? প্রস্রবণের বারিধারা যেমন ভাবে প্রবাহিত হয়, সে সব পত্রে ভালবাসা তেমনই ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে!

আরও ছয় মাস পরে দাদা আর এক স্থানে বদলী হইলেন। পথে আমার কর্ম্মস্থান। যাইবার পথে তিনি আমার বাসায় দুই দিন থাকিয়া গেলেন। জেনের কত কথাই বলিলেন। তিনি যেন তাহার চিন্তাতেই মস্‌গুল! নয় মাস গেল—আরও পনর মাস। তাহার পর তিনি ছুটী লইয়া বিলাতে যাইবেন—জেনকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে লইয়া আসিবেন। কত আশা! কত কল্পনা! আর জেনের পত্রে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় কি আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে!

দুই দিন পরে দাদা চলিয়া গেলেন—যে স্থানে গেলেন, সে স্থানটা অস্বাস্থ্যকর—কেবল জলা, আর ধানের ক্ষেত। তিন মাস পরে তাঁহার জ্বর হইল। তিনি গ্রাহ্য করিলেন না—কিন্তু ম্যালেরিয়া তাঁহাকে ছাড়িল না। চিকিৎসায় জ্বর বন্ধ হইত বটে, কিন্তু আবার দেখা দিত; আর শরীর কেবলই দুর্ব্বল হইতেছিল। অন্য কর্ম্মচারীরা ছুটী লইতে পরামর্শ দিলে তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না—দুই বৎসর পূর্ণ করিয়া তিনি দীর্ঘ ছুটীতে বিলাত যাইবেন। তাঁহার লক্ষ্য অন্য দিকে—আপনার দিকেও ছিল না। তাঁহার অসুখের সংবাদ তিনি আমাকেও দেন নাই।

ছয় মাস পরে আমি সে সংবাদ পাইলাম—পাইয়াই তাঁহার কাছে গেলাম। তখন বর্ষা শেষ হইয়াছে; চারি দিকে বৃক্ষলতার ঘনশ্যাম পত্রের বাহুল্য। মাঠে ধানের ক্ষেত্র—ক্ষেত্রে জল। চারি দিকে—আকাশে বাতাসে আর্দ্রতা। তাহারই মধ্যে বাঙ্গলোয় দাদা অসুস্থ, অথচ সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। আমি জিদ করিলাম, তাঁহাকে ছুটী লইতে হইবে। কিন্তু তিনি আমার কথাও শুনিলেন না; বলিলেন, বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ জ্বরের সময় গিয়াছে; আর ছয় মাস পরে তিনি দীর্ঘ ছুটী পাইবেন—জ্বরের সাগর-যাত্রার মত ঔষধ আর নাই; তাহার পর তিনি ত মাসাধিক কাল বিলাতে থাকিবেন—সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

কয়দিন পরেই আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিন্তু মনে কেমন আশঙ্কা রহিয়া গেল। প্রায়ই দাদাকে পত্র লিখিতাম—তিনি কেমন আছেন? তিনি লিখিতেন, মন্দ নহে। এইরূপে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল—তাহার পর পত্র পাইলাম, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

যাইয়া দেখিলাম, দাদাকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না! ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া ছয় মাসের ছুটী লওয়া হইল; কিন্তু ডাক্তার বলিলেন, সে অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা যাইবে না। আমি ছুটী লইয়া তাঁহার কাছে রহিলাম। দাদার মনে অবসাদ দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। তিনি কেবল কবে বিলাতী ডাক আসিবে, তাহার সন্ধান করিতেন—ডাক আসিলে জেনের পত্র বার বার পাঠ করিতেন; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আমি বিলাতে যাইতে পারিব ত?' আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিতাম।

ক্রমে তিনিও বুঝিলেন, আমিও বুঝিলাম—আর আশা নাই।

এক একবার জ্বর বাড়িলে দাদা অচৈতন্য হইতে লাগিলেন; জাগিয়া বিলাতী ডাকের খোঁজ করিতেন। যে দিন বিলাতী ডাক আসিল, সে দিন তাঁহার অবস্থা শোচনীয়। আমি পত্র খুলিলাম। কি ভয়ানক পত্র! আর সে 'আমার সোলিলো'—'প্রিয়তম সল'—সে সব সম্বোধন নাই। পত্রখানিতে জেন্ লিখিয়াছে—সে বরাবর দাদার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে। যখন তাহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী দেখিয়াও দাদা বুঝিতে পারেন নাই—সে বাগ্‌দত্তা, তখনই তাহার বিদ্রূপবৃত্তি প্রবল হয়, এবং সে দাদার সঙ্গে প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া এমন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, যেন সে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে। তাহার দিদিকে সে এ কথা বলিয়াছিল, এবং দুই ভগিনীতে এই অভিনয় করিয়াছে। দাদার পত্রের উত্তর তাহারা দুই ভগিনীতে নানা উপন্যাস দেখিয়া প্রস্তুত করিত—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদিগের প্রেমপত্র নকল করিয়া দিত। সে যেন একটা খেলার নেশা! তাহার পর আজ যখন সে দাদার পত্র পাইয়াছে, তিনি যাইতেছেন—তখন আশঙ্কায় তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। তাহার প্রণয়ী যুদ্ধে গিয়াছিলেন—ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। সে পত্রের মধ্যে তাহার স্বামীর, তাহার ও তাহার শিশু কন্যার একখানি ফটো পাঠাইয়াছে; লিখিয়াছে—দাদা কি তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন? সে ভুল করিয়াছে—অপরাধ করিয়াছে; কিন্তু দাদা উদার-হৃদয়, তিনি তাহাকে ক্ষমা করুন; নহিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। সে দাদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে।

খেলা! কি নির্ম্মম—কি ভীষণ খেলা! এ পত্র ত আমি দাদাকে দেখাইতে পারিব না—এ পত্র পড়িলে তাঁহার মৃত্যুমুহূর্ত্ত যে বিষময় হইবে। দাদা যখন একবার জ্ঞানলাভ করিয়া বিলাতী ডাকের খোঁজ করিলেন, তখন আমি একখানা পুরাতন পত্র পড়িলাম।

দাদা বলিলেন, 'জেন বলিয়াছিল, সে সমস্ত জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে আর আমার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। তুমি লিখিয়া দিও—আমি তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি দিলাম। আমি সংসার পাতাইব বলিয়া মিতব্যয়ী হইয়া তাহারই জন্য টাকা জমাইয়াছি—আমার উইলে সব টাকা তাহাকে দিয়া গেলাম—তুমি পাঠাইয়া দিও।'

বলিতে বলিতে দাদার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। আমি সে অশ্রু মুছাইয়া দিলাম।

তাহার পর দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জেনের ছবিখানি কোথায়?'

ছবি নিকটে ম্যাণ্টলপিসের উপর ছিল। আমি বলিলাম, 'ছবি যেখানে ছিল, সেখানেই ত আছে।'

'আমি আর দেখিতে পাইতেছি না—পৃথিবীর আলোক নিবিবার পূর্ব্বে একবার ছবিখানা আমাকে দাও।'

আমি ছবিখানা আনিয়া দিলাম। এক দিন যে চিত্র সুন্দরীর প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ তাহা পিশাচীর ছবি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও আমি ছবিখানা দাদার হাতে দিলাম। কম্পিতহস্তে ছবি লইয়া দাদা সেখানি চুম্বন করিলেন।

সেই দিনই দাদার জীবন শেষ হইল।

দাদার শবদাহ করিয়া ফিরিয়া আমি প্রথমেই তাঁহার বাক্স হইতে উইল বাহির করিলাম, এবং সেই উইল ও বিদেশিনীর—পিশাচীর প্রতিকৃতি ও পত্রগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শব্দ-কথা।

[৪ ।—কারক-প্রকরণ, ৩]

যুক্তি ও প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ, এই চারিটী কারক বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে কোনও ক্রমেই পরিত্যক্ত হইতে পারে না। আমরা দেখাইয়াছি যে, 'দ্বারা', 'দিয়া', 'হইতে', 'চেয়ে' প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি কারকার্থ-দ্যোতক বলিয়া বিভক্তিরূপে

গণ্য। এই শব্দগুলিকে বিভক্তি বলিয়া স্বীকার না করিবার জন্য, ত্রিবেদী মহাশয় শেষে যে একটা কারণ দিয়াছেন, তাহা এই—

"আমা দ্বারা এ কাজ হইবে না, এই বাক্যে 'আমা দ্বারা' স্থলে আমার দ্বারা...ব্যবহৃত হইতে পারে।...'দ্বারা' বিভক্তি-চিহ্ন হইলে একটা শব্দের উপর দুটা বিভক্তির যোগ হইয়া পড়ে। ইহা অনুচিত।...রাম চেয়ে শ্যাম ছোট, অথবা রামের চেয়ে শ্যাম ছোট ; লাঠি দিয়া মার, অথবা লাঠিতে করিয়া মার, 'কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম, দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌লেম',...'চাহিলা দূতী স্বর্ণলঙ্কা পানে' ... এই সকল বাক্যে postposition-(পরবর্ত্তী অব্যয় শব্দ)-গুলির পূর্ব্ববর্ত্তী পদের বিভক্তিচিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথাও বা লুপ্ত হইয়াছে। বিভক্তি-চিহ্ন কোথায় থাকিবে বা থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই।...এমন সময় আসিতে পারে, যখন (এই) postpositionগুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিচিহ্নে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানে উহাদিগকে বিভক্তি-চিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না, উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।"

এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। একটী শব্দের উপর দুটা বিভক্তি বা প্রত্যয়ের যোগ সংস্কৃতাদি প্রাচীন ও পরিণত ভাষায় ব্যাকরণানুসারে বিরুদ্ধ হইলেও, ইংরাজি ও বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক চলিত ভাষায় তাহার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ;—

(১) ইংরাজি ভাষায়—'lesser' এই পদে দুইটী প্রত্যয় আছে ; ইহা double comparative ; 'this is the *most unkindest* cut of all' সেক্সপীয়রের এই প্রয়োগে double superlative ; 'children', 'men-servants', 'women-servants', 'lords-justices'—এগুলি double plural ; 'seamstress' শব্দটি double feminine ; 'cockerel', 'pickerel' এই দুইটীতে double suffix (প্রত্যয়) আছে ; of mine, ours, yours, hers, theirs, 'of queen's' এইগুলি double possessive ; 'from whence', 'firstly' প্রভৃতির প্রয়োগও একেবারে অপ্রচলিত হয় নাই।

(২) বাঙ্গালা ভাষায়—সক্ষম, সকাতর, নির্দ্দোষী, নিরপরাধী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, অভাগিনী, জীবিতমান * যে সকল মহাশয়েরা † ইত্যাদি। আবার, 'আমার দ্বারা', 'রামের চেয়ে', 'আমার পানে', 'আমাকে দিয়া' প্রভৃতি যে

* 'সুখ কি জীবিতমানে, কিবা অথ নির্ব্বাণে'।—হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'।

† ...'যে সকল মহাশয়েরা মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন ছিলেন না।'—বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত 'উপক্রমণিকা' ব্যাকরণের প্রথম মুদ্রণের বিজ্ঞাপন।

বাক্যগুলি ত্রিবেদী মহাশয় স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইগুলিই, এবং তৎসদৃশ সকল বাক্যই বাঙ্গালা ভাষায় দ্বৈত বিভক্তি-প্রয়োগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বপক্ষে আনীত এই সাক্ষীগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে বলিয়া, যদি ইহাদিগকে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করিতে কেহ অস্বীকার করেন, তবে বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ দ্বৈত বিভক্তিযুক্ত বাক্যপ্রয়োগের অন্যান্য মীমাংসার কথা কহিতে হইবে। প্রথমতঃ—ইহা বুঝিতে হইবে যে, 'দ্বারা', 'দিয়া', 'চেয়ে', 'হইতে' প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি দুই প্রকারে প্রযুক্ত হয়; (১) অব্যয় শব্দ-রূপে তাহাদের সাধারণ স্বতন্ত্র প্রয়োগ। (২) বিভক্তি-রূপে তাহাদের বিশিষ্ট সংযোগ-প্রয়োগ। যে স্থলে বক্তার উদ্দেশ্য, উৎকর্ষ বা দৃঢ়তার (Emphasis) প্রকাশ, সে স্থলে ঐ অব্যয় শব্দগুলি প্রথম প্রকারে প্রযুক্ত হয়, এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে স্বতন্ত্র বিভক্তির যোগ হয়। যে স্থলে বক্তার বিশেষ দৃঢ়তা-জ্ঞাপনের প্রয়োজন নাই, সে স্থলে দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই, আমাদের এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। 'তাঁহা দ্বারা এ কাজ হইবে না' অপেক্ষা 'তাঁহার দ্বারা এ কাজ হইবে না', এই বাক্য দৃঢ়তর। তদ্রূপ, 'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল', 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল', 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু', 'কিসের লাগিয়া হলে দিশাহারা', 'কিসের জন্য' এই বাক্যগুলিতে অব্যয় শব্দের পূর্ব্ব পদে বিভক্তির যোগ থাকাতে, সেগুলি 'সুখ চেয়ে', 'কি লাগি', 'কি জন্য' অপেক্ষা দৃঢ়তাব্যঞ্জক। উক্ত অব্যয় পদগুলির পূর্ব্ব পদে স্বতন্ত্র বিভক্তি-যোগ থাকিলেই বাক্যের দৃঢ়তা সূচিত হইবে। ইহা দ্বারা আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, কেবল ঐ অব্যয়গুলি বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হইলে ও পূর্ব্ব পদে বিভক্তি না থাকিলে, বাক্যের উদ্দিষ্ট দৃঢ়তা কোনও স্থলেই প্রকাশিত হয় না। প্রচলিত প্রয়োগানুসারে ও উচ্চারণের কৌশলে বাক্যের এই দৃঢ়তা নির্দ্দেশিত হয়। কোনও শব্দের বা বিভক্তি-প্রত্যয়ের দ্বৈত প্রয়োগ, দৃঢ়তা (Emphasis) জ্ঞাপন করে—ইহা সকল ভাষারই সাধারণ নিয়ম। Shakespeare যে 'the *most unkindest* cut of all' লিখিয়া বসিলেন, তাহার কারণ, ব্যাকরণে তাঁহার অনভিজ্ঞতা নহে—বাক্যে প্রগাঢ় করুণাপূর্ণ দৃঢ়তার বিবক্ষা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'যে সকল মহাশয়েরা' লিখিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহার অনবধানতা নহে—কঠোর শ্লেষ-কশাঘাতের আকাঙ্ক্ষা।

উক্ত দ্বৈত বিভক্তি-প্রয়োগ সম্বন্ধে হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন—

'দ্বারার পূর্ব্বে বিকল্পে 'র' বা 'এর' হয়। যথা, তাহা দ্বারা বা তাহার দ্বারা ; রাম দ্বারা বা রামের দ্বারা ... 'দ্বারা'র পূর্ব্বে 'র' বা 'এর' হওয়া ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে'... ('বাঙ্গালা ব্যাকরণ', ৪২ পৃঃ)।

নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, এরূপ 'বিকল্প' ব্যবস্থা না করিয়া, অন্য প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'অব্যয় শব্দের যোগে যে...বিভক্তি হয় উহাকে 'উপপদ বিভক্তি' বলে।...যে স্থলে 'দিয়া', করিয়া', 'দ্বারা', 'কর্ত্তৃক', 'চেয়ে', ও 'অপেক্ষা' শব্দ স্বয়ং বিভক্তি-রূপে ব্যবহৃত হয়, তথায় ইহাদের যোগে অন্য বিভক্তি হয় না। যথা, হাত দিয়া ধর, উপকূল দিয়া চল, নৌকা করিয়া আন, রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, বিদ্বান্ চেয়ে ধনী লোক মান্য নয়, পিতা অপেক্ষা পূজ্য কে। ...এ স্থলে কর্ত্তৃক, চেয়ে প্রভৃতিকে বিভক্তি না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বলিয়া মানিলে, 'রাজকর্ত্তৃক', 'বিদ্বচ্চেয়ে' 'পিত্রপেক্ষা' ইত্যাকার পদ সিদ্ধ হইবেক ; কিন্তু সেরূপ পদ বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধ ও সুচারু নহে।' (নববোধ ব্যাকরণ, ৫০।১ পৃঃ)।

উপরে যাহা যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে 'দ্বারা', 'দিয়া', 'হইতে', 'চেয়ে' প্রভৃতি অব্যয় পদগুলিকে বিভক্তি-চিহ্ন বলিতে রামেন্দ্রবাবুর যে শেষ আপত্তি তাহা পুনর্ব্বার খণ্ডিত হইতেছে। আবার, এ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি স্বয়ংই উক্ত অব্যয়গুলির ভাবী পরিণাম যে বিভক্তি, ইহা আশঙ্কিতচিত্তে অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'এমন সময় আসিতে পারে, যখন (এই) অব্যয়গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সঙ্গে মিশিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিচিহ্নে পরিণত হইবে।" তা যদি হয়, তবে এই অব্যয় পদগুলিকে (এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল যুক্তিপ্রমাণ দিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও) বিভক্তি-রূপে গ্রহণ করিতে ত্রিবেদী মহাশয়ের বিশেষ এমন আপত্তি কি? যে শব্দগুলি কিছুকাল পরে বিভক্তিতে পরিণত হইবে, তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতি যে বিভক্তিময়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভিতরে বিভক্তির বীজ না থাকিলে 'কালে' কি কোনও শব্দ বিভক্তিতে পরিণত হইতে পারে? যে অষ্টির অভ্যন্তরে আম্রের বীজ আছে, তাহা হইতেই পরিশেষে আম্র উদ্ভূত হয়। আম্রাতক হইতে আম্র জন্মে না। যাহা ভবিষ্যতে বিভক্তি হইবে, তাহা তদ্‌বিভক্তির বর্ত্তমান আকার, এই সহজ সত্যটী ত্রিবেদী মহাশয় স্বীকার করেন নাই।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ভাদ্র।—'শ্রীমুহম্মদ আবদর রহমান চুঘতাই চিত্রকরের সৌজন্যে' প্রকাশিত 'গোলাপ ও সরাপ' নামক ছবিখানিতে back-ground ভিন্ন আর কিছু বুঝিবার উপায় নাই। অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এই সংখ্যায় শ্রীমতী সীতা দেবীর 'সোনার খাঁচা' নামক একখানি উপন্যাসের সূচনা হইয়াছে। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ 'দম্পতি, জম্পতি, জায়াপতি' প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—' "দম্"এর সহিত "পতি" শব্দের যোগে "দম্পতি" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই "দম্পতি" শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে দম্পতী। যখন এই সহজ উপায়ে "দম্পতি" শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায়, তখন কেন বলিব, "জায়াপতি" হইতে জম্পতি, এবং "জম্পতি" হইতে "দম্পতি"?' শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের 'হৃদয়-নারী'র কতক হেঁয়ালি, কতক ন্যাকামী। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'এখন' দেখিয়া তাঁহার 'তখন' মনে পড়ে।

'রক্ত ছিল তপ্ত বেশী, মাংসপেশী টনটনে;
চিন্তাহীন চিত্ত-ভূমি শুধ্‌না ডাঙ্গা ঠনঠনে।'

'ঠনঠনে'র কবিতা ইতিপূর্ব্বে অনেকের শ্রীচরণে দেখা গিয়াছে, কিন্তু কবির কলমে তাহার আবির্ভাব এই সর্ব্বপ্রথম দেখিলাম। বাঙ্গালা কবিতার ভাগ্যে এতও ছিল! অবশেষে বিজয়চন্দ্র তাহাকে 'ঠনঠনে' দিয়া শায়েস্তা করিলেন। কবি কেবল কল্পনাকে ঘোড়দৌড় করাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে রসার 'হড্‌ল-রেসে'র মাঠেও দৌড় করাইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা খানা ডোবা বেড়া টপ্‌কাইয়া যে বাহাদুরী দেখাইয়াছে, বাঙ্গালা মাসিকপত্রেও তাহা অতুলনীয়।

'পল্‌কা-ভাব-স্পর্শ-লাগা হাল্‌কা স্নায়ু-কম্পনে—
খেল্‌তো ছুটে চাট্‌কা প্রাণ, মট্‌কা-ছোঁয়া লম্ফনে।'

প্রাণের 'মট্‌কা ছোঁয়া লম্ফন' নিশ্চয়ই মৌলিক। ইহাকে কেহ 'হাসির কবিতা' ভাবিয়া ভুল করিবেন না; ইহা serious রচনা। যখন 'রক্ত ছিল তপ্ত বেশী', তখন বিজয়বাবু

'যৌনগর্ব্ব খর্ব্ব করে সর্ব্বজনের সঙ্গ নে'

লিখিলে আমরা বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তিনি এই অমূল্য উপদেশ অসঙ্কোচে ছড়াইয়া দিলেন। রস-মস্তিকের এই দানের শেষ উপদেশটি স্মরণীয়—

'তৃপ্তি বেশী হাসির চেয়ে, পরের তরে ক্রন্দনে!'

অতএব, হাসিবেন না, কবির জন্য কাঁদিবার চেষ্টা করুন। শ্রীপ্রভাকর দাসের 'প্রদীপ' চলনসই গল্প। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাঁকুড়ার পত্র' আমরা সকলকে পড়িতে বলি। শ্রীকালিদাস রায়ের 'প্রথম পরিচয়' বোঝা যায়। ইহার সহজ ও সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ্য। শ্রীমতী বিহঙ্গবালা দাসীর 'মা' নামক গল্পে বিশেষত্ব নাই। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'প্রথম কথা'র প্রকাশ,—

'হঠাৎ যে দিন আমার পায়ে ফুটলো কিসের কাঁটা,
উহু বলে পড়্‌নু বসে, অবশ হল পা-টা।
তখন তুমি চকিত এসে হে বালিকা বধূ,
লাজটি ভুলে ঘোমটা তুলে বল্লে আহা শুধু।'

পৃথিবীতে শুধু যে 'অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়', তাহা নহে। কাঁটা ও কাঁটা-খোঁচা হইতেও কবিতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রতিভা কণ্টকবিদ্ধ হইলে, তাহা হইতে কবিতার স্রোত বহিবে, ইহাও অবশ্য বিচিত্র নহে। অর্জ্জুন যেমন পিতামহ ভীষ্মের জন্য বাণ বিঁধিয়া ভোগবতীর উৎস মর্ত্তে তুলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কবিরাও তেমনই মস্তিষ্ককে কাঁটা দিয়া বিঁধিয়া শরাসনে শয়ান বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কাব্যির ধারা টানিয়া আনিতেছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা' নামক কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

'আজি নিরন্ন দেশ বিপন্ন,
ক্লেশ-বিধুর লক্ষ হিয়া;
নিষ্ঠুর মৃত্যুর নীরব ছায়া
ছাইল অম্বর পক্ষ দিয়া।
মরু-ধূসর প্রান্তর অই,
বিবর্ণ অম্বর, বর্ষণ কই?

আজি ভিখারী বালক নারী,
প্রাণ ধরে শিশু অশ্রু পিয়া।
অতি দুঃসহ দুর্গতি রে,
হতাশ শত কঙ্কাল ফিরে!
"কে দিবি অন্ন?—কে হবি ধন্য?"—
পুণ্য পথে ফিরিছে পুছিয়া!'

সবুজ পত্র। বৈশাখ।—'সবুজ পত্রে'র পুনরাবির্ভাবে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। নূতন উদ্যমের প্রথম সংখ্যা চিঠিতেই প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় 'ঔরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। 'রাম না হইতেই রামায়ণে'র মত। রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টির ইতিহাস' আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে বলে', হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বল্লেন, 'ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের যোগাড় করে আন, আর একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।'

ভাণ্ডারী হাতযোড় করে বল্লে, 'পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে' হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরুৎ-ব্যোম, তা' সে যত চাই।'

চতুর্ম্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চার জোড়া গোঁফে তা' দিয়ে বল্লেন, 'আচ্ছা ভাল, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এস, দেখা যাক্।'

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিং, না দিলেন নখ, আর দাঁত যা দিলেন তা'তে চিবোনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রে

কোনো কোনো কাজে লাগবার মত হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের সখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না, তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ কোরে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য় এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেরই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু কাড়্‌তে চায় না কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎ ব্যোম যখন ক্ষিতি অপ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এই রকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড় খুসি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালবাসেন বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ! কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুট্‌তে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোন-গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট-করার বড় সুবিধে।

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলা-মলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারিদিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, তার গুহা কেউ কাড়্‌ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলামাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎ ব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উস্কে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

অত্যন্ত যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগ্‌ল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল ততটা হল না। তবু চুন বালি খ'সে দেয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে লাগ্‌ল।

এতে মানুষের মনে বড় রাগ হল। বললে, 'একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাইনে।'

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এম্নি উঠেপড়ে ডাণ্ডা চালালে যে ওর আর লাথি চল্‌ল না। মানুষ তার পাড়াপড়্‌শিকে ডেকে বল্‌লে, 'আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।'

তারা তারিফ করে বল্‌লে, 'তাইত একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা, তোমারই ধর্ম্মের মত ঠাণ্ডা!

একে ত গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা

তুলে সে চিহি চি হ করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরা ভাবে আওয়াজটা ত ঠিক ভক্তি-গদ্‌গদ শোনাচ্চে না। মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরুল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে মুখ ত একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বল্লেন, 'নিশ্চয় তোমারি কীর্ত্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েচ।'

যম বল্লেন, 'সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!'

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারিদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ-স্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করচে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, 'আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোন কাজে লাগ্‌বে না।'

মানুষ বললে, 'ছিছি, তাতে হিংস্রতার বড় প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েচি। খাসা আস্তাবল।'

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।'

মানুষ বললে, 'আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে। তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খত দিতে রাজি আছি।'

মানুষ করলে কি, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু তার সাম্‌নের দুটো পায়ে কসে রসি বাঁধ্‌ল। তখন ঘোড়া এম্‌নি চল্‌তে লাগ্‌ল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখ্‌তে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখ্‌তে পান না। তিনি নিজের কীর্ত্তির এই ভাঁড়ের মত চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, 'ভুল করেচি ত!'

মানুষ হাত জোড় করে বল্লে, 'এখন এটাকে নিয়ে করি কি? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই।'

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন, 'যাও, যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে!'

মানুষ বল্‌লে, 'আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা!'

ব্রহ্মা বল্‌লেন, 'সেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব!' *

ভাণ্ডার। শ্রাবণ।—'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই' প্রবন্ধে 'দেবদত্ত' বাঙ্গালার মৃত-পল্লীর ছবি আঁকিয়াছেন। 'সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সংযুক্ত গ্রাম্য-সমিতি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীকণীন্দ্রনাথ বসুর 'জাতীয় নারী ও সমবায়ে' লেখক এ দেশেও নারীদের কল্যাণকল্পে সমবায় প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

উদ্বোধন। ভাদ্র।—শ্রীস্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ঠাকুরের জীবনের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। গুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের ছবিও অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মনে হয়, লেখক আরও বিবৃত করিলেন না কেন? শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের 'জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব' উপাদের সন্দর্ভ। তর্কভূষণ মহাশয়ের বুঝাইবার প্রণালী দার্শনিক রচনায় নবব্রতীদিগের আদর্শ হইতে পারে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান' সময়োপযোগী সুপ্রবন্ধ। 'সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের বিবরণ' আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। তপস্বিনী নিবেদিতার এই তপস্যার সাক্ষী বিদ্যালয়টী সমগ্র বাঙ্গালীর সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপের সহিত স্পর্দ্ধা করি। কবে আমরা সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে ইউরোপবাসীদের মত সাহায্য করিতে শিখিব? বিদ্যালয়ের ভূমি-ক্রয়ের দেনা বারো হাজার টাকা এখনও শোধ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই ঋণশোধে সেই টাকার সদ্ব্যবহার করিলে হয় না? সে টাকা কি আদায় হইয়াছে? কলিকাতার টাউন-হলে নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার জন্য 'বিরাট' সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সে সভায় ধনকুবেরের মেলা দেখিয়াছিলাম। স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য 'প্রকাণ্ড' কমিটী হইয়াছিল। তাহারই বা কি হইল? 'আদিতে বাক্য ছিল', সেই বাক্য সত্য হইল, অবশেষে সেই শব্দময়ী সভার শব্দময় সঙ্কল্প শব্দ-ব্রহ্মে মিশিয়া গেল? ডাক্তার কাঞ্জিলাল হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন? অন্ততঃ হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় একটু চেষ্টা করিলে হয় না? আমরা যদি দেশের হিতকর অনুষ্ঠানের সাফল্যবিধানে এত উদাসীন হই, তাহা হইলে শুধু গোঁড়ামীর সাহায্যে কখনই ভারত উদ্ধার করিতে পারিব না। 'ত্যাগ' ভিন্ন পতিত জাতির উদ্ধার নাই। যাহারা টাকাটা, সিকেটা, পাইটা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা এই দুর্ভাগ্য দেশের 'নেতা' হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নেতৃত্বে জাতি কখনও মুক্তি লাভ করিবে না। সমগ্র বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায়, মুষ্টিভিক্ষায়, 'শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তিমতী প্রকাশস্বরূপা নারীগণের সেবা'র সঙ্কল্প পূর্ণ হউক। ধনীর হস্ত যদি মুষ্টিবদ্ধ থাকে, দরিদ্রের রিক্ত হস্তই সে কার্য্য সম্পন্ন করুক। বিন্দু বিন্দু জলকণায় জলাশয় পূর্ণ হয়। বাঙ্গালার কুমারীপূজার এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানকে আমরা—লক্ষ লক্ষ—কোটী কোটী দরিদ্র কি অভাবমুক্ত করিতে পারিব না? সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, 'সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তম' আমাদের 'হৃদয়ে শুভ প্রেরণা আনয়ন করিয়া এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে দান করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য প্রদান করুন।'

ভারতী। ভাদ্র।—শ্রীপুলিনবিহারী দত্তের 'দর্পণ' নামক চিত্রখানির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। কৃত্রিমতার আতিশয্য ও অস্বাভাবিকতা সুকুমার-কলা নহে। অনাবৃতার পিশিতপিণ্ডের প্রদর্শনই কোনও 'কলা'র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'র সীমা অতিক্রম করিয়াছে। চিত্র-প্রকাশের ফলে তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড না হয়, এখন বোধ হয় তাহা স্মরণ করিলে ক্ষতি নাই। শ্রীঅমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণের 'কিরাত জাতি' উল্লেখযোগ্য।—'M'Crindle বলেন, কিরাতগণ পার্ব্বত্য জাতি, অরণ্য ও পর্ব্বত উহাদের বাসস্থান, শিকার-লব্ধ দ্রব্যই ইহাদের উপজীবিকা ; শাস্ত্রসম্মত হিন্দুধর্ম্মাচার ইহারা রক্ষণ করিয়া চলিত না বলিয়া কিরাতগণ শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কিরাতগণ আসাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল। নেপালে যে 'কিরান্তি' জাতি আছে, তাহারা যে কিরাত-জাতি, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই কিরাতজাতি কালক্রমে পূর্ব্বভারতের পার্ব্বত্য ভূমি অধিকার করিয়া বসে। যে যে স্থানে গমন করিয়া ইহারা বাস করিয়াছে, তত্তৎভূমি কিরাতভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। কাজেই কিরাতভূমির পরিসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিরাতগণ অতি প্রাচীন জাতি। বৈদিকগ্রন্থে ইহাদের কথা আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে, ইহারা গুহাবাসী (৩০।১৬)। অথর্ব্ববেদে (১০।৪।১৪) এক জন 'কৈরাতিকা'র (কিরাতবালার) উল্লেখ আছে। Lassen তাঁহার 'ভারতীয় পুরাতত্ত্বে'' প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, কিরাতগণ বৈদিকযুগের পর নেপালের পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করিত। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে (১০।১১) কিরাতদিগকে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। কিরাতদিগকে অনেকে বর্ব্বর ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মূলতঃ ইহারা যে ক্ষত্রিয় ছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও বামন পুরাণমতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় কিরাতদেশ অবস্থিত। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত চীন ও কিরাতসেনা লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।' শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রাত্রির বেদনা' দুরূহ রূপক। ইহার সম্বন্ধে বলা যায়, 'কিছু কিছু বুঝি'। কবির রচনায় যদি বুঝিবার অংশ বাড়ে, এবং না বুঝিবার মশলা কমে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র বুঝিবার আশা করা যায়। আমরা নিরাশ হইব না, 'কালোহ্যয়ং' কুত্র হিসাবেও 'নিরবধিঃ' বটে। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'স্বপ্ন' নামক গদ্যকাব্যি পড়িয়া দ্বিজেন্দ্র-নাথের

'সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড, গোড়া নাই আগা।'

মনে পড়িল। ইনি স্বপ্নে 'বেলাহীন' আকাশমণ্ডল দেখিয়াছেন। জাগ্রতে কি আকাশমণ্ডলে 'তমালতালীবনরাজিনীলা', 'ধারানিবন্ধেব কলঙ্করেখা' বেলা দেখিয়া থাকেন? শ্রীগুরুদাস সরকারের 'খাজুরাহো' সুখপাঠ্য। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'বিরহে' দেখিতেছি,—

'ওই, গাছে বসে ভিজে নীরবে বায়স, ঘরে বসে ভিজি আমি।'

নিজের বাড়ী হয় ত মেরামত করুন ; ভাড়াটে বাড়ী হয় ত কাঁদিয়া বাড়ীওয়ালা নামক দেব-তার চরণ অশ্রুজলে ভিজাইয়া দিন। যদি কোনটাই মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে না হয় দিনু রায়ের 'তোমারই বিরহে সই রে, দিবানিশি কত সই' গানটার উপদেশ জীবনে মগ্ন করুন। তাও যদি অসাধ্য মনে হয়, বাদলায় মুড়ির সদ্গতি করুন। এ সব ছাড়িয়া একবারে কবিতা! কবিদের কি মনে হয় না, তাঁহাদের যেমন বিরহ ভাল লাগে, আমাদেরও তেমনই এমন কবি-তার বিরহ অন্ততঃ 'ঘন ঘোর বরষা'র স্পৃহনীয় হইতে পারে? শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'ভাদরের বেলা' যেন ভিজা ভট্টাচার্য্যের 'বিরহে'র অ্যান্টিডোট, পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি-লাম। শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'হানসীর প্রেম' 'মেলো-ড্রামাটিক' গল্প।

পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু।

পূরু নামে এক রাজবংশ বৈদিক যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। (১) এই বংশে পুরুকুৎস নামক এক বীর নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক বিজয়-কাহিনী ঋগ্বেদ চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শরৎ নামক দাস জাতির সপ্ত পুরী তিনি জয় করিয়াছিলেন। ঋষিগণ মনে করিতেন, পুরুকুৎসের প্রতি তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রই শরৎদিগের সাত পুরী বিদারণ করেন। ভরদ্বাজ ঋষি পূরুদিগের একটী পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। (২) সেই যজ্ঞের জন্য তিনি যে সূক্ত রচনা করেন, তাহাতে পুরুকুৎসের এই বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। (৩)

পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যুর রচিত এক সূক্তে আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুকুৎসের মহিষী পুত্রার্থ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞের পর ত্রসদস্যু

---

(১) যং। পূরবঃ। বৃত্রহনং। সচন্তে।—১।৫৯।৬ (গোতম পুত্র নোধা) যে বৃত্রহন্তাকে পূরুগণ সেবা করেন।

যং। পূরুভ্যঃ। দীদিবাংসং। ন। অগ্নিং।—৪।৩৮।২ (বামদেব) যাঁহাকে দীপ্যমান অগ্নির মত পূরুদিগকে দিয়াছ।

অয়ং। তে। মানুষে। জনে। সোমঃ। পূরুষু। সূয়তে।—৮।৫৩।১০ (কণ্বপুত্র প্রগাথ) এই সোম তোমার নিমিত্ত মানুষ লোকে পূরুদিগের মধ্যে অভিষব হইতেছে।

(২) দ্যৌঃ। ন। যঃ। ইন্দ্র। অভি। ভূমি। অর্যঃ। তস্থৌ। রয়িঃ। শবসা। পৃৎসু। জনান্।
তং। নঃ। সহস্রভরং। উর্বরাসাম্। দদ্ধি। সূনো। সহসঃ। বৃত্রতুরম্॥—৬।২০।১ (ভরদ্বাজ।)
হে ইন্দ্র। সূর্য্য যেমন ভূতজাতকে, সেইরূপ যে (পুত্ররূপ) ধন যুদ্ধে শত্রুজনদিগকে বল দ্বারা আক্রমণ করিতে পারে, হে বলের পুত্র! এমন সহস্রদাতা উর্ব্বরা-ভূমি-দাতা, বৃত্রহননকারী (পুত্র) প্রদান কর।

(৩) সনেম। তে। অবসা। নব্যঃ। ইন্দ্র। প্র। পূরবঃ। স্তবন্তে। এনা। যজ্ঞৈঃ।
সপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্ম। শারদীঃ। দর্ৎ। হন্। দাসীঃ। পুরুকুৎসায়। শিক্ষন্॥
—৬।২০।১০ (ভরদ্বাজ।)

হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষার সহিত নবতর ধন (আমরা) ভজনা করি। পূরুগণ এই সকল যজ্ঞের দ্বারা স্তব করিতেছে। কারণ, পুরুকুৎসকে দিবার জন্য সাত পুরী (ও) সুখ বিদারণ করিয়াছ, শারদী দাসী (প্রজাকে) বধ করিয়াছ।

জন্মগ্রহণ করেন। (১) ত্রসদস্যু এই ঋকে আপনার 'অর্ধদেব' উপাধি ছিল, প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, 'আমাদের সপ্তর্ষি পিতৃগণ অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন, এবং আমারও যজ্ঞ করিয়াছিলেন।' (২) মূলে 'দৌর্গহ' শব্দ আছে। সায়ণ-মতে, ইহার অর্থ,—পুরুকুৎস অর্থাৎ দুর্গহের পুত্র। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে, দৌর্গহ অর্থে অশ্ব। (৩) বোধ হয়, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের মত ত্যাগ করিয়া সায়ণের মত গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। পুরুকুৎসকে শতপথ-ব্রাহ্মণ-কার ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও ঋক্ আমরা ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হই না।

ত্রসদস্যু কর্তৃক উক্ত এই সাত জন ঋষি কে কে? আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পুরুদিগের মধ্যে একটী পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ভরদ্বাজ ঋষি সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু-বর্ণিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞেই যে ভরদ্বাজ উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কণ্বগোত্র সোভরি ঋষি পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যুর দান-স্তুতি ঋক্ রচনা করিয়াছেন। (৪) উদ্ধৃত দুইটী ঋক্ হইতে জানা

---

(১) পুরুকুৎসানী। হি। বাং। অদাশৎ। হব্যেভিঃ। ইন্দ্রাবরুণা। নমোভিঃ।
অথ। রাজানং। ত্রসদস্যুং। অস্যাঃ। বৃত্রহনং। দদথুঃ। অর্ধদেবম্।—৪।৪২।৯
(ত্রসদস্যু।)

হে ইন্দ্র-বরুণ! পুরুকুৎস-মহিষী তোমাদিগকে হবি ও নমস্কার দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন; অনন্তর ইঁহাকে বৃত্রহন্তা, অর্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করিয়াছিলে।

(২) অস্মাকম্। অত্র। পিতরঃ। তে। আসন্। সপ্ত। ঋষয়ঃ। দৌর্গহে। বধ্যমানে।
তে। আ। অযজন্ত। ত্রসদস্যুং। অস্যাঃ। ইন্দ্রং। ন। বৃত্রতুরং। অর্ধদেবম্।
—৪।৪২।৮। (ত্রসদস্যু।)

এই স্থানে আমাদিগের সপ্তর্ষি পিতৃগণ দৌর্গহের বধকালে (উপস্থিত) ছিলেন। তাঁহারা ইঁহার (অর্থাৎ পুরুকুৎসানীর) ইন্দ্রতুল্য, বৃত্রহন্তা, অর্ধদেব, ত্রসদস্যু (পুত্রের) যজ্ঞও আসিয়া করিয়াছিলেন।

(৩) There with Purukutsa, the Aikshvaka king, once on a time performed a horse-(daurgaha)-sacrifice, whence it is of this that the Rishi sings (Rig-Veda 4-42-8)—'These, the seven Rishis, were then our fathers when Daurgaha was bound.'
[Sayana, differently from our Brahmana takes Daurgaba as the patronymic of Purukatsa (son of Durgaha).] XIII—5-4-6.

(৪) অদাৎ। মে। পৌরুকুৎস্যঃ। পঞ্চাশতম্। ত্রসদস্যুঃ। বধূনাম্।
মংহিষ্ঠঃ। অর্যঃ। সৎপতিঃ।—৮।১৯।৩৬ (সোভরি।)

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে ৫০টী বধূ দিয়াছেন। (তিনি) অতির শ্রেষ্ঠ মংহনকারী (ও) সৎপতি।

যাইতেছে যে, সুবাস্তু-নদীতীরে এই দান হইয়াছিল। তাহা হইলে মনে হয়, বর্ত্তমান স্বাৎ নদীতীরে পুরুকুৎসের রাজধানী ছিল। আমরা 'সপ্তসিন্ধু' প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, স্বাৎ নদীকে প্রাচীন কালে গোমতিও বলিত। উদ্ধৃত দ্বিতীয় ঋকে শ্যাবঃ, তিসৃণাং ও সপ্ততীনাং, এই তিন শব্দ প্রাপ্ত হই। সায়ণ উহাদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। উহাদের কি অর্থ, তাহা আমরা বিচার করিয়া স্থির করিব।

ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণের ঋত্বিক্ কবষ ঋষি একটী ঋকে কণ্বকে নৃসদ-পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তিনি শ্যামবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শ্যাব নামেও অভিহিত করিয়াছেন। (১) ইহা হইতে মনে হয়, সোভরি শ্যাব শব্দ দ্বারা কণ্বকে বুঝাইয়াছেন। পুরু রাজাদিগের প্রজাগণ সম্ভবতঃ তিস্র ও সপ্ততী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অশ্বের পুত্র বশ ঋষি একটী ঋকে সপ্ততী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি পৃথুশ্রবা কাণীতের যজ্ঞ করেন। (২) এই

উত। মে। প্রয়িয়োঃ। বয়িয়োঃ। সুবাস্ত্বাঃ। অধি। তুগ্বনিঃ।

তিসৃণাং। সপ্ততীনাং। শ্যাবঃ। প্রণেতা। ভুবৎ। বসুঃ। দিয়ানাং। পতিঃ॥—৮।১৯।৩৭

(সোভরি।)

এবং আমাকে বহু (গো অশ্বাদি ধন), কন্যাদিগের সহিত (বস্ত্রাদি) সুবাস্তু (নদীর) তীরে (দান করিয়াছেন)। শ্যাব, দাতা তিস্রদিগের (ও) সপ্ততীদিগের বসু, পতি (ও) প্রকৃষ্ট নেতা হউন।

[সায়ণ-মতে শেষ অংশের অর্থ:—শ্যাব (অর্থাৎ শ্যামবর্ণ বৃষ) ২১০টী গাভীর অগ্রগামী, বসু, দানার্হা (গোদিগের) পতি হউক।]

(১) উত। কণ্বং। নৃসদঃ। পুত্রং। আহুঃ।
উত। শ্যাবঃ। ধনং। আ। অদত্ত। বাজী।—১০।৩১।১১ (কবষ।)

এবং নৃসদ-পুত্রকে কণ্ব বলা হয়; এবং হবিরূপ অন্নযুক্ত শ্যাব ধন পাইয়াছিলেন।

[বাজী হবির্লক্ষণান্নবান্ কণ্বঃ শ্যাবঃ শ্যামবর্ণঃ সন্ অস্মাৎ অগ্নেঃ সকাশাৎ ধনং আদত্ত অগৃহ্ণাৎ। ইতি সায়ণঃ।]

(২) যঃ। অশ্বেভিঃ। বহতে। বস্তে। উস্রাঃ। ত্রিঃ। সপ্ত। সপ্ততীনাম্।
এভিঃ। সোমেভিঃ। সোমসুৎভিঃ। সোমপাঃ। দানায়। শুক্রপূতপাঃ॥
—৮।৪৬।২৬ (বশ।)

যে (পৃথুশ্রবা কানীত) অশ্ব সকলের দ্বারা বাহিত হন, সপ্ততীদিগের গো সকলকে ২১ (স্থানে) বাস করাইয়াছেন; হে সোমপানকারি, দীপ্ত ও পূত সোম পানকারি! এই সকল সোমের দ্বারা, সোমাভিষবকারীদিগের দ্বারা (তিনি) দানার্থ (প্রস্তুত হইয়াছেন)।

[সায়ণ-মতে, ত্রিঃ সপ্ত সপ্ততীনাং অর্থ ২১ গুণ ৭০ গাভীদিগের দ্বারা গমন করেন। অথচ মূলে

যজ্ঞে তিনি যাঁহার নিকট হইতে দান প্রাপ্ত হন, তাঁহার বিষয় ঐ ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন। সপ্তবীদিগের গাভীদিগকে কাণীত ২১ স্থানে রাখিয়াছেন, ইহা বশ উল্লেখ করিতেছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, তাহাদের ২১টী গোত্রজ ছিল। কত সহস্র গো, অশ্ব, উষ্ট্র কাণীত দান করিয়াছিলেন, তাহা একটী ঋক্ হইতে দেখান যাইতেছে। ৬০ হাজার বা অযুত অশ্ব, বিংশতি শত উষ্ট্র, শ্যামবর্ণ বড়বা দশ শত, ত্রিঅরুষী দশটী, ও দশ সহস্র গাভী দান করা হইয়াছিল। (১) ইহা ব্যতীত আরও দানের উল্লেখ আছে। অতএব, সপ্তীনাং শব্দের যে অর্থ সায়ণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ইহা দ্বারা মনে করি, পূরুদিগের মধ্যে একটী বিশের (অর্থাৎ প্রজার) নাম বুঝাইতেছে। সেইরূপ তিস্ৃণাং শব্দের অর্থও আর এক বিশ সম্প্রদায়কে বুঝায়। ঋগ্বেদের আর এক ঋক্ আমাদের এই অর্থের সমর্থন করে। এক্ষণে আমরা পাঠকদিগকে ইহার প্রমাণ প্রদান করিব।

জমদগ্নি ঋষি একটী ঋকে বলিতেছেন—"তাঁহারা (অর্থাৎ মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা দেবগণ) তিস্রদিগের অরুণবর্ণ, জয়শীল একটী পুত্র প্রেরণ করিবেন। সেই সকল মরণরহিত অহিংসিত দেবগণ মর্ত্যদিগের ধামসকল দর্শন করেন।" (২) সায়ণ তিস্ৃণাং অর্থে পৃথিব্যাদীনাং করিয়াছেন। কিন্তু তিন মাতার এক পুত্র কে? অগ্নি দুই মাতার পুত্র; সূর্য্য অদিতির পুত্র, অর্থাৎ এক মাতার পুত্র। অতএব, তিস্ৃণাং শব্দের সায়ণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিলে কোনও অর্থ হয় না। আমরা বলি, ইহার অর্থ পূরুরাজাদিগের তিস্র নামক প্রজা। জমদগ্নি ৪র্থ ঋকে বলিতেছেন—"যে (জ্ঞানলাভার্থ) প্রশ্ন করে না, যজ্ঞ করিতেও (জ্ঞানের) আলোচনায় সুখী হয় না, এরূপ (বিপক্ষের সহিত) সংগ্রাম হইতে আমাদিগকে অদ্য উদ্ধার কর, বাহুদ্বয়ের দ্বারা উদ্ধার কর। (৩) যে শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে ঋষি তিস্রদিগের একটী

আছে,—অশ্ব দ্বারা গমন করেন ও গো সকলকে বাস করান। ২১ গুণ ৭০ অর্থাৎ ১৪৭০ গাভীকে বাস করান অর্থ হইতে পারে না।]

(১) ষষ্টিঃ। সহস্রা। অশ্ব্যস্য। অযুতা। অসনং। উষ্ট্রানাং। বিংশতিং শতা।
দশ। শ্যাবীনাং। শতা। দশ। ত্রিঅরুষীণাং। দশ। গবাম্। সহস্রা।—৮।৪৬।২২ (বশ।)

(২) তে। হিন্বিরে। অরুণং। জেন্যং। বসু। একং। পুত্রং। তিসৃণাম্।
তে। ধামানি। অমৃতাঃ। মর্ত্যানাং। অদব্ধাঃ। অভি। চক্ষতে।—৮।৯০।৩
(জমদগ্নি।)

(৩) ন। যঃ। সংপৃচ্ছে। ন। পুনঃ। হবীতবে। ন। সংবাদায়। রমতে।
তস্মাৎ। নঃ। অদ্য। সংঋতেঃ।—(জমদগ্নি।)

পুত্রের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই শক্র যজ্ঞে অনাস্থা-প্রদর্শনকারী। ইহা হইতে আমরা অনুমান করি, ত্রসদস্যু যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং যাহাতে ভরদ্বাজ ঋষি এক জন ঋত্বিক ছিলেন, সেই যজ্ঞে জমদগ্নিও ব্রতী থাকিয়া উদ্ধৃত সুক্তটী রচনা করিয়া পাঠ করেন। বিশ্বামিত্র ঋষি বৃদ্ধ জমদগ্নির নাম একটী ঋকে উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ইহাতে তিনি বিশ্বামিত্র অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অত্রি ঋষি ত্রিবৃষ্ণ-পুত্র ত্রিঅরুণের নিকট এক শত সুবর্ণ, ২০টী গো ও রথে যুক্ত দুইটী অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিঅরুণ যেরূপ, ত্রসদস্যুও সেইরূপ অত্রির উপর প্রীত হইয়া দান করেন। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ঋকে আমরা ইহা অবগত হই। (২) অতএব, অত্রি ঋষি ত্রসদস্যুর যেমন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেইরূপ তাঁহার মাতার যজ্ঞেও ব্রতী ছিলেন।

অগস্ত্য ঋষি একটী ঋকে যুবক পুরুকুৎসের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! মিথ্যা বাক্যযুক্ত শারদী বিশকে দমন করিয়াছ, যখন (তাহাদের) সপ্তপুর বিদীর্ণ করিয়াছ; হে অনিন্দনীয়! গমনশীল জল প্রবাহিত করিয়াছ, যুবক পুরুকুৎসের জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছ।" (৩) তিনি

---

(১) উরুষ্যতং। বাহুভ্যাং। নঃ। উরুষ্যতম্॥—৮।৯০।৪
যাং। মে। পলস্তি। জমদগ্নয়ঃ। দদুঃ।—৩।৫৩।১৬ (বিশ্বামিত্র।)

(২) ত্রৈবৃষ্ণঃ। অগ্নে। দশভিঃ। সহস্রৈঃ। বৈশ্বানর। ত্রিঅরুণঃ। চিকেত।—৫।২৭।১
যঃ। মে। শতা। চ। বিংশতিং। চ। গোনাং। হরী। চ। যুক্তা। সুধুরা। দদাতি।
বৈশ্বানর। সুষ্টুতঃ। বর্ধানঃ। অগ্নে। যচ্ছ। ত্রিঅরুণায়। শর্ম॥— ঐ ২
এব। তে। অগ্নে। সুমতিং। চকানঃ। নবিষ্ঠায়। নবমম্। ত্রসদস্যুঃ।
যঃ। মে। গিরঃ। তুবিজাতস্য। পূর্বীঃ। যুক্তেন। অভি। ত্রিঅরুণঃ। গৃণাতি॥
—৮।২৭।৩ (অত্রি।)

হে বৈশ্বানর অগ্নে! ত্রিবৃষ্ণ-পুত্র ত্রিঅরুণ দশ সহস্র দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন।
যিনি আমাকে শত (সুবর্ণ), বিংশ গো, রথে যুক্ত দুই অশ্ব দিতেছেন, হে বৈশ্বানর অগ্নে!
(সেই) ত্রিঅরুণকে সুন্দর স্তুত ও বৃদ্ধি পাইয়া সুখ প্রদান কর।
হে অগ্নে! অত্যন্ত স্তুত্য তোমার নিমিত্ত ত্রসদস্যু নূতন স্তব কামনা করিলে, যে ত্রিঅরুণ আমার রচিত তুবিজাতের পূর্ব্ব স্তব সকল একমনে বলিতেছেন।

[এই ঋকের অর্থ সায়ণ কিছু অন্যরূপ করিয়াছেন।]

(৩) দনঃ। বিশঃ। ইন্দ্র। মৃধ্রবাচঃ। সপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্ম। শারদীঃ দর্ৎ।
ঋণোঃ। আপঃ। অনবদ্য। অর্ণাঃ। যূনে। বৃত্রং। পুরুকুৎসায়। রন্ধীঃ॥
—১।১৭৪।২ (অগস্ত্য।)

আর এক ঋকে গোতম, অত্রি ও পুরুমীঢ় ঋষির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ঋকে তিনি বলিতেছেন—"হে দর্শনীয়দ্বয়! তোমাদিগকে গোতম, পুরুমীঢ়, অত্রি হবির্যুক্ত হইয়া রক্ষার্থ (প্রত্যেকে) আহ্বান করিতেছেন। হে নাসত্যদ্বয়! অভীষ্টদিকে গমনকারীর মত তোমরা ঋজু পথ দ্বারা আমার আহ্বানে আইস।" (১) এই ঋক্ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গোতম, অত্রি, ও পুরুমীঢ় অগস্ত্যের সহিত একত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি, অত্রি ত্রসদস্যুর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎসকে অগস্ত্য যুবক-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, দেখিতেছি। অতএব, পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু যুবক হইবার পূর্ব্বে অগস্ত্য বোধ হয় স্বর্গে গমন করেন। সেই জন্য তাঁহার রচনা-মধ্যে ত্রসদস্যুর নাম নাই।

গোতমগণ একটী ঋকে পুরুকুৎসের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! সেই তুমি পুরুকুৎসের জন্য যুদ্ধ করিয়া ৭ পুরী বিদারণ করিয়াছ।" (২) এই ঋক্‌টি ১ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তে বর্ত্তমান। গোতমগণ যে এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা অপর এক ঋকে উক্ত হইয়াছে। (৩) ১ম মণ্ডলের ৬২ সূক্তের একটী ঋকে আমরা দেখিতেছি, গোতম ও নোধা মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছেন। (৪) সায়ণ ইহার অন্তর্গত গোতম ও নোধা শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—গোতম-পুত্র নোধা। তাহা হইলে, সায়ণ-মতে,

---

(১) যুবাং। গোতমঃ। পুরুমীঢ়ঃ। অত্রিঃ। দস্রা। হবতে। অবসে। হবিষ্মান্।
দিশং। ন। দিষ্টাং। ঋজুয়া ইব। যন্তা। আ। মে। হবং। নাসত্যা। উপ।
যাতম্।—১।১৮৩।৫

(২) ত্বং। হ। ত্যৎ। ইন্দ্র। সপ্ত। যুধ্যন্। পুরঃ। বজ্রিন্। পুরুকুৎসায়। দর্দ্দঃ।—১।৬৩।৭

(৩) অকারি। তে। ইন্দ্র। গোতমেভিঃ। ব্রহ্মাণি।—১।৬৩।৯

হে ইন্দ্র! গোতম সকলের দ্বারা তোমার স্তব করা হইয়াছে।

(৪) সনায়তে। গোতমঃ। ইন্দ্র। নব্যম্। অতক্ষৎ। ব্রহ্ম। হরিযোজনায়।
সুনীথায়। নঃ। শবসান। নোধাঃ। প্রাতঃ। মক্ষু। ধিয়াবসুঃ। জগম্যাৎ।—১।৬২।১৩

হে ইন্দ্র! রথে অশ্বযোজন নিমিত্ত গোতম নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন (ও) নিত্যবৎ প্রয়োগ করিতেছেন। হে বলবান্ (ইন্দ্র)! আমাদিগের (যজ্ঞ) সুন্দররূপে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধীরত্ববান্ নোধা প্রাতঃকালে শীঘ্র গমন করুন।

[সায়ণ 'জগম্যাৎ' অর্থে এ স্থলে আগচ্ছতু করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ৫ম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ৫ম ঋকে 'আজগম্যাৎ' অর্থে আগচ্ছেৎ করিয়াছেন। অতএব, আমরা মনে করি, তাঁহার অর্থ এ স্থলে ঠিক হয় নাই। তাহা হইলে, গোতম ও নোধা বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়া পড়ে।]

গোতম-পুত্র পুরুকুৎসের সপ্ত-পুর-জয়ের বার্ত্তা অবগত ছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি, গোতম অগস্ত্যের এক যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তাহা হইলে, পুরুকুৎসের বিজয়-বার্ত্তা জানিবার সম্ভাবনা গোতমেরও ছিল। উদ্ধৃত ঋকের আমরা যে অর্থ করি, তাহাতে গোতম ঐ সূক্তগুলির রচনা করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গোতম ও পুরুকুৎস যে সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না। তবে পুরুকুৎসের যজ্ঞে গোতম উপস্থিত ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না।

সম্বরণ নামক এক ঋষি পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যুর যজ্ঞে যে দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ঋক্‌বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"এবং আমাকে হিরণ্যবান্ পুরুকুৎস-পুত্র সূরি ত্রসদস্যুর সেই সকল (দান) প্রীত করিয়াছিল।" (১) সম্বরণকে প্রজাপতির পুত্র বলা হইয়াছে। এই প্রজাপতি কে, তাহা লইয়া প্রাচীনকালেই সন্দেহ উঠিয়াছিল। কেহ বলেন, তিনি বিশ্বামিত্র-গোত্র; কেহ বলেন, বাচের পুত্র।

বসিষ্ঠ ঋষি পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যুর উল্লেখ করিয়াছেন। (২) কিন্তু তিনি পুরুকুৎস কর্ত্তৃক সপ্তপুরী-জয়ের কথা বলেন নাই। ইহার কারণ কি? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। 'সুদাস' প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, বসিষ্ঠ রাজা সুদাসের প্রধান ঋত্বিক্ ছিলেন। ঐ প্রবন্ধে ইহাও দেখান গিয়াছে যে, পরুষ্ণী (বর্ত্তমান রাভী) নদীর কূল ভেদ করিতে আসিয়া চয়মান-পুত্র কবি, শ্রুতকবষ ও বৃদ্ধ দ্রুহ্য জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (৩) অতএব সপ্রমাণ হইতেছে, কবষ ও বসিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। বসিষ্ঠ কবষকে শ্রুত উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি যে বেদবিৎ ছিলেন, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কবষ-ঋষি-রচিত কতকগুলি সূক্ত দশম মণ্ডলে বর্ত্তমান। ঐ মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ সূক্ত তাঁহারই রচিত। ইহাদের মধ্যে ৩৩ সূক্তে দেখিতে পাই, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকট তিনি ধন প্রার্থনা

(১) উত। ত্যা। মা। পৌরুকুৎস্যস্য। সূরেঃ।
ত্রসদস্যোঃ। হিরণিনঃ। ররাণাঃ।—৫।৩৩।৮ (সম্বরণ।)

(২) প্র। পৌরুকুৎসিং। ত্রসদস্যুং। আবঃ।
ক্ষেত্রসাতা। বৃত্রহত্যেষু। পূরুম্।—৭।১৯।৩ (বসিষ্ঠ।)
ক্ষেত্র-লাভের যুদ্ধে, বৃত্রহত্যাকালে পুরুকুৎসের পুত্র পূরু ত্রসদস্যুকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছ।

(৩) ৭।১৮।৮ ও ১২ ঋক্।

করিতেছেন। (১) অতএব, পুরুবংশীয় কুরুশ্রবণ রাজার হোতা হইয়া এই কবষ ঋষিই সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ; ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। এই যুদ্ধকালে ত্রসদস্যু জীবিত ছিলেন না। 'মিথ্যা-বাদী পূরুকে জয় করিব', ইন্দ্রের এই প্রতিজ্ঞা বসিষ্ঠের এক ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে। (২) সেই পূরু যে ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, রাজা সুদাসের সহিত ত্রসদস্যু-বংশের মিত্রতা-বন্ধন ছিন্ন হওয়ায়, সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ পূরুদিগের প্রশংসাসূচক ঋক্ রচনা করেন নাই, বা যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন না বলিয়া লুপ্ত হইয়াছে।

পুরুকুৎসকে অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি পৃশ্নিগু বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। (৩) পৃশ্নিগু অর্থে নানা বর্ণের গাভীযুক্ত। অতএব, পুরুকুৎস যে অনেক গাভীর অধিপতি ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। আমরা দেখাইয়াছি, ত্রসদস্যু স্বাৎ নদীতীরে রাজত্ব করিতেন। স্বাৎ নদীর আর এক নাম গোমতি। স্বাৎ নদীতীরে অনেক গোব্রজ বা গোষ্ঠ ছিল। ইহার জন্য উহার আর এক নাম গোমতি হইয়াছিল। সপ্তর্ষীদিগের পৃথুশ্রবা কাণীতের দান আমাদের অনুমানের সমর্থন করে।

বসিষ্ঠ যে পূরু জয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি একটী সূক্তে বলিয়াছেন (৪) "সুদাসের রথকে কেহ পরিভ্রমণ করে নাই, ব্যবহার করে নাই ; ইন্দ্র যাঁহার রক্ষক, মরুৎগণ যাঁহার, সেই (সুদাস) গোমতি ব্রজে গমন করুন।" আমরা অনুমান করি, গোমতীতীরে পূরুদিগের রাজ্য তিনি অধিকার করিয়া গমন করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বসিষ্ঠ এই ঋকে প্রদান করিয়াছেন।

আমরা 'অতিথিগ্ব দিবোদাস' প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে,

---

(১) কুরুশ্রবণং। আবৃণি। রাজানম্। ত্রাসদস্যবম্।
মংহিষ্ঠং। বাঘতাং। ঋষিঃ।—১০।৩৩।৪ (কবষ।)

বাঘতদিগের ঋষি (আমি কবষ) ত্রসদস্যুর পুত্র মংহিষ্ঠ কুরুশ্রবণ রাজাকে (ধনের জন্য) প্রার্থনা করি।

(২) ৭।১৮।১৩ ঋক্।

(৩) যাভিঃ। পৃশ্নিগুং। পুরুকুৎসং। আবতম্।—১।১১২।৭ (অঙ্গিরার পুত্র কুৎস) নানা বর্ণের গাভীর অধিপতি পুরুকুৎসকে যে সকল (রক্ষা) দ্বারা রক্ষা করিয়াছ।

(৪) নকিঃ। সুদাসঃ। রথং। পরি। আস। ন। রীরমৎ। ইন্দ্রঃ। যস্য। অবিতা।
যস্য। মরুতঃ। গমৎ। সঃ। গোমতি। ব্রজে।—৭।৩২।১০

রাজপুতানার অন্তর্গত শাম্বর হ্রদ ও আবু (বা অর্ব্বুদ) পাহাড় আর্য্যগণ জয় করিয়াছিলেন। দিবোদাস শম্বর-জয়ের জন্য ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি এই জয়ের স্তব রচনা করিয়াছিলেন। ইহার একটী ঋকে শরৎদিগের পুরী-জয়ের নিম্নলিখিতরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই;—"হে ইন্দ্র! যখন শরৎদিগের পুরী ধ্বংস করিয়াছিলে, পরাজয় করিয়া ধ্বংস করিয়াছিলে, (তখন) পূরুগণ তোমার এই বীর্য্যের (বিষয়) অবগত হইয়াছিল। হে ইন্দ্র! হে শক্তিপতে! অযজ্ঞকারী সেই মর্ত্ত্যকে শাসন কর, (তাহার নিকট হইতে) মহতী পৃথিবী, এই জল সকল কাড়িয়া লইয়াছ, হৃষ্ট হইয়া এই জল সকল (লইয়াছ)।" (১)

আমরা দেখাইয়াছি, সুদাস ও দিবোদাসের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। বোধ হয়, সেই জন্য দিবোদাসের পুত্র সুদাস-শত্রু পূরুদিগের এই বিজয়-কাহিনী তেমন উৎসাহের সহিত বলেন নাই, পুরুকুৎসের নামের উল্লেখও করেন নাই। শরৎ-দিগের ৭ পুর জয় শম্বর-জয়ের অল্প পরে বা পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছিল। এই সাত পুর কোন্ স্থানে?

আমরা 'দিবোদাস' প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণ দ্বারা শম্বর দাসের রাজ্যের অবস্থান নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সে সকল ছাড়া আর একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরুচ্ছেপ ঋষি বলিতেছেন—"উভয় দ্যাবা-পৃথিবীকে ঋত দ্বারা পবিত্র করিব; ইন্দ্রবিহীন দেশস্থ দ্রোহকারীদিগকে দহন করিব, যেখানে অমিত্রগণ যুদ্ধার্থ আসিয়া হত হইয়াছে—বৈলস্থানে হিংসিত হইয়া শয়ন করিয়াছে। ১"

"হে মঘবন্! এই যাতুমতিদিগের বল চূর্ণ কর—কুৎসিত বৈলস্থানে, কুৎসিত মহাবৈলে স্থিত। ৩" (২) সায়ণ বৈলস্থানের অনেক অর্থ করিয়াছেন; তাহাতে উহা হয় শ্মশান নয় নাগলোক বুঝায়। আমরা অনুমান করি

---

(১) বিদুঃ। তে। অস্য। বীর্য্যস্য। পূরবঃ। পুরঃ। যৎ। ইন্দ্র
শারদীঃ। অবাতিরঃ। সসহানঃ। অবাতিরঃ।
শাসঃ। তং। ইন্দ্র। মর্ত্ত্যং। অযজ্যুং। শবসঃ। পতে
মহীং। অমুষ্ণাঃ। পৃথিবীং। ইমাঃ। অপঃ। মন্দসানঃ। ইমাঃ। অপঃ॥—১।১৩১।৪

(২) উক্ষে। পুনামি। রোদসী। ঋতেন। দ্রুহঃ। দহামি। সং। মহীঃ। অনিন্দ্রাঃ।
অভিব্লগ্য। যত্র। হতাঃ। অমিত্রাঃ। বৈলস্থানং। পরি। তৃঢ়াঃ। অশেরন্॥—১।১৩৩।১
অব। আসাং। মঘবন্। জহি। শর্ধঃ। যাতুমতীনাম্।
বৈলস্থানকে। অর্মকে। মহাবৈলস্থে। অর্মকে॥—১।১৩৩।৩ (পরুচ্ছেপ।)

পরুচ্ছেপ ঋষি বিল বা ভীল সম্বন্ধীয় দেশকে বৈলস্থান আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১) ইহারা নাগ-পূজক ছিল; সেই জন্য অহি বা বৃত্র নামেও আর্য্যগণ ইহাদিগকে অভিহিত করিতেন। বর্ত্তমান কালেও আরাবল্লী পর্ব্বতে অনেক ভীল বাস করে। শাম্বর হ্রদ আরাবল্লী পর্ব্বতের নিকট। অতএব, ইহাকে ভীল বা বিল-স্থান বলিতে পারা যায়। ভীলগণের বর্ত্তমান সংস্কৃত নাম ভিল্ল।

দেখা যাইতেছে, আর্য্যগণ সরস্বতী-তীর হইতে আসিয়া রাজপুতানা অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি ইহার দক্ষিণেও অগ্রসর হন নাই? আমরা অনুমান করি, সুবাস্তু নদীতীরের পুরুকুৎস রাজা বর্ত্তমান সাতপুর পর্ব্বতে অবস্থিত শরৎদিগের পুর অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, এই সাতপুর-জয় হইতে ঐ পর্ব্বত সাতপুর পর্ব্বত নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। যদি মামুদ গজনীর সোমনাথ-জয় সম্ভব হইয়া থাকে, তবে সাতপুর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী শরৎ দাসদিগের সাতপুর-জয় পুরুকুৎসের পক্ষে কখনই অসম্ভব নহে।

আমরা দেখাইয়াছি, ত্রসদস্যুর এক পুত্র রাজা কুরুশ্রবণ। সোভরি ঋষি তাঁহার আর এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"হে অন্নবান্ (অশ্বিদ্বয়)! ঋতের পথ সকলের দ্বারা আমাদিগের নিকট এস। হে বৃষদ্বয়! ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষিকে মহৎবলের নিমিত্ত তাহাদের দ্বারা প্রীত কর।" (২) এই সোভরি ঋষি ত্রসদস্যুরও যজ্ঞ করেন। মনে হয়, ত্রসদস্যুর মৃত্যু হইলে প্রথম তৃক্ষি ও পরে কুরুশ্রবণ রাজা হন; অথবা, এক জন তিত্রদিগের, অপর জন সপ্তভীদিগের রাজা হন।

সোভরি ঋষি একটী সূক্তে দিবোদাস অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। (৩)

---

(১) দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণ-রচয়িতা ডাক্তার কল্‌ডওয়েলের মতে, দ্রাবিড়ীয় 'বিল' অর্থাৎ ধনু হইতে ভিল্ল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।—বিশ্বকোষ।

(২) উপ। নঃ। বাজিনী বসূ। যাতং। ঋতস্য। পথিভিঃ

যেভিঃ। তৃক্ষিং। বৃষণা। ত্রাসদস্যবম্।

মহে। ক্ষত্রায়। জিন্বথঃ॥—৮।২২।৭ (সোভরি।)

(৩) প্র। দৈবোদাসঃ। অগ্নিঃ। দেবান্। অচ্ছ। ন। মজ্মনা।

অনু। মাতরং। পৃথিবীং। বি। বাবৃতে। তস্থৌ। নাকস্য। সানবি।

—৮।১০৩।২ (সোভরি।)

দিবোদাসের দ্বারা আহূত অগ্নি বল দ্বারা দেবতাদিগের নিকট (এখনও গমন করেন) নাই; পৃথিবী মাতার সমীপে বর্দ্ধিত হইতেছেন; (তিনি) নাকলোকের উচ্চ স্থানে ছিলেন।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি দিবোদাসের যজ্ঞও করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, দিবোদাস ও ত্রসদস্যু যে সমসাময়িক নরপতি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বোধ হয়, পুরুকুৎস যৌবনকালেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

যে সকল ঋষি পুরুকুৎস-মহিষীর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের যে সকল নাম প্রাপ্ত হইলাম, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভরদ্বাজ, কণ্ব ও তৎপুত্র সোভরি, জমদগ্নি, অত্রি, অগস্ত্য, এবং সম্ভবতঃ গোতম, এই সপ্তর্ষি। প্রজাপতির পুত্র সম্বরণ ত্রসদস্যুর যজ্ঞ করেন। আমরা অনুমান করি, মনুকে প্রজাপতি ঋষি বলা হইত। সম্বরণ সম্ভবতঃ তাঁহারই পুত্র। ইহা আমাদের অনুমানমাত্র, তাহাও স্মরণীয়।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর।

আজ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে দুটো কথা বলিব। আপনারা হয় ত প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসিবেন, তুমি বিজাতি, বিদেশী, তোমার এই স্মৃতিসভায় দুটো কথা বলিবার কি অধিকার আছে? তুমি বলিবার কে? কিন্তু যে মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার্থ আজ আপনারা এই বিরাট সভা আহূত করিয়াছেন, যাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভকে উন্নততর করিবার জন্য আপনারা প্রয়াস করিতেছেন, তাঁর সহিত আমার যে কতদূর গাঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা আপনারা জানেন না। আমি শ্রদ্ধাপূর্ণহৃদয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুটো কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।—তাঁর সহিত আমার সম্বন্ধ—তিনি প্রথমতঃ আমার শিক্ষাদাতা, এবং দ্বিতীয়তঃ আমার শান্তিদাতা।

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কলিকাতায় প্রথম আসি, তখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সানুগ্রহে আমাকে স্বনামখ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া আমার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়—কি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছি—কি প্রশান্ত নয়ন, কি গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী,—এমন আশা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছিলাম; বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে প্রথম দিনেই নয়ন সার্থক হইরাছিল

দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখন আমি বাঙ্গালাও ভাল জানিতাম না, ইংরাজীও সেইরূপ। মনের আশা মিটাইয়া—প্রাণ খুলিয়া—তাঁর সহিত দুটো কথা সে দিন আর বলিতে পারিলাম না। তাঁর কথাগুলিও বড় ভাল বুঝিতেও পারিলাম না। সেই অবধিই মাঝে মাঝে আমি তাঁর কাছে যাইতাম—নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাঁকে উত্যক্তও করিতাম, কখনও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে, কখনও বা হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে, কখনও বা তন্ত্র সম্বন্ধে, এবং কখনও বা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোনটীর উত্তরই না দিয়া বলিতেন—'আমি ও সম্বন্ধে জানি না।' কি আশ্চর্য্য!—এমন পণ্ডিত, লোকের কাছে শুনিয়াছিলাম, তাঁর মত পণ্ডিত খুব কম, এবং নিজেও কত আশা করিয়া তাঁর কাছে আসিয়াছিলাম, তিনি নিজেই বলিলেন—'আমি ও সম্বন্ধে জানি না।' সেই দিন হইতেই আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া তাঁর পাণ্ডিত্যে আমার খুব সন্দেহ হইয়াছিল। আর আমি তাঁর কাছে বড় যাইতাম না—এমন কি, এক বছর ধরিয়া যাই নাই।

হঠাৎ এক দিন মনে হইল, আজ ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট গিয়া একটু গল্প করিয়া আসি। ধীরে ধীরে তাঁর বাহিরের ঘরে গেলাম। বড়ই যত্ন করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। অনেক কথার পর বৈদিক যজ্ঞের কথা উঠিল,—সেই সময়ে আমি যজ্ঞ সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনা করিতেছিলাম। কিন্তু কোনরূপে ভাল বুঝিতে পারি নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে, যজ্ঞ বলিতে অনেক যজ্ঞ বুঝায়। সত্য কথা বলিতে গেলে, সেগুলি না দেখিলে বুঝা বড় শক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ভারত তা'র সে পূর্ব্বের পথ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পিতৃপিতামহের কর্ম্মকাণ্ড—যজ্ঞ, সে আর করিতে জানে না। তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে বিষয়ে এখন শিক্ষা বা অনুসন্ধান করিতে গেলে সেই বিষয়ের পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরও এক জন সেই ধরণের পণ্ডিত ছিলেন। অনেক পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু বিজাতি বলিয়া কেহই আমাকে তাহা শিখাইতে প্রতিশ্রুত হন নাই, কিন্তু সে দিন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে সে আশা মিটিয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাছে আমার কষ্টের কথা জানাইয়াছিলাম—অনেক দিন ধরিয়া যে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য কষ্ট পাইতেছি, তাহা শুনিয়া বলিলেন—'আপনি কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। কাজে কাজেই ও সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জানা আছে, তাহা

আপনাকে বলিব।' সেদিনকার মত তাঁর অনূদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণখানি আমাকে পড়িতে দিলেন। সেই বইখানি পড়িয়াই আমার বড় অনুতাপ হইয়াছিল—এত বড় এক জন পণ্ডিতের সম্বন্ধে এমন ভুল ধারণা করিয়াছিলাম! বাস্তবিকই রামেন্দ্রসুন্দর অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের দুরূহ স্থানসমূহও আমাকে এমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে আমি খুব একটা উঁচু স্থান না দিয়া থাকিতে পারি নাই। কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ, তাহাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, এগুলি তিনি আমাকে সেই হইতে সুচারুরূপে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দিতেন। সেই দিন হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, রামেন্দ্রসুন্দর এক জন বাস্তবিক পণ্ডিত—তাঁর কথা বইয়ের কথা নয়।

ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, গুণের চেয়ে দোষের ভাগটা আমাদের বেশী। সে সব দোষের ভিতর একটা দোষ মাথা উঁচু করিয়া পরের কাছে আমাদের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। সে দোষটা হইতেছে এই যে, বিষয়টা ভালো করিয়া বুঝিতে পারি বা নাই পারি, নিজের আয়ত্ত করিতে পারি বা নাই পারি, দুটো পাতা পড়ি বা নাই পড়ি, লোকের কাছে কিন্তু ঘোষণা করিয়া দিতে চাই—আমি ও বিষয়টা খুব শিখিয়াছি। এই যে মস্ত একটা দোষ—এটা আজ কাল বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে। এটা কিন্তু আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরের ছায়াও মাড়াইতে পারে নাই। যেটুকুতে তাঁর একটুও সন্দেহ থাকিত, সে সম্বন্ধে তিনি ভুলিয়াও বলিতেন না, 'আমি জানি'। এটা কিন্তু কেহ মনে করিবেন না, নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসহীনতার পরিচায়ক। ইহাই মনুষ্যত্বের একটা মস্ত লক্ষণ—প্রকৃত পণ্ডিতের প্রধান গুণ। যতক্ষণ একটা জিনিসকে নিজের করিতে না পারি, ততক্ষণ কাহারও কাছে বলিব না যে, আমি উহা শিখিয়াছি। জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই মূলমন্ত্র করিতে হইবে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরও তাহাই করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে তিনি একটু জ্ঞান আছে স্বীকার করিতেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যজ্ঞ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। এমন করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সে বিষয় তাঁর সম্পূর্ণ জানা আছে। আমাকে বুঝাইবার কিছু দিন পরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি এমন সুন্দর হইয়াছিল, এমন গবেষণাপূর্ণ হইয়াছিল যে, আজ কাল ওরূপ খুব কম পণ্ডিতেই বলিতে পারেন, বা লিখিতে পারেন।

সংক্ষেপে আমার শিক্ষাদাতা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিলাম। এখন একবার আমার শান্তিদাতা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিতে চাই।

আপনাদের আগেই বলিয়াছি, প্রথম বারেই যখন রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখনই উঁহার প্রীতিময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সেই হইতেই যখন আমার মনে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, তখনই উঁহার নিকটে গিয়া বসিতাম। হয় ত দেশের কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া মন অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে—তখনই উঁহার নিকটে গিয়া বসিতাম। মনে বড় বিশ্বাস ছিল যে, মহাত্মা রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত দুটো গল্প করিলে, তাঁর মুখের দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিলে শান্তি লাভ করিতে পারিব। বাস্তবিকই কাজেও তাই হইত। যখনই যাইতাম, হাসিমুখে বড় আদর করিয়া কাছে বসাইতেন—যেন চিরপরিচিত। শান্তভাবে কত গল্প করিতেন—যেন কত দিনের আত্মীয়তা।

সেবার আমার বড় অসুখ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ভুগিয়াছিলাম বলিয়া নিজের কোনও কাজ করিতে পারিতাম না। কাজ করিতে না পারায় এমনই কষ্টবোধ হইত যে, একা থাকিতে খুব অশান্তি ভোগ করিতাম। সেই জন্য সেবার কিছু দিন প্রায় প্রত্যহ উঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। এক দিন বলিলেন,—'কি কিমুরা সাহেব, আসুন, কোনও কাজ আছে?' বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিকই ত কোনও কাজ নাই—কেন প্রত্যহ উঁহাকে বিরক্ত করিতে আসি। কি আর উত্তর দিব, বলিলাম—'কোনও কাজ ত নাই—আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।'—'বেশ—আসুন। কাজ না থাকলে এখানে কি করিতে?' 'অসুখের জন্য কাজ কর্‌তে না পারায় বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি, আপনার কাছে একটু শান্তি লাভ কর্‌তে এসেছি।' রামেন্দ্রসুন্দর বড় আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'এখানে আসিলে কি আপনার শান্তি হয়?' 'হাঁ, আপনার শান্ত হাসি মুখ দেখিলে হৃদয়ে বড় শান্তি পাই।' আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর চ'খে সে দিন জল আসিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে—আর তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না, বলিয়াছিলেন—'কিমুরা মহাশয়—আমাদের দেশ দরিদ্র হইলেও সেই শান্তিভাবটা এখনও রহিয়াছে।' বাস্তবিক কথা বলিতে গেলেও তাই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিচিহ্ন ঐ রকম দুই একটা ভাবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইখানে দুটো নিজের কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা

সাধারণতঃ জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, বা ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। তাঁরা যে কিছু না করিয়া আসেন, এমন নহে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এক রকমের পণ্ডিত হইয়া আসেন। যখন আমি সংস্কৃত ও দর্শন পড়িবার জন্য ভারতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, বন্ধুবর বলিলেন—তুমি ভারতবর্ষের মত গরম দেশে কেন যাইতেছ ? ওই কুসংস্কারপূর্ণ দেশে গিয়া কি তোমার শিক্ষা হইবে ? মাতা, পিতা ও জ্ঞাতিগণ সকলেই ভারতে আসার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু তাঁদের মতে মত দিতে পারি নাই—হয় ত ইউরোপে বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিয়া, ক্রমবিকাশের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখিয়া ঐ বিষয়-গুলি শিখা যাইতে পারে—ভারতবর্ষে হয় ত সেটা হইবে না। কিন্তু যে দেশের জিনিস—সে ধর্ম্মই হউক, বা সাহিত্যই হউক, বা দর্শন শাস্ত্রই হউক, কিংবা অপর যে কোনও বিষয়ই হউক না কেন,—সে দেশের জিনিস সে দেশের সহিত সে সকলের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সে দেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা না করিলে, সে দেশের জিনিস-গুলিকে কখনও আয়ত্ত করা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি অন্য দেশে গিয়া শিক্ষা করিলে ভারতীয় বিষয়সমূহের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এই জন্যই আমি ভারতে আসিয়াছিলাম। বন্ধুগণের কথা, এমন কি, পিতা মাতার কথার চেয়েও আমার এই বিশ্বাসটাকেই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। দেশের দেশীয়ত্ব বাদ দিয়া, সে দেশের জিনিসকে নিজের করিবার ইচ্ছাটা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করা কত দূর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, বলিতে পারি না।

শেষ কথা—রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় নিরহঙ্কার ও [illegible] পণ্ডিতের সহিত মেশায় আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলাম। আমি তাঁকে যে গুণসমূহে গুণান্বিত মনে করিয়াছিলাম, তাদের মধ্যে চিন্তাশীলতা প্রথম। কোনও দিন কোনও কথারই আমি তাঁকে হঠাৎ উত্তর দিতে দেখি নাই। সব সময়েই বেশ চিন্তা করিয়া উত্তর দিতেন। তাঁর একটা বড় গুণ দেখিয়াছিলাম—তিনি কখনও কাহারও উপর রাগ করিতেন না—আমি তাঁকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। এই শান্তিপ্রিয়তাই তাঁকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই স্থিরচিত্ত ছিলেন। চাঞ্চল্য ভাব কখনই তাঁহার মুখে পরিলক্ষিত হইত না। এমন নিরহঙ্কার ছিলেন যে, সেরূপ বড় মিলে না। এক

দিন আমাকে বলিয়াছিলেন—'কিমুরা সাহেব, বৌদ্ধধর্ম্ম আমাকে কিছু শিখাইয়া দেন না। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশ করিব।' গত বৎসর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিবার ভার পাই, তখন তিনি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—'বেশ হইয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে পুস্তক লিখিবেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়টা বাঙ্গালাতেও প্রকাশ করিয়া আমাদের দিবেন।'

এরূপ চিন্তাশীল, শান্তিপ্রিয়, নিরহঙ্কার আদর্শ পণ্ডিত আপনাদের দেশে হয় ত অনেক আছেন, কিন্তু আমার দেশে বড় কচিৎ পাওয়া যায়। তিনি যে কত সৌন্দর্য্যের আধার ছিলেন, তাহা আমি অজ্ঞ—সম্যকরূপে বুঝাইতে পারিব না। মোট কথা, তাঁকে দেখিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে, 'স্বভাবে সুন্দর, রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, বিদ্যায় সুন্দর, এবং হাসিতে সুন্দর' ছিলেন, সে কথাটার সার্থকতা বেশ বুঝিয়াছিলাম।—নামে যে সুন্দর ছিলেন, সেটা ত আপনাদের অনেক দিনের জানা কথা। সেই ত সেই দিন তাঁকে দেখিয়াছিলাম—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে চাহি না।—আপনারাও বোধ হয় আমার কথায় সায় দিতে আপত্তি করিবেন না। যখনই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে, তখনই তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার মনের ভিতর জাগিয়া উঠে। তাঁকে যেন তখনই দেখিতে পাই। কেমন করে বলিব, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর যশঃসৌরভ তাঁকে অমর করিয়া রাখিবে।

আপনাদের দেশ, তাঁর জন্মভূমি—এখানে আপনারা তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবার অনেক আয়োজন করিবেন, সন্দেহ নাই—আর তাঁর কার্য্যই তাঁর স্মৃতিকে সকলের মনে চিরদিন জাগাইয়া রাখিবে। তবে আমি—তাঁর এই বিদেশী ভক্ত—তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার একটা উপায় স্থির করিয়াছি; তাঁর বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি আমার মাতৃভাষায় অনূদিত করিয়াই আমার দেশে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিব।

আর, কিমুরা।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মুসলমানদের আমল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তারানাথ ন্যায়রত্নের নিবাস হরিরামপুর গ্রামে। এই গ্রামখানি যে পরগণার অন্তর্গত, তাহার নাম ছিল—পরগণে এলামসাহী। বিজয় দত্ত নামক এক জন ধনাঢ্য কায়স্থ নবাব সরকারে অনেক টাকা নজর সেলামী দিয়া, এবং বিস্তর টাকা আমলা-খরচ করিয়া সমগ্র এলামসাহী পরগণা বে-মেয়াদী ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। হরিরামপুর সাধারণ পল্লীগ্রাম হইলেও ভাগিরথী-তীরে অবস্থিত বলিয়া এই নূতন তালুকদারের সদর কাছারী এই গ্রামেই সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই মহাল বন্দোবস্ত করিয়া লইতে বিজয় দত্তের বিস্তর টাকা ব্যয় হওয়ায়, তালুকস্থ প্রজাগণের নিকট পড়তা করিয়া সেই টাকা আদায় ও নিরিখ বৃদ্ধি করিয়া দশ টাকা আয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মহালে আসিয়াছেন। বিজয় দত্তের স্ত্রী মহামায়া ও কন্যা সত্যবালা তাঁহার সঙ্গেই আছেন।

তালুকদার মহালে আসিয়াছেন,—প্রজারা দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট দরবার করিতেছে।—কাহারও জমীর দরবার, কাহারও খাজনা-হ্রাসের দরবার, কাহারও ছেলে বেকার বসিয়া আছে, তাহার জন্য একটী চাকরীর দরবার; সমস্ত দিনই দরবার চলিতেছে। কাছারী-বাড়ী দিবারাত্রি সরগরম।

তারানাথ ন্যায়রত্নের কোনও দরবার নাই, এ জন্য তিনি তালুকদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। বিজয় দত্ত ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'তারাঠাকুর কত বিঘা লাখেরাজ ভোগ করে, তাহার কোনও সনন্দ আছে কি না'—এই প্রসঙ্গ লইয়া কাছারীতে একটু আধটু আলোচনাও চলিয়াছে। মোসাহেবের দল জমীদারদের অপরিহার্য্য বাহন। সুতরাং বিজয় দত্তেরও চাটুকারের অভাব ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল। তারা ঠাকুরের লাখেরাজের প্রসঙ্গ উঠিলে, প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহাদেরই এক জন, পার্শ্বস্থ অন্য এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'কেমন হে

রায় মশায়! তারাঠাকুরের কোনও সনন্দ থাকার কথা তোমার স্মরণ হয় কি? আমার ত স্মরণ হয় না।'

রায় মশায় মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, 'সনন্দ থাক না থাক, এত বেশী জমী কখনও যে তার দখলে ছিল, এ ত বাপু, আমার বিশ্বাস হয় না।'

তৃতীয় মোসাহেব 'বিশ্বাস মশায়' একটু দূরে বসিয়াছিল, সে মাথা উঁচু করিয়া বলিল, 'এত বেশী জমী কোনও কালেই তার দখলে ছিল না, এ কথা আমার শুনা আছে; আর বিলক্ষণ জানাও আছে। তারাঠাকুর, কি ব'লে—'ক্রমশ' বাহু গিল্‌তে গিল্‌তে হাত গিলেছে! মালের জমী ঠেলে বার করে নিজের দখল বিস্তর বাড়িয়ে নিয়েছে। ঠাকুরের কি 'মিষ্টে'!'

'ঘোষ মশায়', আর একটি পারিষদ, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'জমী হলেই হ'লো? তারাঠাকুরের জমীর মত জমী এ দিগরে আছে? জমী নয় ত যেন সোনার খনি! বিঘেয় বিঘেয় সোনা ফলে। (মুহূর্ত্তকাল নীরবে মাথা চুল্‌কাইয়া) এ জমী বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলে সরকারের যদি বিলক্ষণ দশ টাকা আয় না হয় ত আমি কায়েৎ-বাচ্চাই নই!'—প্রস্তাবটা প্রভুর মনের মত হইয়াছে কি না বুঝিবার জন্য সে সতৃষ্ণনেত্রে একবার বিজয় দত্তের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু বিজয় দত্ত বড় চাপা লোক, তাঁহার মুখ দেখিয়া এই ঘোষ মোসাহেবটী কিছু বুঝিতে পারিল না।

তালুকদার প্রজার নিকট তাঁহার নজর-সেলামীর টাকা আদায় করিবেন, এবং নিরিখ বৃদ্ধি করিয়া আয় বাড়াইবেন। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণকে হস্তগত করিয়া তাহাদের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে সকল দিকেই সুবিধা হইতে পারে—চতুর বিজয় দত্ত ইহা ভালই জানিতেন। তিনি এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ধান লইতেছিলেন, এ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি কে, কাহারই বা প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, এ গ্রামের প্রজাবর্গের মধ্যে তারানাথ ন্যায়রত্নের প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকে। সুতরাং তিনি এই বিষয়-বুদ্ধিহীন, সরল ব্রাহ্মণপণ্ডিতটিকে হস্তগত করাই সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মোসাহেবের দল তাঁহার মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি সে সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ন্যায়রত্ন নাকি খুব বড় পণ্ডিত?'

অদূরে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন, তাঁহার কি একটা দরবার ছিল। তিনি উত্তর করিলেন, 'ন্যায়রত্নের সমকক্ষ মহাপণ্ডিত আমাদের এ প্রদেশে আর দ্বিতীয় নাই। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই তিনি অসাধারণ পারদর্শী, তথাপি তাঁহার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই। তাঁহার লোভ নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী, ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই।'

তালুকদার বলিলেন, 'বটে? লোকে তাঁর খুব খাতির করে?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'খাতির! তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে।'

তালুকদার বলিলেন, 'গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ হ'লে তারা কাজি সাহেবের কাছে নালিশ না ক'রে তারই কাছে না কি বিবাদ নিষ্পত্তি কর্‌তে যায়?'

ব্রাহ্মণ ঠাকুর সোৎসাহে বলিলেন, 'যদিস্যাৎ গ্রামে প্রজাবর্গের মধ্যে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ সংঘটন হয়, সে ক্ষেত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই মধ্যস্থতাবলম্বন-পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকেন; কাজি সাহেবের সকাশে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ-উত্থাপনের আবশ্যকতা প্রায়ই কেহ অনুভব করে না।'

তালুকদারের অন্যতম মোসাহেব পূর্ব্বোক্ত ঘোষজা ঠাকুরের কথা শুনিয়া চটিয়া বলিল, 'সোজা কথায় জবাব দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়? তোমাদের বামুনপণ্ডিতগুলার দোষই ঐ; সাধুভাষা ছাড়া আর তোমরা কথা বল্‌তে পার না। অত বিদ্যে প্রকাশ করা কেন হে বাপু?'

ঠাকুর বলিলেন, 'রাজা স্বয়ং ভগবানের অংশ; ভগবানের বিভূতি রাজদেহে বর্ত্তমান। বিস্তর সৌভাগ্যে রাজদর্শন হয়; তাঁহার সহিত বাক্যালাপে যদি সাধুভাষার ব্যবহার না করিব, তবে কি ডোমের সহিত সাধুভাষায় আলাপ আপ্যায়ন করিতে হইবে?'

কিন্তু এ সকল বাক্‌বিতণ্ডায় তালুকদারের লক্ষ্য ছিল না। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, ন্যায়রত্নকে কোনও কৌশলে হস্তগত করিতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।—কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে ন্যায়রত্নকে বশীভূত করিতে পারা যায়, তাহাই তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যে তাঁহার মনের ভাব জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। এই সকল গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি তাঁহার প্রসাদভিক্ষু নির্ব্বোধ মোসাহেবগণের

মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার গুপ্ত সংকল্প অপদার্থ ও অসার চাটুকারগণের কর্ণগোচর করিয়া, মন্ত্রগুপ্তির উপযোগিতা নষ্ট করিবেন,—বিজয় দত্ত এরূপ বিষয়-বুদ্ধি-বর্জ্জিত অন্তঃসারশূন্য লোক ছিলেন না। নতুবা তিনি বহু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নবাব সরকার হইতে পরগণা এলামসাহী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন না।

এক দিন অপরাহ্নে তালুকদার কন্যা-সমভিব্যাহারে হাতীতে চড়িয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। হাতীর সম্মুখে ও পশ্চাতে মাথায় লাল-পাগ্‌ড়ী বাঁধা লাল-কুর্ত্তিধারী বিস্তর পেয়াদা! ন্যায়রত্নের বাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তালুকদারের ইচ্ছা হওয়ায়, তাঁহার ইঙ্গিতে মাহুত হাতীকে সেইখানে দাঁড় করাইল। হাতী পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন শুণ্ড আস্ফালন করিতে লাগিল। পেয়াদার দল তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাতীর চারি দিকে একটি বূহ্য রচনা করিল। পাড়ার ছেলের দল পেয়াদার ভয়ে হাতীর নিকটে আসিতে না পারিয়া কিছু দূরে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য নির্নিমেষনেত্রে দেখিতে লাগিল। তাহারা হাতীর দিকে চাহিয়া চাপা গলায় কত কথার আলোচনা করিতেছিল; হঠাৎ একটা উলঙ্গ ছোট ছেলে তাহার দিদির কোলের কাছে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

'হাতী তোর গোদা গোদা পা,
আমাকে চড়িয়ে নিয়ে যা!'

বালকের কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র দুই তিন জন পেয়াদা লাঠী তুলিয়া সরোষে সেই শিশু-কৌজের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া বালকের দল হুড়ামুড়ি করিয়া পরস্পরের ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে দশ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। যে বালক তাহাকে 'চড়িয়ে নিয়ে' যাইবার জন্য হাতীকে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার দিদি তাহার গালে 'ঠাস্' করিয়া এক চড় মারিয়া তাহার 'ডানা' ধরিয়া টানিতে টানিতে সকলের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল, এবং হাতীর 'হাওদার' লাল ঝালরের বাহার দেখিতে লাগিল।

গ্রামের কয়েক জন বৃদ্ধ অদূরবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছিল; তালুকদার হাতীতে চড়িয়া ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তাহাদের পাশা-খেলা ও তামাক-

টানা উভয়ই বন্ধ হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল।

এক জন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে মস্তক প্রসারিত করিয়া পথি-প্রান্তস্থ হাতীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল, 'গরীব বামুনের বাড়ীতে তালুকদারের পদার্পণ —আর কারও ভাগ্যে কখনও এত সম্মান ঘটে নি; ন্যায়রত্নের পরম সৌভাগ্য!'

আর এক জন বলিল, 'ন্যায়রত্ন কি তোমার আমার মত মানুষ!' তিনি গরীব হ'লে কি হয়, কত বড় পণ্ডিত লোক! দেশজোড়া মান। শাস্তরেই ত আছে—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বানং সর্ব্বত্রং পূজ্যতে।' বিদ্বান 'ব্যেক্তি'র পূজো সকল লোকেই করে থাকে। সাধে কি আমার শঙ্করাকে টোলে দিয়েছিলাম? কি করবো, টোলখানা উঠে গেল! তা ন্যায়রত্নের মত মানী লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তালুকদার যদি তাঁর বাড়ীতে আসেন, তাতে তালুকদারেরই 'সৌজন্যতা' 'প্রেকাশ' হচ্ছে, কি বল জয়চন্দোর?'

জয়চন্দ্র নামধারী বৃদ্ধটি মাথা নাড়িয়া মুরুব্বিয়ানা প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, 'আরে রেখে দাও তালুকদারের সৌজন্যতা! তাঁর সৌজন্যতা সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনও ফয়তা না দেওয়াই ভাল। আমরা ভাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের আবশ্যক? তবে কথাটা যখন তুল্লে, তোমাদের কাছে বল্‌তে দোষ নেই—সে দিন তালুকদারের কাছারীতে ন্যায়রত্নের জমীজমা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হচ্ছিল, তা শুনে ত গরীব ব্রাহ্মণের জমী কয় কুড়ার দশায় কি দাঁড়ায়—কিছু বলা যায় না।'

ন্যায়রত্নের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী পথে এত সমারোহ—ন্যায়রত্ন তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই; তিনি তখন তাঁহার বাসগৃহের 'পিঁড়া'য় বসিয়া সুমতিকে 'কুমারসম্ভবে'র একটি কঠিন শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে সুমতি 'রঘুবংশ' শেষ করিয়া 'কুমারসম্ভব' আরম্ভ করিয়াছে।—হঠাৎ ন্যায়রত্ন সংবাদ পাইলেন, তালুকদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পথে প্রতীক্ষা করিতেছেন! ন্যায়রত্ন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কন্যার অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তালুকদার হাতী হইতে নামিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া তাঁহারই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তালুকদার সম্মুখে সেই গৌরবর্ণ, প্রশস্তললাট, প্রসন্নবদন, ব্রহ্মণ্যতেজোমণ্ডিত, দীর্ঘদেহ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই ন্যায়রত্ন; তাঁহাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিবার আবশ্যক হইল না। তালুকদার সর্ব্বজন-সমক্ষে

দণ্ডবৎ হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিলেন; সত্যবালাও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। দর্শকগণ প্রশংসমান-নেত্রে তালুকদারের এই বিনয়-নম্র উদার ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া একবাক্যে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

ন্যায়রত্ন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া, 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া তালুকদার ও তালুকদার-নন্দিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর সস্নেহে সত্যবালার হাত ধরিয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তালুকদার তাঁহার দেহরক্ষী বরকন্দাজগণকে পথিপ্রান্তে অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া ন্যায়রত্নের অনুসরণ করিলেন। ন্যায়রত্ন সত্যবালা সহ গৃহপ্রাঙ্গনে পদার্পণ করিতে না করিতে সুমতি আসিয়া সত্যবালাকে পরমসমাদরে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ন্যায়রত্ন তালুকদারকে লইয়া তাঁহার বাসগৃহের পিঁড়ায় উঠিয়া ব্যগ্রভাবে একখানি কম্বল বিছাইয়া দিলেন।

এই কম্বলখানি ন্যায়রত্ন মহাশয় কত কাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বহু কাল ধরিয়া শীত-গ্রীষ্মে সমভাবে ব্যবহারের ফলে কম্বলের লোমগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে; সূত্রগুলি যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহার উপর কম্বলের তিন চারি স্থান ছিঁড়িয়া গিয়া, তলার মাটী দেখা যাইতেছে! কোনও সংসার-জ্ঞান-সম্পন্ন গৃহস্থ—সে যতই দরিদ্র হউক, কোনও ভদ্রলোকের অভ্যর্থনার জন্য, এই জীর্ণ, ছিন্ন, অব্যবহার্য্য কম্বল বাহির করিতে লজ্জিত হইত; 'দেশের রাজা' তালুকদারের অভ্যর্থনা ত দূরের কথা! কিন্তু বিষয়-জ্ঞান-বর্জ্জিত, অভাব-বোধে অনভ্যস্ত ন্যায়রত্ন এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার! তিনি বলিলেন, 'আমার ন্যায় গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভবাদৃশ দিক্‌পালতুল্য ব্যক্তির শুভাগমন, আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু আপনাকে বসাইতে পারি, সেরূপ আসন ত আমার ঘরে নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কম্বলখানিতে আসন গ্রহণ করুন। দেখুন, ভগবান মরীচিমালীর সর্ব্বত্র প্রসারিত রশ্মিজাল কেবল যে বিকশিত কমলদলেই নিপতিত হইয়া তাহা সুষমাপূর্ণ করে, এরূপ নহে, দরিদ্র কৃষকের জীর্ণ কুটীরের বিবর্ণ পর্ণরাশিকেও তাহা উপেক্ষা করে না।'

তালুকদার হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত, আপনার এই উপমাটি আপনার মুখেই শোভা পায়, কিন্তু আমার মত নগণ্য ব্যক্তি এ উপমার যোগ্য নহে—আমি শূদ্র, আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা। এ কম্বলখানি নিশ্চয়ই আপনার আসন, আমি শূদ্র হইয়া আপনার আসনে বসিব?—এ অনুরোধ করিয়া আপনি আমাকে অপরাধী করিবেন না।'।

এই কথা বলিয়া তালুকদার ন্যায়রত্নকে সেই কম্বলের উপর বসাইয়া স্বয়ং মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভরে তাহা কণ্ঠে, ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করিলেন।

তালুকদারের কি ব্রাহ্মণভক্তি, কি নিষ্ঠা, কি অমায়িক ব্যবহার! ন্যায়রত্ন মুগ্ধ হইলেন; সরল ব্রাহ্মণ পরম পুলকিতচিত্তে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার অকপট ভক্তি দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে যেন আপনার মতি থাকে;—ইহা অপেক্ষা বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।'

তালুকদার বলিলেন, 'আমিও আর কোনও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি না। ঐ আশীর্ব্বাদই করুন, যেন দেব-দ্বিজে আমার অচলা ভক্তি থাকে, ধর্ম্মে যেন মতি থাকে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আজ কালের দিনে ধর্ম্ম আর অর্থ একাধারে প্রায়ই দেখা যায় না। যাহার অর্থ আছে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ,—কালের এমনই বিচিত্র প্রভাব যে, ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার মতি গতি নাই; সুখ ও স্বার্থের সন্ধানেই সে সদা ব্যস্ত!'

তালুকদার বলিলেন, 'আপনি অসঙ্গত কথা বলেন নাই; কিন্তু আমি জানি, ধর্ম্মই মানুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। নিজের কথা এ পাপ মুখে আর কি বলিব? আমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী গয়া গিয়াছি, ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়াছি, বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত শুনিয়াছি। অধিক কি, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান এবং ভগবদ্গীতা পাঠ না করিয়া আমি কখনও জল-গ্রহণ করি না।'

ন্যায়রত্ন সোৎসাহে বলিলেন, 'সাধু সাধু! আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। দেব-দ্বিজে ভক্তি-প্রদর্শন অতি প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার পক্ষে কেবল তাহাই ত যথেষ্ট নহে। আপনি এখন আমাদের ভূস্বামী, রাজা; প্রজাপালনই যে আপনার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম—এ কথা আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। আপনাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে হইবে। তাহাদের যে সকল অভাব অভিযোগ আছে, তাহা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া আপনাকে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনি ইহ-জীবনে আত্মপ্রসাদ ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ-সুখের অধিকারী হইবেন।'

তালুকদার হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'প্রজাপালন যে আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু—'

ন্যায়রত্ন তালুকদারের আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু—কি বলুন? আমার নিকট আপনার কোনও কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।'

তালুকদার মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'আপনাকে একটি কথা বলিতে আমার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার একটি কথা রাখেন ত—'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রজার হিতার্থ আপনি আমাকে যাহা বলিবেন—আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

তালুকদার বলিলেন, 'ঠাকুর, আপনাকে আমি আর অধিক কি বলিব, এই তালুকখানি ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আমার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। নবাব বাহাদুরকে নজর-সেলামী দিতে হইল, সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহার পর ঘুষ,—আমলাদের ঘুষ, চাকরবাকরদের ঘুষ। আপনি ত নবাব সরকারের কাণ্ডকারখানা কিছু জানেন না, সেখানকার মশাটি, মাছিটি পর্য্যন্ত ঘুষ খাইবার জন্য শুঁড় বাহির করিয়া বসিয়া থাকে!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এত ঘুষ দিলেন কেন?'

তালুকদার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'ঘুষ দিলাম কেন? ঘুষ না দিলে কি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতাম? প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের কবল হইতে এই পরগণা গ্রহণ করিতে পারিতাম? ঘুষের বলেই ত আমি অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু এই বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া আমি এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। এখন তালুকের প্রজারা যদি 'ভাঙ্গনি' করিয়া এই টাকাটা আমাকে উঠাইয়া দেয়—দশের লাঠী একের বোঝা—তাহা তাহাদের গায়েও লাগিবে না, অথচ আমি বজায় থাকিতে পারিব।'

ন্যায়রত্ন সবিস্ময়ে বলিলেন, 'ঘুষের টাকার ভাঙ্গনি!'

তালুকদার চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, 'নবাব বাহাদুরকে যে টাকা নজর দিয়াছি, তাহা ত আর ঘুষ নয়। আমিও ত প্রজাদের নিকট নজর-পাতরার দাবী করিতে পারি।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনি ভূস্বামী, রাজা; মহালে আসিয়াছেন; আপনার সম্মানরক্ষার্থ প্রজারা যাহার যেমন সাধ্য, অবশ্যই আপনাকে নজর দিবে। কেনই বা দিবে না? কিন্তু নজরের ত 'ভাঙ্গনি' হয় না।'

তালুকদার বলিলেন, 'সে যাহা হয় হইবে, কিন্তু প্রজারা যে নিরিখে খাজানা দিয়া আসিতেছে, তাহা কিছু বাড়াইয়া না দিলে আমার মালগুজারির সংস্থান হইবে না।'

ন্যায়রত্ন কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'রাজার জমী প্রজারা আবাদ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিয়া লয় বলিয়া পূর্ব্বে রাজারা উৎপন্ন ফসলের অংশ পাইতেন। তাহাকে রাজভাগ বলিত, এবং প্রজারাও তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রদান করিত।'

তালুকদার হাসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! সে কালের সঙ্গে এ কালের তুলনা! সে কাল কি আর আছে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এখন সেই রাজভাগ খাজানা নাম ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে আদায় হইতেছে। যখন যে তালুকদার আসেন—তিনি চান কেবল খাজানা—আর খাজানা। কিন্তু প্রজারা বৈশাখের রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমী চাষ করে; শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা মাথায় করিয়া ফসল উৎপন্ন করে। রাজার খাজানা দিয়া তাহাদের থাকে কি? এ সকল কথা ত কোনও তালুকদারকেই চিন্তা করিতে দেখি না। বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে না পারিলে, এক জনের পিতৃপিতামহের আমলের বহু দিনের ভোগদখলী জমী অবাধে কাড়িয়া লইয়া অপরকে বিলি করিয়া দিতেও অনেক তালুকদার ইতস্ততঃ করেন না। তবে আপনার যেরূপ ধর্ম্মভাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনি নিশ্চয়ই সে প্রকার নিষ্ঠুরের কার্য্য করিবেন না,—ইহাই আমার ধারণা হইয়াছে।'

তালুকদার বলিলেন, 'সে রকম কাজ করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই; তবে কথা কি জানেন? প্রজার নিকট যে টাকা খাজানা আদায় হয়, তাহাতে নবাব সরকারের মালগুজারির টাকার সংস্থান হইবার আশা নাই, কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া আমাকে নিরিখ-বৃদ্ধি করিতেই হইবে। আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, এই বিষয়ে আপনাকে আমার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে হইবে। প্রজারা আপনাকে যেরূপ খাতির সম্মান করে, সকলেরই আপনি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র—আপনি একটা মুখের কথা বলিয়া দিলে আমাকে এ জন্য বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না।'

* * * * * *

দাওয়ায় বসিয়া ন্যায়রত্নের সহিত তালুকদারের যখন এই সকল কথা হইতে-

ছিল, সেই সময় সুমতি ও সত্যবালা ঘরের মধ্যে বসিয়া পরস্পর আলাপ-পরিচয় করিতেছিল।

সুমতি ও সত্যবালা সমবয়স্কা, উভয়েই পরমসুন্দরী; কিন্তু সত্যবালা বসন-ভূষণে সমলঙ্কৃতা, আর সুমতি নিরাভরণা, মলিন-বসন-পরিহিতা। সত্যবালা সধবা; সুমতি বিধবা। স্ফটিকগোলকসমাচ্ছাদিত উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের নিকট সুমতিকে যেন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায় নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মাণ দেখাইতেছিল।

সত্যবালা বাল্যকাল হইতেই দাসদাসীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, আদর-যত্নে লালিত পালিত হইয়াছে। সুমতির সাংসারিক অবস্থা সত্যবালার অতি শোচনীয় বোধ হইল। সত্যবালা দেখিল, ন্যায়রত্নের বাড়ীতে একখানির অধিক বাসের ঘর নাই! ঘরে খাট নাই, চৌকি নাই, একটি বাঁশের মাচার উপর একটি জীর্ণ মলিন বিছানা জড়ান রহিয়াছে। তৈজসপত্রের মধ্যে পিতল কাঁসার নিতান্ত সাধারণ কয়েকখানি থালা, বাসন, আর ঘটী, বাটি! শিকায় কয়েকটি মাটীর হাঁড়ি ঝুলিতেছে। সম্পত্তির মধ্যে—উঠানে কয়েকটি ছোট ছোট গোলায় ধান ও ডা'ল বন্দ রহিয়াছে!

সুমতির ললাটে সিন্দুরবিন্দু নাই দেখিয়া, এ কথা সে কথার পর সত্যবালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার এ দশা কত দিন হইয়াছে?'

সুমতি বলিল, 'নিতান্ত ছেলেবেলা, নয় বৎসর বয়সের সময়!'

সত্যবালা ভাবিল, সুমতির মত দুঃখিনী এ সংসারে বুঝি আর কেহই নাই।

এবার সুমতি সত্যবালাকে তাহার বরের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সত্যবালা বলিল, 'আমার বাবার ত আর কোনও ছেলে মেয়ে নেই; তাই বাবা একটি গরীবের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে, তাকে ঘর-জামাই ক'রে রাখবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু আমার স্বামী ঘর-জামাই হয়ে থাক্‌তে রাজী হন নি, তিনি চলে গিয়েছেন।'

সুমতি বলিল, 'চলে গিয়েছেন! কোথায় গেলেন?'

সত্যবালা বলিল, 'এখন তিনি যে কোথায় আছেন, তা ঠিক বল্‌তে পারি নে। অনেক দিন তাঁর কোনও খবর পাই নি।'

সুমতি বলিল, 'তা তিনি ঘর-জামাই হ'য়ে থাকতে রাজী হ'লেন না কেন? তোমার বাপের এত অতুল বিষয়সম্পত্তি, তুমি ভিন্ন তাঁর আর ত কেউ নেই।'

সত্যবালা বলিল, 'আমার স্বামী ঘর-জামাই হ'য়ে থাক্‌তে কেমন লজ্জা

ও অপমান বোধ করলেন, কোনও মতেই তিনি তাতে রাজী হলেন না। সকলের প্রকৃতি ত আর এক রকম নয়, যে যেমন বোঝে।'

সুমতি বলিল, 'তুমি কখনও শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলে?'

সত্যবালা বলিল, 'না।'

সুমতি বলিল, 'কেন?'

সত্যবালা বলিল, 'বাবা যেতে দেন নি।'

সুমতি ক্ষুব্ধভাবে বলিল, 'তুমি সেখানে যেতে পাবে না, তোমার স্বামীও এখানে থাকতে রাজী ন'ন, তবে কি হবে?'

সত্যবালা বলিল, 'চিরদিনই কি আর এমনই যাবে? আমার স্বামী ব'লে গিয়েছেন, তাঁর অবস্থা ভাল হ'লেই আমাকে নিয়ে যাবেন।'

সুমতি বলিল, 'তখনও যদি তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে না দেন?'

সত্যবালা বলিল, 'তা কেন দেবেন না? যাঁর হাতে বাবা আমাকে সঁপে দিয়েছেন, তাঁর অবস্থা যেমনই হোক, আমি তাঁরই কাছে থাকব। বাবার ধন দৌলত আছে; তা বড়, না আমার স্বামী বড়? যেমন-তেমন একখান ঘর করে' আমরা দু'জনে এক সঙ্গে থাক্‌ব; তাঁর যা কিছু রোজগার হবে—তাতেই সংসার চালাব। বাবার সম্পত্তির আশায় আমি কি স্বামী ত্যাগ ক'রব?'

সত্যবালার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় সুমতির হৃদয় পূর্ণ হইল। সে মনে মনে তাহার প্রশংসা করিল।

অতঃপর সত্যবালা সুমতিকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; তাহার অনুরোধ শুনিয়া সুমতি তাহাকে জানাইল, পিতার অনুমতি ব্যতীত সে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সুমতির কথা শুনিয়া সত্যবালা তাহার পিতার নিকট সুমতিকে তাহাদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল।—তখন তালুকদার ন্যায়রত্নকে ধরিয়া বসিলেন, সুমতিকে তাঁহার বাসায় পাঠাইতেই হইবে। কিন্তু ন্যায়রত্ন এ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তালুকদার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, 'আমি প্যালকী-বেহারা পাঠাইয়া দিব; আমার বাসায় আপনাকে মেয়ে পাঠাইতে হইবে।'

ন্যায়রত্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'মেয়ের বাবা কখনও পালকী চড়ে নাই, তবে সে পালকী চড়িবে কোন্ অধিকারে '

তালুকদার হঠাৎ এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার বলিলেন, 'মানুষ হইয়া মানুষের কাঁধে চড়িয়া বেড়ান আমার বড় ভাল বোধ হয় না। সুমতিকে যদি যাইতেই হয়—সে হাঁটিয়া যাইবে; কিন্তু আমার মনে হয়, তাহার না যাওয়াই ভাল।'

তালুকদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কেন আপনি এ কথা বল্‌ছেন?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনি রাজা মানুষ, আর সুমতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। নানা বিষয়ে তাহার ত্রুটী হওয়াই সম্ভব।'

তালুকদার বলিলেন, 'আমার সত্যবালাও যা, সুমতিও তাই; তার কি ত্রুটী হ'তে পারে?—আর ত্রুটী হলেই বা কি?'

তালুকদারের অনুরোধ কোন রূপেই এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে ন্যায়রত্ন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি এক জন দাসী পাঠাইলে সুমতি তাহার সহিত তাঁহার বাসায় যাইবে।

বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের নিকট বিদায়-গ্রহণ-কালে আর এক দফা তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া পরমভক্তিভরে বলিলেন, 'আমি আপনার দাস; আমার দ্বারা যদি কখনও আপনার কোনও অভাবমোচন হয়, —তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব, আমার জীবন ধন্য হইবে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনার অনুগ্রহলাভ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবানের কৃপায় কোনও বিষয়েই আমার কখনও কোনও অভাব হয় নাই। যিনি আমাদের এই ছুইটি জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকল অভাব মোচন করিতেছেন।'

তালুকদার ন্যায়রত্নের নিকট তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধি সম্বন্ধে কোনও আশা-ভরসা না পাইয়া ক্ষুণ্নমনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ন্যায়রত্নের সহিত তালুকদারের কি আলাপ হইতেছিল, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া কৌতূহলী গ্রামবাসীরা নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল; এবং ন্যায়রত্নের শুভাকাঙ্ক্ষী পূর্ব্বোক্ত মোসাহেব-চতুষ্টয় বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া, তালুকদারের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ-আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি।

৪

১৬ই অক্টোবর।—এরোপ্লেনের সাহায্যে ঠিক করা হইতেছে, কি ভাবে কামান ছুড়িলে লক্ষ্য অব্যর্থ হয়; * ইহার মধ্যে আমরা তিন তিন বার আক্রান্ত হইলাম। ক্রমে চারি দিক হইতে আঁধার নামিল; তখন আসল আক্রমণ আরম্ভ হইল। সারা রাত যুদ্ধ, আর যুদ্ধ; ভোর পাঁচটার সময় আমাদের কামান ছোড়া

---

* পূর্ব্বে ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড় হইতে দূরবীণ কষিয়া শত্রুর অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইত; গোলা ছুড়িতে ছুড়িতে দূরবীণ দিয়া দেখিয়া একটু আগু পিছু, বা ডান দিক, বাঁ দিকে গোলা ফেলা হইত। প্রায় দৃশ্যমান লক্ষ্য আক্রান্ত হইত। সম্মুখ-যুদ্ধ উঠিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে লুকাইবার ব্যবস্থাটা যেমন নৈপুণ্যের মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল, গোলন্দাজকেও তেমনই দৃশ্যমান লক্ষ্য হইতে অদৃশ্য লক্ষ্যের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিবার উপায় বাহির করিতে হইল। প্রথমে লক্ষ্যের অবস্থান কোনরূপে ম্যাপে ঠিক করিয়া, ত্রিকোণমিতির সাহায্যে তার দূরত্ব ও কোণ (angle) নির্দ্দেশ করিয়া তার উপর কামান ছোড়া হইত; শত্রুর নিকটবর্ত্তী কোনও এক গুপ্তস্থান হইতে দূরবীণ কষিয়া গোলা কিরূপে পড়িতেছে, তাহা বলিলে (signal), গোলন্দাজ কামান উঁচু নীচু করিয়া এ দিকে ও দিকে মুখ ঘুরাইয়া ঠিক ঠিক ভাবে গোলা ফেলিতে চেষ্টা করিত। ইহার পর জর্ম্মণের দেখাদেখি এরোপ্লেন হইতে দূরবীণ কষা সুরু হইল; তখন ১৯১৫। কোনরূপে মাটীর উপর বড় বড় শাদা পাল পাতিয়া তাহাতে কাল কাল অক্ষর দিয়া 'এভিয়েটার'কে সংবাদ পাঠান হইত; ব্যোমনাবিক আলো বা নিশানের সাহায্যে গোলা কোথায় পড়িতেছে, তাহার সঙ্কেত করিত। তার পর উঠিল উড়োকলে (wireless) 'ওয়্যারলেস্'। ইহাও শত্রুর নিকট ধার করা। সেই সঙ্গে উড়োকলে আপনা-আপনি 'এঙেল' দেওয়া 'মেশিনগান' বসান হওয়ায় অন্তরীক্ষ হইতে একমাত্র observation ও regaling সম্পন্ন হইতে লাগিল। 'রিগেলিং' করিবার আগে উড়োকলের আড্ডায় খবর পাঠান হইত,—'অমুক জায়গায় এত ঘণ্টার সময় অমুক নম্বর ব্যাটারী গোলা ছুড়িবে।' যথাসময়ে জাহাজটী আসিয়া বেতার সংবাদ দিল—'আসিয়াছি'। কামান ধরিয়া কাল্পনিক কথামাত্রার অনুযায়ী দিকে কামান নির্দ্দেশ করা হইল। কলটী লক্ষ্যের উপর দূরবীণ কষিয়া আজ্ঞা করিল—'ছোড়'। এক মিঃ পরে কোথায় গোলার আঘাতে ধূলি উড়িল; এবং তাহা দেখিয়া সংবাদ পাঠাইল, যথা—ডাইনে ২০ মিলিয়াম; আগে ৩০ মিলিয়াম। যথাযথ যন্ত্রগুলি নির্ভুল করিয়া আবার কামান নির্দ্দেশ করা হইল। বেতার যন্ত্রে 'আমরা প্রস্তুত হইয়াছি' সংবাদ পাইয়াই কর্ণধার দূরবীণ কষিয়া আজ্ঞা করিল—'ছোড়।' আবার সংবাদ আসিল—'পিছনে ৬০ মিলিয়াম; ডাইনে ২০।' এইরূপে ছুড়িতে ছুড়িতে লক্ষ্যটী যখন দুটী গোলার মধ্যে পড়িয়া গেল, তখন সেই দুই দূরত্বের মাঝামাঝি একটা দূরত্ব লইয়া, এবং ঠিক ওই রকম

হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। রাত্রে আমাদের আদৌ ঘুমের ইচ্ছা হয় নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য,—ক্লান্তি হইয়াছে যথেষ্ট,—তিন ঘণ্টা অন্তর বিশ্রাম করা সত্ত্বেও। চারি দিকে তুমুল উত্তেজনা—কামানের অগণিত গর্জ্জন—যুদ্ধের নব নব ঘটনাপর্য্যায়ে মন নিবিষ্ট,—ঘুম আসিবে কেমন করিয়া! সম্মুখে ৫০০ হইতে ১০০০ গজ দূর প্রসারিত ভূভাগে কি হইতেছে না হইতেছে, 'টেলি-ফোনে'র মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টাধ্বনি তার সংবাদ দিতেছে। 'টেলিফোনে'র বিরামবিহীন বার্ত্তা শুনিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ। রজনী প্রভাত হইল; বিকট যুদ্ধ স্তব্ধ। পদাতি সৈন্য বন্দুক ফেলিয়া কোদাল, কুড়ুল লইয়াছে—আত্মরক্ষার তাগাড় ইত্যাদির যে যে অংশ ভগ্ন, তাহার সংস্কারে ব্যস্ত; গোলন্দাজ সৈন্যরা ধুইয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া কামানে তেল দিতেছে; রসদাগার 'শেল' 'ফিউজ' ইত্যাদি দিয়া পূর্ণ হইতেছে; চাতালের যে অংশ জীর্ণপ্রায়, তাহা নূতন শ্রী প্রাপ্ত হইতেছে; কামানের যে সব যন্ত্রপাতি উড়িয়া গিয়াছে, তাহা পুনঃস্থাপন করা হইতেছে; শত্রুর গোলা লাগিয়া যে স্থানে গর্ত্ত হইয়াছে, সে স্থান ভরিয়া দেওয়া হইতেছে; লাঙ্গল দিলে যেমন ঘাস উঠিয়া যায়, যে স্থানে Shrapnelএর টুকরায় তেমন ভাবে ঘাস উঠিয়া গিয়াছে, সে স্থান গাছের ডাল পালা কিংবা জাল দিয়া ঢাকিয়া, অথবা ঘাস কাটিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। বেলা দুপুর হয় নাই; আমাদের সমস্ত প্রস্তুত; নিশাযোগে আর একবার আক্রমণ করিতে হইবে। প্রাতরাশের পর

মাঝামাঝি একটা দিক ঠিক করিয়া ভাল করিয়া গোলা ছুড়িতে আজ্ঞা করা হইল। যদি দেখা গেল যে, অধিকাংশ গোলা ঘন ভাবে লক্ষ্যের উপর পড়িতেছে, তখন মোটামুটি লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, বুঝা গেল।

পূর্ব্বের দুই উপায় ব্যতীত আর দুই তিন উপায়ে 'রিপেলিং' করা যাইতে পারে। কখনও কখনও পাকা সেনানীরা কানে শুনিয়া কামানের দিক নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন। অনেক সময় উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গুলি দিয়া কোণ মাপিয়া কামানের দিক ঠিক করা হয়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা পরিমাপ আছে; এই দর্শনের উপর এই সূক্ষ্ম মাপিবার উপায় প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুর উচ্চতায় মুঠা করিয়া হাতটা লম্বা করিয়া ধরিলে এক একটা অঙ্গুলি এক হাজার মিঃ দূরে কতকটা করিয়া জমী আবৃত করিয়া ফেলে। এরূপে মাপিয়া দেখা যায় যে, বৃদ্ধাঙ্গুলি—৪০, তর্জ্জনী ও মধ্যমা—৩০, অনামিকা—২৫, কনিষ্ঠা—২০ মিঃ স্থান (এক হাজার মিঃ দূরে) আবৃত করিয়া থাকে। বলিতে কি, এই অঙ্গুলি-মানের সাহায্যে যত তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায়, আর এটা কার্য্যতঃ এত সূক্ষ্ম হইয়া উঠে যে, উন্মুক্ত রণাঙ্গনে এই অঙ্গুলি-মানে অদ্ভুত কার্য্য দেখান যায়।

গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া আহার করিতে গেলাম। আমাদের সাম্‌নে পাঁচ গজ দূরে একটী গোলা পড়িল; ইহা ফাটিলে আমাদিগকে ক্ষত-বিক্ষত, এমন কি, টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিত; সুখের বিষয়, তেমন কিছু হইল না। মাটী হইতে বাহির করিয়া Shellটী সুড়ঙ্গের ভিতরে লইয়া গিয়া 'ডিনেমাইট' নল দিয়া দুই ভাগে ফাটাইয়া ফেলিলাম,—সাত আট সের 'পিক্‌রিক এসিড' পাওয়া গেল। এই 'এসিড' 'ডিনেমাইটে'র সহিত মিশাইয়া দিলে, সেই মিশ্রিত দ্রব্য কঠিন প্রস্তরস্তূপ ফাটাইয়া ফেলিতে অব্যর্থ।

১৭ই অক্টোবর।—গত কল্য রণজয়ে কিছু দূর আগাইয়াছি; তখন প্রভাত। শত্রুর পদাতি সৈন্যের নূতন লাইনে লক্ষ্য ঠিক করিতেছি। একটী 'এরোপ্লেন' যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিতে সাহায্য করিতেছে; সহসা জর্ম্মণ উড়োকল আমাদের কলটী ঘিরিয়া ফেলিল। জর্ম্মণ কলের একটী ছিল 'বাইপ্লেন' Friedrichshafenএর ঢপে নির্ম্মিত। আমাদের কামানের উপর উড়িয়া 'টর্‌পেডো' ছুঁড়িয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল। জর্ম্মণরা বোধ হয় ব্যাটারীর সন্ধান পায় নাই। কিংবা, গত সপ্তাহের কোনও সংবাদ জানিত না।

ইতিমধ্যে ফরাসী ও আমেরিকান কল চারিদিক হইতে আসিয়া উপস্থিত— আমাদের 'এরোপ্লেনে'র কর্ণধারকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং জর্ম্মণ নাবিকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। শীঘ্রই সমর ব্যপদেশে বিমানবাহিনী সুকৌশলে দুর্দ্দান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—'মেশিনগানে'র যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে সাম্‌নে ও পিছনে দূরে দূরে যেন দিক্‌চক্রবাল স্পর্শ করিয়া বিন্দুপরিমিত কোনও একটা কিছু মেঘের মত বোধ হয়। কয়েক মিঃ যাইতে না যাইতে দেখি, দূরের মেঘখণ্ড শত্রু কিংবা মিত্র কোনও না কোনও পক্ষের বিমানপোতে পরিণত—পরস্পর পরস্পরের অনুধাবন করিতেছে। নাবিকগণ বড় নিপুণ, বড় চতুর, যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায়। উড়োকলের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল— মনে হইল, হাট বাজারের দিন আকাশ জুড়িয়া চিল উড়িতেছে। আকাশে শত্রু মিত্র উভয়েই সামর্থ্যমত এরোপ্লেন লইয়া যাইতে ত্রুটী করিল না। যেমন স্থলে এবং জলে, তেমনই আকাশে অধিকসংখ্যক উড়োকলের একত্র সমাবেশ করিয়া যুগপৎ যুদ্ধ করা বিশেষ ফলপ্রদ। জর্ম্মণ কর্ণেল Thomson ভবিষ্য-দৃষ্টিবলে তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। এমন যুদ্ধ বড় সাংঘাতিক। ১৯১৪-১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে এই কৌশলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়। কিন্তু আজ আমরা যেখানে

যুদ্ধ করিতেছিলাম, সেখানে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সমগ্র বিমানবাহিনী যে কোনও স্থানে আকাশে নিয়োজিত হইতে পারিত। 'মেশিন' গোলা ইত্যাদি দিয়া আক্রমণ করিয়া আকাশের যুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তোলা হয় ;—সাধ্য কি, শত্রুর পদাতি সৈন্য ঝড়ের মত তুমুলবেগে আগাইয়া পরিখা অধিকার করে। এ যুদ্ধের দৃশ্য বড় বিচিত্র ; কয়েক মিঃ মাত্র ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তারবিহীন যন্ত্রে সংবাদ আসিল, আমাদের যে কলটী চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সেটী অনুধাবনকারী উড়োকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে ; কোন্ স্থানে থাকিয়া লক্ষ্য করিবে, এবং লক্ষ্যই বা কি, তাহা ঠিক করিয়াছে। আশে পাশে ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই—রণে যোগ দিবার প্রলোভন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে। কাজেই আমরা গোলাগুলি বর্ষণ পুনরায় আরম্ভ করিলাম—ডজনখানেক গোলা ছোড়া, আর দেখি মাথার উপর একখানি পর্য্যবেক্ষণকারী জর্ম্মণ উড়োকল—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে ; অনুধাবনকারী আর দুটী কল তাহাকে রক্ষা করিতে। এক মিনিটও হয় নাই, আমাদের ব্যাটারীর উপর ভীষণ অগ্নিবর্ষণ সুরু হইল। তাহারা থামিলেই আমরা পাল্টা গোলাগুলি ছুড়িতে লাগিলাম। শত্রু তখন ১৫০ মিঃ মিঃ, ১০৫ মিঃ মিঃ ও ৭৭ মিঃ মিঃ কামানের গোলায় আমাদের রীতিমত ছাইয়া ফেলিল। আমরা কয়েক জন সুড়ঙ্গে আশ্রয় লইলাম।—সুড়ঙ্গ কামানের ডান দিকে ; ভাল করিয়া খনন করা হয় নাই। কাজেই একটী একটী করিয়া আমাদের প্রত্যেককে পলাইতে হইল। এক একটী গোলা ফাটার শব্দ শুনি, আর দুটী ধাপের অন্তরালে মাথা লুকাই। দুই সেকেণ্ডের মধ্যে মাথার উপর দিয়া ছটকা টুকরা বাওয়ার শব্দ শোনা গেল। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যে উপরে ছিল, সে বাহির হইয়া দৌড়িয়া আসল সুড়ঙ্গে গোপনে আশ্রয় লইল। বাহির হইয়াও অনেককে ফিরিয়া আসিতে হইল ; কারণ, চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত গোলাগুলির হিস্ শব্দ, আর হিস্ শব্দ। তাড়াতাড়ি আশ্রয় লইতে গিয়া বিষম ফাঁদে পড়িয়াছিলাম—নিরাপদে সে স্থান হইতে পলাইতে আমাদের ছয় জনের ৫ মিনিট লাগিল। প্রথমে বাহির হইল নিগ্রোরা ; কারণ, তারা ছিল সব চেয়ে উপরে ; তার পর ফরাসী, তার পর দুই জন বাঙ্গালী। কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ। আমাদের কামান ছুড়িবার আদেশ হইল—ব্যোমযানের নাবিকেরা আকাশ হইতে মুহুর্মুহুঃ সংবাদ পাঠানর তাগাদায়। আধ ঘণ্টা কামান ছোড়ার পর শত্রুর অনেকগুলি ব্যাটারীর দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িল—

আমাদের তখন সুড়ঙ্গে আশ্রয় লইবার আদেশ হইল। পুনরায় আক্রমণ করিবার অনুমতি পাইলে, অন্যান্য ব্যাটারীর সহিত অদম্য উৎসাহে যুগপৎ কামান ছুড়িতে লাগিলাম। দ্বিপ্রহর—বেলা দুইটা; যুদ্ধ থামিল। আমরা আহার করিতে গেলাম।

আজিকার আক্রমণে অনেক বনস্পতি নিপতিত,—কাষ্ঠাহরণ করিতে করাত লইয়া বাহির হইলাম। শীতকালের জন্য মাটীর নীচে ঘরে এ সব সংগৃহীত হয়।

১৯শে অক্টোবর।—'ভার্দ্দ'ন' ও 'আরগন'-এর মধ্যবর্ত্তী সারা ভূভাগ রহিয়া রহিয়া আক্রান্ত হইতেছে। আমাদিগকে কামানের পাশে দাঁড়াইয়া—সকাল এগারটা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি ঘণ্টায় কামান ছুড়িতে হইয়াছে। বরফ পড়িতেছে, যেন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মত—গিরিগাত্র ধবল-শ্রী প্রাপ্ত; বৃক্ষ-রাজি পত্রচ্যুত। দূরে, বহু দূরে আত্মরক্ষার নিমিত্ত যাহা কিছু মাটীর উপর উঁচু হইয়া আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে—তুহিন-শুভ্র ক্ষেত্রের উপর কে যেন কাল কাল দাগ কাটিয়াছে। ব্যোমযানের দ্রুত গমনাগমন, এবং কামানের লক্ষ্য ঠিক আছে কি না তাহা ঘন ঘন দেখায়, আকাশ মুখরিত। অবিরাম শ্রম ও পর্য্যাপ্ত ভোজনে দেহ পুষ্ট ও মন সুস্থ থাকে।

২২শে অক্টোবর।—ইঞ্জিনীয়ারদের লোকেরা সেনাপতিদের জন্য একটী বিলাস-সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতেছিল; সে স্থান হইতে সেনানীরা বেশ যুদ্ধ চালাইতে পারে। কারিগরেরা সকলে গোলার ছট্‌কা টুকরায় আহত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। সারা রাত ধরিয়া যুদ্ধ—আক্রমণের পর আক্রমণ ভীষণ হইয়া উঠিল।

২৭শে অক্টোবর।—রাত্রি ১০-৩০; সদলে আক্রমণ করিতে আমরা প্রস্তুত। সে দিনের আক্রমণ স্থগিত করা হইল; কারণ, দক্ষিণ দিক হইতে বৃষ্টি আসার সূচনা দেখা গেল। তারবিহীন যন্ত্র সংবাদ দিল, Nancy জলধারাপ্লুত। কামানের কড়্ কড়্ গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে বৃষ্টির দড়্ বড়্ বর্ষণ শোনা গেল।

পরে ভোর তিনটায় আক্রমণ আরম্ভ হইয়া সাতটা অবধি চলিল। আবার ১০-২০ মিনিটের সময় প্রাতে কামানের লক্ষ্য ঠিক করিতে আরম্ভ করা হইল; লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইল; ১২-২৫ মিনিটের সময়ে শব্দ শুনিয়া লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইল। তখন ১-৩০ মিনিট, জর্ম্মণেরা কামানের লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল। ২য় এবং ৩য় ধরণের মুখস আনিবার জন্য 'ডাগ্‌আউটে'র ভিতর যাইতে দৌড়ি-

তেছি, আর মাথার উপর Fusant-shell ফাটিতেছে। কেহ কিন্তু আহত হইল না। গোলাগুলি যেন আমাদিগকে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া আস-পাশ দিয়া চলিয়া গেল। জর্ম্মণের গোলাগুলি ছোড়া বেশ আরম্ভ হইল—গোলা কোথায় পড়িয়া কিরূপ ভাবে ফাটিল, আমি তাহা আমার রোজনামাচাতে টুকিয়া রাখিলাম।

প্রথম পর্য্যায়ে ১৩৫ বার গোলা পড়িল; তন্মধ্যে ৩৫টী 'রেগলিং' করিতে ব্যবহৃত হয়।

বেলা ৩-৫৬ মিনিটের সময়ে ১৬৪ বার; তন্মধ্যে ২৪টী 'রেগলিং' করিবার জন্য।

তৃতীয় পর্য্যায় বেলা ৬-১৫ মিনিটের সময়ে ১৫০ বার; তন্মধ্যে ১২টী 'রেগলিং' করিবার জন্য।

শ্রীহারাধন বক্সী।

মক্কা-ভ্রমণ।

২

২২শে শওয়াল (১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) শুক্রবার দিল্লীর সুবিখ্যাত জামে-মসজিদে জুমার নমাজ (সাপ্তাহিক উপাসনা) পড়িলাম। আমাদের বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জেলাই পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এতগুলি মুসলমানের একত্র সমাবেশ আর কোনও দিন কোথাও দেখি নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ মুসলমান-প্রধান। পরন্তু, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু জামে-মসজিদে, জুমার নমাজে, অত্যধিকপরিমাণে লোকসমাগম দেখিয়া, প্রথমে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, এবং কারণানুসন্ধানের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আসরের নমাজের সময়, আমার অনুসন্ধানের পথ আপনা হইতেই পরিষ্কৃত হইয়া গেল। দেখা গেল যে, অতি সামান্যসংখ্যক লোক আসরের উপাসনার জন্য জামে-মসজিদে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু কাহাকেও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম না। মগ্‌রিবের নমাজের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সঙ্গত বোধ করিলাম। আসরের নমাজের সময় যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, মগ্‌রিবের নমাজের সময়ও ঠিক সেই অবস্থাই পরিদৃষ্ট হইল।

মগ্‌রিবের নমাজের পর, মসজিদে বসিয়া, ইমাম সাহেবের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের আলোচনা করিলাম। জুমার নমাজে অধিকপরিমাণে লোকসমাগম এবং আসর ও মগ্‌রিবের নমাজে লোক-সংখ্যা হ্রাসের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, এখানে অপর কোনও মসজিদে জুমার নমাজ হয় না। কেবল জামে-মসজিদেই জুমার নমাজ হইয়া থাকে। অথ্‌-তিয়া নমাজ, লোকে সুবিধা অনুসারে, নিকটবর্ত্তী মসজিদে পড়িয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে এখন আর এরূপ হয় না। পূর্ব্বে—শাহী আমলে, বাঙ্গালা দেশের মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রাজমহল ও পাণ্ডুয়ায়, এই আদর্শে জুমার নমাজ পড়া হইত। কিন্তু সে দিন এখন আর নাই। এখন বাঙ্গালা দেশের মুসল-মানেরা পল্লীতে পল্লীতে মসজিদ স্থাপন করিতেছেন। অন্যান্য দলাদলির সহিত, মুসলমানদিগের মধ্যে এখন নমাজ পড়িবার দলাদলিও যথেষ্টপরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে এই প্রকার দলাদলির সংখ্যা কম। যে কোনও কারণেই হউক, একটু মনান্তরের সূত্রপাত হইলেই, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানেরা নূতন মসজিদের সৃষ্টি করিয়া, পৃথক ভাবে নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষানুসারে এই প্রকার ব্যবস্থা অতীব ঘৃণার্হ।

অনুসন্ধানে জানিলাম, পশ্চিমাঞ্চলে দুই ঈদের নমাজও প্রায় মসজিদে হয় না। ময়দানে—ঈদ্‌-গাহেতে, উভয় ঈদের নমাজ পড়া হয়। শাহী আমলে বাঙ্গালা দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ইদানীং যত দিন মওলানা খায়েরুদ্দিন সাহেব জীবিত ছিলেন, তত দিন কলিকাতার গড়ের মাঠে, তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ, উভয় ঈদের নমাজ পড়িতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। উক্ত মওলানা সাহেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র (মওলানা) আবুল কালাম আজাদ সাহেব দুই একবার ময়দানে নমাজ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় এই সু-প্রথাকে দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারেন নাই।

নমাজ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, বৃহৎ বৃহৎ নগরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসজিদে সাময়িক নমাজ হইবে, এবং দুই একটি বৃহৎ মসজিদে সাপ্তাহিক জুমার নমাজ হওয়াই উত্তম। ক্ষুদ্র পল্লীতে একাধিক মসজিদ থাকিবে না। সকলেই সেই মসজিদে সমবেত হইয়া জুমার সাপ্তাহিক উপাসনা শেষ করিবেন। ঈদায়েনের নমাজ, ময়দানে ঈদ্‌গাহে সমবেত হইয়া পাঠ করাই প্রশস্ত। কিন্তু এখন কু-শিক্ষকদিগের প্রাধান্য হেতু কেহ আর শাস্ত্রা-

দেশ মান্য করিয়া চলিতে চাহে না। যদি কেহ জনসাধারণের মধ্যে এই সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি-প্রচারের চেষ্টা করেন, তিনি জনসমাজে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। জানি না, করুণাময় খোদাতায়া'লা, কবে মানব-হৃদয়ে শাস্ত্রভক্তি দান এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে সৎ-পথ প্রদর্শন করিবেন।

২৪শে শওয়াল (১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪) রবিবার বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলাম। স্নেহভাজন গোলাম হোসেন কাসেম আরেফ সাহেবের সু-ব্যবস্থায়, কোনও হোটেলে অথবা মোসাফিরখানায়, কিংবা সরাইতে বাসা লইতে হয় নাই। আরেফ সাহেবের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যে সকল সদ্গুণ থাকিলে মানব 'ভদ্রলোক'-পদবাচ্য হইতে পারে, আমার আশ্রয়দাতার মধ্যে বাস্তবিকই সেই সকল সদ্গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাইলাম। তিনি যেমন বিনয়ী, তেমনই সদালাপী। ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তিকে ইদানীন্তন আর বড় একটা বিনয় সৌজন্যের দিকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

২৫শে শওয়াল (১৬ই অগ্রহায়ণ) সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় বোম্বাই শহরের মোসাফিরখানায় পঁহুছিলাম। মোসাফিরখানার কর্ত্তৃপক্ষ অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং থাকিবার জন্য একটি সুসজ্জিত কামরা ছাড়িয়া দিলেন। কয়েক দিনের পথ-শ্রান্তিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সে কারণ ১৬ই ও ১৭ই অগ্রহায়ণ—দুই দিন বিশ্রাম করিলাম।

১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার প্রাতে শহর-ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সারাদিন ভ্রমণান্তে সন্ধ্যাকালে বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, অনেক মুসলমান ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রথমেই তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন, এবং আমিও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমি তাঁহাকে আরবী ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন আলাপ পরিচয় হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে তিনি মক্কাধামে বাস করিতেছেন।

তিনি আমার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। পত্রের শিরোভাগের হস্তাক্ষর দেখিয়া, ইহা যে কাহার লেখা, তাহা বুঝিলাম। আমার পিতৃব্য-পুত্র স্নেহভাজন ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী আমাকে এই পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

'আপনি কলিকাতা ত্যাগ করার পর, আপনার কোনও পত্রাদি পাই নাই। আপনি

কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। সময় সময় এক একখানি পত্র লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। বাড়ীর সকলেই কুশলে আছেন, জানিবেন।

'পত্রবাহক হাজী সাহেব আমাদের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু। ইঁহার আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায়। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর হইতে ইনি পবিত্র মক্কাধামে বাস করিতেছেন, এবং মোয়াল্লিমের কার্য্য করিতেছেন। সম্ভবতঃ আপনি বোম্বাই শহরে অবস্থানকালে, পত্রবাহক হাজী আবদল হামিদ সাহেবের (১) মারফৎ আমার এই পত্র পাইবেন। আমার এই পত্র পাওয়ার পূর্ব্বে যদি অন্য কোনও মোয়াল্লিমের সহিত আপনার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়া থাকে, এবং আপনি তাঁহার কাফেলাভুক্ত (দলভুক্ত) না হইয়া থাকেন, কিংবা তাঁহার দলভুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনি পত্রবাহক হাজি আবদল হামিদের দলভুক্ত হইবেন। কারণ, তাহা হইলে আপনার কোনও কষ্ট হইবে না।

'আপনি যদি অপর কোনও মোয়াল্লিমের দলভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রয়োজন বোধ করিলে আপনি হাজি আবদল হামিদ সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইঁহার নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে আপনি কোনও প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।'

পর দেশে ও পর-বাসে হঠাৎ আত্মীয় স্বজনের পত্র পাইলে, কিংবা হঠাৎ কোনও আত্মীয়-স্বজনের দর্শন পাইলে প্রাণে যে কতই আহ্লাদ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র-পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমি হাজী সাহেবের সহিত পুনরায় আলাপ-পরিচয় আরম্ভ করিলাম। হাজী সাহেব বলিলেন যে, তিনি আজ সাত দিন বোম্বাই নগরে আসিয়াছেন। প্রত্যহ সকল সরাই বা মোসাফিরখানায় আমার অনুসন্ধান লইয়াছেন, কিন্তু সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অদ্য মোসাফিরখানার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ করিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আমি তাঁহাকে আমার স্নেহভাজন ভ্রাতার পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, 'এ সম্বন্ধে আমার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। আমার দ্বারা যদি আপনার কোনও উপকার হয়, এবং আমি যদি আপনার কোনও উপকার করিতে পারি, বিশেষ আনন্দিত হইব।'

অপর কোনও মোয়াল্লিমের সহিত যে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং আমি যে অপর কোনও মোয়াল্লিমের দলভুক্ত হইবার প্রতিশ্রুতি দিই নাই, সে কথা হাজী আবদল হামিদকে জানাইলাম। তাঁহাকে আরও জানাইলাম

---

(১) বিগত ১৩১৯ সালে হাজী আবদল হামিদ মোয়াল্লিম সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

—অনুবাদক।

যে, আমি তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে 'কায়া' চাতুল্লার' ও 'মদিনা-মনুওয়ারা'র জেয়ারৎ (১) করিবার বাসনা রাখি।

অতঃপর হাজী আব্দল হামিদ আগামী প্রত্যূষে পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় আটটার সময় হাজী আব্দল হামিদ সাহেব আসিলেন। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেট আমার নিকট আছে কি না?' আমি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সার্টিফিকেট সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। সেই সার্টিফিকেট তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি সার্টিফিকেট হস্তে লইয়া বলিলেন, 'চলুন, একবার 'পিল্‌গ্রীম'-অফিসারের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া আনি।'

তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত বাহির হইলাম, এবং 'পিল্‌গ্রীম' আফিসে উপস্থিত হইয়া 'পিল্‌গ্রীম'-অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার বয়স, জন্মস্থান, পিতার নাম, এই প্রথমবার আমি হজে যাইতেছি কি না, দেশে আমার কে কে আছেন, আমার সহিত যে পরিমাণ টাকা পয়সা মৌজুদ আছে, তাহাতে হজ্ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিবার খরচা কুলাইবে কি না, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমার উত্তর তাঁহার নোট-বহিতে লিখিয়া লইলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বাসায় ফিরিলাম, এবং স্নানাহার-সমাপনান্তে একটু বিশ্রাম করিলাম। বিকালে একবার হাজী আব্দল হামিদ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন।

২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা প্রায় ৭॥ টার সময় পুনরায় হাজী আব্দল হামিদ সাহেব আসিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া শহর-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বোম্বাই শহরে যতগুলি মোসাফিরখানা ও সরাই আছে, হাজী

---

(১) কায়া' চাতুল্লার—কায়া' য়া অর্থাৎ গৃহ, এবং আল্লা শব্দ হইতে তুল্লা শব্দের সৃষ্টি। অর্থাৎ, আল্লার গৃহ। ইহাকে কেহ কেহ বঙ্গ ভাষায় 'কাবা' বা 'মন্দির' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

মদিনা-মনুওয়ারা—যে স্থানে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের পবিত্র সমাধিমন্দির, সেই স্থানকে 'মদিনা-মনুওয়ারা' বলে। অর্থাৎ, মদিনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান।

জেয়ারৎ—আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করাকে জেয়ারৎ বলে।—অনুবাদক।

সাহেবের সহিত সকল স্থানেই যাওয়া হইল, এবং বাঙ্গালী, বেহারী, আসামী, উড়িয়া, পঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু মক্কাযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রত্যেক মোসাফিরখানাতেই কিছু না কিছু নাশ্‌তা হইল, সুতরাং ক্ষুধার পীড়ন সহ্য করিতে হইল না।

মোসাফিরখানা ও সরাইখানা সকল পরিদর্শন করিবার পর, হাজী আব্দল হামিদ সাহেবের সহিত পর পর কয়েক জন ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই সেই স্থানে যে সকল যাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম। অপরাহ্ণ চারিটার সময় বাসায় ফিরিলাম।

৩০শে শওয়াল (২১শে অগ্রহায়ণ) শনিবার, অপরাহ্ণকালে হাজী আব্দল হামিদ সাহেব আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন, এবং আমার 'পাস্‌-পোর্ট'খানি আমার হস্তে দিয়া কহিলেন যে, 'আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণ ১১ই ডিসেম্বর, বুধবার প্রাতঃকালে 'ফতে শাহ-আলম' জাহাজ ছাড়িবে; আমি ঐ জাহাজেই আপনাদিগকে লইয়া যাত্রা করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। আগামী কল্য প্রাতে আপনার টিকিট ক্রয় করা আবশ্যক।'

আমি তৎক্ষণাৎ হাজী সাহেবের হস্তে আমার পাসপোর্ট ও টিকিটের মূল্য দিলাম। হাজী সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটি আবশ্যক কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। অদ্য এই স্থানে আবশ্যকবোধে তাহা লিখিলাম। কথা কয়টি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইল।

প্রশ্ন।—হজ কাহার জন্য ফরজ?

উত্তর।—মাল্‌দার, অর্থাৎ ধনবানের জন্য হজ ফরজ। হজ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিবার সময় যদি তাহার নিকট এরূপ অর্থ সঞ্চিত থাকে যে, সেই অর্থ দ্বারা তাহার অনুপস্থিতকালে, তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ সহজে চলিতে পারিবে; তাহার যাতায়াতের খরচ বহন করিতে কোনও কষ্ট হইবে না, রাজার অথবা রাজপক্ষের কোনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর তাহার হজ-যাত্রার পক্ষে কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকে, এবং সে ব্যক্তি যদি কোনও কঠিন পীড়ায় পীড়িত না থাকে, তবেই সেই ব্যক্তির পক্ষে হজ-যাত্রা ফরজ, অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রশ্ন।—এই সময়ে তাহার কি কর্ত্তব্য ও কি প্রকারে সঙ্কল্প করিতে হইবে?

উত্তর।—যাতায়াতে যে পরিমাণ পাথেয় প্রয়োজন হইবে, তাহা, এবং তদতিরিক্ত কিছু পরিমাণ অর্থ সঙ্গে লইবে। ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে

নিজেকে সমর্পণ করিবে। অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলিকে চিরকালের তরে মুছিয়া ফেলিবে। সে ব্যক্তি আজীবন যে সকল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পাপ করিয়াছে, তাহার জন্য 'তওবা' করিবে, এবং খোদাতায়া'লার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। তাহার যদি কোনও পরিমাণ অর্থ দেনা থাকে, তবে যাত্রার পূর্ব্বে সেই দেনা পরিশোধ করিবে। যদি কাহারও কোনও পরিমাণ অর্থ তাহার নিকট আমানৎ থাকে, তাহা আমানৎদাতাকে প্রত্যর্পণ করিবে। যদি কেহ শত্রু থাকে, তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহার তুষ্টি সাধন করিবে। পিতামাতা থাকিলে, তাঁহারা যাহাতে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় দান করেন, তাহার চেষ্টা করিবে। পিতামাতার অবর্ত্তমানে, পিতামহ ও পিতামহী বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। হজ-যাত্রার সময় যে অর্থ সঙ্গে লইবে, তাহা হালাল বা বৈধ অর্থ হওয়া আবশ্যক। (১) বৈধ অর্থ না হইলে, তাহার গ্রাহ্য হইবে না। হজ-গমনেচ্ছুক ব্যক্তির যদি বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ অর্থ থাকে, এবং সেই অর্থে যদি তাহার পৃথক চিহ্ন না থাকে, তবে সে ঋণ গ্রহণ করিয়া হজ যাত্রা করিবে। (২) খোদাতায়া'লাকে সর্ব্বদাই তাহার পাপের শাস্তি বিধান কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। মৃত ব্যক্তিকে যেমন বাধ্য হইয়া সংসারের সকল মায়া মমতা ত্যাগ করিতে হয়, সেই প্রকার হজ-গমনেচ্ছু ব্যক্তি গৃহ ত্যাগ করিবার সময় অন্তর হইতে সমুদায় মায়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। মেস্‌ওয়াক্ (দাঁতনকাটি), আয়না (দর্পণ), কাঁকুই, সুরমা ও সলাই, কাঁচি, ছুরি, আসা' (লাঠী), বদ্‌না, ক্ষুর, ছুচ-সূতা সঙ্গে লওয়া বিশেষ আবশ্যক। গৃহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দুই রাকায়া'ত নফল নমাজ পাঠ করিতে হয়। প্রথম

---

(১) কোনও পিতৃমাতৃহীন নাবালকের অভিভাবক-স্বরূপে তাহার সম্পত্তির ধ্বংসসাধন করিয়া ধনবান হইলে সেই অর্থ অবৈধ। দীন দরিদ্রগণের কাহারও ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া ধনবান হইলে সেই অর্থ অবৈধ। সুদের অর্থ অবৈধ। চোরের নিকট হইতে অল্পমূল্যে চোরাই-মাল ক্রয় করিয়া ধনবান হইলে, সেই অর্থ অবৈধ। কোনও নিরাশ্রয় বিধবা স্ত্রীলোক অথবা অপর কোনও ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া কোনও পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রাখিলে, যদি আমানৎদার সেই গচ্ছিত টাকার কথা অস্বীকার করিয়া ধনবান হয়েন, তবে সেই অর্থ অবৈধ। অবৈধ অর্থের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।—অনুবাদক।

(২) ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারা যাইবে যাহার অর্থ সম্পূর্ণ বৈধ। অথবা যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে পারিবে যে, সে যে অর্থ ঋণ দান করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ বৈধ অর্থ, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা যাইতে পারে।—অনুবাদক।

রাকায়া'তে সুরাহ ফাতেহা ও সুরা কুল্ইয়া আইয়োহাল্কা পড়িবে, এবং দ্বিতীয় রাকায়া'য়াতে সুরা ফাতেহা, সুরা কোল্হু-আল্লা, আয়তুল্ কুরসী, পুনরায় সুরা কোল্হু-আল্লা, সুরাহ কোল্ আউজো-বেরাব্বিল ফালাক, সুরাহ কোল আউজো বেরাব্বিন নাছ্ পড়িয়া দ্বিতীয় রেকাত্ শেষ করিবে। (১) কিছু পরিমাণ অর্থ ভিক্ষুককে দান করিবে। অতঃপর আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে। ধন, জন, ঘর, বাড়ী, অর্থ, সামর্থ্য, সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে। জাদেসসবিল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সময় হইতে লড়াই-ঝগড়া ত্যাগ করিতে হইবে, এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শ্লীল কথা ব্যতীত অপর কোনও বাক্যালাপ করিবে না। জোর করিয়া কিংবা ভয় দেখাইয়া কাহারও নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য গ্রহণ করিবে না। কোনও প্রকার যান্ বাহন যথাযথ ভাড়া দিয়া গ্রহণ করিবে। হাস্যমুখে ও মিষ্ট ভাষায় সকলের সহিত বাক্যালাপ করিবে। সকল ব্যক্তিকেই নিজের অপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করিবে। হজের সঙ্গীদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে, যেরূপ ব্যবহার মহাপুরুষ হজরৎ মোহাম্মদ মুস্তাফা হজ যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত করিয়াছিলেন। (২)

২৫শে অগ্রহায়ণ ১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নকালে যথানিয়মে পুনরায় হজ ও উমরার নিয়ত (সঙ্কল্প) করিয়া, জাহাজে আরোহণ করিলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে নায়তগুলির আরবী বচন এবং বাঙ্গালা অর্থ লিখিত হইল।

উম্বার নীয়ত।

আল্লা হোম্মা ইন্নি ওরিদুল্ ওম্রাতা ফায়াস্সেরহোলি অ-তাকাব্বাল্হা মিন্নি অ-আ ন্ন আলায়হা অ-বারেকলি ফিহা নাওয়ায়তোল্উম্রাতা অ-আহ-রামতো বেহা লিল্লাহে তায়ালা।

বাঙ্গালা অর্থ।

হে আল্লা! আমি ইচ্ছা করিতেছি উম্রার, তুমি উহা আমার জন্য সহজসাধ্য

(১) পরে এই সকল আরবী শব্দ ও সুরার অর্থ প্রকাশিত হইবে।—অনুবাদক।

(২) হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তাফার জীবনচরিতে লিখিত আছে যে, এক সময় তিনি হজ-যাত্রাকালে কোনও বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দুইটী দাঁতনকাটী প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাঁহার কোনও এক জন প্রিয় শিষ্য তাহার একটী প্রার্থনা করিলে, যে দাঁতনকাটিটী সোজা ও উত্তম, সেইটী তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

কর। আমার হইতে তুমি উহা গ্রাহ্য কর, আর তুমি আমাকে সাহায্য কর, এবং উহার সুফল তুমি আমাকে দান কর। আমি নীয়ত করিতেছি, উমরার এবং আহ্‌রাম্ বান্ধিলাম খোদাতায়া'লার জন্য।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

বোরিং মেশিন্।

১

আমাদের সেই প্রিয় বন্ধু—শ্রীযুক্ত রামলাল চাটুর্য্যে, পূর্ব্বে বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ-রেলওয়ে লাইনের রক্সৌল নামক স্থানে ষ্টেশনমাষ্টার ছিলেন; এবং সেইখানে সদুপায়ে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

রক্সৌল নেপালের সীমাস্থিত একটি বিখ্যাত ষ্টেশন। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের এলাকা হইতে অনেক পণ্যদ্রব্য সেই স্থান হইয়া নেপালে চালান হয়। তন্মধ্যে 'বটের' নামক পক্ষীই সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য।

প্রায় সহস্রাধিক ঝাঁকা বটের প্রতি মাসে রক্সৌল ষ্টেশনে উপস্থিত হইত, এবং তন্মধ্যে ঝাঁকার বাঁশ ভাঙ্গিয়া অনেক বটের উড়িয়া যাইত। অনেক বটের ঝাঁকার মধ্যেই সন্তানপ্রসবকালে পক্ষিলীলা সংবরণ করিত, এবং তাহাদিগের সদ্যঃপ্রসূত ডিম্বগুলি নষ্ট হইয়া যাইত।

এই প্রকার বহুসংখ্যক বটেরের অন্তর্দ্ধানের সহিত বড়বাবু রামলালবাবুর ধনবৃদ্ধির কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এই বিবেচনায় ডি, টি, এস, সাহেব তাঁহার চাক্‌রী লইয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সেই টানাটানির ফলে বড়বাবুর চাকরীর বন্ধনের সহিত সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, এবং ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়া পড়িল।

অতএব, তিনি যাহা কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রচ্ছন্নভাবে 'জড়ো' করিয়া, বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের নিমডিহি ষ্টেশনের নিকট আড্ডা গাড়িলেন।

রামলাল বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। সন্তানাদি ছিল না। কেবল এক জন ভৃত্য সমভিব্যাহারেই তিনি ছোটনাগপুরের সেই পার্ব্বতীয় অঞ্চলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেখানে মধ্যে মধ্যে দস্যুর আক্রমণ-সম্ভাবনা দেখিয়া রামলালবাবু তাঁহার সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ (বোধ হয় সহস্রা-

ধিক স্বর্ণমুদ্রা) কোনও অজ্ঞানিত স্থানে প্রস্তরের নিম্নে সাবধানে পুতিয়া নিশ্চিন্তভাবে ভগবদারাধনা করিতেন।

তাঁহার জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—অর্থাৎ, ঈশ্বর-উপাসনার বিশেষ রকম সরল ও প্রীতিকর প্রণালীর আবিষ্কার। এই উদ্দেশ্যসাধনার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে সুখাসনে নয়ন ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য নিধু দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া প্রভুর ও তাহার দশা কি হইবে, তাহা একমনে চিন্তা করিত।

এ স্থলে বড়বাবুর সম্বন্ধে আরও গোটাকতক কথা বলা উচিত।

ক্রমাগতঃ ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া তাঁহার 'শুচিবাই' নামক বায়ুরোগ জন্মিয়াছিল, এবং তজ্জন্য নিধুকে সারাদিন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে হইত। পাছে নিধু পলাইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় বড়বাবু নিধুকে আফিং খাইতে দিতেন, এবং সেই আফিংএর নেশায় বিভোর হইয়া নিধিরাম দাস জন্মভূমি মাণিকগঞ্জের স্বপ্ন দেখিত, এবং নিশ্চয় কোনও দিন ভগবানের কৃপায় বড়বাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পথে মুক্তিলাভ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবে, এবং সেখানে মনোমত একটি স্ত্রী বাছিয়া লইবে, তাহা মনে করিয়া অতিশয় প্রফুল্ল-চিত্তে হস্ত ও পদ ঘন ঘন সঞ্চালন করিত। কিন্তু বড়বাবু তাঁহার সঞ্চিত ধন এত গোপনে রাখিয়াছিলেন যে, সে মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

২

রামলালবাবুর আসন্ন মুক্তি-সম্ভাবনার অন্যতম প্রমাণ যে, তিনি স্ত্রীলোককে অত্যন্ত ভয় করিতেন। অথচ তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের এক তিল বেশী নয়। তিনি নিধিরামকে বুঝাইয়া দিতেন, 'দেখ্ নিধু! যোগশাস্ত্রের মধ্যে অষ্টাবক্রীয় তন্ত্রশাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গীতা কেবল দর্শনশাস্ত্র। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র গৃহস্থের উপযোগী কোনও কালেই নয়। অষ্টাবক্রীয় তন্ত্রে ধ্যানের কোঠাই সর্ব্বপ্রধান। একমনে স্বার্থধ্যান করিতে করিতে পরমার্থের ধ্যান স্বতঃই সোজা হইয়া পড়ে। স্বার্থ কি? টাকা। যাহার টাকা নাই, সে ক্রমাগত কি করিয়া টাকা সঞ্চয় হয়, তাহাই ধ্যান করিবে। যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, সে তাহার সেই গুপ্ত ধনের বিষয় অহরহঃ চিন্তা করিবে।'

নিধিরাম বলিত, 'প্রভু! এ কথা লাখ্ কথার মধ্যে এক কথা, যদি টাকা থাকে।'

রামলালবাবুর আশ্রম একটা অদ্ভুত পদার্থ। সারি সারি দারুনির্ম্মিত

বারটি ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার মধ্যে একটি গোশালা। সকলগুলিরই খড়ের চাল, আলকাত্‌রা মাখান' একটি দ্বার, এবং পশ্চাদ্ভাগে একটি বাতায়ন। সকল ঘরের মধ্যেই একটি 'দড়ির খাট' ও একটি মৃন্ময় কলসী। পার্ব্বতীয় ভূমি সত্ত্বেও, সকল ঘরেরই তল প্রস্তরময়, এবং অসংখ্য ছিদ্রপূর্ণ। তাহার মধ্যে নানাবিধ কীট পতঙ্গের বাস। রামলালবাবুর যখন যে ঘরে ইচ্ছা, দিবা ও রাত্রি, অবস্থিতি করিতেন, এবং স্বহস্তে একটি 'কুকারে' পাক করিয়া খাইতেন। সকল ঘরেরই দেয়ালের মধ্যস্থ একটি ছিদ্র দিয়া একগাছি লম্বমান রজ্জু বাটীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক ঘরে চারিটী ঘণ্টা বাঁধা থাকিত। প্রত্যেক ঘরের অভ্যন্তরে দ্বারে সংলগ্ন একটি কেরোসিনের টিন বাঁধা ছিল। সুতরাং কোনও ঘরে কেহ প্রবেশ করিতে গেলে, সমগ্র গৃহশ্রেণী কেরোসিন টিন ও ঘণ্টার শব্দে নিনাদিত হইয়া বিকট ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িত।

বিজন স্থানে কোনও সাধুপুরুষ অবস্থান করিলে অনেকে তাঁহার দর্শনলাভ করিতে আসে। সেই জন্য, ১২ নম্বরের ঘরের দ্বার তাঁহাদিগের জন্য অবারিত থাকিত। ১২ নম্বরের ঘরে শব্দ হইলে, নিধিরাম ৬নং গৃহে প্রবেশ করিত, এবং ৩ নম্বর গৃহস্থিত প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সমাচার দিত। শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধায় রামলালবাবু দিনের মধ্যে বিংশতিবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া, বিংশতি খণ্ড গেরুয়া বসন ক্রমান্বয়ে পরিধান করিতেন, এবং বেলা তিনটার সময় স্বহস্তে আতপতণ্ডুল ও অপক্ক কদলী প্রভৃতি পাক করিয়া আহার করিতেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে কতিপয় ভ্রাম্যমাণ ভদ্রলোক নিমডিহি ষ্টেশনে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। নিমডিহি ষ্টেশনের বাবুর সহিত তাঁহাদিগের আলাপ হইয়া গেল।

এই আগন্তুকবর্গের মধ্যে দলপতি ফরিদপুর-নিবাসী গোবর্দ্ধন কাঞ্জিলাল এক জন খনিজপদার্থবেত্তা (Mineralogist)। পরিধানে হ্যাট ও কোট, সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র Boring Machine (খনন করিবার কল)। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ছোটনাগপুরের তাম্রখনি সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক জন ইতিহাসলেখক—তিনি দাক্ষিণাত্যের লোক—ভার্গব তেলাং নামধেয়—টিকিযুক্ত মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে এক খণ্ড মোটা পট্টবস্ত্র—পাদুকাবিহীন পদতল। তৃতীয় ব্যক্তি তেলাং মহাশয়ের স্বামী—

অর্দ্ধ-পুরুষ-বেশধারিণী এক জন যুবতী স্ত্রীলোক—দ্রৌপদী বাই নামধেয়া—রন্ধনকার্য্যে বিশেষ পটু। চতুর্থ ব্যক্তি এক জন (জলধরঅ-নামক) উড়িষ্যা-দেশীয় খানসামা।

ঠং—ঠং—ঢং—ঢঢং—

কি ঘোর শব্দ! রামলালবাবু ত্রস্ত হইয়া ডাকিলেন, 'নিধু—দেখ্ ত কে এসেছে'—

নিধু ৬নং গৃহ হইতে উঁকি মারিয়া ৩নং গৃহে প্রভুকে জানাইল, 'চারি জন অতিথি দ্বারদেশে। তন্মধ্যে এক জন দেখিতে স্ত্রীলোকের ন্যায়।'

রামলালবাবু। সর্ব্বনাশ! ঠিক বল্‌ছিস্ ত?

নিধু। আপনি উঁকি মারিয়া দেখুন।

রামলালবাবু দ্বারের ফাঁক হইতে অতিথিবর্গকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। 'এদের এ দেশের লোক বলিয়া ত বোধ হয় না! আর ঐটি স্ত্রী কি পুরুষ, ঠিক্ বোঝা যাচ্ছে না। তবে গোঁফ নাই, এবং মাথার চুল যে বেতর লম্বা, সেটা নিশ্চয়। এখন উপায়?'

(বাহির হইতে)—'এ বাটীতে রামলাল সাধু বাস করেন?—আমরা তাঁহার দর্শনাভিলাষী।'

রামলাল। নিধু! বল্ যে 'আছেন।'

নিধু। (উচ্চৈঃস্বরে) 'একটু বসুন—ঐ গোশালার নিকট ১২নং ঘরে।'

অতিথিগণ ১২নং গৃহে গমন করিবামাত্র সমগ্র বাটী ঘণ্টারবে নিনাদিত হইল।

দ্রৌপদী। এ কি জ্বালা!

তেলাং। চমৎকার ব্যাপার!

কাঞ্জিলাল। আমার বোরিং কলটা সাবধানে রাখ্‌তে হবে দেখছি। জলধর! তুই পাশের ঘরে ঢুকে দেখ্, যায়গা আছে কি না।

'বোরিং মেশিন' সযত্নে রক্ষিত হইলে নিধিরাম আসিয়া সংবাদ দিল যে, ৩নং গৃহে প্রভু প্রস্তুত, কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ।

দ্রৌপদী। এ কি জ্বালা!

তেলাং। চমৎকার ব্যাপার!

কাঞ্জিলাল। জলধর, তুই কল্‌টা সাবধানে দেখিস্।

ইহা বলিয়া তেলাং ও কাঞ্জিলাল রামলাল সাধুকে দর্শন করিতে গেলেন। ইত্যবসরে দ্রৌপদী নিধিরামকে ডাকিয়া বলিল, 'ভাল আছ ত নিধুবাবু ?'

নিধিরাম। 'আফিংএর সাহায্যে বেশ ভাল আছি। তবে আমি এখনও বাবু হ'তে পারি নি, এটা কেবল মুক্তিসাপেক্ষ।' ইহা বলিয়া নিধিরাম দীনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল, এবং শীঘ্রই সে 'বাবু' হইবে, সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাহার মলিন বস্ত্রের দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত করিল।

দ্রৌপদী। নিধুবাবু—এখানে কষ্ট ক'রে থাকায় লাভ কি ?—সমস্ত দিন জল টান্‌তে হয়, আর গেরুয়া বসন কাচ্‌তে হয়—কি ঘোর, কঠিন দাসত্ব! তোমার কি দেশের উপর মায়া নাই ?

নিধিরাম কটাক্ষপাত করিয়া জানাইল যে তাহার বিশেষ রকম মায়া আছে, এবং এই বনবাসে থাকার 'বিশেষ উদ্দেশ্য' আছে, কিন্তু তাহা সে আপাততঃ প্রকাশ করিতে নারাজ্।

দ্রৌপদী। দেখ, আমরা কেমন স্বাধীন! ঐ যে বোরিং মেশিন্ দেখছ, তার সাহায্যে আমরা এক দণ্ডের মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত ও পাথরের নীচে কোথায় সোনার খনি আছে, তা ঠিক্ বল্‌তে পারি, এবং দিন কতকের মধ্যে অনেক টাকা রোজগার করি—

নিধিরাম চমকিয়া উঠিল, 'ঠিক বলছ ? তবে আমি তোমাদের দলে মিশব—বল্‌তে কি, এই ঘরগুলির মধ্যে কোনও একটাতেই—পাথরের তলে সোনা আছে—যদি গোলমাল না কর, তবে তোমাদের কল চলাবার যায়গা আমি দু'দিনেই ঠিক করে দিতে পারি। একবার কল্‌টা চালিয়ে দিন, আমি দেখ্‌ব।'

দ্রৌপদী। তাড়াতাড়ি করলে হবে না। তুমি জলধরের সঙ্গে মিশে যাও—সে গোপনে দেখিয়ে দেবে—

দ্রৌপদী বাই ইহা বলিয়া জলধরকে ডাকিল, এবং তিন জনে মিলিয়া পরামর্শ করিল যে, রাত্রিকালেই গোশালার পশ্চিম দিক খনন করা হইবে।

সেই রাত্রিতেই কিঞ্চিৎ খনন করিয়া যাহা আবিষ্কৃত হইল, তাহা আশাপ্রদ—অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ গোশালা হইতে ৬নং গৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৪

ঐতিহাসিক ভার্গব তেলাং বলিলেন যে, তাঁহার 'সাধু পুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্তে'র ৩য় খণ্ডে রামলাল সাধু মহাশয়ের বৃত্তান্ত অলঙ্ক ভাষায় ছাপাইব।

তাহাতে রামলালবাবুর কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমার জীবনের ইতিহাস অতি ক্ষুদ্র। আমার মুক্তি সম্বন্ধে মতামতই আসল কথা—অষ্টাবক্রীয় সংহিতাই মুক্তিশাস্ত্র।'

কাঞ্চিলাল। সে কি প্রকার, তাহা শুনিবার অধিকার আমাদের আছে কি?

রামলাল। কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে পারেন।

কাঞ্চিলাল (তেলাং মহাশয়ের প্রতি)। টুকিয়া লন্।

ভার্গব তেলাং বৃহৎ সবুজবর্ণের চসমা চক্ষে দিয়া তালপত্রে কথাগুলি টুকিতে লাগিলেন, এবং রামলাল সাধু বলিতে লাগিলেন—

'এই হৃদয় একটা কন্দরবিশেষ। তাহার মধ্যে কাঞ্চনের মায়া বাস করে। কাঞ্চন বাহিরে, মায়া অন্তরে। মায়াটুকু হৃদয় খনন করিয়া বাহির করিলে, কাঞ্চনের মূল্য থাকে না, এবং অপর পক্ষে, কাঞ্চন অন্তর্হিত হইলে মায়ার আধার থাকে না।

'যেমন—ক্ষুধা নহিলে খাদ্যের মূল্য নাই, অপর পক্ষে—খাদ্য না থাকিলে ক্ষুধা হইত না।

'অনেকে মনে করেন যে, ক্ষুধা বর্জ্জন করিয়া খাদ্য দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়, কিংবা মায়া বর্জ্জন করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ধন সঞ্চয় করা যাইতে পারে—উভয়ই কেবল কথার কথা।

'এখন, প্রধান সমস্যা, কি উপায়ে মুক্তি লাভ হয়?'

তেলাং। কি চমৎকার!

কাঞ্চিলাল। আমার বোধ হয় যে, বোরিং মেশিন দিয়ে পৃথিবীর ধন রত্ন খুঁড়ে নষ্ট করাই ভাল।

রামলাল। তাতে কোনও ফল হবে না, ক্রমে অভাবে মায়া বেড়ে উঠবে। যেমন স্ত্রীবিয়োগে হয়।

তেলাং। কি চমৎকার!

কাঞ্চিলাল। তবে উপায়?

রামলাল। ক্রমাগত ধন সঞ্চয় করতে হবে, যখন পৃথিবীর ধন সম্পত্তি এক জন লোকের করতলস্থ হবে, তখনই তাহার মুক্তি সম্ভব।

কাঞ্চিলাল। তা কি কখনও সম্ভব?

রামলাল। তবে মুক্তিও সম্ভব নয়। অতিশয় আহার করলে যেমন

পেট কেটে মৃত্যুর সম্ভাবনা, অতিশয় সম্পত্তি হলেও তেমনি মুক্তির সম্ভাবনা। অনাহারে, কিংবা পরিমিত আহারে, মায়ার তিলমাত্র কমতি হয় না।

রামলালবাবু এই প্রকারে তাঁহার মুক্তিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া নিধিরামকে ডাকিলেন, 'এঁদের খাওয়াদাওয়ার কি যোগাড় হয়েছে নিধিরাম?'

নিধিরাম। সব ঠিক। এঁদের সঙ্গে উপরন্তু অপর্য্যাপ্ত চা ও বিস্কুট আছে প্রভু!

এই কথা শুনিয়া রামলালবাবু শিহরিয়া উঠিলেন।

'দেখিস্, ঘরগুলো যেন নোংরা না হয়—স্নান করবার জল নিয়ে আয়। এঁদের গোশালায় রাঁধবার বন্দোবস্ত করে দে—(কাঞ্চিলালের প্রতি) আপনাদের কোনও আপত্তি নাই ত?'

কাঞ্চিলাল। আমাদের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি আছেন, তিনিই রেঁধে দেন—তিনি নিজেই গোশালা পছন্দ করেছেন।

রামলাল সাধু, স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া শিবনেত্র উৎপাদন পূর্ব্বক বলিলেন —'স্ত্রীলোকমাত্রেই পথে বর্জ্জনীয়া—তবে তিনি গোশালা পছন্দ করেছেন, এতে বোধ হচ্ছে' তিনি পবিত্রা নারী—'

তেলাং। তিনি সন্ন্যাসিনী। আপনার আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষায় এতদূর এসেছেন—একবার অনুমতি হয় ত দূর হ'তে ভূমিষ্ঠা হ'তে চা'ন্।

রামলাল সাধু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'আমার এতে ঘোর আপত্তি হ'ত, কিন্তু তিনি যখন এত দূর এসেছেন, তখন নিরাশ কর'ব না—এ বিষয় ভেবে দেখ্‌ব!'

৫

দ্রৌপদী বাই নিম্ন হস্তে উপস্থিত হইয়া সাধু পুরুষকে প্রণাম করিল। রামলাল সাধু নিধিরামকে ইঙ্গিতপূর্ব্বক বলিলেন, 'এই সাধ্বীকে একটি কদলী দাও—'

কদলী অর্পিত হইলে রামলাল সাধু বলিলেন, 'আমি এই দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। যদি তোমার কোনও মনস্কামনা থাকে, তবে এই কদলী দ্বারাই সিদ্ধ হবে। তোমার স্বামী আছেন?'

দ্রৌপদী। না, আমি বিধবা। ঠাকুরের কৃপায় যেন আর বিবাহ না করিতে হয়, ইহাই মনস্কামনা।

রামলাল। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের মুক্তি নাই। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, কিন্তু মুক্তি হবে না।

দ্রৌপদী। আমি মুক্তি চাই না। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছি, কেবল সেবা করে বেড়াব।

রামলাল। কি সেবা আরম্ভ করেছ? শাস্ত্রে সন্ন্যাসীদের তিন প্রকার সেবা বর্ণিত আছে। প্রথমতঃ গঞ্জিকাসেবা—যেমন, ইতিহাস, কাব্য, ব্যাকরণ ও শাস্ত্রচর্চ্চা। দ্বিতীয়তঃ পশুসেবা—যেমন, গো, মহিষ, গর্দ্দভ, অশ্ব প্রভৃতির সেবা। তৃতীয় মানবসেবা—অর্থাৎ, ভেল্‌কী ও প্রবঞ্চনার বলে অর্থ সঞ্চয় ক'রে দীর্ঘায়ু লাভ করা।

দ্রৌপদী বাই নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া নিবেদন করিল, 'আমি আপাততঃ তেলাং মহাশয়ের ইতিহাস বাংলা ভাষায় লিখ্‌ছি।'

রামলাল। অতি উৎকৃষ্ট! ইতিহাসটা লেখা হয়ে গেলে একটা গরু কিংবা ছাগলের সেবা আরম্ভ করলে অনেকটা উন্নতি হবে। ক্রমে তৃতীয় সোপানে উপস্থিত হবে।

দ্রৌপদী। আপনার উপদেশ খুব অদ্ভুত!

রামলাল। সংসারাশ্রমে থাকলে এ সব উপদেশ মাথা দিয়ে বেরোয় না, এই জন্য গুরুর দরকার। তুমি যখন সন্ন্যাসিনী হয়েছ, তখন এক জন গুরুর দরকার।

দ্রৌপদী। সেই গুরুর অন্বেষণেই আপনার পদতলে এসেছি। আপনিই আমার গুরু হবেন।

রামলাল। আমার নিজের খাবার সংস্থান নাই, সুতরাং সেটা অসম্ভব। আর একটা কথা, আমার উপদেশ দেওয়া অভ্যাস নাই। মানুষের স্বভাব এই যে, কেউ কারও কথা শুনে না—বিশেষতঃ স্ত্রীলোক। তবে তোমার ভক্তি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি, সেই জন্য বলে দিচ্ছি যে, আজ এই অপক্ক কদলী সিদ্ধ ক'রে আহার করবে। কাল প্রাতঃকালে যদি সুমতি হয়, তবে আবার এস।

দ্রৌপদী পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া গোশালায় ফিরিয়া গেল। রামলালবাবু নিধিরামকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা নিধিরাম! তোর দেশে যেতে ইচ্ছে করে? মনে কর, যদি তোকে কিছু টাকা দিয়ে, একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিই, তবে তুই সুখী হবি?'

নিধিরাম কি ভাবিল—তার মুখে প্রভুভক্তির ভাব দেখা দিল—আবার সে ভাব গিয়া অন্য একটা ভাব মুখে করিয়া নিবেদন করিল, 'প্রভু! আমাকে কে বিয়ে ক'রবে?'

রামলাল। তোর চেহারা ত মন্দ নয়। মনে কর ঐ স্ত্রীলোকটি—দ্রৌপদী বুঝি?—যদি তোকে বিয়ে করে?

নিধিরামের ভয় হইল। ঠাকুর কি তার মনের কথা খানিকটা জানিতে পারিয়াছে?

'তাও কি কখনও হয়?'

রামলাল সাধু। পয়সা দিলে হয়; আমি বলছি হবে।

নিধিরাম। না—আপনাকে ছেড়ে যেতে পারব না।

রামলাল সাধুর মুখ বিমর্ষ হইল। সংসার পাপের দিকে নহিলে হেলে না। সেই পথই সোজা।

৬

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র এবং অপূর্ব্ব 'বোরিং মেশিন্', ৮নং গৃহের প্রস্তর ভেদ করিয়া রামলাল সাধুর গুপ্ত ধনের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে!

প্রফুল্লাননা দ্রৌপদী নিধিরামের স্কন্ধে তাহার কোমল বাহু স্থাপন করিয়া কহিল, 'নিধুবাবু, আজ তুমিই আমার সকলের চেয়ে প্রিয়।'

জলধর বলিল, 'নিশ্চয়।'

নিধিরাম অহিফেনের নেশায় বিভোর হইয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'সকলের চেয়ে প্রিয় হলে' কি হয়?'

দ্রৌপদী। প্রিয়তম হয়!

জলধর। নিশ্চয়।

নিধিরাম দ্রৌপদীর সুশ্রী ও চঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিল, 'যদি মোহরের তোড়া নিয়ে, প্রিয়তমা ভার্গবের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তবে উপায় কি?'

দ্রৌপদী। তোমার সন্দেহ হচ্ছে প্রিয়তম? তবে সব কথা তোমাকে প্রকাশ করে বলি। জলধর আমাদের দেশের লোক; সে দাগাবাজ নয়। কাঞ্জিলালবাবু ও ভার্গব তেলাং দু'জনেই নিরীহ ভালমানুষ। কেবল ঐ কলটা হস্তগত করবার জন্য তাদের সঙ্গে যুটেছিলুম।

জলধর। কলটার সঙ্গে একটা পম্প্ আছে, সেটাতে দরকার হলে পাথরের নীচে থেকে জল পর্য্যন্ত তোলা যায়।

নিধিরাম। আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে, একটু তুলে ফেল।

জলধর 'পম্প' করিয়া জল আকর্ষণ করিল। ফোয়ারার মত জল ছুটিতে লাগিল।

নিধিরাম জল পান করিয়া প্রস্তরখণ্ডের নিম্নস্থিত সুবর্ণমুদ্রার তোড়া টানিয়া বাহির করিল। একটা তোড়া নয়, দুইটি! এক সহস্র নয়, দুই সহস্র!

দ্রৌপদী আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া বলিল, 'তোরা প্রত্যেকে এক একটা তোড়া কাঁধে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়। এই রাত্রিতেই পগার পার হয়ে এখানকার রেলওয়ে-ষ্টেশনের পরের ষ্টেশনে টিকিট নিয়ে গাড়ী চড়ব। সেটা কত দূর?

নিধিরাম। মোটে দুই ক্রোশ। ভোরের সময় গাড়ী আসে। ততক্ষণ জঙ্গলে লুকিয়ে থাক্‌ব।

জলধর। তেলাং মহাশয় ইতিহাস লিখে গোশালায় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দ্রৌপদী। আর কাঞ্জিলাল?

জলধর। তিনি ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে শয়ন কর্‌তে গিয়েছেন।

দ্রৌপদী। বেশ! প্রিয়তম! এখন স'রে পড়া যাক্।

জলধর। কিন্তু জলের ফোয়ারা এখনও ছুটছে, ঘর যে ভেসে গেল।

দ্রৌপদী। এখনই ফোয়ারা বন্ধ কর।

নিধিরাম। এ কি বিপদ, তোড়ার সঙ্গে দড়ি বাঁধা দেখ্‌ছি।

দ্রৌপদী। এই ছুরি দিয়ে কেটে ফেল।

জলধর ছুরিকা লইয়া নিমেষের মধ্যে রজ্জু কাটিয়া দিল।

নিধিরাম। সর্ব্বনাশ! কাজ্‌টা ভাল হ'ল না!

দ্রৌপদী। এ কি শুন্‌তে পাচ্ছি প্রিয়তম!

ঘোর ঘণ্টা নিনাদে দ্বাদশ গৃহ পরিপূর্ণ! ৩নং গৃহ হইতে রামলাল সাধু বিকট রবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'জুয়াচোর, পাজি, নচ্ছার, চোর! তোরা ঘরের মধ্যে জলে ডুবিয়া মর!'

সেই জলাকীর্ণ গৃহে সুবর্ণ-তোড়া স্কন্ধে, অহিফেন নেশায় বিভোর নিধিরাম কাতরস্বরে বলিল, 'প্রিয়তমা! এখন পলানো অসম্ভব!'

জলধর! নিশ্চয়! এক একটা বোঝা সাড়ে বার সের। আমার অসাধ্য। ইহা কহিয়া সে পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া অমানিশার অন্ধকারে দ্রৌপদীর সহিত অন্তর্হিত হইল।

৭

অনুতপ্ত নিধিরাম জল ভাঙ্গিয়া গোশালায় গেল, এবং তেলাং মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিল, 'সর্ব্বনাশ হয়েছে!'

ইতিমধ্যে মশকের দংশনে বিব্রত কাঞ্জিলাল ষ্টেশন হইতে প্রত্যাগত হইয়া দ্বাদশ নং গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অসম্ভব! সকলই জলাকীর্ণ!

তেলাং। ব্যাপারখানা কি?

নিধিরাম। জলধর বোরিং-মেশিনের ফোয়ারা খুলে দিয়েছিল, সেটা এখনও থামে নাই।

কাঞ্জিলাল। সে কি? তা হলে মেশিন্‌টা নষ্ট হয়ে যাবে যে? সে গেল কোথায়?

নিধিরাম। প্রিয়তমার সঙ্গে পালিয়েছে!

তেলাং। দ্রৌপদীর সঙ্গে?

নিধিরাম। নিশ্চয়!

তখন নিধিরাম রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিল, 'আমাকে বাঁচান্—প্রভুকে বুঝিয়ে দিন, আমি নিরপরাধ।'

তখন ভোর হইয়া কাক ডাকিতেছিল। রামলাল সাধু তাঁহার গুপ্ত ধন ইতিমধ্যে অন্যত্র স্থাপন করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, 'নিধু! এ দিকে আয়!'

জলের স্রোতে নিধুর নেশা ছুটিয়া যাওয়াতে সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

কাঞ্জিলাল। ভার্গব বাবু—ঘটনাগুলি টুকিয়া লউন।

ভার্গব তেলাং তাঁহার তালপত্রের তাড়া বগলে করিয়া বলিলেন, 'ষ্টেশনে গিয়া লিখিলে ভাল হয়।'

কাঞ্জিলাল। আর আমার বোরিং-মেশিন্?

নিধিরাম। সেটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

কাঞ্জিলাল হতাশদৃষ্টিতে কল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কথাটা নিতান্ত সত্য। তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তখন রামলাল সাধু নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আপনাদের স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া আনা প্রথম বেয়াকুফী হয়েছে, এবং স্ত্রীলোককে কলের মর্ম্ম শেখান দ্বিতীয় বেয়াকুফী। বোরিং-মেশিনটা লইয়া আসা তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেয়াকুফী। এ সব ঘটিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াই আমি তাকে অপক্ব কদলী দিয়া আশীর্ব্বাদ করেছিলাম। মেয়েটা চালাক ছিল, দেখ্‌তেও

মন্দ নয়। নিধিরামের সঙ্গে বেশ মানাত। কিন্তু এ ব্যাটা ম্যাড়াকান্ত, বুঝ্তে পারে নাই।'

ইহা বলিয়া রামলাল সাধু অকৃতজ্ঞ ভৃত্য নিধিরামের কর্ণ টানিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন।

কাঞ্চিলাল। যা হ'বার হয়ে গেছে, ভার্গব বাবু! এইবার আপনার তৃতীয় খণ্ডটা সমাপ্ত করে ফেলুন।

বয়স্য।

নেজামীর 'হপ্ত্ পয়কর।'

নেজামী পারস্যের একতম মহাকবি। তিনি ইংরেজ কবি চসারের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে পারস্যের সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইয়া অপূর্ব্ব কবিত্বচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। এত প্রাচীন কালের কবি হইলেও তিনি পারস্যের সাহিত্যাকাশে আজও অত্যুজ্জ্বল ভাস্করবৎ দেদীপ্যমান। তিনি পদ্যচ্ছন্দে পাঁচটি উপাখ্যান-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত 'হপ্ত্ পয়কর' নামে অভিহিত। 'হপ্ত্ পয়কর' অর্থে 'সপ্ত সৌন্দর্য্য' বুঝায়। নেজামী তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'রহস্য-ভাণ্ডার' (Magazine of Mysteries) রাখিয়াছিলেন। অনেক সমালোচক (Hammer Purgstale) বলেন যে, উক্ত গ্রন্থের মত 'হপ্ত্ পয়কর'কেও একটা 'গল্প-ভাণ্ডার' (Magazine of Stories) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা প্রাচীন পদ্য-গল্প-গ্রন্থসমূহের অন্যতম, এবং সর্ব্বদাই অনুকৃত হইয়া আসিতেছে।

এই গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাস অত্যন্ত সরল। ইহার নায়ক বহরম গোর এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্যের রাজা ছিলেন। তাঁহার ধনাগারের কোনও এক গুপ্ত কক্ষে তিনি একদা সাত জন রাজকুমারীর আলেখ্য প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে এক জনের নাম 'ফোরথ'। তিনি ভারতের 'রায়' বা রাজার কন্যা ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ 'ফুর' বা 'পুর' হইতেই তাঁহার নামোৎপত্তি হইয়া থাকিবে। আরবী ভাষায় 'প' না থাকায় 'ফ' দ্বারা পারস্যের 'প' অক্ষরের কার্য্য চলিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার পিতা কনৌজের রাজা, এবং গ্রীকদিগের 'পোরাসে'র (Porus) বংশধর ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অন্য ছয়টি ছবি পৃথিবীর অন্য ছয়টি দেশের রাজকন্যার ছবি,—যেমন একটি গ্রীক সম্রাটের কন্যার, একটি রুসিয়ার জারের (সম্রাটের) কন্যার, ইত্যাদি।

বহরম গোর ছবি দেখিয়া সাত জনকেই ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তিনি পরে রাজদূত ও মূল্যবান উপহারাদি পাঠাইয়া তাঁহাদের পিতার নিকট হইতে সাত জনকেই লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি সপ্ত গ্রহের অনুরূপ সপ্ত গুম্বজ-বিশিষ্ট এক প্রাসাদ প্রস্তুত করাইলেন। কেবল ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। প্রাসাদের কক্ষগুলিকে সপ্তাহের 'সপ্ত-বার'-জ্ঞাপক করিয়া তিনি এক এক রাজকন্যার বাসের জন্য এক এক গুম্বজের নীচের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। প্রত্যেক গ্রহের বর্ণানুসারে প্রত্যেক কক্ষের গাত্র রঞ্জিত করা হইল। শনি গ্রহের বর্ণানুসারে ফোরথের প্রাসাদ কাল বর্ণে রঞ্জিত হইল। বহরম কৃষ্ণবর্ণ-বস্ত্র-পরিহিত হইয়া প্রথমে শনিবার দিন ফোরথের গৃহে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটি গল্প বলিতে অনুরোধ করিলেন। ফোরথ একটি গল্প বলিলেন। সেই গল্পটি এইরূপ :—

'এক সহর ছিল। সেই সহরে সকল লোকই 'সেয়াপোষ' বা কৃষ্ণবর্ণ-বস্ত্র-পরিধান-কারী। এক জন ভ্রমণকারী উক্ত সহরে যায়। সেখানে গিয়া সে একটা উড্ডীয়মান ঝুড়িতে আরোহণ করে, এবং পরে তাহার অন্য এক 'সেয়ামুর্গ' বা আরব্যোপন্যাসের জটায়ু (Roc) নামক পক্ষীর পায়ের সঙ্গে বন্ধন করে, ইত্যাদি।'

পর দিন—রবিবার বহরম গ্রীক সম্রাটের কন্যা হুমাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার গৃহখানি স্বর্ণরাগরঞ্জিত ছিল। বহরম পীতবসন পরিধান করিয়া মস্তকে স্বর্ণমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। রাজার অনুরোধে হুমাইও একটি গল্প বলিলেন।

এই ভাবে বহরম পর পর প্রত্যেক প্রাসাদে গমন করিলেন। যে গ্রহ ও বারের অনুরূপ যে প্রাসাদ, তিনি সেই দিনে সে বর্ণের বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন; তাহার কোনও অন্যথা হইত না। প্রত্যেক রাণীকেই তিনি একটি গল্প বলিতে অনুরোধ করিতেন, এবং প্রত্যেকেই এক একটি গল্প বলিয়াছেন।

রুস-রাজকন্যা ৪র্থ গল্প বর্ণনা করেন। গল্পটি এই :—

এক রাজকন্যা একটি দূরবর্ত্তী ও আশ্চর্য্যরূপে সুরক্ষিত দুর্গে বাস করিতেন। তাঁহার বাসনা ছিল যে, তাঁহার প্রেমার্থিগণ দুর্গভেদ করিয়া আসিয়া তাঁহার সন্ধান লইবেন। তিনি জানিতেন যে, এরূপ কার্য্যে অবশ্য অনেকেই অকৃতকার্য্য হয়, এবং এক জনমাত্র সফলতা লাভ করে। ফলতঃ এক অসম-সাহসিক রাজপুত্র 'সেয়ামুর্গে'র সাহায্যে দুর্গে প্রবেশ করিয়া তৎকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন।

এই গল্পটি বহুঘটনাপূর্ণ। এ জন্য ইয়োরোপে ইহার বেশ সমাদর হইয়াছে, এবং আর্ডম্যান (Erdmann) কর্ত্তৃক জর্ম্মণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু সাতটি গল্পের মধ্যে হুমাইর বর্ণিত গল্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে, এমন আর কোনও চরিত্র আর কোনও গল্পে দেখা যায় না। ইহা পারস্যরাজ ও তাঁহার এক সুন্দরী ক্রীত-দাসীর গল্প। রাজা জ্ঞানী, সুশ্রী ও প্রেমিক। তিনি নিজের কোষ্ঠী হইতে জানিতে পারেন যে, স্ত্রীসংসর্গ তাঁহার পক্ষে বিপদের কারণ হইবে। এই কারণে তিনি যত দূর সম্ভব, স্ত্রীজাতি হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু স্বভাবের গতির প্রতিরোধ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। উপযুক্তা রাজকন্যা না পাওয়ায়, এবং স্থায়ী মিলনে প্রাণের আশঙ্কা থাকায়, তিনি টাকা দিয়া দাসী কিনিতে আরম্ভ করিলেন। এক কুব্জপৃষ্ঠা বৃদ্ধা তাঁহার দালাল হইয়া তাঁহাকে দাসী যোগাইত; কিন্তু ফল সন্তোষজনক হইল না। ঐ সকল ক্রীত-দাসী রাজা ডেবিড (দাউদ) অথবা গজনীর সুলতান মোহাম্মদের অন্তঃপুর হইতে সংগৃহীতা বলিয়া বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিলেও, রাজা নিরাশহৃদয়ে প্রত্যেককে সপ্তাহে কি তন্ন্যূন সময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। বৃদ্ধা নূতন নূতন পুরস্কার-লাভের আশায় এই কার্য্যে রাজাকে উৎসাহিত করিতেন। অবশেষে সংবাদ আসিল যে, এক জন চীনা দাস-ব্যবসায়ী খল্লাজ (Khallaj) ও কাথে (Kathay) দেশের বাছা বাছা প্রায় সহস্র সুন্দরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক অনুপমসৌন্দর্য্যশালিনী রমণী আছে; সে এমন সুন্দরী যে, প্রভাত-তারকাও তাহার নিকট হার মানে। রাজা তাহাকে আনাইলেন। তাহার সঙ্গিনীগণকেও আনাইলেন। রাজার নিকট আনীত হইবার পর একমাত্র সেই রমণীই তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিল। রাজা যেমন শুনিয়াছিলেন, তাহাকে তদপেক্ষাও বেশী সুন্দরী দেখিতে পাইলেন। রাজা তাহার প্রণয়াসক্ত হইলেন; কিন্তু খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি দাস-ব্যবসায়ীকে উক্ত রমণীর গুণাগুণ ও চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, সওদাগর তাহার নৈতিক চরিত্র ও মানসিক গুণের বিস্তর প্রশংসা করিলেন, কিন্তু স্বীকার করিলেন যে, তাহার এক মস্ত দোষ আছে। সে দোষ এই যে, পুরুষের প্রতি তাহার কোনও আসক্তিই নাই, এবং কোনও পুরুষ তাহাকে পাইতে চাহিলে সে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, এবং তাহার হস্তে ঐ পুরুষের জীবন বিপন্ন হয়। সুতরাং তাহাকে যেই ক্রয় করে, সেই পর দিন প্রাতে ফিরাইয়া দেয়। বণিক

বলিলেন, তিনি শুনিয়াছেন যে, উক্ত স্ত্রীলোকের মত রাজাও সহজে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন। এজন্য তিনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, রাজা যেন তাহাকে না কিনিয়া অন্য কাহাকেও মনোনীত করেন। রাজা কিন্তু অন্য কাহাকেও লইলেন না, তাহাকে লইয়াই নিজ অন্তঃপুরে রাখিলেন। রমণী তথায় অজ্ঞাতে নির্জ্জনে মনোহর কুসুমের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা তাহার নিকট যাইয়া কত কথা বলিতেন, কিন্তু রমণী তাঁহার কোনও কথারই প্রত্যুত্তর করিত না। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা উভয়ের মিলন করিয়া দিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু উভয়েই তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন।

এক দিন রাত্রে রাজা রমণীর নিকট যাইয়া নানারূপ মধুর সম্ভাষণ করিলেন, এবং ভাবাবেশে তাহার কত প্রশংসা করিয়া ফেলিলেন। 'তুমি আমার জীবনের চক্ষু, এবং চক্ষুর জীবন। তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনায় চন্দ্রের রশ্মি নিষ্প্রভ।' ইত্যাদি স্তুতিবাদ করিয়া রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দয়িতে, আমার প্রতি তোমার এই উদাস ভাবের কারণ কি?' তৎপরে তিনি তাহাকে স্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। এ বিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য রাজা সোলেমান ও শেবার (Sheba) রাণী বিল্‌কিসের কাহিনী বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।—

'বিল্‌কিসের হস্তপদ-শূন্য এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। বোধ হইত যে, তাহার হস্ত পদ যেন শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। সোলেমান স্বর্গীয় দূতশ্রেষ্ঠ জিব্রায়েলকে এই বিপদের কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত বলিলেন, সোলেমান ও বিল্‌কিসকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তাঁহারা যদি সম্পূর্ণ অকপটভাবে তাহার সদুত্তর প্রদান করেন, তবেই বালক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে। মহাভারতে দ্রৌপদীকে যেরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে, বিল্‌কিসকেও প্রায় তদ্রূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "সোলেমানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও অন্য পুরুষ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন কি না?" বিল্‌কিস উত্তর করিলেন, "তিনি কোনও সুন্দর যুবা পুরুষ অবলোকন করিয়া তৎপ্রতি অনাসক্ত থাকিতে পারেন নাই।" তাঁহার এই সত্যের পুরস্কারস্বরূপ বিকলাঙ্গ পুত্র তৎক্ষণাৎ হস্তদ্বয় লাভ করিল। সোলেমানের প্রতি প্রশ্ন হইল,—"তিনি এত বড় ও মহৎ হইয়াও কখনও কোনও জিনিসে লোভ করিয়াছেন কি না?" তিনি উত্তর করিলেন, "ধনী এবং শক্তিশালী হইয়াও তিনি তাঁহার দর্শনার্থী ব্যক্তিগণ উপহার আনিয়াছেন কি না, লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।" তাঁহার এই সরলতার পুরস্কারস্বরূপ বালক পদদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।'

গল্প শেষ করিয়া রাজা রমণীকে তাহার এরূপ উদাসভাবের যথার্থ কারণ ব্যক্ত করিতে, এবং তাহার এমন অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি সত্ত্বেও সে রাজার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় কেন, তাহা বলিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন যে, রমণী এত দূরে দূরে থাকিলেও তিনি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। রাজার শপথ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে উদাসিনী রাজরাণী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তাঁহার বংশে কোনও স্ত্রীলোক পুরুষকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলে, সন্তান-প্রসবের সময় সূতিকাগারেই তাহার মৃত্যু হয়। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রশ্নের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াই যেন রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি পুরুষকে গর্ভধারণ করিতে হইত, তবে এ অবস্থায় তাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সাহসী হইতেন কি না? স্ত্রীলোকেরা এই বিষদিগ্ধ মধু পান করিবে কেন? তৎপর তিনি নিঃসঙ্কোচে সরল ভাবে বলিলেন,—

'আমার জীবনকে আমি এত ভালবাসি যে, আমি উহাকে কিছুতেই এরূপে বিপদাপন্ন করিতে পারি না। আমি জানের (জীবনের) প্রেমিক, প্রেমিকের প্রেমিক নহি। যখন তিনি তাঁহার গুপ্ত বিষয় বলিয়া দিলেন, রাজা এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিউন বা বিক্রয় করিয়া ফেলুন,—যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যেমন নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, রাজাও তাঁহার নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন।'

তিনি কেন এতগুলি সুন্দর সুন্দর স্ত্রীলোককে অবিচারে শীঘ্র শীঘ্র পরিত্যাগ করেন, কেনই বা কাহাকেও হৃদয় দান করেন না, অথবা কাহাকেও মাসৈক কালও রাখেন না, এবং কাজের অযোগ্য ল্যাম্প বা বাতির ন্যায় তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করেন, এ সমস্ত বিষয় তিনি জানিতে চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে রাজা স্ত্রীজাতিকে বিষম আক্রমণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

'কোনও স্ত্রীলোকই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। তাহারা কেবল নিজের স্বার্থই দেখে। তাহারা ভাল বলিয়া দেখায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত মন্দ। একবার তাহারা সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিলে আর কোনও কাজ করিতে চায় না। প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করা বিধেয়। গমের ময়দা সকলের পেটে হজম হয় না। নারী জাতির উপর কোনও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তাহারা তৃণখণ্ডের মত বাতাসে যেখানে সেখানে নীত হয়। স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণখণ্ড দর্শন করিলে কম্পমান তুলাদণ্ডের ন্যায় তাহাদের মস্তক ইতস্ততঃ করিতে থাকে। দাড়িম্ব পাকিলে সুশ্রী হয়। মুক্তা বয়সের সঙ্গে উন্নত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অসার অপদার্থ হয়। শিশু বা আঙ্গুরের মত স্ত্রীলোকেরা যৌবনে মনোহর, কিন্তু বয়স্ক হইলে কাজ হইয়া যায়। গৃহে স্ত্রীজাতিকে শশা বলা যায়,—কাঁচা অবস্থায় পাকা, পাকা অবস্থায় কাঁচা।'

অবশেষে রাণীর প্রতি সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা রাজা তাঁহার কথা শেষ করিলেন,—বলিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়া তিনি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারেন না।

এততেও বালিকার (রাণীর) কোনও পরিবর্ত্তন হইল না,—তাঁহারা পরস্পর হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই বুড়ী কুট্টনী মিলন করিতে গিয়া তাঁহাদের বিচ্ছেদভাব আরও বাড়াইয়া তুলিল। রাজা ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন—জোর করিলেন না। তিনি তাঁহাকে অতি ভদ্রভাবে ও সসম্মানে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহার আমাদিগকে 'বোস্তাঁ' নামক গ্রন্থে সাদী-বর্ণিত অবাধ্য ক্রীতদাসীর প্রতি খলিফা আল্-মনসুরের ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপেক্ষা করিতে করিতে অবশেষে রাজা জয়লাভ করেন, এবং বালিকা আত্মসমর্পণ করেন। ওয়াল্টার স্কটের Princessএর মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়, 'যদি সে আত্মসমর্পণ না করিত।' কিন্তু ক্রীতদাসী এতদতিরিক্ত আর কি করিতে পারিত?

রাণীগণের বর্ণিত গল্পাবলী ভিন্ন 'হপ্ত্ পয়করে' আরও অনেক বিষয় আছে। ইহাতে বহরম গোরের জীবনচরিত দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী ও একটি বন্য গর্দ্দভ শিকারকালে এক অতলস্পর্শ গহ্বরে তাঁহার পতন ও তিরোধানের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। 'শাহনামা'তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত বহরমের গুপ্তভাবে কনৌজ-রাজের সহিত দর্শন সম্বন্ধে নেজামী কিছুই বলেন নাই। ফেরদৌসীর মতে বহরম ছদ্মবেশে কনৌজের রাজা সেঙ্গিলের (Shengil) রাজসভায় গমন করিয়া তাঁহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিয়া এক পত্র দিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল সেঙ্গিলের দরবারে অবস্থানপূর্ব্বক একটি বন্য হস্তী বধ করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে সেঙ্গিল তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় দুহিতা সপিনিয়লের তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার পরে বহরম তাঁহার এই ভারতীয় পত্নী সহ পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোনও ভারতীয় ইতিহাস বা উৎকীর্ণ লিপিতে 'সেঙ্গিল' নামক কোনও রাজার নাম দৃষ্ট হয় না। ফেরদৌসী এই নাম কোথা হইতে পাইলেন, বলা যায় না। যে তেলাসীর ইতিবৃত্ত (Chronicle of Telasi) হইতে ফেরদৌসী সম্ভবতঃ বিবাহের গল্পটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ নাম দেখা যায় না। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'সেঙ্গিল' নামধেয় আর এক জন ভারতীয় রাজা পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধে আফ্রাসিয়াবকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াও কবি ফেরদৌসী উল্লেখ করিয়া

গিয়াছেন। তিনি রুস্তম কর্ত্তৃক পরাজিত ও হত-প্রায় হইয়াছিলেন। বহরমের গুপ্তভাবে ভারত-পরিদর্শনের কথা এক ভাবে প্রীতিপ্রদ; কারণ, ইহারই উপর নির্ভর করিয়া কাট্রন (Catron) প্রভৃতি লেখকগণ সম্রাট বাবরের গুপ্তভাবে ভারত-পরিদর্শনের গল্প সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাবর কিংবা তাঁহার সমসাময়িক অন্য কোনও ঐতিহাসিক তাঁহার এরূপ ভারত-পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ 'শাহনামা'কে ভিত্তি করিয়াই এরূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছিল।

ইলিয়টের ভারতেতিহাসের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৫৫৩ পৃষ্ঠায় 'ফেরিস্তা'র কৃত ইতিহাসের প্রস্তাবনায় 'সঙ্কল' নামক এক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। তথায় উল্লিখিত আছে যে, তিনি 'কোচ' হইতে আসিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি কোচবিহার বা আসাম হইতে আসিয়াছিলেন, এবং মিঃ গেট্ (Gait) কর্ত্তৃক উল্লিখিত 'জঙ্গল বাতাহু' (Jangal Batahu) ও 'সঙ্কল' একই ব্যক্তি ছিলেন, অথবা সঙ্কল জঙ্গল বাতাহুর জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ফেরিস্তাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সঙ্কল লক্ষ্ণৌতি বা গৌড়ের স্থাপয়িতা ছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত অন্য একটী গ্রন্থে সঙ্কল ও বহরমের উল্লেখ দেখা যায়। 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন্' নামক আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও সঙ্কলের উল্লেখ আছে, কিন্তু সম্ভবতঃ 'ফেরিস্তা' হইতেই উহা গৃহীত হইয়া থাকিবে।*

নেজামীর এই 'হপ্ত্ পয়কর' অবলম্বন করিয়া আমাদের মহাকবি আলাওল বঙ্গভাষায় তাঁহার 'সপ্ত পয়কর' রচনা করিয়া গিয়াছেন। আগামী বারে আমরা উহার বিষয় আলোচনা করিব।

আব্দুল করিম।

ভারতে দ্যূতক্রীড়া।

পুরাকাল হইতেই ভারতে দ্যূতক্রীড়া প্রচলিত আছে। পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্মরণাতীত সময় হইতে ভারতে দ্যূত প্রচলিত রহিয়াছে।

---

* সুপ্রসিদ্ধ মিঃ এইচ্ বিভারিজ লিখিত একটী ইংরেজী প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে লিখিত আছে,—গত ভর্তৃক নারী দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ধনলাভ করিতেন, ইহা স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। *

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় রচিত তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে, কার্ত্তিকের শুক্ল প্রতিপদে শঙ্কর মনোহর দ্যূতক্রীড়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব ইহাতে দ্যূতক্রীড়া করিবে, তাহাতে সংবৎসরের শুভাশুভ নির্ণীত হইবে। † এই তিথির দ্যূতপ্রতিপদ একটী নাম।

লক্ষ্মীপূর্ণিমায় অক্ষ-ক্রীড়ার বিধান আছে। ইহারও দ্যূতপূর্ণিমা আখ্যা আছে। ‡

মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার প্রবল প্রতাপ লক্ষিত হয়। সভাপর্ব্ব-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে ব্যথিতহৃদয় দুর্য্যোধন যখন শকুনির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপে যুধিষ্ঠিরকে নিগৃহীত করিতে পারি, তখন শকুনি দ্যূতক্রীড়ার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'দ্যূতে আমি অদ্বিতীয়, আমি অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিব। যুধিষ্ঠির অনভিজ্ঞ, পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষহৃদয় জ্যা, হৃদয়স্ফূর্ত্তি আমার রথ। তাহার পরে সেই দ্যূতক্রীড়ার সমাপ্তি হইলে রাজন্যবৃন্দ-পরিবৃত সভায় প্রকাশ্য দিবালোকে অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারা দ্রৌপদী আনীতা ও অবমানিতা হইয়াছিলেন। এই দ্যূতক্রীড়াই সেই মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ, বহুলোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ নিগমের আদিভূত প্রণব, এই আখ্যা প্রদান করিলেও অত্যুক্তি দোষ হয় না। §

* অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাং।
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা হস্রেব নি রিণীতে অপ্সঃ॥

† শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেহহনি ভূপতে॥
তস্মাদ্দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ। তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য
সম্বৎসরঃ শুভঃ।

পরাজয়ে বিরুদ্ধস্তু লব্ধ-নাশকরো ভবেৎ।

‡ আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু চরেজ্জাগরণং নিশি। কৌমুদী নিশাচন্দ্রো আক্ষৈর্জাগরণং করেৎ॥

§ যাস্যমেতাং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
তপ্যসে তাং হরিষ্যামি দ্যূতেন জয়তাং বর॥
আহূয়তাং পরং রাজন্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
মা সংশয়ং গমোহি ত্বমবুদ্ধা চ চমূমুখে॥
অক্ষান্ ক্ষিপন্নক্ষতঃ সন্ বিদ্বান বিদুষো জয়েৎ।
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্তরং।

বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতচর্য্যার জন্য যখন যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন 'অক্ষদক্ষ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। * কিরূপ গুটিকা সকল কার্য্যকর হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় দিয়া † বলিয়াছিলেন যে, বৈদূর্য্য-কাঞ্চন-দন্ত-নির্ম্মিত কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের গুটিকা সকল প্রস্তুত করিত। ইহাতে দেখা যায়, খেলার জন্য লোকে বহু ব্যয় করিয়া গুটি প্রস্তুত করিত।

অধিক আনন্দকালেও দ্যূতক্রীড়া হইত; যথা, কুরুগণের সহিত যুদ্ধজয় করিয়া আসিলে সমস্ত বিত্ত দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য বিরাট প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ‡ অসামান্যগুণসম্পন্ন নিষধপতি নলও পুষ্করের সহিত দ্যূতে সর্ব্বস্ব হারাইলেন। পুষ্কর দময়ন্তীকে পণ রাখিবার জন্যও বলিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, কদাচিৎ পত্নী পর্য্যন্ত পণ রাখিবার প্রবৃত্তি হইত, দ্যূতের নেশা এমনই ভয়ঙ্কর। §

মৃচ্ছকটিক নাটকে দ্যূতের ভাষা ও দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা দ্যূতপরায়ণ দর্দ্দুরক বলিয়াছেন,—দ্যূতক্রীড়া মানবের অসিংহাসন রাজ্যস্বরূপ, কোনও স্থানেই পরাভূত হয় না। নিত্যই অর্থদান গ্রহণ হইতেছে। ধনলোভী ব্যক্তিগণ রাজার ন্যায় দ্যূতকরের উপাসনা করেন। ত্রীয়া (তিন সাত এগার) দান-পতনে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। ছয়া (দুই ছয়দশ) পতনে শরীর শোষণ হইয়াছে। কট (চারি আটবার) পতনে মারা গিয়াছি। নান্দী (এক পাঁচ নয়) দান পড়ায় পণদানে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতেছি। ¶

---

* অক্ষান্ প্রযোক্তুং কুশলোঽস্মি দেবিতা
কঙ্কেতি নাম্নাস্মি বিরাট বিশ্রুতঃ।

† বৈদূর্য্যান্ কাঞ্চনান্ দান্তান্ ফলৈঃ জ্যোতীরসৈঃ সহ।
কৃষ্ণাক্ষান্ লোহিতাক্ষাংশ্চ নির্বর্ত্স্যামি মনোরমান্।

‡ স্ত্রিয়ো গাবো হিরণ্যঞ্চ যচ্চান্যদ্বসু কিঞ্চন। ন মে কিঞ্চিত্ত্বয়ারক্ষ্যমন্তরেণাপি দেবিতুং॥

§ দ্যূতে প্রবর্ত্ততাং ভূয়ঃ প্রতিপাণোঽস্তি কস্তব। শিষ্টা তে দময়ন্ত্যেকা সর্ব্বমন্যজ্জিতং ময়া॥
দময়ন্ত্যাঃ পণঃ সাধু বর্ত্ততাং যদি মন্যসে।

¶ দ্যূতং হি নাম পুরুষস্যাসিংহাসনং রাজ্যং কুতঃ
ন গণয়তি পরাভবং কুতশ্চিৎ হরতি দদাতি নিত্যমর্থজাতং।
নৃপতিরিব নিকাম মায়দর্শী সমুপাস্যতে বিভববতা জনেন॥
ত্রেতা হৃতঃ সর্ব্বস্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোষিতশরীরঃ।
মর্দ্দিতঃ দর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি॥

আর এক স্থানে দেখা যায় যে, পরাজিত পণদানভয়ে লুক্কায়িত দ্যূতলব্ধ সংবাহকের মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন যে, ঢক্কাশব্দে যেমন রাজ্যহীন রাজার হৃদয় হরণ করে, তদ্রূপ কত্তা (কাসু) শব্দে নির্দ্ধনের হৃদয় হরণ করে। সুমেরুশিখর পতনসম দ্যূতক্রীড়া আর করিতে পারিব না জানিলেও কোকিল মধুর কত্তা শব্দে মনোহরণ করে। *

পরে এই সংবাহক পণদানে অসমর্থ হইয়া পণ্যাঙ্গনার প্রসাদে পণ দান করিয়া নিতান্ত অপমান বোধ হওয়াতে সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ-সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের শিরোমণিস্বরূপ গদ্যকাব্য কাদম্বরীর নায়ক চন্দ্রাপীড়ের দ্যূতাভ্যাস-কথা লিখিত আছে, এবং দশকুমারচরিতে সমাহ্বয় নামক দ্যূত-ক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যের নিয়মে জানা যায় যে, ধূর্ত্তকিতব প্রতিবারে শতপণের কম পণ রাখে না। সভিক অর্থাৎ দ্যূতসভাধ্যক্ষ তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি শতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে। রাজা সেই দ্যূতসভাধ্যক্ষ কিতবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। সভিকও রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ দান করিবেন। দ্যূতকরদিগের জয়লব্ধ বস্তু জিতের নিকট হইতে আদায় করিবেন। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিকযুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্তসমাজে পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন। † রাজা কতকগুলি ভৃত্য-কেই দ্যূতক্রীড়ার জয়-পরাজয়-নির্ণেতা সভ্যরূপে, কতকগুলি ভৃত্যকে সাক্ষিরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বপদাদি-চিহ্নিত করিয়া

---

* অলে! কত্তা শদ্দে ণিণাণঅস্স হলই হড়অং মণুস্সস্স
ঢক্কাশদ্দে ব্ব ণড়াধিবস্স পব্ভট্ঠ লজ্জস্স।
জাণামি ণ কীলিস্সং শুমেলু-শিহল পড়ণ শণিহং জুদং
তহ বিহু কোইল মহুলে কত্তা শদ্দে মনং হলদি।

গৃহে সভিকমুদ্ধৃত্য সভিকং পঞ্চকং শতং। গৃহীয়াদ্ ধূর্ত্তকিতবা দিতরাদ্দশকং শতং।

† স সম্যক্ পালিতো দদ্যাৎ রাজ্ঞো ভাগং যথাকৃতং।
জিতমুদ্গ্রাহয়েজ্জেত্রে দদ্যাৎ সত্যবচঃ ক্ষমী।
প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে প্রসিদ্ধধূর্ত্তমণ্ডলে।
জিতং স সভিকস্থানে দাপয়েৎ নিশ্চয়ঃ।

রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। রাজা এক ব্যক্তিকে দ্যূতসভাধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণিদ্যূতেও এই বিধি উক্ত আছে।* মনু বলেন যে, রাজা মনোযোগসহকারে রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিবেন। দ্যূত ও সমাহার, এই দুইটি দোষ রাজগণের রাজ্যের হানিকর। ইহা প্রকাশ্য চৌর্য্য। অতএব প্রতিবিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অক্ষশলাকাদি অপ্রাণি দ্রব্য দ্বারা ক্রীড়াকে দ্যূতক্রীড়া বলে। মেষকুক্কুটাদি প্রাণী দ্বারা ক্রীড়ার নাম সমাহ্বয়। যে ব্যক্তি দ্যূত বা সমাহ্বয় নিজে করে, বা অন্য দ্বারা করায়, রাজা উহাদের সকলেরই বৃত্তচ্ছেদাদি প্রাণিবধ পর্য্যন্ত সকল দণ্ড করিতে পারিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয় কর্ত্তা নট প্রভৃতিকে পুরে বাস করিতে দিতে নাই। এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার বঞ্চনাদি দ্বারা ভদ্র প্রজাদিগের নানারূপ পীড়া জন্মায়। দ্যূত মহা অনর্থের মূল। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ পরিহাসচ্ছলেও দ্যূতবশ হইবেন না।†

বিষ্ণু-সূত্রের মতে, কূটাক্ষদেবীর (যাহাদের পাশায় ইচ্ছানুরূপ দান পড়ে) করচ্ছেদ দণ্ড। মন্ত্রৌষধির সাহায্যে গৃহীতা অক্ষদেবীর অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ দণ্ড।‡ নারদের মতেও, দ্যূত ও সমাহ্বয়ের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।§

দ্যূতক্রীড়া নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তথাপি ইহার প্রচলন থাকার কারণ কি? এবং শাস্ত্রতঃ দ্যূতক্রীড়ার বিধান থাকারই বা অর্থ কি? যুধিষ্ঠির, নল

---

* দ্রষ্টারো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এব হি। রাজা সচিহ্নং নির্ব্বাস্যা কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ॥
দ্যূতমেকমুখং কার্য্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ। এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে॥

† দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবর্ত্তয়েৎ। রাজান্তঃকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং॥
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ। তয়োর্নিত্যং প্রতিঘাতে নৃপতি র্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভি র্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে। প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েচ্চ বা। তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা সর্ব্বাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥
দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ। তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্।—৯।২২১।২২৫

‡ দ্যূতে কূটাক্ষদেবিনাং করচ্ছেদঃ। উপাধিদেবিনাং সন্দংশচ্ছেদঃ।—৫।১০০।১০৪

§ অক্ষ ব্রধ্র শলাকাদ্যৈ র্দেবনং জিহ্মকারিতং। পণক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং দ্যূতং সমাহ্বয়ং॥

প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণও কেন ঈদৃশ কুকার্য্যে রত হইয়াছিলেন? এই সকলের কারণ সম্প্রতি অনুসন্ধান করা যাউক। কোজাগরী পূর্ণিমায় দ্যূত অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই। দ্যূত-প্রতিপদেও দ্যূতক্রীড়া না করিলে কোনও পাপশ্রুতি নাই। অতএব তাহা না করিলেও দোষ হয় না। তবে যাহারা দ্যূতাভিলাষসংযমনে অশক্ত, তাহারা এই দুই দিনও সাবধান হইয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে পারেন।

বুঝি বা অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী-সেনা-সম্মিলিত সমরাঙ্গণে অপূর্ব্ব রণকৌশলে বহুলোকক্ষয়কর মহামারীর বীজাণুর ন্যায় অথবা ধূমকেতুর উদয়ের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের এই দ্যূতপ্রবৃত্তি হইয়াছিল।

দময়ন্তী-স্বয়ংবরে ব্যর্থমনোরথ কলির প্রভাবে নল দ্যূতাসক্ত হইয়াছিলেন। আর, বেদের দ্যূতক্রীড়ার কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহার অবাধ প্রচলন ছিল না, জীবিকার জন্য বিধবা কদাচিৎ এই পথে যাইত।

রাজন্যবর্গের দ্যূতাভ্যাসে কদাচিৎ স্বার্থসাধনের সুযোগ সংঘটিত হইত। তাহার নিদর্শন দশকুমারচরিতের অপহারবর্ম্মচরিতে দেখা যায়।

মনু দ্যূত সম্বন্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কঠোর নিষেধ না থাকিলে সে কার্য্যের প্রচলন থাকিতে বাধা হয় না। চৌর্য্য প্রভৃতি নিন্দিত কর্ম্ম চিরদিনই সকল সমাজে সর্ব্বশাস্ত্রমতে দূষণীয়, তথাপি ইহার প্রচলন সর্ব্ব দেশেই বিদ্যমান আছে। এই প্রকার দ্যূত নিষিদ্ধ হইলেও তাহার বিলোপসাধন হইতে পারে নাই।

আমরা উপসংহারে বলিতেছি যে, পণপূর্ব্বক ক্রীড়াই দ্যূতক্রীড়া; তাহারই নিন্দাশ্রুতি আছে; তাহাতেই লোকের ধন মান নষ্ট হইয়া থাকে। সময়-যাপনের জন্য কর্ম্মক্লান্ত শরীরের একটু বিশ্রামলাভের জন্য কোনও পণ না রাখিয়া পাশা দাবা খেলা তেমন দোষের হয় না। যেহেতু ইহাতে সর্ব্বনাশ সাধিত হয় না।

চতুরঙ্গ ক্রীড়ার নিয়মও মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনা দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাহি যে, দ্যূত-ক্রীড়া বহুকাল যাবৎ ভারতে প্রচলিত আছে। অন্যের অনুকরণ করিয়া প্রচলিত হয় নাই।

শ্রীদুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ।

মূষিকাদি।

দন্তুরবর্গীয় জন্তুদিগের মধ্যে মূষিকবংশীয় জন্তুগণই সংখ্যায় অধিক, এবং বহু প্রকারের দেখা যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই বংশীয় জন্তুর বাস। এই বংশের প্রায় সকল জাতীয় জন্তুই মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। অধিকাংশেরই লেজ লম্বা, শল্কযুক্ত ও লোমহীন, এবং প্রায় সকলেরই পিছনের ও সামনের পা সমান লম্বা হয়। ইহাদের ছেদনদন্ত খুব সরু ও বর্দ্ধনশীল; প্রত্যেক মাড়ীতে তিন যোড়ার বেশী চর্ব্বণ-দন্ত থাকে না। প্রায় সকলেরই সম্মুখের পায়ের প্রথম বা বুড়া আঙ্গুল লুপ্তপ্রায়, পিণ্ডবৎমাত্র বিদ্যমান থাকে।

এই বংশীয় জন্তুগণ আটত্রিশটি 'গণে' ও প্রত্যেক 'গণ' বহু 'জাতি'তে বিভক্ত। এই সকল 'গণে'র মধ্যে মূষিক বা ইন্দুর, জেব্‌রিল, হ্যাম্‌ষ্টার, ভোল্, লেমিং ও মস্কোয়াস্ প্রধান।

ইন্দুরের শরীরের গড়ন হাল্‌কা ও সুঠাম। শরীরের তুলনায় কাণ ও চোখ বেশ বড়। কাণের বাহির দিক লোমশূন্য। চোখ দুটী গোল গোল, ভাসা ভাসা ও উজ্জ্বল। মুখ লম্বা, সরু ও সুচাল। মুখাগ্র লোমশূন্য। লেজ লম্বা, গ্রন্থিল, লোমশূন্য, আঁইস বা শল্কযুক্ত। দেহের বর্ণ একরঙ্গা, ধূসর, বা মেটে।

ইহারা নিশাচর। সাপ, বেজি, চিল, শকুনি প্রভৃতি দেখিতে পাইলেই ইহাদিগকে নষ্ট করে; এই জন্য ইহারা দিনের বেলায় বাহির হয় না। রাত্রি-কালে প্যাঁচা ছাড়া অন্য শত্রুর হাতে বড় একটা পড়িতে হয় না, তাই রাত্রি-কালে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। ইহারা সর্ব্বভুক্। শস্য ও ফল মূল ত খায়-ই, তা ছাড়া মাছ মাংসও খায়। ইহাদিগকে পাখীর ছোট ছোট ছানা ও ডিম খাইতেও দেখা যায়।

শস্যক্ষেত্র, বাগান, মানুষের বাসগৃহ, গোলা, জাহাজ প্রভৃতি যে সব স্থানে সর্ব্বদা প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী থাকে, সেই সব যায়গায় ইন্দুর বাস করে। ইহারা বৎসরে তিন চার বার সন্তান প্রসব করে, এবং প্রত্যেক বারে অনেকগুলি ছানা জন্মে। অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে, ইহারা মানুষের বড়ই ক্ষতিকর হইয়া উঠে। তখন ইহাদের বিনাশের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ইন্দুর বা মূষিকগণের এক শত পঞ্চাশ 'জাতি'র পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক ভারতবর্ষেই প্রায় চল্লিশ জাতীয় মূষিক দেখা যায়।

প্রাচীন ভূখণ্ড অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা দেশে মূষিকের বাস। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মূষিক ছিল না। আজ কাল আমেরিকায় অনেক বন্দরে বিস্তর মূষিক দেখা যায়। ইহারা বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া নীত হইয়াছে, আদিম নিবাসী নহে। শস্যপূর্ণ বাণিজ্য-জাহাজ এ দেশের কোনও বন্দরে কিছু দিন থাকিলে, সেই বন্দরের অনেক ইন্দুর শস্যের লোভে সেই জাহাজে গিয়া আশ্রয় লয়। অল্প কালেই সেই জাহাজে তাহাদের বাচ্চা জন্মিয়া পাল বাড়িয়া যায়। পরে সেই জাহাজ সমুদ্রপথে দূর দেশের কোনও বন্দরে উপস্থিত হইলে অনেক ইন্দুর সেই জাহাজ হইতে তীরে নামিয়া যায়, অথবা শস্যের বস্তার সহিত তীরে নীত হয়, এবং সেই বন্দরে আশ্রয় লইয়া তথায় তাহাদের বংশবিস্তার করে। এই কারণে যে সকল দেশে পূর্ব্বে মোটেই ইন্দুর ছিল না, আজ কাল সে সব দেশেও অনেক ইন্দুর দেখা যায়।

ইন্দুর ছোট ও বড় দুই রকমের হয়। ছোট রকমের ইন্দুরদের নেংটে বা নিংটা ইন্দুর বলে; আর বড় রকমের ইন্দুরদের ধেড়ে ইন্দুর বলা যাইতে পারে।

বড় বা ধেড়ে ইন্দুরদের দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের ধেড়ে ইন্দুর লোকের বাসগৃহে ও শস্যের গোলায় গর্ত্তে বাস করে। ইহাদিগকে গৃহমূষিক বা ঘোরো ইন্দুর বলা যায়। আর এক দলের ধেড়ে ইন্দুর আছে; তাহারা মাঠে ও শস্যক্ষেত্রে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। ইহাদিগকে ক্ষেত্রমূষিক বা মেঠো-ইন্দুর বলা যায়।

ক্ষেত্রমূষিক আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়। মাথার হাড়ের দীর্ঘতা, চোখের নীচের হাড়ের উচ্চতা, এবং শরীরের পরিমাণে লেজের দীর্ঘতা অনুসারে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

এশিয়া প্রদেশের বড় বড় মেঠো-ইন্দুর প্রধানতঃ তিন দলের দেখা যায়।

প্রথম দলের মেঠো-ইন্দুরগুলি খুব বড় বড় হয়। তাদের গায়ের লোম কর্কশ ও শক্ত, মাথার খুলি লম্বা ও সরু, লেজ দেহ ও মুণ্ডের সমান দীর্ঘ, পা চারিখানিও বেশ বড় বড়। ইহাদের স্ত্রীজাতির ছয় যোড়া বা বারটি স্তন থাকে। দাক্ষিণাত্যের কাণাড়ী ভাষায় ইহাদের নাম 'পাণ্ডিকোক্কু' বা শূয়রে-ইন্দুর; তাহা হইতে ইংরাজিতে 'ব্যাণ্ডিকুট্' নাম হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'ইন্দুরে' বলে।

দ্বিতীয় দলের মেঠো-ইন্দুর আকারে পূর্ব্বোক্ত দলের ইন্দুর অপেক্ষা

একটু ছোট হয়। তাদের লেজ, শরীর ও মুণ্ডের দৈর্ঘ্যের ⅞ হয়। তাহাদের স্ত্রীজাতির বুক হইতে তলপেট পর্য্যন্ত আট যোড়া বা যোলটি স্তন থাকে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'গুনোমিস্' অর্থাৎ 'বহুপ্রসূ' বলে; কারণ, ইহাদের এক এক বারে আটটা হইতে বারটা করিয়া ছানা জন্মে।

তৃতীয় দলের মেঠো-ইন্দুর পূর্ব্বোক্ত দুই দলের ইন্দুর অপেক্ষা ছোট হয়। তাহাদের লেজ, শরীর ও মুণ্ডের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক হয়। সম্মুখের কর্ত্তন-দন্ত অধিকতর চ্যাটাল, এবং কষের চর্ব্বণ-দন্ত অধিকতর বড় হয়। স্ত্রীজাতির বুকে দুই যোড়া ও পেটে দুই যোড়া, মোট চার যোড়া বা আটটি স্তন থাকে। ইহাদের এক একবারে দুইটা হইতে চারিটা বাচ্চা জন্মে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'নেসোকিয়া' বলে।

ব্যাণ্ডিকুটের গায়ের লোম কর্কশ; মাথা, গলা ও দুই পাশের লোম কোমল। গায়ের উপর দিকের রঙ্গ মেটে; পেটের দিক ধূসর; নাক, কাণ, পায়ের পাতা লাল্চে। লেজ কাল, তাতে লোম থাকে না; থাকিলেও দু'চারি গাছি মাত্র। ইহাদের দেহ ও মুণ্ড ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চ, এবং লেজ ১২ কি ১৩ ইঞ্চ লম্বা হয়। ওজনে এক একটা দেড় সের ভারি হয়। ইহারা গোলার শস্য, বাগানের ফল মূল ও হাঁস, মুর্গীর ছানা ও ডিম খাইয়া লোকের বড় ক্ষতি করে। কলিকাতার গড়ের মাঠে ও অন্যত্র বড় বড় পুকুরের পাড়ে গর্ত্তে ব্যাণ্ডিকুট বাস করে। বঙ্গে অন্যত্র বিরল। বোম্বাই প্রদেশে ব্যাণ্ডিকুট কদাচিৎ দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে যে সব ব্যাণ্ডিকুট দেখা যায়, তাহারা বাঙ্গালা দেশের ব্যাণ্ডিকুট অপেক্ষা একটু বড় হয়। মান্দ্রাজ নগরে ব্যাণ্ডিকুট এত অধিক দেখা যায় যে, সেখানে লোকেরা প্রত্যহ লাঠীর আঘাতে এক শতেরও অধিক বিনাশ করে। খুব বড় বলিয়া ইন্দুর-ধরা কলে ধরা যায় না, ঠেঙ্গাইয়া মারিতে হয়। মান্দ্রাজে ইহারা ঘরের ভিতর বড় একটা বাস করে না; ড্রেণ, নর্দ্দমা, গোয়াল-ঘর ও আস্তাবলে বাস করে।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় ব্যাণ্ডিকুট দেখা যায়; তাহারা আকারে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় অপেক্ষা একটু ছোট হয়। তাহাদের পা বড় ও চরণতল অধিকতর চ্যাটাল; গায়ের রঙ্গ লাল্চে মেটে, পেটের রঙ্গ সাদাটে; নাক, কাণ, চরণ লালাভ; কর্ত্তন-দন্ত নারাঙ্গী, নখ হল্‌দে। ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি বড় ব্যাণ্ডিকুটেরই মত।

গুনোমিস্ ইগ্‌ড়ে উত্তর ভারতবর্ষের গাজিপুর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও কাছাড়

পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কলিকাতায় অনেক আছে। ইহাদের দেহ ও মুণ্ড ৮½ ইঞ্চ, লেজ ৬½ ইঞ্চ লম্বা; গায়ের রঙ্গ মেটে; নাক, কাণ ও চরণ লাল্‌চে; লেজ লোমশূন্য, গোঁফের লোম বড় বড় ও কাল। ইহারা মাঠে ও বাগানে, গর্ত্তে বাস করে, এবং ক্ষেতের শস্য খাইয়া লোকের বড় ক্ষতি করে।

এই সব ক্ষেত্র-মূষিক ও গৃহ-মূষিক, সকলকেই এক 'গণে'র (genus) মনে করা হইত; কিন্তু আজ কাল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ব্যাণ্ডিকুট, গুণোমিস্, নেসোকিয়া ও ইন্দুরকে ভিন্ন ভিন্ন 'গণে' বিভক্ত করিয়াছেন।

বড় ইন্দুর বা গৃহ-মূষিক দুই প্রকারের দেখা যায়। এক জাতির রঙ্গ কাল; অপর জাতির রঙ্গ পিঙ্গল বা মেটে। এই দুই জাতির প্রভেদ এই যে, মেটে ইন্দুরের শরীরের গড়ন স্থূল, মুখাগ্র মোটা, কাণ ও লেজ ছোট। লেজের দৈর্ঘ্য, মুণ্ড ও দেহের দৈর্ঘ্যের সমান, বা কিছু কম। দেহ ৮ হইতে ১০ ইঞ্চ, লেজ ৭ হইতে ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। শরীরের উপর দিকের রঙ্গ ধূসর বা মেটে, পেটের দিকের রঙ্গ সাদা। কাল ইন্দুর অপেক্ষা মেটে ইন্দুর অধিকতর বলবান।

কাল ইন্দুর মেটে ইন্দুর অপেক্ষা কিছু ছোট হয়। কিন্তু দেখিতে বেশী সুন্দর। ইহাদের শরীরের গড়ন হাল্‌কা, লেজ শরীরের অনুপাতে বড়; দেহ ও মুণ্ড ৭ ইঞ্চ, লেজ ৮ হইতে ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়; মুখাগ্র লম্বা ও সরু; নাসাগ্র নীচের চোয়াল ও অধর হইতে অনেকখানি বাহির হইয়া থাকে। ইহাদের রঙ্গ নীলাভ কাল। মেটে ইন্দুর অপেক্ষা ইহারা অনেক দুর্ব্বল।

ইংরাজিতে কাল জাতীয় ইন্দুরকে 'ব্ল্যাক্‌র‍্যাট্' বলে। বৈজ্ঞানিক নাম 'মুস্‌র‍্যাটাস্'। মেটে জাতীয় ইন্দুরকে ইংরাজিতে বলে 'ব্রাউন র‍্যাট', বৈজ্ঞানিক নাম 'মুস্ ডেকুমেনস্'।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কাল ইন্দুর বা 'র‍্যাটাস্'এর রঙ্গ কালই দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই জাতীয় ইন্দুর অর্থাৎ 'মুস্‌র‍্যাটাস্' কোনও কোনওটা কাল, কোনও কোনওটা মেটেও হয়। কোনও কোনও মেটে রঙ্গের র‍্যাটাস্ ইন্দুরের পেটের রঙ্গ ধব্‌ধবে সাদা হয়। মেটে জাতীয় ডেকুমেনস্ ইন্দুরের সঙ্গে ইহাদের রঙ্গের কোনও প্রভেদ নাই। কেবল আকার, শরীরের ও মুখের গড়ন, এবং শরীরের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য দেখিয়া কোন্‌টা কোন্ জাতীয় ইন্দুর, তাহা ঠিক করা হয়।

স্থানভেদে সকল জাতীয় ইন্দুরেরই আকার ও রঙ্গের তারতম্য ঘটে। কাশ্মীর, নেপাল, নাইনিতাল প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশের ইন্দুরের গায়ের লোম অধিকতর ঘন ও কোমল হয়, তাহাদের লেজও অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, পেটের তলায় রঙ্গ সাদা হয়, কোনও কোনটার লেজটাও সাদা হয়; গায়ের উপরের রঙ্গ লাল্‌চে, মেটে, বা ধূসর হয়। স্থানভেদে বর্ণভেদ হওয়ায় একই জাতীয় দুইটি ইন্দুরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলিয়া ভ্রম হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কাল জাতীয় বা র‍্যাটাস্‌ ইন্দুর অপেক্ষা মেটে জাতীয় বা ডেকুমেনস্‌ ইন্দুর অধিক হিংস্র ও বলবান। পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কাল জাতীয় ইন্দুরই ছিল। পরে এশিয়া দেশ হইতে মেটে জাতীয় ইন্দুর ইউরোপে প্রবেশ করে। কথিত আছে যে, ১৭২৭ খৃঃ দলে দলে মেটে ইন্দুর মধ্য-এশিয়া হইতে আসিয়া ভল্‌গা নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া রুসিয়া ও তাহার পশ্চিমের দেশসমূহে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের প্যারি নগরে এই জাতীয় ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম দেখা যায়। ইহারা যে দেশে একবার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই দেশেই অল্প সময়ের মধ্যে বংশবিস্তার করিয়াছে। অধিকতর বলবান ও হিংস্র বলিয়া ইহারাই কালক্রমে কাল জাতীয় ইন্দুরের স্থান অধিকার করে। আজ কাল ইংলণ্ডে কাল জাতীয় ইন্দুর বিরল।

ভারতবর্ষে মেটে জাতীয় অর্থাৎ ডেকুমেনস্‌ ইন্দুর সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর-গুলিতেই দেখা যায়। সমুদ্রকূল হইতে দূরে ভারতবর্ষের মাঝখানের কোনও নগরে বা গ্রামে আজও মেটে জাতীয় ইন্দুর প্রবেশ করে নাই। এলাহাবাদ ও কাণপুর দুটি খুব বড় নগর, নদীর ধারে। এখানে বিদেশ হইতে শস্যপূর্ণ অনেক বড় বড় নৌকা আইসে। এই দুই নগরে প্লেগের সময়ে লোক নিযুক্ত করিয়া, পয়সা দিয়া, হাজার হাজার ইন্দুর মারা হইয়াছিল। সেই সব ইন্দুর কোন্‌ কোন্‌ জাতীয়, তাহার পরীক্ষাও হইয়াছিল। তাহাদের সকলেরই রঙ্গ মেটে হইলেও, একটাও ডেকুমেনাস্‌ বা মেটে জাতীয় ইন্দুর নহে, সবগুলিই মেটে রঙ্গের কাল জাতীয়, বা র‍্যাটাস্‌ ইন্দুর। ভারতবর্ষে র‍্যাটাস্‌ ইন্দুর গাছে ও ঘরের চালেও বাসা করে।

বোম্বাই ও কলিকাতা নগরে অনেক মেটে রঙ্গের ডেকুমেনাস্‌ ইন্দুর দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই ড্রেন ও নর্দ্দমার ভিতরে, গোয়াল-ঘর ও আস্তাবলের পাশে ও শস্যের গোলায় থাকে। ইহাদিগকে লোকের বসত-

বাড়ীতে বাস করিতে প্রায় দেখা যায় না। লোকের বাড়ীতে মেটে রঙের র‍্যাটাস্ ইন্দুরেরই বাস। ভারতবর্ষে ডেকুমেনস্ ইন্দুরের স্বভাব প্রকৃতি অনেকটা মেঠো-গুনোমিস্ ইগ্ড়ের মত।

মান্দ্রাজে কিন্তু ডেকুমেনস্ ইন্দুর নাই। সেখানে 'ব্যাণ্ডিকুট' একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

ইউরোপে ডেকুমেনস্ ইন্দুর সর্ব্বত্রই অনেক দেখা যায়। এক এক সময়ে ইহাদের দল এত অধিক হইয়া পড়ে যে, তাহাদের উপদ্রবে লোকের খাদ্য-সামগ্রী রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহারা সর্ব্বভুক্—শস্য, ফলমূল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য ছাড়া টাট্কা বা পচা মাছ মাংসও খায়। ক্ষুধার জ্বালায় সময়ে সময়ে জীবন্ত মানুষকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না।

রবার্ট ষ্টিভেন্‌সন্ বলিয়াছিলেন যে, একবার তাঁর কয়লার এক খনির মধ্যে, পাথুরে কয়লা কাটিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া আনিবার জন্য, কয়েকটা ঘোড়া রাখা হইয়াছিল। ঘোড়াদের খাইবার জন্য দানা বস্তা-বন্দি করিয়া খনির মধ্যে রাখা হইত। দানার লোভে কতকগুলি ইন্দুর সেই খনির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের বংশ খুব বাড়িয়া যায়। পরে কিছু দিনের জন্য খনির কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং ঘোড়াগুলিকে উপরে তুলিয়া আনা হয়। কিছুকাল পরে পুনরায় খনির কাজ আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হয়। তখন এক দিন এক জন লোক প্রথমে খনির মধ্যে প্রবেশ করে। খনিতে নামিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষুধার্ত্ত ইন্দুরের দল তাহাকে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। লোকটা মরিয়া গেল। কয়েক ঘণ্টা পরে অপর লোকেরা নামিয়া দেখে যে, তাহার হাড়'ক'খানিমাত্র পড়িয়া আছে। ইন্দুরেরা তাহার সব চামড়া মাংস উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

প্যারি নগরে বড় বড় ড্রেন বা ঢাকা নর্দ্দমা যে সব লোক পরিষ্কার করিতে যায়, তাহাদের অনেকে মাঝে মাঝে ঐরূপ ইন্দুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ শুনা গিয়াছে।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্যারি নগরে একবার এত বেশী ইন্দুর হইয়াছিল যে, সে বৎসর এক রাত্রিতে দুই হাজার ছয় শ' পঞ্চাশটা ইন্দুর মারা হইয়াছিল। এক মাসের মধ্যে ষোল হাজারেরও অধিক ইন্দুর মারা হয়।

ইন্দুরী বৎসরে তিন চার বার সন্তান প্রসব করে, এবং এক এক বারে তাহার আটটা দশটা বাচ্চা জন্মে। এই জন্য ইহাদের সংখ্যা অল্পকালের মধ্যেই অনেক হইয়া পড়ে।

ইন্দুর যেমন শস্যাদি খাইয়া ফেলিয়া লোকের ক্ষতি করে, তেমনই আবার আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করিয়া উপকারও করে। পথ ঘাট নর্দ্দমা পরিষ্কারক ধাঙ্গড়েরা যে কাজ করে, ইন্দুরও অনেকটা সেই কাজই করে। বাড়ীর বাহিরে যে স্থানে লোকে জঞ্জাল ফেলিয়া দেয়, যে নর্দ্দমাতে বাড়ীর ভাত ফেন, পচা ব্যঞ্জন, মাছ মাংস গিয়া পড়ে, ইন্দুরেরা সেই সব স্থানে বাস করে, আর সেই সব উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত পচা দুর্গন্ধ বস্তু খাইয়া ফেলিয়া লোকের অনেকটা উপকার করে।

ইহাদের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। খাদ্যসামগ্রী কোথায় আছে, ইন্দুরেরা সহজেই টের পায়। জাহাজ বা নৌকায় শস্য প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য থাকিলে ইন্দুরেরা তাহা জানিতে পারে। যে রশি বা শিকল দ্বারা নৌকা বা জাহাজ ঘাটে বাঁধা থাকে, ইন্দুরেরা সেই রশি বহিয়া নৌকায় বা জাহাজে যায়। ইহারা বেশ সাঁতরাইতেও পারে। অনেক সময় ইন্দুরকে খাল ও ছোট ছোট নদী সাঁতরাইয়া পার হইতে দেখা গিয়াছে।

দন্তুরবর্গের অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইন্দুরেরাও দলবদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। খাদ্যের অভাব, সন্তান-প্রসবের অসুবিধা, মানুষ বা অন্য জন্তুর অত্যাচার ইহাদের স্থানপরিবর্ত্তনের মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ইন্দুরের পিছনের পায়ের গড়ন এমন যে সে ইচ্ছা করিলে পিছনের পায়ের পাতা পিছন দিকে ঘুরাইয়া দিতে পারে। এইরূপ ক্ষমতা থাকায় ইন্দুর অক্লেশে নীচের দিকে মুখ করিয়া দেয়াল, থাম, লোহার শিক বা গাছ বাহিয়া গড়ানিয়া ভাবে নামিতে পারে ; পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না।

ইন্দুরের বুদ্ধিকৌশল অদ্ভুত। ইহারা অতি কৌশলে ঝুড়ির ভিতর হইতে ডিম চুরী করিয়া লয়। একটা ইন্দুর ঝুড়ি বাহিয়া উঠিয়া ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, এবং সম্মুখের দুই পা দিয়া একটা ডিম আপন বুকে চাপিয়া ধরে,এবং পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে ঝুড়ি বাহিয়া ঝুড়ির ধার পর্য্যন্ত উঠে। বাহিরে আর একটা সঙ্গী ইন্দুর থাকে, সে তখন বাহির দিক হইতে ঝুড়ি বাহিয়া উঠিয়া ভিতরের ইন্দুরের নিকট হইতে সেই ডিমটাকে নিজের দুই পা ও বুকে জড়াইয়া লয়, এবং পিছনের পায়ের সাহায্যে ঝুড়ি বাহিয়া নামিয়া আইসে। মাটিতে নামিয়া ডিমটাকে ঠেলিতে ঠেলিতে গড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায়। গড়াইবার অসুবিধা হইলে একটা ইন্দুর ডিমটাকে পা দিয়া বুকে চাপিয়া রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে, আর একটা ইন্দুর তাহার লেজ মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে

ডিমসুদ্ধ টানিতে টানিতে গর্ত্ত পর্য্যন্ত লইয়া যায়। পরে ডিমটাকে ঠেলিয়া গর্ত্তের মধ্যে গড়াইয়া দেয়।

সরুমুখ বোতলের নীচে তেল ঘি বা মধু থাকিলে, আর বোতলের মুখে ছিপি না থাকিলে, ইন্দুর বোতলের মধ্যে লেজ ঢুকাইয়া দেয়, লেজে তেল বা মধু লাগিয়া গেলে লেজ তুলিয়া লইয়া চাটিয়া খায়।

নিদ্রাকালে ইন্দুর শরীরকে কুণ্ডলী বা তাল পাকাইয়া শোয়। জন্মকালে বাচ্চাদের শরীর লোমশূন্য ও চোখ বোজা থাকে। তখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে, এবং মার দুধ খাইয়া বাঁচে। ক্রমে ক্রমে শরীরে লোম গজায়, এবং কয়েক দিন পরে চোখ ফোটে। তখন নিজেরাই ঘুরিয়া ফিরিয়া খাবার খুঁজিয়া খায়। পুং ইন্দুর সুবিধা পাইলে ক্ষুদ্র বাচ্চাদের খাইয়া ফেলে। কোনও কোনও ইন্দুরীকেও সময়ে সময়ে আপনার বাচ্চা খাইয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে।

সাধারণ মূষিক অপেক্ষা আকারে ছোট অনেক জাতীয় মূষিক ভারতবর্ষে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে এক জাতীয় ইন্দুর আছে, তাহাদের মাথা ও দেহ ৬ ইঞ্চ, লেজ ৫ ইঞ্চ লম্বা হয়। তাহাদের পিঠের দিকের রঙ্গ গাঢ় মেটে, পেটের দিকের রঙ্গ সাদাটে, শরীরের গড়ন স্থূল, চরণ সাদা। ইহারা ঘরের চালে বাসা করে, রাত্রিতে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গৃহস্থের ভাণ্ডারের খাবার খাইয়া ফেলে, বাগানের কন্দমূল খাইয়া নাশ করে। বাক্স, আলমারীর তক্তা কাটিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে। সময়ে সময়ে পঙ্গপালের মত অনেকগুলি এক সঙ্গে বাহির হইয়া ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে। ইহারা সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে গেছো-ইন্দুর দেখা যায়। ইহারা গাছে, বিশেষতঃ নারিকেল গাছে ও ঘরের চালে বাসা করিয়া থাকে। ইহাদের মাথা ও শরীর ৫½ হইতে ৭½ ইঞ্চ, লেজ ৬½ হইতে ৮½ ইঞ্চ লম্বা হয়। কোনও কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন, ইহারা ভিন্ন জাতীয় নহে, ইহারাও 'র‍্যাটাস্' ইন্দুর।

ভারতবর্ষে আর এক প্রকার গেছো-ইন্দুর দেখা যায়। তাহাদের মাথা ও শরীর ৩ ইঞ্চ ও লেজটা ৪½ ইঞ্চ লম্বা হয়। গায়ের পিঠের দিকের রঙ্গ গাঢ় বাদামী বা লাল্‌চে মেটে, পেটের দিক হরিদ্রাভ সাদা, পায়ের আঙ্গুলগুলি সাদা, পায়ের তলার রঙ্গ হল্‌দে। ইহারাও গাছে ও ঘরের চালে বাসা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ছোট রকমের মেঠো-ইন্দুর কয়েক জাতীয় দেখা যায়। সাঁওতাল

পরগণা, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে ইহাদিগকে খোলা মাঠে গর্ত্তে বাস করিতে দেখা যায়। ইহাদের গায়ের রঙ্গ পাঁশুটে, পেটের রঙ্গ সাদাটে।

আসামের চেরাপুঞ্জি প্রদেশে এক রকম ছোট মেঠো-ইন্দুর দেখা যায়। তাহাদের শরীর ২½ ইঞ্চ, লেজও ২½ ইঞ্চ লম্বা হয়; রঙ্গ গাঢ় মেটে। গায়ে ঘন কোমল লোম জন্মে। ইহাদের কাণ ½ ইঞ্চ লম্বা হয়।

ছোট সাধারণ গৃহ-মূষিক সকল বাড়ীতেই দেখা যায়। ইহাদিগকে নিংটা বা নেংটি ইন্দুর বলে। ইহাদের দেহ ও মুণ্ড ২ হইতে ৩ ইঞ্চ, এবং লেজ ৩ হইতে ৪ ইঞ্চ লম্বা হয়। ইহাদের চোখ বড় বড় ও উজ্জ্বল, কাল কাচের পুঁতির মত দেখায়। কাণও শরীরের তুলনায় বেশ বড়। লেজ লোমশূন্য। গায়ের রঙ্গ ধূসর, পিঠ ও পেটের দিকের রঙ্গ প্রায় একই রকম, তবে পেটের দিকের রঙ্গ একটু হাল্‌কা হয়। ইহারা এশিয়া মহাদেশের জন্তু, কিন্তু আজ কাল পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই নিংটা ইন্দুর দেখা যায়। ইহারা লোকালয়ে থাকিতে ভালবাসে, এবং মানুষের ঘরের মেঝেতে ও দেওয়ালে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বাস করে। গৃহস্থের ঘরের দুধ ছানা, নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ও চাল ডাল খায়। মাছ মাংস বড় একটা খায় না, তবে অন্য খাবার না পাইলে মাছ মাংসও খায়। অনেক সময়ে ধান ও ছোলার বস্তায়, নাড়ার গাদায় ধেড়ে ইন্দুর ও নিংটা ইন্দুরকে একত্র থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ইহারা ভারি চঞ্চলপ্রকৃতি ও ভীরুস্বভাব। দিনের বেলায় অন্ধকার নির্জ্জন ঘরে ও রাত্রিতে সকল ঘরে ঘুরিয়া খাবার খুঁজিয়া বেড়ায়। সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, একটু শব্দ শুনিলেই দৌড়িয়া গর্ত্তে ঢুকে, বা বাক্স পেটারা বা হাঁড়িকুড়ির আড়ালে লুকায়। বাচ্চা পাড়িবার সময়ে তুলা, নেকড়া, কাগজের টুকরা প্রভৃতি দিয়া কোমল বাসা তৈয়ার করে। বইএর আলমারী, কাপড়ের সিন্দুক বা বাক্স পেটরায় ফাঁক থাকিলে, তাহার ভিতর ঢুকিয়া, কাগজপত্র, কাপড়চোপড় কাটিয়া কুটি-কুটি করিয়া তাহা দিয়া বাসা তৈয়ার করিয়া সেই বাসায় বাচ্চা প্রসব করে। ইহাদের দৌরাত্ম্যে গৃহস্থের পুঁথিপত্র, কাপড় চোপড় কত যে নষ্ট হয়, তাহা বলা যায় না।

ইহারা খুব লাফাইতে পারে। একবার একটা নিংটাকে দশ ফুট উচ্চ আলমারীর মাথা হইতে মেঝের উপর লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে দেখিয়াছি। সোজা দেওয়াল বাহিয়া ও দড়ি বাহিয়া উঠিতে ইহারা খুব পটু। ইহারা বহুপ্রসূ; বৎসরে চার পাঁচ বার বাচ্চা পাড়ে, এবং এক একবারে চারিটা হইতে আটটা

পর্য্যন্ত বাচ্চা জন্মে। জন্মকালে বাচ্চাদের গায়ে লোম থাকে না, গায়ের চামড়া পাতলা ও লাল থাকে, চোখও বোজা থাকে।

অনেকে সাদা রঙ্গের নিংটা ইন্দুর পোষে। ইহারা বেশ পোষ মানে। সাদা ও কাল নিংটা একত্র পুষিলে, তাদের বাচ্চা সাদা ও কালয় মেশা বিচিত্র রঙ্গের হয়।

অনেক লোকে ধেড়ে ইন্দুর আর নিংটা ইন্দুরের মাংস খায়। আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও বিহার প্রদেশের 'কাহার' ও অন্য কোনও কোনও জাতি বড় ধেড়ে ইন্দুর পুড়াইয়া বা রোষ্ট করিয়া খায়। ভাগলপুরে আমাদের এক কাহার চাকর ছিল; আমাদের ইন্দুর-ধরা কলে যত ইন্দুর পড়িত, সেগুলি লইয়া সে চুলোয় ফেলিয়া পুড়াইয়া একটু তেল নুন মাখিয়া ভর্ত্তা করিয়া ভাতের সঙ্গে খাইত; বলিত, খেতে বেশ লাগে। চীন দেশের লোকেরা ইন্দুর মারিয়া শুকাইয়া রাখে। শুঁটকী মাছের মত তাহা রাঁধিয়া খায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

আমি রব না সে দিন।

মিতি নব নব কলি, এই লীলা-সরোবরে
চিরদিন ফুটাইবে হৃদয়-নলিন;
আমি শুধু রব না সে দিন!

রূপ রস গন্ধে ভরি, ধরায় অমরা ধরি,
বাজাবে সুরভি-মাখা বীণ;
আমি শুধু রব না সে দিন!

বরষি মধুর মধু, তখনো জাগিবে বিধু,
আমি শুধু রব না সে দিন!

হৃদয়ে ধরিয়া ইন্দু, তখনো ছুটিবে সিন্ধু,
আমি ক্ষুদ্র এক বিন্দু হইব বিলীন!

অতীত আঁধার ঘোরে রহিব কি তন্দ্রা-ঘোরে—
রহিব কি আজিকার স্বপনে নিলীন!

সে সব চাঁদের সুধা পিয়ে মিটাইতে ক্ষুধা
হৃদয়-চকোরী শুধু রবে না উড্ডীন।
আমি শুধু রব না সে দিন।

সুরভি-পাগল হিয়া, রবে কোথা ঘুমাইয়া,
নিবদ্ধ কোরক মাঝে ষট্‌পদ দীন;

জীবন-সায়াহ্নে আজি নবোদ্যমে তন্ত্রী মাজি
নবীন বসন্তে বাঁধি নব সুরে বীণ।

বাজো তবে শেষ বার প্রবাহি পীযূষধার
যাক্ ধুয়ে অন্তরের বাসনা মলিন।

ভাণ্ডার করিয়া খালি, শবদ-সম্পদ ঢালি
পূজে যাই প্রেম ছু'টি রাতুল চরণ;

এ তারে ও তারে ছুটি, বাজ বাজ নামি উঠি,
ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ রণন-ঝনন!

ফুরায়ে আসিছে দিন, ত্র-ত্র-তুঁ-গীন্ গীন্,
আসিছে প্রেয়সী-সন্ধ্যা অলক-ধূসর,

অকল লুটায় ধরা, সীমন্তে শোভিত তারা
আনত আনন শান্ত, নির্ব্বাক অধর।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে, মিলায়ে আসিছে ধীরে,
বিচিত্র জগৎ চারু গাঢ় তমসায়;
নব সুর বাজ রে বীণায়!

যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে চেয়ে ধীরে ধীরে
গেয়ে যাই বিদায়ের গান,
দিবস হতেছে অবসান!

দিবা কিবা শর্ব্বরীতে, এসেছিলে শূন্য হাতে,
তখন কি এনেছিলে কিছু ?
এবে গমনের বেলা, সাঙ্গ সব লীলা খেলা,
তবু কেন চাহিতেছ পিছু ?
ওরে মুগ্ধ, ওরে বীণ, ওরে প্রিয়, ওরে দীন,
ছেড়ে দে ও পূরবীর সুর !
দীপকে ভৈরবে ডাক, আঁধার টুটিয়া যাক্,
বসন্ত-প্রভাত সুমধুর।
বিশ্ব জুড়ে কোলাহল, তুই মুছে আঁখিজল
গৃহকোণে রহিবি কি দীন ?
দেখ চেয়ে প্রভাত নবীন।
এ কি এ মরণানন্দ, কেন ভেঙ্গে ছন্দোবন্ধ,
চল ছুটে—সুরে কি বেসুরে ;
উদারে মুদারে তারে, ঝঙ্কারিয়া বারে বারে
নবানন্দে গা রে প্রাণ পূরে।
অন্তঃপুরে নব রাগে ভারত-প্রকৃতি জাগে
এলায়িত কেশ নাহি বান্ধে ;
বসিয়া রন্ধনশালে আঁখি চাপি করতলে
ধুঁয়ার ছলনে নাহি কান্দে।
ভঁয় ভঁয় ঘন ঘোর বাজে শিঙ্গা, নিশা ভোর,
জাগিয়াছে মরণ-আহ্বান ;
লাগিয়াছে হুড়াহুড়ি, ছোটে অশ্ব দড়বড়ি,
কে আগে সঁপিতে পারে প্রাণ।
মোর স্বর্গ-শিশুগুলি তোমারে আকুলি তুলি
করিতেছে নীরব আহ্বান ;
জড়ে চিতে কি সম্বন্ধ, পরোক্ষে স্মরণ ধন্দ,
আবেগে ভরিয়া উঠে প্রাণ !

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ব্রহ্মবিদ্যা। আশ্বিন।—সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'মা ! জাগৃহি' নামক একটি সাময়িক কবিতা। ইহা রহস্য-কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন 'কাব্যি' নহে। যাহার অর্থ বুঝিবার জন্য হয় কবির বাড়ী, নয় 'জ্ঞানের বাড়ী' ছুটিবার দরকার হয়, 'মা জাগৃহি' সে শ্রেণীর কবিতা নহে। বাঙ্গালা মাসিকের নিকষে কষিলে, ইহার রস হয় ত অধুনাতন 'কবিতা'র কষের পার্শ্বে নিতান্ত বিভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার প্রধান গুণ, ইহা বুঝা যায়। যে ক্ষেত্রে কিছুই বোঝা যায় না, সেখানে বুঝিবার অবকাশ পাইলেই কৃতার্থ হইতে হয়। পক্ষান্তরে, যে মন্ত্রে মা জাগেন, ইহাতে সে মন্ত্রশক্তির প্রেরণা—উদ্দীপনা নাই। ইহা কামনা। 'ধনং দেহি, জনং দেহি'র মত কাম্যপূজার প্রার্থনা। উচ্চ স্তরের কবিত্ব নাই ; কিন্তু বাঙ্গালীর মনের মত প্রার্থনা বটে।—বাঙ্গালায় একটা বিষয় লক্ষ্য করিলে আনন্দ হয়। তাহা আকাঙ্ক্ষার, কামনার, প্রার্থনার সমতা। যাহার মুখে যে ভাষার কথা ফোটে, সে সেই ভাষায় মাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। গদ্যে পদ্যে, প্রবন্ধে নিবন্ধে, গল্পে আখ্যানে, নাটকে উপন্যাসে, কাব্যে কবিতায়, কাব্যি-সমস্যায় প্রহেলিকায়, ভাষায় অভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের কামনা ফুটিয়া উঠিতেছে। সমবেদনায় প্লাবনে বাঙ্গালা প্লাবিত হইতেছে। এই ভাব-প্লাবনের পর নিশ্চয় কর্ম্মের পলী পড়িবে।—জীবেন্দ্রকুমারের কবিতায় দেখিতেছি,—

'জাগ জাগ জাগ মা আমার।
শ্যামাঙ্গনে আজি বাঙ্গালার।
তৃষ্ণার্ত্তের বারি-রূপে, বুভুক্ষুর অন্ন-রূপে
বস্ত্র-রূপে বিবস্ত্র জনার !
জাগ জাগ জাগ মা আমার !'

ইহাতে কবিত্ব নাই, কিন্তু প্রয়োজন আছে, সত্য আছে। 'আশার ভাষার জাগ, ধরমে করমে জাগ' বেশ, কিন্তু 'জাগ মর্ম্মে বিশল্যকরণী' নিতান্ত কষ্টকল্পনা—যেপথে ভাবের শক্তিশেল হইয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্য সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আজ কাল কবিরা 'একমেটে' করিয়াই মাসিকের পূজার দালানে কবিতার প্রতিমা পাঠাইয়া দেন। finishএ অনেকেরই লক্ষ্য নাই, রুচি নাই। শেষ শ্লোকে—

'জাগৃহি মা! জাগৃহি মা আজি!
আরতির বাদ্য উঠে বাজি' !
এ পূজা সার্থক কর, সন্তানের অর্ঘ্য ধর,
অগ্নিমন্ত্রে মৃত প্রাণরাজি
দীক্ষা দিতে জাগৃহি মা আজি !'

আরতির সময় মা ত জাগ্রত। 'বোধনের বাদ্য উঠে বাজি'ই সঙ্গত ও প্রশস্ত। 'বোধন' করিয়াই মাকে জাগাইতে হয়। ইহাও বোধনের কবিতা। কবির মত লিখিয়া একবার পাঠকের মত পড়িয়া দেখিলে, বোধ হয়, অনবধানতার এই চিহ্নগুলি রচনা হইতে লুপ্ত হইতে পারে। 'একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি' এখন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। এই জন্য আমাদের সাহিত্যে রাশি রাশি বাক্য বিফল হইয়া যাইতেছে। 'অগ্নিমন্ত্রে মৃত প্রাণরাজির দীক্ষা দিতে' মা যদি জাগেন, তাহা হইলে আশাও জাগিবে, ভাষাও জাগিবে। এই দেবীপক্ষে সেই শুভ দিনের—সেই মঙ্গল-মুহূর্ত্তের কামনা করি। শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'যোগমায়া'র সূচনা অত্যন্ত technical; পরে যদি বুঝিতে পারি। শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবীর 'অতিথি' অত্যন্ত কাঁচা 'কবিতা'। 'হের সন্ধ্যা পরিয়া অঞ্জন দাঁড়াইয়া আছে পথ মাঝে'—অঞ্জন কালো, সন্ধ্যায় অন্ধকার আছে, অতএব ? শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বৈজ্ঞানিক ও দিব্যদৃষ্টি' এবারকার 'ব্রহ্মবিদ্যা'র চাণাচুর। খুব মুখরোচক। ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র বৈশাখের 'নব্যভারতে' লিখিয়াছিলেন, ভূত নাই। আর, 'ব্রাহ্মসমাজে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসরূপ রোগ প্রবেশ করিতেছে।' সেই জন্য ডাক্তার মিত্র 'নব্যভারতে'র পুরিয়ায় যোড়ক করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ঔষধ দিয়াছিলেন। সেই ঔষধে তিনি হীরেনবাবুকেও অনুপানের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বারো বৎসর পূর্ব্বে হীরেনবাবু ডাক্তার মিত্রকে 'দিব্যদৃষ্টি'র প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র সেই প্রমাণের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু হীরেনবাবু এ পর্য্যন্ত সে প্রমাণ দেন নাই।—হীরেনবাবুর প্রবন্ধের জন্য আমরাও অনেক দিন—প্রায় 'বারো-দুগুণে' চব্বিশ বৎসর—আশা-পথ চাহিয়া আছি। মধ্যে একটি পাইয়াছি,—'মানব-মঙ্গল';—তাহাও এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই! অতএব, আমরা ভুক্তভোগী,—ডাক্তার মিত্রের এই আশা-প্রতীক্ষায় বা নিরাশায় প্রচুর সমবেদনা ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।—যাক, এখন আসল কথা বলি। হীরেনবাবু 'বৈজ্ঞানিক ও দিব্যদৃষ্টি'তে বলিতেছেন, ভূত আছে। তবে ডাক্তার মিত্র যখন জিজ্ঞাসার পর-পারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে ভূত মানাইবার দরকার কি, উপায়ই বা কি ?—ডাক্তার মিত্র লজ, ক্রুক্স্ প্রভৃতি ভূত-বাদীদের মানেন না। কেলভিন, ল্যাঙ্কেষ্টার প্রভৃতি, যাঁহারা ভূত মানেন না, তাঁহাদের মানেন। ভূতের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে মিত্রের সহিত বিচার কর্ত্তব্য কি না, সম্ভব কি না, তাহার বিচার না করিয়া হীরেনবাবু ভূতের গল্প লিখিলে এই দেশীপকে 'পাওনাদার দুর্দ্দান্ত'দিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত আমরা একটু স্বস্তিলাভ করিতাম। কিন্তু হীরেনবাবু সে বিষয়েও কৃপণতা করিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছেন।—আমরা ভূত মানি না, কিন্তু ভূতকে ভয় করি। ভয় হইতে ভক্তির দূরত্ব অধিক নয়; অতএব, আমাদের জন্য প্রমাণ অনাবশ্যক। পাঠকদিগকেও এই পথের পথিক হইতে বলি। কিন্তু দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে বাস করিয়াও ডাক্তার মিত্র ভূত দেখিতে পাইলেন না, এবং হীরেনবাবু 'আস্তো' ও 'ন্যাস্তো' ভূত ধরিয়া ডাক্তার মিত্রকে দেখাইতে, ভূতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারিলেন না? 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! সে যাহা হউক, হীরেনবাবু দশের বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুরে 'দিব্যদৃষ্টি'র যে প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত। শেষ পরীক্ষার বিবরণটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

'ঘরের এক কোণে একখান গুপ্তপ্রেসের পাঁজি পড়িয়াছিল, সেই পাঁজি আমিনের [যাদুকরের] হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, 'এইবার জিজ্ঞাসা কর, তোমার হাতে কি আছে।' বলা উচিত যে, বরাবরই বালকের চক্ষে কাপড় বাঁধা ছিল, এবং সে আমাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া ছিল। সে যে স্থূল দৃষ্টিতে কোন কিছু দেখিতে পারিতেছিল না, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। পঞ্জিকা হাতে হইয়া আমিন ঐ বালককে আবার প্রশ্ন করিল, তাহার হাতে কি আছে? দুইবার তিনবার প্রশ্নের পর বালক উত্তর করিল, 'কিতাব।' আমি বলিলাম, 'কি কিতাব জিজ্ঞাসা কর।' তিনবার চারিবার জিজ্ঞাসিত হইবার পর বালক উত্তর করিল, 'পঞ্জিকা।' তখন বুঝিলাম, আমার সঙ্কেত বা Code word প্রয়োগের আশঙ্কা অমূলক। আমি আমিনকে বলিলাম যে, 'দেখ, চিন্তা-চালন বা Thought Transference বলিয়া একটা জিনিস আছে। তুমি যখন পাঁজিখানি হাতে করিলে, এবং হস্তস্থিত পুস্তকের নাম জানিলে, তখন তোমার মস্তিষ্কস্থিত চিন্তা বালকে সংক্রামিত করা কিছু বিচিত্র নহে। অতএব ইহার দ্বারা চিন্তাচালন প্রমাণিত হইল বটে, কিন্তু ইহাকে আমি দিব্যদৃষ্টির প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।' আমিন বলিল, 'তবে অন্যরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন, চেষ্টা করিয়া দেখি, তাহাতে পাশ হইতে পারি কি না।' ঘরের আর একধারে কয়েকখান সংবাদপত্র পড়িয়া ছিল। আমি তাহার মধ্যে একখানা টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, সেটা Indian Mirror। আমার পকেটে একটা key-less ঘড়ি ছিল। সেইটা বাহির করিয়া নিজে না দেখিয়া তাহার কাঁটা ঘুরাইতে লাগিলাম। তখন বেলা প্রায় পৌনে নয়টা। ঐরূপ কাঁটা ঘুরাইবার ফলে আমার ঘড়ীতে কত সময় সূচিত হইল, তাহা আমি নিজেও দেখিলাম না, অপর কেহও জানিতে পারিল না। তখন সেই ঘড়িটাকে Indian Mirror কাগজে বেশ করিয়া জড়াইলাম, এবং একটা সূতা দিয়া সেই প্যাকেটকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া আমিনের হাতে দিলাম। প্যাকেটটি হাতে হইয়া আমিন সেই বালককে পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'আমার হাতে কি আছে?' বালক বলিল, 'কাগজ।' পুনরায় প্রশ্ন করাইলাম, 'কি কাগজ?' বালক উত্তর করিল, 'আখবর (সংবাদপত্র)।' পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'কি আখবর?' বালক উত্তর করিল, 'আয়না' (Mirror)'। পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'কাগজের মধ্যে

কি আছে?' বালক বলিল, 'ঘড়ি।' পুনরায় প্রশ্ন করাইলাম, 'ঘড়িতে কত বাজিয়াছে?' বালক উত্তর করিল, 'একটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট।' তখন সেই প্যাকেট খুলিয়া ঘড়ি বাহির করিয়া দেখা গেল, বাস্তবিকই ঐ ঘড়িতে একটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট সূচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি অথবা উপস্থিত কেহই জানিতাম না যে, ঐ ভাবে কাঁটা ঘুরাইবার ফলে আমার ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছিল।'—কাশীধামে আমরাও এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, অবশ্য বৈজ্ঞানিকের, দার্শনিকের, বা ভূতান্বেষীর দৃষ্টিতে নহে। আমাদের সম্বল ছিল কৌতুক ও কৌতূহল। বেহালার এক ব্রাহ্মণ-যুবকও এইরূপ 'দিব্য-দৃষ্টি'র বা 'চিন্তা-চালন'-শক্তির অধিকারী ছিলেন। মনে মনে নদীর নাম ভাবিয়া রাখিলাম। যেমন ভাবা, তিনি অমনই এক টুকরা কাগজ হাতে দিলেন, তাহাতে লেখা—'মিসিসিপি!' আমি তাহাই ভাবিয়াছিলাম! পাটীগণিতের শেষে অঙ্কের যে উত্তর থাকে, প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতবাবু সেই উত্তর-মালার একটা সুদীর্ঘ অঙ্ক মনে মনে ধরিলেন। উত্তর-দাতা তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন!—ইহা হইতে পরকাল, পুনর্জ্জন্ম, ভূত প্রভৃতি প্রতিপন্ন হয় কি না, তাহা বলিতে পারি না। দামোদরবাবু যেমন 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার 'মৃন্ময়ী' লিখিয়াছিলেন, আমিও তেমনই হীরেনবাবুর 'দিব্য-দৃষ্টি'র উপসংহার লিখিলাম।—আর একটি কথা হীরেনবাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ডাক্তাররা যদি ভূতে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমরা রোগে ঔষধ পাইব না, এবং ক্রমে ভূতই দুর্লভ হইয়া উঠিবে? পক্ষান্তরে, ভূত যে নাই, তাহার প্রমাণ, এখনও কোনও ভূত 'জনা'র মত 'প্রতিবিধিৎসিতে' তাহার মর্ত্ত্যলোকের ডাক্তারের ঘাড় ভাঙ্গে নাই। মানুষ মরিয়াই ভূত হয়। মানুষ বীজ, ভূত তাহার ফল। মানুষ কারণ, ভূত কার্য্য। কারণের গুণ কার্য্যে থাকে। অতএব, মানুষের প্রতিহিংসা মানুষ হইতে উৎপন্ন ভূতে নিশ্চয় থাকিবে। যদি ভূত থাকিত, তাহা হইলে কোনও ভূত কি রাণী ভবানীর মত বলিত না—

'প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর!'

এবং ডাক্তার, কৌঁসুলী, আটর্ণী, উকীল, টাউট, হাকিম, জ্ঞাতি, বন্ধু, লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেকটার প্রভৃতি অসংখ্য ভূত-স্রষ্টার মধ্যে কাহারও ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভূতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিত না? এই জেরার উত্তরে হীরেনবাবু কি বলেন?—শ্রীশশধর গুহ নিয়োগী 'নিত্যমুক্ত' নামক ছড়ায় লিখিয়াছেন,—

'এই চিদাকাশ ঘটাকাশ মহাকাশে রয়।'

কিন্তু মাসিক 'ব্রহ্মবিদ্যা' ঘটাকাশ, চিদাকাশ, না মহাকাশ? 'নিত্যমুক্ত'ও ত ভূতের মত কথায় কথা হইয়া উঠিল! ছড়া হইতে যাঁহার মুক্তি নাই, তিনি ক্ষণমুক্তও নহেন, তা নিত্যমুক্ত!—তবে শশধর-কবির মিলগুলি নিয়ম-বন্ধন হইতে নিত্যমুক্ত বটে। 'যাই' ও 'রই'কে তিনি দিব্য মিলাইয়া দিয়াছেন। 'নিত্যমুক্তে'র দোসরের নাম—'প্রার্থনা।' ইনি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কন্যা। ইনি 'আমি'তে ও 'খানি'তে মিলাইয়াছেন। যথা—

'পূজিব তোমায় আমি,
দিয়ে মম হৃদিখানি।'

কিন্তু কবি যদি লিখিতেন,—'পূজিব তোমারে স্বামী, দিয়ে মম হৃদিখানী', তাহা হইলে এই পাঁচ-সিকা-সের—সরষের-তেলের দিনে কবিতাটি চাটগাঁ হইতে চাটনীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গে মুখে মুখে বিচরণ করিতে পারিত। অথবা, কবি যদি লিখিতেন, 'পূজিব তোমার আমি, দিয়ে মম হৃদিস্বামী', তাহা হইলে কবিতার সহৃদয়রা কতই না 'তারিপ্' করিতেন! ষট্‌চক্র, সহস্রার প্রভৃতির সঙ্গে দেহের মধ্যে নাড়ীর যে হার আছে, 'হৃদি' বা হৃৎপিণ্ডটাই সেই হারের 'স্বামী', অর্থাৎ মধ্যমণি, ইহা ডাক্তার শশিভূষণ মিত্রও ত অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে ভট্টাচার্য্য কবি এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন না কেন? বাঙ্গালা সাহিত্য কবিতার প্রহরৎ লাভ করিত; মিল বেচারাও বাঁচিয়া যাইত। মিলের উপর দেখিতেছি 'ব্রহ্মবিদ্যা'র বড় রাগ! শ্রীভোলানাথ বসু মল্লিক 'আগমনী'তে 'ঘোষণা'র ও 'জ্যোৎস্না'র মিলাইয়াছেন! 'জ্যোছনা' ও কবির অরুচি? যতি ত কোনও চরণেই নাই। যেমন রঙ্গ-কাণা আছে, রায় বাহাদুর ও বেদান্তরত্ন কি তেমনই 'মিল কানা' হইয়া উঠিলেন? শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণ-তীর্থের 'স্বাগত' মামুলী বটে, কিন্তু ইনি 'মিল'কে জবাই করেন নাই।

প্রবাসী। আশ্বিন।—শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'শ্রীকৃষ্ণ ও সুদাম' মনোজ্ঞ ছবি। রবীন্দ্রনাথের 'পায়ে-চলার পথ' গদ্য-কবিতা—উপভোগ্য। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যে ভাবায় 'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উন্মেষ' দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাদের অনধিগম্য।—'রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যটিকে আমরা যে অবস্থায় পাই, তখন সৃষ্টির অনিয়মের উত্তাপ ও উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হয়ে গেছে।' ইহাতে কি বুঝায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'যে অবস্থা'র সঙ্গে 'তখনে'র অন্বয় কি, এবং 'সৃষ্টির অনিয়মের উত্তাপ ও উচ্ছ্বাস' ও তাহার সহিত 'মানসী'র আবির্ভাবের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। আর এক স্থানে দেখিতেছি,—'কবির মদির প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁকে পাগল করে রেখেছিল!' 'মদির প্রাণ!' শ্রীঅমৃতলাল শীলের 'কাকী' সুখপাঠ্য। ইহাতে অনেক নূতন কথা আছে। শ্রীমণিলাল ভট্টাচার্য্যের 'মুসলমান শাসনে রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা' ও শ্রীযদুনাথ সরকারের 'প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরীর 'দানের বেদন' নামক গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীকালিদাস রায়ের 'অলকাপুরী' পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। 'প্রণয়িনী যথা মাধব নিশীথে কুসুমের শয্যায়' ও 'অভ্রংলিহ প্রাসাদের শিরে' যতিভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর 'মাতৃমিলন' চমৎকার!—কবিতাটি 'অন্তরেরি অন্ধকারের পাপ্‌ড়ি বিদারি' বাহির হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমরা একটু উদ্ধৃত করিব।—

> 'আজ প্রভাতে—সু-প্রভাতে,
> সুপ্তি-কাকের পক্ষ-'তা'-তে,
> ডিম ফাটি' ওই নতুন-আঁখি
> উঠ্‌ল জাগিয়া—
> জাগরণের পিক-শিশুটি
> পুলক-ভরা স্বরে।'

কাহার ডিম? কাকের বাসায় কোকিলের ডিম ফোটে, ইতি কবি-প্রসিদ্ধি। এ ক্ষেত্রে সুপ্তি—কাক। জাগরণ—পিকশিশু। কিন্তু ডিমটি কি? এ কল্পনা যে, 'হাতেমতাই'য়ের হোমা

পক্ষীকেও দৌড়ের পাল্লায় পরাজিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালায় ক্রমে sublime ও ridiculous-এর ব্যবধান—সীমা-রেখা লুপ্ত হইতেছে। দুই একটি সুন্দর চরণ আছে—'বৃষ্টি-বারি শিউলী-রূপে আগুন ভরি' ঝরে।' আগুন—অরুন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাঁকুড়ার পত্রে' উপস্থাপিত 'দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধকল্পনা'য় অনেক নূতন কথা আছে। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 'অমৃতে'র উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

'পীযূষ মাখম তুললে ওরা দুঃখ-দুখের মন্থনে!'

ইহার টীকা নিষ্প্রয়োজন!—'আমেরিকায় শিশুপালনে সতর্কতা' সুখপাঠ্য, শিক্ষাপ্রদ। 'দেশের কথা' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবার খুব সমৃদ্ধ।

সবুজ পত্র। আষাঢ়।—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী 'বিলে জঙ্গলে শিকারে' শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরীর "Sport in Jheel and Jungle" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছেন। সুখপাঠ্য। বাঙ্গালায় শিকার-সাহিত্য নাই। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে অনেকের চিত্তরঞ্জন করিবে। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জ্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?"

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম, বল্লেম, "মনে পড়চে বটে কিন্তু ঠিক নাম করতে পারচিনে।"

সে বল্লে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বল্লেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মত কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেচ?"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে। আমি বুঝলেম সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে! বর্ষার মেঘ শরতে শিউলি ফুলের হাসি শিখে নিয়েচে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেখে দিয়েচ?"

সে বল্লে, "এই দেখনা আমার গলার হার!"

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, "আমার আর ত সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও ত ম্লান হয়নি।"

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্লে, "মনে আছে সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাওনা, তুমি শোককেই চাও।"

লজ্জিত হয়ে বল্লেম, "বলেছিলাম বটে, কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।"

সে বল্লে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি ত ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বল্লেম, "একি তোমার অপরূপ মূর্ত্তি!"

সে বল্লে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

ফরাসী সাধারণে সমাজ-তান্ত্রিকতা ও তাহার ফল। *

১

[কিছুরই সৃষ্টি হয় না, সকলই ধ্বংসশীল, এই ধ্বংস হইতে ধ্বংসান্তরে পদক্ষেপের মধ্যে সৃষ্টি, সত্তা ও স্থিতি অবস্থিত। দেশ, ধর্ম্ম, ভগবান, ও সত্য সম্বন্ধে ধারণা, এমন কি, বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সকলও ক্রমবিবর্ত্তনশীল। ফরাসী-বিপ্লব—সমাজতন্ত্র—পরিবর্ত্তন সকলের অগভীরতা।]

কিছুরই সৃষ্টি হয় না, সকলই ধ্বংসশীল, ইহা ফরাসীদিগের কথা। বিপ্লবের দাবানলে যখন ফ্রান্স অগ্নিশোণিত হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল, ফরাসী-জীবনে রাজতন্ত্রের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু রাজনীতিক জীবন বদলাইয়াই এ বিপ্লব ক্ষান্ত হয় নাই। বিপ্লব সরল ভাবের কোনও জিনিস নয়, পরন্তু সহস্রমূল;—সমাজ, ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত জীবন, এ সকলেই ইহার বহুল শিকড় অবস্থিত—রাজনীতি ইহার মধ্যে অন্যতম। স্বেচ্ছাশাসনের পর ধীরে ধীরে খৃষ্ট-ধর্ম্ম বিশ্বাসীর হৃদয় হইতে অপসারিত হইতে লাগিল। শতাধিক বৎসর যাইতে না যাইতে দেখা গেল, খৃষ্টদেবতা ফ্রান্সে তাঁহার ধর্ম্মলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জোরেষ বলিতেন, 'মাতৃভূমিও বিবর্ত্তনের ফলে বৃহদাকার ধারণ করিতে পারে, ধর্ম্ম আজ বর্ব্বরতার স্তর ভেদ করিয়া আধুনিকতম হিন্দু, খৃষ্ট, মহম্মদীয় যৌগিক (Synthetic) সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছে। অভ্রান্ত সত্যরূপে কত যুগধর্ম্ম মানবজীবন তোলপাড় করিয়া নব নব ভাব ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটাইয়াছে। আজ বিজ্ঞানের অভ্রান্ত অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ—অক্ষয় অণু ও

---

* ফরাসী সমাজ-তান্ত্রিকতার কথা লিখিবার পূর্ব্বে, সমাজ-তান্ত্রিকতা কি, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১ম, সমাজতান্ত্রিকতা একটী নিরীশ্বরবাদী ধর্ম্ম। ২য়, ইহার ভিতর ঈশ্বরে অবিশ্বাস—প্রজ্ঞার মুক্তি (Freedom of thought)—ভাবী একাকার—সমগ্র বিশ্বে শ্রমজীবি-শাসন, এক বিশ্বমানব জাতি প্রভৃতি বিষয়ে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবার অনুশাসন আছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ধর্ম্ম প্রভাবে প্রজাতন্ত্র, শ্রমজীবি-সমবায়, nationalisation of wealth and industry ইত্যাদি সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে।

অব্যয় শক্তি প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি ধূলিবিলুণ্ঠিত। জড়ের (১) ও স্থির থাকিবার অধিকার নাই, তাহাকেও এক হইতে আর এক পদার্থ, পরে শক্তি, শেষে Xরে হইয়া অবশেষে ইথর-সাগরে চির-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে হয়—আর তাহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। দেবতাও ফ্রান্সে তাঁহার সৃষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই—প্রথমে চেন (ওক), তার পর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, পরে যীশু তার পর সন্ত প্রচারক (St) অবশেষে এক নূতন মূর্ত্তিতে ফ্রান্সে আবির্ভূত হইলেন। নূতন ধর্ম্ম আসিল—আবালবৃদ্ধবনিতা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র ফরাসী জাতি তাহাতে গা ভাসাইলেন। সমাজতন্ত্রের প্রচারকগণ পুরাতন গাইড বা সন্তদিগের মত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে নূতন সত্য প্রচার করিয়া দেশকে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিরীশ্বরবাদী নবতান্ত্রিকগণ পুরোহিতদিগকে (ক্যাথলিক্) নিঃস্ব করিয়া সমাজ হইতে একরূপ চণ্ডালত্বে নামাইয়া দিলেন।

জগতে অনেক নূতনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক সে সকল যে কতটা নূতন, তাহা ভাবিবার বিষয়। দেশে কোনও একটা ভাব বা কর্ম্ম-প্রেরণা জাগিলে, এমন কি, এক দেশেই কয়েকটা সঙ্ঘ গঠিত হইলেই প্রত্যেকে 'নূতন আমরা' এই বলিয়া চীৎকার করেন। নূতন নামের এক সম্মোহন আছে—একটা মাধুর্য্য আছে। একই আত্মা প্রতি জন্মেই প্রায় অপরিবর্ত্তিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু বোধ হয় পুরাতন সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ প্রচার হয়, এ নূতন লোক—তার কত আনন্দ ও উৎসাহ। জন্ম, জাগরণ ও উত্থানাদির মধ্যে নূতন কিছু থাক আর না থাক—(বড় বেশী নূতনত্ব থাকে না) 'নূতন আমরা' এই ঘোষণার ভিতর যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তাহা সকলের অপেক্ষা বড় সত্য।

ফ্রান্সের এই নব-বাদ, ইহার ভিতরও ফরাসী-জীবনের সত্য তপ্ত দ্যোতনা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল। নব ধর্ম্মের সাধক ও ভক্তের এখানেও বড় অভাব ঘটে নাই।

ফরাসীরা বলেন, মানবের আশা চাই, বিশ্বাস চাই—বায়ু-অপ-খাদ্যের ন্যায় ঐগুলি না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না—অন্ততঃ আশা-বিশ্বাস-হীন জীবন কেমন, তাহা মানুষ জানে না। এই আশা ও বিশ্বাসের

(১) Evolution of Matter by Dr. Lebon.—*Bibliotheque de la Phylosophie Scientifique*—*Paris.*

মধ্যেই ধর্ম্মের ভিত্তি। শত শত যুগে প্রলেপের পর প্রলেপ পড়িয়া ধর্ম্মাদি সংস্কারের সৃষ্টি হয়—বিপ্লব হত্যা ইহার ধ্বংস করিতে পারে না। ইহার মূলে জাতীয়-মানস ও অধ্যাত্ম-জীবন, যেখানে আশা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি। সেখানে পরিবর্ত্তন না আসিলে ধর্ম্ম-সংস্কার অসম্ভব। ফ্রান্সে বিপ্লবের ঢেউ অধিকাংশ উপর দিয়া না যাইলেও দেশাত্মার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই; জাতীয় জীবনের অন্তরে গভীরতর প্রেরণাগুলি প্রায় অস্পৃষ্ট ছিল। রাজাকে ফাঁসি দিয়া রাজশাসনের অবসান হয় নাই। খৃষ্টের নামে কর্ণ বন্ধ করিলেও ভগবান বিলুপ্ত হন নাই। পুরোহিতগণের উচ্ছেদসাধন করিলেও পূজা প্রার্থনা বড় একটা কমে নাই। 'ভগবান হয় ত যদি কোথাও থাকেন অন্তরেই আছেন, অন্তরই তাঁহাকে ভক্তি দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে', ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি স্বয়ম্ভু হউন বা মনসা-কৃতই হউন, তাঁহাকে একবার হৃদয়ে বসাইলে দুই দিনের বিপ্লবে বা দুই বৎসরের প্রচারে তাঁহাকে নিষ্কাশিত করা যায় না। ভগবানের নাম পরিবর্ত্তিত হয়—মুড়ি, নারায়ণ, যীশু বা বিজ্ঞান। সমাজ ও শাসন-তন্ত্রের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজতন্ত্রী, বিপ্লববাদী, ধীরাধীর-পন্থী, বর্ব্বর (Sauvage) স্বেচ্ছাচারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক দিনের ইচ্ছায় অন্তরের সংস্কারের সৃষ্টিও অসম্ভব, ধ্বংসও অসম্ভব।

বোধ হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে—প্যারিস নগরীতে জনতন্ত্রবাদীদের এক মহাসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বেনস্ত তাহার বুঝি সভাপতি ছিলেন। সভারম্ভ হইবার প্রাক্কালে সভাপতি মহাশয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্লুতস্বরে একটি প্রার্থনা করেন। তাঁহার ভাব, ভাষা ও Symbol (যন্ত্র)-গুলি পায়েন, খৃষ্ট, এমন কি, আমাদের সরস্বতীর বন্দন অপেক্ষা কোনও অংশেই নূতন নহে। এক জন ভদ্রলোক সেই সভায় গিয়াছিলেন, তিনি বলেন—এ ত মন্দ নয়—যিনি সকল পৌত্তলিকতা ও ক্যাথলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া শুদ্ধ বিজ্ঞানালোকে আমাদিগকে উদ্ভাসিত করিবেন, তাঁহার এই উজ্জ্বল মূর্ত্তিটি কোন দেবী ভাঙ্গিয়া দিবেন।

এক দিন কুত্রা সহরে হাঁসপাতালে শুইয়া আছি। সেথায় কেহ প্রেমাকাঙ্ক্ষা বা সঙ্গীত-প্রয়াস ব্যতীত মন্দিরে যান না। হঠাৎ প্রাতে জানালা খুলিয়া দেখি, হোতেল-দে-ভিলের (Coroporation buildings) সম্মুখে এক বৃহৎ উদ্যান, এবং প্রতি বৃক্ষতলে প্রতি বীথিকায় স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বৃক্ষগুলি মূলহীন জনমহিলাদের হস্তে

প্রোথিত। শ্রীমতী সেক্রেটারী আহতদিগকে প্রাতঃপ্রণাম করিতে আসিলেন —জিজ্ঞাসায় জানিলাম—আজ লরেল গাছের ডাল জর্ডনের জলে স্পর্শ করাইয়া আনিলে সকল কার্য্যে সিদ্ধি ও কৃষিকর্ম্মে প্রাকৃতিক বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ফ্রান্সের সকল স্থানেই এইরূপ। কতকটা আমাদের রথের কাছি টানার মত। মুক্ত-প্রজ্ঞ কুসংস্কারবর্জ্জিত জড়বাদী সোসিয়েলিষ্ট ফ্রান্সে এ এক মন্দ আচার নয়! সে দিন পাকপর্ব্ব। ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও আশা যায় নাই, দুর্ব্বলকে বিশ্বাসও করিতে হইবে—ধর্ম্ম-ত্যাগ অসম্ভব।

২

[খ্রীষ্টধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্রের তুলনা—পুস্তকে যাহাই লিখিত থাকুক, সাধারণ হৃদয়ে 'সমাজতন্ত্রের রূপ'—ইহজগতে স্বর্গ। ফলে শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস—বিরোধ। ডেপুটীদিগের আশ্বাসবাণী-পূরণাভাবে ষ্টেটের প্রতি ঘৃণা—হতাশা। State and Syndicate.]

সমাজতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিকতার বিলোপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে যথেষ্ট ক্যাথলিক প্রভাব বিদ্যমান। নবতান্ত্রিকগণ পুরাতনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও, তাঁহারা পুরাতনের বিশিষ্ট প্রভাব হইতে মুক্তি পান নাই। সংক্ষিপ্ত তুলনায় ইহা শীঘ্র প্রতিভাত হইবে।

ধর্ম্মপুস্তক ও দর্শনাদিতে কি লিখিত আছে, তাহা দেখিয়া কোনও দেশের ধার্ম্মিকতা, এমন কি, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকগণ কি লিখিয়াছেন—তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও প্রেরণার ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব দেখিয়া আমরা ফরাসী দেশের সমাজ-তান্ত্রিকতার বিচার করিব না। সাধারণের চিত্তে এই নব ধর্ম্মের যে বিশিষ্ট মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল—ফরাসী জনগণের কর্ম্মের ভিতর এই ভাবের প্রভাব যেথায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি ও কর্ম্মরাশির ভিতরটার সহিত সাধারণ ক্যাথলিকতার তুলনাই আমাদের উদ্দিষ্ট।

সাধারণ ক্যাথলিকতার মধ্যে প্রধান অঙ্গ—স্বর্গের কল্পনা; তার পর ভাবী একাকার—তার পর হীনতার মহত্ত্ব-প্রতিপাদন। (Idolisation of weakness)। দীনতায় যে মহত্ত্ব, এ ভাব ক্যাথলিক, বৌদ্ধ, জৈন, এমন কি সেদিনকার হিন্দুধর্ম্মেও বর্ত্তমান। ক্যাথলিকতায় আত্মসমর্পণ—Strength of weakness ইত্যাদি ভাব গভীর ও যৌগিক হইলেও, সাধারণে এই ভাব ঠিক ঠিক ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিয়া পুরোহিতের অত্যাচার—স্বেচ্ছাতন্ত্র, স্ত্রীশাসন ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছিল। সমাজতন্ত্রও ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব প্রতি

পন্ন করিবার মানসে Syndicate, শ্রমজীবি-পরিচালিত কল-রাজ্য-ব্যবসায় ও পরাক্রান্ত বুরোক্রাসীর সৃষ্টি করিয়াছে। 'মানুষমাত্রই শুধু মনুষ্য হিসাবে নয়—কর্ম্মশক্তি—অভিজ্ঞান, experience, technicality, বিচার-শক্তি, সর্ব্ব বিষয়েই সমকক্ষ—অতএব সকলেই সকল-কর্ম্ম-সম্পাদনক্ষম। এই জ্ঞানে সমাজতান্ত্রিকের বিশ্বাস যে,কলকারখানা, যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি ইত্যাদির পরিচালনার্থ কোনও বিশিষ্ট জাতির প্রয়োজন নাই। ব্যবসায়ী, রাজসেবী, বিজ্ঞানবিৎ সমাজের পরগাছা-(parasite)-মাত্র। 'এমন এক দিন আসিবে, যখন সকলে এক বেতন পাইবে—উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র পৃথিবীতে থাকিবে না; সে দিন স্বদেশ, স্বার্থ ও যুদ্ধাদি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে—এক জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম সম্পদ,—এক জাতি, এক দেশ,—একমাত্র সমাজ—ধর্ম্মপ্রাণ —এক বিশ্বমানব জাতি—কর্ম্মশীল শ্রমজীবী—পৃথিবীতে যথার্থ বৈকুণ্ঠ অবতরণ করিবে।'

সেণ্ট পলের সৌভ্রাত্রে সকলে এক হইয়া সানন্দে বাস করিবে। খৃষ্টীয় স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ আনন্দধাম মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইবে।

মহাত্মা যীশু বিশ্বাসীদিগকে স্বর্গে স্থান দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন—সেথায় কর্ম্ম নাই, ভোজন নাই, দেশ নাই, স্বার্থ নাই, তৎসম্ভূত দ্বন্দ্ব নাই, আছে শুধু আনন্দ ও এক ধর্ম্মভীরু প্রাণ। কিন্তু তাঁহার গোলোক পারের পারে কেহ কখনও দেখেন নাই—চর্ম্মচক্ষে কেহ তাহা দেখিবার আশাও করেন নাই, কিন্তু নবধর্ম্মের স্বর্গ ইহ জগতে। যে দিন মানব দেখিবে, আর পৃথিবীতে স্বর্গ আসিল না, সে দিনই সমাজতান্ত্রিকতার শেষ; তার পর আবার কোন্ নূতন ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হইবে, তাহা অনিশ্চিত।

সমাজতান্ত্রিকতার ফলে শ্রমজীবীদিগের আপাততঃ কিছু সুখ হইলেও, দেশগত ভাবে এই নবধর্ম্ম ফ্রান্সকে বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্তর হইতে দশম স্তরে অধঃপাতিত করিয়াছে। আজ প্রায় বিশ বৎসর একরূপ শ্রমজীবীগণই একমাত্র তাঁহাদের স্বার্থের জন্য ফ্রান্স শাসন করিয়া আসিতেছেন। রাজতন্ত্রের সময় সম্রাট আপনার ইচ্ছা ও সুখ ও তাঁহার পারিষদবর্গের ভোগ নিবৃত্তি করিয়া সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই শাসনাদি করিতেন। আজ তাহার পরিবর্ত্তে চৌদ্দ মিলিয়ন শ্রমজীবীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভদ্র, ধনী ও ব্যবসায়িগণ প্রপীড়িত। একের অত্যাচারের পরিবর্ত্তে বহুর (majority) অত্যাচার

আবর্ত্তিত হইয়াছে। সময় সময় স্থির করা যায় না, রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর।

মহাজনের অবস্থা—'ক'এর কলে এ বৎসর বড় ক্ষতি হইয়াছে। 'ক' গ্রামের শ্রমজীবীদের ইচ্ছা,তাহাদের মনিব একটী বিদ্যালয় ও একটী হাঁসপাতাল করিয়া দিন। চেম্বারে (Parliament) কথা উঠিল—কিন্তু কোন্ আইনে এক জনকে ইহা করিতে বাধ্য করা যায়—সকলে সমান। ফলে এক আইন পাশ হইল, সকল কলওয়ালাকে হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয় রাখিতে হইবে। 'ক' ব্যবসা বন্ধ করিয়া আমেরিকায় যাত্রা করিল। 'খ'য়ের ষ্টীমার কোম্পানী ভাল চলে না—লোকে বেশী খাটে না; মনে করে, তারা দয়া করিয়া প্রভুর কর্ম্ম করিতেছে। তাহাদের বেশী মাহিনা—ছুটী ও উপরি বকশিস্ দিতে হয়। 'খ' এ সব দিতে বাধ্য—চেম্বরে ডেপুটীগণ আইন করিয়াছেন। অনন্যোপায় হইয়া 'খ' বলিল, আমাকে ১০০ মাইল পিছু ১৫৲ ক্ষতিপূরণ না দিলে আমি ব্যবসা বন্ধ করিব। চেম্বর কি করেন,—১৫৲ Indemnity ধার্য্য হইল। কতকগুলি জার্ম্মণ জাহাজ ফরাসী উপকূল হইতে সামান্য সামান্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া বা রিক্ত সমুদ্রে পরিভ্রমণ ও জরীপাদি করিয়া মাইল-পরিভ্রমণের হিসাবে কোটী কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ লইয়া গেল। তখন তাড়াতাড়ি সব ক্ষতিপূরণ করা বন্ধ হইল। রেলওয়ালা ও কুলীদের বড় ঝগড়া। কুলীদের প্রতিনিধিগণ একটী 'সরল' প্রস্তাব করিলেন যে, সরকার (তাহাদের প্রতিনিধি-সভা) রেলগুলি খাস করিয়া লউন। তাহাই হইল। ফল, লক্ষ টাকা বাৎসরিক লোকসান।

সমাজতান্ত্রিক ফরাসী প্রতিনিধি।—ফ্রান্সে লোকে পয়সার জন্য পলিটিক্‌স্ করে। আর কোথাও অন্ন হইল না, নিরন্ন প্রতিনিধি-পদ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। নির্ব্বাচনের সময় ইহা করিব, তাহা করিব—সকল দুঃখ দূর করিয়া শ্রমজীবিগণ যাহা চায়, তাই করা হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইল। যথাসময়ে প্রতিনিধি চেম্বরে আসিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্রমজীবীকে সকল সুখ দিতে পারিলেন না—প্রথমতঃ অনেকে অর্থ দিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি কিনিয়া লইল—তার পর হাতে চন্দ্র বা স্বর্গ ধরিয়া দেওয়া মানবের ক্ষমতাতীত। ফল, প্রতিনিধিদিগের প্রতি ও তৎসহিত সরকারের প্রতি ঘৃণা। ছয় বৎসর পরে আবার নির্ব্বাচন—'ক' ও 'খ'কে 'অ' ও 'আ' গ্রামের সাধারণে আর নির্ব্বাচন করিবে না। 'উ' ও 'ঊ' গ্রামের পদচ্যুত প্রতিনিধি 'গ' ও 'ঘ' আসিল।

'ক'ও 'খ'এর স্থান অধিকার করিল। সেইরূপ প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস, পরে ব্যর্থ আশা ও বদ্ধমূল ঘৃণা।

সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে State ও Syndicate। ষ্টেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বুরোক্রাসী। ফরাসী বুরো কি অদ্ভুত ব্যাপার, দুই একটা সত্য উদাহরণেই তাহা প্রতীত হইবে।—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে একটা Armoured Cruiser অর্ডার দেওয়া হয়। পাছে এক আফিসে খোল ও বর্ম্ম উভয়ের অর্ডার দিবার অধিকার দিলে হাতটানে অধিক অর্থ ব্যয় হয়, তাই 'সরল মনে' চেম্বর দুইটী অফিসকে দুইটী দ্রব্যের অর্ডার দিবার আজ্ঞা দিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উভয় দ্রব্যই প্রস্তুত হইল—খরচ তিন মিলিয়ন। বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, খোলটী (Cruiser) বর্ম্মের ভিতর ঢুকিল না—নূতন খরচ দুই মিলিয়ন ও দুই বৎসর সময়ক্ষেপ।

প্যারিস ন্যাশনাল লাইব্রেরী হইবে। এক অফিস সব অর্ডার দিয়া সারা বৎসরে পাথরের মেজে প্রস্তুত করাইল। আর এক অফিসের কর্ত্তা পরিদর্শন করিতে আসিয়া বলিলেন, 'মারবেল বড় ঠাণ্ডা, সব তুলিয়া কাঠের মেজে কর।' তাহাই হইল—খরচ আরও কয়েক লক্ষ। শুনা যায়, পরিদর্শনকারীর কফবৃদ্ধি ব্যাধি ছিল!

তার পর Syndicate বা শ্রমজীবী সমবায়ের সরকারকে শ্রমজীবীদের অভাব-অভিযোগ-জ্ঞাপনার্থ প্রতিনিধি-সভা।—

তুঁলো সহরে ডকে পরিভ্রমণ করিতেছি। দূরে একটী বংশীধ্বনি হইল। চকিতে এক জন সাইকেলবিহারী চলিয়া গেলেন, তাঁহার পিঠে 'কাজ থামাও—ইতি পি' লেখা একটা বিজ্ঞাপন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলে ডক্ ত্যাগ করিয়া চলিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, কেন কাজ বন্ধ? জনতন্ত্রের (Democracy) কোনও কথাই ইহার মধ্যে ছিল না। Syndicalistগণ জানিতেন, সাধারণকে জোরের সহিত কর্ম্ম করাইতে হয়। আর বেনামা 'পি'! ইহার সম্মোহন সকল 'গুণি' জানেন। পুরা নাম দিলে সে মোহ থাকে না। তার পর কর্ম্মসিদ্ধি হইলে পী সী বলিয়া সহি করিতে পারেন; পুরা নামে তিনি হয় ত 'ধনী' ধরা পড়িয়া যাইতে পারেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের পিয়নদিগের ধর্ম্মঘট হয়। সমগ্র দেশ আলোড়িত ও মন্ত্রিসভা নতজানু হইয়া পড়েন। বহু দিন পিয়নগণ আপনাদের পরিচয় গোপন করিয়া এই ধর্ম্মঘট সাধারণ বিপ্লবের সূচনা, এই প্রহসন প্রচার

করেন। রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়া হয়—তাঁহারা ইচ্ছা করিলে চেম্বরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সীন নদীতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহারা আপনাদের পরিচয় দিয়া ফেলেন। উপদেবতা অজানা ও অন্ধকারাবৃত থাকিলেই তাহার দৈব ক্ষমতা। আলোয় আসিলে তাহাকে বায়ুসাৎ হইতে হয়। আলোয় আসিয়া পিয়নগণের সেই দশা হইল। লোকে ভাবিল,—'আরে, কটা পিয়নে ধর্ম্মঘট করেছে—আমাদের কিছু নয়। ক'টা পোষ্টম্যানে রাজ্য সমাজ উল্টা পাল্টা করিবে।' সাধারণে একটু হাসিল। ভয়াবহ ধর্ম্মঘটও বন্ধ হইল।

ফরাসী মহাজনগণ বলেন, সমাজতান্ত্রিকতা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। এই সব সিদ্ধান্ত পূর্ণ সত্য না হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সরকার (সমাজতান্ত্রিকতার প্রতিনিধিগণ) অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া শিল্প-বাণিজ্য-ধ্বংসের সহিত হীনতায় প্রশ্রয় দিয়াছেন, এবং বলের হীন প্রয়োগই করিয়া আসিয়াছেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিনিধি (functioner) দ্বারা ব্যবসায় চলিতে পারে না। সকল ব্যবসায়ীকে এক সময়ে শ্রমজীবীদের সুবিধাজনক কোনও অনুষ্ঠানে বাধ্য করিবার জন্য আইনের সৃষ্টি অত্যাচার। বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অগণ্য রাজকর্ম্মচারীর সৃষ্টি, এবং বাধ্য হইয়া তাহাদের অল্প বেতন দিবার চৌর্য্য বুরোক্রাটদের একটী ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্যাথলিকতা আপন ধর্ম্মপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়া স্বেচ্ছাচারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমাজতান্ত্রিকতা ব্যবসায়ী ও ভদ্রদিগের উপর আপন প্রভুত্ব অচ্যুত রাখিবার জন্য সরকারকে অযথা অনন্ত ক্ষমতা দিয়া এক প্রকারে গুরুভার রাজকর্ম্মচারিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। ফরাসীরা সরল (Simplist)—সরকার তাহাদিগের দেবতা; ইহারা Slatist—যাহার যাহা বাঞ্ছা, তাঁহার নিকট দাবী করেন—অভাবে আত্মগ্লানির সৃষ্টি—ও আত্মনির্য্যাতন।*

৩

[সমাজতন্ত্রের জন্ম—জার্ম্মাণী; বর্দ্ধন-ফ্রান্স; ও সাফল্য—রুসিয়া। সমাজতন্ত্রের প্রচার-গৃহীত প্রজাগণের মধ্যে (naturalised subjects)—দরিদ্র ও শান্তিপ্রিয়—

* অস্ত্রের ফরাসীসুলভ রাজভক্তি (Slatism) শাসক সম্প্রদায়কে অযথা অতুল-শক্তিসম্পন্ন ও বিশ্বাসভাজন করিয়া স্বকৃত রাজদেবতা ও প্রতিনিধিবর্গকে রাজ্যচালনে অক্ষম ও সকলের ঘৃণাভাজন করিয়াছে।—অন্তরের সংস্কার ও বুদ্ধিগত নব ভাবের দ্বন্দ্বে ফরাসী জীবন প্রতিপদে বিষম সমস্যায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বণিকের মধ্যে—ভদ্রবংশে। সীমান্তরালে সমাজতন্ত্র—১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণের মানসিক অবস্থা (morale)।]

সমাজতন্ত্রের পিতা কার্ল মার্কস্। নিবাস জার্ম্মণী, বা তথাকথিত অতি-মানুষতা ও ক্ষত্রিয়তার (militarism) দেশে। ইহার বর্দ্ধন—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্মভূমি ফরাসী-হৃদয়ে—ইহার সাফল্য স্বেচ্ছাচার-পীড়িত রুস রাজ্যে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন স্বেচ্ছাচারী কংসের কারাগারে—তিনি লালিত পালিত গোকুলে—তাঁহার প্রধান লীলা কুরুক্ষেত্রে। এই বিষয়গুলি কৌতূহলজনক বটে।

সমাজতন্ত্রের প্রচার বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই সাধারণ সমাজতন্ত্রী-বিপ্লববাদীর (গোঁড়া সমাজতন্ত্রীদের) আকৃতি ও ব্যবহার আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে। একটা অস্পষ্ট ধারণাবশে আমরা গোঁড়া সমাজতন্ত্রীগণের জাত্যাংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে থাকি। অধিকাংশের শিরায় প্রবাসী জার্ম্মাণ, সুইস, ইতালীয়, আরব ও স্পেনীয়দের রক্ত প্রবাহিত। আমরা সহস্রাধিক জনের সহিত আলাপ করিয়াছি। নানা জিলায় নানাবৃত্ত্যবলম্বী সমাজতন্ত্রীগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া ভাবের আদান প্রদান করিয়াছি। তাহারাও আমাদিগকে মূর্খ দরিদ্র জ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে সরলভাবে তাহাদের মনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছে। তাহাতে আমরা অধিকাংশকে বিদেশী বলিয়া জানিয়াছি। বিদেশী যদি সমাজতন্ত্রী বলিলেই, প্রতিযোগী ফরাসী শ্রমজীবীর সহযোগীতে পরিণত হয়, তবে কোন্ মূর্খ ত্যাগ না করিবে? ফ্রান্সে প্রায় ⅙ অংশ জার্ম্মণ ও স্পেনীয়, এবং ⅙ অংশ ইতালীয়ান ও আরব। দেশের মধ্যে ⅓ অংশ বিদেশী যে প্রথম অবসরে বিদেশী রাজের প্রথম পীড়নে সাম্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এবং গোঁড়াভাবে নব ধর্ম্মটী লইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জার্ম্মণ বা ইতালীয়ান ১০ বৎসর পরে ফরাসী নাম ধারণ করিলেন, কিন্তু ১০ বৎসরে কি যুগযুগান্তরের স্বদেশকে ভোলা যায়? ১০ বৎসরে কি অপরের মাতৃভূমিকে আপনার মায়ের মত ভালবাসা যায়?

তখন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ, আমরা প্রথম মারসেলিস সহরে পরিভ্রমণ করিতেছি। একটী ভদ্রপরিচ্ছদধারী শ্রমজীবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথায় কথায় স্বদেশ-ভক্তির কথা উঠায়, তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'আমাকে স্বদেশানুরাগী বলিবেন না—ইহা আমার পক্ষে কটু ভাষা স্বরূপ। যদি কোনও মাতৃভূমি থাকে, সে মানব জাতি—যদি কোনও ধর্ম্ম, রাজনীতি থাকে, সে

আমার ইচ্ছা। স্বদেশ, সে ত একটা বারাঙ্গনা--বেশ্যা-সেবায় যেমন প্রভূত ক্ষতি, কোনও লাভ নাই, স্বদেশানুরাগেও সেরূপ কোনও লাভ নাই—ইহা আমাদের সকল দুঃখের কারণ। স্বদেশ নাই—সীমান্তরাল, যাহা তোমায় আমায় পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, সে নিশ্চিত জানিও, মহাজন-কৃত ফাঁদ। (La Patrie c'est un putin la creation des gros-ventres.)

কিয়ৎক্ষণ পরে আরও কথার সহিত জানিতে পারিলাম, কথক মহাশয় ইতালীয়ন, এখানে ৬ বৎসর মাত্র বাস করিয়াছেন—বয়স ৪০—কর্ম্ম Clerk, মাহিনা ২৫০ ফ্রাঙ্ক। (কুলীর মাহিনা মাসে ৩০০ ফ্রাঙ্ক)। পরবর্ত্তিকালে অন্ততঃ শতাধিকবার স্বদেশ-বারাঙ্গনা ও মায়িক সীমান্তরালের (frontier) কথা শুনিয়াছি। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের ও তাঁহার প্রতিভূ গির্জ্জার অন্তর্ধানের পর সমাজতন্ত্র ও তাহার প্রতিনিধি চেম্বার (সরকার) ফরাসী-হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। আজ উপাসনা ছাড়িয়া একাগ্রমনে তাঁহারা Slatuএর ভজনা আরম্ভ করিয়াছেন। মদ্য-বিক্রেতার রপ্তানী অভাবে মদ্য বিক্রয় হয় না। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেবতার নিকট বলি দিতেন। আজ তিনি Slatist, রাগিয়া Stateকে বলিলেন, যদি আমার মদ্য বিক্রয় না হয় ত তোমার ও প্রতিমূর্ত্তি পদাঘাতে ভাঙ্গিব—State তাড়াতাড়ি তাহার মদ কিনিয়া লইল, মদ্য-বিক্রেতা নব-তান্ত্রিক হইল।

প্রফেসার—মাহিনা অতি অল্প। শিক্ষা স্মৃতিমাত্র (cram)—মাহিনা কলের সর্দ্দারের তুল্য। তিনি বলিলেন, সমাজ আমার এই বহু বৎসরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম—বোতল বোতল তৈল-দাহন—চক্ষুদান, স্বাস্থ্যদান, সর্ব্বশাস্ত্র-স্মৃতি-ধারণ—ইহার মূল্য বুঝিল না—আমার প্রতি অত্যাচার করিল—এ পক্ষপাতী সমাজকে ভাঙ্গিতেই হইবে। প্রফেসার, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রিগণ নব তন্ত্রে দীক্ষা লইলেন।

লেফ্‌টানেন্ট মাহিনা পাইলেন—১০০ ফ্রাঙ্ক; সৈনা মাহিনা পাইলেন ।৴১০। State বলিল, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিতেছ—তোমার আবার মাহিনা কি? মাহিনা দিয়া তোমাকে এ সম্মানার্হ Citizen-পদ হইতে নামাইতে কখনই পারিব না। অনন্যোপায় সৈন্য সমাজতন্ত্রী হইল।—অন্তরের Slatism ও চতু-আশা দেশকে সমাজতান্ত্রিক করিয়া তুলিল!

দেশে মূর্খ হউক, ভদ্র হউক, ইতর হউক, সাধারণে একটা ভাব গ্রহণ করিল—পর্য্যায়ে সমগ্র দেশে সেই ভাব ছড়াইয়া পড়ে। এই মানসিক

স্পর্শ (mental contagion) ভদ্র-বংশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিকতার প্রসারের হেতু। ইহা ভিন্ন উন্নতমনা জন সমাজতান্ত্রিক দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। খ্রীষ্ট-দর্শনের উচ্চ জ্ঞান ও যোগ-বার্ত্তার পর এই নব-তান্ত্রিকতা একমাত্র তাঁহাদের উচ্চমুখী বৃত্তি সকলের সঞ্চালন-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্র।—আমরা প্রথম দফায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তনের যখন আজ্ঞা পাইলাম, তখন রাত্রি ১২টা। আমি ব্যাটারীর গর্ত্তে ছিলাম—টেলিফোন-খাতে গেলাম। টেলিফোনিষ্ট এক জন অর্দ্ধ-বর্ব্বর কর্স, অপর জন ইতালীয় অর্দ্ধ-জার্ম্মণ; ইহারা যুদ্ধাদি ব্যাপারে কখনও থাকে না। আমার প্রতি ব্যবহারে তাঁহারা সকল সময়ে সহৃদয় ছিলেন—আমরা তাঁহাদের বন্ধুত্বে উপকৃত। বিদায়কালে তাঁহারা আমায় দুই একটী কথা বলিলেন। কিরূপে সেনাদলেই সাধারণে সকল প্রকার দোষ করিতে অভ্যস্ত হয় (army is the school of all vice) কিরূপে রিভিউ হইতে অপহরণ, তাহার পর অপহৃতের কারাবাস, কারাবাসের পর তাহার চৌর্য্যবৃত্তি; নির্জ্জনতা হইতে পানদোষ; প্রবাসকষ্টে বেশ্যাসক্তি, এবং বর্ব্বর নিয়মের মধ্যে বর্ব্বরত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা জলদগম্ভীর ভাষায় আমায় বুঝাইয়া দিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে যথার্থ কথা কহিয়াছিলেন—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সব হইতে কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায়? তিনি বলিলেন, স্বদেশ-জ্ঞান পুঁছিয়া ফেল। (এইখান হইতেই তাঁর নূতনত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল)। বিপ্লব করিয়া সকল সেনানায়ককে মার—সব দেশ গরীবের ধনে পরিণত হউক। আমি বলিলাম, যদি জার্ম্মণেরা আমাদের মত না করে? তিনি বলিলেন, এইরূপ যাহাতে করে, তাহাই করিতে হইবে। আমি বলিলাম দেখিবেন, আগে যেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ না করি।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লববাদ জার্ম্মাণীর পরাজয়ের একটী অন্যতম কারণ; অন্ততঃ লুডেনডুফ এই কথা বলেন। ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-বাহিনীতে বিপ্লববাদী সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব দেখিয়া আমাদের স্পষ্ট বোধ হইত যে, শীঘ্রই আমাদের দেশে অধুনাতন জার্ম্মাণীর সমগ্র নাট্যাঙ্কগুলি অভিনীত হইবে। আমেরিকান না আসিলে আমাদের ফ্রান্সে একটী বড় রকমের অন্তর্বিপ্লব ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যুদ্ধের কয়েক বৎসর ভদ্রগণ সৈন্য-গণের সহিত যেরূপ হীন ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অকথ্য। যাহারা ফ্রান্সে

থাকিত, তাহাদের তরে ভাবিবার কেহ ছিল না। যদি তার Sweet-heart বা স্ত্রী থাকিতেন, যদি তিনি এই মহার্ঘ্য-সময়ে সহস্র দুঃখ সহ্য করিয়া, তাঁহার মন একাগ্র করিয়া রাখিতে পারিতেন, তবেই সৈন্য একখানি পত্র পাইত —গৃহে আসিলে তাহাকে ভালবাসিবার অথবা তাহার চিত্তবিনোদন করিবার কেহ থাকিত। বহু সৈন্যের পত্নী বা Sweet-heart পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণার্থ বা বৃদ্ধ পিতামাতা বা কনিষ্ঠ সহোদরের জীবনরক্ষণার্থ ব্যভিচার করিতে বাধ্য হইতেন। এ সকল কথা সত্য! সত্য! সত্য। সহরে দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্লব ছাড়া সৈন্যদের বসিবার কোনও আশ্রয় ছিল না। কর্দ্দমাক্ত বুট, ছেঁড়া পট্টি—বড় ওভার-কোট, রুক্ষ শরীর—সৈন্যগণ পশ্বাদিবৎ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, (কেহ তাহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিত না) অবশেষে বারাঙ্গনা-গৃহ বা শুণ্ডিকালয় তাহাদিগকে মুক্ত দ্বারদেশে সম্ভাষণ করিয়া লইত। প্রত্যহ সালোনিকা হইতে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, জঘন্য-আবরণ-[illegible] সৈন্যগণ রাত্রি ১২টার সময় মার্সেলিস সহরে আসিয়া পঁহুছিতেন। [illegible] কর্ম্মচারী ও কুলীদিগের জন্য train camp গাড়ী যোগাইতেন, কিন্তু [illegible] অভাগা (সমুদ্র-যাত্রার ক্লেশের পর) ২।৩ ক্রোশ হাঁটিয়া শীতে, বৃষ্টিতে [illegible] ক্যাম্পে কীট-পরিবৃত দেবদারু কাঠের খাটে শুইতে যাইত—কেহ তাহাদের একটা খবরও লইত না।—কাহারও দ্বারে দাঁড়াইলে সে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইতে যাইত।

[illegible] একটু অর্থব্যয়ে ও সহৃদয়তায় ব্যবসায়ী ও ভদ্রগণ সাধারণের [illegible] পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রম ও [illegible] সমুদ্র সৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে উভয়কেই অন্ততঃ কিছু কালের জন্য [illegible] হইতে হইবে।

[illegible] প্রভাবে, অনাবশ্যক স্ফূর্ত্তিবর্দ্ধক শিক্ষার প্রচার—রাজপূজা (Statism)—অল্প বেতন—গুরুভার বুরোক্রেসীর অত্যাচার ফরাসী-জীবনে হীনতর সমাজ-তান্ত্রিকতার প্রচারে সহায়তা করিয়াছে। mental contagionও এ বিষয়ে কম করে নাই। যুদ্ধকালে বড়লোকের ব্যবহারে—জাতিভেদ শুধু নয়—জাতি-যুদ্ধ (class war) শীঘ্রই ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

৪

[স্বদেশপ্রেম-হীন সমাজতান্ত্রিক ফরাসীদিগের স্বদেশ-রক্ষায় বীরত্ব—বিপৎকালে সংস্কারের

(Inconscient) প্রবণতা—খাত-নিবাসী ও আক্রমণে বহির্গত সৈন্যের মানসিক অবস্থায় পার্থক্য।]

সমাজতান্ত্রিকতার সম্মোহনে ফরাসী জীবন ক্রমে ক্রমে স্বদেশপ্রেমহীন হইয়া পড়িতেছিল। বিপ্লবের পর ফরাসীদিগের জীবন-মন্ত্র ছিল—Honour and fatherland। মাতৃভূমির প্রতিমূর্ত্তি ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও ফরাসীরা বিগত যুদ্ধে যে ত্যাগ ও বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে পৃথিবী, বিশেষতঃ জার্ম্মণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ আশ্চর্য্যান্বিত। যাহারা মাতৃভূমিকে বেশ্যা সম্বোধন করিতে পারে, তাহাদের এ স্বদেশরক্ষার পণ—অবাস্তর, অবোধগম্য। বাস্তবিক, ইহা সত্য, কিন্তু সনাতন সত্য নহে। শান্তিতে যে জীবন, যে মনের ভাব, বিপদে তাহা থাকে না। ব্যক্তিগত সমাজগত সকল জীবন সম্বন্ধেই ইহা সত্য। মাতৃভূমি আক্রান্ত—প্রজাতন্ত্রের এ সুখ আর পরাধীনতায় থাকিবে না। জাতিবিদ্বেষ—জার্ম্মণীর উপর প্রতিশোধ ইচ্ছা—ইত্যাদি মনোবৃত্তির আলোড়নে রাষ্ট্রজীবনের গভীরতম সূক্ষ্মতম স্তর পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল; সেথায় চির-ফরাসী-সুলভ স্বদেশপ্রেম ও যুদ্ধ-স্পৃহা নিদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তমিত হয় নাই—সঙ্কটকালে অতীত সংস্কার জাতীয় আত্মাকে অমিত-বলে ছুটাইয়া লইয়া চলে। মৃত ফরাসী-জীবনে প্রাণের অদ্ভুত তাড়না দেখিয়া বিশ্ব চমৎকৃত হয়।

আমরা নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছি—সৈন্যগণ, যাঁহারা সহরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিতেন—তাঁহাদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রস্থিত সৈন্যগণের মনোভাবের আদৌ মিল ছিল না। পিছনের সৈন্যরা মৌখিক বাচালতা-সহকারে 'যুদ্ধ চাই না' ইত্যাদি কথার আলোচনা করিত, কিন্তু সৈন্যনিবাসের বর্ব্বর-শাসনাধীন থাকায় তাহাদের চরিত্রে দাসভাবের বিশিষ্ট লক্ষণ পরি-লক্ষিত হইত। কিন্তু যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতেন, তাঁহাদের কথায় গভীরতা অনুভূত হইত। তাঁহারা সমাজতান্ত্রিকতার বহু আলোচনা না করিলেও, ইহার প্রভাব অল্প ছিল না। তাঁহারা একমনে কার্য্য করিয়া যাইতেন—নির্ভীকভাবে কথা কহিতেন—'জেনারল'কেও সেলাম করিতেন না—পরস্পরকে অধিক ভালবাসিতেন—আর দিনের পর দিন গণিয়া চাতুর্ম্মাসিক অবসরের অপেক্ষা করিতেন। সঙ্কটস্থলে সঙ্ঘবিশেষের কিরূপ মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। একই সৈন্য প্রতিজ্ঞা করিল, এবার আক্রমণের সময় পশ্চাৎবর্ত্তী হইব। যুদ্ধশেষে সেই

বীরত্বের war error পাইল। এরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে। খাতে থাকিতেও 'আমি' বলিয়া কিছু থাকে। আমার বুদ্ধি—আমার মত—আমার সুখ। কিন্তু খাত হইতে লাফাইয়া উপরে উঠিবামাত্র এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, প্রতি ইঞ্চ দিয়া 'মেশিনগানে'র 'বুলেট' ছুটিতেছে - ঝাঁকে ঝাঁকে সার্পনেল ও পারকাসেন শেল—ঝিন ঝিন গ্রেনেডের শব্দ—'টরপিডো'র ভৈরব রব—সম্মুখে কাঁটা তার—শত্রুর সঙ্গীন—তথায় 'আমি' (conscient) ডুবিয়া যায়—থাকে শুধু একজাতীয় প্রাণ, একটা উৎকট ঘৃণা - অবিশ্বাসীর প্রতি বিশ্বাসীর ঘৃণা—তাহাকে হত্যা করিয়াই বুঝি স্বর্গ - সে বুঝি নরকের পিশাচ গোব্রাহ্মণঘাতী—দেশের শত্রু—সমাজের শত্রু—মানব জাতির শত্রু। একটা আবেশ চিৎসাগরের ওপার হইতে আসিয়া সৈন্যসঙ্ঘকে পাগল করিয়া ছুটায়। কলের মত তাহারা অভ্রান্ত—আজ্ঞা পালন করে, এবং কর্ম্ম করে—প্রজ্ঞার একেবারে বিলোপসাধন হয়।

জাতীয় জীবনসঙ্কটেও ঐরূপ ফ্রান্স আত্মহারা হইয়া এক অতীত পিতৃপিতামহের অনৈসর্গিক প্রেরণাবশে ছুটিয়াছিল—কোথায় যাইতেছিল, জানিত না। এড্‌মিরেল 'টোগো' জলযুদ্ধে জয়ী হইয়া বলিয়াছিলেন—আমার পিতৃগণের প্রেতাত্মা আমায় চালাইয়া এই জয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছে। পিতৃপুরুষের পর পর হইতে সেই বড় চাওয়াটা সঙ্কটসময়ে এইরূপ বলবতী হয়ই বটে।

পরিশিষ্ট।

পূর্ব্বের অংশেই প্রতিভাত হইয়াছে, সমাজতান্ত্রিকতার সম্মোহনে ফরাসীজীবনের জাতীয় ভাব সকল নির্ব্বাপিত হয় নাই—ফরাসী-জীবন সে দিকে খুব স্থির জমাট (stable)। কিন্তু দেশে যে বাণিজ্যধ্বংসাদি অমঙ্গল ঘটিয়াছে, সম্মোহনে যে সাধারণের চিত্তবিক্ষোভ ঘটিয়াছে (disequilibrium of mental health) তাহা এখনও সমাজে বিষবৎ কার্য্য করিতেছে। সকলেই সন্ত্রস্ত, কখন কি হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুস রাষ্ট্র-বিপ্লবে ফরাসী-জীবনে এক বড় ছাপ দিয়াছে। বিপ্লবের নারকীয় প্রতিফল খবরের কাগজে—বক্তৃতায় সাধারণের সম্মুখে ধরায় বিপ্লববাদিগণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। সাধারণেরও সেরূপ বিপ্লবের দিকে ঝোঁক নাই।

ফরাসী সমাজে সমাজতন্ত্রক্লিষ্ট জনগণের Syndicate আদি দর্শনে আমাদের মনে হইত, সুস্থ ব্যষ্টি সকলেরও একটী সমবায় আবশ্যক। সম্প্রতি এই

ভাবে, সাধারণের (জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে) উন্নতিকল্পে National Solidarity League প্রভৃতি সমবায় স্থাপিত হইতেছে। যুদ্ধ-জয়েও এই বিপ্লববাদ ও জাতিবিদ্বেষ একটু প্রশমিত হইবে। কিন্তু বিপ্লবের বীজ জলবায়ুর অভাবে আজ প্রস্ফুটিত না হইলেও, ইহার স্ফুরণ অনিবার্য্য। আজ সে দুর্দৈবকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এক দিন তাহার সম্মুখীন হইতে হইবেই। সেদিন বড় দূরেও নহে।

শ্রীহারাধন বক্সী।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই সত্যবালার সহিত সুমতির পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সত্যবালা ধনাঢ্য-দুহিতা, তাহার সহিত সুমতির আত্মীয়তা গাঢ় হইলেও সুমতি প্রথম প্রথম তাহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত; সত্যবালা ইহা পছন্দ করিত না।

এক দিন সত্যবালা বলিল, 'আমি তোমাদের বাড়ী আসিলে ও রকম কর কেন ভাই?'

সুমতি বলিল, 'কি করি?'

সত্যবালা বলিল, 'আমি আসিলেই তুমি তাড়াতাড়ি আমার জন্য আসন আনিয়া দাও, আমার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়।'

সুমতি হাসিয়া বলিল, 'তুমি যে ভাই জমীদারের মেয়ে, কত ভাগ্যে তুমি আমাদের বাড়ী আস।'

সত্যবালা বলিল, 'হইলাম-ই বা জমীদারের মেয়ে, তাহাতে কি যায় আসে?'

সুমতি বলিল, 'কি জ্বালা! তুমি আসিয়া কি মাটীতে বসিবে? তোমাকে বসিতে আসন দিব না?'

সত্যবালা বলিল, 'কেন, আমি মাটীতে বসিলে কি ক্ষয়ে যাব?'

সুমতি বলিল, 'তাও কি হয়?'

সত্যবালা বলিল, 'তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমাকে দেখিতে আসি; ভালবাসার কাছে কি বড়লোক গরীব লোক আছে? দেখ, আর যদি তুমি

আমাকে এত আদর যত্ন কর—তা' হলে আমি কিন্তু তোমাদের বাড়ী আসিব না।'

সুমতি বলিল, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে। আর তোমাকে খাতির যত্ন করিব না। তুমি যাহাতে মনে ব্যথা পাও, তাহা কি আমি করিতে পারি?'

সুমতির মনে যে একটু সঙ্কোচ ছিল, সেই দিন হইতে তাহা তিরোহিত হইল। তাহাদের উভয়ের হৃদয় এক সূত্রে আবদ্ধ হইল। তাহাদের স্নেহের বন্ধন সুদৃঢ় হইল।

ন্যায়রত্নের বাড়ী ও তালুকদারের বাসা, এ উভয়ের ব্যবধান অধিক নহে। সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া অবকাশ পাইলেই সুমতি সত্যবালার সহিত দেখা করিতে যায়। সত্যবালাকে সংসারের কোনও কাজ দেখিতে হইত না। রাজার মেয়ে সে, তাহার ত অবকাশের অভাব নাই; ইচ্ছা হইলেই সে সুমতিদের বাড়ী বেড়াইতে আসে, এবং তাহার কাছে বসিয়া থাকে। সে দেখিতে পায়, সুমতি সকালে উঠিয়া ঘর নিকায়, বাসন মাজে; ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করে; মধ্যাহ্নে পাকশালার সকল কাজ করে—কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, উনান জ্বালে, ভাত রাঁধে, বৃদ্ধ পিতাকে পরমযত্নে খাইতে দেয়; অপরাহ্নে নানা প্রকার সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে। আবার কোনও প্রতিবেশীর বাড়ীতে কোনও বিপদ আপদ হইয়াছে শুনিলে, তাহাকে না ডাকিতেই সেখানে উপস্থিত হয়, রোগীর সেবা করে, ঔষধ খাওয়ায়, মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় রোগীর শিয়রে বসিয়া মধুরবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দান করে—ইহাও সত্যবালার অজ্ঞাত ছিল না।

সুমতি সারাদিনই পরিশ্রম করে। পরিশ্রমেই তাহার সুখ। শরীর-রক্ষার জন্য আহার করিতে হয়, তাই সে দুটি ভাত খায়, লজ্জা-নিবারণের জন্য কাপড় পরে; তাহার অশন-বসনে বিন্দুমাত্র আড়ম্বর বা বাহুল্যের পরিচয় ছিল না। কিন্তু সত্যবালা রসনা-পরিতৃপ্তির জন্য তৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিত, সে তাহার সুন্দর দেহ সুসজ্জিত করিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিত। আহার ও আমোদ, নিত্য নূতন বেশভূষা করা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও কাজ ছিল না। ভোগবিলাসে কখন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না, ভোগের মাত্রা, বিলাসের পরিমাণ যতই বর্দ্ধিত হয়, আকাঙ্ক্ষার অনলশিখা ততই হবিঃপুষ্ট হুতাশনের মত প্রবল হইয়া উঠে। সহস্র বিলাস ও প্রলোভনের মধ্যে পরিতুষ্ট হইয়াও সত্যবালা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না, সে নিত্য নূতন

অভাব অনুভব করিত। কিন্তু সুমতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, তাহার দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সত্যবালা তাহার জীবনের সহিত নিজের ঐশ্বর্য্য-মোহমুগ্ধ বিলাস-বাসনা-বিজড়িত জীবনের তুলনা করিত। বোধ হয়, প্রত্যেক নরনারীর পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক। সত্যবালার মনে নিজের উপর কেমন একটা ধিক্কার জন্মিয়া গেল! কিন্তু স্বর্ণপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া শ্যামলপল্লবসমাচ্ছন্ন বৃক্ষশাখার নিভৃত অংশে তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র নীড়ে বাস করিবার জন্য শারীর মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠে, সত্যবালার হৃদয়ের কোন্ গোপন প্রান্তে সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ায় সুমতির প্রতি তাহার অন্তর্নিহিত স্নেহ যেন শত-ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় সুমতি এক দিন অপরাহ্নে—সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া সত্যবালার বাসায় বেড়াইতে গেল। দুই সখীতে নানা সুখ দুঃখের গল্প করিতে করিতে কখন যে সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। শীত কাল। উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু বহিতেছিল। কিন্তু সুমতির গাত্রে শীত-বস্ত্র ছিল না। সত্যবালা সুদৃশ্য মূল্যবান শালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া ছিল, তথাপি তাহার মনে হইতেছিল, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, আর তাহার সম্মুখে দরিদ্রা ব্রাহ্মণকন্যা একবস্ত্রে উপবিষ্টা, অঞ্চল ভিন্ন তাহার দেহের অন্য কোনও আচ্ছাদন ছিল না। সত্যবালার মনে হইল, এই দারুণ শীতে—কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ায় সুমতির কতই কষ্ট হইতেছে! সে গল্প করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া গেল, এবং কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে নিজের একখানি মূল্যবান পশমী শীতবস্ত্র লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুমতির নিকট প্রত্যাগমন করিল, এবং সেই 'র‍্যাপার'খানি সুমতির সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া দিল। ইহাতে সুমতি মহা বিব্রত হইয়া পড়িল, সে অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। সে কোনমতেই তাহা গ্রহণ করিবে না, সত্যবালাও ছাড়িবার পাত্রী নহে। অবশেষে সত্যবালার মা সেই কক্ষে আসিয়া যখন সুমতিকে তাহা লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন সুমতিকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত র‍্যাপারখানি গায়ে রাখিতে হইল।

জমীদারের সংসারে যে সকল দাস দাসী ছিল, তাহাদের মধ্যে রমণী বহু দিনের পুরাতন পরিচারিকা। পুরাতন ভৃত্য হইলে কি হয়, দরিদ্র কৈবর্ত্তের মেয়ে রমণীর লোভ বড় বেশী। বড়লোকের ঝি বলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ মন

মাৎসর্য্যে পূর্ণ ছিল। 'রাজকন্যা' সত্যবালা দরিদ্রদুহিতা সুমতিকে সমকক্ষের মত দেখিয়া থাকে, এবং সুমতিও দরিদ্র প্রজার মেয়ে হইয়া জমীদার-নন্দিনীর সহিত অসঙ্কোচে 'মেলা মেশা' করে, ইহা দেখিয়া ঈর্ষ্যার আগুনে সে জ্বলিয়া মরিত। কিন্তু সে মনের জ্বালা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিত না। সত্যবালা তাহার গাত্রবস্ত্রখানি পরম স্নেহে সুমতির গায়ে জড়াইয়া দিল, ইহা দূর হইতে দেখিয়া তাহার মনের আগুন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সত্যবালা ও তাহার মায়ের পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রাদিতে তাহারই অধিকার— বিশেষতঃ সে সত্যবালাকে তাহার শৈশবকাল হইতে কোলে পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছে, আর আজ কোথা হইতে একটা গরীব বামুনের মেয়ে আসিয়া দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া সত্যবালার মন ভিজাইয়া তাহার অবশ্যপ্রাপ্য অমন সুন্দর 'র‍্যাপার'খানি হস্তগত করিল! ইহাতে রমণীর রাগ হইবারই কথা। সে রাগে ফুলিতে লাগিল, এবং কিরূপে এই 'বামনী'টাকে জব্দ করিবে, তাহার প্রভু-পত্নীর 'দুই চক্ষুর বিষ' করিয়া তুলিবে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিশেষতঃ প্রাচীনা পরিচারিকার প্রভাব প্রতিপত্তি অল্প নহে। মন্থরার কুমন্ত্রণায় রঘুকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রকেও চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল!

* * * *

অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ ন্যায়রত্নের শূলবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি মাটীতে পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতেছে, তথাপি সুমতি জমীদারের বাসা হইতে ফিরিল না কেন, ভাবিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা, বিলাসিনী তালুকদার-কন্যার সহিত সুমতির ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্নের মনে আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি রোগ-যন্ত্রণার উপর মানসিক অশান্তিতে কাতর হইয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুমতি গৃহে প্রত্যাগমন করিল। মূল্যবান পশমী 'র‍্যাপারে' তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন শতবৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। রোগের যন্ত্রণা তাঁহাকে তত দূর কাতর করিতে পারে নাই; কিন্তু পাছে সুমতি মনে কষ্ট পায়, এই ভয়ে তিনি তাহাকে এ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলিলেন না, কেবল একবার রুক্ষদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সুমতি পিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া 'র‍্যাপার'খানি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া

ফেলিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ন স্নেহ-কোমল-স্বরে কন্যাকে বলিলেন, 'মা, আমরা বড় গরীব। গরীব বটে, কিন্তু লোভী নহি; বিলাসের সহিতও আমাদের পরিচয় নাই। অবস্থায় যেরূপ কুলায়, সেইরূপ অল্প মূল্যের মোটা সূতার কাপড় ভিন্ন মূল্যবান পশমী কাপড় চোপড় ব্যবহার করা আমাদের শোভা পায় না। অনাবশ্যক অভাবের সৃষ্টি করা কি ভাল, মা?'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া লজ্জারক্তিমমুখে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; একটা কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

আমাদের দেহের কোনও স্থানে একটি ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইলেও যন্ত্রণায় অধীর হই, সামান্য অসুখ হইলে ভগবানকে নিষ্ঠুর মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগ করি, অভিমান করি, তাঁহার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। ন্যায়রত্ন বহু দিন হইতে শূলবেদনার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। এত কষ্টেও ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শূলবেদনা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুচিত্তে ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করেন। কিন্তু আজ তিনি যন্ত্রণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘ কাল সুস্থ থাকিবার পর এবার তাঁহার রোগের আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

ন্যায়রত্নের শয়নকক্ষে একখানি অতি সুন্দর পট ছিল। কৃষ্ণনগরের এক জন বিখ্যাত পটুয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিল। দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁহার পিতা দৈত্যকুল-কলঙ্ক ভগবদ্দ্বেষী দুর্ব্বৃত্ত হিরণ্যকশিপু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পুত্রের এই আত্ম-সমর্পণদর্শনে দারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারের অভিপ্রায়ে তাহাকে বিষ পান করাইতেছেন, হিরণ্যকশিপু রাজবেশ ধারণ করিয়া সশস্ত্র ভ্রুকুটী-কুটিল-মুখে প্রহ্লাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, প্রহ্লাদ স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, সুবর্ণনির্ম্মিত শূন্য বিষপাত্র তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পড়িয়া আছে; সুতীব্র হলাহল উদরস্থ হওয়ায় প্রহ্লাদের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ নীল হইয়া গিয়াছে, বিষের জ্বালায় তাঁহার ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত, ওষ্ঠাধর যেন মৃদুস্পন্দিত হইতেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া প্রহ্লাদ করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যেন সেই সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীহরির নিকট এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রহ্লাদের মুখে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত নির্ভরের ভাব চিত্রকরের তূলিকার দুই একটী রেখাপাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! চিত্রকর যেন সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছে। প্রহ্লাদ এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ একাগ্রচিত্তে ভগবানের করুণাকণা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা দেখিলে অতি কঠোরহৃদয় সংশয়বাদী নাস্তিকের হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য শ্রদ্ধা ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়ে।

ন্যায়রত্ন কত দিন ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে এই পবিত্র চিত্রখানি নিরীক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহার মানসনেত্রে কোন্ স্মরণাতীত যুগের একটী গৌরবময় উজ্জ্বল দৃশ্য মায়া-চিত্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত। তিনি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সেই চিত্রখানির দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

ন্যায়রত্ন আজ প্রবল শূলবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের যাতনারাশি যেন অশ্রুর আকার ধারণ করিয়া দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় বিগলিত হইতেছে। অবশেষে যন্ত্রণা যখন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি ঊর্দ্ধনেত্রে সেই প্রহ্লাদ-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, 'প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ, ধন্য তুমি, সার্থক তোমার ভগবদ্ভক্তি! বিষপানে তুমি যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ, তাহার সহিত আমার এই রোগ-যন্ত্রণার তুলনা হয় না। আমার রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা তোমার বিষের যন্ত্রণা কত অধিক! কিন্তু ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! ভগবানের প্রতি তোমার কি অটল বিশ্বাস! তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া বালক তুমি, এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলে; কিন্তু অধম আমি, মূঢ় আমি, আমার ত সে ভক্তি বিশ্বাস, নির্ভর করিবার সে শক্তি নাই; তাই বুঝি আমাকে পরাস্ত হইতে হইল। তুমি পাকা সোনা, বিপদের আগুনে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছ, আমি অসার অঙ্গারমাত্র—দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইলাম!'

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুদিত করিলেন, ভগবানকে ডাকিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'হে হরি, হে মধুসূদন, হে কৃপাসিন্ধু, তোমার করুণাবিন্দু দান করিয়া এ অধমের দুর্গতি দূর কর, রক্ষা কর।'

সুমতি পিতার যন্ত্রণা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, সে এক পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল, তাহার স্নেহকোমল চিত্ত আলোড়িত করিয়া এই প্রশ্নগুলিই পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতেছিল—'হায়, কি পাপে বাবার এই শাস্তি? যাঁর চরিত্র দেবচরিত্রের মত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র,

তাঁকে কেন এ রোগে ধরিল? এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তবু ভগবানে তাঁর কি অচলা ভক্তি! ভগবানের কি বিচার নাই?' সুমতির হৃদয় ক্ষোভে অভিমানে পূর্ণ হইল। পিতা 'কাতর-ভয়ভঞ্জন' হরিকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া সুমতি ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবা, তোমার এ যন্ত্রণা আর ত চক্ষে দেখা যায় না! তুমি আর হরিকে ডেক না, তাঁর নাম আর মুখে এন না; কেন তুমি তাঁকে দয়াময় কৃপাসিন্ধু বলে ডাক্‌ছ? যাঁর রাজ্যে এত রোগ, এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ কষ্ট, তাঁকে আর দয়াময় বলো না।'

ন্যায়রত্ন কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সুমতি, অনেক দিন পরে আজ আমার শূলবেদনা উপস্থিত হইয়াছে; আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে, এ কথা সত্য; ভগবান আমাকে কি পাপে এই শাস্তি দিতেছেন, তাহা জানি না; কিন্তু যন্ত্রণা পাইতেছি বলিয়া তাঁহার নাম লইব না? তাঁহার অনন্ত করুণায় সন্দেহ করিব? এত কাল ধরিয়া তোমাকে যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহার কি এই ফল? তোমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল সুমতি? হরি হে, তুমি যদি সদা সর্ব্বক্ষণ আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করাইতে, তাহা হইলে আমাকে এক দণ্ডও তোমার সঙ্গ ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত না। দুঃখের মেঘ মাথার উপর ঘনাইয়া না আসিলে ত তোমাকে মনে পড়ে না হরি! আমি অবোধ, অজ্ঞান; আমার অজ্ঞান তিমির নাশ করিয়া, তোমার উপর নির্ভর করিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি দান কর, দীনবন্ধু!'

ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার নীরব হইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'শূলের বেদনায় আমার যে কষ্ট না হইতেছে—তোমার মুখে ভগবানের প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমি তাহার শত গুণ অধিক কষ্ট পাইলাম। ভগবানে যাহার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, তাঁহার উপর যে নির্ভর করিতে না পারে, দুঃখ দুর্দ্দিনে সে কোথায় দাঁড়াইবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? দুদিন পরে আমি যখন ইহলোক ত্যাগ করিব, তখন তুমি কাহার শরণ লইবে? তোমার কি দশা হইবে ভাবিয়া মরণেও যে আমার শান্তি নাই সুমতি!'

ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল।

সুমতি ধীরে ধীরে বলিল, 'বাবা, আমার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিতেছি, হরির চরণে তুমি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, হরিই তোমার ধ্যান,

হরিই তোমার জ্ঞান। তোমার নিকট সংসার অসার, তিনিই তোমার সারাৎসার। তাঁহার প্রতি যাঁহার এত ভক্তি, এত বিশ্বাস, ভুলিয়াও যিনি কখনও অধর্ম্মাচরণ করেন না, তাঁহাকে হরি কেন এমন কঠোর রোগ দিলেন? তাঁহার পাদপদ্মে যাঁহার অচলা মতি, তাঁহার প্রতি হরির এত অকৃপা কেন বাবা?'

ন্যায়রত্ন কন্যার কথা শুনিয়া যেন মুহূর্ত্তের জন্য রোগের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন, তিনি আবেগভরে বলিলেন, 'আমার প্রতি হরির অকৃপা? ও কথা বলো না—বলো না! এমন কথা আর কখনও মুখেও আনিও না, মা! আমার প্রতি সত্যই তাঁহার দয়ার সীমা নাই। তাঁহার দয়া না থাকিলে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মন প্রাণ কখনও ব্যাকুল হয়? সংসারে সকলই অসার, জগৎ-সংসার অনিত্য, মায়াময়। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মন-সমর্পণে যে সুখ, যে আনন্দ, তাহা কি তাঁহার বিশেষ কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায়? তুমি রোগের কথা কি বলিতেছ? শরীর ধারণ করিলে রোগ ত হইবেই, তাহা নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। আমার শূল রোগ হইয়াছে, কিন্তু এ সংসারে কত লোককে আমার অপেক্ষাও কত অধিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে; ইহা অপেক্ষাও উৎকট ব্যাধির আক্রমণে কত লোক প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার কোনও সংবাদ রাখ কি? কেহ অন্ধ, কেহ বধির, কেহ চিরজীবনের জন্য বাক্‌শক্তি হারাইয়াছে। গলিত কুষ্ঠ রোগে কত লোকের হাত পা খসিয়া পড়িতেছে, দুর্গন্ধে তাহাদের স্ত্রী কন্যারাও তাহাদের নিকটে যাইতে পারে না! আমার শূল হইয়াছে, ইহার উপর যদি আমি অন্ধ, বধির, বোবা হইতাম, কুষ্ঠ রোগে যদি আমার হাত পা খসিয়া পড়িত, প্রাণাধিকা কন্যা তুমি, দুর্গন্ধে যদি তুমিও আমার নিকটে আসিতে—আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে অশক্ত হইতে, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি মা, আমার কি দশা হইত?'

পিতার কথা শুনিয়া সুমতি শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তালুকদার প্রজাদের নিকট টাকায় টাকা নজর ও টাকায় আট আনা হারে নিরিখ বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন; তদনুসারে যাহার বর্ত্তমান খাজানা

দশ টাকা, তাহাকে দশ টাকা নজর ও পনের টাকা খাজানা দিতে হইবে। এই প্রস্তাবে কোনও প্রজা সম্মত হইল না।

ন্যায়রত্ন গ্রামের প্রধান প্রজা; সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে চলে। তিনি প্রজাদের বুঝাইয়া যদি তাহাদিগকে সম্মত করাইতে পারেন, এই আশায় তালুকদার তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাবের অনুমোদন করা দূরের কথা, তালুকদারের মুখের উপর দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন।

তালুকদার বিজয় দত্ত নিরুপায় হইয়া অবশেষে কাজি সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাজটা তেমন ভালও হইল না; তিনি মুর্গীর আণ্ডা (এবং পরম বৈষ্ণব হইলেও) খাসী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী উপহার পাঠাইয়া ও যোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না। এ ক্ষেত্রেও তালুকদার আশানুরূপ ফল লাভ করিলেন।

এই সময় যিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার নামের সহিত এই আখ্যায়িকার কোনও সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তিনি কাজি সাহেবের এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহার ভগিনীপতি বাঙ্গালার সুবেদার, তাহার সাত খুন কেন, সাত শ খুন মাফ! সম্পর্ক-গৌরবে কাজি সাহেবের বুক অহঙ্কারে পাঁচ হাত ফুলিয়া উঠিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কাজি সাহেবের যুক্তি ও পরামর্শানুসারে প্রজার নিকট নজরাণা ও বর্দ্ধিত হারে খাজানা আদায়ের জন্য নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে অনেকটা স্থান ঘিরিয়া এক একটা প্রকাণ্ড খোঁয়াড় নির্ম্মিত হইল, এবং নজরের টাকা আদায়ের জন্য প্রজাদের গরু তাড়াইয়া লইয়া গিয়া সেই সকল খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করা হইল। বর্দ্ধিত হারে খাজানা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রজাদের ক্ষেতের পাকা ধান ক্রোক করা হইল। গরুগুলি খোঁয়াড়ের ভিতর দাঁড়াইয়া অনাহারে নীরবে চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিল। গরু অভাবে চাষাদের চাষ আবাদের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষেতের ধান ক্রোক করায় পাকা ধান ক্ষেতেই পড়িয়া নষ্ট হইতে লাগিল।

তখন গ্রামস্থ মাতব্বর প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া তালুকদারের নিকট দরবার করিতে আসিল।

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। তালুকদার সবেমাত্র পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াই বাহিরে আসিয়াছেন; তাঁহার মাথায় একটি নাতিদীর্ঘ টিকি, টিকির অগ্রভাগে একটি ফুল ঝুলিতেছে; তাঁহার নাসিকাগ্রে তিলক; গায়ে রেশমী নামাবলী, গলায় তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা, হরিনামের ঝুলিটি সোনার আংটায় সেই মালার সহিত আবদ্ধ। দেখিলেই মনে হয়, তালুকদার মহাশয় বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি, পরম সাধু পুরুষ!

তালুকদার বহির্ব্বাটীতে পদার্পণ করিয়া সমাগত প্রজাবর্গকে দেখিয়াই নিদাঘাপরাহ্ণের মেঘকান্তির ন্যায় মুখকান্তি অত্যন্ত গম্ভীর করিলেন, এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, 'কেমন হে বাবু সকল, সাধ মিটেছে কি না?'

এক জন প্রধান প্রজা সবিনয়ে উত্তর করিল, 'সাধ মিট্‌তে আর বাকি থাকল কি হুজুর! গরুগুলা আজ আট দশ দিন খোঁয়াড়ের মধ্যে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে ম'ল, ক্ষেতের পাকা ধান ক্ষেতেই শুয়ে পড়ল। আমাদের দশায় কি হবে ধর্ম্মাবতার!'

ধর্ম্মাবতার মুখের কদর্য্য ভঙ্গী করিয়া দন্তবিকাশপূর্ব্বক কর্কশস্বরে বলিলেন, 'কি হবে, তা কিছু দিন সবুর ক'রে থাকলেই দেখ্‌তে পাবি। যদি নজর সেলামী না দিস্, 'বৃদ্ধি' হারে খাজনা দিতে যদি রাজী না হ'স, তা' হলে এই হরিনামের মালা গলায় করে বল্‌ছি, ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গায় তোদের গরু বাছুর সব ভাসিয়ে দেব।'

প্রজা বলিল, 'আপনি পরম হিন্দু, হিন্দু রাজা হ'য়ে গোহত্যা করবেন হুজুর?'

তালুকদার বলিলেন, 'করব, করব, করব। এখন তোদের গরু ধরে এনেছি; এর পর তোদের জরু ধরে এনে বেইজ্জৎ করবো, তোদের ভিটেয় শর্ষে বুনে ঘুঘু চরাব—তবে আমার নাম—'

তালুকদার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আর যে সকল অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিলেন, তাহা ভাগবতের শ্লোক বলিয়া কোনও প্রজার বিশ্বাস হইল না। তাহারা অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এই অপমান তাহারা সহজে পরিপাক করিতে পারিল না। তাহারা একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল যে, তালুকদারকে নজর-সেলামী বা বর্দ্ধিত হারে নিরিখ, এই উভয়ের কিছুই দিবে না। তাহার বাড়ীতে আর

দরবার করিতেও যাইবে না। কোনও গ্রামবাসী তাহার সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না।

অতঃপর প্রজারা খোঁয়াড় ভাঙ্গিয়া স্ব স্ব গরু বাহির করিয়া লইয়া গেল। সেখানে যে সকল পেয়াদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা প্রজাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদের বাধা দেওয়া দূরের কথা, তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও সাহস করিল না। তাহারা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সংবাদ তালুকদারের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না; তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু হঠাৎ ইহার প্রতীকারের কোনও ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া লজ্জায় ও অপমানে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাড়ীর বাহিরে আসিলেন না। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার যে কয়েক জন হিন্দু পরিচারক ছিল, তাহারা আর চাকুরী করিবে না বলিয়া জবাব দিয়া গিয়াছে। ধোপা দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ী হইতে যে সকল কাপড় ধুইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহা সে বস্তা বাঁধিয়া ফেরত দিয়া গেল। তালুকদার এক দিন অন্তর দাড়ি-গোঁফ কামাইতেন; ক্ষৌরকর্ম্মের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নাপিত আসিল না; নাপিতকে ডাকাইবার জন্য এক জন পাইক পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন, সে তালুকদারকে কামাইয়া সমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে পারিবে না। হাট বাজার হইতে তালুকদারের লোক শূন্য-হস্তে ফিরিয়া আসিল; দোকানদারেরা বলিয়াছে, তাহারা তালুকদারকে এক ছটাক জিনিসও বিক্রয় করিবে না। সমগ্র প্রজাপুঞ্জের রুদ্ধ রোষানল হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া তালুকদারকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

তালুকদার একাকী অন্দরে বসিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া কত কথা চিন্তা করিলেন, কিন্তু অতঃপর তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় তিনি অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে কাজি সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিভৃতে উভয়ের যুক্তি পরামর্শ আরম্ভ হইল। দীর্ঘকাল পরামর্শের পর স্থির হইল, কাজি তাঁহার ভগিনীপতি অর্থাৎ সুবেদারের নিকট এতেলা করিবেন, তালুকদারের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে, নবাব-সরকারের মালগুজারী আদায় হইবে না। অতএব বিদ্রোহী প্রজাদের দমনের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, তালুকদার স্বয়ং সেই এতেলা লইয়া সদরে দরবার করিতে যাইবেন,

এবং এই অপমানের প্রতিবিধানের জন্য যদি দশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহাও তিনি করিবেন।

প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেরূপ স্থির ও গম্ভীর ভাব ধারণ করে, হরিরামপুরের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। গ্রামে কোনও গণ্ডগোল বা আন্দোলন, আলোচনা বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র রহিল না। প্রজারা নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের ক্ষেতের পাকা ধান কাটিয়া, ঝাড়িয়া, স্ব স্ব গোলায় তুলিতে লাগিল। তালুকদারের যে সকল পাইক তৈলপক্ব লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠী ঘুরাইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ভয় প্রদর্শন করিত,—প্রজাদের গরু ও জরু কাড়িয়া লইয়া যাইবে, কাহারও মান ও জান্ বজায় রাখিবে না,—তাহাদের কাঁধের লাঠী লগুড়াহত কুকুরের লাঙ্গুলের মত নতমুখ হইয়া তাহাদের বগলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের বাবরীর বাহার অদৃশ্য হইল, এবং তাহারা প্রজাদের সহিত চোখোচোখী হইলে মাথা গুঁজিয়া পথের এক ধার দিয়া নিতান্ত গোবেচারার মত নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে লাগিল। সে দম্ভ, সে জাঁক আর নাই! এমন কি, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তালুকদার পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ, কেহই তাঁহার সন্ধান পাইল না।

• • • •

সুমতি ও সত্যবালা সমবয়স্কা হইলেও তাহাদের অবস্থা সমান নহে, সুতরাং তাহাদের সখীত্ব-বন্ধনে তাহাদের পিতা মাতা সুখী হইতে পারিলেন না। ন্যায়রত্ন ভাবিতেছিলেন, জমীদার-কন্যার সহিত মিশিলে সুমতির অধঃপতনের পথই প্রশস্ত হইবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা যে আদর্শ সম্মুখে দেখিবে, তাহা তাহার পক্ষে কদাচ হিতকর হইতে পারে না, বিলাসের সহিত পরিচয় হইলে আর তাহার রক্ষা নাই। অন্য দিকে সত্যবালার মা ভাবিতেছিলেন, একটা লক্ষ্মীছাড়া হাভাতের মেয়ের সংসর্গে তাঁহার মেয়ে শীঘ্রই বিগ্ড়াইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ, জমীদার-গৃহিণীর আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক, এ কথা বলা যায় না। সুমতির সহিত ঘনিষ্ঠতায় সত্যবালার ব্যবহারে কেমন একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল, তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সত্যবালা সুমতিকে তাহার জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছিল; মনস্তত্ত্ববিদ্গণ ইহার কারণ স্থির করুন, কিন্তু মানব-জীবনের ইতিহাসে বহু বার প্রতিপন্ন হইয়াছে—দারিদ্র্যের চরণ-তলে রাজরাজেশ্বরের হীরক-রত্ন-খচিত উষ্ণীষ লুটাইয়াছে, আর্থিক ঐশ্বর্য্য দরিদ্রের প্রসন্নতা কামনা করিয়াছে। ইহার কারণ কি, বলা কঠিন; বোধ হয়,

ত্যাগে যে তৃপ্তি আছে—ভোগে তাহা নাই। বাল্যকাল হইতে সত্যবতী ভোগসুখে ও বিলাসেই প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু এত দিন পরে সুমতিতে সে নূতন কিছু দেখিয়াছে, সে আর পূর্ব্বের ন্যায় বেশভূষা করে না, ভাল কাপড় পরে না, গহনা গায়ে দেয় না, নূতন নূতন ফ্যাসানে পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধে না। বেশ-ভূষার প্রতি তাহার এই উপেক্ষা তাহার জননীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অপরাধটা সুমতিরই অধিক বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।

সত্যবালার মা মহামায়া কন্যার স্বভাবের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকল কথাই তাঁহার স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায়রত্নের নিকট যদি কোনও প্রকার সাহায্য পাওয়া যায়, এই আশায় তালুকদার প্রথমটা স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, ন্যায়রত্ন প্রজাগণের পক্ষ ভিন্ন কখনও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট কোনও সাহায্য পাইবারই আশা নাই, তখন তিনি এক দিন সত্যবালাকে নিকটে ডাকিয়া তাহাকে ন্যায়রত্নের বাড়ী যাইতে ও তাঁহার বিধবা কন্যার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিলেন।

পিতার কঠোর আদেশে সত্যবালা দুঃখিত হইল, কিন্তু তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, তাহার সেরূপ প্রকৃতিও ছিল না। সে পিতার এই ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিল না, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। সে ন্যায়রত্নের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল; কিছু দিন সুমতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

সুমতি সত্যবালাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিল, সেই মধুরহৃদয়া বিধবা পিতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, চিনিত না; তাহার পিতাই তাহার ধর্ম্ম, স্বর্গ ও তপস্যা। তাহার পর সত্যবতীকে পাইয়া, তাহার হৃদয়ের পরিচয় লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় সত্যবতীর প্রতি স্নেহে পূর্ণ হইয়াছিল, সে স্নেহ পবিত্র, স্বার্থ-সম্পর্ক-বিরহিত, স্বর্গীয়। সত্যবালাকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইয়া সুমতির মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; অবশেষে সে আর মন স্থির করিতে না পারিয়া, এক দিন অপরাহ্নে গৃহকার্য্যাবসানে তালুকদারের গৃহে উপস্থিত হইল।

সুমতিকে দেখিয়া তালুকদার-পত্নী মহামায়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তখন খোলা বারান্দায় বসিয়া সত্যবতীর চুল বাঁধিতেছিলেন; অদূরে সুমতিকে

দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন; তাহাকে কোনও কথা বলিলেন না। সরলা সুমতি ইহাতে দ্বিধা বোধ করিল না, অন্য দিন সে যে ভাবে তাঁহাদের নিকট বসিয়া গল্প করিত, সে দিনও সেইরূপ তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিল।

সুমতির এই নির্লজ্জতা—এইরূপ গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে আসা মহামায়ার অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি মহাধনবান তালুকদারের পত্নী, দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার শিষ্টাচারের যোগ্য নহে, তাহা তিনি জানিতেন। তাহার অপমান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না, সত্যবালাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'লোকে ত লোকের বাড়ী যায় না, তবে লোকে কেন বেহায়ার মত সেধে লোকের বাড়ী আসে? বেহায়াদের লজ্জা, সরম, অপমান—কোনও কিছুই নেই?'

সুমতি মহামায়াকে 'খুড়ীমা' বলিয়া সম্বোধন করিত; 'খুড়ীমা' যে তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া এরূপ বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন—সরলা সুমতির ইহা ধারণার অতীত। কিন্তু সে বিনা আহ্বানে তাঁহার পাশে বসিলেও তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না দেখিয়া সুমতি বলিল, 'খুড়ীমা, আজ তোমার মনটা ভার-ভার দেখ্‌ছি কেন?'

মহামায়া বলিলেন, 'আমার এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে একটা পেত্নীতে ধরেছে, তাকে ছাড়াই কি করে, তাই ভাবছি।'

ইতিমধ্যে এক জন দাসী আসিয়া আয়না, চিরুণী, সুগন্ধি কেশতৈল, চুল বাঁধিবার গুছি ও মূল্যবান একটি জরির ফিতা সত্যবালার সম্মুখে রাখিয়া গেল। ফিতাটি অতি মূল্যবান, দিল্লীর শিল্পীর নির্ম্মিত।

মহামায়া কন্যার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে সুমতিকে লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপমানমিশ্রিত বিদ্রূপ এতই সুস্পষ্ট যে, সুমতিই যে তাহার লক্ষ্য—ইহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সুমতি কি উপলক্ষ্য করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে—তাহাই সে ভাবিতেছে; এমন সময় মায়ের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্যবালা বলিয়া উঠিল, 'মা, যে দিন তুমি আমাকে সুমতিদের বাড়ী যেতে বারণ করেছ—সেই দিন থেকে আমি আর ওদের বাড়ী যাই না। সুমতিও না হয় আর কোনও দিন তোমাদের বাড়ী আস্‌বে না। কিন্তু সে তোমাদের কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যে, তাকে এমন ক'রে দশ কথা না শুনালেই নয়?'

কন্যার কথা শুনিয়া মহামায়া আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; মুখের কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'হাড়হাভাতে মেয়ের কথার যে ছিরি! অন্যায় এমন কি বলেছি যে, তুই আমাকে মুখ নেড়ে দশ কথা শুনিয়ে দিচ্ছিস্? সে এ বাড়ীতে আসে কেন? তাকে এখানে কে ডাকে?'

মহামায়ার গর্জ্জন কতক্ষণ চলিত, বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'মা, কর্ত্তা ফিরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে অনেক ফৌজ এসেছে।'

কর্ত্তা আসিয়াছেন শুনিয়া মহামায়া ও সত্যবালা উভয়েই তাঁহার সহিত দেখা করিতে উঠিয়া গেল; সুমতিও এতক্ষণে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে গৃহে ফিরিল। সে কি অপরাধে মহামায়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

কাজিসাহেব তালুকদারের পক্ষসমর্থন করিয়া তাঁহার ভগিনীপতি ফয়জুখাঁর নিকট যে এত্তেলা পাঠাইয়াছিলেন, সেই এত্তেলার বলেই হউক, অথবা তালুকদারের তদ্বিরের মাহাত্ম্যেই হউক, বিদ্রোহী প্রজাগণের শাসনের জন্য এক জন সুবেদারের অধীনে পঞ্চাশ জন পাঠান সৈন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। আদেশ হইয়াছিল, তাহারা আপাততঃ হরিরামপুরেই থাকিবে, এবং তাহাদের বেতন ও আহারাদির সমস্ত ব্যয় হরিরামপুরের প্রজাগণকেই বহন করিতে হইবে। তালুকদার মহালে প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল অতিথির আতিথ্য-সৎকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকায় স্ত্রী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের অবসর হইল না। মহামায়া তাঁহার জন্য কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া কন্যা সহ ফিরিয়া আসিলেন।

মহামায়া কন্যার কেশসংস্কার অসম্পূর্ণ রাখিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন; তিনি পুনর্ব্বার তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। তিনি দেখিলেন, আয়না, চিরুণী, ফুলেল তেল প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি সেই স্থানেই আছে—নাই কেবল সেই কারু-কার্য্য-খচিত মূল্যবান জরির ফিতাটি। তাহা অদৃশ্য হইয়াছে।

মহামায়া বিচলিতস্বরে বলিলেন, 'ফিতেটা দেখ্‌ছি নে কেন রে, ফিতে কে নিলে?'

রমণী দাসী পাশের ঘরে কাজ করিতেছিল; প্রভু-পত্নীর চীৎকার শুনিয়া আপন-মনেই বলিতে লাগিল, 'এত দিন এ সংসারে আছি, খড়কুটোটুকও

কখনও এদিক ওদিক হয় নি। এখন কত হবে, কত যাবে; চোখ আছে দেখ্‌বো, কান আছে শুন্‌বো।'

রমণীর এই মন্তব্য মহামায়ার কর্ণগোচর হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে লো রমণি! তুই বলছিস্ কি?'

দাসী উত্তর করিল, 'না মা, আমি কিছু বলি নি। হবে আবার কি? আমরা গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই, আমাদের মত আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিতে যাওয়া কেন? আমাদের মুখ বুজে চুপ্‌ করে থাকাই ভাল।'

মহামায়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'কেন লো, চুপ্‌ করে থাক্‌বি কেন? ফিতে কোথায় গেল, যদি জানিস্ ত শীগ্‌গির বল। নৈলে ঝাঁটা পেটা করবো, তা জানিস্?'

রমণী এবার তাহার হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া কর্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, 'তোমাদের এই রকমই বিচের বটে! ফিতে চুরী করলে এক জন, আর ঝাঁটা-পেটা করবে আমাকে? খাসা বিবেচনা যা হোক মাঠাকুরুণ, তোমার!'

মহামায়া বলিল, 'কে ফিতে চুরী করেছে—তা জানিস্ যদি, তবে বল্‌চিস্‌ নে কেন? বল্, কার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে—'

মহামায়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমণী তীব্রদৃষ্টিতে সত্যবালার দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, 'সত্যি কথা বলি ত দিদি রাগ করবে, আর যদি না বলি ত তুমি ঝাঁটা-পেটা করবে; ঐ যে কথায় বলে, 'বললে মা মার খায়—না বললে বাপে এঁটো খায়'—আমার হয়েছে সেই দশা। কাজ কি আমার এত ঝকমারিতে? আমার মাইনে পত্তর চুকিয়ে দাও, আমি দ্যাশে চলে যাই;—দ্যাশে আমার দ্যাওরের দেড় 'খাদা' ভুঁই আবাদ, আমার কি ভাতের দুক্কু?'

রমণী বীরদর্পে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল; তাহার চক্ষুতে জলের ধারা বহিল, সঙ্গে সঙ্গে নাক ঝাড়িবার ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ, গর্জ্জন ও বর্ষণ সমভাবে চলিতে লাগিল।

সত্যবালা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়াছিল; রমণীকে সক্রোধে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া সে বলিল, 'দেখ্‌ রমণি, সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি! আমি ত রাগ করে তোদের দু' বেলা ফাঁসি দিই! আমি কি জন্যে রাগ করতে যাব?

তুই যা জানিস্, এক্খুনি বল। আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলচিস্—এ তোর কি রকম আক্কেল ?'

রমণী এবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, কটিদেশে উভয় হস্ত সংস্থাপনপূর্ব্বক অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তবে রাগ করো না দিদিমণি! যেই তোমরা মায়ে ঝিয়ে কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে উঠে গেলে, আর তক্ষুণি, বল্লে না পিত্যয় যাবা, তোমার ভালবাসার ঐ সুমতি ঠাকরুণ এদিকে ওদিকে একবার তাকিয়ে টপ্ করে তোমার ফিতেটা তুলে নিয়ে পেট্ কোঁচড়ে গুঁজে ফেল্লে, তার পর উঠে চট্ করে স'রে পড়্‌লো! আমি ঘরের বদ্দি থেকে বামুনের মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দুটি চক্ষের মাথা খাই, যদি মিছে কথা বলে থাকি। এখনও দিনের পর রাত্তির হচ্চে, মাথার ওপর চন্দোর সূয্যি উঠ্‌চে। তয়ে এখনও আমার বুকের বদ্দি ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্চে। ধন্যি মেয়ে যা হোক, সাবাস বুকের পাটা!'

সত্যবালা ও তাহার মা যখন উঠিয়া যান, তখন সেখানে সুমতি ভিন্ন আর কেহ ছিল না, সুতরাং রমণীর কথা সত্য বলিয়াই মহামায়ার ধারণা হইল। কিন্তু সত্যবালা কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া জননীর অলক্ষ্যে খিড়কী দিয়া তাড়াতাড়ি বাসা হইতে বাহির হইল। মহামায়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে 'হাট্‌কুড়ি' 'সর্ব্বনাশী' সুমতির শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

সুমতি সবেমাত্র বাড়ী আসিয়া হাত পা ধুইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে— এমন সময় সত্যবালা ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাত দু'খানি ধরিয়া, কাতরস্বরে বলিল, 'দেখ ভাই, যে কাজ তুমি করে এসেছ—তা আমার বিশ্বাস না হ'লেও রমণী বল্‌ছিল, সে নিজের চোখে তা দেখেছে। সে মাকে সব কথা বলে দিয়েছে। কথাটা বাবার কাণে গেলে সর্ব্বনাশ হবে ভাই! তিনি যে রাগী মানুষ, প্রলয়কাণ্ড করে তুল্‌বেন। এ বিপদে আমাকে ভাই রক্ষে কর।'

সুমতি অবাক্ হইয়া সত্যবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে মানসিক চাঞ্চল্য ও বিস্ময় দমন করিয়া সত্যবালাকে বলিল, 'তোমার কথা ত আমি বুঝতে পাল্লাম না ভাই, আমি কি করেছি? রমণী কি দেখেছে, তোমার মাকেই বা কি বলেছে?'

সত্যবালা বলিল, 'আমার কাছে আর সে কথা লুকুচ্ছো কেন ভাই? ফিতেটা আমাকে ফিরিয়ে দাও, কথাটা যাতে চাপা পড়ে, আমি তার একটা উপায় করবো। তোমার বদ্‌নাম আমি সহ্য করতে পারবো না।'

সুমতি যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, 'ফিতের কথা কি বল্‌ছো বুঝতে পারচিনে?'

সত্যবালা বলিল, 'বুঝতে পেরেছ বৈ কি? মনের অগোচর ত পাপ নেই। আমার মাথার সেই জরির ফিতেটা কোথায়? দেখি তোমার পেট-কোঁচড়।'

এই কথা বলিয়াই সত্যবালা সুমতির পরিধেয় বস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু ফিতাটি তাহার নিকট পাওয়া গেল না। তখন সত্যবালা সুমতিকে তাহার কাপড় ঝাড়া দিতে বলিল।

সুমতি এতক্ষণে সত্যবালার অভিযোগ বুঝিতে পারিয়া ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যবালা! তুমি বল্‌ছ কি? আমি তোমার ফিতে চুরী করে এনেছি—এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়? এ কি অন্ন কলঙ্ক!'

সত্যবালা বলিল, 'আমি তোমাকে চুরী করতে দেখি নি, তোমার বদ্‌নামও করি নি। তুমি আমার ফিতে চুরী করবে—এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। তবে রমণী বলে যে, সে নাকি তোমাকে ফিতেটা পেট-কোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে আসতে দেখেছে!'

সত্যবালার কথা শুনিয়া সুমতির মাথা ঘুরিয়া গেল, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল,—এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'ভাই, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিধবা; তোমার ফিতে আমার কি কাজে লাগ্‌বে যে, আমি তা চুরী করে আন্‌ব?'

সত্যবালা বলিল, 'তবে আমার ফিতে গেল কোথায়? ফিতে ত পাখা মেলে করে উড়ে যায় নি, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ নিয়েছে; তা তুমি ছাড়া সেখানে আর কেউ ত ছিল না।'

সুমতি বলিল, 'এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমাকে যে দিব্যি করতে বলবে, সেই দিব্যি করে বলছি, তোমার ফিতে আমি ছুঁইও নি। এমন অসম্ভব কথাটা তুমি বিশ্বাস করলে—এ দুঃখ যে আমার মরলেও যাবে না।'

ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের এই সকল কথা হইতেছিল, ন্যায়রত্ন কিছু দূরে পিঁড়ায় বসিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি সত্যবালার কাছে আসিয়া তাহার মুখে কথাগুলি আর একবার শুনিলেন, তাহার পর সুমতিকে বলিলেন, 'মা, না বুঝে যদি সত্যবালার ফিতেটি এনে থাক, তবে এখনই ফিরিয়ে দাও। মানুষের পদে পদে মতিভ্রম হয়, বিশেষতঃ তুমি ছেলে মানুষ।'

সুমতি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল, পিতার কথা শুনিয়া দুঃখে, কষ্টে, অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, 'বাবা, তোমারও বিশ্বাস—সত্যবালার ফিতে আমিই চুরী করেছি! আমি ভগবানকে সাক্ষ্য করে বল্‌ছি, উহার ফিতে আমি স্পর্শও করি নি। যে কোনও দিন চুল বাঁধে না, চুলে চিরুণী ছোঁয়ায় না, ফিতের তার কি দরকার বাবা? আমার মন কি তুমি জান না বাবা?'

সত্যবালা মুহূর্ত্তের জন্যও সুমতিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে নাই, কেবল রমণী দাসীর কথা শুনিয়াই সে সুমতির কাছে ফিতার সন্ধানে আসিয়াছিল। সুমতির ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া সত্যবতী বুঝিল, সুমতি সত্য কথাই বলিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তাহার ফিতা চুরী করে নাই। চোর-সন্দেহে সুমতির পরিধেয় বস্ত্র অনুসন্ধান করায় সত্যবালার অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও লজ্জা হইল। সে সুমতিকে দুই একটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া বাড়ী ফিরিল। সে পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল, সুমতি চোর নয়, তবে কে ফিতা চুরী করিল? কাহার এত সাহস?

কিন্তু সুমতির মনে এ সকল প্রশ্ন উদিত হইল না; যে মিথ্যা কলঙ্কের ভার তাহার মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছিল—তাহার গুরু-ভার সে অসহ্য মনে করিল। দুঃখে, কষ্টে, লজ্জায়, ভয়ে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে শরাহত বিহঙ্গশাবকের ন্যায় ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল, এবং ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'মা জগদম্বা, এ আবার কি পরীক্ষা!'

* * * *

তালুকদার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কাজি সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

কাজি সাহেব অতি শীর্ণদেহ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায় পুরুষ। তাঁহার

অম্বিসার চিবুকে অল্প কয়েকগাছি 'খোদার নুর' আছে। তাঁহার মস্তকে ফকীরের টুপী, পায়ে পায়জামা, গায়ে কাল বনাতের চাপ্‌কান্‌, দেহের বর্ণের সহিত তাহা চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। তাঁহার জবা ফুলের মত লাল মোটা মোটা চক্ষু দুটা যেন অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে; গঞ্জিকার প্রেমে মুগ্ধ না হইলে চক্ষু সাধারণতঃ এরূপ 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' হয় কি না সন্দেহ।

কাজি সাহেব তাঁহার ভগিনীপতি ফয়জু খাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে দশমুখে প্রশংসা করিতেছেন, এবং তাঁহার এত্তেলার বলেই তালুকদার সুবেদারের অধীনে এতগুলি ফৌজ সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য, এবং ভগিনীপতির নিকট তাঁহার কিরূপ প্রচণ্ড খাতির ও প্রতিপত্তি, তাহার পরিচয় দিতেছেন। আবার তালুকদারও সত্য মিথ্যা নানা কথায়, ফয়জু খাঁ যে তাঁহার শ্যালকের এত্তেলায় যথেষ্ট খাতির সম্মান করিয়াছেন— ইহা সপ্রমাণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় সত্যবালার ফিতা-চুরী-সংক্রান্ত সকল বিবরণ দূতমুখে তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

কাজি সাহেব এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহার 'খোদার নুর' আন্দোলনপূর্ব্বক করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সকলই খোদাতালার মর্জ্জি! নইলে কি এমন সময় এমন ঘটনা ঘটে? সকল নষ্টের মূল সেই হারামজাদা বুড়ো বামুনটাকে জব্দ করিবার জন্য ইহা খোদার খেলা ভিন্ন আর কি? এমন সরেশ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।'

তালুকদার হর্ষবিগলিতস্বরে বলিলেন, 'আমি আর কি বলিব, আপনিই ধর্ম্মাবতার, কাজি। যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি করুন। কিন্তু সেই বিট্‌লে বুড়ো বামুনটা চক্রান্ত করিয়া আমার চূড়ান্ত অপমান করাইয়াছে, আমার মাথা কাটা গিয়াছে; ইহার উচিত বিচার আপনাকে করিতেই হইবে, বুড়োটা যেন জাল ছিঁড়িতে না পারে।'

কাজি বলিলেন, 'গোলা লোকে বামুন বেটার কি গুণ দেখিয়া তাহার খোসনাম করে বুঝি না, কিন্তু আমার আন্দাজ, এই বামুন বেটার মত পাজী নচ্ছার শয়তান এ দুনিয়ায় আর দুটি নাই। এই রায়ৎ ক্ষেপানোর মূলই সেই হারামজাদা, তাকে জব্দ করিতে পারিলে অন্য সকল রায়ৎ এক তাড়ায় শাসন হইয়া যাইবে। আপনি পীরের দরগায় সিন্নি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বিজয়া-দশমী।

১

নিবে আসে দিবাচ্ছটা প্রতিমার মুখে,
সজল-নয়ন ভক্ত দাঁড়ায় সম্মুখে ;
ধূপ-ধূম্র লতাইয়া,
চরণ পরশ নিয়া,
পুড়িয়া পুড়িয়া অই ভস্ম-অবশেষ,
লুটায় নির্ম্মাল্য পদে—বিমলিন বেশ।

২

স্তিমিত প্রদীপ-শিখা—ক্লান্ত সন্ধ্যারতি,
উৎসবের কোলাহলে সহসা বিরতি।
শিশু-মুখে নাহি হাসি,
ফুটে না কুন্দের রাশি,
ধীরে ধীরে কথা কয়—আঁখি ছল ছল,
গৃহিণী আঁচলে মুছে নয়নের জল।

৩

পূরবী গাহিছে দূরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,—
কে যেন কে ফিরিবে না—সাধিয়া সাধিয়া!
তরুপত্রে মরমর,
সমীরণে সর-সর,
কার যেন দীর্ঘশ্বাস উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
'চোক গেল'—সহে না ত, ডাকিছে পাপিয়া!

* * *

৪

অই ডুবে—অই ডুবে সোনার প্রতিমা—
নদী-জল আলো করি' রূপের পূর্ণিমা!
মেঘ-অন্তরালে পশি'
ভাবে দশমীর শশী—
যার পদনখরূপে এত রূপ তার,
সে আজি ডুবিল, ধরা করি' অন্ধকার!

৫

শিহরিল তরঙ্গিণী—স্তব্ধ কলগান,
ক্ষণতরে রুদ্ধ গতি,—বহিল উজান!
পুণ্য পরশনে নীর,
হর্ষে উচ্ছ্বসিল তীর,
তার-কণ্ঠে ভক্ত ডাকে—'মা গেল, কোথায়!'
কূলে-কূলে প্রতিধ্বনি করে 'হায় হায়!'

৬

যাও দেবি, কোন্ প্রাণে দিব গো, বিদায়!
ষষ্ঠীতে বোধন করি'—দশমী-সন্ধ্যায়,
ছিঁড়ি' হৃৎপিণ্ড, শিরা,
বিসর্জ্জিনু পুত্তলীরা-
নদী-জলে এ প্রতিমা! সে কি সহা যায়?
যাও দেবি,—বলিব না ; এস পুনরায়!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস।

[শ্রীযুক্ত মোনাহান মহোদয়ের সঙ্কলিত চতুর্থ প্রবন্ধের অনুবাদ।]

[নাগ-চোর বিক্রমশিলায় আগমন ;—অতীশের প্রতিশ্রুতি ও তিব্বতযাত্রা ;—তিব্বতের পথে অতীশের করুণার ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় ;—বধির স্থবিরের শাস্ত্রীয় আলাপ-শ্রবণ ;—অতীশের নেপালরাজ অনন্তকীর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎকার ;—তিব্বত রাজ্যে অতীশের সংবর্দ্ধনা ;—অতীশের দিব্য মূর্ত্তি ;—তিব্বত সম্বন্ধে অতীশের অভিমত ;—অতীশের মহাযান-মতবাদ-

ব্যাখ্যা, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার ও গ্রন্থ-রচনা ;—অতীশের মৃত্যু ও তাঁহার জীবনচরিত ;—নয়পাল-রাজত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—চেদিরাজের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি ;—নিয়ালতাগিনের বারাণসী-আক্রমণ ;—গয়ার মন্দির-লিপি ও নয়পাল-রাজত্বের স্থিতিকাল ;—চক্রদত্তের পরিচয়।]

খেয়া-ঘাটে নামিয়া তাঁহারা বরাবর বিহারে চলিয়া গেলেন। রাত্রি অধিক হইলেও, বিহারের এক জন অধ্যক্ষ পুরুষ তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন—তাঁহাদের পরিচয় কি, তাঁহারা কোথা হইতে আসিতেছেন, জানিয়া লইয়া,সদর-দ্বারের নিকটে একটি ধর্ম্মশালা দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা সেই ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করিলেন। পর দিন প্রাতে বিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইল! তাঁহারা প্রবেশ করিয়া তিব্বতীগণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপনীত হইলেন; ল্লা নামা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াও যিনি অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইতে সফলকাম হইতে পারেন নাই, সেই লোচাভ গিয়াৎসোন সেঞ্জেও সেই গৃহেই বাস করিতেছিলেন। গিয়াৎসোন সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে পুনঃপ্রত্যাগত হইয়া বিক্রমশিলায় অধ্যয়নে নিরত হইয়াছিলেন। বিহারে অবস্থান করিয়া বিহারের অধ্যক্ষ স্থবির রত্নাকরের ছাত্র হইবার নিমিত্ত গিয়াৎসোন নাগ-চোকে উপদেশ দিলেন।

নাগ-চোর বিক্রমশিলায় আগমন।

নাগ-চোকে কিরূপ ভাবে রত্নাকরের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল, তিব্বতীয় গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। রত্নাকর তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ-অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করিলেন। পর দিন এক বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন হইল। তাহাতে অতীশ প্রভৃতি বহু সুপণ্ডিত বৌদ্ধ ও বিক্রমশিলাধিপতিও সমবেত হইয়াছিলেন। বিক্রমশিলার অধিপতি, নয়পালের অধীনস্থ এক জন সামন্ত নৃপতি বলিয়াই অনুমান হয়। নাগ-চো এই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

নাগ-চো পরে অতীশের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন, এবং গিয়াৎসোনের সহায়তায়, পরিশেষে অতীশকে বহু ভবিষ্যভাষীর সহিত মন্ত্রণার পর তিব্বত-গমনে সম্মত করিতে পারিলেন ; দেড় বৎসরে হাতের কাজ শেষ করিয়া তৎপরে তিনি তিব্বতে যাত্রা করিবেন, অতীশ এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই তিব্বত-যাত্রার সঙ্কল্প অপ্রকাশ রাখিতে হইয়াছিল ; কারণ, প্রকাশ হইলেই স্থবির রত্নাকর প্রভৃতির বাধা দিবার আশঙ্কা ছিল।

অতীশের প্রতিশ্রুতি ও তিব্বত-যাত্রা।

এই দেড় বৎসর নাগ-চো অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিলেন। কথিত আছে, এক দিন নাগ-চো ও গিয়াৎসোন অতীশের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি

বলিয়াছিলেন,—'তোমরা লোচাভ সম্প্রদায় বড়ই উৎসাহী। গিয়াৎসোনের নিকট তোমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি। তাহার নিকট হৃদয়বিদারক জ্বলন্ত বর্ণনা শুনিবার পর, তিব্বতরাজের যন্ত্রণার কথা মনে করিতেও আমার হৃৎকম্প হয়—তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু বস্তুতঃই আক্ষেপের বিষয়। পাপিষ্ঠ গারলোগ-রাজকেও আমি করুণার চক্ষে দেখি,—নরকে ভিন্ন তাহার অন্যত্র স্থান হইবে না।' অবশেষে অতীশের তিব্বত-যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে, রাত্রিযোগে গোপনে ত্রিশটী অশ্বে তাঁহার মালপত্র বিক্রমশিলা হইতে মিত্র-বিহারে প্রেরিত হইল। এই বিহারটি গঙ্গার উত্তর তীরে নেপালের পথে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অতীশ তৎপরে বৌদ্ধদিগের অষ্টমহাস্থান অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জীবনের আটটি প্রধান ঘটনার লীলাক্ষেত্র দর্শনের নিমিত্ত তিব্বতবাসিগণের সহিত তীর্থ-যাত্রা করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। স্থবির বোধ হয় অতীশের অভিসন্ধি বুঝিয়াছিলেন; তিনিও তাঁহাদের সহযাত্রী হইবেন বলিয়া আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহারা আরও ষাট জন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ-দর্শনে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বিক্রমশিলায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অতীশ পুনরায় মিত্র-বিহার হইয়া নেপালের স্বয়ম্ভূ চৈত্য-দর্শনে গমন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, অতি দূর পথ বিবেচনায় অধিকসংখ্যক লোক সঙ্গে লইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। রত্নাকর তখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন,—অতীশ তিব্বতে যাইবার বাসনা করিয়াছেন। রত্নাকর ইচ্ছা করিলেই অতীশের তিব্বত-যাত্রা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, অতীশ নির্ম্মলচিত্তে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিব্বত-গমনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, এবং অতীশের দর্শনলাভের নিমিত্ত তিব্বতীয়গণও বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং তিনি সমুদারচিত্তে অতীশকে তিব্বতগমনের নিমিত্ত তিন বৎসরের বিদায় দিলেন, এবং যথাসময়ে তিনি যাহাতে প্রত্যাগমন করেন, তৎসম্বন্ধে নাগ-চোকে অঙ্গীকার করিতে বলিলেন। নাগ-চো তাহাতে সহসা সম্মত হইলেন না। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল,—তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে অতীশ আপন ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিবেন। এইরূপে ১০০০ সালে অতীশ বহু লোকলস্কর লইয়া বিক্রমশিলা হইতে মিত্রবিহারে যাত্রা করিলেন। তিব্বতীয়গণ, নাগ-চো, গিয়াৎসোন সেঙ্গে এবং তাহার ভ্রাতা বীর্য্যচন্দ্র, পণ্ডিত ভূমি-গর্ভ ও মহারাজ ভূমিসঙ্ঘ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে জনৈক রাজভিক্ষু

বলিয়া মনে হয়। অতীশকে বিদায় করিয়া দিবার সময়, স্থবির সত্য সত্যই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—ভারতের অমঙ্গল-সূচনা দেখা দিয়াছে—বহুসংখ্যক তুরুষ্ক অর্থাৎ মুসলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে; তাঁহার চিন্তার কারণ হইয়াছে। মিত্রবিহারের ভিক্ষুগণ অতীশ প্রমুখ ব্যক্তি-বর্গকে সোৎসাহে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর, নেপাল-সীমান্তের সন্নিধানে ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র বিহারে, এবং সীমান্ত অতিক্রম করিয়াই তীর্থক সম্প্রদায়ের দীক্ষাগ্রহ আচার্য্যগণের দ্বারায় তাহাদিগের একটি পুণ্য ক্ষেত্রে তাঁহারা তুল্যরূপে অভ্যর্থিত হইলেন। বৌদ্ধ-বৈরী কতিপয় শৈব কর্তৃক অতীশের প্রাণবধের নিমিত্ত অষ্টাদশ জন দস্যু প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অতীশের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নির্ব্বাক্‌ ও নিশ্চল হইয়া রহিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া অতীশ বলিলেন—'দস্যুদের দেখিয়া আমার করুণার উদ্রেক হইতেছে।' এই বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বালুকার উপর কয়েকটি মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত দস্যুবর্গের সংজ্ঞা-লাভ ঘটিল।

এই পথ-ভ্রমণ-ঘটিত কতকগুলি আজগুবী গল্প আছে,—তাহা হইতে অতীশের করুণা ও চিত্তের কোমলতাই প্রকাশ পায়। একটি গো-পালকের পরিত্যক্ত বাথানে তিনটি কুকুর-ছানাকে অযত্নে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, 'আহা, বেচারাদের দেখিলে দুঃখ হয়' বলিয়া তিনি তাহাদের তুলিয়া লইয়া আপনার পরিহিত পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে করিয়া কিছু দূর লইয়া গিয়াছিলেন।

তিব্বতের পথে অতীশের করুণার ও অলৌকিক শক্তির পরিচয়।

সেই কুকুরগুলির বংশ নাকি এখনও র‍্যাডেং নামক স্থানে দৃষ্ট হয়,—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। অতীশ উপঢৌকন দিবেন মনে করিয়া একখানি চন্দন কাঠের ক্ষুদ্র টেবিল লইয়া যাইতেছিলেন। নেপালে একটি স্থানে তাঁহাকে এক দিন রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। সেই স্থানের রাজা অতীশের নিকট টেবিলখানি চাহিলেন, কিন্তু অতীশ তাহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাকে পথে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি দস্যুকে লেলাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অতীশ সেই পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, ভূমিতে অদ্ভুত ছবি আঁকিয়া দস্যুগণকে মূর্চ্ছাগ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং কিয়দ্দূরে নিরাপদ স্থানে অগ্রসর হইয়া পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ও তাহাদিগের অভিমুখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পর দিন তাঁহারা নেপালের স্বয়ম্ভু তীর্থে উপনীত হইলেন। সে স্থানের রাজা তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে অভ্যর্থিত

করিলেন। গিয়াৎসোন সেখ্রে সেই স্থানে জ্বরে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার মৃত্যু হইল। কেহ কেহ বলেন, অতিথির মৃত্যু হইলে গৃহস্বামীই তাহার ধনাধিকারী হয়. এইরূপ স্থানীয় প্রথা থাকায়, তাহারই প্রভাব এড়াইবার নিমিত্ত গিয়াৎসোনকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন,—পাছে স্থানীয় শাসনবিভাগ হইতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইয়া বিলম্ব ঘটে, এবং উৎপাত উপদ্রবের আবির্ভাব হয়, তাই গিয়াৎসোনের মৃতদেহ নদীতীরে লইয়া গোপনে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, তিনি জীবিতই রহিয়াছেন—ইহাই প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রাতে তাঁহার শয্যা ও পরিচ্ছদাদি একখানি ডুলিতে করিয়া বহিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। স্বয়ম্ভু হইতে অতীশ নৃপতি নয়পালের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন,—নাগ-চো তাহা তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন।

অতীশ তৎপরে সদলবলে পলপা জেলার অধীন হোলখা নামক স্থানে চলিলেন, এবং তথায় এক মাস কাল একটী বধির বৌদ্ধ জ্ঞানী পুরুষের অতিথি হইয়া রহিলেন।—সেই বৌদ্ধ জ্ঞানী সাধারণ্যে বধির স্থবির নামেই পরিচিত ছিলেন। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতীয় ইতিহাসের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—এই বধির স্থবির অতীশের নিকট ছয় দিন ধরিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলাপ শুনিয়াছিলেন ; ইহা কতকটা অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়।

বধির স্থবিরের শাস্ত্রীয় আলাপ-শ্রবণ।

তৎপর তাঁহারা পলপার সমতল ক্ষেত্রে—পলপই-থানে পঁহুছিলেন। তৎকালে নেপালরাজ অনন্তকীর্ত্তি তথায় দরবার করিতেছিলেন। বিশেষ আন্তরিকতার ও শ্রদ্ধার সহিত অতীশ নৃপতি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন ; অতীশ তাঁহাকে একটি হস্তী উপঢৌকন দিয়া প্রার্থনা জানাইলেন,—উহার বিনিময়ে অনন্তকীর্ত্তিকে ঐ স্থানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে, তাহার নাম হইবে থান-বিহার ;—তদনুসারে এই বিহার পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজার পুত্র, যুবরাজ পথপ্রভাও তৎকালেই অতীশ কর্ত্তৃক ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হয়েন।

অতীশের নেপালরাজ অনন্তকীর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎকার।

তাহার পর অতীশ সদলে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতেই চারি জন অধিনায়কের অধীনে শতসংখ্যক দেহরক্ষী অশ্বারোহী তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ; তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্তই উহারা প্রেরিত হইয়াছিল। প্রতি সেনাপতির অধীনে ষোলটি করিয়া শ্বেতপতাকাবাহী বর্শাধারী ছিল ; অন্যান্য

তিব্বত রাজ্যে অতীশের সংবর্দ্ধনা।

দেহরক্ষিগণের হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা ছিল; তন্মধ্যে বিংশতি জনের হস্তে সাটিনের ছত্র বিরাজ করিতেছিল। বাদিত্র দলের হস্তে ফ্লুট, ব্যাগপাইপ, গীটার ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ছিল।

তিব্বতীয় ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে,—উদাত্তগম্ভীর স্বরে "ওম্-মণিপদ্মে-ওম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারা মগধের ঋষি পুরুষের নিকট অগ্রসর হইয়া তিব্বতরাজের সবহুমান্ অভ্যর্থনা প্রদান করিলেন। উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত রহিয়াছে;—

"তিব্বতরাজের প্রতিনিধির নাম নারী-চো সুম্পা; তিনি তাঁহার পাঁচ জন সঙ্গী লইয়া অতীশকে প্রায় সাড়ে বারো ভরি সোনা, এক থালা নালী গুড়, ও চীনের ড্রেগন-মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত পেয়ালায় করিয়া তিব্বতীয় প্রথায় প্রস্তুত চা অতীশকে উপহার দিয়াছিলেন। চা প্রদান করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন,—'হে মহাপুরুষ, অনুমতি করিলে এই দিব্য পানীয় প্রদান করিতে পারি, কল্পবৃক্ষের রস-সার ইহাতে নিহিত রহিয়াছে।"

অতীশ, উপরিভাগে, পদোচিত উন্নত স্থানে কোমল আসনে বসিয়াছিলেন; তিনি উত্তর করিলেন,—অবস্থা-পরম্পরায় শুভই সূচনা করিতেছে। এই মূল্যবান পদার্থে নির্ম্মিত বিচিত্র পেয়ালায় কল্পবৃক্ষের সঞ্জীবনী-সার রহিয়াছে। এই পানীয়ের তোমরা এত আদর কর,—ইহার নাম কি? লোচাভ বলিল,—'গুরুদেব, ইহার নাম চা; তিব্বতের ভিক্ষুগণও ইহা পান করিয়া থাকেন। চা'র গাছ খায় বলিয়া আমরা জানি না; তবে চা'র পাতা ক্ষার, লবণ ও মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া গরম জলে মথিত করিয়া, সেই সুপ পান করিয়া থাকে। ইহার বহু গুণ।' অতীশ বলিলেন—'তিব্বতের ভিক্ষুগণের পুণ্য হইতেই চা নামক এই উৎকৃষ্ট পানীয়ের উদ্ভব হইয়া থাকিবে।'

অতীশ অবসরমত তিব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে জো-না চেন্-পো নামক স্থানে নাগ-চোর বাড়ীতে নাগচোর অতিথি হইয়া এক মাস কাটাইলেন। একবার মানসরোবরের (তিব্বতীয় ভাষায় 'মা-ফাম') ডক মযোলিন নামক স্থানে সপ্তাহ কাল বিশ্রাম করিলেন। তিব্বতীয় ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে,—তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়-বাসী আচার্য্য শান্ত রক্ষিতকে ভারতের সীমান্ত হইতে তিব্বতে আনয়ন করিবার সময়, রাজা খি-স্রং-দেত্‌সানের মন্ত্রিগণ যেমন অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, অতীশের পথিভ্রমণকালেও দেহরক্ষী দলের অধিনায়কগণ তেমনই অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গান করিয়া-

ছিলেন। সেনাপতি-প্রধানের অভ্যর্থনা-বাক্য পুরুষপরম্পরাক্রমে আমা- দিগের হস্তগত হইয়াছে; তাহাতে তিব্বতের ও তিব্বত-রাজের সুকৃতি ও অতীশের শুভাগমনে দেশের যে সকল উপকার সাধিত হইল, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সেই অভ্যর্থনা-বাক্যে সেনাপতি নিবেদন করিয়াছেন;—'ভারত- বর্ষে যে ধর্ম্মগত উন্নতি বিদ্যমান রহিয়াছে, এতদ্দেশে তাহার অভাব থাকিলেও, এ স্থানে এমন অনেক সুবিধা আছে, যাহা ভারতবর্ষে খুঁজিলেও মিলিবে না। এখানে—পুরুগিয়াল দেশে,—তীব্র রৌদ্র নাই, সর্ব্বত্রই আলোকোজ্জ্বল নির্ঝর —সর্ব্বত্রই স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী রহিয়াছে। শীতকালেও তিব্বতে তেমন তীব্র শীত অনুভূত হয় না। তিব্বতের পর্ব্বতরাজির পাদপাশ্রিত পৃষ্ঠ সাধারণতঃ উষ্ণ,—সেই উষ্ণতাই শীত ঋতুতে এ দেশকে উপভোগ্য করিয়া তুলে। বসন্ত- কালে এ দেশের নর নারী আহার্য্য বস্তুর অভাব বড় বোধ করে না, এ স্থানে পক্ক শস্যই প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। শরৎকালে উপত্যকায় অধিত্যকায় ও পর্ব্বতপৃষ্ঠে—সর্ব্বত্রই শস্যের প্রাচুর্য্য হেতু, এ দেশ মরকত-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে।' এই অভ্যর্থনার উপসংহারে সেনাপতি-প্রধান 'লো-আ লো মা লো লা লো লা ইত্যাদি' সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ অতীশের অশ্ব সুবর্ণ-হংসের ন্যায় ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেছিল; এবং অতীশ, সময়ে সময়ে, অপর সাধারণ হইতে আপনার অসাধারণত্বের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অর্দ্ধ-হস্ত-পরিমিত নিরবলম্ব শূন্যে উত্থিত হইতেছিলেন। তাঁহার বদনে সতত স্মিতহাস্য বিকশিত; তাঁহার অধরোষ্ঠে সতত সংস্কৃত মন্ত্র পরিস্ফুরিত হইতে- ছিল। তাঁহার মূর্ত্তি—সদানন্দের মূর্ত্তি; প্রায় প্রতি বাক্যের শেষেই তিনি বলিতেছিলেন—'অতি ভাল, অতি মঙ্গল, অতি ভাল হয়।'

অতীশের দিব্যমূর্ত্তি।

তিব্বতবাসিগণের সদানন্দ প্রফুল্ল প্রকৃতি দেখিয়া বর্ত্তমান পর্য্যাটকগণ যেরূপ চমৎকৃত হয়েন, অতীশও সেরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহরক্ষী- দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন— 'তিব্বত-রাজের এই ভৃত্যগণের আনন্দ-উল্লাস গন্ধর্ব্বরাজ প্রমোদের আনন্দ উল্লাসকেও অতিক্রম করিয়াছে। হিম- বৎ প্রদেশ সত্য সত্যই অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্রশিষ্যের স্থান। কারণ, তিনি না হইলে, এই উদ্দাম ও ভীষণপ্রকৃতিক তিব্বতীয়গণকে কে সংযত করিল! এই যে এত উদ্দাম প্রকৃতি, তথাপি তাহারা কেমন উৎফুল্ল, কেমন মনোরম।'

তিব্বত সম্বন্ধে অতীশের অভিমত।

অবশেষে অতীশ থোলিন পঁহুছিলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। প্রজাবর্গকে অতীশের ধর্ম্মোপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে ত্রয়োদশ বর্ষ বাস করিবার কালে, অতীশ মহাযান-মতবাদ-ব্যাখ্যায় ও বিশুদ্ধ-বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিব্বতের মূর্খ বিপথ-চালিত লামাগণ তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক অবৌদ্ধ সংস্কার আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কথিত হয়, অতীশ ঐ সকল লামাদিগকে সৎমার্গ প্রদর্শন করেন, এবং তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ঐ সকল অবৌদ্ধ সংস্কার বিদূরিত করেন। এই কালের মধ্যে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কতিপয় নাম আমাদের গোচরে আসিয়াছে; যথা—

অতীশের মহাযান-মতবাদ-ব্যাখ্যা, বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার ও গ্রন্থ-রচনা।

(১) বোধিপথপ্রদীপ, (২) চর্য্যাসংগ্রহপ্রদীপ, (৩) সত্যদ্বয়াবতার, (৪) মধ্যমোপদেশ, (৫) সংগ্রহগর্ভ, (৬) হৃদয়নিশ্চিত, (৭) বোধিসত্ত্বমাল্যাবলী, (৮) বোধিসত্ত্ব কর্ম্মাদিমার্গাবতার, (৯) শরণাগতাদেশ, (১০) মহাযানপথসাধন-বর্ণসংগ্রহ, (১১) সূত্রার্থ-সমুচ্চয়োপদেশ, (১২) দশকুশলকর্ম্মোপদেশ, (১৩) কর্ম্মবিভঙ্গ, (১৪) সমাধিসম্ভবপরিবর্ত্ত, (১৫) লোকোত্তরসপ্তকবিধি, (১৬) গুরুক্রিয়াক্রম, (১৭) চিত্তোৎপাদসম্বরবিধিক্রম, (১৮) শিক্ষাসমুচ্চয় অভিসময়, (১৯) বিমলরত্নলেখন।

১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে লাসার নিকট নেথান নামক স্থানে অতীশের মৃত্যু হয়। তিব্বতের প্রথম লামা-পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রোমতান তাঁহারই মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন; এবং ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রোমতানই তাঁহার গুরুর চরিতাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন।

অতীশের মৃত্যু ও তাঁহার জীবনচরিত।

নয়পালের রাজত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ঘটনা—চেদিরাজ কর্ণ কলচুরির সহিত তাঁহার সংগ্রাম। ইহা তাঁহার রাজ্যকালের প্রারম্ভেই সংঘটিত হইয়াছিল। কোনও কোনও চেদি-লেখ-মধ্যে এই যুদ্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক অনূদিত তিব্বতীয় বৌদ্ধ ইতিহাসেও প্রাপ্ত হওয়া যায়;—নয়পালের অনুরোধক্রমে অতীশ যখন বিক্রমশিলার মহাস্থবিরের পদ গ্রহণ করেন, ঐরূপ সময়ে কর্ণ কর্ত্তৃক মগধ আক্রান্ত, এবং নয়পালের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়; এবং কর্ণ গৌড়ের রাজধানীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পরিশেষে নয়পাল জয়যুক্ত হয়েন, এবং উভয় শক্তি স্থাপন করেন। নয়পালের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রায় তিন বৎসর পরে, অনুমান ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে, এই

নয়পাল রাজত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—চেদিরাজের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি।

সন্ধি হইয়াছিল,—এবং অতীশ এই সন্ধি-সংঘটনে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন।

নিয়ালতাগিনের বারাণসী-আক্রমণ।

আবুল-ফজল-রচিত তারিখ-ই-বাইহাকি নামক পারস্য ইতিহাস-গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে,—১০৩১ খৃষ্টাব্দে নিয়ালতাগিন বারাণসী আক্রমণ করেন। তিনি সুলতান মামুদের পুত্র গজ্নী-অধিপতি সুলতান মামুদের অধীনে লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, এই আক্রমণকালে, বারাণসী নয়পালের রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত ছিল। পক্ষান্তরে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, নয়পালের পূর্ব্বাধিকারী মহীপালের সময়েই বারাণসী চেদির কুলচুরি-বংশের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার কোনও মতই অসন্দিগ্ধ বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, তারিখ-ই-বাইহাকির এক স্থানে দৃষ্ট হয়,—নিয়ালতাগিন তাঁহার সৈন্যদল সহ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া নদীর বাম তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে পর দিন প্রত্যূষে বারাণসীতে উপস্থিত হয়েন, এবং ক্রমে তাহার কাপড়ের বাজার, গন্ধদ্রব্যের বাজার এবং মণিরত্নের বাজার—এই তিনটী বাজার লুণ্ঠন করিয়া অপরাহ্ণে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

উত্তর-ভারতের মুসলমান-বিজয়ের প্রথম ভাগে বারাণসী ধারাবাহিকরূপে বহুবার আক্রান্ত হইয়াছে। নিয়ালতাগিনের আক্রমণ সেই সকলের প্রথম আক্রমণ।

গয়ার মন্দির-লিপি ও নয়পাল রাজত্বের স্থিতিকাল।

গয়ার দুইখানি মন্দির-লিপিতে নয়পালের রাজ্যকালের পঞ্চদশ বর্ষ সংযুক্ত দেখা যায়। তাহা হইতেই গয়া যে নয়পাল রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত ছিল, এবং তাঁহার রাজ্যকাল অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ স্থায়ী হইয়াছিল,—ইহাই সূচিত হয়। এই লিপি দুইখানিতে কৌতূহলের অপর বিষয়ও আছে। প্রায় শত বৎসর হইল, দামোদর লাল ধোক্রি কর্ত্তৃক কৃষ্ণদারকা মন্দির নামে পরিচিত একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; উহারই ভিত্তি-গাত্রে স্থাপিত একখানি শিলাফলকে একটি লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে;—তাহাতে শূদ্রকের পুত্র ও পরিতোষের পৌত্র বিশ্বাদিত্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক একটি বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। অপর লিপিখানি নরসিংহের ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়। তাহাতে শূদ্রকের অপর পুত্র বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক গদাধরের মন্দির নির্ম্মাণ-ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক কৃষ্ণদ্বারকা

মন্দির ও নরসিংহ মন্দির, যথাক্রমে প্রাচীন বিশ্বাদিত্য-নির্ম্মিত বিষ্ণুমন্দিরের এবং বিশ্বরূপ-নির্ম্মিত গদাধর মন্দিরের উপকরণ-সহযোগে রচিত হইয়াছে। বিশ্বাদিত্য ও বিশ্বরূপ যে বংশের সন্তান, সে বংশ যে নয়পালের, এবং তাহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে গয়ার একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বংশ ছিল, অন্যান্য লেখ হইতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি লিপিতে বিশ্বাদিত্য কর্ত্তৃক ভবেশ ও প্রপিতামহেশ্বরের নামে দুইটি শিবমন্দির-নির্ম্মাণের উল্লেখ আছে; একখানি গদাধর-মূর্ত্তিতে বিশ্বাদিত্যের পিতামহ পরিতোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং শীতলা মন্দিরের আর একখানি লিপিতে বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপাল কর্ত্তৃক বহু দেবতার উদ্দেশে একটি মন্দির-নির্ম্মাণের ও উত্তরমানস নামক একটি সরোবর-খননের উল্লেখ রহিয়াছে। যক্ষপাল 'নরেন্দ্র'-(রাজা)-রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন; সম্ভবতঃ তিনি কোনও সামন্ত নৃপতি ছিলেন।

ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বারকা-মন্দির-লিপিতে উহার রচয়িতা সহদেব বাজি-বৈদ্য (অশ্ব-চিকিৎসক) বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

চক্রদত্তের পরিচয়।

চক্রপাণিদত্তের একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তিনি নয়পালের মহানসাধ্যক্ষের ভাগিনেয় বলিয়া আপনার উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়চরণ মৈত্রেয়।

বে-বে-বেশ রে!

১

হরিনাভির জমীদার নবীন ঘোষের বাড়ীতে লক্ষ্মী-পূজা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজা করিতেছেন। পাড়ার তিনকড়ি ও তাহার খুড়তুতা ভাই হরিচরণ দালানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতি মনোযোগের সহিত পূজা দেখিতেছে; আর জলপানির আম, সন্দেশ, লিচু, তালশাঁস প্রভৃতির দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া, কোনও প্রকারে আত্মসংবরণ করিতেছে।

পূজা সাঙ্গ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজার বস্ত্রখানিতে নৈবেদ্য, জলপানি,

চিনি, সন্দেশ, বাতাসা প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমুদায় বাঁধিয়া লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনকড়ি আশা করিয়াছিল, পূজা সাঙ্গ হইলে, অন্ততঃ প্রসাদ হিসাবে, তাহারা কিছু না কিছু পাইবে। কিন্তু সে যখন দেখিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের দিকে দৃকপাতও করিলেন না,—আপন-মনে চলিয়া গেলেন, তখন সে ক্ষোভে হরিচরণের দিকে চাহিয়া অঙ্গভঙ্গীসহকারে বলিল, 'শা—শা—র বামুন তো বে—বে—বেশ রে!'

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবহারে হরিচরণও বিলক্ষণ চটিয়াছিল। সে মনে মনে একটা মতলব ঠিক করিয়া তিনকড়িকে চুপি চুপি বলিল,—'চল ত, ঐ পুঁটলীটা কোনও ফন্দী করে' কেড়ে নিই গে।'

তিনকড়ি উৎসাহের সহিত বলিল, 'তা—তা—তাই চল।'

উভয়ে দেউড়ী পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে দেওয়ানজীর ভাই মাণিক চক্রবর্ত্তী টলিতে টলিতে আসিতেছে, আর আপন মনে 'অ্যাক্টিং' করিতেছে,—

'বিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত!'
'এই বাম পদাঘাতে ক্ষুদ্র
পতঙ্গের সম তোমারে দলিতে পারি!'

সম্মুখে তিনকড়ি ও হরিচরণকে দেখিয়া বলিল, 'তিনকড়ি বাবু যে, বলি ক'দ্দূর?'

তিনকড়ি মাণিকের নিকট সহানুভূতি পাইবার আশায় বলিল,—'শা—শা—র বামুনের আ—আ—আক্কেলটা দেখলে!'

সহসা মাণিক থমকিয়া দাঁড়াইল, চোক পাকাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—'কি বল্লি রে,—উল্লুক! বামুন হ'লো তোর শা—শা—বলে কারে তা জানিস?'

তিনকড়ি এতটা আশা করে নাই। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'আ—আ—আমি বলব তো—তো—তোর তায় কি?'

'বটে!—কুড়ুনির বেটার উড়ুনি গায়!—কদাকার—আবর্জ্জনা। বামুন,—কি না ব্রাহ্মণ,—ব্রহ্মাণ্ড যে প্রসব করে,—সেই ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবকারিণী জগদ্ধাত্রীর কন্যাকে তুই বে করেছিস্, বলচ্চে চা'স্! চুলের মুটি ধরে চাঁদ দেখিয়ে দেবো না!'

গোলমাল শুনিয়া জমীদার নবীনবাবু বাহিরে আসিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, —'কি হ'লো হে মাণিক ?'

'দেখুন দিকি নি স্পর্দ্ধা !—'কলেরার আরম' যত সব। বলে কি না—শা— ! যদি গৃহ অর্থে ব'লে থাকিস্, তা হ'লে তোদের ক্ষমা করতে পারি। তা না হলে– '

'কে কাকে বল্‌লে হে ?'

'ঐ তিনে, আর হরে। লক্ষ্মী পূজো বলে' আমি আজ এক ফোঁটা মদ পর্য্যন্ত খেলুম না,—কেবল তাড়িতেই কাজ সারলুম ; আর ঐ বেটা 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কফ, বামুনকে বলে কি না শা— !' আপনিই বলুন না বামুনটা কি কম ? শাস্ত্রেই লেখা আছে,—ব্রাহ্মণ বলে নোয় না মাথা কে আছে এমন কুণ্ডু ; আমাদের কোনও পূর্ব্ব পুরুষে,—ঐ কি বলে, ডিঙ্গিয়ে ছিল সিন্ধু।'

নবীনবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কৈ হে, তোমার তিনে আর হরে ?'

নবীনবাবুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনকড়ি ও হরিচরণ যে সে স্থান হইতে চম্পট দিয়াছিল, মাণিক এতক্ষণ তাহা লক্ষ্য করে নাই। এবার চারি দিক চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ভয়ে পালিয়েছে।'

তিনকড়ি ও হরিচরণ মাণিকের সম্মুখ হইতে পালাইয়া একেবারে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনকড়ি বলিল,—'বে -বে—বেটা মাতালটা স—স —সব মাটী করলে।'

হরিচরণ বলিল,—'ছাড়া হবে না। ও বামুনের পুঁটলী কেড়ে এক দিন খেতেই হবে।'

তিনকড়ি উৎসাহের সহিত বলিল, 'নি – নি –নিশ্চয়ই।'

২

হরিনাভির কোনও যজমানের বাটীতে সত্যনারায়ণ পূজা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী ফিরিতেছিলেন। প্রায় দেড় মাইল দূরে মাহিনগর নামক গ্রামে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। পূর্ণিমা রাত্রি ; পল্লীগ্রামের রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত না থাকিলেও জ্যোৎস্নালোকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে রাস্তা চলিতেছেন ; সঙ্গে কোনও প্রকার আলো রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুণ্-গুণ্ করিয়া শ্যামা-সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে আপন-মনে

চলিতেছিলেন। মধ্য পথে একটা বাঁশ-ঝাড়ের কাছে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একটা সরু বাঁশ রাস্তার উপর শুইয়া পড়িয়া আবার পরক্ষণেই উঠিয়া গেল। বাঁশের আগায় বস্ত্রাবৃত কি একটা পদার্থ,—কতকটা মনুষ্যাকৃতি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহসী হইলেও, তাঁহার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল; তিনি আর অগ্রসর না হইয়া পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় আবার দেখিলেন, একটি বাঁশ রাস্তার দিকে হেলিয়া পড়িল। বাঁশের উপর হইতে সেই বস্ত্রাবৃত মনুষ্যাকৃতি সহসা রাস্তার উপর নামিয়া পড়িয়া, তৎক্ষণাৎ বাঁশের উপর উঠিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে বাঁশটিও ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইল। এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি উপস্থিত বিপদে সহসা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া কম্পিতচরণে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে দেখিলেন, একখানি গরুর গাড়ী আসিতেছে। তিনি সমুদ্র-জলে পতিত ব্যক্তির কাষ্ঠখণ্ড-প্রাপ্তির ন্যায়, বিপদে সাহায্যলাভের ক্ষীণ আশা দেখিয়া কোনও প্রকারে সাহসে ভর করিয়া, গাড়ীর আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; এবং ক্ষীণ-অস্পষ্ট-কণ্ঠে পড়িতে লাগিলেন,—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।'

গাড়ী নিকটে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কম্পিতস্বরে ডাকিলেন, 'রামু!'

'কে ও, ঠাকুর ম'শায়! আপনি এখানে! ও কি, কাঁপছেন যে! ভয় পেয়েছেন না কি?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিলেন;—তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

গাড়োয়ান রামু বলিল,—'ও রকম হয়ে থাকে ঠাকুর ম'শায়। আপনি বামুন, ভয় কি। উঠুন গাড়ীতে, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গাড়ীতে উঠিলেন। রামু গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে গান ধরিল, 'ওমা, এরা আমায় বড় ভয় দেখায়।'

গাড়ী চলিয়া গেলে বাঁশঝাড়ের ভিতর হইতে আমাদের তিনকড়ি ও হরিচরণ বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। তিনকড়ি মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 'শা—শা—শা—বামুন তো বে—বে—বেশ রে!'

হরিচরণ বলিল,—'ভয়ে কাঁপতে লাগল, তবু পুঁটলীটা ছেড়ে পালাল

না,—ভয়ে মূর্চ্ছাও গেল না! আমাদের মশার কামড় খেয়ে বাঁশঝাড়ে কাপড় আর দড়ি টাঙ্গানই সার হল।'

তিনকড়ি অবসাদভরে বলিল, 'তা—তা—তাই ত।'

তিনকড়ি ও হরিচরণ অগত্যা গৃহাভিমুখে ফিরিল। বার বার বিফল-মনোরথ হওয়ায়, যে কোনও প্রকারেই হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জব্দ করিবার জন্য ইহাদের কেমন একটা জিদ বাড়িয়া গেল। উভয়ে সমস্ত পথ ধরিয়া নানারূপ পরামর্শ করিতে করিতে আসিতে লাগিল। ইহারা এ সম্বন্ধে যুক্তি করিতে এতই বিভোর যে, মোড় ফিরিয়া অন্য রাস্তা ধরিবার সময় বিপরীত রাস্তা হইতে মাণিক চক্রবর্ত্তী তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না।

পর দিন বেলা নয়টার সময় তিনকড়ি ও হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, মাণিক চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হইতেছে। মাণিক অ্যাক্‌টিং করিতেছে,—

'... .. .. কলঙ্কবারতা
আর নাহি প্রকাশ জগতে
বিভুপদে কর ত্বরা আত্মসমর্পণ ;
দুর্নিত জীবন
শুদ্ধ কর চির অনুতাপে।'

সম্মুখে তিনকড়ি ও হরিচরণকে দেখিয়া মাণিক বলিল, 'বাবা, তোদের বাহাদুরী আছে! রাতারাতি এতগুলো মুরগীর ডিমের খোলা জোটালে কোত্থেকে হে!'

হরিচরণ আশ্চর্য্যের ভান করিয়া বলিল,—'মুরগীর খোলা! কোথায়?'

'বেটা যেন কুঁড়োজালি হাতে হরিনাম জপেন,—কিছুই জানেন না! ওরে শকুনিরা, ভটচায্যির বাড়ীর কানাচটা তোদের গোভাগাড় নয়;—বেটা কালীঘাটের কেলে কাঙালী।'

তিনকড়ি কিছু ক্রুদ্ধস্বরে চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, 'আ—আ—আমরা ফেলেছি নাকি?'

'না, ভটচায্যি ম'শায় তোর বাবার শ্রাদ্ধে ক'টা মুরগীর ডিম পেয়েছিল, তাই কাল রাত্রে খেয়েছে। যা—সুমুখ থেকে;—তোদের মুখ দেখলেও গায়ত্রী জপ করতে হয়।'

৩

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোনও যজমানের বাটীতে সূতিকা ষষ্ঠী পূজা করিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী গৃহের দীপ জ্বালিতেছেন, এমন সময় আমাদের তিনকড়ি ও হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিল, 'মা ঠাকুরুণ!'

'কে গা?'

উভয়ে অন্দরে প্রবেশ করিল। হরিচরণ বলিল, 'ভট্‌চার্য্যি ম'শায় আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।'

'কেন গা?'

'আজ রাত্রেই ভুবন ব্রহ্মচারীর মেয়ের বে হবে। এইমাত্র সব ঠিক হয়ে গেল। এখন ত আর কল্‌কেতা থেকে কাপড়-চোপড় সব কিনে আনবার সময় নেই; তাই ভট্‌চার্য্যি ম'শায় তাঁর বাড়ী থেকে এই সব জিনিসপত্র নে যেতে বল্লেন। ভুবন ব্রহ্মচারী এর পর সব দাম ধরে দেবেন এখন।' হরিচরণ তার পকেট হইতে একটা ফর্দ্দ বাহির করিল।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিলেন, 'আজ শনিবার অমাবস্যে, আজ বে কি গো বাছা!'

হরিচরণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'কি জানি, ভট্‌চার্য্যি ম'শায়ই ব্যবস্থা দিয়েছেন।'

'তা কি কি চাই?'

হরিচরণ ফর্দ্দ পড়িতে লাগিল,—'প্রমাণ থান—৮, পেড়ে কাপড়—৫, গামছা—১১, থালা—৫, গেলাস—৭, আর আসনাঙ্গুরী ও মধুপর্কের বাটী—৪ প্রস্থ।'

'এত কাপড় চোপড় সব কি হবে গো?'

হরিচরণ নীরব,—কি যে বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তিনকড়ি বলিল, '—কি—কি—কি বলে—না—না—নান্দীমুখ হবে।'

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী গালে হাত দিয়া বলিলেন, 'কি অলুক্ষুণে কথা গো! রাত্তিরে যে রাক্ষুসি ক্ষণ,—রাত্তিরে কি ছরাদ্দ হয়! আর এত কাপড়, গামছা, থালা, গেলাস কি করবে গো! আভ্যুদিকে তো জানি ষষ্ঠী মার্কণ্ডের পূজোর কাপড় দু'খানা, আর ছরাদ্দের হয় গামছা আটখানা, না হয় থান তিনখানা। কিছু বুঝতে পারছি না বাছা।'

তিনকড়ি ও হরিচরণ, এতটা জবাবদিহি করিতে হইবে, স্বপ্নেও ভাবে নাই। হরিচরণ সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল; বলিল,—'আরও বোধ হয় কি কি কাজ হবে।'

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিলেন, 'তাও তো বুঝতে পারছি না বাছা। থালের সঙ্গেই ত গেলাস দেয় জানি। থাল চাইছ পাঁচটা, আর গেলাস চাইছ সাতটা। পুজোর পেড়ে কাপড় চাইছ পাঁচখানা, আর আসনাঙ্গুরী মধুপর্কের বাটী চাইছ চার প্রস্ত। এ কি রকম হিসেব বাছা তোমরাই জান।'

উভয়ে মহা সমস্যায় পড়িল; কি যে জবাব দিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হরিচরণ একবার এ দিক ও দিক চাহিয়া বলিল, 'আমরা কি জানি বলুন। ভট্চার্য্যি ম'শায় যা বলে দিলেন, তাই বললুম।'

'তা বাছা তোমরা ভট্চার্য্যি মশায়কেই পাঠিয়ে দাও, তিনি নিজে এসে নিয়ে যান।'

'ভট্চার্য্যি মশায়ের তো আর এত দূর আসবার সময় হবে না; সেই জন্যই তো আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তা কি করব বাছা, বল গে, আমি দিতে পারলুম না।'

তিনকড়ি একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল,—'আ—আ—আমাদের বি—বি—বিশ্বাস করছেন না?'

'কি করেই বা করি বাছা! বের দিন থেকে ফর্দ্দর জিনিসগুলো পর্য্যন্ত—সবই যে গোলমাল ঠেকছে।'

'তবে আমরা ঐ কথাই বলি গে।' হরিচরণ আর তথায় অপেক্ষা করা সমীচীন বিবেচনা করিল না; তিনকড়ির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনকড়ি বলিল,—'এ—এ—এই হাটে এসেছিস তুই মা—মা—মাছ কিনতে!'

'তাই ত দেখছি। যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী!'

উভয়ে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিল।

৪

তিনকড়ির মা অজস্রধারে কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীতলায় শুইয়া হত্যা দিতেছিলেন। তিনকড়ি ও হরিচরণকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তোরা এসেছিস? জামীনে খালাস হলি, না একেবারে ছেড়ে দিলে?'

তিনকড়ি ও হরিচরণ উভয়েই স্তম্ভিত। তিনকড়ি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি—কি—কি হল?'

তিনকড়ির মা ভৎর্সনাপূর্ণস্বরে বলিলেন, 'তোদের কিসের অভাব যে, তোরা এমন কাজ করতে গিয়েছিলি?'

ব্যাপার কি জানিবার জন্য ইহারা এত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল যে, আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। হরিচরণ কুপিতস্বরে বলিল, 'হয়েছে কি তাই আগে খুলে বল না। অমন করছ কেন?'

ইহাদের ভাব দেখিয়া তিনকড়ির মার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। তিনি বলিলেন, 'তোরা নাকি ভট্‌চার্য্যি মশায়ের বাড়ী থালা কাপড় চুরী করতে গিয়েছিলি?'

'কে বল্‌লে?'

'কেন, ঐ ও পাড়ার,—নাম ধরতে পারিনি ছাই,—চকোত্তি ঠাকুর।'

হরিচরণ একবার তিনকড়ির মুখের দিকে চাহিল।

তিনকড়ি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মা—মা—মাণিক চক্কোত্তি?'

'হাঁ।'

হরিচরণ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বল্লে সে?'

'বলে যাবে আবার কি? তোদের পুলিস থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যে ১০০৲ টাকা নিয়ে গেল।'

'তুমিও দিলে?'

'আমার কাছে কি ছাই টাকা ছিল? বৌমার বালা বন্ধক রেখে কামিনীর মার কাছে থেকে ১০০৲ টাকা এনে দিলুম।'

তিনকড়ির চক্ষুঃস্থির! সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ক্রোধে ও ক্ষোভে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিচরণের দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'শা—শা—শা—বামুন তো বে—বে—বেশ রে!'

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪

এখন অন্যান্য শ্রেণীর আয়ের দিকে লক্ষ্য করিতে পারেন, এবং তাহারা কিছু টাকা ছাড়িয়া দিলে গরীব প্রজাদিগের কোনও উপকার সম্ভবে কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, অন্য শ্রেণী নিজের আয়ের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেও, প্রজার অন্ন বাড়িবে না; কারণ, শস্যের অভাব। তবে সেই টাকায় তাহারা আচ্ছাদন এবং ঔষধ, গৃহনির্ম্মাণ ও চাষোপযোগী সরঞ্জাম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া, চেষ্টা করিলে অধিক অন্ন উৎপন্ন করিতে পারে।

গবমেণ্টের আয় ও ব্যয়।

(আয়)		(ব্যয়)	
রাজস্ব	২৭ কোটী	কর্ম্মচারিগণের বেতন ও শাসনের ব্যয়	২৬
লবণ	৫ „	কৃষি, শিক্ষাবিভাগ, খাল, বনরক্ষা, দুর্ভিক্ষের ব্যয়, প্রভৃতি	৫
ষ্ট্যাম্প	৭ „	সৈনিক ও পুলিস	২০½
আবকারী	১১ „	হোমচার্জ্জ, অর্থাৎ কর্ম্মচারিগণের পেন্সন, সৈনিকগণের পেন্সন, টাকার একশ্‌চেঞ্জ প্রভৃতি ও টাঁকশাল	১২
বাণিজ্য-শুল্ক	৮ „		
ইনকম-ট্যাক্স প্রভৃতি	২ „		
দলীল রেজিষ্ট্রি	½ „		
পোষ্টাপিস ও টেলিগ্রাফ	২ „		
খাল প্রভৃতি হইতে	½ „		
	৬৩½ „		
রেলওয়ে	৫ „		
	৬৮½ „		৬৩½

পথকর প্রভৃতি হইতে গবমেণ্ট যাহা পাইয়া থাকেন, তাহা শিক্ষা, রাস্তাঘাট, প্রভৃতির জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে অর্পিত হয়।

গবমেণ্টের আয় ব্যয় লইয়া বজেটের সময় কাউন্সিলে আলোচনা হয়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, গবমেণ্ট স্বীয় আয়ের অর্দ্ধেক টাকা ছাড়িয়া দিলেও, কিংবা রাজস্ব কমাইয়া দিলেও, ভারতবাসীর প্রত্যেক লোকের আয় কেবল বৎসরে দেড় টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে

দরিদ্র প্রজাগণের বিশেষ কোনই লাভ নাই। কিন্তু অন্য উপায়, অর্থাৎ চাষী-দিগের অন্ন-বস্ত্র উৎপন্নের সহায়তা কি করিয়া হইতে পারে, তাহার উপর সম্প্রতি গবর্মেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য। সৈনিক ও পুলিসের অর্দ্ধেক বরখাস্ত করিয়া দিলেও তাহাদের জন্য চাষোপযোগী জমী নাই। সুতরাং অন্য উপায় কিংবা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে দরিদ্র প্রজাগণের অন্নের অংশীদার হইতে হইবে। ইহাতে ফলে কি দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তনীয়। সরকারী কর্ম্মচারিগণের বেতন কিঞ্চিৎ কমান যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দক্ষ ও সৎ কর্ম্মচারী পাওয়া দুর্ঘট। সুতরাং যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়, শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় শিল্পের বিস্তার হয়, এবং সকলের যুক্ত পরিশ্রমের সুবিধা হয়, তাহারই জন্য দেশের প্রধানতঃ চেষ্টা করা উচিত। রাস্তা ঘাট কমাইয়া, শিক্ষা ও কৃষিকর্ম্মের বিস্তার ও প্রজাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টাকার কি করিয়া সদ্ব্যয় হইতে পারে, তাহাও আলোচ্য।

ভূস্বামিগণের আয় ও ব্যয়।

ভূস্বামিগণের আয় খাজনাস্বরূপ ১৩০ কোটী টাকা (যেখানে গবর্মেণ্টই ভূস্বামী, সে স্থলের খাজনা ৮ কোটী বাদ দিয়া)। বনজাত ও খনিজ দ্রব্য হইতে তাঁহাদিগের আয় প্রায় ৪৪ কোটী। মোট ১৭৪ কোটী টাকা।

আয়		ব্যয়।	
জমা	১৭৪ কোটী	অনুচরবর্গ ও নিজের অন্নের ব্যয়	১২ কোটী
		কর্ম্মচারীর বেতন	১৪ "
		রাজস্ব	২০ "
		মামলা মোকদ্দমা	৪০ "
		রেলওয়ে-ভ্রমণ	২ "
		অট্টালিকা ও বিলাসের দ্রব্য, বস্ত্র, প্রভৃতি	৪০ "
		হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পালন	৪ "
বক্রী	৩২ "	অন্যান্য ব্যয়, যেমন চাঁদা প্রভৃতি	১০ "
(ইহা হয় ত কোম্পানীর কাগজ কিংবা গহনা)			১৪২

যত দূর আন্দাজ করিতে পারা যায়, তাহাতে জমীদার-নামধেয় ভূস্বামীর মধ্যে অতি অল্প লোকেরই মূলধন আছে। কিন্তু তাঁহারা যদি নিজের দেশে থাকেন,

এবং মামলা মোকদ্দমা ও বিলাসের ফর্দ্দ কমাইয়া কৃষির উন্নতিতে মনোযোগী হন, বন ও খনিজপদার্থের সদ্ব্যয় করেন, এবং কৃষকের গৃহনির্ম্মাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হন, তবে তাঁহাদিগের 'চিরস্থায়ী' বন্দোবস্তের সুফল চিরস্থায়ী হইবে, নচেৎ বেশী ভাগ জমীদারীই যে দশ বিশ বৎসরের মধ্যে শেষ দশাপ্রাপ্ত হইবে, তাহা প্রতীয়মান হয়।

জমীদারগণের নিকট ৪০, প্রজাদিগের নিকট ৫, ও ব্যবসাদারগণের নিকট ৮০ কোটী টাকা উপার্জ্জন করিয়া ৮০ লক্ষ ডাক্তার, উকীল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ ও তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের দিনপাত হয়। তাহাদিগের অন্নের ব্যয় ৪০ কোটী, এবং জমীদারবর্গের ন্যায় তাঁহাদিগেরও ব্যয় আছে। তাঁহাদিগেরও হাতে যাহা মূলধনস্বরূপ থাকে, তাহা আন্দাজ ১৫ কোটী। বলা বাহুল্য যে, এই সকল মূলধন হয় কোম্পানীর কাগজ, কিংবা গহনা।

অবশেষে ব্যবসাদারগণের কথা বলিব। ৫ কোটীর মধ্যে, ৪ কোটীর উপর কেবল মজুরের সংখ্যা। ইহাদিগকে প্রায় ২০০ কোটী টাকার অন্ন খাইতে দিতে হয়। চাষী অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা গড়-পড়তায় ভাল, কিন্তু এই সব কুলী মাদক দ্রব্য খাইয়া এবং সামাজিক ও ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইয়া ভয়ঙ্কর কুচরিত্র হইয়া পড়িতেছে।

আসল ব্যবসাদারগণ, যাহারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, তাহারা,—

কৃষকের নিকট হইতে ক্রীত শস্য	২১৩ কোটী
আমদানীর মূল্য	১১০ "
রপ্তানীর মূল্য	১৩৫ "
জমীদারের ও অন্যান্য শ্রেণীর নিকট হইতে ক্রীত দ্রব্য	৫০ "
এবং স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যাদি	৫০ "
	৫৫৫ কোটী

এই ৫৫৫ কোটী টাকার কারবারে যাহা লাভ হয়, এবং তদুপরি ঋণ প্রভৃতির কারবারে, ও হুণ্ডি চেক্ প্রভৃতির কৌশলে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা উপরি-উক্ত মজুরের ব্যয় বহন করে, এবং নিজের অন্নের সংস্থান করে।

৫

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের দ্রব্য দুর্মূল্য হইয়া পড়িল কেন, এবং দরিদ্র কৃষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় হইল কেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সকল দেশেরই এক প্রকার ইতিহাস।

এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, মনস্বী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বহু দিন ধরিয়া একটা তদন্ত করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া একটি বহুমূল্য 'রিপোর্ট' লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া, আমরা কতকগুলি কথা নিবেদন করিলাম।

দ্রব্য ও অন্ন-বস্ত্র দুর্ম্মূল্য হইবার দুই প্রকার কারণ।

১। পৃথিবী-ব্যাপী কারণ, কিংবা অবস্থা।

২। ভারতবর্ষ-ব্যাপী সেই প্রকার অবস্থা, এবং উভয়ের সংঘাত।

পৃথিবী-ব্যাপী কারণ।—

১। সুবর্ণের বহুলতা।

২। ঋণের প্রসারতা।

৩। অসার পরিশ্রম।

৪। খাদ্য-শস্যের অভাব।

ভারতবর্ষ-ব্যাপী কারণ।—

১। শস্য ও ভূমিজাত দ্রব্যের অনাটন।

২। শস্যের জন্য সমগ্র পৃথিবীর আগ্রহ।

৩। চাষের ব্যয়াধিক্য।

৪। রেলওয়ে এবং অন্যবিধ পথ এবং বাণিজ্যবিস্তারের জন্য রপ্তানীর সুবিধা।

৫। ব্যাঙ্ক ও ঋণের প্রসারতা।

৬। সোনা রূপার প্রচুর আমদানী।

কথাগুলির মূলে কেবল দুইটি কথা। এক দিকে খাদ্যশস্যের অভাব, এবং অন্য দিকে অল্প পরিশ্রমে কিংবা কল-কৌশলে তাহা কৃষকদিগের নিকট প্রাপ্ত হইবার জন্য দেশব্যাপিনী চেষ্টা।

বাহ্য চাকচিক্যশালী সমৃদ্ধির কিংবা বিভূতির লোভে পড়িয়া ক্রমেই প্রবৃত্তির পথে কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি হয়; সুতরাং ঊর্ণনাভের জাল বিস্তৃত হইয়া পড়ে। টাকা ও ঋণের প্রাদুর্ভাব কমাইয়া, কৃষকগণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কিসে খাদ্যশস্য বাড়াইতে পারে, তাহাই জগতের ও ভারতবর্ষেরও সমস্যা।

বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ সাব্যস্ত হইয়াছে।

১। লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষ কম।

২। সময়োপযোগী বৃষ্টির অভাব।

৩। ব্যবসার লাভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খাদ্যশস্যের পরিবর্ত্তে অন্য শস্যাদির চাষ।

৪। কৃষিবৃদ্ধির উপযোগী উৎকৃষ্ট জমীর অভাব।

৫। কর্ম্মঠ কৃষী ও গাভীর অভাব। অতএব সম্যকভাবে চাষ হয় না।

৬। ভূমির উর্ব্বরতা-হ্রাস।

খাদ্যশস্যের চাষ প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলেই শতকরা পাঁচ ভাগ লোক বাড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশ বাদ দিলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। গাভীর খাদ্যের অনাটন হইয়াছে।

লোকসংখ্যার অনুপাতে কোন্ প্রদেশে খাদ্যের অভাব, তাহা শেষের তালিকাতে দ্রষ্টব্য। সময়োপযোগী বৃষ্টির অভাব ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ব্যবসার লাভের জন্য যাহারা অন্যান্য বাণিজ্যোপযোগী চাষ করে, বাঙ্গালা ও বোম্বাই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু বাঙ্গালায় খাদ্যশস্যের অনাটন প্রায়ই হয় না। বোম্বাই ও বেরার প্রভৃতি প্রদেশে কার্পাস প্রভৃতি বেচিয়া যাহা হয়, তাহাতে কৃষকদিগের লাভ অত্যন্ত কম, অতএব তাহারা মাদ্রাজ ও বাঙ্গালার শস্য সংগ্রহ করিতে সচরাচর অসমর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেখানে দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়ে।

পতিত জমী অনেক অঞ্চলে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষুদ্র চাষীর হাতে যে সকল উৎকৃষ্ট জমী পূর্ব্বে ছিল, এখন ঋণগ্রস্ত হইয়া, তাহারা হয় ত মহাজন কিংবা ধনী চাষীকে বেচিয়া, এখন তাহাদেরই মজুরী করিয়া দিনপাত করে। কতকগুলি লোকের হাতে অনেক জমী পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা নিজে পরিশ্রম না করাতে সম্যকভাবে চাষ হয় না।

গোজাতির ধ্বংস একটী কারণ। গোচারণের মাঠের অভাব। জলের অভাব, সারের অভাব। দুগ্ধের অভাব; রোগ হইলে কৃষকবালকেরা একটু দুগ্ধ পায় না।

বাঙ্গালার কয়েকটি জেলা ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তির হ্রাস হইয়াছে। তাহার প্রাকৃতিক কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সার ও যুক্ত শ্রমের অভাব হওয়াতে দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান সুকঠিন।

সকল প্রদেশেই খাদ্যশস্যের জন্য আগ্রহ। এ দিকে বন প্রভৃতি উচ্ছিন্ন হইয়া, এবং কল কারখানার কেন্দ্রে ও সহরে খাদ্যদ্রব্যের টানাটানি হইয়া, তৈল, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি কৃষকদিগের জুটিয়া উঠে না।

রেল ও বাণিজ্য পথ বিস্তার এবং টাকা ও হুণ্ডী, চেক, কিংবা ঋণের কারবার বৃদ্ধি পাইয়া সকলের দৃষ্টি অর্থলাভের উপর এত দূর ধাবিত হইয়াছে যে, অন্ন কি করিয়া উৎপন্ন হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে না। টাকার কারবার যত বৃদ্ধি পায়, ব্যবসাদারগণের মূলধন নামক অলীক সম্পত্তি, ততই অধিকপরিমাণে সঞ্চিত হয়, সুতরাং দ্রব্য দুর্মূল্য হওয়া অনিবার্য্য। ফলে সকলেই মনে করে যে, কোনও প্রকারে ব্যবসা দ্বারা কিংবা সুদে খাটাইয়া কিছু লাভ করিতে পারিলেই, অল্প পরিশ্রমে সুখে দিনপাত সম্ভব। কিন্তু এ দিকে অন্নের অভাব ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া পড়ে। যতই অন্নের অভাব, ততই দ্রব্য দুর্মূল্য হইতে থাকিবে।

আমরা বলিয়া থাকি যে, এক সময় টাকায় আট মন ধান পাওয়া যাইত। তখন প্রচুরভাবে অন্ন উৎপন্ন হইত; টাকা ও ঋণের কারবার কম ছিল। রপ্তানী ছিল না। এখন নানাবিধ উপায়ে টাকা ও ঋণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, শস্য বেচিয়া অপদার্থ দ্রব্য সকলে ক্রয় করে, অন্ন উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আট টাকায় এক মন দাঁড়াইয়াছে। যাহারা অর্থনীতি বুঝিতে পারে না, তাহারাও এই সামান্য কথা বুঝাইয়া দিতে পারে যে, ঘরে অন্ন ও বস্ত্র না থাকিলে সকলই দুর্মূল্য হইয়া পড়ে।

৬

তবে অন্ন বস্ত্র কি করিয়া স্বচ্ছল হইবে?

যাহা সংক্ষেপে বলা গেল, সেগুলি একত্র করিয়া দেখা যাউক।

১ মানসিক কিংবা নৈতিক
- নষ্ট আদর্শ।
- কাল্পনিক অভাব ও তজ্জনিত বাসনা।
- শ্রমের অপব্যয়, ও কলকারখানার বহুলতা।
- বিলাসের দ্রব্যের সৃষ্টি।
- লাভের চেষ্টা।
- ঋণের প্রসারতা।

২ প্রাকৃতিক
- জলের অভাব।
- গোজাতির ধ্বংস।
- বন, নদী, গোচারণের মাঠ প্রভৃতির ধ্বংস।
- রোগের প্রাদুর্ভাব।

৩ সামাজিক
- সহানুভূতির অভাব।
- দরিদ্র কৃষকের ঋণভার।
- যুক্ত পরিশ্রম ও সঞ্চয়ে অপ্রবৃত্তি।
- শিক্ষার অভাব।

উল্লিখিত কারণাবলীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞাণ করিয়া বিচার না করিলে, বক্তৃতা, আলোচনা, উপদেশ, সমবায়-সমিতি-স্থাপনের চেষ্টা, স্বায়ত্ত-শাসন, এবং আইনকানুনের অনুষ্ঠান সকলই বিফল হইয়া পড়ে।

১। মানসিক ও নৈতিক।

ভারতবর্ষের এককালে ধর্ম্মের আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার অনুযায়ী। সেই জন্য আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিংবা স্মৃতিতে কতকগুলি আচার-ব্যবহারের কঠোর অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। সেগুলি এখন শিথিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যতই দারিদ্র্য বাড়িবে, দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের সূত্রপাত আরম্ভ হইবে, আমরা ততই সেই সনাতন প্রথাগুলির সার্থকতা উপলব্ধি করিব। যদি জীবন ও ধর্ম্ম একত্র রক্ষা করিতে হয়, তবে সেই পথানুসরণ ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই।

পাশ্চাত্য সোস্যালিষ্টিক সম্প্রদায়ের মত এই যে, জগৎ প্রবৃত্তির পথে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং কতকগুলি শ্রেণীর নষ্ট আদর্শ এবং তদ্ভূত বিলাস-প্রিয়তায় এত দূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্মবাজরোগের স্থান তাহাদিগের হৃদয়ে নাই; অতএব কোনও প্রকারে তাহাদিগকে ধ্বংস না করিলে দারিদ্র্য ঘুচিবে না। ইহা হইতেই অরাজকতা ও নরহত্যা প্রভৃতি বাড়িতেছে। কিন্তু প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির সংঘর্ষে জীবহত্যা, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের অনুমোদনীয় নহে। সখ্য, অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মই কলির মূলমন্ত্র। সে ধর্ম্মে হিংসা নাই, এবং তাহা ভগবদ্ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার পথ মধ্য-পথ। এবং সেই পথের আদর্শ, কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপে দাঁড়ায়, তাহাই সত্বর সোস্যালিষ্টগণকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কলে-কৌশলে বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া, শ্রমের অপব্যয় করিয়া, কিংবা ঋণ দিয়া, সুদ খাটাইয়া, এবং লাভের চেষ্টা করিয়া, অসমভাবে ধনপাত করা ও অন্ন-উৎপত্তির পথে বাধা দেওয়া সে ধর্ম্মের অনুমোদনীয় নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তির আরোপণ করাই আধুনিক সমস্যা।

দরিদ্রের প্রতি দয়া-প্রকাশ ও দান-ধর্ম্মও সে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত

নহে। সকল জীবই ঈশ্বরের আদর্শে সৃষ্ট। মানবের দয়া ও করুণা তাহার একটা অঙ্গ. কিন্তু শ্রমজীবী দরিদ্রের মুখের অন্ন কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া, পরে কিঞ্চিৎ দয়া-প্রকাশ করিলে, কোনও ফল নাই। যতই জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ততই জীবের আত্মমর্য্যাদা বাড়ে। সমাজের অধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া ক্রমেই পরস্পরের প্রতি সকলের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম একাধারে অবস্থিত হইলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা কেবল সখ্য। সেই সখ্যের আধুনিক নাম

'যুক্ত পরিশ্রম'।

সেই যুক্ত পরিশ্রমে যে সকলের অবস্থা এক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাও নয়। প্রাকৃতিক জগতে সকলের অবস্থা এক নয়। বড় ছোট আছে, সবল ও দুর্ব্বল আছে; কিন্তু সকলেরই খাদ্যসংস্থান বিধাতা করিয়া দিয়াছেন। বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ছোট হয় না বাঘের বল কুরঙ্গ অপেক্ষা অধিক। বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, একটা আর একটাকে মারিয়া খায়; কিন্তু মানব সেই সমস্যার পূরণ করিতে গিয়া যুক্ত পরিশ্রমের সৃষ্টি করে, এবং হিংসার পথ রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয়।

অতএব শ্রমের সমস্যাই আধুনিক জগতের প্রধান সমস্যা। সেই সমস্যার পূরণ করিয়া দরিদ্রের মুখে অন্ন ও পরিধানে বস্ত্র না দিলে, এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে, শান্তির সম্ভাবনা নাই।

আধুনিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে সেই শ্রম কি করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে?

১। প্রাকৃতিক।

জলের অভাব দূর, এবং দূষিত জলের সংশোধন প্রথম সমস্যা। বাঙ্গালায় জল আছে, কিন্তু বিহার, ছোটনাগপুর ও অন্যান্য প্রদেশে জলের জন্য হাহাকার। কি করিয়া যুক্ত পরিশ্রমে জলের সংস্থান হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে দ্রষ্টব্য। জল নহিলে সবই ব্যর্থ হইবে।

বৃষ্টির জন্য জলের যেমন দরকার, সারেরও তেমনই। সুতরাং গোজাতির উন্নতি দ্বিতীয় সমস্যা।

বন, নদী, খাল বাঁধ ও গোচারণের মাঠ প্রভৃতির স্বত্ব কি করিয়া উপরি উক্ত উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও দ্রষ্টব্য। খড়, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি বিনামূল্যে না পাইলে ছোট ছোট ঘর বাঁধাও কৃষকদিগের পক্ষে অসম্ভব হয়।

উভয় সমস্যার পূরণ হইলে, রোগের প্রাদুর্ভাবও কমিয়া যাইবে। সামাজিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য।

৭

সামাজিক সমস্যাই তৃতীয় সমস্যা।

আমরা অনেক সময় সমাজকে দোষী করি। অন্ন-জলের সংস্থান না থাকিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যুক্ত পরিশ্রম না থাকিলে অন্ন জল দুষ্প্রাপ্য হয়। সুতরাং পরিশ্রমের অভাব কিংবা আলস্য, পরিশ্রমের অপব্যয়, এবং ব্যক্তিগত স্বত্বসাব্যস্তের জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টাই, সমাজ-বিশৃঙ্খলতার কারণ।

যত দিন সেটুকু না হইবে, তত দিন শিক্ষা-বিস্তার বৃথা। মুখে অন্ন ও দেহে স্বাস্থ্য না থাকিলে শিক্ষা অসম্ভব। আবার, শিক্ষার বহু বিস্তার হইলে, পরে যুক্ত পরিশ্রমের সার্থকতা উপলব্ধি হয়; সুতরাং উভয়েরই একত্র অনুশীলন না করিলে চলে না। অর্থাৎ, বলপূর্ব্বক শিক্ষাও যেমন দরকার, বলপূর্ব্বক যুক্ত ও সার্থক পরিশ্রমে নিযুক্ত করাও সেই প্রকার দরকার। এই ক্ষমতাটুকু যদি সমাজের না থাকে, তবে স্বায়ত্ত শাসন অসম্ভব।

একটা পরিবারের আধুনিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পিতাও যেমন পরিশ্রমে কাতর, পুত্রগণও সেই প্রকার। পিতার মত্টুকু বিদ্যা বুদ্ধি, পুত্র তাহাও পায় না। পরিবারবর্গ পূর্ব্বাবস্থায় থাকে, কিংবা ক্রমে অবনতির পথে হেলিয়া পড়ে। সমাজের নেতা হইবার ক্ষমতা ও সাহস কাহারও নাই। চরিত্রের অভাব। গ্রামে গিয়া দেখুন, দুশ্চরিত্র লোকের কেহ কোনও খবর রাখে না; একটা চুরী ডাকাতী হইলে কেহ কাহারও সাহায্য করে না। একটু গোলমাল হইলে হয় গবর্ণেন্টকে আবেদন, কিংবা পুলিসকে আশ্রয়, কিংবা মামলা মোকদ্দমা। কে কাহার কতটুকু আত্মসাৎ করিতে পারে, তাহার চিন্তা ও স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য ব্যগ্রতা। ইহাতেই দিন কাটিয়া যায়। অনুচর ও আত্মীয়বর্গ সেই সুযোগে যে পক্ষ বলবান, তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

কাহারও সহিত কাহারও সহানুভূতি নাই। ইহাই কি 'জাতীয় জীবন'?

প্রত্যেক গ্রামেরই দরিদ্র কৃষক ঋণভারগ্রস্ত। যাহার দশ বিঘা জমী আছে, তাহার বলদ মরিয়া গেলে অন্য চাষীর সাহায্য পায় না। বীজধান্য ধার করিতে হয়। তাহার সুদ শতকরা পঞ্চাশ। জমীদারের খাজনা দুই বৎসরের বাকী, তাহার সুদ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি কিছু শস্য হয়, তবে এক অংশ কোনও কোনও দুরন্ত লোকের গো মহিষ খাইয়া যায়; তাহাদের খোঁয়াড়ে দেওয়া ও

তাহা লইয়া মামলা মোকদ্দমা করা অসম্ভব। গ্রামের প্রায় বার আনা লোক অকর্ম্মা। কেবল এই কৃষকদিগের স্কন্ধে চাপিয়া থাকে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গুরুমহাশয়, তহশীলদার, চৌকিদার, অভ্যাগত অমুক এবং অমুক, জমীদারের ঘোড়া এবং হাতী রজকের গাধা, এমন কি, কীট পতঙ্গ ও বানর পর্য্যন্ত এই কৃষকের শস্য লইয়া টানাটানি করে। এই জীর্ণ শীর্ণ কৃষকের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, আধুনিক ভারতবর্ষ সহরে বসিয়া রাষ্ট্র শাসনের স্বপ্ন দেখিতেছে! যখন জ্বালাতন হইয়া কৃষক দেশ ছাড়িয়া চা-বাগান প্রভৃতির দিকে পলায়ন করে, কিংবা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া মরে, তখন উল্লিখিত বার আনা অকর্ম্মণ্য লোক গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

এই কৃষককে এক বৎসরের জন্যও যদি কেহ স্বচ্ছন্দ অবস্থায় রাখিয়া একটা দুর্ভিক্ষ নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া দিতে পারেন, তবে তিনিই দেশের নেতা, ভারতবর্ষের পূজ্য, এবং যে জাতিই হউন না কেন, তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। বহুপূর্ব্ব কালে চতুর্ব্বর্গের যুক্ত-সমিতি ব্রাহ্মণ দ্বারা নীত হইয়া এই অসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই প্রথার মধ্যে 'দাসত্বে'র দোষ দেখিয়া থাকি। পরিবারের কিংবা সমাজের হিতার্থ যুক্ত-পরিশ্রম অনেক সময় দাসত্ব বলিয়া মনে হয় বটে।

এখন দেখা যাউক, এই যুক্ত পরিশ্রমটা কি, এবং কোন্ উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

আমরা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক জেলা দেখিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের ধারণা যে, গ্রাম্য সমাজ একেবারে অকর্ম্মণ্য। যুক্ত পরিশ্রম কি করিয়া করিতে হয়, তাহার শিক্ষা না দিলে, যে কোনও প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শই বিফল হইয়া পড়িবে।

প্রথমে আমরা যে সকল প্রদেশ সচরাচর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া পড়ে, তাহারই কথা বলিব।

জলের অভাবই এই সকল স্থানে অধিক।

গবর্মেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, এবং জমীদারগণ একত্র হইয়া এই অভাব দূর করিতে পারেন।

১। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত গ্রামের একটা তালিকা করা কর্ত্তব্য। অধুনা প্রায় সকল জেলাতেই সেটল্‌মেণ্ট হইয়াছে। সেই সেটল্‌মেণ্টের পুঁথি দেখিয়া,

যে সব কৃষকের জমীর পরিমাণ কুড়ি বিঘার কম, তাহাদিগের তালিকা কিংবা গ্রামের জমীর নক্সায় তাহাদের জমী অঙ্কিত করা উচিত। এই রকম পাঁচ ছয়টী গ্রাম একত্র করিয়া একটি সার্কেল করিলে হয়।

২। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত এই প্রকার সার্কেলের দরিদ্র প্রজাবর্গের নাম রেজেষ্ট্রী। যাহারা বসিয়া খায়, কিংবা ঋণ দেয়, তাহাদিগেরও নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক দরিদ্র প্রজার ঋণ ও বাকী খাজনার তালিকা। যাহাদিগের ঋণ ও বাকী খাজনা এত বেশী যে, এক বৎসরের ধান বেচিয়া শোধ হয় না, তাহাকে আমরা 'এন্‌কম্বর্ড' জোত বলিব।

৪। দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রজাদিগের বিরুদ্ধে কোনও বাকী খাজনা কিংবা ঋণের নালিশ দায়ের হইতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট ইহাদিগের কিস্তিবন্দী করিয়া দিবেন। যে সকল জোত 'বন্ধক' হইয়া অপরের দখলে আছে, তাহা মুক্ত করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আইন জারি করা হইবে।

৫। প্রত্যেক জোতে কি প্রকার ও কত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিয়া, জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৬। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটা ভাল কূপ ও পুষ্করিণী পানীয় জলের জন্য, এবং এই সকল চাষীর চাষের জন্য দুই একটা বড় বাঁধ নির্ম্মাণ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড করিবেন। চাষীদিগেরই যুক্ত পরিশ্রমে তাহা নির্ম্মিত হইবে। তাহারা এই পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইবে। জমীদার তাহার উপযোগী জমী ছাড়িয়া দিবেন। বর্ষার জল ছাড়া, যদি নদী ও খাল হইতে জল আনয়ন করা সম্ভব হয়, তাহার উপায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড করিবেন।

৭। গোচারণের জন্য যথেষ্টপরিমাণে মাঠ ইহাদিগের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। খড় কাঠ প্রভৃতি কৃষকেরা বিনামূল্যে পাইবে।

৮। চৌকিদারী ট্যাক্স এই সকল গ্রাম হইতে উঠাইয়া দিয়া, এই চাষী-দিগের মধ্যে এক জনকে বিনা বেতনে চৌকিদার নিযুক্ত করিতে হইবে। এক বৎসর পূর্ণ হইলে, তাহার পদে আর এক জন বাহাল হইবে।

৮

বাঙ্গালায় পঞ্চায়েতী সমিতির এক প্রকার প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে হিতৈষী লোকও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিহার ও উড়িষ্যায় তাহার নিতান্ত অভাব। ছোট নাগপুরে পঞ্চায়েতী প্রথা এখনও

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য লোকের হস্তে এই ভার দিলে, আপাততঃ কোনও ফল হইবে না। ডেপুটী কলেক্টর, মুনসেফ, কিংবা সবডেপুটী কলেক্টরগণই ইহার সূত্রপাত করিবেন। তাঁহারা দেশের হিতের জন্য অনুপ্রাণিত হইলে, এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ হইলে, অনেক আশা করা যায়। প্রত্যেক ডেপুটী কলেক্টরের মধ্যে থানা ভাগ করিয়া দিলে হয়। যে সকল স্থান উল্লিখিত প্রকারে সার্কেল-বিভক্ত হইবে, সেখানে যত কিছু মামলা মোকদ্দমা, তাঁহারা এবং স্থানীয় মুন্সেফগণ, মাসের মধ্যে দুই একবার থানায় গিয়া বিচার করিয়া আসিবেন। যাহাতে মিটমাট্ হইয়া যায়, সেই চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। দরিদ্র চাষা যাহাতে মামলা মোকদ্দমায় না পড়ে, তাহার সৎপরামর্শ তাঁহারা দিবেন। যে স্থলে বন জঙ্গল প্রচুর, সেখানে প্রজাগণকে কাঠ, বাঁশ ও খড়, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্য জমীদার যাহাতে বিনা বায়ে বিতরণ করেন, তাহার বিধান করিবেন। সেটেল্‌মেণ্টে অনেক স্থলে দরিদ্র কৃষকগণের স্বত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে গিয়া মামলা মোকদ্দমা করে কে?

জলের বন্দোবস্ত করিতেই আপাততঃ দুই এক বৎসর কাটিয়া যাইবে। রাস্তা ঘাটে ও সেতুনির্ম্মাণে আর টাকা ব্যয় না করিয়া জলের অভাব দূরীকরণই এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রধান কর্ম্ম। সুবৃষ্টি হইলে জলসঞ্চয়ের উপায় প্রথম বৎসরেই সহজ হইয়া পড়িবে।

অতঃপর যুক্তপরিশ্রম কোন্ প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক।

১। উপরি-উক্ত কৃষকেরা অন্য কাহারও নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সমবায়-সমিতি ও কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এখন যে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে ভালরূপে হইবে, তাহার আশা কম। প্রত্যেক গ্রামের অবস্থা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। গবর্মেণ্টই কৃষির জন্য ঋণ দিবেন, এবং তাহা এই সকল চাষা যুক্ত হইয়া গ্রহণ করিবে। সকলের জোত তাহার জন্য একত্র দায়ী হইবে, এবং তাহারা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইবে।

২। গবর্মেণ্ট টাকা ঋণ দিবেন না, কেবল বীজশস্য যোগাইবেন, এবং সুদের পরিবর্ত্তে শস্যভার গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক থানায় গোলাবন্দী করিয়া রাখিবেন। দুর্ভিক্ষের সময় ইহাই বিতরিত হইবে। দুই বৎসরের সুদস্বরূপ

ধান্য জমিয়া গেলে, তাহার এক বৎসরের অংশ, প্রয়োজন হইলে, বীজ-ধান্য-স্বরূপ আবার দেওয়া যাইতে পারে। আসল টাকাও গবর্মেণ্ট শস্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গোলাবন্দী করিবেন। নূতন বৎসরের ধান্য হইলে পুরাতন চাউল বিক্রয় করিয়া আবার নূতন চাউল দ্বারা তাহা পূরণ করিবেন।

৩। প্রত্যেক চাষী তাহার বীজধান্য গবর্মেণ্টের গোলায় রাখিতে বাধ্য হইবে। প্রত্যেক চাষীর জন্য তাহার হিসাব থাকিবে।

৪। বাকী শস্য চাষীদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য। যাহাতে তাহারা হাটে শস্য বিক্রয় করিয়া অপদার্থ দ্রব্য ক্রয় না করে, তাহার বিধান করিতে হইবে। হাটের উপর লক্ষ্য থাকিলে, এবং তৈল, বস্ত্র প্রভৃতির দর বাঁধিয়া দিলে, ইহা সহজ হইয়া পড়িবে।

৫। এই সকল সুবিধার পরিবর্ত্তে চাষীগণকে গবর্মেণ্ট-অনুমোদিত যুক্ত-পরিশ্রম প্রথা নিম্নলিখিত ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে—

যুক্ত-পরিশ্রমের প্রণালী।

১। চাষীদিগের মধ্যে জমীর কম বেশী থাকিলেও সকলের লাঙ্গল ও গরু পরস্পরের হিতার্থ ব্যবহৃত হইবে, এবং তাহারা কৃষিকার্য্যে পরস্পরকে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করিবে।

২। সার সকলেরই প্রাপ্য।

৩। প্রত্যেক গ্রামের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগের ইনস্পেক্টর যে সকল শস্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা চাষীগণ চাষ করিতে বাধ্য থাকিবে। অন্যথা দণ্ডনীয় হইবে। আলস্যবশতঃ বসিয়া থাকিলেও দণ্ডনীয় হইবে। ইনস্পেক্টর কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কৃষিকার্য্যে কঠিন পরিশ্রমই সেই দণ্ড।

৪। প্রত্যেক গ্রামেই যথাসম্ভব কার্পাস, বাঁশ, লাল আলু, পেঁপে, নানাবিধ দাইল, মশলা, তেঁতুল, বেল, আম্র ও কাঁঠাল, মহুয়া, কেঁদ, পিয়াল প্রভৃতির চাষ করিতে সকলে বাধ্য; অর্থাৎ, যে সকল বৃক্ষ ও লতা সামান্য জলেই ফল প্রসব করে, এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রের আহার্য্য হইতে পারে, তাহা প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন করিতে সকলে বাধ্য হইবে।

৫। গ্রামের তৈলোপযোগী শস্য ও মোটা-তৈলের উপযোগী বৃক্ষাদি পর্য্যাপ্তভাবে রোপণ করিতে হইবে। কেরোসিন তৈল যত উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

৬। বাঁধের মৎস্য সকলে বণ্টন করিয়া লইবে।

৭। গবর্মেণ্টের অনুমতি ভিন্ন সার্কেলের কোনও প্রজা অন্য দেশে, কিংবা চা-বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতে পারিবে না।

অন্নের সংস্থানের উপায় উল্লিখিত প্রকারেই অনেকটা সম্ভব। বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাত আবশ্যক দ্রব্যের জন্য, গবর্মেণ্ট এখন হইতেই বন্দোবস্ত করিতেছেন। ছোট ছোট প্রাদেশিক কারখানায় ও প্রজাদিগের গৃহেই বস্ত্র বুনানীর আয়োজন ও তদুপযোগী শিক্ষা ও যুক্ত-পরিশ্রমের অনুষ্ঠান শীঘ্রই হইবে।

ইহাতে ব্যবসাদার, জমীদার, ডাক্তার, ওভসিয়র, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও দরিদ্র কর্ম্মচারী প্রভৃতি যোগদান করিয়া কিরূপে স্বীয় অবস্থার উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরস্পরের হিতসাধন করিতে পারেন, এখন তাহার কথা বলিব। তাহাই ভবিষ্যতের স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিস্বরূপ হইবে।

৯

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃষকের খাজনার টাকা হইয়া ও ব্যবসা করিয়া যে সকল শ্রেণী দিনপাত করে, তাহাদিগের কেবলমাত্র লাভের দিকেই দৃষ্টি থাকে, সুতরাং তাহারা শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির কথা লইয়াই আলোচনা করে। খাদ্যশস্যের বিষয় তাহারা ভাবিয়া দেখে না; কারণ, তাহারা মনে করে যে, টাকা থাকিলেই খাদ্য আসিবে। সেই ভ্রম-অপনোদনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থান ছাড়িয়া দিয়া সকল প্রদেশের দিকে একত্র দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে খাদ্যশস্য প্রচুর; বাঙ্গালার অনেক জেলা, এবং বিহারের উত্তর-ভাগের অনেক স্থান এইরূপ। অন্য প্রদেশে খাদ্যের অনাটন হইলে, তাহারা বিক্রয় করিয়া লাভ করে। এই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অসংখ্য মধ্যবর্ত্তী লোক আসিয়া জুটে; তাহার মধ্যে রাজপুতানা প্রদেশের ব্যবসাদারই অধিক। সেখানে শস্যের অতিশয় অনাটন। তাহারা উপরি-উক্ত উপায়ে দিনপাত করে। অন্য উপায় নাই।

কিন্তু যে সকল প্রদেশে শস্যাভাব, তাহার অধিবাসিগণের সকলেরই ব্যবসা করা কখনও সম্ভবপর নয়। সুতরাং সে স্থলের দরিদ্র শ্রমজীবীর শস্য সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায়, অর্থাৎ, হয় ত খাদ্যশস্যপ্রধান প্রদেশে চলিয়া গিয়া সেখানকার কৃষকদিগের শ্রমের লাঘব করা, কিংবা শিল্পজাত দ্রব্যে

তাহাদিগের অভাব পূরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে ঘন ঘন চলিয়া যায়, কিংবা কলকারখানায় ও সহরে গিয়া জুটে। অন্নের অভাবে তাহাদের অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু ইহাতে দেশের যেরূপ দুর্গতি হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে না গিয়া তাহার অধিবাসিগণ ঘরে বসিয়াই শিল্পজাত দ্রব্য কি করিয়া প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা সম্প্রতি 'হলাণ্ড কমিশন' তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জন্য এত জিনিস বাহির হইতে আমদানী হয় যে, তাহা আমাদের দেশের দরিদ্র শিল্পিগণ ও শ্রমজীবিগণ ঘরে বসিয়া প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষের খাদ্য-শস্য-প্রধান প্রদেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে।

কতকগুলি আমদানীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন।

বিদেশ হইতে আমদানী।

১৯১৪ খৃঃ।

মৎস্য	১৬ কোটী টাকার।
ফল	২০ লক্ষ "
তামাক	৫০ " "
কাগজ	১ কোটী "
বস্ত্র	৫০ কোটী "
ছবি, সাবান, ছড়ি, খেলনা, ছাতা, দেশলাই প্রভৃতি	৫ কোটী "

কিন্তু এ সব ঘরে প্রস্তুত করিবার মাল মশলা, সরঞ্জাম ও কলকারখানা যোগাইবে কে? এবং তাহার উপযোগী দক্ষ শ্রমজীবী কোথায়?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মিষ্ঠ কৃষক ও তাহাদিগের মজুর অন্য স্থানে চলিয়া গেলে গ্রামের অকর্ম্মণ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঘরে বসিয়া হাহাকার করে। সেই হাহাকার-নিবৃত্তির একই উপায়—তাহাদিগের শিল্পশিক্ষা। যখন লাঙ্গল ধরা তাহাদিগের পক্ষে অপমানসূচক, তখন কৃষকের স্কন্ধে চাপিয়া থাকার অপেক্ষা স্বীয় পরিশ্রমে দেশেরই অন্যান্য দ্রব্যের অভাব পূরণ করা জীবিকা-নির্ব্বাহের একই মাত্র উপায়। এবং সেই পরিশ্রম বাস্তুভিটা না ছাড়িয়া, অন্যত্র না গিয়াও হয়। ইহার আরও কতকগুলি সুবিধা। যে সকল কৃষক

ও মজুর বিদেশে গিয়াছে, তাহারা ঘরে ফিরিয়া আবার কৃষিকর্ম্মের সূত্রপাত করিতে পারে। ফলে, অন্ন ও বস্ত্র উভয়েরই সংস্থান হইবে।

মধ্যজীবীর যুক্ত পরিশ্রমই সেই উপায়।

ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যোগদান করিতে পারে। এবং তাহা করিলে অন্ন বস্ত্রের দুর্মূল্যতা কমিয়া যায়।

আপাততঃ কলকারখানা না হইতে পারে, কিন্তু স্বীয় প্রদেশের তৈল, ঘৃত, মৎস্য, গৃহদ্রব্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি অনেক জিনিস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুক্ত পরিশ্রমে হইতে পারে। সেটুকুর সূত্রপাতের জন্য জমীদার, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতির সহায়তা আবশ্যক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারিগণও তাহাতে যোগদান করিতে পারেন।

যৌথ কারবারের ভিত্তি এইখানে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যে, ব্যবসাদারের হস্তে না গিয়া স্বীয় প্রদেশের আবশ্যক দ্রব্যের অভাব নিজেই সস্তা দরে পূরণ করা।

যদি প্রদেশেই অন্ন থাকে, তবে কৃষকগণই তাহার অনেক দ্রব্য ক্রয় করিয়া সানন্দ-মনে অন্ন যোগাইবে। যদি প্রদেশে খাদ্যের অভাব হয়, তবে খাদ্যশস্য-প্রধান প্রদেশে তাহা চালান দিলে অন্ন জুটিবে।

মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি ব্যবসাদার না জুটাইয়া এক স্থানের সমবায়-সমিতি অন্য প্রদেশের কৃষককে অল্প লাভেই তাহা দিতে পারিবেন। ইহাতে পরস্পরের সখ্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে।

অন্ন ও বস্ত্রের অভাব দূরীভূত হইলেই বিস্তৃত লোকশিক্ষার আয়োজন স্বতঃই উদ্ভাবিত হইবে।

স্বায়ত্তশাসনের মূল এইখানে।

এখন দেখা যাউক, এই অনুষ্ঠানে কাহাদিগের ব্রতী হওয়া আবশ্যক।

১। জমীদারগণ ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী।

২। মধ্যবিত্ত শ্রেণী; যাহারা চাষ করিতে অপারগ। যে সকল কৃষক সম্পত্তিশালী ও নিজে চাষ করে না, তাহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩। ডাক্তার, উকীল ও ওভরসিয়র প্রভৃতি।

৪। শ্রমজীবী; যেমন তাঁতী, চর্ম্মকার, লৌহকার, কুম্ভকার প্রভৃতি।

৫। মৎস্যজীবী, কাঠুরিয়া, গোপ ও তৈলকার প্রভৃতি।

৬। ছোট ছোট স্থানীয় ব্যবসাদার ও দোকানদার।

৭। পেন্সন-প্রাপ্ত গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারী।

৮। অন্য প্রদেশ হইতে আনীত সুদক্ষ শিল্পী।

সকলেই সেই যুক্ত-সমিতির মধ্যে থাকিবে।

ইহাদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত ঘনীভূত সখ্য সম্বন্ধই প্রথমতঃ আবশ্যক।

কিন্তু সদাচরণ না থাকিলে এরূপ কোনও কারবার চলিবে না। এই সৎ-প্রবৃত্তির মন্ত্র কে এই দুর্ভাগ্য দেশের অধিবাসীর কর্ণে প্রদান করিবে?

এই যুক্ত-সমিতিকে কিংবা সমবায়-সমিতিকে আমরা 'যৌথ কারবার' বলিব না। কারবার বলিলে লাভ বুঝায়। সমিতির উদ্দেশ্য, পরস্পরের অভাবপূরণ। যাঁহার পক্ষে যেটুকু সম্ভব, তিনি তাহার সামান্য মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সমিতিকে দিবেন। ঈশ্বরকে 'ফল অর্পণ' করার যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে ইহাই তাহার মধ্যে খানিকটা। জমীদার তাঁহার বন, নদী, মাঠ ছাড়িয়া দিয়া, কেহ টাকা, কেহ বা কায়িক পরিশ্রম, কেহ বা বুদ্ধিবল দ্বারা এই স্থানীয় সমিতিগুলির পরিচালনা করুন। ইহার মূলে ইচ্ছা-শক্তি ও ধর্ম্ম। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বৈদ্য কিংবা ছোট ডাক্তার, জলপরিচালন, ক্ষুদ্র গৃহনির্ম্মাণের জন্য ছোট ছোট ওভরসিয়র ও রাজকর্ম্মচারী নিজের নিজের আত্মশক্তি প্রয়োগ করুন। বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য ছোট ছোট উকীল ও স্কুল ও পাঠশালার শিক্ষকগণ সমিতিতে একত্র হউন। সহরের গলিঘুঁজি ও আবর্জ্জনার মধ্যে না থাকিয়া, একবার মুক্ত মাঠে আসিয়া এই বিশ্ববিশ্রুত স্বর্গসম দেশের সোনার বর্ণ কি করিয়া কালি হইয়া গেল, তাহার চিন্তা করুন। একবার যুক্ত হইয়া বসিলে অভাব থাকিবে না। সুইজরল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নব্য ইতালী এই উপায়ে সখ্য ও শান্তি স্থাপন করিয়া দেশের দৈন্য দূর করিতেছে। একবার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইলে শিক্ষাপ্রচার করিতে কতক্ষণ লাগে?

স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া এই ক্ষেত্রে যোগদান করুন। কেবলমাত্র এক লক্ষ্য, —অন্ন, বস্ত্র ও জীবনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চয়। স্থানীয় অভাব পূর্ণ না হইলে যেন বিক্রয় ও লাভের দিকে কদাচিৎ মন না যায়।

সামান্য চিন্তা করিলেই ইহার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া কিংবা ভারতবর্ষেই অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া, এবং ব্যবসাদারের হাতে পড়িয়া সকলের কি দুর্গতি হইতেছে, তাহা বোধ হয় এ বৎসর সকলেরই

ধারণা হইয়াছে। স্থানীয় কৃষকই লাভের লোভে ঘরের ধান বিক্রয় করিয়া গ্রামগুলিকে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করে। যাহাতে শ্রমজীবী মজুর ও দরিদ্র কৃষক যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া সবল ও সুস্থ দেহে জন্মভূমির কর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখুন। তাহাদের যদি সাধ হয়, সমিতিই বস্ত্র বুনিয়া, ছাতা, জুতা ও জামা তৈয়ারী করিয়া, তাহাদের পরিধান করাইয়া দিন।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার শারদীয় উৎসবের সময় ঢাকী, ঢুলী, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, লৌহকার, চর্ম্মকার ও মালাকার, দরিদ্র চাষী, তৈলকার ও গোপদিগের কথা মনে পড়ে কি? সামান্য উপঢৌকন পাইলেই তাহারা কত সানন্দে নৃত্য করিত! আবার তাহাদের একবার হৃদয়ের দিকে টানিয়া লউন। গৃহে চোর আসিবে না। 'এনার্কিষ্টে'র ভয় থাকিবে না। আপনারাই তাহাদের হৃদয়ের রাজা হইয়া থাকিবেন।

যুক্ত পরিশ্রমে অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করিয়া, ঘরে সঞ্চয় করুন। অনাবৃষ্টির সময়, কিংবা বাজারে দর চড়িয়া গেলে, তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। যদি পর্য্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অন্য প্রদেশকে অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিতে পারেন। আজ দেখুন, লাভের দুর্দ্দম্য লালসায় পড়িয়া সহরের ব্যবসাদারগণ অন্ন অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দেয় না। ছয় টাকা নহিলে এক যোড়া বস্ত্র পাওয়া যায় না, চারি আনা নহিলে ঘরের প্রদীপ জ্বলে না। এক দলকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করিয়া আর এক দল আত্মহত্যার সূত্রপাত করিতেছে। ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করুন।

দেশের অন্ন-বস্ত্র না জুটিলে স্বায়ত্বশাসন ও 'রিফর্ম স্কীম'—সকলই বৃথা। জলের অভাবে কিংবা দূষিত জলের বিষে, কিংবা অন্নের অভাবে, কিংবা বাসোপযোগী গৃহ ও বস্ত্রের অভাবে লোক মরিয়া গেলে, স্বায়ত্তশাসন চলিবে কাহাদের লইয়া? ডাক্তার, হাঁসপাতাল, পয়ঃ-প্রণালী ও পাঠশালা—সকলই বৃথা।

যাঁহারা বাঙ্গালার কতিপয় জেলায় শস্যশ্যামল ক্ষেত্র এবং পাট ও চামড়া ও তামাকের আমদানী দেখিয়া সমৃদ্ধির স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়েন, তাঁহাদের পক্ষে এ সব কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যে সকল প্রদেশ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, সেখানে ইহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে।

যদি বাস্তবিকই 'ইউনিয়ন কমিটী' যুক্ত-কর্ম্মসমিতির আকারে পরিণত হয়, তবে তাহাদিগের অভাব জানাইতে ও আবশ্যক টাকা ঋণস্বরূপেই হউক, কিংবা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের 'গ্রাণ্ট'-স্বরূপেই হউক, প্রাপ্ত হইতে অধিক সময়

(চাষের বিবরণ)

কোটী বিঘায়।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা (কোটী)	চাউল	গোধূম	ভুট্টা	অন্যান্য খাদ্যশস্য	কয়লা (কোটী মণ)	তৈলোপযোগী	কার্পাস	পাট	চা	অন্যান্য ভূমিজাত
আসাম	⅓	১	…	…	…	…	⅒	…	…	⅛	…
উত্তর পূর্ব্ববঙ্গ	২	২½	…	…	⅓	…	½	…	১¼	…	¼
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ ও উড়িষ্যা	২½	৪	…	…	⅓	১২৪	⅒	…	⅙	…	…
ছোটনাগপুর	⅓	১	…	…	⅙	২০০	⅒	…	…	…	…
বিহার	২½	৩	⅓	⅙	২	…	⅙	…	⅒	…	½
উত্তর-পশ্চিম	৪½	২	২	⅓	৬	…	¼	⅙	…	…	১
পঞ্জাব	২⅛	…	২⅙	⅙	৩	…	⅓	¼	…	…	½
বোম্বাই	২	½	⅙	…	৫½	…	½	১¼	…	…	⅙
বেরার	⅙	১	[illegible]	…	½	…	¼	⅓	…	…	…
মধ্যদেশ	১⅛	১	১	…	১½	…	⅓	¼	…	…	⅙
মাদ্রাজ	৪	২	…	…	৪½	…	½	½	…	…	⅓
মোট	২৩	১৮	৬	১	২৪	৩২৪	৩½	৩	১½	⅛	৩

লাগিবে না। প্রত্যেক ইউনিয়নের লোকসংখ্যা, জমী ও শস্য, জলের অভাব, গাভীর সংখ্যা ও বীজশস্যের অভাব প্রভৃতি নির্দ্ধারণ না করিলে, হঠাৎ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ সম্ভবে না। কিন্তু একবার ব্রতী হইলে সকলই সহজ হইয়া পড়ে। বিশ্বনিয়ন্তা মানবকে মরুভূমির মাঝেও এত ধন দিয়া রাখিয়াছেন যে, হতাশ হইবার কোনও কথাই নাই। আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার কিছুই নূতন নহে, কেবল এই দুর্দ্দিনে সেগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

যদি এ বৎসর সুবৃষ্টি হয়, তবে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। বস্ত্র ও জীবনোপযোগী দ্রব্য যুক্ত-পরিশ্রম দ্বারা যত দূর সম্ভব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। পরের মুখাপেক্ষী হইবেন না। বিক্রয় ও লাভের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করিবেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, সাধারণ স্বত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। জীবনের প্রথম সংগ্রামে কতকগুলি বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য লোক দরিদ্র-সাধারণকে দলিত করিয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু শেষ সংগ্রামে প্রকৃতি তাহাদের ধ্বংসসাধন করে, এবং কৃষিক্ষেত্র ও অরণ্য হইতে আবার সেই আদিম জাতি-বাহির হইয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। কার্ত্তিক।—'ভৌগোলিক পরিভাষা-গঠনে পণ্ডিতদিগের মতামত' উল্লেখযোগ্য। সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর-ভবনে 'সারস্বত-সমাজ' নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সভায় ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অগ্রহায়ণ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী'র এই সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার নমুনা দিলাম,—'এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরুমধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটী বক্তাই স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে 'সঙ্কট' শব্দ, স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়,—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, Channel, Mountain-pass, সমস্তই বুঝায়।

'অনেক গ্রন্থকার Strait শব্দের স্থলে 'প্রণালী' ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে জল-নির্গমপথ বুঝায়। প্রণালী—অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

'Peninsulaকে বাঙ্গালার সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপ বলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়। অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে 'প্রায়দ্বীপ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝা যায়।

'এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।'

রাজনারায়ণ বসুর সমগ্র পত্রখানি আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাবের উত্তর আছে।—'আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না। ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করতঃ প্রচণ্ডবেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক; কেহ কাহার কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। 'irritabile vates trition'। আমার অনুরোধ এই, আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা—উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে—তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটীতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্য প্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম; Channel শব্দ কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়; তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন 'স্থলসঙ্কট' ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে।' শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বঙ্গ-সাহিত্যে বর্দ্ধমান' কৌতুকজনক প্রবন্ধ। মিহিদানা ও খাজার জন্মভূমি বর্দ্ধমানের উল্লেখ বঙ্গসাহিত্যে নাই, এমন নহে। কিন্তু

> 'কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ,
> এক দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।'

প্রভৃতি এ প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নহে। বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ! আমরা 'বর্দ্ধমানে'র কোনও নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ পড়ি নাই। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'কবিতা' বা 'গানে'র টুকরায় আমরা দুধের সাদ ঘোলে মিটাইবার অবকাশ পাইয়াছি; পাঠককেও তাহার আস্বাদ দিতেছি। বর্দ্ধমান কালিদাসের পেটে চৌধুরী সমালোচক লিখিয়াছেন,—'শঙ্করাচার্য্যের

প্রচারিত মায়াবাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে সেই প্রাচীনকাল হইতেই নানা কথা-কাটাকাটি হইয়া আসিতেছে; আজিও তাহার বিরাম হয় নাই; গ্রন্থকার কিন্তু এই দুরূহ মায়াবাদ একটী কথায় আমাদের বুঝাইয়া দিলেন,—

'মায়া কিরে? মায়া কেরে?
সে তো তাঁর ছায়াটীরে।'

জ্ঞানের ভাস্বরতার সহিত ভক্তির স্নিগ্ধতার শুভ সম্মিলন যাঁহাতে না ঘটিয়াছে তিনি কখনই এরূপ জটিল দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা এত সহজে করিতে পারেন না।'—মায়ার 'জটিল তত্ত্বে'র মীমাংসা না হউক, এই সমালোচনায় আর একটা বিষয় সপ্রমাণ হইয়া গেল। 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবনবিজয়ী ভব' নিশ্চয়ই সার-সত্য, ধ্রুব-সত্য! চৌধুরী সুরেশচন্দ্র এই সত্যে স্বতঃসিদ্ধ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি, বাঙ্গালা দেশের সমালোচনার মরুক্ষেত্রেও আমরা সুরেশচন্দ্রের মত এমন সাহসী 'নির্লজ্জ' আর কখনও দেখি নাই! 'মায়া কিরে? মায়া কেরে? সে তো তাঁর ছায়াটিরে'—ইহা যে মায়াবাদ-রূপ 'জটিল দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা', এই অ-জটিল সহজ 'তত্ত্ব'টুকু বর্দ্ধমানের মিহিদানার অপেক্ষাও মনোহর! 'মায়া তাঁর ছায়া'! আশ্চর্য্য আবিষ্কার! 'বর্দ্ধমান' অর্থাৎ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এই হীরার গোলকুণ্ডা বটেন, কিন্তু সেই হীরা তুলিলেন—চৌধুরী সুরেশচন্দ্র। আশা করি, এই আবিষ্কারক এবার 'নোবেল প্রাইজে' বঞ্চিত হইবেন না। 'ভক্ত কবি' অর্থাৎ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ 'গদ-গদকণ্ঠে গাহিতেছেন,—

'করুণার তব কিনারা নাই।
প্রতিকাজে তাই তোমারে পাই।'

দ্বিতীয় শঙ্কর চৌধুরী সুরেশচন্দ্র এই বর্দ্ধমান-সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—'এই অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই তো জগতের এই মরণশীল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে একদিনের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে নাই।' জগতের 'মরণশীল ঐশ্বর্য্য' না পারুক, জীবনশীল খাজানা? তবে সুরেশচন্দ্রের মত আর দুই এক জন সমালোচক এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের মত আর দুই এক জন সম্পাদক জুটিলে 'বর্দ্ধমান'কেও লালাবাবুর পথ ধরিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুরেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'যেটুকু বলিতে চাই সেটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারাই হইতেছে লেখকের একটা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। তিনি যদি অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিয়া বক্তব্যটুকুর সবখানি পাঠককে নিঃশেষে বুঝিতে না দেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের শক্তি-হীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়।' এখন 'বর্দ্ধমানে'র রচনায় এই 'স্পষ্টতা'র উদাহরণ দেখুন,—

'অনন্ত সুষুপ্তে করি না ভাবনা।
অনন্ত জাগ্রতে সদাই বাসনা॥
অনন্তের তরে, অনন্তের সুরে,
অনন্তের স্বরে, গাহিতে কামনা।
অনন্ত করমে, অনন্ত মরমে,
অনন্ত চরমে, এই ত সাধনা॥'

অনন্তের এমন দানসাগর শ্রাদ্ধ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ভিন্ন আর কে করিতে পারিত? 'বর্দ্ধমানে'র রূপার কাটীর স্পর্শে 'অনন্ত' একবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে, আবার সোনার কাটীর স্পর্শে তখনই জাগিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই 'অনন্ত সুষুপ্ত' কে? ভাষ্যকার সুরেশচন্দ্র তাহার ব্যাখ্যা করিলে ভাল হইত! ছয় চরণের মধ্যে চারি যোড়া 'অনন্ত'! মেয়েরা দুই হাতে দু' গাছা পরে! ভাগ্যে অনন্তের ফণা এক সহস্র, নতুবা এই 'অনন্ত করমে'র ও 'অনন্ত মরমে'র 'অনন্ত কর্ম্মভোগ' তাঁহার এক-আধটা ফণার সহিত না। বাঙ্গালীকেও বলিতে হইত,—

'অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া!'

বর্দ্ধমান 'নিশ্চয়' বলিবেন,—'ভগবান আমাকে এমন সমালোচকের কবল হইতে উদ্ধার কর!'—এই 'তত্ত্ববোধিনী'র জন্য বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত রচনা দিলেও, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যেরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, এবং তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিদ্যাসাগর প্রভৃতির রচনা 'তত্ত্ববোধিনী'তে ছাপা হইত। সেই 'তত্ত্ববোধিনী'কে 'ছেঁদা মালা'য় পরিণত করিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'টক ঘোল' পরিবেষণ করিতেছেন। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ!'

ব্রহ্মবিদ্যা। কার্ত্তিক।—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'বিজয়া'য় বিশেষত্ব নাই। কবি সেই পূজা বড় ভালবাসেন, যাহাতে 'সুতের শোণিত হয় না সঁপিতে চরণে মার।' মার 'বৈষ্ণবী'-রূপ-কল্পনাও ত হিন্দুর তন্ত্রে বিরল নহে। কিন্তু 'সুতের শোণিত'ই কি এত বড়? স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, 'বেটী রক্ত চায়!' তিনিই হিংসা, তিনিই অহিংসা। যুগধর্ম্মের উপযোগী জাতীয় যজ্ঞে 'সুতের রক্ত'ও দিতে হয়। শুধু 'আঁখি-বারি' ও 'মর্ম্মের প্রীতি' দিয়া দশপ্রহরণ-ধারিণী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী মার পূজা হয় না। যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলি,—

'বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি',

তিনি যদি বাহুতে শক্তি দেন, এবং হৃদয়ে ভক্তি দেন, তাহা হইলে সে শক্তি মার পূজায় 'সুতের শোণিত'ও দান করিতে পারে, এবং সে ভক্তি এই কঠোর ব্রতে ভক্তকে অনুপ্রাণিতও করিতে পারে। যে পূজার যে উপচার, তাহা পরিহার করিবার উপায় নাই। শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাধ্য ও সাধন' প্রবন্ধে নানা কথার সমাবেশ আছে—শৃঙ্খলা নাই, এবং ইহার বিবিধ বার্ত্তার অনুসরণও দুরূহ। ইহা অধিকারীর 'সাধ্য' হইতে পারে, শিক্ষার্থীর 'সাধন' নহে। শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবীর 'অনুভব' পদ্যে রচিত, অতএব কবিতা। নমুনা—

'সকল সময় আসো না ত এইখানে
তাই, এলে পরেই তোমা ভালো বাস্‌বো গো।'

কবি যাঁহার আগমন কামনা করিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার 'ইষ্ট';—ব্রহ্মও হইতে পারেন, তেত্রিশ কোটী দেবতার এক জনও হইতে পারেন। কি কুক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র গান রচিয়াছিলেন! তাহার পর বাঙ্গালা দেশের কবিযূথের আবালবৃদ্ধবনিতা হাফেজ হইয়া উঠিল! সকলেরই ঈশ্বরের সঙ্গে সখ্য ক্রমে ঘনাইয়া উঠিতেছে! আন্দাজে, বেনামে, ইসারায় আধ্যাত্মিক কাব্যি-সাগরে মধুর-রসের ফেনপুঞ্জময় তরঙ্গ উঠিতেছে।

'অনুভবে'ও সেই মধুর-রস অনুভব করিলাম। কিন্তু ইহা কি? গদ্য, না পদ্য? শুনিয়াছি, ব্রহ্ম নির্গুণ, তাই কি 'ব্রহ্মবিদ্যা' কবিতার লক্ষণ করিয়াছেন—নির্গুণ? শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তীর 'সুখ'ও এই শ্রেণীর নির্গুণ কবিতা। নমুনা—

'শ্বাপদ-সঙ্কুল উচ্চ ভীষণ বনেতে,
সুখের আশায় পশে হাসিতে হাসিতে।'

মিলের কবি কল্পতরু বটে। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রীর 'উষস্তি-হস্তিপক-সংবাদ' সুখপাঠ্য। 'আত্মার প্রয়াণ' প্রহেলিকা। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদের 'নূতন মাপের কথা'য় দেখিতেছি, —'এই মাপটি বুঝে না, এমন কোন ক্ষুদ্র কীট আছে কি না, আমরা জানি না।' অতএব, সকলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র 'প্রাচীন ভারতে জনসেবা' হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—'খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্যাম-দেশে জয়বর্ম্মন্ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এই রাজা তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আরোগ্য-শালা বা হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; এই শিলালিপি ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দের। এই শিলালিপি-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে তাঁহার রাজ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১০২টি আরোগ্য-শালা ছিল। দরিদ্রদিগকে অন্নদান করা হইত। এই উদ্দেশ্যে যে চাউল প্রয়োজন হইত, তাহা উৎপাদন করিবার জন্য ৮১,৬৪০ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষ নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক আরোগ্য-শালায় ৩২ জন করিয়া বেতনভুক্ কর্ম্মচারী ছিল, তাহা ছাড়া প্রত্যেক আরোগ্য-শালায় ৬৬ জন করিয়া সেবক কোনরূপ বেতন না লইয়া, এমন কি, নিজব্যয়ে থাকিয়া স্বেচ্ছায় সেবা করিত। প্রত্যেক আরোগ্য-শালায় দুই জন করিয়া চিকিৎসক থাকিতেন; প্রত্যেক চিকিৎসকের অধীনে এক জন সেবক ও দুই জন সেবিকা কার্য্য করিত। ইহা ছাড়া ঔষধ-বিতরণের জন্য দুই জন ভাণ্ডার-রক্ষক, দুই জন পাচক, বুদ্ধদেবের পূজার জন্য দুই জন পূজক ও ১৪ জন শুশ্রূষাকারী থাকিত। দুই জন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা জল গরম করিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত করিত; আর দুই জন স্ত্রীলোক ধান ভানিত। ব্যাপার কত বৃহৎ ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে পশুচিকিৎসার জন্যও আরোগ্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাই আরোগ্য-দান। প্রাচীন পুরাণে ও স্মৃতিগ্রন্থে আমরা আরোগ্য-দানের উপদেশ পাই। যিনি মানুষ বা অন্য কোন জন্তুর রোগ-প্রতীকারের জন্য ঔষধ পথ্য দান করেন, তিনি প্রাণদাতা; তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি রোগার্ত্ত বা ক্ষুধিতকে মধুর আশ্বাসবাক্য বলেন, তিনি গোমেধের ফল লাভ করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ-লাভের উপায় আরোগ্য-দান। অতএব আরোগ্য দান করিলে সর্ব্বদানের ফল হয়। আরোগ্য-শালা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে ভাল ভাল ঔষধ, ঘৃত, অন্ন ও মধুর ব্যবস্থা করিবে। আরোগ্যশালায় সুপণ্ডিত বৈদ্য নিযুক্ত করিবে। বৈদ্য বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন, এবং ঔষধগুলির সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিবে। ওষধি, মূল ও পাতার বিষয় তাঁহার জানা চাই, কোন্ ওষধি কিরূপে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা থাকিবে। যিনি ধর্ম্মবুদ্ধিতে এইরূপ আরোগ্যশালা স্থাপন করেন, তিনিই কৃতকৃত্য। দয়ালু ব্যক্তি আরোগ্যশালাতে ঔষধ, পাচন, তৈল প্রভৃতির -

সাহায্যে একটি রোগীকেও সম্যক্ রোগমুক্ত করিতে পারিলে তাহার ফলে, সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন।'

আয়ুর্ব্বেদ। কার্ত্তিক।—কয় মাসের পর 'আয়ুর্ব্বেদ' একটু 'চাঙ্গা' হইয়াছে। কিন্তু 'আয়ুর্ব্বেদে'র শীর্ষেও কাবির ভাণ্ডার! শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্তের 'বঙ্গে বিজয়া' মাথায় করিয়া হেমন্তের 'আয়ুর্ব্বেদ' আসরে উপস্থিত। যে রোগে বাঙ্গালা পাগলা-গারদে পরিণত, 'আয়ুর্ব্বেদ' স্বয়ং সেই রোগে আক্রান্ত! 'Physician heal thyself'! আমরা আশা করিয়াছিলাম, তুমি মধ্যমনারায়ণ ও শিবাঘৃতের ব্যবস্থা করিবে! এখন তোমার জন্যই 'লোহার বালা' আবশ্যক হইয়া উঠিল! শ্রীগণনাথ সরস্বতীর 'আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস' চলিতেছে। শ্রীকুমুদিনী বসু সরস্বতীর 'শিশুপালন' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু lecture বাদ দিলে আরও উপাদেয় হইত। কাজের কথার সঙ্গে বাজে কথার আধিক্য শোভা পায় না। যে প্রসঙ্গে যে কথার 'বিস্তার' আবশ্যক, সে প্রসঙ্গে অবান্তর কথার উপর lecture 'নীর' পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর মেয়েরা উপদেশের ক্ষীর গ্রহণ করিতে পারিবে না। 'শিশু-পালন'-সূত্রে সমগ্র মানব-সমাজের সংস্কার সম্ভব। তাহা বড় কথা। কেমন করিয়া শিশুপালন করিতে হয়, আপাততঃ তাহাই আমাদের আবশ্যক। শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন 'শিশু-চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা'য় কয়েকটি রোগের ঔষধ বলিয়া দিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ও অবশেষে এইরূপ ঔষধ-নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি 'জ্বরে'—এই সাধারণ অভিধানে কয়েকটী ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কোন্ জ্বরে? 'সাধারণ জ্বরে' বলিলে কি বুঝিব? অথবা কয়টি ঔষধই 'সর্ব্বজ্বরগজসিংহ?' 'সকল চিকিৎসা'য় 'বাতাজীর্ণে লাল চতুর্মুখে'র গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। লেখক কে, বলিতে পারি না—কিন্তু ইনি সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।—ইনি 'প্রাতর্ম্রমণে'র ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বিসর্গসন্ধিকে চাকদায় তীরস্থ করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পালের 'নিরামিষ খাদ্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্তের 'মুষ্টিযোগ ও টোটকা'য় অনেকগুলি ঔষধ বিবৃত হইয়াছে। এই সকল মুষ্টিযোগের কোন্গুলি তাঁহার পরীক্ষিত, লেখক তাহার উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

সুবর্ণবণিক-সমাচার। কার্ত্তিক।—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দের 'মহামায়া' কবিতাটি মহামায়া অপেক্ষাও মায়াময়ী—দুর্ভেদ্য। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার 'সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' অত্যন্ত অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মার 'শ্রীধাম-নবদ্বীপ-দর্শনে' নবদ্বীপের 'মাতৃ-মন্দিরে'র ইতিহাসে সামাজিকগণের অবধান প্রার্থনীয়। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ পাল 'মরণে'র উপর কবিতা লিখিয়াছেন,এবং প্রশ্ন করিয়াছেন,—'কেন রে মরণ! শুনি তোর নাম শিহরি উঠে পরাণ?' মরণের ইচ্ছা হয়, উত্তর দিবে। কিন্তু কবির গুণপণা দেখিয়া ছন্দ, মিল প্রভৃতি কবিতার সমস্ত সরঞ্জাম শিহরিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি 'মূঢ়জন' ও 'সমজ্ঞানে' মিলাইয়া দিয়াছেন! মডারেট ও ন্যাশন্যালিষ্ট, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে মিলাইবার ভার এই পাল কবিকে দিলে হয় না? 'অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-সভা' হইতে উক্ত সভায় পঠিত, সুকবি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের রচিত 'অক্ষয় লোকে অক্ষয়কুমার' নামক কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

'"প্রদীপ" নিভিয়া গেল, দিব্য "শঙ্খ"-ধ্বনি
থেমে গেল, ঝরে গেল "কনক-অঞ্জলি"!
আহ্বানিল "এষা" লক্ষ্মী আনন্দে আপনি
প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে! বিরহে বিদলি
মিলনের পুণ্যালোক উঠিল ফুটিয়া
অচিন্ত্য অক্ষয় লোকে! বীণাবাদিনীর
একটী মধুর তন্ত্রী পড়িল ছিঁড়িয়া
অকস্মাৎ অতর্কিতে, এ মর্ত্তবাসীর
উদ্বেলিয়া হাহাকার! কাব্য-কুঞ্জবনে
থামিতেছে একে একে পিকের কূজন
কি দারুণ বজ্রাঘাতে! ভ্রমর-গুঞ্জনে
ঘেরিতেছে কেকারব, হা কবি-ভূষণ!
তবে আজি তাই হোক্। অনন্তের গান
পূর্ণ ক'রে দিক্ তব তীর্থযাত্রী প্রাণ।"

বৈবস্বত মনু।

ঋগ্বেদের অন্তর্গত প্রাচীন ঋষিদিগের স্তব আলোচনা করিলে জানা যায়, কোনও কোনও ঋষি মনুর যজ্ঞ করিয়াছিলেন; আবার কোনও কোনও ঋষির জন্মের কথা মনু জানিতেন। কবি-পুত্র উশনার নাম ও দিবোদাস-পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) ঋগ্বেদ হইতে ইহাও জানা যায় যে, মনুর পিতার নাম বিবস্বান ছিল। কিন্তু এই বেদে আদিত্য দেবদিগের মধ্যে কাহারও নাম বিবস্বান নাই। (২) পরবর্ত্তী যুগে সূর্য্যের এক নাম বিবস্বান ধরা হইয়াছে। কিন্তু উহা ঋগ্বেদে আরোপ করা যাইতে পারে না। অষ্টম মণ্ডলের ২৭ হইতে ৩১ সূক্ত বৈবস্বত মনুর রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মনুর কালে বিভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবপূজা প্রচলিত ছিল। তিনি ঐ সকল দেবতাদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ৩৩টী দেবপূজা সকল আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। (৩) এই ৩৩ দেবের মধ্যে সোম, অগ্নি, ত্বষ্টা, ইন্দ্র, রুদ্র, পূষা, বিষ্ণু, অশ্বিদ্বয়, সূর্য্য, মিত্র ও বরুণের বর্ণনা তাঁহারই একটী স্তবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪) অপর এক স্তবে বরুণ, মিত্র, অর্যমা, অগ্নিগণ ও সাত জন মরুতের উল্লেখ আছে। (৫) এই দেবগণ যে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ও তাঁহাদের আদিত্য, মরুৎ ও বসু নাম, ইহা তাঁহার এক স্তবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৬) তিনি পৃথিবী ও ইড়া নামও উল্লেখ

---

(১) উশনা। কাব্যঃ। ত্বা। নি। হোতারং। অসাদয়ৎ।

আযজিং। ত্বা। মনবে। জাতবেদসম্॥—৮।২৩।১৭ (ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা)

কবি-পুত্র উশনা মনুর নিমিত্ত হোতা তোমাকে, জাতবেদা তোমাকে, যজ্ঞকারী তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

দধ্যঙ্। হ। মে। জনুষম্। পূর্বঃ। অঙ্গিরাঃ। প্রিয়মেধঃ। কণ্বঃ। অত্রিঃ।

মনুঃ। বিদুঃ। তে। মে। পূর্বে। মনুঃ। বিদুঃ।—১।১৩৯।৯—(দিবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপ)

দধীচি, বৃদ্ধ অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি, মনু আমার জন্মের কথা জানিতেন; তাঁহারা ও মনু আমার পিতা পিতামহকে জানিতেন।

(২) ২।২৭।১; ১০।৮৮।১১; ১০।৭২।৪,৮,৯।

(৩) ৮।২৮।১; ১।১৩৯।১১; (৪) ৮।২৯; (৫) ৮।২৮; (৬) ৮।২৭।২,৩

করিয়াছেন। (১) ঋগ্বেদের ঋষিগণ মনুর ৩৩ দেবকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেন। ইহা হইতে অনুমান করি, মনু নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বসু, আদিত্য ও মরুৎ (বা রুদ্র) পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধনে সমর্থ হন। এই মিলনে যে নূতন সমাজ গঠিত হয়, তাহা 'মানুষ' নামে বেদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই জন্য বৈদিক যুগে ঋগ্বেদ মানবদিগের বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (২)

যিনি সমাজে এক নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে যিনি এরূপ ধর্ম্ম-সমন্বয় করিয়া নব ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি যে ঋষি ও রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণও আমরা নানা স্থানে প্রাপ্ত হই। শতপথ ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অংশে ইহাকে রাজা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের কোনও ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন, বিষ্ণু মনুকে দান করিতে উরুক্ষিতি বা পৃথিবী করিয়াছেন। (৩) কোনও ঋষি বলিয়াছেন, বিষ্ণু মনুর নিমিত্ত তিন পার্থিব লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৪) ইন্দ্র মনুর জন্য নমুচি বধ করেন, ইহাও কোনও ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন। (৫) কৃষ্ণ-ত্বক্ অব্রতদিগকে ইন্দ্র মনুর নিমিত্ত শাসন করিয়াছিলেন, ঋষিদিগের বিশ্বাস। (৬) ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হইতেছে যে, মনু তিনটী বিস্তৃত ভূভাগের সম্রাট ছিলেন, এবং তিনি কৃষ্ণত্বক্ দাস দস্যুর রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন।

এই তিন পার্থিব লোককে উরুক্ষিতি বা পৃথিবী বলা হইত। ইহাদিগকে তিন ভূমিও বলা হইত, দেখিতে পাই। (৭) এই তিন দেশের তিন যজ্ঞবেদি

---

(১) ৮।২৭।২ ও ৮।৩১।৪

(২) 'King Manu Vaivasvata', he says—'his people are Men, and they are staying here ;'...The Rik (verses) are the Veda ; this it is ;' thus saying let him go over a hymn of the Rik, as if reciting it,

XIII, 4,3,3. (Part V. pp. 361—62)

(৩) বসিষ্ঠ রচিত ৭।১০০।৪

(৪) ভরদ্বাজ পুত্র ঋজিশ্বা রচিত ৬।৪৯।১৩

(৫) বভ্রু ঋষি রচিত ৫।৩০।৭ ; ভরদ্বাজ রচিত ৬।২০।৬

(৬) ১।১৩০।৮

(৭) গৃৎসমদ রচিত ২।২৭।৮

ও তিন বাক্‌দেবীর উল্লেখ ঋগ্বেদের ঋষিদিগের স্তোত্রে বর্ত্তমান। (১) ইহাদের নাম ভারতী বা মহী, সরস্বতী ও ইড়া। তিন প্রকার বাক্যের উল্লেখ ঋগ্বেদের নানা স্থানে বর্ত্তমান। (২) দীর্ঘতমা ঋষি কিন্তু চারি প্রকার বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহাদের সকলগুলি মনীষী ব্রাহ্মণগণ জানেন। তিনটী গুহায় নিহিত থাকে। চতুর্থ বাক্য মনুষ্যগণ বলে। (৩) ইহা হইতে অনুমান করি, ভারতী, সরস্বতী ও ইড়া, এই তিন ভাষায় রচিত স্তব যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণগণ এই সকল স্তব স্মরণ করিয়া রাখিতেন। চতুর্থটী চলিত ভাষা; স্তবের ভাষা হইতে বিভিন্ন ছিল। ঋগ্বেদের অনেক স্তব আমাদের সুখবোধ্য। কিন্তু এরূপ কতকগুলি স্তব আছে, যাহার ভাষা কিছু দুর্ব্বোধ্য। বৈদিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, ইহা দ্বারা বেদের ভাষার মধ্যে কোন্‌টী প্রাচীন ও কোন্‌টি নবীন, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা কিন্তু মনে করি, ঋষিগণ তিন বিভিন্ন দেশে বাস করিতেন বলিয়া, তাঁহাদের ভাষায় কিছু কিছু বিশেষত্ব ছিল। এই নিমিত্ত একই কালের ঋষিদিগের ভাষায় বিভিন্নতা দেখা যায়। যে ভাষা ভারতবর্ষের ঋষিগণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই আমাদের সুখবোধ্য।

তিন বিভিন্নদেশীয় আর্য্য সম্প্রদায়ের অগ্নিবেদিতে যে অগ্নি স্থাপিত হইত, তাহাও তিন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ভারতী নামক অগ্নিবেদিতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, তাহাকে 'ভারত' অগ্নি বলা হইত। অগ্নির আর এক নাম অঙ্গিরা দেখিতে পাই। (৪) ইহা সরস্বান্ নামেও অভিহিত হইত। (৫) ইড়া-বেদিতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, তাহার নাম ছিল আয়ু। (৬)

---

(১) কণ্ব পুত্র মেধাতিথি রচিত ১।১৩।৯; দীর্ঘতমা রচিত ১।১৪২।৯; অগস্ত্য রচিত ১।১৮৮।৮; গৃৎসমদ রচিত ২।৩।৮; বিশ্বামিত্র রচিত ৩।৪।৮; বসিষ্ঠ রচিত ৭।২।৮

(২) তিস্রঃ। বাচঃ। ঈরয়তি। প্র। বহ্নিঃ।—৯।৯৭।৩৪

তিস্রঃ। বাচঃ। প্র। বদ। জ্যোতিঃ। অগ্রাঃ।—৭।১০১।১

(৩) চত্বারে। বাক্। পরিমিতা। পদানি। তানি। বিদুঃ। ব্রাহ্মণাঃ। যে। মনীষিণঃ। গুহা। ত্রীণি। নিহিতা। ন। ইঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং। বাচঃ। মনুষ্যাঃ। বদন্তি।—১।১৬৪।৪৫

বাক্য চারি প্রকার। যে সকল মনীষী ব্রাহ্মণ (আছেন) পরিমিত পদ সকলকে জানেন। তিনটী গুহায় (অর্থাৎ মনে) নিহিত আছে, প্রকাশিত হয় না। মনুষ্যগণ চতুর্থ বাক্য বলিয়া থাকে।

(৪) ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরাঃ। ঋষিঃ—১।৩১।১

(৫) সরস্বন্তং। হবামহে।—৭।৯৬।৪

(৬) ত্বাং। অগ্নে। প্রথমং। আয়ুং। আয়বে। দেবাঃ। অকৃণ্বন্। নহুষস্য। বিশ্পতিম্। ইড়াং। অকৃণ্বন্। মনুষস্য। শাসনীং। পিতুঃ। যৎ। পুত্রঃ। মমকস্য। জায়তে।—১।৩১।১১

ভরদ্বাজ ঋষির একটী স্তোত্রে দেখিতে পাই, রাজা দিবোদাসের এক যজ্ঞে তিন জন প্রধান প্রধান ঋষি ব্রতী ছিলেন। ইহাতে ভরদ্বাজ, অথর্ব ও ভরত ঋষির নামের উল্লেখ আছে। (১) তাঁহার স্তোত্রেও অগ্নির উল্লিখিত তিনটী নাম প্রাপ্ত হই ; যথা, ভারত, অঙ্গিরা ও আয়ু। (২) এই সকল নাম ভিন্ন, অগ্নিকে যজ্ঞের হোতা, বিধাতা, অগ্নি, সুক্রতু, অমর্ত্যদূত, ইত্যাদি নামও প্রদান করা হইয়াছে। আমরা মনে করি, কোনও রাজা যজ্ঞ করিলে, তিন সম্প্রদায়ের ঋষিদিগকে আনিয়া তিনি যজ্ঞে বরণ করিতেন। তাঁহারা আপন আপন অগ্নিতে নিজ নিজ ভাষায় রচিত স্তব দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেন। ইহার উদাহরণ ঋগ্বেদ হইতে আরও দেওয়া যাইতে পারে। মনু নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে এই তিন সম্প্রদায়ের অগ্নিপূজার মিলনসাধন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঋগ্বেদের সকল ঋষি ক্রমে ভারতী, সরস্বতী ও ইড়াকে যজ্ঞকালে আহ্বান করিতেন।

বেদে মরুৎগণ রুদ্র-পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৃৎসমদ ঋষি একটী ঋকে মরুৎগণকে ভরত-পুত্র বলিয়াছেন। (৩) তাহা হইলে রুদ্রের আর এক নাম ভরত। রুদ্র হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে ভারত অগ্নি বলা যাইতে পারে। যে সম্প্রদায় রুদ্রাগ্নি-পূজক ছিল, তাহারা ভারত-জন নামে বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহাদের অগ্নিবেদি ও ভাষা ভারতী নামে অভিহিত হইত। ইহাদের দেশ, অনুমান করি, ক্রমে ভারত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বৈদিক যুগে ভারতীকে মহী নামও দেওয়া হইত। মনু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে যোগদানের পূর্ব্বে এই সম্প্রদায় রুদ্র, অশ্বিদ্বয় ও মরুৎগণের ভক্ত ছিল।

সরস্বতীতীরে অনেক আর্য্য বাস করিতেন। তাঁহাদের যজ্ঞাগ্নি অঙ্গিরা

---

(১) ত্বাং। ঈড়ে। অধ। দ্বিতা। ভরতঃ। বাজিভিঃ। শুনম্। —৬।১৬।৪
ত্বং। ইমা। বার্য্যা। পুরু। দিবোদাসায়। সুম্বতে।
ভরদ্বাজায়। দাশুষে॥—৬।১৬।৫
ত্বাং। অগ্নে। পুষ্করাৎ। অধি। অথর্ব্বা। নিঃ। অমন্থত।
মূর্দ্ধ্নঃ। বিশ্বস্য। বাঘতঃ॥—৬।১৬।১৩

(২) আ। অগ্নিঃ। অগামি। ভারতঃ। বৃত্রহা। পুরুচেতন।
দিবোদাসায়। সৎপতিঃ॥—৬।১৬।১৯
তম্। ত্বা। সমিদ্ভিঃ। অঙ্গিরঃ। ঘৃতেন। বর্দ্ধয়ামসি।—৬।১৬।১১
ত্বে। ত্বে। অগ্নে। ত্বা-উতাঃ। ইষয়ন্তঃ। বিশ্বম্। আয়ুঃ।—৬।১৬।২৭

(৩) আসদ্যাঃ। বর্হিঃ। ভরতস্য। সূনবঃ।—২।৩৬।২

নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 'অঙ্গিরা'-অগ্নির পূজক বলিয়া তাঁহারা অঙ্গিরা নামে বেদে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের দেবগণ বসু নামে পরিচিত। ইন্দ্র, অগ্নি, বৃহস্পতি, ত্বষ্টা, সোম প্রভৃতি দেবগণ বসু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহাঁদের অগ্নিবেদি ও বাক্‌দেবীকে সরস্বতী বলা হইত।

আর এক আর্য্য সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহারা বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, সূর্য্য প্রভৃতি আদিত্যগণের পূজা করিতেন। তাঁহাদের অগ্নির নাম ছিল আয়ু। সেই জন্য তাঁহারা আয়ুবংশীয় বলিয়া বেদে প্রসিদ্ধ। মনু এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। ইঁহাদের অগ্নিবেদি ও বাক্‌দেবীকে ইড়া বলা হইত। আয়ুগণ ক্ষিতি নামেও অভিহিত হইতেন।

যেরূপ তিন প্রকার অগ্নি ও তিনটী বাক্‌দেবীর উল্লেখ ঋগ্বেদে বর্ত্তমান, সেইরূপ ইহাতে তিন প্রকার আর্য্য-প্রজার উল্লেখও দেখা যায়। বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন—'তিন (অগ্নি) ভুবন সকলে রেত উৎপাদন করেন; জ্যোতিঃপূর্ণ তিন আর্য্য-প্রজা (উৎপন্ন হন); তিন প্রকার (সোমের) ঘট উষাকে সেবা করে। বসিষ্ঠগণ সেই সকলকেই জানেন।' তিন অগ্নি হইতে যে তিন আর্য্য-প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বৈদিক যুগের ঋষিদিগের বিশ্বাস। (১) অতএব, ঋগ্বেদের যুগে অঙ্গিরা নামক অগ্নি হইতে অঙ্গিরাগণ, আয়ু নামক অগ্নি হইতে আয়ুগণ ও ভারত নামক অগ্নি হইতে ভারতগণ,—তিন আর্য্য-প্রজারূপে গৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের মিলনে যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহারাই 'মানুষ' নামে ঋগ্বেদে বর্ণিত। এই মিলনে যে মহাশক্তির উদ্ভব হয়, তাহার দ্বারা পণি, বৃত্র, দাস, দস্যু প্রভৃতি জাতিদিগের রাজ্য অচিরে 'মানব'-জাতির করতলগত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের কালে ভারতী, সরস্বতী ও ইড়াকে সকল মনুষ্য যজ্ঞার্হা বলিয়া স্বীকার করায়, ঋষিদিগের স্তোত্রের সাহায্যে কাহারা কোন্ দেশে, কি নামে বাস করিত, তাহার নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কখনও কখনও শত্রুতা হইত; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঋষির স্তোত্রে তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এইরূপ এক বিচ্ছেদ ঋষিদিগের স্তোত্র হইতে অবগত হই। ইহার সাহায্যে ঋষি-বর্ণিত তিন পার্থিব লোক বা ভূমি কোন্ কোন্ দেশকে

---

(১) ত্রয়ঃ। কৃণ্বন্তি। ভুবনেষু। রেতঃ। তিস্রঃ। প্রজাঃ। আর্যাঃ। জ্যোতিঃ অগ্রাঃ। ত্রয়ঃ। ঘর্মাসঃ। উষসম্। সচন্তে। সর্বান্। ইৎ। তান্। অনু। বিদুঃ। বসিষ্ঠাঃ॥
—৭।৩৩।৭

বুঝাইত, এবং উহাদের অধিবাসিগণ কি নামে পরিচিত ছিল, আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ভরদ্বাজ ঋষি একটী ঋকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে ক্ষিতিগণ ও জনদিগের দুই প্রকার রায় অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে। (১) বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ একটি ঋকে ক্ষিতিগণকে জনদিগের ঘোর শত্রু বলিয়াছেন; সেই জন্য অগ্নির নিকট পশ্চিম দিকের শত্রুদহনের প্রার্থনা করিয়াছেন। (২) ভরদ্বাজ ঋষির ঋকে ক্ষিতি ও জন নাম পাইয়াও নিঃসন্দেহে বলা যায় না, উহারা দুই বিভিন্ন দেশের লোক। কিন্তু যখন জানা গেল, ক্ষিতিগণ জনদিগের শত্রু হইয়াছে, এবং সেই জন্য পশ্চিম দিকের শত্রুদিগকে দহন করিবার প্রার্থনা হইতেছে, তখন আর সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, উহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত, এবং ক্ষিতিগণ জনদিগের পশ্চিমে ভিন্ন দেশে বাস করিত।

আমরা 'সুদাস' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বসিষ্ঠ ঋষি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনিও একটী ঋকে ক্ষিতিগণকে দুষ্টমিত্র আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (৩) তাহা হইলে বুঝা যায়, বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ ঋষি ক্ষিতিদিগের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। পরে দেখান যাইতেছে, ভরদ্বাজ ঋষির ভ্রাতাও ক্ষিতিদিগের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। ক্ষিতিগণ যে কাহারা, তাহাও তাঁহার ঋকে জানা যায়। আমরা 'সুদাস' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, পরুষ্ণী (বর্ত্তমান রাভী) নদীর কূলভেদ করিতে অনেক আর্য্য নরপতি ও ঋষি আগমন করিয়াছিলেন। এই জন্য সুদাসের সহিত উঁহাদের যুদ্ধ হয়। সুদাস এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া উরুলোকের সম্রাট্ হন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, পূরুরাজ কুরুশ্রবণের পুরোহিত কবষ, সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর ভ্রাতা কবি ও দ্রুহ্য এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে তুর্বশ, অনু, দ্রুহ্য, পূরু ও ভৃগুগণ আগমন করিয়াছিল। ইহারাই যে বসিষ্ঠ-বর্ণিত দুষ্ট-মিত্র ক্ষিতিগণ, তাহা বৃহস্পতির পুত্র ও ভরদ্বাজের ভ্রাতা শংযু ঋষি সমর্থন করেন। কারণ, তিনি একটী স্তবে বলিয়াছেন—'হে ইন্দ্র! নাহুষ কৃষকদিগের মধ্যে যে তেজ ও ধন আছে, কিংবা পঞ্চক্ষিতিদিগের উজ্জ্বল অন্ন ও যে সকল বল আছে, তাহা আমাদিগকে দাও।' (৪)

---

(১) ৬।১।৫ (২) ৩।১৮।১ (৩) ৭।২৮।৪

(৪) যৎ। ইন্দ্র। নাহুষীষু। আ। ওজঃ। নৃম্ণং। চ। কৃষ্টিষু।

যৎ। বা। পঞ্চ। ক্ষিতীনাং। দ্যুম্নং। আ। ভর। সত্রা। বিশ্বানি। পৌংস্যা॥—৬।৪৬।৭

'হে মঘবন্! কিংবা যে কিছু বীর্য্য তৃক্ষি, দ্রুহ্যু ও যাহা পূরুজনে আছে, তাহা আমাদিগকে দাও (ও) যুদ্ধে হিংসার্থসঙ্গত অমিত্রদিগকে (অধীন করিয়া) দাও।' (১)

আমরা 'পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, পুরুরাজ ত্রসদস্যুর দুই পুত্রের নাম কুরুশ্রবণ ও তৃক্ষি। এই রাজবংশ সুবাস্তু (বর্ত্তমান সাৎ) নদীর তীরে রাজত্ব করিতেন। সুবাস্তু ও কাবুল নদী মিলিত হইয়া সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা অনুমান করি, ক্ষিতিগণ বর্ত্তমান আফ্গানিস্থানে বাস করিত। ইহা মনু-প্রতিষ্ঠিত পৃথিবী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন, নহুষ-পুত্র সরস্বতীতীরে বাস করিতেন। (২) আমরা অনুমান করি, সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহাই মনুর আদি রাজ্য। তিনি ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের ভূভাগ অধিকার করিয়া 'পৃথিবী' রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাকেই সেকালে উরুক্ষিতি বলা হইত। মনুর রাজ্য প্রথম ক্ষিতিতে ছিল বলিয়া, তাঁহার অধিকৃত সাম্রাজ্য উরুক্ষিতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনুমান করি। বর্ত্তমান আফগানিস্থান, মনে হয়, বৈদিক যুগে ক্ষিতি নামে অভিহিত হইত।

তিনি যখন পৃথিবীর সম্রাট হন, তখন তাঁহার রাজধানী যে দেশে স্থাপন করেন, তাহা বেদে পরাবান্ নামে বিখ্যাত। পরাবানের সোম অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। (৩) দেখান গিয়াছে, উশনা মনুর যজ্ঞ করেন। একটী ঋকে দেখি, তিনি পরাবান্ হইতে রক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন। (৪) মনু-বংশীয়গণও পরাবানের পথ হইতে দূরে না যাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। (৫) মনুর

(১) যৎ। বা। তৃক্ষৌ। মঘবন্। দ্রুহ্যৌ। আ। জনে। যৎ। পূরৌ। কৎ। চ। বৃষ্ণ্যম্। অস্মভ্যং। তৎ। রিরীহি। সং। নৃসহ্যে। অমিত্রান্। পৃৎসু। তুর্বণে॥—৬।৪৬।৮

(২) যে। সোমাসঃ। পরাবতি। যে। অর্বাবতি
সুন্বিরে। যে। বা। অদঃ। শর্য্যণাবতি।—৯।৬৫।২২ (জমদগ্নি)

যে সকল সোম পরাবানে, যে সকল অর্বাবানে, বা যাহারা এই শর্য্যণাবানে (আছে) অভিষুত হইতেছে।

শ্যেনঃ। যৎ। অন্ধঃ। অভরৎ। পরাবতঃ।—৯।৬৮।৬
শ্যেন পক্ষী পরাবান্ হইতে যে সোম আহরণ করিয়াছেন।

(৩) উশনা। যৎ। পরাবতঃ। অজগৎ। উতয়ে। কবে।—১।১৩০।৯
কবি-পুত্র উশনা রক্ষার্থ পরাবান্ হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

(৪) ৮।৩০।৩

প্রতি প্রীত ও পরাবান্ হইতে আগত জ্ঞাতিগণকে যজ্ঞে বলিবার জন্য প্রার্থনাও এক ঋকে দেখিতে পাই। (১) সায়ণ পরাবান্ অর্থে দূরদেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, পরাবান্ একটী স্থানের নাম, এবং ঐ স্থানে মনু তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।

আমরা অনুমান করি, মনু পৃথিবী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া আপন রাজধানী 'পরাবানে' যে অগ্নিবেদি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা ইড়া নামে ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে বেদে এইমাত্র সন্ধান পাই যে, পৃথিবীর অন্তর্গত 'বর' নামক স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। (২) রাজা সুদাস যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন তিনি সেই স্থানে গমন করেন। (৩) যে দেশে ইড়া-বেদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দেশ ক্রমে ইড়া নামে এবং লোক সকল ঐড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (৪) অনুমান করি, এই বেদি পারস্য দেশে অবস্থিত ছিল। সেই জন্য পারস্যের প্রাচীন গ্রন্থে ইড়া, ঐড়্যান-বীজ, বর প্রভৃতি শব্দ বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পৃথিবীস্থিত প্রত্যেক দেশের 'বিশ' বা সাধারণ লোক পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। (৫) এই জন্য ঋগ্বেদে 'পাঞ্চজন্যা বিশ', 'মানুষী পঞ্চক্ষিতি' বিশ ও 'পঞ্চক্ষিতি'র উল্লেখ নানা স্থানে দেখিতে পাই। (৬) ইহা হইতে অনুমান

---

(১) পরাবতঃ। যে। দিধিষন্তে। আপ্যং। মনুপ্রীতসেঃ। জনিম। বিবস্বতঃ।—১০।৬৩।১
...........তে। অধি। ব্রুবন্তু। নঃ॥

(আমরা) বিবস্বান্ হইতে জন্মিয়াছি; পরাবান্ হইতে আগত, মনুর প্রতি প্রীত যাঁহারা (আমাদের) জ্ঞাতিত্ব ধারণ করেন, তাঁহারা আমাদিগকে অধিক বলুন।

(২) নি। ত্বা। দধে। বরে। আ। পৃথিব্যাঃ
ইড়ায়াঃ। পদে। সুদিনত্বে। অহ্নাম্।—৩।২৩।৪

(৩) রাজা। বৃত্রং। জঙ্ঘনৎ। প্রাক্। অপাক্। উদক্
অথ। যজাতে। বরে। আ। পৃথিব্যাঃ।—৩।৫৩।১১

(৪) সঃ। সুন্বে। যঃ। বসূনাং। যঃ। রায়াং। আনেতা। যঃ। ইড়ানাং।
সোমঃ। যঃ। সুক্ষিতীনাম্॥—৯।১০৮।১৩

সেই সোম অভিষুত হন, যিনি বসুদিগের, যিনি ইড়াদিগের, যিনি সুক্ষিতিদিগের, যিনি রায়াদিগের নেতা।

(৫) আ। দধিক্রাঃ। শবসা। পঞ্চ। কৃষ্টীঃ।—৪।৩৮।১০। (বামদেব)

দধিক্রা দেব বল দ্বারা পঞ্চকৃষ্টি (প্রজাকে) রক্ষা করেন (বা বৃদ্ধি করেন)।

(৬) পাঞ্চজন্যাসু। কৃষ্টিষু।—৩।৫৩।১৬ পঞ্চ। ক্ষিতীনাং।—৫।৩৫।২
পঞ্চ। ক্ষিতীঃ। মানুষীঃ।—৭।৭৯।১ পঞ্চ। মানুষান্। অনু।—৮।৯।২

করি, মহর্ষি ও রাজর্ষি ভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা কৃষি প্রভৃতি কার্য্য করিত, তাহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। ভারত-জনদিগের অন্তর্গত কৃষক সম্প্রদায় 'পাঞ্চজন্যা বিশ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষিতিগণ পঞ্চক্ষিতি নামে অভিহিত হইত। পঞ্চ মানুষ ও মানুষী পঞ্চক্ষিতি নামে পৃথিবীবাসী সকল কৃষক প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমান করি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

অমরত্ব।

১

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'—

জীবনের সহিত মৃত্যুর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এ মর জগতে ও মর্ত্ত্য রসনায় অমরত্বের কথা শোভা পায় না সত্য, কিন্তু জীবদেহ মরণশীল হইলেও জীবের 'জীবনে'র মৃত্যু নাই, ইহা 'অমর', ইহাই আমি বিজ্ঞানের ভাষায় দেখাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন —

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২ অ।২২

এখানে 'আত্মা' অমর, কেবল 'দেহ' পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাচীন দার্শনিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতে আত্মার স্বরূপ এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আমরা কিন্তু এই শ্লোকে 'দেহী' অর্থে 'আত্মা' * বা 'জীবন' উভয়কেই অভিহিত করিতে পারি।

বৈজ্ঞানিকেরা 'জীবন' কাহাকে বলেন, দেখা যাক।

'জীবন' বা 'প্রাণ' বলিতে কি বুঝায়, তাহা সকলেই জানেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 'প্রাণী'। তাহাদের প্রাণ আছে। তরু, লতা, তৃণ, শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, কিন্তু সেই প্রাণ বা জীবন যে কি, তাহা এক কথায় প্রকাশ করা সহজ নহে। Herbert Spencer প্রভৃতি সকল পণ্ডিতের এক মত—ইহা দুর্জ্ঞেয়। †

---

* See কঠোপনিষৎ, ৫।৩।১৩

† Herbert Spencer—*Principles of Biology. p. 60.*

Life a mysterious principle of action which animates matter and sets it in motion.—*Becquerel.*

Prof. Tait বলেন—'ধাতুতে জীবন সুপ্ত, উদ্ভিদে মূর্চ্ছিত ও মানবে জাগরিত অবস্থায় আছে।' ভারত-গৌরব শ্রীজগদীশ বসু আবার জীবনের রাজ্য প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি জড় পদার্থেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধে 'প্রাণী' বলিতে 'জীব ও উদ্ভিদ' এই দুই-ই বুঝিব। 'প্রাণী' বা 'জীব' বলিতে মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচরস্থ কীটাণু প্রভৃতিকে, এবং 'উদ্ভিদ' বলিতে মহা মহীরূহ বনস্পতি হইতে তুষারজাত ক্ষুদ্র শৈবাল ও পঙ্ক-জ উদ্ভিদাণুকে অভিহিত করিব। সুতরাং আমাদের 'জীব' বা 'প্রাণী' এই দুই প্রাণবন্ত মহা জাতিকে বুঝাইবে।

২

অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না, * ইহা এখন পর্য্যন্ত 'বৈজ্ঞানিক সত্য' বলিয়া সকলের বিশ্বাস; কত পণ্ডিত এই মতের খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হইয়াছেন। মানব অনেক অসাধ্যসাধন করিয়াছে, হয় ত সুদূর ভবিষ্যতে এ মত খণ্ডিত হইবে, অজীব হইতেও জীবের উৎপত্তি হইবে। কিন্তু আজিও অজীব হইতে জীবের জন্ম অসম্ভব। মানব এখনও জীবনের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কেবল ইহাই নহে, পৃথিবীতে জীবনের জন্ম কি প্রকারে হইয়াছে, তাহাও স্থির করিতে পারে নাই। †

আমাদের শ্রীমতী ধরার বর্ত্তমান অবস্থায় অজীব হইতে জীবনের জন্ম অসম্ভব; সুতরাং যখন জীবনের জন্ম হইয়াছিল, হয় পৃথিবীর অবস্থা অন্যরূপ ছিল, নহে ত অন্য কোনও 'লোক' হইতে জীবন এখানে আসিয়াছে, এবং

Our knowledge of the nature of life is altogether too slender to warrant speculation on the fundamental questions.—*Prof. Bateson—Smith-sonian Report. 1915.*

* জীবনের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত আছে, তাহাদের কয়েকটির সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

Theories of origin of Life :—

(1) Life has originated and still originates from the dead.—*Dr. Charlton Bartian.*—এই মতটি খণ্ডিত।

(2) Life has originated from the dead, but can originate no longer.
—*Tyndall and Huxley.*

(3) Life has been brought from different planet.—*Lord Kelvin*.

† We are stalemated in respect of the origin and early history of Life.—*Heredity—Prof. Bateson.*

পরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পৃথিবী জীবনের জন্মভূমি নহে, কেবল কর্ম্মভূমি। *

কিন্তু অন্য 'লোক' হইতে জীবন এখানে আসিল কি করিয়া? মাঝে মাঝে অন্য লোক হইতে উল্কা এ পৃথিবীতে আসে বটে, কিন্তু আসিবার কালে এত বিষম তপ্ত হইয়া উঠে যে, প্রস্তর গলিয়া যায়, কয়লা হীরকে পরিণত হয়। এই উল্কা-যানে জীবন আসিলে পথেই ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

কেহ বলেন, ধূমকেতু-পুচ্ছে জীবন আসিতে পারে। ইহাও সমীচীন নহে; কারণ, ধূমকেতু-পুচ্ছে যে রশ্মি (ultra-violet rays) আছে, তাহা জীবনের পক্ষে মারাত্মক। আবার কাহারও মতে, কেতুপুচ্ছ ছায়ামাত্র, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। অন্য লোক হইতে জীবন আসিলেও, কিরূপে আসিয়াছে, তাহা আপাততঃ অজ্ঞাত।

আবার কেহ বলেন, হয় ত বহু পুরাকালে এই পৃথিবীই জীবনের জন্ম-ধারণের উপযোগী ছিল; ক্রমে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (geology) অনুসন্ধান করিলে এমন কোনও যুগের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এইরূপ নানা তর্ক উঠিতেছে, কিন্তু কোনও চরম মীমাংসা এখনও হয় নাই। বৈজ্ঞানিকের নিকট জীবনের জন্মবৃত্তান্ত যে আঁধারে, সে আঁধারেই রহিয়া গিয়াছে। আমরা জীবনের পক্ষেও বলিতে পারি, 'অজ্ঞানেতে জনম মরণ, বিস্ময়েতে জীবন কাটায়।'

৩

জীবন যে পৃথিবীতে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আদিতে ছিল না; সুতরাং যে উপায়ে হউক, ইহা এখানে আসিয়াছে। এইবার জীবনের জীবনচরিতের আলোচনা করা যাউক।

জীবনের আদিলীলা ঘোরতমসাচ্ছন্ন। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে, প্রথম জীবন প্রায় ৪০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে আসে। ভূপঞ্জরের ৩৪ মাইল নিম্নেও জীবনের চিহ্ন পাওয়া যায়। 'জীবনের চিহ্ন' বলিতে সেই

---

* Lord Kelvinএর মতে কোনও আধুনিক লুপ্ত জগতে জীব সুপ্ত (latent) অবস্থায় ছিল, তাহার এক খণ্ড 'charged with germs' উল্কাপাতে আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহা হইতে এই জীব-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

Arrhenius thinks that latent life is sufficient to enable germs to traverse the icy void of interstellar space in tact during an almost unlimited period—*Latent Life—Becquerel.*

সময়ের জীবের কঙ্কাল বা প্রস্তরীভূত অংশ (fossil) নহে ; কারণ, তখনকার জীবের অস্থি বা তদ্রূপ কোনও কঠিন অংশ ছিল না, যাহা কালের অত্যাচারেও টিঁকিতে পারে। তবে ভিজা মাটীতে তাহাদের চলাচলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতও হইতে পারে। তখনকার জীবের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা ভূপঞ্জরে যে সময়ে প্রথমে জীবের চিহ্ন পাই (cambrian age), তাহার বহু পূর্ব্বে জীবন পৃথিবীতে আসিয়াছে। *

প্রথম জীবের কোনও চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করিয়া কত জীবের জীবন-ইতিহাস দেখিয়া আদি জীবের জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন। আদি জীব (primordial amœba) অতি সরল এক-কোষময় জীব ছিল। † একটি জীব হইতে এই বিশাল জীব জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, না অনেকগুলি সরল জীব হইতে হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ‡ এক হইতে হউক, আর বহু হইতেই হউক, এই জীব-জগৎ আদিতে অতি সরল এক-কোষময় জীব হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই বিশাল জীবজগৎ সেই আদি জীব হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।—আদি জীব এক-কোষময় ছিল, তাহারই বহু-কোষময় বংশধর আজ এক দিকে বিবেক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব, বা গগনবিহারী বিহঙ্গকুল, বলশালী সিংহ, অতিকায় হস্তী ইত্যাদিতে, এবং অন্য দিকে সরসাল ফলে ও সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু

---

* The Cambrian system with its early and semi primitive forms of invertebrate marine fossils stand, roughly speaking, midway in earth's history ; approximately as long period of time was required to develope life to cambrian stage of evolution as has since elapsed up to the present time.—*Evidence of Primitive Life—Walcott.*

† The animate forms that first appeared were of extreme simplicity. They were tiny masses of scarcely differentiated protoplasm outwardly resembling the amœba observable to day, but possessed of the tremendous internal push that was to raise them even to the highest form of life.—*Creative Evolution—Bergson.*

‡ We should be greatly helped by some indications as to whether the origin of life has been single or multiple. Modern opinion is perhaps inclining to multiple theory, but we have no real evidence. Indeed the problem is outside the range of scientific investigation.

—*Heredity—Bateson.*

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই আদি জীবের সমধর্ম্মী এক-কোষময় ক্ষুদ্র protozoa, amœbaও এই সকল জ্ঞাতি ভ্রাতাদিগের সহিত এখনও জীবিত আছে, এবং সেই আদিম প্রথায় জীবন ধারণ করিতেছে। ইহারাও সমান প্রাচীন, তাহারই অংশ।

বিবর্ত্তন সর্ব্ব জীবে একরূপ কার্য্য করে না। তাহা হইলে জীবজগতে এত বৈষম্য দেখিতে পাইতাম না। মানবকে সৃষ্টির চরম ধরিলে, সকল কীট পতঙ্গ. ফুল ফল মানবে রূপান্তরিত হইত। কিন্তু বিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তন সেই আদিজীবের সন্ততিগুলির উপর বিভিন্নরূপ কার্য্য করিয়াছে; কোথাও তাহাকে মানুষ করিয়াছে, আর কোথাও বা তাহাকে সেই আদিরূপেই রাখিয়াছে। বিবর্ত্তনের প্রবাহে আদি জীব মনুষ্যে পঁহুছিয়াছে বটে, কিন্তু সেই প্রবাহের পথি-প্রান্তে মাঝে মাঝে চিহ্ন ফেলিয়া গিয়াছে; তাহা দেখিয়া আমরা বিবর্ত্তনের গতি ধরিতে পারি। আদি জীব হইতে মৎস্য হইল, এবং মৎস্য হইতে সরীসৃপ ও তাহা হইতে চতুষ্পদ ইত্যাদি হইয়াছে। আমরা আজিও কিন্তু মৎস্য, সরীসৃপ ও চতুষ্পদ একত্র দেখিতে পাই। বিবর্ত্তনের প্রবাহে তাহারা সব মানুষ হইয়া যায় নাই, যেন তাহারা কত দূর আসিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবর্ত্তন-প্রবাহ ছুটিতেছে, কোথায় থামিবে কে জানে?

বিবর্ত্তন সেই আদি জীবের সন্তানকে এক দিকে 'মানুষ' করিয়াছে, অন্য দিকে সেই আদিম অবস্থায় রাখিয়াছে, মানব ও amœba একত্র আজ জীবিত আছে, উভয়ে সেই আদি জীবের আধুনিক বংশধর, উভয়েই সমান প্রাচীন। ইহাদের মধ্যে কত বিভিন্ন স্তরের জীব আছে। জীবনের ধারা সেই আদি সরল এককোষময় জীব হইতে বহু-বল-দর্পিত মানব পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কোথাও ছিন্ন হয় নাই। Amœba হইতে মানবের উদ্ভব অবশ্য সরল ভাবে হয় নাই, জীবনধারা কত বিভিন্ন পথে ছুটিয়া কত বিভিন্ন জীবের জন্ম দিয়াছে, সে ধারার কত শাখা অকালে লোপ পাইয়াছে। তাহারই এক শাখা মানবে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

৪

আদি জীবের সমধর্ম্মী, ক্ষুদ্র জীবাণু (protozoa) ও উদ্ভিদাণু (proto-plujta) একটিমাত্র-কোষ-বিশিষ্ট; অর্থাৎ, তাহার দেহ একমাত্র কোষে পর্য্যবসিত, তাহার মুখ হস্ত পদাদি বিভিন্ন অবয়ব নাই, তাহার সবই মুখ; অর্থাৎ, সর্ব্ব শরীর দিয়া আহার গ্রহণ করিতে পারে, এবং হস্ত পদাদির

আবশ্যকতা নাই ; কারণ, জলে ভাসিয়া বেড়ায়। কেবল বংশরক্ষার সময়ে স্বীয় শরীর দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দুইটী বিভিন্ন জীবে রূপান্তরিত হয়। আবার ঐ বিভক্ত অংশ প্রত্যেকে দ্বিধা বিভক্ত হয়, এবং এইরূপে অসংখ্য জীবে পরিণত হয়।

ইহাদের দেহেরও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু নাই। ইহারাই যথার্থ অমর। একটী বিভক্ত হইয়া দুইটী হইল। এখানে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইল বটে, কারণ, পুরাতন 'এক' নূতন 'দুই' হইল, কিন্তু দেহ বা জীবন কিছুই নষ্ট হইল না। আবার, এই 'এক' 'দুই'টী হওয়ায় একটী মাতা ও অপরটী কন্যা হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ই অভিন্ন ও একরূপ। সত্যই কি ইহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় ? হয় ত বা ব্যক্তিত্ব দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় মাত্র, নষ্ট কিছুই হয় না। অবশ্য অপঘাতে, যেমন অগ্নিতে পুড়িলে, ইহারা মারা যায়। ইহা ভিন্ন ইহাদের মৃত্যু নাই, সুতরাং ইহারা অমর। * ইহা অপেক্ষা উন্নত, অর্থাৎ জটিল, জীবে দেখা যায় যে, তাহারা একা বংশ রক্ষা করিতে পারে না। যদিও মাঝে মাঝে একটী জীব নিজ শরীর দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দুইটি হয়, এবং তাহারাও আবার স্বতঃ বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন জীবে রূপান্তরিত হয় (parthenogenesis), তথাপি এইরূপ দুই এক 'পুরুষ' হইলেই তাহারা নির্জীব হইয়া পড়ে, এবং আর বিভক্ত হইতে পারে না ; তখন অপর একটী জীবের সহিত মিলিত হইয়া তবে বংশ রক্ষা করিতে পারে। এইরূপে বংশরক্ষার্থ দুইটী জীব পরস্পর মিলিত হইলে, তাহাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ 'জীব-পঙ্ক' (protoplasm) মিলিয়া যায়, এবং ঐ মিলিত জীবপঙ্ক হইতে কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম হয়।

দুইটী জীব প্রথমে সন্নিহিত হয় ; পরে তাহাদের কোষ দুইটির আবরণ এক স্থানে ছিন্ন হইয়া উভয়ের জীবপঙ্ক মিশিয়া যায় ; কেবল কোষের আবরণ দুইটি (cell-wall) পড়িয়া থাকে। জীব দুইটির শরীরের অধিকাংশ অপত্যে পুনর্গঠিত হয়, এবং নূতন করিয়া আবার জীবন আরম্ভ করে ; সুতরাং তাহা

---

* Weismann says, "Natural death occurs only among multicellular organism, the single celled forms escape it."

Ray Lankester puts, "Death has no place as a natural recurrent phenomenon among these (single-celled) organisms"—*The Evolution of Sex—Geddes Thomson, p. 276.*

Death is not a necessary phenomenon in the history of a proto-zoon, the parent being in point of fact simply and directly converted into the progeny—*Nicholson—Zoology. p. 33.*

জীবিত থাকে। * জীবের অধিকাংশ জীবিত রহিল বটে; কিন্তু উহাদের অল্প ভাগ (cell-wall) জীর্ণবাসের মত পরিত্যক্ত হইল, এবং উহা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অর্থাৎ, এই অংশ জীবের নূতন শরীরে (অপত্যে) স্থান না পাইয়া মরিয়া গেল।

এখানে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; আবার বিবাহেরও আভাস এইখানে প্রথম দেখি। কারণ, দুইটি বিভিন্ন জীব মিলিত হইলে তবে নূতন জীবের উদ্ভব হয়। কিন্তু এখনও স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয় নাই, উভয়েই সমলিঙ্গ। † ইহার পরের অবস্থায় দুইটি ভিন্ন-'লিঙ্গে'র জীবের মিলনে জীবের জন্ম দেখিব। কিন্তু এখন হইতে বিবাহ ও মৃত্যু সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। অভিব্যক্তির স্তরে জীব যত উন্নত হইতে থাকে, অর্থাৎ, জীব-দেহ যত জটিল হইতে থাকে, ইহা তত স্পষ্ট দেখা যায়।

ইহা অপেক্ষা উন্নত ও জটিল (multicellular) জীবে দেখা যায় যে, দুইটি বিভিন্ন আকারের জীব মিলিত হয়। প্রথমে দেখিয়াছি যে, দুইটি জীব সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া থাকে, এবং ঐ মিলিত জীব-পঙ্ক হইতে নূতন জীবের জন্ম হয়। কিন্তু ক্রমে জীবদেহ যত উন্নত অর্থাৎ জটিল হইতে লাগিল, তাহাদের বংশরক্ষাও তত জটিল হইল। এই শ্রেণীর দুইটি জীব মিলিত হইয়া বংশ রক্ষা করে বটে; কিন্তু পূর্ব্বের শ্রেণীর মত তাহাদের সর্ব্ব শরীর মিলিত হয় না, প্রত্যেকের শরীরের অংশ কতক (শুক্র ও শোণিত—'Sperm' and 'germ' cells) মিলিত হয় মাত্র। ‡ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি এইরূপে বংশ রক্ষা করে।

এইবার মনুষ্য প্রভৃতি উন্নত জীবের বংশ-রক্ষার আলোচনা করা যাউক। ইহার জন্য স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক। এখানেও উভয়ের সর্ব্ব শরীর মিশিয়া গিয়া অপত্যে রূপান্তরিত হয় না; তবে পুরুষের শরীরের এক অংশ (শুক্র বা sperm cell) স্ত্রীর শরীরের এক অংশের (শোণিত বা germ cell) সহিত মিশিয়া অপর একটি নূতন জীবের (অপত্যের) সৃষ্টি করে, এবং পিতামাতার শরীরের ঐ অংশ (শুক্র-শোণিত) অপত্যে জীবিত থাকে;

* Nicholson.—*Text Book of Zoology, p. 33.*

† Conjugation of similar cells.—*The Evolution of Sex.*

‡ Fertilisation by differentiated sex-elements—*The Evolution of Sex, p. 162.*

অর্থাৎ, সন্তান-জন্মের পর পিতা বা মাতার মৃত্যু হইলেও তাহাদের শরীরের ঐ অংশের ক্ষতি হয় না। আমরা উপনিষদের ভাষায় বলিতে পারি, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' *, সুতরাং পিতামাতার শরীরের ঐ অংশ সন্তানে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। কারণ, ঐ সন্তানের শুক্র-শোণিত আবার তাহার সন্তানে জীবিত থাকে। এইরূপে আদি জীবের অংশ কত যুগযুগান্তর হইতে এখনকার জীবে এখনও বাঁচিয়া আছে।

আদি জীব, অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকল জীব জন্ম লাভ করিয়াছে, আমাদের অতি-অতি-বৃদ্ধ পিতামহ, হয় ত কত যুগ হইল, তাহা অপঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—কারণ. জীবনের জন্মের পর কতবার মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, যাহাতে অনেক জীব নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু জীবনধারা নষ্ট হয় নাই। আদি জীব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জীবন এখনও সর্ব্ব জীব-জগতে জীবিত আছে, এবং কত কাল আরও থাকিবে! † জীবিত হইতে জীবিতের জন্ম হয়, আদি জীব হইতে তাহার সন্তান জন্মিয়াছিল, এবং তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে সকল জীব-জগৎ জন্মিল, তাহারাও সেই আদি জীবের অংশ। একটি প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র, এবং তাহা হইতে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে। এই দীপশিখার সহিত আদি প্রদীপের যে সম্বন্ধ, জীব-জগতের সহিত আদি জীবের সেই সম্বন্ধ। এই জীবজগৎ সেই আদি জীবের জন্ম হইতে বাঁচিয়া আছে, এবং যত দিন একটিও জীব বাঁচিয়া থাকিবে, তত দিন থাকিবে। ব্যক্তিগত মৃত্যুর সহিত জীবনধারার কোনও সম্বন্ধ নাই। ‡

জীবনধারা উৎস হইতে প্রবাহিত হইলে জল-বুদ্‌বুদের মত কতকগুলি জীব সে ধারায় দেখা দিল। তাহারা দুই দিনেই মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু জীবনধারা বুদ্‌বুদ্ হইতে বুদ্‌বুদান্তরে বহিতে লাগিল। প্রাণীগুলি জীবনধারার আধারমাত্র। Galton বলেন, জীবদেহ কেবল শুক্র-শোণিতের রক্ষক। §

---

* কঠ।—৪৭,১৮

† এই পৃথিবীতে জীবন বর্ত্তমান অবস্থায় আরও ৬,০০০,০০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান্ করেন।

‡ The death of individuals does not seem at all like a diminution of life in general or like a necessity which life submits to reluctantly etseg.—*Creative Evolution—Bergson.*

§ Individual is the trustee of the germ cell.—*Galton.*

কবির ভাষায় বলিতে হয়,—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে ত আজকে নয় আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসচি তোমায় চেয়ে—
সে ত আজকে নয় আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবন-ধারা বেয়ে—
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।"

সকল জীবই যখন জন্মলাভ করে, তখন তাহারা ক্ষুদ্র ও প্রায় অক্ষম থাকে—ইহাই শৈশব। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সর্ব্ব অবয়ব পুষ্ট হয়, এবং বৃদ্ধি পায়—ইহা যৌবন। এই সময়ে তাহারা বংশরক্ষা করিতে বা জীবনের ধারা রক্ষা করিতে যত্নবান হয়; অর্থাৎ, অপত্য উৎপাদন করে। ইহাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এইবার বৃদ্ধি বন্ধ হয়, এবং জরাগ্রস্ত হয়—ইহাই বৃদ্ধাবস্থা। ইহার পরই মৃত্যু—ইহাই জীবন-চক্র।

ইহার ভিতর যৌবনকালই মুখ্য। বিভিন্ন জাতির যৌবন-ইতিহাস দেখা যাউক।

যৌবনকালে জীব মীনকেতনের শাসনে আসে, স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নানা জীব জন্তুর শোভা সৌন্দর্য্য, বল বীর্য্য, নৃত্য গীত, যুদ্ধ বিগ্রহ, সবই মদনের ডালি। কিন্তু বিবাহ ও মৃত্যু একত্রই দেখা যায়। * মদনের শরের সহিত মরণের শরও মিশান থাকে। অনেকেই জানেন যে, কর্কটীর গর্ভধারণ মৃত্যুর বোধন। কয়েক প্রকার ভেক বিবাহ-বাসরে চিতা সজ্জিত করে। † অনেকগুলি কীট অপত্য উৎপাদন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। Weismann ও Goethe দেখাইয়াছেন, কয়েক প্রকার প্রজাপতি ও পতঙ্গ ডিম্ব প্রসব করিয়া কয়েক দণ্ড পরে প্রাণত্যাগ করে। পুং মাকড়সার কয়েক জাতি গর্ভাধান করিয়াই প্রাণ হারায়। প্রণয়িনীর নিকট আত্মত্যাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ! 'পিপীলিকার ডানা উঠে মরিবার তরে', কিন্তু কয়েক দণ্ড বিবাহ-বাসরে নাচিয়া বেড়ায়, এবং তাহার পর মরে।

---

* The death is an altogether inevitable consequence of the reproduction.—*The Evolution of Sex, p. 273.*

† Thomson's Zoology.

উন্নত জীবে বিবাহ ও মৃত্যুর এত নিকট সম্বন্ধ না থাকিলেও মৃত্যুকে মদনের ছায়ায় দেখা যায়। *

আবার বিবাহই জীবনকে অমর করে। সুতরাং মৃত্যু ও অমরত্ব উভয়ই বিবাহে অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। হয় ত জগতে যদি বিবাহ না থাকিত, অর্থাৎ যৌন-সংযোগে যদি জীবের জন্ম না হইত, তাহা হইলে আদি জীবের মত প্রত্যেক জীব অমর হইত। কিন্তু সে পুরাতন জগতে চিরপুরাতন জীব পুরাতন প্রথায় জীবনযাপন করিত। জগতে নূতন বলিয়া কিছু থাকিত না। প্রেম আসিয়া পুরাতনকে চির-নূতন করিয়াছে। কিন্তু এই আনন্দ, এই প্রীতির মূল্য কি ?—মৃত্যু ! † প্রেম নূতনকে জন্ম দিতেছে, এবং পুরাতনকে অপসারিত করিতেছে। প্রেমের চরম স্ফূর্ত্তি বিবাহে ; জন্ম ও মরণের উৎপত্তিও বিবাহে।

জীব মরে, কিন্তু জীবনকে অমর করে। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন অমূল্য। এই নশ্বর জগতে জীব তাহার নশ্বর দেহ জীর্ণবাসের মত ত্যাগ করে, এবং স্বীয় সন্তানে আবার নূতন দেহ লাভ করে। ইহাই জীবনের পার্থিব-অমরত্ব।

৬

জীবন শত শত যুগ পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং আজিও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু চিরকাল কি থাকিবে ? আমাদের পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়া আসিতেছে, সুদূর ভবিষ্যতে—অবশ্য শত শত যুগ পরে, এত শীতল হইয়া যাইবে যে, সকল জলই জমিয়া যাইবে, নদী প্রস্রবণ নিশ্চল হইবে, বায়ু অন্তর্হিত হইবে ; তখন এখনকার মত জীব এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারিবে না। অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তখন কি এই অনন্ত জীবনের শেষ হইবে ? বোধ হয়, না। জীবন অমর। কত পৃথিবী লোপ পাইয়াছে, এবং হয় ত আরও কত পাইবে। কিন্তু এই অমর জীবনধারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, এবং রাখিবে।

উদ্ভিদের বীজমধ্যে জীবন আছে, কিন্তু তাহা সুপ্ত (latent) ; তাহাকে সাবধানে রক্ষা করিলে বোধ হয় অনন্ত কাল জীবিত থাকিতে পারে। অনেক রোগের জীবাণু (germs) অবস্থাবিশেষে অনেক দিন জীবিত থাকে।

---

* In higher animals the fatality of the reproductive sacrifice has been greatly lessened, yet death may tragically persist even in human life as the direct nemesis of love—*Evolution of Sex, p. 275.*

† Death has been willed or at least accepted for the greater progress of life in general—*Creative Evolution, p. 260.—Bergson.*

সূর্য্যরশ্মি, উত্তাপ ও বায়ু সুপ্ত জীবনের অপকারী। যদি অন্ধকারে, উত্তাপ-বিহীন ও বায়ুবিহীন স্থানে বীজ ও জীবাণুকে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে উহাদের সুপ্ত জীবন অনন্ত কাল সুষুপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারে, এবং অনুকূল অবস্থায় পড়িলে আবার বীজ অঙ্কুরিত ও জীবাণু সঞ্জীবিত হইতে পারে। ইহাই পণ্ডিতদের মত। *

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদের মত এক দিন আসিবে। যখন আমাদের সূর্য্য নিবিয়া যাইবে, তখন আমাদের পৃথিবীর অবস্থা চন্দ্রের মত হইবে। চন্দ্র উপগ্রহ এখন নির্জীব, তাহাতে জল নাই, সাগর শুষ্ক, বায়ু নাই, সুতরাং তাহাতে জীবও বোধ হয় নাই। কিন্তু যে দিন সূর্য্য নিস্তেজ হইবে, এই পৃথিবী সে দিন অন্ধকার, বায়ুহীন ও অত্যন্ত শীতল হইয়া যাইবে। তখন এখনকার মত জীব উদ্ভিদ বাঁচিতে পারিবে না বটে, কিন্তু বীজ ও জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারিবে।

সেদিনকার পৃথিবী, সেই হিমানীক্লিষ্ট, জীব-জন্তু-বিহীন, আলোক-উত্তাপ-বিহীন পৃথিবী একা আঁধারে ঘুরিতে থাকিবে। কিন্তু তাহার সঞ্চিত সুপ্ত জীবন, তাহার বীজগুলি, কীট পতঙ্গের ডিম্বগুলি ও জীবাণুগুলির দশা কি হইবে? হয় ত অন্য কোনও সূর্য্য এই পৃথিবীকে আপন সৌর জগতে গ্রহণ করিয়া নূতন গ্রহের সৃষ্টি করিবে, এবং তাহাতে নূতন বায়ু, উত্তাপ সঞ্চালিত করিয়া সুপ্ত জীবনকে সঞ্জীবিত ও উদ্বোধিত করিয়া নূতন করিয়া জীব-জগতের পত্তন করিবে, এবং নূতন বিবর্ত্তনে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি করিবে।

আবার হয় ত বা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পৃথিবী অন্য কোনও গ্রহ উপগ্রহের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং ইহার এক একটি খণ্ড ঐ সুপ্ত জীব সঞ্চিত অন্য গ্রহে উপনীত হইবে, এবং তথায় নূতন জীবনের জন্ম দিবে। যেমন Lord Kelvin অনুমান করেন, আমাদের পৃথিবীতে এইরূপ এক খণ্ড উল্কা আসিয়া আমাদের এই বিশাল জীব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সুপ্ত-জীবনই জীব-জগৎকে অপার্থিব অনন্ত ও চিরকালস্থায়ী অমরত্ব † দান করিতে সমর্থ করিবে।

---

* Latent Life—*Becquerel.*

† It is a pity because latent life which is a true Providence for terrestrial conservation of beings, would have been the best means that nature could have employed to confer on certain animal and vegetable species a sort celestial immortality—*Latent Life—Becquerel.*

৭

পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই সৌর-জগতের মধ্যেই ইহার উৎপত্তি, বা অন্য সৌর-জগৎ হইতে আসিয়া এই সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতের মতে ইহা আমাদের সৌরজগতে গোত্রান্তরিতা বধূ। এই নবোঢ়ার প্রথম পরিচয়ের বিশেষ পরিচয় পাই না। তখন লজ্জাবনতা বধূর মত বড় অল্পভাষিণী। জানি না, জীবন পৃথিবীর পিতৃকুলোদ্ভূত কি না। হইতে পারে, পৃথিবী যখন এই জগতে আসে, তখন জীবন সুপ্ত অবস্থায় ইহাতেই ছিল। তাহার অনেক পরে এই পৃথিবীতে জল ও বায়ু সঞ্চালিত হয়, এবং সেই সুপ্ত জীবকে উদ্বোধিত করে। কিন্তু প্রথমে সৌর-জগৎ-ভুক্ত হইয়া ইহা অত্যন্ত তপ্ত হইয়াছিল, সলিল বাষ্পে পরিণত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে দুর্যোগে সুপ্ত জীবন যে বাঁচিয়া ছিল, তাহা বোধ হয় না। সেই জন্যই বোধ হয় Kelvinএর মতই সমীচীন।

এই সুপ্ত জীবন হইতেই যে এই বিশাল জীব-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত।

পরে এই পৃথিবী এই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমে ইহা শীতল হইতে লাগিল। জীবনও প্রকাশিত হইল। জীবনের প্রথম রূপ ক্ষুদ্র এক-কোষময়। জীব ও উদ্ভিদ পৃথক হয় নাই, মৃত্যুও দখল পায় নাই; কারণ, তখন সকলই অমর। পরে ঐ জীবনের কতক অংশ 'স্থাবর' বা স্থিতিশীল হইয়া বায়ু হইতে খাদ্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহারা হইল 'উদ্ভিদ'; এবং কতক অংশ অপরের প্রস্তুত খাদ্য জোর করিয়া দখল করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল, তাহারা হইল 'জীব'। জীবদিগকে আহার সংগ্রহ করিতে চারি দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, সেই জন্য তাহারা 'জঙ্গম', বা গতিশীল।

ক্রমে পৃথিবীর কৈশোরে এই স্থাবর জঙ্গম উভয়ই বিস্তার লাভ করিল। পৃথিবীর এই যুগকে 'অঙ্গার যুগ' বলে। পৃথিবী তখন কর্দ্দমে ও জলে আবৃত। ভূমণ্ডলের মানচিত্র অহরহঃ পরিবর্ত্তিত হইত। নদী সকল বিস্তীর্ণা ও মন্দ-গতিশালিনী; আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাক্ষেত্র, উভয়ই তুল্য ক্ষমতাশালী, উভয় উভয়কে পরাভূত করিতে ব্যস্ত। বায়ু জলকণা-সংযুক্ত, আর্দ্র; ধরা এক-ঋতু-মণ্ডিতা; অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম, বা মেরুমণ্ডল শীতার্ত্ত ও মধ্যাংশ আতপ-সন্তাপিত ছিল না। এই যুগ জীব-জগতের চরম যুগ। ভীষণকায় জন্তু ও গগনভেদী পাদপ পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত। ভীমকায় সরীসৃপ ভীষণ কীট

পতঙ্গ সে অরণ্যানীতে বিচরণ করিত। জলে মৎস্য ও কুম্ভীর ছিল। কিন্তু পুষ্পের ও পক্ষীর সম্পূর্ণ অভাব। অবশ্য মানব তখন ছিল না।

তাহার পরে মানবের যুগ। মানব যদিও দৈহিক বলে অনেক জন্তু অপেক্ষা দুর্ব্বল, কিন্তু বুদ্ধিতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে বুদ্ধিবলে পৃথিবীকে আয়ত্ত করিয়াছে। এখন মানবের উপকারে লাগাই জীবগণের বাঁচিবার প্রধান সম্বল। যে উদ্ভিদ বা জীব মানবের উপকারে লাগে না, তাহাদের উচ্ছেদ হইতেছে, এবং তাহার উপকারী জীব ও উদ্ভিদের বিস্তার হইতেছে। প্রকৃতির সকল বৃত্তিই মানবের বুদ্ধিবৃত্তির নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

কিন্তু মানবের এই প্রকৃতির উপর আধিপত্য কত কাল থাকিবে? বুদ্ধিবলে এখন সে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বটে,* কিন্তু চিরকাল পারিবে না। পৃথিবীর বৃদ্ধাবস্থায়, অবশ্য লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, মানব আর এ পৃথিবীতে বাঁচিতে পারিবে না; কারণ, তখন জল থাকিবে না, বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী রহিবে না, ফল শস্য জন্মিবে না, ইন্ধন ফুরাইয়া যাইবে। উন্নত জীব ও উদ্ভিদ তখন বাঁচিতে পারিবে না। তখন জীবন আবার বিবর্ত্তিত হইবে। আদি জীব হইতে যাহা বিবর্ত্তিত হইয়া মানবে উন্নীত হইয়াছিল, আবার মানব হইতে তাহাই প্রত্যাগমন করিয়া সরল পথ ধরিবে, এবং এক-কোষময় জীবে রূপান্তরিত হইবে। ইহাও বিবর্ত্তনের অংশ। পরে যখন আরও শীতল হইবে, 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্', আঁধারে আবৃত ধরা, তখন জীবনকেও আবার মূর্চ্ছিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং সেই অবস্থায় অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, কবির কথায় 'অমর হয়ে রবে মরি'। এবং এই জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়া হয় ত অন্য গ্রহে উপনীত হইবে, এবং তথায় অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া আবার উদ্বোধিত হইবে, এবং জীব-জগৎ অনুপ্রাণিত করিবে। এইরূপ কত অনন্ত কাল চলিয়াছে, এবং আরও ভবিষ্যতে কত অনন্ত কাল চলিবে, তাহা ক্ষুদ্র মানব ধারণা করিতে পারে না।

ইহাই অমর-জীবনের অনন্ত-চক্র। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে উপসংহার করি;—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে,—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্ম মৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ারে ভাঁটায়
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান,
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

---

* Man is nature's first insurgent son—*Ray Lancaster.*

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয়; শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে বসিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত; অপূর্ব্ব পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইত। ন্যায়রত্নের মনে যদি কখন বিন্দুমাত্র আত্মশ্লাঘার উদয় হইয়া থাকে, তবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা লিখিয়াই হইয়াছিল; কিন্তু ইহাকে আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কার বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়,—ইহা তাঁহার আত্মপ্রসাদের নামান্তরমাত্র। এ জন্য তিনি কোনও কোনও শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়া স্বয়ং দশ বার তাহা পাঠ করিতেন, তৃপ্তমনে অপরকে তাহা শুনাইতেন, এবং ভাবিতেন, এ প্রকার ভাব, মূল শ্লোকের এরূপ গূঢ় মর্ম্ম পূর্ব্বে বুঝি আর কোনও ভাষ্যকারের কল্পনায় স্থান পায় নাই। আবার পর মুহূর্ত্তেই এই পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য তিনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন।

সুমতি গৃহকার্য্যাবসানে 'পিঁড়া'য় পিতার সম্মুখে উপবিষ্টা, ন্যায়রত্ন ভক্তিগদ্গদচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করিয়া কন্যাকে শুনাইতেছিলেন, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে কি একটা ভয়ানক সোরগোল শুনিতে পাইলেন। পর মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বোক্ত কাজি সাহেব বিশ ত্রিশ জন যমদূতাকৃতি পাঠান কিঙ্কর লইয়া ন্যায়রত্নের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং অসঙ্কোচে তাঁহার 'পিঁড়া'য় উঠিয়া বিদ্রূপভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঠাকুর, একেবারে মস্‌গুল হ'য়ে ও কি কেতাব পড়্‌চো?'

সুমতি কাজি সাহেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে ঘরের ভিতর লুকাইল। ন্যায়রত্ন পুঁথি বন্ধ করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের কোরাণ সরিফের ন্যায় ইহা আমাদের একখানি পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ—'

ন্যায়রত্নের অপমান করাই কাজি সাহেবের এই অনধিকার-প্রবেশের উদ্দেশ্য; দুরাত্মার কখনও ছলের অসদ্ভাব হয় না। তিনি ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'কি বল্লি, কাফের! আমাদের কোরাণ সরিফের সঙ্গে তোদের ভুতুড়ে কেচ্ছা ভরা কেতাবের তুলনা? কোরাণ সরিফের অপমান!'—

তাহার পর, আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে—তিনি থু থু করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার নাগোরা জুতা সমেত সেই সুপবিত্র পুঁথিখানি পদদলিত করিলেন! কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধের উপশম না হওয়ায় তিনি পুস্তকখানি আকর্ষণ করিয়া, তাহা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলেন।

ন্যায়রত্ন এই কল্পনাতীত বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার পরমপূজ্য পবিত্র গ্রন্থের শোচনীয় পরিণাম বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাজি সাহেবের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতরস্বরে বলিলেন, 'দোহাই আপনার, পুঁথিখানি ছিঁড়িবেন না; ধর্ম্মের অপমান করা আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির শোভা পায় না।'

কাজি সরোষে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, 'কাফেরের আবার ধর্ম্ম, তার আবার মান!'

কাজি সাহেব সেই অসহায় দুর্ব্বল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার উৎকট ধর্ম্মানুরাগ-প্রদর্শনের জন্য এক ধাক্কায় ন্যায়রত্নকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার করকবলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ন্যায়রত্নের বহু যত্নের, বহু পরিশ্রমের ও বহু আদরের গ্রন্থখানি মুহূর্ত্তে ছিন্ন কাগজের স্তূপে পরিণত হইল। তাঁহার প্রাণে কি আঘাত লাগিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

কাজি সাহেব পুঁথিখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মোহাম্মদ গিজনী বা আরঙ্গজেবের ন্যায় অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন ভাবিয়া মনের আনন্দে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যেন শ্মশানের উপর দিয়া রৌদ্রতপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্নের ঝটিকা বহিয়া গেল!

ন্যায়রত্নের ক্ষুদ্র গৃহ-প্রাঙ্গণ পাঠান সৈন্যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা কাজি সাহেবের আদেশ পালনের জন্য নীরবে দণ্ডায়মান।

কাজি ন্যায়রত্নকে বলিলেন, 'তোমার ধর্ম্মজ্ঞানের ঝাঁপি সেই লেড়্‌কী কোথায়—যে তালুকদারের বাড়ী থেকে তার মেয়ের ফিতে চুরী ক'রে এনেছে?'

সুমতি তখন ঘরের এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল, আর মনে মনে বলিতেছিল, 'হে হরি, হে মধুসূদন, রক্ষা কর।'

কাজি ন্যায়রত্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সুমতিকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন!

সুমতি দুঃখে, ভয়ে, অপমানে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, 'বাবা বাঁচাও, বাবা গো রক্ষা কর!'

ন্যায়রত্ন কন্যার সাহায্যের জন্য গৃহমধ্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কাজি সুমতির কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিলেন। তাহার পর তাহার পিঠে এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, সে 'পিঁড়া' হইতে উঠানে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পাঠানদের আদেশ দেওয়া হইল—তাহারা যেরূপে পারে, তাহার নিকট হইতে চোরা মাল আদায় করিবে।

এই আদেশ শ্রবণমাত্র দুই জন পাঠান এক লম্ফে আসিয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা অভাগিনী সুমতিকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল; আর দুই পিশাচ 'ফিতা কোথায়—বাহির কর!' বলিয়া বেত্রাঘাত করিল।

সুমতি আঘাত-যন্ত্রণায় মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল; তথাপি পাষাণহৃদয় পাঠানগণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না, কাজি মহা উল্লাসে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে তখনও বেত্রাঘাত চলিতে লাগিল। সুমতির পিঠ ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিল; তাহার কোমল অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল; রক্তধারায় মৃত্তিকা সিক্ত হইল।

ন্যায়রত্ন দুর্ব্বৃত্তগণের কবল হইতে সুমতিকে রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া স্বীয় শীর্ণ দেহ দ্বারা কন্যাকে আচ্ছাদিত করিলেন, কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, 'বাপু সকল, আর মের না, আর মের না, দোহাই কাজি সাহেব, রক্ষা করুন, মেয়েটাকে হত্যা করবেন না।'—কিন্তু তাঁহার অনুনয় বিনয় নিষ্ফল হইল, দুই চারি ঘা বেত তাঁহার পিঠেও পড়িল।

কাজির যে সকল পাঠান অনুচর ন্যায়রত্নের অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া প্রফুল্ল চিত্তে এই বীরোচিত কার্য্য সন্দর্শন করিতেছিল, কাজিসাহেব তাহাদিগকে চোরা মালের অনুসন্ধানে ঘর খানাতল্লাসী করিবার আদেশ প্রদান করিলে তাহারা ন্যায়রত্নের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাসন, বিছানা প্রভৃতি তৈজসপত্রাদি সশব্দে আঙ্গিনায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়িয়াছে—এইরূপ একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। পাঠানগণের হুহুঙ্কারে সমগ্র পল্লী প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহারা ন্যায়রত্নের ঘর হইতে চোরামাল বাহির করিতে পারিল না। তালুকদার-কন্যার ফিতার সন্ধান হইল না। তখন কাজি সাহেব ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'ওরে কাফের, লোকে না কি বলে —তুই বড় ধার্ম্মিক! মেয়েকে চুরী বিদ্যা শিখানোই বুঝি কাফেরের ধর্ম্ম? তুই জেনে শুনে সেই চোরা মাল নিজের দখলে রেখেছিস্; যদি ভাল চাস্ ত ফিতা বের ক'রে দে।'

ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কাজি সাহেব, আপনার যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন, আপনার প্রবল প্রতাপ—যা খুসী করতে পারেন; আমরা দরিদ্র বটে, কিন্তু ভগবান আমাদের চুরী করবার প্রবৃত্তি দেন নি, ফিতা ত তুচ্ছ জিনিস, মহামূল্য ধনরত্নেও আমাদের লোভ নেই, তেমন বংশেই আমাদের জন্ম নয়। আমার মেয়ে কখনও চুরী করে নি, আমার ঘরেও কোনও চোরা মাল নেই।'

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কাজি সাহেবের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে করিতে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার কারপরদাজদের আদেশ করিলেন, 'এই বুড়া শয়তান ও তার মেয়ের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে দু'জনকেই তালুকদারের কাছারীতে নিয়ে চল্।'

এইরূপে চুরীর তদন্ত শেষ হইলে কাজি সাহেব বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সদম্ভে অনুচরবর্গ সহ ন্যায়রত্নের গৃহ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

সূর্য্যদেব কোন্ দিন কাহার ভাগ্যে কি ভাবে উদিত হইয়া থাকেন, তাহা কে বলিতে পারে? আজ প্রভাতে যখন তিনি উদিত হন, তখন ন্যায়রত্নের চিত্ত শান্তি ও প্রফুল্লতায় পূর্ণ ছিল; তাঁহার মুখ প্রভাতারুণের আলোকের ন্যায় স্নিগ্ধ হাস্যে উজ্জ্বল ছিল, গ্রামস্থ জনসাধারণের নিকট তাঁহার মান সম্ভ্রম অক্ষুন্ন ছিল, তাঁহার বংশগৌরব অম্লান ছিল; কিন্তু দেব বিভাবসু দিবাবসানে অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনে কি যুগান্তরব্যাপী পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হইল! দুরপনেয় কলঙ্কপশরা মস্তকে লইয়া, মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদে আততায়ীর হস্তে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া ঘৃণিত তস্করের বেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পবিত্র-হৃদয়া প্রাণাধিকা দুহিতা সুমতিকে রাজপথে বাহির হইতে হইল। [illegible]-দেবতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিধাতার কি বিচিত্র বিধান!

পথে জন মানবের সাক্ষাৎ নাই। কাজি সাহেব ন্যায়রত্নের গৃহে উপস্থিত

হইয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া প্রতিবেশিবর্গ সকলেই স্ব স্ব অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল; যাহাদের কৌতূহল অত্যন্ত অধিক, তাহারা কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া দূর হইতে সভয়ে পথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু নিকটে গিয়া ব্যাপার কি দেখিতে বা এই পৈশাচিক অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হয় নাই।

কোনও পল্লীতেই কাহারও সাড়া শব্দ নাই! চারি দিক গভীর নিশীথিনীর স্থায় নিস্তব্ধ, যেন সমগ্র পল্লী জনমানবশূন্ত, পরিত্যক্ত! দৈবাৎ কেহ কোনও অপরিহার্য্য কারণে পথে বাহির হইয়া থাকিলে দূর হইতে স্থায়রত্ন ও সুমতিকে দেখিয়া পাছে দৃষ্টি-বিনিময় হইলে তাঁহারা লজ্জা পান, এই ভয়ে দূরে প্রস্থান করিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জনকোলাহলমুখরিত গ্রামখানি যেন নিরানন্দময় বিজন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

স্থায়রত্ন এই ভাবে নিগৃহীত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে—সায়ংকালে তাঁহার দুই এক জন প্রতিবেশী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিল। ক্রমে অনেকে একত্র সম্মিলিত হইল; কিন্তু তাহাদের কাহারও মুখে কোনও কথা নাই; তাহাদের সকলেরই মাথার উপর দিয়া কি যেন একটা দারুণ বিপদের ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে, সকলেই মুহ্যমান, ক্ষোভে দুঃখে সকলেই যেন মৃতকল্প! তাহারা ম্লানমুখে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

অবশেষে এক জন প্রতিবেশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'কি সর্ব্বনাশই হ'য়ে গেল!'

দ্বিতীয় প্রতিবেশী গভীর বিষাদভরে বলিল. 'যা না হ'বার তাই হ'ল! কে ভেবেছিল যে, এমন ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষের অদৃষ্টে এমন সর্ব্বনাশ ঘটবে?'

তৃতীয় প্রতিবেশী বলিল, 'আজ তাঁর সর্ব্বনাশ হ'ল, কাল তোমার হবে, তার পর দিন আমার হবে; স্থায়রত্নেরই যখন এই অবস্থা, তখন তোমার আমার বা গ্রামের অন্য সকলের নিরাপদে থাকবার আশা কোথায়?'

চতুর্থ প্রতিবেশী বলিল, 'আর আশা! পৈতৃক ভিটে ছেড়ে না পালালে আর নিষ্কৃতি নেই। শেষে বুঝি সাত পুরুষের ভদ্রাসন ত্যাগ করতে হয়।'

প্রথম প্রতিবেশী বলিল, 'অকারণ ব্রাহ্মণের এই রকম অপমান ক'রে কি তালুকদারের মঙ্গল হবে? এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, দিনের পর রাত হচ্ছে।'

তৃতীয় প্রতিবেশী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা না হ'লে আর ঘোর কলি বলবে কেন? শাস্ত্রেই ত বলেছে—'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'—

এই কলিযুগে ভাল লোকের 'অপমান' হওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই রে বাবা! শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হবার যো আছে?'

দ্বিতীয় প্রতিবেশী বলিল, 'সব্‌সে চুপ্‌ ভাল। কাজ কি এ সকল কথায়? তালুকদারের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্চে। আবার কি একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেবে, মনের কথা মনেই থাক।'

এই যুক্তির সারবত্তা কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না, প্রতিবেশীরা স্ব স্ব চরকা তৈলাক্ত করিতে চলিয়া গেল।

ন্যায়রত্ন ও সুমতি দুঃখে কষ্টে লজ্জায় ও অপমানে মৃতপ্রায়। তাঁহাদের পায়ে বেড়ী থাকায় পথে চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। দুই পাঁচ পা চলিয়াই তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে বসিয়া পড়িতে হইল; সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের গর্জ্জন ও লাঠীর গুতা-বর্ষণ। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' পড়িতেই তাঁহাদিগকে উঠিয়া আবার চলিতে হইল। তালুকদারের কাছারী অধিক দূরে নহে; কিন্তু এই সামান্য পথও যেন আর ফুরায় না!—দুঃখের পথ এমনই দীর্ঘ।

কিছু দূর গিয়া সুমতি কাতরস্বরে বলিল, 'বাবা, আর ত চল্‌তে পারছি নে!'

অভাগিনী পথের ধূলার উপর শুইয়া পড়িল। ন্যায়রত্ন আর কি করিবেন? তিনি মাথায় হাত দিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়ের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিল, তিনি কেবল বলিলেন, 'হে ভগবান!'

সিপাহীরা ছিন্নমূলা লতিকার ন্যায় ধরালুণ্ঠিতা সুমতিকে উঠাইবার জন্য বিস্তর ঠেলাঠেলি করিল, কিন্তু ধরাশয্যা হইতে আর তাহাকে উঠাইতে পারিল না। সুমতির অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে, তাহার আর পদমাত্র চলিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু সেই ছাতুর দলের উদ্ভাবনী শক্তি তাহাদের পৈশাচিকতার অনুরূপ। তাহারা সুমতির হাতের হাতকড়িতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি ধরিয়া ইষ্টকবদ্ধ কঠিন পথের উপর দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল!

সহৃদয় পাঠক, কোমলহৃদয়া পাঠিকা, সুমতির সেই অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন কি? সুমতির অর্দ্ধাঙ্গ—তাহার কটিদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত মাটীতে ছেঁচ্‌ড়াইয়া যাইতেছে; ইষ্টকের সহিত ঘর্ষণে তাহার এই অর্দ্ধাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতেছে, তাহার পরিধেয় বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় তাহাকে টানিতে টানিতে মর্ম্মাহত জীবন্মৃত বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন সহ যখন তাহারা তালুকদারের কাছারীতে উপস্থিত হইল, তখন বসুন্ধরা এই লোমহর্ষণ

দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া লজ্জায় সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন।

রমণী সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল। পথে সে সুমতির দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের আনন্দে কোথায় পা ফেলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে মহামায়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং করতালি দিয়া স্খলিতস্বরে বলিল, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল!'

মহামায়া তাহার এই আকস্মিক আনন্দোচ্ছ্বাসের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে লো! তুই যে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়েছিস?'

রমণী হাত নাড়িয়া বলিল, 'আহ্লাদ হবে না? সেই বুড়ো বামুনটার আর তার নচ্ছার মেয়েটার হাতে পায়ে বেড়ি পড়েছে, মা! সিপুইরা সবাই মিলে ছুঁড়ীটাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসছে, তার গা কেটে দরদরিয়ে রক্ত পড়ছে। দেখ মা ছুঁড়ীটার কি জান শক্ত! এটু কাঁদছে না, ককাচ্চে না। আমরা হ'লে কালামুখ দেখাবার আগে গলায় দড়ি দিতাম।'

মহামায়া রমণীকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের বৈঠকখানার একটী পাশ-কুঠুরীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এই সংবাদ শুনিয়া সত্যবালাও তাঁহার পাশে উপস্থিত হইল। সুমতির দুর্দ্দশা দেখিয়া সত্যবালার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া প্রবলবেগে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার মাতার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, এবং অশ্রুধারায় তাঁহার চরণ সিক্ত করিয়া সুমতিকে মুক্তিদানের জন্য তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিল।

মহামায়া সরিয়া গিয়া স্বামীকে ডাকিলেন। কয়েক মিনিট তালুকদার-দম্পতির গোপনে কি পরামর্শ হইল। অবশেষে তালুকদার কাজি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিভৃতে তাঁহার সহিত কি যুক্তি-পরামর্শ করিলেন।

পরামর্শ শেষ হইলে তালুকদার ন্যায়রত্নের হস্ত পদ শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া পর দিন তাঁহাকে কাজি সাহেবের দরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দান করা হইল বটে, কিন্তু সিপাহীরা সুমতির বন্ধন মোচন করিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; দুই একটি নক্ষত্র ফুটিয়াছে। চন্দ্রালোকে ন্যায়রত্ন তাঁহার ঘরখানি যেন মনের দুঃখে অন্ধকারে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে! তাঁহার স্নেহের ধন, নয়নের পুত্তলি, মমতার সজীব প্রতিমা সুমতিকে যমদূতেরা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে; তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণ নিরানন্দময় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার শয্যা, উপাধান ছিন্ন ভিন্ন ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত; হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি তৈজসপত্র চূর্ণ, বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত; তাহাতে যে সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল, শৃগাল কুকুরের দল তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ঘোর কোলাহল করিতেছে। অতি বীভৎস দৃশ্য!

যে শান্তিসুখপূর্ণ পবিত্র গৃহে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শত মধুর স্মৃতিতে যে গৃহ সমলঙ্কৃত, সেই গৃহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া নিদারুণ শোকাবেগে ন্যায়রত্নের হৃদয় অভিভূত হইল; তাঁহার উভয় চক্ষু ফাটিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; সংসারে আসক্তিরহিত, নির্লিপ্ত, সংযত-চিত্ত ব্রাহ্মণ আর কোনও প্রকারে আত্ম-সংযম করিতে পারিলেন না, তিনি বিদীর্ণহৃদয়ে উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিলেন, 'সুমতি, মা, মাগো!'

তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক কণ্ঠধ্বনি, ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, গগন ভেদ করিয়া, চন্দ্রালোকিত আকাশের ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উত্থিত হইল, প্রতিধ্বনি যেন কাঁদিয়া বলিল,—

'নাই, সে নাই!'

ন্যায়রত্ন সে রাত্রি সেই শ্মশানভূমির এক প্রান্তে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

সুমতি চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্তা। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। সর্ব্বসন্তাপহারিণী মায়াবিনী নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহে সুমতি কারাকক্ষের কঠিন ভূমিশয্যায় নিদ্রিতা হইয়াছিল; রাত্রিশেষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্ব দিনের সমস্ত ঘটনা—তালুকদার-কন্যার ফিতা হারানো হইতে কাজি সাহেব কর্ত্তৃক তাহাদের গৃহ লুণ্ঠন পর্য্যন্ত সকলই মনে পড়িয়া গেল। প্রথমে তাহা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়াই তাহার ভ্রম হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তাহার হস্ত পদের লৌহ-

শৃঙ্খল, সর্ব্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা, তাহার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া কঠোর সত্যের মধ্যে তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। সুমতি চাহিয়া দেখিল, তাহার শয়নকক্ষ অন্ধকারপূর্ণ, ঊর্দ্ধে কয়েকটি গবাক্ষ, সেই গবাক্ষপথে ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে, তাহার দক্ষিণে বামে—মস্তকে ও পদতলে ঘরের দেওয়াল স্পর্শ হইতেছে; তাহার পৃষ্ঠদেশ কয়েকগুচ্ছ তৃণের উপর প্রসারিত রহিয়াছে!

নিদ্রাভঙ্গে সুমতি সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভব করিল। পূর্ব্ব দিনের সকল ঘটনা মনে পড়িতেই, পিতার কথা তাহার মনে হইল। নিষ্ঠুর কাজির আদেশে তাহার পাঠান কিঙ্করেরা তাঁহাকেও এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে, এবং অবশেষে তাঁহাকে তাহার মত করিয়াই হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া তাহার মন প্রাণ অত্যন্ত কাতর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, প্রাণের আবেগে তাহার তৃণশয্যায় উঠিয়া বসিল। সে নিজের দুঃখ যন্ত্রণা সমস্তই বিস্মৃত হইল; তাহার পিতার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া নিদারুণ হুতাশে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সুমতি চক্ষু মেলিয়া দেখিল, চারি দিক অন্ধকার। চক্ষু মুদিয়া দেখিল, তাহার হৃদয়মধ্যেও মেঘমণ্ডিত শ্রাবণ-অমানিশার গাঢ় অন্ধকার বিরাজিত! তখন সে উদ্বেলিতহৃদয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার বরাভয়প্রদ রাঙ্গা চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিল, "মা গো জগজ্জননী, না বুঝিয়া যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর, আমার বাবাকে রক্ষা কর, এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।"

সুমতির বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, সে যেন মা জগদম্বার অভয় চরণ দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে, তাহার চিত্ত সেই পাদপদ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তাহার সংজ্ঞা নাই, চেতনা বিলুপ্ত।

সহসা দ্বার-উদঘাটনের শব্দে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সুমতি চক্ষু মেলিয়া চাহিল, চাহিয়া যাহা দেখিল—সে ত মায়ের অভয় চরণ নয়, সে সভয়ে দেখিল, এক যমদূতাকৃতি ভীষণ-দর্শন পেয়াদা দ্বার খুলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; নিশা অবসান প্রায়, প্রভাতকল্পা শর্ব্বরীর অস্ফুট আলোকে সে সেই পেয়াদার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "পেয়াদা সাহেব, আমার বাবা কোথায়?"

পেয়াদা উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, 'তোর বাবা, সেই মড়ি-পোড়া বুড়ো বামুন? তার কথা শুনে আর তোর কাজ নেই।'

সুমতি কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া বলিল, 'কেন পেয়াদা সাহেব, তাঁর কথা শুনে আর কাজ নেই বল্‌ছ কেন? তাঁর কি কোনও অমঙ্গল হয়েছে?'

পিশাচের মত হাসিয়া পেয়াদা বলিল, 'হাঁ, তার আঠার আনা মঙ্গল। শুন্‌বি তবে? তোর যে দশা, তারও সেই দশা হয়েছে! এখন তোকে পুছ করতে চাই, চোরা মাল ফেরত দিবি কি না? যদি ফেরত দিস, তবেই ত তোদের বাঁচন, নৈলে তোর সামনে তোর বাপ সেই বুড়ো বামোনকে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দ্যাওয়া হবে—তার পর জল্লাদের হাতে তোর মাথা কাটা যাবে।'

পেয়াদার কথা শুনিয়া সুমতির মুখ শুকাইল, তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, 'কেন পেয়াদা সায়েব, যদি কোনও অপরাধ করে থাকি, আমি করেছি; আমার বাবার কি দোষ? তাঁকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন?'

পেয়াদা বলিল, 'তোর বাপের দোষ নেই? সেই বুড়ো বেটারই ত যত দোষ। সেই তোকে চুরী করতে শিখিয়েছে, চোরা মাল সে-ই ত ঘরে লুকিয়ে রেখেচে। এই যে গাঁয়ের বিলকুল রায়ৎ ক্ষেপে উঠেছে, সে-ও ত তারই নষ্টামীতে হয়েছে—এখন তুই বল্‌ছিস তোর বাবার দোষ কি?'

পেয়াদার কথাগুলি সুমতির কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ। তাহার পিতাকে কুকুরের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইবে—কুকুরে তাঁহাকে ভক্ষণ করিবে শুনিয়া সুমতি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল। সে হতাশভাবে একদৃষ্টে পেয়াদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার সেই নির্নিমেষ দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত, তাহার মন প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া কোন্ সুদূর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!

পেয়াদা সুমতিকে ধাক্কা দিয়া বলিল, 'তুই ভাবছিস কি?'

সুমতি নিদ্রোত্থিতার ন্যায় বলিল, 'অ্যাঁ, কি বল্‌ছ? আমার বাবা—'

পেয়াদা বলিল, 'চোরা মাল ফেরত দিবি কি না বল?'

সুমতি বলিল, 'চোরা মাল? কোথায় চোরা মাল? চোরা মালের কথা কিছু জানিনে, বল পেয়াদা সায়েব, বল আমার বাবা কোথায়?'

পেয়াদার ধৈর্য্যধারণ করা অতঃপর কঠিন হইল, সে তাহার হস্তস্থিত

তৈলপক্ক বাঁশের লাঠী দ্বারা সুমতির স্কন্ধে গুঁতা মারিয়া বলিল, 'আজ তোদের মামলা হবে, তার পর সাজা! দুটো মস্তো মস্তো ডালকুত্তোকে কাল থেকে খেতে দেওয়া হয় নি, তারা শুকিয়ে আছে; একাদশীতে তোরা উপোস পাড়িস্‌নে? সেই রকম তারা উপোস পেড়ে আছে; আজ তারা পেট ভ'রে তোর বাপের গোস্ত খাবে। মুর্গি জবাই করে ছেড়ে দিলে যেমন ধড়ফড় করে —তোর বাবা কুকুরের কামড়ে তেমনই ধড়ফড়িয়ে মরবে।—চুরী কবুল করলি নে, তোর বাবা চোরা মালও বের করে দিলে না, মজাটা টের পাবে এখন।'

পেয়াদা বক্তৃতা শেষ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার পশ্চাতে কারাদ্বার রুদ্ধ হইল।

সুমতি একাকিনী সেই ঘোর-অন্ধকার-পূর্ণ কারা-প্রকোষ্ঠে বসিয়া অবনত-মস্তকে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর সে স্থির করিল, তাহার প্রাণ যায় যাক্, যে উপায়েই হউক, পিতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। বিচারকালে যদি সে চুরী স্বীকার করে, যদি সে বলে,—চোর সে নিজে, তাহার পিতার কোনও অপরাধ নাই—তাহা হইলেও কি তাঁহার প্রাণরক্ষা হইবে না? কিন্তু কাজি সাহেব নিশ্চয়ই চোরা মাল বাহির করিয়া দিতে বলিবে, ফিতাটি ফেরত চাহিবে, তখন?—তখন সে কিরূপে ফিতা বাহির করিয়া দিবে?—সুমতি ভাবিল, তখন সে বলিবে, পথে আসিতে আসিতে ফিতাটি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—তাহা খুঁজিয়া পায় নাই।

এইরূপ মিথ্যার সাহায্যে সে তাহার পিতার জীবনরক্ষার সঙ্কল্প করিল। হায়, সংসারজ্ঞানহীনা সরলা বালিকা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার বহু যত্নের ও বহু পরিশ্রমের ফল শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে, ছিন্ন পত্রগুলি নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত! তাঁহার শোণিত তুল্য প্রিয়, পরম পবিত্র গ্রন্থখানির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি তাঁহার অঙ্গ হইতে নামাবলিখানি অপসারিত করিয়া তাহা মৃত্তিকায় প্রসারিত করিলেন এবং গ্রন্থের ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পত্রগুলি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত করিয়া নামাবলির উপর রাখিয়া পুঁটুলি বাঁধিলেন,

এবং তাহা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক মনে মনে বলিলেন, 'হে হরি, হে মধুসূদন, আমি অতি অধম, অকিঞ্চন ও জ্ঞানহীন মূঢ়; তোমার অনন্ত লীলা আমি কিরূপে বুঝিব? আমার কি সাধ্য যে, তোমার অনন্ত মহিমার আধার এই পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করি! হে দর্পহারী মধুসূদন, তুমি আমার পাণ্ডিত্যের দর্প চূর্ণ করিয়া আমার মস্তক মাটীর ধূলার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছ। ম্লেচ্ছের হস্তে আমার এই লাঞ্ছনা তোমারই প্রদত্ত দণ্ড, তোমার অপার করুণায় নির্ভর করিয়া এই কঠোর দণ্ড নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিবার শক্তি আমাকে দান কর হরি!'

ন্যায়রত্ন ছিন্ন পুঁথির পত্রগুলি মস্তকে ধারণ করিয়া মুদিতনেত্রে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কাজি সাহেবের পেয়াদা স্থূল বংশদণ্ড হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হুঙ্কার দিল, 'ঠাকুর!—ও ঠাকুর!'

ন্যায়রত্নের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। তিনি চক্ষু খুলিয়া তাঁহার সম্মুখস্থিত সেই দীর্ঘদেহ, মল্লবেশী, দণ্ডধারী মুসলমান পদাতিকের বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ন্যায়রত্নকে নীরব দেখিয়া পেয়াদা তাহার হস্তস্থিত সুলোহিত বংশদণ্ড দ্বারা মৃত্তিকায় আঘাত করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, 'বলি, পুঁটুলী মাথায় নিয়ে চোক্ বুজে ভাবচিস্ কি? যমের বাড়ী থেকে তলপ হয়েচে, যাবি নে?'

ন্যায়রত্ন বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অবিচলিতস্বরে বলিলেন, 'হাঁ বাবা, আমি যমের বাড়ী যাবার জন্য সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছি, এখন তিনি ডাক্‌লেই বাঁচি।'

পেয়াদা তাম্বূলরাগরঞ্জিত দন্তপংক্তি উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলিল, 'ডাক্‌তেই তো এসেছি, জোর তলপ, জল্‌দী চল্।'

ন্যায়রত্ন নিঃশব্দে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কাগজের পুঁটুলিটি যথাস্থানে রাখিয়া একখানি মলিন উত্তরীয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহকোণ হইতে একখানি বাঁশের লাঠী সংগ্রহপূর্ব্বক পেয়াদার অনুসরণ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে পেয়াদা বলিল, 'কাল যা হবার, তা তো হয়েই গিয়েছে, আজ কি হবে, তার কিছু খবর পেয়েছ ঠাকুর?'

ন্যায়রত্ন ঔদাসীন্যভরে বলিলেন, 'যা হবার, তা ত চরমই হয়ে গিয়েছে বাপু! হবার আর বাকি আছে কি!'

পেয়াদা সোৎসাহে বলিল, 'বাকি এখনও ঢের! আজ তোমার বিচার হবে, যে কাজ করেছ, তার জন্যে সাজা নিতে হবে না ঠাউরেছ না কি?'

ন্যায়রত্ন আর কোনও কথা বলিলেন না, নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। সমুদ্রে যাহার শয্যা, শিশিরপাতে তাহার ভয় কি? তিনি অবিচলিতচিত্তে কাজি সাহেবের হুজুরে হাজির হইলেন। কাজি তাঁহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই, এই ভাবে কয়েক মিনিট মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ন্যায়রত্নকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বুড়ো হ'লে মানুষের বুদ্ধি লোপ হয়, নইলে এই শেষ বয়সে তোমার এ রকম মতিচ্ছন্ন হবে কেন?'

ন্যায়রত্ন সংযতস্বরে বলিলেন, 'আমার মতিচ্ছন্ন হওয়ার কি পরিচয় পেয়েছেন?'

কাজি উদ্ধতভাবে বলিলেন, 'তুমি লাখরাজে বাস কর। তোমাকে খাজনা দিতে হয় না, তুমি বামুন মানুষ, হেঁদুদের মোল্লা, তোমাকে কখনও নজর-সেলামীও দিতে হয় নি; তবে তুমি প্রজাদের বদ্‌ পরামর্শ দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে কেন? তাদের খাজনা দিতে বারণ করে' মহালকে মহাল বিদ্রোহী করলে কেন?'

ন্যায়রত্ন দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, 'কোনও প্রজাকেই আমি খাজনা দিতে নিষেধ করি নি। পিতৃপিতামহের আমল থেকে যার যে খাজনা ধার্য্য আছে, সেই গুজস্তা সুরত নিলে খাজনাও অদায় হ'তো, প্রজারা অবস্থানুযায়ী দশ টাকা নজর-সেলামীও দিত; কিন্তু তালুকদার চান্‌ টাকায় টাকা নজর, টাকায় আট আনা নিরিখ বৃদ্ধি, এ সকল প্রজারা কোথা থেকে দেয়?'

কাজি সাহেব ন্যায়রত্নের ন্যায়সঙ্গত কথা শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, 'কি যে কও ঠাকুর, তার যদি মাথা মুণ্ডু কিছু থাকে! তালুকদারের সঙ্গে যে খাজানায় মহাল বন্দোবস্ত হয়েছে, নিরিখ বৃদ্ধি ভিন্ন তার যে স্থিত দাঁড়ায় না। তালুকদার কি ঘর থেকে মালগুজারি সরবরা করবে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব প্রজারা কি ক'রে দেবে? 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!'—মহালের অবস্থা না বুঝে, প্রজার অবস্থা না জেনে, তালুকদার জিদের বশে অন্যায় অতিরিক্ত কর ধার্য্যে মহাল নিলেন কেন? এ জন্যে যদি তাঁকে ঘর থেকে মালগুজারি সরবরাহ কর্‌তে হয়, তবে সে দায়িত্বভার তাঁকেই বহন কর্‌তে হবে; প্রজার ঘাড় ভেঙ্গে সে টাকা আদায় করা কি তাঁর উচিত? তিনি এই অতিরিক্ত রাজকর ঘর থেকে দিয়ে মহাল রক্ষা করুন।'

কাজি সাহেব মুখের মত জবাব পাইয়া ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত হইলেন, বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'তা তিনি করবেন না, করতে পারবেনও না। প্রজারা খাজানা না দিলে নবাব সরকারের মালগুজারির টাকা আদায় হবে না; আমি নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত থাকতে কখনই সরকারের লোকসান হ'তে দেব না; প্রজারা ঘাড় হেঁট করে এই 'বৃদ্ধি-নিরিখে' খাজানা দেবে; তোমার মত হাজার লোক তাতে বাধা দিয়েও কিছু করতে পারবে না।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রজারা অসহায়, দুর্ব্বল, এই ভরসাতেই আপনি এ কথা বল্‌ছেন, কিন্তু অসহায়ের সহায়—দুর্ব্বলের বল, ভগবান আছেন!'

কাজি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'যাদের কোনও মুরদ নেই, তারাই কথায় কথায় ভগবানকে দেখায়! তা বেশ, তোদের বাবা সেই ভগবান বেটাকেই ডেকে আনিস্, হিঁদুর ভগবান যেন মাথায় ফ্যাটা বেঁধে লাঠী ঘাড়ে নিয়ে প্রজাদের রক্ষা করতে আসে।—এখন যে জন্যে তোকে এখানে আনা হয়েছে—সে কথা শোন্। চুরী করলে কি চোরামাল দখলে রাখ্‌লে জবর রকম সাজা পেতে হয়—তা জানিস্ ত? তবে যদি চোরামাল ফিরিয়ে দিস্—তা হ'লে আমি মেহেরবাণি ক'রে কিছু কম সাজা দিয়েও তোদের ছেড়ে দিতে পারি। আমার দয়ার শরীর, তা ছাড়া মাছি মেরে হাত কালো করবার আমার ইচ্ছে নেই। আজই তোদের অপরাধের বিচার হবে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'বেশ কথা, বিচার হোক, বিচারে যদি আমাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, বিচারপতি যে শাস্তি দেবেন—তাই গ্রহণ করবো, তবে ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌তে পারি, আমার কাছে কোন চোরা মাল নাই।'

কাজি বলিলেন, 'তোমার কাছে না থাকে, তোমার সেই হারামজাদী মেয়েটার কাছে আছে। অমন মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি? সে বুড়ো বয়সে তোমার মুখে চুণ কালি দিলে, তার জন্যে তোমাকে বদনামের ভাগী হতে হ'লো; তোমার মেয়েই যে চুরী করেছে, তার প্রমাণের ত কোনও কসুর হয় নি।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমি যদি তার জন্মদান করে থাকি, আর এতকাল ধরে' আমি তাকে যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছি, তা যদি মিথ্যা না হয়, তা হ'লে আমি বুকে হাত দিয়ে অহঙ্কার করে বল্‌তে পারি—কখনই সে চুরী করে নি। আমার মেয়ে-চোর, এমন মিথ্যা অপবাদ যে দিতে পারে, নরকেও

তার স্থান হবে না। আমার কন্যা চোর, এ কথা যে দিন সত্য হবে, সে দিন পতিব্রতা সতী কুলত্যাগিনী হবে, ধর্ম্ম সে দিন পৃথিবী থেকে অন্তর্ধান করবেন।'

কাজি বলিলেন, 'থামো ঠাকুর, আর অত বাহাদুরী করতে হবে না; যদি ভাল চাও ত তোমার মেয়েকে বুঝিয়ে বল, চুরী করা কিতেটি সে ফিরিয়ে দিক্।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমি কোথায় আমার মেয়ের দেখা পাব?'

কাজি বলিলেন, 'আমি তার উপায় করছি।'

অতঃপর কাজি সাহেব ন্যায়রত্নকে সুমতির নিকট লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া স্থানান্তরে চলিলেন।

* * * *

সুমতি হাজত-ঘরে বসিয়া তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল; সহসা দ্বারোদ্‌ঘাটন-শব্দে সে চমকিত হইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, তাহার পিতৃদেব দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান।

সুমতি 'বাবা!', 'বাবা!' বলিয়া ব্যগ্রভাবে উঠিতে গেল; তাহার পদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, ইহা তাহার স্মরণ ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

ন্যায়রত্ন দুঃখিনী কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি বিদীর্ণহৃদয়ে ধরালুণ্ঠিতা কন্যার শিয়রপ্রান্তে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং সুমতির মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

সুমতি উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগ সংযত করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, 'বাবা, আজ না কি আমাদের বিচার হবে?'

ন্যায়রত্ন সংক্ষেপে বলিলেন, 'সেই রকমই শুন্‌ছিলাম।'

সুমতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, 'বাবা, আমি চুরী করেছি কবুল করব।'

ন্যায়রত্ন কন্যার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, সুমতির মস্তক ক্রোড় হইতে নামাইয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবেগকম্পিতস্বরে বলিলেন, 'সুমতি! তোমার মুখে এ কথা শুন্‌তে হবে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। তবে কি সত্যই তুমি—'

ন্যায়রত্ন কথাটি শেষ করিতে পারিলেন না, ক্ষোভে নিদারুণ অন্তর্বেদনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল; অসহ্য মনস্তাপে তাঁহার অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত শুষ্ক হইল! এবং মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত ছিল, তাহা যেন জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। তিনি শূন্যদৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুমতি তাহার পিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কাতরস্বরে বলিল, 'বাবা, তুমি তোমার অভাগিনী মেয়ের উপর রাগ করো' না। স্থির হ'য়ে একটু বসো বাবা। আমি চোর নহি, এমন দুষ্কর্ম্ম আমি ক'রতে পারি যে, চুরী করা দূরের কথা, এমন কু-প্রবৃত্তি আমার মনেও স্থান পায় না, এ কথা কি তুমি জান না বাবা? আমার মনের কোন্ কথা, কোন্ চিন্তা তোমার অজ্ঞাত?—আমি চোর, এ ধারণা তোমার মনেও স্থান পাবে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'তবে তুমি চুরী কবুল করতে চাও কেন? কোন্ লোভে তুমি এই মিথ্যা কলঙ্কের পশরা মাথায় তু'লে নিতে চাচ্ছ?'

সুমতি বলিল, 'চুরী কবুল করলে যে শাস্তি হবে, সে শাস্তি আমি একাই ভোগ করবো। আমার অপরাধে তোমাকে ত দণ্ড ভোগ করতে হবে না; তোমার ত প্রাণরক্ষা হবে। আমার সঙ্গে ওরা যে তোমাকেও দোষী করছে, তোমার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রে ওরা যে মিথ্যা কলঙ্কের কালী ঢেলে দিচ্ছে! আমি চুরী কবুল করলে তোমার সে কলঙ্ক ত দূর হবে; তুমি ত মিথ্যা অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। সেটাই কি আমার পক্ষে কম লাভ, বাবা? এ লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বাবা, তোমার মুখেই শুনেছি, দেবতাদের মঙ্গলের জন্য দধীচি মুনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; আর আমার স্বর্গ, আমার ধর্ম্ম, জপ, তপ, পিতৃদেব তুমি, তোমার মিথ্যা কলঙ্ক দূর করবার জন্যে, তোমার দুর্গতি নিবারণ করবার জন্যে, সেই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি মাথায় তু'লে নিতে আমি ভয় পাব বাবা?'

ন্যায়রত্ন বুঝিলেন, তাঁহারই জন্য সুমতি আত্মবিসর্জ্জনে, আত্মবলিদানে উদ্যত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে তাহার নিকট উপবেশন করিলেন, স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন, 'মা, আমার কলঙ্কমোচনের জন্য তুমি মিথ্যা কলঙ্কের ভার মাথায় নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করবে সঙ্কল্প করেছ; কিন্তু মিথ্যা কলঙ্কে আমার কি ক্ষতি হবে? মিথ্যা কলঙ্কে কত মহাপুরুষকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে; কত ধিক্কার, কত অভিশাপ তাঁরা নীরবে বহন

করেছেন; তাঁহাদের তুলনায় আমি কীটেরও অধম। সর্ব্বান্তর্যামীর ত কিছুই অগোচর নয় মা! আর যদি শারীরিক যন্ত্রণার কথাই বল, তা হ'লেও তাতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই; তুমি ত জান মা, ইহকালই আমাদের সর্ব্বস্ব নয়; জলের বুদ্বুদ ত জলেই মিশ্‌বে, মুহূর্ত্তকাল অগ্র-পশ্চাতে কি আসে যায়? যদি ওরা আমাকে ফাটকেই আবদ্ধ করে, তাতেই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কি? যে দিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিনই ত ফাটকে আটক হয়েছি; এত দিন এই সংসার-কারাগারের এক কক্ষে ছিলাম, এখন না হয় আর একটা কক্ষে পুরে রাখবে।'

সুমতি বলিল, 'না বাবা, তোমাকে ফাটক দেবে না, তোমাকে নাকি কুকুর দিয়ে খাওয়াবে; কি ভয়ানক কথা!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'সামান্য একটা ফিতের জন্যে আমার প্রাণদণ্ড হবে, তা-ও আবার এ রকম নিষ্ঠুর ভাবে? তা হ'তেও পারে; এ রাজ্যে, বিশেষতঃ এ রকম মহাপিশাচ কাজির আমোলে। যদি তা-ই হয়, আমাকে যদি কুকুর দিয়েই খাওয়ায়, তাতেই বা কি? তুমি মনে করছ, আমার বড় যাতনা হবে, আমি কত কষ্ট পাব; কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? আমি কতকাল থেকে দারুণ শূলরোগে কষ্ট পাচ্ছি, এই বৃদ্ধ বয়সে সে যন্ত্রণা অসহ্য মনে হয়; সে যন্ত্রণার তুলনায়, কাজি সাহেব আমাকে যে মৃত্যু-যন্ত্রণা দেবেন, তা তেমন গুরুতর নয়। আমাকে যদি কুকুর দিয়েই খাওয়ান হয়, সামান্য কিছুক্ষণ সে যন্ত্রণা ভোগ করে' আমি এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবো।'

সুমতি বলিল, 'না বাবা, ও কথা বলো না; তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, আমার প্রাণে তা কখনও সহ্য হবে না. আমি তা চোখে দেখ্‌তে পারব না; এ চিন্তাও যে অসহ্য বাবা!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এ সকলই ভগবানের খেলা, তিনি কত রকমে আমাদের পরীক্ষা করেন, তা আমাদের ধারণার অতীত। আমরা পৃথিবীতে সহ্য করতেই এসেছি, সহ্য করা ভিন্ন আর উপায় কি মা? তাই বলে' কি আমার এই ছার জীবনরক্ষার জন্য তুমি চুরী কবুল করবে? মিথ্যা অপবাদ সত্য অপরাধ ব'লে স্বীকার করবে? আমার অনিত্য দেহের জন্য তোমার পুণ্য-শ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণের সুনাম কলঙ্কিত করবে? তুমি চুরী কবুল করলেই তোমাকে চোরের প্রাপ্য দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। সে দণ্ড লঘু হবে, এমন প্রত্যাশা করো না মা!'

সুমতি বলিল, 'শুনেছি, জল্লাদের হাতে আমার মাথা কাটা যাবে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'অসম্ভব কি? তুমি একটা তুরপনেয় কলঙ্ক নিয়ে সংসার থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে। লোকে চিরকাল তোমাকে চোর বলে' ঘৃণা করবে—আর আমাকে বেঁচে থেকে লোকের সেই ঘৃণা, টিট্‌কারী, অবজ্ঞা সহ্য করতে হবে; তার চেয়ে মৃত্যুই কি আমার শত গুণ অধিক বাঞ্ছনীয় নয়? জীবনে আমার আর সুখ শান্তি নেই মা!'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার নয়ন হইতে অশ্রুর স্রোত বহিল; সে কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা, আমারই জন্য আর বেঁচে থেকেও তোমার সুখ নেই। আমি নিরপরাধ, কিন্তু বিনা অপরাধে, চুরী না করে'ও আমি চোর বলে ধরা পড়েছি, আমার হাতে পায়ে বেড়ি পড়েছে, আমাকে হাজতে পুরেছে, দেশ জুড়ে আমার কলঙ্ক রটেছে; আমার এ কলঙ্ক কখনও দূর হবে না, লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না, বেঁচে থাক্‌তে আমার আর একটুও ইচ্ছে নেই বাবা!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হও মা, আমাদের মত লোকের পক্ষে মৃত্যুই মঙ্গল। লোকে মৃত্যুর নামে ভয় পায়, কিন্তু আমরা কেহই এ পৃথিবীতে অমর হয়ে আসি নি। রোগে হোক, আর জল্লাদের হাতেই হোক, সকলকেই এক দিন মরতে হবে। কোনও উপলক্ষে এ সংসার থেকে বিদায় নিতে পারলে আমরা যেথানে যাব, সেথানে রোগ, শোক, পাপ তাপ বন্ধন, জ্বালা যন্ত্রণা, কিছুই নেই; সেথানে কলঙ্ক নেই, অপবাদ নেই। সেই পবিত্র লোকে তোমার মা আছেন, কত কাল তাঁকে দেখনি, তাঁকে সেথানে দেখ্‌তে পাবে, তোমার ভগিনীরা এসে তোমাকে ঘিরে দাঁড়াবে; জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি, তোমাকে পেয়ে তাদের কত আনন্দ হবে!'

সুমতি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে পিতার কথা শুনিতেছিল; মা ও ভাই ভগিনীদের সহিত মিলনের আশায় তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল, চক্ষুতে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল; বর্ষার সজল জলদরাশি অন্তর্হিত হইলে উজ্জ্বল সূর্য্যা-লোকে যেমন জলসিক্ত শ্যামল প্রকৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সুমতির মুখমণ্ডল সেইরূপ ভাব ধারণ করিল।

ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার বলিলেন, 'কাজি সাহেবের বিচারে আমরা যদি আজ অপরাধী প্রতিপন্ন হই, সে জন্য দুঃখ নাই; কিন্তু মা জগদম্বার নিকট যেন অপরাধী না হই।'

সুমতি বলিল, 'আমি বুঝতে না পেরে মনে করেছিলাম, তোমার জীবন-রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বল্‌তে হয় বল্‌ব, চুরী কবুল করতে হয় করবো, কিন্তু আর না, এ তুচ্ছ জীবন কাজি সাহেব যে ভাবে নষ্ট করতে চান্‌, করুন; তাতে আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। আমি মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে ধর্ম্ম ও দেবতা সাক্ষী করে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ব—"আমি চোর নই।"

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাচীন ভারতের নাগরিক আদর্শ।

Local Self Government Gazette এ K. S. Ramswami Sastri প্রাচীন ভারতের নাগরিক আদর্শ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—'পৌরজনবর্গের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টিত থাকিতেন। প্রত্যেক বাড়ী হইতে যাহাতে জলনিকাশ হয়, সেই জন্য রীতিমত চালু পয়ঃপ্রণালী রাখিতে হইত। এই সকল পয়ঃপ্রণালীর প্রস্থ তিন পদ হইত। বাড়ী হইতে জল বাহির হইয়া বৃহত্তর সরকারী পয়ঃপ্রণালীতে পড়িত। এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যদি কেহ বাড়ীতে এরূপ পয়ঃপ্রণালী না রাখিত, তবে তাহাকে ২৪ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। আমাদের কলিকাতার যেমন এক বাড়ীর গায়ে আর এক বাড়ী, দুই বাড়ীর মাঝখানে কোনও ফাঁক নাই, তখন সেরূপ হইবার উপায় ছিল না। দুই বাড়ীর ভিতর তিন চারি পদ ভূমি খালি রাখিতে হইত। বাড়ীর মালিকরা পরামর্শ করিয়া এমন ভাবে গৃহনির্ম্মাণ করিতেন, যাহাতে অপরের কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা না হয়, বা না হইবার সম্ভাবনা থাকে। বৃষ্টি পড়িয়া বাড়ীর ছাদ যাহাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য মাদুর দিয়া ছাদ ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল। মাদুর ছাদের উপর দৃঢ়-সংবদ্ধ থাকিত, যাহাতে বাতাসে, বা ঝড়ে না উড়িয়া যায়।

যদি কাহারও বাড়ীর কোনও গর্ত্ত, সিঁড়ি, মই, গোবর জমান, বা এইরূপ কোনও কিছু রাস্তার লোকের বা পাশের বাড়ীর লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে, কিংবা জল জমিয়া কাহারও দেওয়ালের ক্ষতি করে, তবে যাহার বাড়ীর জন্য বিরক্তি বা ক্ষতি হইত, তাহাকে ১২ পণ জরিমানা দিতে হইত। পয়ঃপ্রণালী দিয়া রীতিমত জল নিকাশিত না হইলেও ১২ পণ জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। বিষ্ঠা বা মূত্রের জন্য দুর্গন্ধ উত্থিত হইলে জরিমানার পরিমাণ ছিল ২৪ পণ। যাহাতে কাহারও কোনও রূপে স্বাস্থ্যহানি না হয়, সে বিষয়ে যে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইত, উপরি-উক্ত নিয়ম সকল হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

হাঁসপাতালেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক হাঁসপাতালের 'ভৈষজ্যাগারে' প্রচুর ঔষধ মজুত থাকিত। এত ঔষধ থাকিত যে, এক আধ বৎসরের ব্যবহারে তাহা নিঃশেষিত হইত না। তারে

ভারে ঔষধ ভৈষজ্যাগারে জমা হইত। শুধু জমাই হইত না, প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়ও হইত। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে তখন চারি প্রকার চিকিৎসক ছিল। প্রথমতঃ, 'ভিষজঃ' বা 'চিকিৎসকাঃ'; অর্থাৎ,সাধারণ বৈদ্য। দ্বিতীয়তঃ, জাঙ্গলিবিদঃ; অর্থাৎ, ইহারা বিষ-বৈদ্য। তৃতীয়তঃ, 'গর্ভব্যাধিসংজ্ঞাঃ' বা 'সূতিকা-চিকিৎসকাঃ'। চতুর্থ, পল্টনের অস্ত্রচিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীগণ। পল্টনের অস্ত্রচিকিৎসগণের সঙ্গে 'শস্ত্র, যন্ত্র, বস্ত্র' প্রভৃতি ও শুশ্রূষা-কারিণীদের নিকট পথ্য, খাবার, পানীয় প্রভৃতি থাকিত। প্রত্যেক সংঘবদ্ধ পল্টনের সঙ্গেই চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী থাকিত। পশুচিকিৎসার জন্য পশুচিকিৎসক ছিল। ঔষধ তৈয়ারীর জন্য নানাপ্রকার গাছগাছড়ার আবাদ হইত। রাজসরকার হইতেও ঔষধার্থ ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের গাছগাছড়ার চাষ হইত। রাজসরকার হইতে চিকিৎসকদের ও চিকিৎসালয় প্রভৃতির তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা হইত।

যাহাতে খাদ্যাদির জন্য দেশে কোনও রূপ পীড়া না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। কেহ কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইলে সাজা পাইত। বিস্তীর্ণ সহরে বা পল্লীতেও যাহাতে রোগবিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে, বা সংক্রামক হইয়া না দাঁড়ায়, সে জন্য রাস্তা ঘাট পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা হইত। কোথায়ও জল বাধিয়া কাদা হইয়া পচিয়া না উঠে, আবর্জ্জনা জমিয়া অপ্রীতিকর দুর্গন্ধ বাহির না হয়, সে দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইত। যে এই সকল দোষে দোষী হইত, তাহাকে শাস্তি পাইতে হইত। রাজপ্রাসাদের, মন্দিরের, কোনও তীর্থস্থানের, অথবা জলাশয়ের নিকট মল-মূত্র-ত্যাগও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। তবে কেহ অসুস্থতানিবন্ধন বা ঔষধ-ভক্ষণের ফলে ঐরূপ কুকার্য্য করিলে তাহাকে মাপ করিবার ব্যবস্থা ছিল। সহরের বা গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে মৃত জানোয়ার বা মনুষ্যদেহ নিক্ষেপ বা সমাধি বা সৎকার করা স্বাস্থ্যনীতির বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। মৃত-সৎকারের ও গোর দিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। কতকগুলি পথ ব্যতীত অন্য পথ দিয়া মৃত বহন করিয়া লইয়া যাইবার কাহারও অধিকার ছিল না।

তখন শবব্যবচ্ছেদেরও ব্যবস্থা ছিল। যাহাতে শব পচিয়া না যায়, তজ্জন্য শবে এক প্রকার তৈল মাখান হইত। যাহাদের বিষ, উদ্বন্ধন, শ্বাসরোধ, জলেডোবা প্রভৃতি কারণে আকস্মিক অপমৃত্যু হইত, তৎক্ষণাৎ তাহাদের শব ব্যবচ্ছেদের জন্য ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইত। উপস্থিত চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতেন, কি কারণে লোকটীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কি করিয়া মৃত্যুর কারণ নির্ণীত হইত, সেই সব লক্ষণ-পরিচয় অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকের কোনরূপ সন্দেহ হইলে আদালতে রীতিমত সাক্ষী-সাবুদ লইয়া বিচার করিয়া নির্ণীত হইত, কি কারণে লোকটীর মৃত্যু ঘটিল।

নাগরিকগণের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কার্য্যের বিশদ বর্ণনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। যদি কোনও গৃহস্থের নিকট পাঁচ প্রকার জলপাত্র [কুম্ভ, দ্রোণ (কাঠনির্ম্মিত জলপাত্র) প্রভৃতি] মই, কুড়াল, ধুমাতাড়ান কুলা, অলস্ত দরজা জানালা টানিয়া নামাইবার জন্য আঁকশী, সাঁড়াশী (খড় ছড়ানর জন্য,) চামড়ার একটী ব্যাগ না থাকিত, তাহাকে ¼ পণ জরিমানা দিতে হইত। লৌহকর্ম্মকারদিগকে নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে থাকিতে হইত। প্রত্যেক গৃহস্থকে ডাকিলে

অতীতে যাহাতে সদাসর্ব্বদা পাওয়া যায়, তাহার নিয়ম ছিল। বড় বড় পথের ধারে ধারে, সব চৌমাথায়, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সহস্র সহস্র কলসী জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইত, যাহাতে আগুন লাগিলে অতি সহজে জল পাওয়া যায়। যদি কোনও গৃহস্থ কোথাও যে কোনও দ্রব্যে আগুন লাগিলে আগুন নিবাইতে সাহায্য না করিত, তবে তাহাকে ১২ পণ রাজদণ্ড দিতে হইত। কিন্তু ভাড়াটিয়াদিগকে কোনরূপ দণ্ড দিতে হইত না।

প্রাচীন ভারতের নাগরিকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে সব রাজকর্ত্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বর্ত্তমানের তুলনায় তাহা নিকৃষ্ট কি উৎকৃষ্ট, তাহার উত্তর সহজেই অনুমেয়।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

ফরাসী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি।

নভেম্বর ১৯১৭ ও তাহার পরবর্ত্তী সময়।—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। রুসিয়ার আকস্মিক পতনের খবর পাওয়া গেল;—সেই সঙ্গে যুদ্ধও শেষ হইত, এবং জয়যুক্ত জার্ম্মণীর দৃপ্তহাস্যে ধরিত্রী লজ্জায় অবনত হইতেন; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও উন্নত আমেরিকানদের তদুপযোগী বিচিত্র কর্ম্মপটুতা সে যাত্রা আমাদিগকে রক্ষা করে। রুসিয়া ইউরোপের প্রাচ্যভূমি। বৎসর আরম্ভ হইতে না হইতে সেখানে নানা রকমের গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। রুসিয়ার প্রথম প্রজাতন্ত্রে প্রত্যেক ফরাসীর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখা যায়; তাহার কারণও সুস্পষ্ট। রুসিয়ায় যে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে বেশীর ভাগ কার্য্যনিপুণ প্রজাতান্ত্রিকদল; কিছু কিছু Idealist ও Maximalist যে না ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। কার্ণেস্কী এই বিরাট সাম্রাজ্যের অর্থবল ও ক্ষাত্রশক্তি একত্র করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে রুসিয়া 'আস্তেন্ত' সঙ্ঘের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে— শত্রুপক্ষ পার্থিব absolutism ও capitalismএর নেতা, সকলের কাছে এই কথাই উচ্চকণ্ঠে বলা হইত। রিগা উপকূলের বড় বড় যুদ্ধ ফলপ্রদ হয়। কার্ণেস্কী শুধু সৈন্যনিবাসে বীর যোদ্ধাদের উৎসাহ দেন নাই—রণাঙ্গনে অগ্রণী হইয়া বন্দুক-হস্তে স্বয়ং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার উদার দৃঢ় চরিত্র দেখিয়া ও অমোঘ বীরবাণী শুনিয়া সমগ্র রুসিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্রের গোলযোগ ও কর্ণিলফ্-সংক্রান্ত নানা বার্ত্তা সীমান্তরালে আসিল। সন্দিগ্ধচিত্ত অনেকে এই অনিশ্চিত গোলযোগের যবনিকার অন্তরালে দুর্ঘটনার নানা বিভীষিকা দেখিলেন।

আধুনিক ইউরোপ যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল। নায়াগ্রা প্রপাতের মত ঘটনার অজস্রধারা সমগ্র রুসিয়া প্লাবিত করিয়া তুলিল। ঠিক এই সময়ে ক্ষিপ্র রণনীতিক চাতুর্য্যবলে রুসে লেনিন্ ও ট্রট্সকি, এই যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়; সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ়-জ্ঞানতত্ত্ব (Mysticism) ও চরমাদর্শবাদের (Idealism) তরঙ্গ ওতপ্রোতভাবে সারা দেশ তোলপাড় করিয়া তুলে। Brest-Litovaskএর সন্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদীরা দলে দলে দেশে ফিরিতে থাকে; সীমান্তরালে যে সব যোদ্ধার দেখা পায়, তাহাদের নিকট আপনাদিগের দুঃখকাহিনী বিবৃত করে; এবং বলে, যে সব জর্ম্মণ, ইতালিয়ান, অষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি রুসে বাস করিয়া দেশীয় লোক হইয়া যায়, তাহারা যুদ্ধে খুব লড়িয়াছে। এরূপ বলিবার অবশ্য তাহাদের যথেষ্ট কারণ ছিল। রণযাত্রা স্থগিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ১,৫০০,০০০ সৈন্য সমেত ১৫০ জার্ম্মণ ও অষ্ট্রিয়ান ডিভিসণকে প্রত্যুদগমন করিয়া আনিবার আয়োজন হইল। রণক্ষেত্রে বিচিত্র ঘটনায় বিচিত্র সংঘটনের অভিনয় হইল। স্বপ্নেও যাহার কোনও অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, আকাশের কোন অন্ধকার হইতে তাহা বর্ষার কাল মেঘের মত উদিত ও ঘনীভূত হইল। ইহাই অঘটন; মনে হয়, ইহারও যেন একটা অজ্ঞাত ধারা আছে। দক্ষ কর্ম্মীরা (Expert) ভবিষ্য দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এবার ইংরাজ, ফরাসী ও ইতালিয়ন সমর-সীমানায় যুদ্ধের বেগ বাড়িবে; কাজেই যেখানে যেখানে বিপদের ভয় আছে, সেই সেই স্থানে সৈন্যসংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। ইতিহাসের এ সব অপূর্ব্ব ঘটনা একটীর পর একটী অভিনীত হইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ব্বিকল্পমনে তাহাই স্মরণ করিলাম।

গত কয়েক মাসের ভীষণ শ্রমে আমরা রুগ্ন হইয়া পড়ি। ক্রমে সুস্থ হইতে থাকি। ঠিক সেই সময় খবর পাওয়া গেল, "তোমাদের রেজিমেণ্টের ছুটী।"—কত দিনের প্রত্যাশিত কত মধুর এই সংবাদ! যেন ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়া গেল। রাত নাই, দিন নাই, 'ছুটী' এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি কানে কানে শব্দিত হইতেছে—কণ্ঠে যে গান উঠিত, তাহার ছত্রে ছত্রে লেখা 'ছুটী'—'ছুটী'—স্বপ্ন দেখিলাম। কনককিরণে দীপ্ত সমুদ্রকূলে কি হাসি ফুটিতেছে—নীলাভ জলধির উপকূলে সে কি ললিত নীলিমার দ্যুতি!—কি ঝক্ ঝক্ জলিতেছে হেমময় বালুকারাজি,—দূরে দূরে আকাশে সিন্ধুশীকরবিনিন্দিত শুভ্র মেঘচ্ছটার সে কি বিনোদ নৃত্য!—কত উজ্জ্বল, কত স্নিগ্ধ, কত সুন্দর!

রজনী শেষ হয় হয়—সুখ-উষার অনিন্দ্য রূপটী সবে ফুটিয়া উঠিতেছে; ছোট খাট রকমের স্থানীয় গোটা কয়েক যুদ্ধ হইয়াছে—বন্দুক-হাতে আমি প্রহরী নিযুক্ত। তখন বেলা ১০ টা। এক জন 'টেলিফোনিষ্ট' আমার সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল! একটু উদার হইয়া ফরাসী ভাষায় তাহাকে 'প্রিয়-তম' বলিয়া সম্ভাষণ করিলাম। প্রাতঃপ্রণামটী (Bonjour monsieur) জানাইলাম, আর বলিলাম, আরও একটু দ্রুত যাও। তখনই সে মুখ ফিরাইয়া একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিল, 'এই যে তুমি এখানে—তোমাকেই খুঁজি-তেছি।' দম দেওয়া কলের গানের মত তড়্‌বড়্‌ করিয়া এক দমে গোটা কয়েক কথা বলিয়া ফেলিল,—'একটা খবর আছে, আমার খাটুনির দাম ১ লিটার ভাল মদ; তা কিন্তু জেনো—অবশ্য দামটা দিতে তুমি কখনও ভুল্‌বে না;—কাল সকাল ছ'টায় তোমার ছুটী, অর্থাৎ দেশে ফির্‌তে পার্‌বে। ভোর চারিটা নাগাত উঠো—এই নাও, কোন্ পথ ধরে যেতে হবে, এই কাগজে সে সব লেখা আছে।' কাগজে পথটী আঁকিয়া দেখান। উলটাইয়া পাল-টাইয়া চিরকুটটুকু শিরস্ত্রাণের মধ্যে রাখিয়া মাটীর নীচে যে ঘরে থাকিতাম, সেখানে গেলাম। সৈনিকের কাজ থেকে তখনকার মত অবসর মিলিল—কাজেই নির্ভাবনায় সে রাত্রে নিদ্রা বেশ গাঢ় হইল।

ভোর চারিটা। শয্যা ত্যাগ করিয়া নিদ্রাতুর বন্ধুদের বেশ নাড়া দিলাম—তাহারা শুধু জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা কি আক্রান্ত?—প্রস্তুত হ'বার ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে কি?' যেমন শুনিল, এমনতর কোনও অঘটন ঘটে নাই, অমনই বেশ করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া গোটা কয়েক নাসাধ্বনি করিল! সাধ্য কার, তাহাদের জাগায়? কুম্ভকর্ণ কয়েক দিন ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, রামায়ণের এ কথা যে ধ্রুব সত্য, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। তাহাদের অমূল্য নিদ্রা ভাঙ্গাইবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে, এ কথা সানুনয়ে বলা সত্ত্বেও তাহারা আমার কথা শুনিল না। বেগতিক দেখিয়া দুই একটী বাছা বাছা কথায় আমার বক্তব্য শেষ করিবার সঙ্কল্প করিলাম—'Co বাঙ্গালী সৈনিক কয় জনকে ছুটী দিতেছেন—ছুটীর আর দুই ঘণ্টা মাত্র বাকী।' নিকটে সহসা মানুষের গন্ধ পাইলে সুপ্ত সিংহ যেমন চমকাইয়া উঠে, তাহারা তেমনই ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, এবং আমায় কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিল—আমার অপরাধ, এ শুভ বার্ত্তা শুনিবামাত্র আমি কেন তাহাদের গোচর করি নাই! আমি মনে মনে ভাবিলাম, রাত্রির প্রথম ভাগে কাঁচা

ঘুম ভাঙ্গাইতে গেলে আমার ভাগ্যে দুই এক্টা চপেটাঘাত বরাদ্দ হইলেও হইতে পারিত। সারা দিন কামান দাগার পর সুদূরে পদব্রজে অভিযান করিতে হইলে, ক্লান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রা একান্ত আবশ্যক;—এমন শুভ বার্ত্তাই যে এরূপ তীব্র নিদ্রা ভাঙ্গাইবার পক্ষে অব্যর্থ, তাহা আমি বেশ জানিতাম।

এক ঘণ্টাও হয় নাই, জাগরিত হইয়াছি; যে আসবাবপত্র লইয়া আমাদের ঘর বাড়ী, সে সব দুইটা থলিতে পুরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। তার পর প্রাতঃরাশ শেষ করিলাম। দুই দিন চলে, এমন পরিমাণ মাংস ও রুটী (preserved food) সঙ্গে লইয়া উচ্চতন কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহারা আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সদিচ্ছা ও সদ্ব্যবহারের সাগ্রহে বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন; বাঙ্গালীসুলভ বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য যে ইহার প্রসূতি, সে কথাও বলিলেন। Co এবং প্রধান অফিসার আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও উচ্চ আদর্শের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—'আমাদের প্রেরণার উৎস, এই দুইটী ভাব; ইহাই আমাদিগকে স্বেচ্ছায় অপ্রত্যাশিত ভাবে রণাঙ্গনের বীভৎসতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।' বিপদসঙ্কুল রণব্যূহ হইতে অক্ষতদেহে ফিরিতেছি বলিয়া তাঁহারা পুনরায় আমাদিগকে অভিবাদন জানাইলেন,—'আশা করি, তোমাদের বিশ্রাম-সুখের দিনগুলি দূরে কোনও নিরাপদ স্থানেই নির্ব্বিঘ্নে কাটিবে।' এই শুভ ইচ্ছা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম।

টেলিফোন-আফিসে আসিলাম। একটী সহৃদয় বন্ধু এক ধরণের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লববাদের কথা বলিলেন। তিনি ভাবগতিকে বুঝাইতে চান, তিনি সত্যেরই জয় ঘোষণা করিতেছেন। ছিন্ন-তন্ত্রী বীণার মত একটা কড়া সুর ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে—এইখানেই অস্বাভাবিকতা—এইখানেই সাদৃশ্যের অভাব। তাহার স্বপ্ন কিরূপে মূর্ত্ত ও বাস্তব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলেম, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রস্তাবনা আদৌ কার্য্যকরী বলিয়া মনে হইল না। এই সকল ভদ্রলোক আমাদের ব্যাটারীতে প্রচারক ছিলেন—হতভাগ্য মানব! দুঃখ যেন বিগ্রহবান হইয়া ইহাদের বুকের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সংসারের সকল স্থানেই ঘায়ের পর ঘা খাইয়া শুধু ক্ষতবিক্ষত; সাম্রাজ্যিকতা, (Imperialism) বিশ্বজনীনত্ব (Catholicism) এবং মহাজন—ইত্যাদির অত্যাচারে ইহারা উৎক্ষিপ্ত; ইহাদের দর্শন কিংবা

মতবাদ কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়া সমর্থন করা যায় না। ইহাদের যুক্তি তর্ক বড় বিচিত্র; নিজেদের কথা বুঝাইবার জন্য ইহারা তথাকথিত আধুনিকতম প্রত্যক্ষবাদের সাহায্য লন। ইঁহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্লিষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপীড়িত জাতির অন্তরাত্মা সেই উৎক্ষিপ্ত বিদ্রোহী জনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই অদ্ভুত তথ্য ইহাদের জীবনের স্তরে স্তরে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে। স্বপ্ন-প্রবণ সমাজ-তান্ত্রিকের মতবাদ যাহাই হউক না, আমরা তাহার মতে মত দিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাই আর নাই দেখাই, তিনি আগ্রহের সহিত আমাদের হাতে হাত দিয়া অভিবাদন করিলেন, এবং পথে অনেকটা দূর আমাদিগকে আগাইয়া দিলেন। ফরাসী সৈন্যদলে এরূপ চরিত্র-চিত্র নিত্য-দৃশ্য; ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু নাই।

সেণ্ট ক্যাথারাইন দুর্গে পঁহুছিলাম; কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া সন্নিহিত এক গ্রামে গেলাম,—একটী ট্যাক্সী মোটর মিলিল। সন্ধ্যার রাঙ্গা আকাশে তখনও আঁধার নামিয়া আসে নাই—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু আকাশের এক কোণেই আছাড় খাইতেছে। তখন Fleur-sur-air নামক গ্রামে আসিয়া হাজির হইলাম। সেখানে একটি ডিভিসন্—তাহাতে কেবল উপনিবেশের সৈন্য, আর ফরাসী দেশবাসী সৈন্য। Transport trainএর অপেক্ষায় সে গ্রামেই আমাদের দিন কয়েক অবস্থিতি হইল।

তিন দিনও হয় নাই; ১৮ই নভেম্বর আসিল। সে সময় শীতকালের তুমুল আক্রমণের সূচনা হয়; রণভেরীর উদাত্ত গর্জ্জন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—ধ্বংস-যজ্ঞে কে কত আহুতি দিতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য শিবের প্রলয়-বিষাণ যেন সকলকে ডাক দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মণ বাহিনীর নিকট যুদ্ধের পর যুদ্ধে হারিয়া ইতালিয়নরা পিছু হটিতে লাগিল। ইংরাজ ও ফরাসী অনতিবিলম্বে সাহায্য না পাঠাইলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইত। ইতালিয়নরা দেখিতে শুনিতে বেশ চিত্তাকর্ষক—যে কোনও বিষয় সহজেই ইহাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত করা যায়। কাজেই এরূপ পরাজয়ের পর সহজে বিচলিত-চিত্ত হওয়া ইহাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। এই ঘটনার পরেই মিত্রশক্তিসঙ্ঘের সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন যে, মিত্রবাহিনী এক জন প্রধান সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক—এমন কি, অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল ইংরাজ জাতিও এই মতের পক্ষপাতী হন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল। আমরা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি।

P. L. M. রেল লাইনে লোকের ভিড় আর কমে না। অনবরত Paiveএ লোক রওনা হইতেছে ; শুধু লোক ও মালপত্রে গাড়ীগুলি বোঝাই হইয়া চলিয়াছে। অগত্যা Bordeaux লাইন ধরিয়া যাইতে হইল। সুন্দর প্রভাতে আমাদের যাত্রা সুরু হইল। প্রভাত পবনের উচ্ছ্বসিত স্পর্শ বেশ লাগিল—নীল আকাশ আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল। সারা সপ্তাহটা গাড়ীতে থাকিয়া Girande জেলার St. Madanএ পঁহুছিলাম। একটি আমেরিকান সৈন্ত-শিবিরে আমাদের থাকিতে হয়—শিবির নয় ; ৪০ কিলোমিঃ পরিমাণ ভূভাগ জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড নগর। বেশ পরিপাটী, বেশ সমৃদ্ধিশালী ; রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, বেতার টেলিগ্রাফ, জলের কল, সিনেমাটোগ্রাফ, বাজার হাট, দোকান-পাট, কিছুর অভাব নাই। সেখানে আমেরিকানদের সহিত দুই সপ্তাহ কাজ করিবার পর আমাদিগকে Magandas গ্রামে পাঠান হয়। এই নূতন স্থানে বুরোক্রাটিক আমলা-কর্ম্মচারীর হাতে আমরা যারপরনাই অসুবিধা ভোগ করি। কর্ম্মচারীর দল যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তব রণ কখনও দেখেন নাই—সে স্থানে আদৌ যাইতে চাহিয়াছিলেন কি না সন্দেহ! আইন-কানুন শাসন ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা ভাসা-ভাসা ধারণা আছে—সুতরাং আপনাদের আকস্মিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া ইঁহারা অযথা পরপীড়ক হইয়া পড়েন ; স্বভাবের তাড়নায় সৃষ্টির মধ্যে অভিনব জীব হইয়া উঠেন। তিন দিন ধরিয়া Regiment থাকিবার কোনও ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যুদ্ধপ্রত্যাগত বীরবৃন্দ অবশ্য নানা ক্লেশ-স্বীকারে অভ্যস্ত ; অগত্যা তাহারা কেহ গোশালায়, কেহ অনুনয় বিনয় করিয়া গ্রামবাসীর কুটীরে, কেহ বা অর্থ দিয়াও দশ মাইল দূরে কাহারও গৃহে আশ্রয় লইল। ইহার কোনও প্রতিবিধান করিতে না পারায় আমাদিগকে Concentration Campএ পাঠান হয়। দশ সহস্র সৈনিকের প্রত্যেকেই পীড়িত বলিয়া যুগপৎ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিল। কাজ করিতে কেহ বড় রাজী নহে ; কর্ত্তৃপক্ষের ক্রুদ্ধনয়নে শাস্তি দিবার প্রতিজ্ঞা দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া ভয়ে ভয়ে সকলে কাজে গেল। কিন্তু কাজ করিতে পারিবে কিরূপে?—শৈত্য ও উত্তাপে দেহ জর্জ্জরিত,—মন অবসন্ন,—কর্ম্মৈষণা আসিবে কোথা হইতে? প্যারিসে ডেপুটীদের এ দুরবস্থা জানাইয়া তার করা হয়। ফলে Diagone আমাদের শিবির পরিদর্শন করিতে আসেন।

এপ্রিল ১৯১৮ ও তার পরবর্ত্তী সময়।—মার্সেলে আসিলাম। দিন

কয়েকের মধ্যে বলাই আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে ভারতে ফিরিবার জন্ত জাহাজের আশায় রহিলাম—শস্যশ্যামল কনক-কুন্তল দেশটীর কথা মনে পড়িল। ১২ই তারিখে যে জাহাজ ছাড়িবার কথা, তাহা আসিল না; এবং 'বিজার্ট' ও 'মালটা' হইতে যে সব জাহাজ 'আসিতেছি' বলিয়া তার করে, তাহার কোনটী মার্সেলে আসিয়া উঠিতে পারে নাই। তারবিহীন বার্ত্তা বাতাসে মিশিয়া যায় নাই, কিন্তু নিরেট জাহাজখানা জ'লো হাওয়ায় কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহা বোধগম্য হয় নাই। শুধু খাইয়া আর সাগর উপকূলে ভ্রমণ করিয়া দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের রওনা হওয়া সম্বন্ধে কোনও সংবাদ আসিয়াছে কি না, সে বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রত্যহ একবার করিয়া Caserue de chariteএ যাইতাম। যে সকল লোক যুদ্ধ ব্যাপারে আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিল না,—তাহাদের সহিত আমরা মেলামেশা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাদের মতামত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে; এক দিকে Brest-Litovskএর লজ্জাজনক হেয় সন্ধিপত্র, অন্য দিকে রুসে বীভৎস করুণ-নাটকের অভিনয় মনুষ্যমাত্রকেই বিচলিত করিয়া তুলে। রুস-প্রেমিকের অশ্রুতপূর্ব্ব নীতিবাদ কার্য্যক্ষেত্রে একে একে কিম্ভূতাকার ডিগ্‌বাজি খাইতে লাগিল। কে যে কি বলিতে চাহিতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিল। রাজনীতিজ্ঞ রথিবৃন্দ রুসের ঘটনাপর্য্যায়কে একবাক্যে বীভৎসতার প্রতিচ্ছবি বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন,—সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতায় ও কাগজ-কলমে Capitalist, Socialist ও Seditionist, এই সকল কথার নির্দ্দয়ভাবে একত্র সমাবেশ,—মাসের পর মাস বিদ্রূপ-ছবির প্রকাশ—Caillon, Maloy প্রভৃতি বড় দরের Socialist কর্ত্তৃক হেয় সন্ধিপত্রে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর প্রভৃতি বিচিত্র সংবাদ জনসাধারণের গোচর হইলে, সাধারণের শাসন-তন্ত্র ও 'সোসিয়েলিজম্' বলিতে যাহা বুঝায়, তৎপ্রতি লোকের অবজ্ঞা ও ঘৃণার উদ্রেক হইল।

পৃথিবীতে সকল স্থানেই 'সাধারণ' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কৃতবিদ্য জন হইতে একেবারে পৃথক। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আজ পর্য্যন্ত অনিবার্য্যরূপে স্থায়ী হইয়া আছে। সুশ্রুতের ছুরিকা কাটিয়া কাটিয়া একটীর পর একটী স্তর তুলিয়া দিলেও, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোনখানে, তাহা খুঁজিয়া পাইবে না। সাধারণের সংযম কিংবা বিচারবুদ্ধি বলিতে কিছু নাই বলিলেই হয়। আছে শুধু উৎকট আত্মাদর ও বিকট দ্বেষবোধ। তীক্ষ্ণ মেধা বা বলবতী

ঈষণা না থাকায় তাহারা কেবল ভালবাসিতে কিংবা ঘৃণা করিতে জানে, পূজা করিতে কিংবা হত্যা করিতে, অপরের জন্য মরিতে কিংবা অপরকে নিজের জন্য আত্মাহুতি দিতে, বাধ্য করিতে পারে। উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যুৎ-বেগে এমন দ্রুত মতপরিবর্ত্তন করিতে আর কোনও সঙ্ঘই পারে না। এই জন্যই বোধ হয় Antonioর কথায় রোমানরা যাহার মাথা কাটিতে যায়, তাহার নিকটেই অবশেষে মাথা নত করে—Cæsarএর সৈন্যবাহিনী Brutus-এর প্রতি যেরূপ ঘৃণায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, ঠিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নিজেদের রাজার উপর তদ্রূপ বিসদৃশ ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়াছিল। সাধারণের এমন উত্তাল নৃত্যও যেন বিধি-নির্দ্দিষ্ট অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এ যেন তপ্ত দ্রব লৌহ; যে ছাঁচে ঢালিবে, তাহারই প্রতিরূপ ফুটাইয়া তুলিবে; মুগুরের একটা আঘাতেরও প্রয়োজন হইবে না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষককুল, স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি, মুটে মজুর পর্য্যন্তকে বিদ্রূপচ্ছলে বলিতে শুনিতাম, এক জন Socialistকে একটা পদাঘাতে Maximalistএর দলে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে। কিংবা, 'সুদখোর মহাজনের দল অপরকে মহাজন বলিয়া আমাদের চোখে ধূলা দিতেছে।' কিংবা, 'বিপ্লববাদ এবং সৈন্য-সৃষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন দেশের পক্ষে তেমনই বিপজ্জনক,যেমন Bolshavism মিত্র-শক্তির সাফল্যের অন্তরায়!' তখন আমার মোটেই আশ্চর্য্য বোধ হইত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে, চারি মাস পূর্ব্বে যখন এ দেশের জনগম্য সকল স্থানেই ঘুরিতেছিলাম, তখন এ দেশেরই লোকদের বড় গলায় খুব জোরে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'যত রকম পাপ সম্ভবপর হইতে পারে, সৈন্যবাহিনী তাহারই জন্মদাতা।' কিংবা, 'সৈন্যসঙ্ঘ একটা বড় গণিকা—তাহার সেবারত হইবার মত বোকামী আর দ্বিতীয় নাই।' কিংবা, 'দেশ বিদেশের সীমানা আজই মুছিয়া যাক, এবং থাক শুধু সুন্দর আদর্শ।' 'আদর্শ' বলিতে লোকে Socialismই বুঝিত।

এই মানসিক পরিবর্ত্তনের কথা জর্ম্মণী বিশেষ জানিত না, কাজেই যাহাতে শত্রুর দেশে একটা বিপ্লব বাধিয়া যায়, কিংবা শ্রমজীবী ও মহাজনের বিকট দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তজ্জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটী করে নাই; বায়ুপথে নিত্য নৈমিত্তিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে উড়ো চিঠি ছড়াইয়া গুপ্তচর দ্বারা বিষকল্পনা প্রচার করিয়া আপনার বিচিত্র বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় দেয়। জর্ম্মণী মনে করিত, কাল্পনিক উপায়ে স্বাভাবিক ঘটনা-পর্য্যায়ের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। ইহা কতটা সত্য তাহা বলিতে পারি না; তবে এইটুকু জানি যে,

রুসিয়ার প্রজাতন্ত্র তেমন টিকিয়া উঠিতে পারে নাই—এবং বিজয়দৃপ্ত মিত্র-পক্ষের কঠিন সন্ধিসর্ত্ত শ্রমজীবীর যে লড়াই জর্ম্মণী প্রায় বাধাইয়া দিয়াছিল, তাহা তখনকার মত স্থগিত থাকে। এ যুদ্ধের সময় তখনও আসে নাই—কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইবার চেষ্টা সফল হয় নাই।

দেশে ফিরিবার জন্য মাসের পর মাস আমাদের এমনই করিয়া অপেক্ষা করিতে হইল। কত কি শুনিলাম; কত কি দেখিলাম; কিন্তু যে জাহাজটাতে আমাদের যাত্রা সুরু হইবে, সেটা দেখিলাম না। সীমান্তরালে রণক্ষেত্রে থাকিতে থাকিতে যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত নিঃশেষ হইতে বেশী দিন লাগিল না। সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা আমাদের নিকট শুধু যে নিয়মের মত হইয়া উঠে, তাহা নয়; এ অভ্যাস আমাদের এত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত যে, অভাবের মধ্যে থাকা কেমন কেমন লাগিত।

তখন ভোর; শয্যা ত্যাগ করিয়াছি; আমি বলাইয়ের দিকে চাহিলাম; বলাই আমার দিকে চাহিল। 'কি বল বলাই, নগরে কাজ করা যাক্—স্বচ্ছল অবস্থায় থাক্‌তে হবে।' এ কথা শুনিয়া সে বলিল, 'নিশ্চয়।' কাজের চেষ্টায় নগরের দিকে বাহির হওয়া গেল। Pradoর সৈন্য-নিবাসে থাকিবার সময় দেখিতে পাইতাম, সৈনিকেরা, এমন কি, পদপ্রাপ্ত পরিচালকেরাও (Commissoned officer) ছুটীর সময় সামর্থ্যমত যে যেমন পারিত, কাজ করিত। কারণ, প্রাচ্য দেশের লোকেরা জীবন্তভাবে থাকিতে বড় ভালবাসে—তারা চায় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রাণ অনুভব করিতে, এবং যাহাতে অর্থাগমের পথ আছে, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে ঢালিয়া দেয়। অর্দ্ধেক রাত্রি হইতে না হইতে সমস্ত ব্যয় করিয়া আমাদের দেশের লোকের মত কপর্দ্দকহীন হইয়া পড়ে; কিন্তু কঠোর শ্রম, সুখাদ্য ভোজ্যদ্রব্য, উত্তম পেয়, পরিপাটী শয্যা ও অর্থলভ্য সকল রকমের সুখ তাহাদিগকে স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে একটা প্রাণশক্তি অনুভব করিতে দেয়—সে অনুভূতির মূল্য কি, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে এইটুকুই মনে লাগে যে, আমরা কাজও করি না, লাভও করি না, এবং তাহার ফলে যে খরচও করি না, তাহা বলাই বাহুল্য—আমরা না পাই স্বাস্থ্য, না পাই সম্পদ—আর আমাদের সনাতন প্রাণ যে কোনও নিগূঢ় অপ্রাণের মধ্যে সুপ্ত, তাহারও খোঁজ রাখি না।

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

মাণিকের মা

১

প্রথমা স্ত্রী চমৎকারী বিদ্যমানে গোরাচাঁদ খোড়াই কুটুম্বিতা করিতে গিয়া যখন সপ্তদশবর্ষীয়া থাকমণিকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিল, তখন চমৎকারী স্বামীকে কতকগুলা গালাগালি দিয়া এবং নিজ অদৃষ্ট-দেবতাকে বিস্তর অভিসম্পাত করিয়া স্বামীর সহিত হাঁড়ী পৃথক করিয়া লইল। গোরাচাঁদ উপার্জ্জনক্ষম হইলেও চমৎকারী কোনও দিনই তাহার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিত না; নিজে মাছ ধরিয়া, মাছ বেচিয়া যাহা আনিত, তাহাতেই নিজের ও স্বামীর পেটের ভাত চালাইয়া দিত। আর গোরাচাঁদ যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অধিকাংশই তাড়ীর আড্ডায়, মদের দোকানে দিয়া আসিত। কচিৎ বা স্ত্রীর জন্য একখানা কল্কাপেড়ে শাড়ী কিনিয়া আনিয়া চমিকে যে আন্তরিক ভালবাসে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত। স্বামীর ভালবাসার উপর চমির কিন্তু কোন সন্দেহই ছিল না, এবং সে ভালবাসার কোনখানে কোনও একটু শিথিলতা থাকিলেও তাহাকে প্রগাঢ়ভাবে পাইবার জন্যও তাহার তেমন বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না। সুতরাং গোরাচাঁদের চেষ্টা যে সফল হইত, এমন বলা যায় না।

তবে গত শীতের সময় গোরাচাঁদ যখন এক বছরের ছেলে মাণিকের জন্য একটা ছিটের জামা কিনিয়া আনিয়াছিল, তখন চমৎকারী সেই সাত আনা দামের ছিটের জামাটার মধ্যে কতটা গর্ব্ব নিহিত আছে, প্রতিবেশিনীদিগের নিকট কয়েক দিন ধরিয়া তাহাই খ্যাপন করিয়া বেড়াইয়াছিল, এবং সে দিন সে যে দুইটা বড় গল্‌দা চিংড়ী পাইয়াছিল, রমণ ঘোষ তাহার দর তিন আনা হাঁকিলেও পয়সার লোভ সংবরণ করিয়া তাহার ঝোল রাঁধিয়া গোরাচাঁদকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল। গোরাচাঁদ ভাতের পরিবর্ত্তে এক ভাঁড় তাড়ীর সঙ্গে চিংড়ী দুইটার সদ্ব্যবহার করিলেও চমৎকারী তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই।

কিন্তু কুটুম্বিতায় গিয়া গোরাচাঁদ যখন নূতন সঙ্গিনী লইয়া আসিল, তখন স্বামীর এই ব্যবহারটা তাহার হস্তের মুদ্গরের আঘাত অপেক্ষা কঠোর বলিয়া চমির বোধ হইল। সে পর দিনই রান্নাচালার অপর পার্শ্বে একটা উনান কাটিয়া পৃথক্ হাঁড়ীতে রাঁধিয়া খাইল।

গোরা বলিল, 'যখন হাঁড়ী আলাদা করেছিস্, তখন আমার কাছে তোর এক পয়সারও পিত্যেশ আর নাই, তা ব'লে রাখছি।'

মুখভঙ্গী করিয়া হাত দুইটা নাড়িয়া চমি বলিল, 'আরে আমার পিত্যেশ রে! তোর পিত্যেশ আমি করি?'

গোরা ক্রোধ গম্ভীর-স্বরে বলিল, 'এই কথা তো?'

গর্জ্জন করিয়া চমি বলিল, 'হাঁ, এই কথা। আমি এক বাপের বেটী, আমার কাছে দোতা কথা নাই।'

প্রতিবেশিনীরা তিরস্কার করিয়া বলিল, 'হাঁ লা মাণ্কের মা, তুই তো বড্ড হাবা মেয়ে। ও আপদটাকে ঝাঁটা মেরে না তাড়িয়ে নিজেই আলাদা হ'লি?'

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া চমি উত্তর করিল, 'চুলোয় যাক্ মা, ও মুখপোড়া মিন্সে ক্ষেপেছে ব'লে আমিও কি ওর সাথে পাগল হ'তে যাব?'

প্রতিবেশিনী সহানুভূতির স্বরে বলিল, 'সত্যি বাছা, গোরারই বা আক্কেল-খানা কি? বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ!'

'মরণ ছটফটানি মা, মরণ ছটফটানি' বলিয়া চমি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

২

'থাকি!'

গম্ভীরস্বরে থাক উত্তর দিল, 'কেনে?'

চমি জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ তোদের হরিবাসর না কি?'

থাক কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে আপনার পরিহিত বস্ত্রের অপর প্রান্তটা শেলাই করিতে লাগিল। চমি একটু অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ তোদের রান্না চড়বে না?'

থাক বলিল, 'এক মুঠো পান্তা ছিল, আমানি দিয়ে তাই খেয়েছি।'

সহাস্যে চমি বলিল, 'তুই পান্তা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছিস, আর মিন্সে এসে বুঝি তোর পেটে হাত বুলুবে?'

ঝঙ্কারের সুরে থাক বলিল, 'পেটে হাত বুলুবে কি মাথায় হাত বুলুবে—সেই জানে। চাল না থাকলে কি রাঁধবো? ছাই!'

ঈষৎ হাসিয়া চমি বলিল, 'রেঁধে দিতে পারলে মিনসে নতুন গিন্নীর হাতে একটা নতুন জিনিস খেতে পায় বটে। কিন্তু দিতে পারবি কি?'

থাক নাসা কুঞ্চিত করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। চমি বলিল, 'তা চাল নাই তো মিন্‌সেকে বলিস্ নি কেন ?'

থাক মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, 'কে রাত দিন বলতে যাবে ? কাল সাঁজের বেলায় বল্লুম, তা রা করলে না।'

চমি হাসিয়া উঠিল ; বলিল, 'তবেই তুই কলনা ঘোড়্‌ষের ভাত খেয়েছিস্!'

থাক ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। চমি ভাতের হাঁড়ী হইতে কয়েকটা ভাত তুলিয়া লইয়া টিপিতে টিপিতে বলিল, 'তা কারো ঘর থেকে আধ সের চাল ধার ক'রে আনলেও তো পারিস্।'

ঝঙ্কার দিয়া তীব্রকণ্ঠে থাক বলিল, 'কোথায় ধার কত্তে যাব ? কে ধার দেবে ?'

চমি বলিল, 'ধার নিবি, শোধ করবি, তা ধার দেবে না কেন ?'

'আমার অমন বাপ চোদ্দপুরুষে পরের দোরে চাল ধার ক'রে বেড়ায় না।'

বলিয়া থাক সপত্নীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

চমি আর কিছু বলিল না। ভাতের হাঁড়ী উনান হইতে নামাইয়া ফেন ঝাড়িল, এবং মাছ রাঁধিয়া ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে বসিল। থাক কাপড় শেলাই শেষ করিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

ছেলেকে খাওয়াইয়া, ভাতের হাঁড়ীতে চাপা দিয়া চমি জাল লইয়া তাহার ছিন্ন অংশের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল, এবং মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া উঠানের জাম গাছের ছায়াটা উত্তর দিক্ হইতে কতটা পূর্ব্ব দিকে সরিয়া গিয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল।

গামছা পরিয়া ভিজা কাপড়খানা গায়ে জড়াইয়া শুকাইতে শুকাইতে গোরা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, এবং ঘরের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাকিল, 'থাক !'

দুই তিন ডাকের পর থাক উত্তর দিল, 'কি ?'

গোরা একটু উচ্চস্বরে বলিল, 'এমন সময় শুয়ে ? ভাত দিতে হবে না ?'

থাক উঠিয়া বসিয়া উত্তর দিল, 'ভাত কোথা ?'

গোরা বলিল, 'ভাত নাই তো কি আছে ? চিঁড়ে দই ?'

ক্রোধ-গম্ভীর-স্বরে থাক বলিল, 'না, আমার মাথা।'

চমি গম্ভীর মনোযোগের সহিত জাল সংস্কার করিতে লাগিল। গোরা

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তোমার মাথাটা ভাড়ীর সঙ্গে হ'লে মন্দ হ'তো না। কিন্তু এখন ওটা তুলে রাখ।'

থাক কোনও উত্তর দিল না। গোরা গামছা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে পরিতে বলিল, 'সত্যি, আজ রান্না হয় নি না কি?'

থাক উত্তর করিল, 'চাল কোথায় যে রাঁধবো?'

'তবে খাব কি?'

'আমার মাথা।'

গোরা ঘরের ভিতর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা একবার নিক্ষেপ করিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চমিকে লক্ষ্য করিয়া গোরা বলিল, 'সেরটাক চাল ধার দিতে পারিস্ মাণকের মা?'

জাল হইতে মুখ না তুলিয়াই চমি বলিল, 'আমার চাল বাড়ন্ত।'

গোরার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; সে নীরবে বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল। চমি বলিল, 'আমার হাঁড়ীতে ভাত আছে, খাবি?'

'না।'

'খেলে দোষ হবে না কি?'

'হাঁ।'

'চাল ধার ক'রে খেলে দোষ হবে না, আর ভাত খেলে দোষ হবে?'

'চাল ধার নেব, শোধ দেব; ভাত ধার নেওয়া যায় না, শোধও দেওয়া যায় না।'

'তা না হয় এক দিন অমনই খেলি?'

'উপোস দিয়ে শুকিয়ে মলেও নয়।'

'তবে তাই মর!' বলিয়া চমি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ভাত বাড়িয়া স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া খাইতে বসিল। গোরা গম্ভীরভাবে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

চমি খাইতে খাইতে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া স্বামীর দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গোরা হুঁকা রাখিয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। চমি আর দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়াই মুখখানা বিকৃত করিল। তখনও অর্দ্ধেক ভাত পাতে পড়িয়া ছিল; সেগুলা দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পাথর শুদ্ধ তুলিয়া রাখিল, এবং হাত মুখ ধুইয়া ছেলেটাকে লইয়া দাবার এক পাশে শুইয়া পড়িল।

৩

দ্বিতীয় পক্ষকে লইয়া গোরাচাঁদ একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিল। আগে চমিই সংসার চালাইত, আর সে নিজের উপার্জ্জনের পয়সা মদে তাড়ীতে উড়াইয়া আমোদে দিন কাটাইত। কিন্তু চমি হাঁড়ী পৃথক্ করিলে তাহাকে সংসারের ভার লইতে হইল; সুতরাং আমোদের মাত্রাটা কমিয়া আসিল। ইহাতে গোরাচাঁদ ক্ষোভ ব্যতীত একটুও আনন্দ বোধ করিল না। সঙ্গীরা যখন তাড়ীর ভাঁড় বা মদের বোতল লইয়া ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটাইতে যাইত, তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোরাচাঁদকে ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হইত। যে দিন প্রলোভনটা নিতান্ত অসংবরণীয় হইয়া উঠিত, বা সঙ্গীদের সাদর আহ্বান ও অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিত না, সে দিন তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। সে দিন ঘরে ফিরিয়া শুধু যে চাউলের অভাবে উপবাস দিতে হইত, তাহা নহে; সেই সঙ্গে থাকর তর্জ্জন গর্জ্জন ও তীব্র বাক্য-বাণ তাহাকে নীরবেই সহ্য করিতে হইত। যে দিন একটু অসহিষ্ণু হইয়া পড়িত, সে দিন থাককে দুই এক ঘা দিয়া আপনার অবিমৃশ্যকারিতাজনিত ক্ষোভটাকে দূর করিবার চেষ্টা করিত। তাহাতে কিন্তু ব্যাপারটা এমনই বীভৎস হইয়া দাঁড়াইত যে, তজ্জন্য গোরাচাঁদকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। থাকর কান্নার চীৎকারে পাড়ার মেয়ে পুরুষ আসিয়া জড় হইত। তাহাদের কেহ থাকর দোষ দিয়া, কেহ বা গোরাকে দোষী করিয়া, সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে যে একটা আদালতের বিচারের অভিনয় আরম্ভ করিত, তাহা গোরাচাঁদের পক্ষে নিতান্তই অসহনীয় হইয়া পড়িত।

কিন্তু সব চেয়ে অসহ্য হইত চমির হাসিটা। এই বিচার-বিতর্কের কোলাহলের মধ্যে চমি যে এক পাশে দাঁড়াইয়া মিটি-মিটি হাসিত, সেইটাই গোরার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া পড়িত। সেই শব্দহীন হাসিটুকুর মধ্যে এমনই একটা তীব্র তিরস্কার ধ্বনিত হইতে থাকিত যে, তাহাতে গোরার মাথার শিরগুলা পর্য্যন্ত টন্ টন্ করিয়া উঠিত। তাহার ইচ্ছা হইত, সে নদীতে গিয়া ঝাঁপ দেয়, অথবা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে।

তবে সকল দিনই চমি এই শ্লেষের হাসিটুকু হাসিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। যে দিন গোরাচাঁদের নেশার ঝোঁকটা একটু বেশী থাকিত, এবং প্রহা-রের মাত্রাটা অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপক্রম করিত, সে দিন চমি আগে হইতেই মাঝে পড়িয়া হয় স্বামীকে, নয় থাককে টানিয়া আনিয়া বিবাদের

নিষ্পত্তি করিয়া দিত। ইহাতেও যে গোরা আঘাত পাইত না, এমন নয়। নেশার ঝোঁক কাটিয়া গেলে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, আর কোনও দিনই সে তাড়ীর আড্ডা বা মদের দোকানের ছায়া স্পর্শ করিবে না। কিন্তু প্রলোভনের নিকট প্রতিজ্ঞা চিরদিনই পরাভূত। সুতরাং গোরাকে সময়ে সময়ে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে হইত।

তাহার এই প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুতির জন্য চমি কিন্তু স্বামীকে দোষী মনে করিত না। পুরুষ মানুষ এইরূপই অসংযত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য মেয়ে মানুষকে ধীর-সংযত-ভাবে সংসারের ভার মাথায় লইতে হয়। কিন্তু থাক সে ভার লইতে সম্পূর্ণ নারাজ। এমন দুল্‌দুলে গতর লইয়া বসিয়া খাইবে, উপবাস দিবে, মার খাইয়া পাড়ার লোক জড় করিবে, তথাপি জাতি-ব্যবসা করিবে না। সকাল হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত মাছ ধরিলে চার পাঁচ আনার মাছ হয়। তাহাতে দুইটা পেটের ভাতের যোগাড়টা হইয়া যায়। কিন্তু স্বামী এক পয়সার মাছ কিনিয়া আনিবে, তবু সে পাঁচটা মাছ ধরিয়া সংসারের সুসার করিবে না। এমন মেয়েমানুষের কপালে কি সুখ থাকে?

চমি সপত্নীকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু থাক কিছুতেই জাল ঘাড়ে করিতে স্বীকৃত হইল না। চমি তাহাকে এবং তাহার কপালকে গালাগালি দিয়া নিরস্ত হইল। শুধু তাহাই নয়, এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়েকে ঘরে আনার জন্য স্বামীর উপরেও হাড়ে হাড়ে রাগিয়া গেল। আগে সে মধ্যে মধ্যে গোপনে হাঁড়ীর ভাত বাড়িয়া দিয়া উভয়কে উপবাস হইতে রক্ষা করিত; ভাল মাছ পাইলে কতকটা দিয়া আসিত; কিন্তু এখন হইতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল, এবং সে কুটা ছিঁড়িয়া এই দুইটী লোকের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

কিন্তু সে দিন গোরাচাঁদ অভুক্ত অবস্থায় বাহির হইয়া গেলে ক্ষুধা সত্ত্বেও পাতের ভাতগুলার উপর যখন অরুচি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে এই প্রতিজ্ঞাটা বজায় রাখিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে তাহার যেন একটা সন্দেহ জন্মিল।

কিন্তু ছিঃ, যে উপবাসটাকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইল, অথচ তাহার হাঁড়ীর ভাত খাইতে অস্বীকার করিল, উপবাস দিয়া শুকাইয়া মরিলেও তাহার ভাত খাইবে না বলিয়া মুখের উপর চোটপাট জবাব দিয়া গেল, তাহার জন্য আবার মমতা কি? হইলই বা সে স্বামী। স্বামী হইয়া সে কোন্ দিন নিজের

কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে? স্ত্রীকে প্রতিপালন করা দূরের কথা, স্ত্রীই বরং তাহাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রতিদানে সে এই একটা লক্ষ্মীছাড়া মাগীকে আনিয়া তাহার বুকে যেন বাঁশ পুঁতিয়া দিল। আজ সাত বৎসর বিবাহ হইয়াছে; এই সাত বৎসর কাল চমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, সুখ অসুখ, সকল তুচ্ছ করিয়া যাহাকে খাওয়াইয়া আসিল, সেই লোকটাই আজ নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় তাহার অন্নকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে রীতিমত অপমান করিয়া গেল। এই লোকটার জন্যই আবার মনের এত চাঞ্চল্য! চমি মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, খবরদার!

সন্ধ্যা হইলে চমি ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইল। তার পর ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া দুপুর বেলার পাতের ভাতগুলা খাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। শুইবার আগে একবার থাকর ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'থাকি, ঘুমিয়েছিস্ না কি?'

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে থাক উত্তর দিল, 'না।'

চমি বলিল, 'এখনো ফিরলো না। রাত তো দু'ঘড়ি হলো, গেল কোথায়?'

যেন গভীর উপেক্ষার স্বরে থাক উত্তর দিল, 'কে জানে।'

নিজের ঘরের বাঁশের আগড় ভেজাইয়া দিয়া চমি শুইয়া পড়িল। শুইল বটে, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। লোকটার সন্ধ্যার সময়েই ফিরিবার কথা, অথচ এত রাত্রি পর্য্যন্ত কেন ফিরিল না, এই চিন্তাটা মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল। চমি জোর করিয়া সে চিন্তাটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল, এবং তজ্জন্য কাল বামুন-পুকুরে মাছ ধরিবে, বা জোমড়ার খালে যাইবে, তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু স্বল্পকালমধ্যেই যখন সে মীমাংসা হইয়া গেল, অথচ তখনও চোখে ঘুম আসিল না, তখন সে আর একটা নূতন চিন্তা জুটাইয়া লইল।

তাহার মাণিক—এই দেড় বছরের ছেলেটুকু কত দিনে বড় হইবে? বড় হইয়া সে যখন মাছ ধরিতে শিখিবে, তখন চমি আর জাল ঘাড়ে করিয়া ঘুরিতে যাইবে না। বড় জোর সে বাজারে গিয়া মাছগুলা বেচিয়া আসিবে। পয়সা যাহা পাইবে, সব খরচ করিবে না। কিছু কিছু জমাইয়া চার গণ্ডা সাড়ে চার গণ্ডা টাকা হইলেই একটী বৌ ঘরে আনিবে। তার পর মাণিকের আবার ছেলে হইবে। এত আশাও মানুষে করে? কিন্তু আশা লইয়াই সংসার তখন, আজ যেমন মাণিক পাশে শুইয়া আছে, এমনই করিয়া নাতিটিকে পাশে

রাখিয়া ঘুম পাড়াইবে। আর ঐ হতচ্ছাড়া মিন্‌সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে থাকিবে। সে কিন্তু কিছুতেই নাতিটীকে ঐ মিন্‌সের কাছে যাইতে দিবে না। সে থাকিকে লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে লইয়াই থাকিবে।

৪

'থাক!'

চমি কাণ খাড়া করিল। থাক কি উত্তর দিল, শুনা গেল না। গোরাচাঁদ বলিল, 'পয়সা যোগাড় করে চাল নিয়ে আসতে রাত হ'য়ে গেল। এখন উঠে ভাত চাপিয়ে দাও।'

থাক উত্তর দিল, 'এই রাত দুপুরে আমি রাঁধতে পারবো না।'

গোরাচাঁদ বলিল, 'না রাঁধলে খাব কি?'

থাক বলিল, 'তা আমি জানি না।'

গোরাচাঁদ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, 'কিন্তু মাণ্‌কের মা নিশুতি রাতে উঠে আমাকে রেঁধে দিয়েছে।'

চড়া গলায় থাক বলিল, 'তবে মাণ্‌কের মার কাছেই যাও না, দেখি—কেমন রেঁধে দেয়।'

'আচ্ছা' বলিয়া গোরাচাঁদ চমির ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, 'মাণ্‌কের মা!'

চমি চোখ দুইটা জোরে টিপিয়া পড়িয়া রহিল। গোরাচাঁদ আগড়ে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকিল, 'মাণ্‌কের মা, ও মাণ্‌কের মা!'

চমি উত্তর দিল না, পাছে শব্দ হয় বলিয়া নিঃশ্বাসটু পর্য্যন্ত ফেলিল না। গোরাচাঁদ আর দুই একবার ডাকিয়া, 'দূর হোক্' বলিয়া চাউলের পুঁটুলিটা নিজের ঘরের দাবায় ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। চমির ইচ্ছা হইল, উঠিয়া রাঁধিয়া দেয়। কিন্তু তখনি মনে হইল, কেন সে রাঁধিতে যাইবে? সুয়ো রাণী দিক্ না। মিন্‌সের যে বড় তেজ! চোখ টিপিয়া ভাবিতে ভাবিতে চমি ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিন সকালে চমি থাককে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁলা থাকি, কাল কখন্ ফিরলো?'

থাক বলিল, 'অনেক রাতে।'

চমি বলিল, 'সেই রাতে তোকে আবার রাঁধতে হ'লো?'

মুখটা ভারি করিয়া থাক উত্তর করিল, 'বোয়ে গেছে আমার রাঁধতে।'

চমি। খেলে কি?

থাক। কি আবার খাবে? হরিমটর।

চমি। দুজ'নে ভাগ ক'রে খেয়েছিলি বোধ হয়?

চমি একটু শ্লেষের হাসি হাসিল। থাক উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে রহিল। চমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কেন, উঠে এক মুঠো রেঁধে দিতে পারলি নে?'

মুখখানা বিকৃত করিয়া থাক উত্তর দিল, 'না।'

তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া চমি বলিল, 'ধন্যি মেয়ে তুই যা হোক। মানুষটা সারা দিন রাত না খেয়ে রইলো, আর তুই এক মুঠো রেঁধে দিতে পারলি না?'

ঠোঁটটাকে উল্টাইয়া তীব্রকণ্ঠে থাক বলিল, 'এত দরদ তো তুমি উঠে রেঁধে দিলে না কেন? তোমার দরজায় গিয়ে তো মাথা কুটলে, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। এমন আল্‌গা দরদ সবাই দেখাতে পারে।'

বলিয়া সে চমির মুখের কাছে আপনার হাত দুইটা নাড়িয়া দিল। চমিও উত্তরে চড়া সুরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। গোরা মুখ হাত ধুইয়া উপস্থিত হইল, এবং থাককে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আজ আর খাটতে যাব না। সকাল সকাল রান্না চাপিয়ে দাও, আমি ছিপটা নিয়ে দেখি, দু'টো মাছ যদি পাই।'

এই নির্লজ্জ পুরুষটার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চমি সরিয়া আসিল, এবং জালখানা ঘাড়ে লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন চমি বুঝিল, স্বামী একেবারে গোল্লায় গিয়াছে। ঐ হতচ্ছাড়া মাগীটা নিশ্চয়ই উহাকে গুণ্‌ করিয়াছে; সেই গুণের প্রভাবে উহার আর মাথা তুলিবার সাধ্য নাই। সুতরাং স্বামীকে এখন আর কোনও কথা বলা বৃথা। চমি সেই দিন হইতে স্বামীর চিন্তা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিল, এবং মনকে অনেক বুঝাইয়া সেইরূপে চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

৫

বাজারে যাইতে যাইতে প্রতিবেশী জগার মা বলিল, 'ওলো চমি, আর শুনেছিস্, আমার বোন-জামায়ের ভাই রঘোকে দেখেছিস্ তো?'

চমি কৌতূহলান্বিত হইয়া বলিল, 'দেখেছি বৈ কি খুড়ী, সে যে কতবার তোমাদের ঘরে এসেছিল। তার কি হ'য়েছে?'

জগার মা বলিল, 'হতভাগা একটা বৌ থাকতে আর একটা বিয়ে করেছিল। এই তোরি মত আর কি!'

চমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'তার পর?'

জগার মা বলিল, 'তার ঐ আগেকার বৌটা সোয়ামীকে বশ করবার তরে গুণ্ করেছিল। কি শেকড় মাকড় না গুঁড়ো খাইয়ে দিয়েছিল, তাতে ছোঁড়া একেবারে পাগল হ'য়ে গিয়েছে।'

চমি শিহরিয়া উঠিল, শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'বল কি খুড়ী?'

জগার মা বলিল, 'আর বাছা, শেকড় মাকড়ের কি গুণ, তা কি বলা যায়? কোনও শেকড়ে মানুষ মরে, কোনও শেকড়ে বাঁচে।'

চমির মাথার চুলগুলা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে খাড়া হইয়া উঠিল। থাকিও যদি এইরূপ কোনও শিকড় খাওয়াইয়া থাকে? যদি কেন, নিশ্চয় খাওয়াইয়াছে। নতুবা তেমন রাগী পুরুষটা কি এমন ভেড়া বনিয়া যায়? রূপ যৌবন? কিসের রূপ যৌবন! তাহারও ত এক সময়ে রূপ যৌবন ছিল; আর তাহা থাকির অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন ছিল না, বরং অনেকটা বেশীই ছিল। কিন্তু কৈ, তাহার মোহে স্বামী তো এমন ভেড়া বনে নাই; পান হইতে চূণটী খসিলেই অনর্থ বাধাইয়া দিত। কিন্তু এখন? নিশ্চয়ই কিছু খাওয়াইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে শেষে যদি পাগল হয়? বুঝি তাহার লক্ষণও একটু একটু দেখা দিয়াছে। এখন প্রায়ই একা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। এমন চুপ করিয়া তো কখনও থাকিত না। তবে কি সত্যই পাগল হইয়া যাইবে?

কথাটা ভাবিতেও চমির নিঃশ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। এ দিকে জগার মা 'গুণ্' সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও শ্রুত নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু সে সকল কথা চমির কাণে ঢুকিতেছিল না; সে শুধু স্বামীর পরিণাম-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্তব্ধভাবে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা খুড়ী, এর কি কাটান নাই?'

'কিসের কাটান?'

'এই "গুণ্" করার?'

'কাটান থাকবে না কেন? তবে সবাই কি জানে?'

'কে জানে?'

'রঙ্গপুরের চৈতন মালিক এক জন মস্ত গুণীন। সে নাকি সব রকম তুক্ তাক্ জানে।'

চমি ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। জগার মা তাহাকে

সম্বোধন করিয়া বলিল, 'দেখ্ চমি, কিছু মনে করিস না, আমার কিন্তু সন্দ হয়।'

রুদ্ধশ্বাসে চমি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি সন্দ হয় খুড়ী?'

জগার মা বলিল, 'থাকি ছুঁড়ী নিজ্জস্ গোরাকে "গুণ" করেছে। এ যদি না হয়, তবে আমি রূপো জেলের মেয়েই নই।'

একটা জোর নিঃশ্বাস ফেলিয়া চমি বলিল, 'আমারও তাই সন্দ হয় খুড়ী।'

জগার মা বলিল, 'তুই এক কাজ কর বাছা, একবার রঙ্গপুর যা। ভারী গুণীণ। কিছু করেছে কি না, সে গুণে ব'লে দিতে পারবে। আর যদি কিছু ক'রেই থাকে তারও কাটান দিতে পারবে।'

চমি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নেবে?'

জগার মা বলিল, 'বেশী কিছু নয়, পাঁচটা সুপারী, আর স'পাঁচ আনা পয়সা। তার পর ফল হ'লে খুসী হ'য়ে যা দিস্।'

'আচ্ছা দেখি' বলিয়া চমি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

সেই দিন বাজার হইতে ফিরিয়া অবধি চমি স্বামীর উপর তীব্র লক্ষ্য রাখিল, এবং তাহার প্রত্যেক কাজের মধ্যেই যেন একটা পাগলামীর আভাস দেখিতে পাইল। একবার গোরা হুঁকা হাতে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। চমি আস্তে আস্তে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছিস্ মাণ্‌কের বাপ?'

গোরা মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভাবছি, তোর মাথাটা কবে খাব?'

চমি বলিল, 'আমার মাথা তো অনেক দিনই খেয়েছিস্।'

ঘাড় নাড়িয়া গোরা বলিল, 'উঁহু, সে আমি নিজের মাথা খেয়েছি। একদিন তোর মাথার ঝোল রেঁধে আমাকে খাওয়াবি চমি?'

বলিয়া গোরা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই অর্থহীন হাসি দেখিয়া চমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! এ যে পাগল হইয়া পড়িয়াছে! চমির বুকটা গুর্-গুর্ করিতে লাগিল।

চার দিন চমি মাছ ধরিতে গেল না। সওয়া পাঁচ আনার পয়সা লইয়া ছেলেটাকে কোলে করিয়া রঙ্গপুর যাত্রা করিল। লোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল, 'ছেলেটার তরে দিগড়ের পঞ্চানন্দের ফুল আনতে যাচ্ছি।'

৬

জগার মা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো চমি?'

চমি বলিল, 'যা বলেছ খুড়ী, মস্ত গুণীণ। গুণে হু-বহু সব ব'লে দিলে। পানের সঙ্গে গুঁড়ো খাইয়েছে। তাই তো বলি, মিনসে এত করে কেন?'

সগর্ব্বে শিরঃসঞ্চালন করিয়া জগার মা বলিল, 'এই দেখ্, আমি তো ব'লেছি, ঐ ছুঁড়ীই তোর মাথা খেয়েছে। কিছু ওষুদপত্র দিলে?'

চমি বলিল, 'তিনটে শেকড় দিয়েছে। ভাতের সঙ্গেই হোক, কি তরকারীর সঙ্গেই হোক, খাওয়াতে হবে।'

ব্যস্তভাবে জগার মা বলিল, 'তবে আর কি, খাইয়ে দে। ও অকাট্টি ওষুদ। দেখবি, ঐ গোরা যদি তোর পায়ে লুটিয়ে না পড়ে, আমাকে খুড়ী ব'লেই ডাকিস্ নে।'

সলজ্জে হাসিয়া চমি বলিল, 'তোমার এক কথা খুড়ী।'

জগার মা হাসিয়া উঠিল। চমি বলিল, 'কিন্তু ভাবছি খুড়ী, কি ক'রে খাওয়াব? আমার ঘরে তো খায় না।'

জগার মা বলিল, 'তাতে কি? ছেলের জন্মতিথি কি এমনি একটা অছিলে ক'রে ওদের দু' মানুষকে নেমত্তন্ন কর্ না।'

খুড়ীর এই উপদেশ চমি শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

পর দিন চমি স্বামী ও সপত্নীকে নিমন্ত্রণ করিল। খুব সকালে উঠিয়া কয়েকটা বড় বড় চিংড়ি মাছ ধরিয়া আনিল; বাজার হইতে আলু পটোল কিনিয়া আনিয়া আড়ম্বরসহকারে রন্ধনের উদ্যোগ করিল।

রন্ধনশেষে চমি স্নান করিয়া আসিয়া এলো-চুলে ভিজা-কাপড়ে শিকড় তিনটা বাটিতে বসিল। শিলের উপর শিকড়গুলাকে ফেলিতেই হঠাৎ তাহার বুকটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এও তো একটা অজানা শিকড়, ইহার গুণ কি কে জানে! যদি ইহাতেই কোনও অমঙ্গল হয়, যদি এগুলা বিষাক্ত হয়? বাটিতে গিয়া চমি ভয়ে ভয়ে হাত গুটাইয়া লইল।

না না, চৈতন মালিক খুব ভাল গুণীন। সে কি না জানিয়াই ইহা দিয়াছে? ইহাতে নিশ্চয়ই থাকির ঔষধের গুণ কাটিয়া যাইবে। শুধু স্বামীর পাগলামীর ভয়ই দূর হইবে না, থাকি তাহার চোখের বিষ হইবে। যেমন তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তেমনই ফল পাইবে।

চমি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া জোরে জোরে শিকড়গুলা বাটিয়া ফেলিল, এবং সেই বাটা শিকড় লইয়া স্বামীর ঝোলের বাটীতে মিশাইয়া দিল।

৭

গোরা খাইতে বসিয়াছিল, চমি কম্পিতহস্তে তাহার পাতের কাছে ঝোলের বাটীটা ধরিয়া দিল। গোরা একটু হাসিয়া বলিল, 'তোর বেটার বিয়ে না কি মাণ্‌কের মা ?'

চমি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'না, বেটার বাবার বিয়ে।'

সহাস্যে গোরা বলিল, 'তোর সাথে বুঝি ?'

চমি হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া পাথরবাটীতে অম্বল ঢালিতে লাগিল। গোরা ঝোলের বাটীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'জোমড়ার খালের চিংড়ী বুঝি ? অনেক দিন তোর হাতের ঝোল খাই নি মাণ্‌কের মা, দেখি আজ কেমন রেঁধেছিস্।'

চমির বুকটা দুড়্ দুড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতে লাগিল। গোরা তখন এক গণ্ডূষ ঝোল লইয়া মুখের কাছে তুলিয়াছে। চমি পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। গোরা হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার উদ্বেগস্ফীত আরক্ত মুখের দিকে চাহিল।

স্বামীর হাতটা নিজের কম্পিত হস্তে ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চমি বলিল, 'সত্যি করে বল্ দেখি মিন্‌সে !'

বিস্ময়জড়িতস্বরে গোরা বলিল, 'কি বলবো মাণ্‌কের মা ?'

'চমি তোকে গুণ্ ক'রেছে ?'

গোরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল, 'তুই পাগল হ'য়েছিস ?'

উত্তেজিতকণ্ঠে চমি বলিল, 'আমি পাগল হই নি মিন্‌সে, তুই পাগল হ'তে ব'সেছিস্।'

'তোর মাথা' ! বলিয়া গোরা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। চমি তাহার হাতটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'থাম্, সত্যি বল্, তুই পাগল হবি না ?'

গোরা বলিল, 'তোর জ্বালায় বোধ হয় এবার হবো। হাত ছাড়, ক্ষিদের সময় ন্যাক্‌রা ভাল লাগে না।'

বলিয়া সে চমির হাত হইতে আপনার হাতটা ছিনাইয়া লইল, এবং হাসিতে হাসিতে পুনরায় ঝোলের বাটীতে হাত দিল। চমি দুই হাতে ধরিয়া ঝোলের বাটীটা তাহার সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইল, এবং বাটী সমেত ঝোলটা উঠানে

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। গোরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি চমি?'

চমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওতে ওষুধ মেশান আছে রে মিন্‌সে, ও ঝোল বিষ!'

বিস্ময়স্তব্ধকণ্ঠে গোরা বলিল, 'কে ওষুধ মেশালে চমি?'

চমি বলিল, 'আমি মিশিয়েছি। থাকি তোকে গুণ্ করেছে, তারই কাটান ওষুদ ওতে আছে। চুলোয় যাক্ ওষুদ, চুলোয় যাক থাকি, তুই ওঠ মিন্‌সে, আমার ঘরে তোর খেতে হবে না।'

বলিয়া সে গোরার হাত দুইটা ধরিয়া টানিতে লাগিল। গোরা তাহার উদ্বেগচঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'তা হচ্ছে না চমি, আজ থেকে তোর হাতে ছাড়া যদি আর কারও হাতে খাই, তবে আমি রামু খোড়য়ের ছেলেই নই। থাকি যদি আমাকে গুণ্ ক'রে থাকে, তবে সে গুণের কাটান তোর হাতেই আছে।'

চমি তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া পাতের কাছে বসিয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ওরে মিন্‌সে, তুই হাসছিস্ কি ক'রে! আমি যে তোকে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিলাম! আমাকে দু'ঘা মারলেও যে আমার শান্তি হয় রে মিন্‌সে।'

গোরা হাসিয়া বলিল, 'মারবো এবার যে দিন হাঁড়ী আলাদা করবি। এখন উঠে আর ঝোল থাকে তো দে। মুখে আগুন তোর, অমন বড় বড় চিংড়ী দু'টো নষ্ট করে ফেল্‌লি।'

চমি সকড়ী-হাতেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হাসিতে হাসিতে বাকী ঝোলটা গোরার পাতে ঢালিয়া দিল। গোরা হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'ও থাকি, আমাকে ওষুদ খাওয়াচ্ছে—দেখে যা।'

হাস্যোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে চমি বলিল, 'রেখে দে তোর থাকি! আমি কি আর তোর থাকিকেই ভয় করি, না তোকেই ডরাই রে মিন্‌সে? আমি আবার সেই চমি, সেই মাণ্‌কের মা!'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ।—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অঙ্কিত 'বাসন্তী উষা' নামক ছবিখানির বক্তব্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বাতায়নপথে উষার আলো দেখা যাইতেছে' অঙ্কনে পটুতার পরিচয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'শিবনাথ শাস্ত্রী' হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম,—'শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা। মানুষের ভালমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি খুব বড় শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে সঙ্কীর্ণভাবে কর্ত্তব্যনীতির চর্চ্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল, এই জন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয়। তিনি ছোট ও বড়, নিজের সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন একটি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস সমুজ্জ্বল ও সজীব ছিল, কোনো ছাঁচে ঢালাই করিয়া কঠিন আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন—মানববাৎসল্য হইতেই এই গল্প তাঁর মনে কেবলি জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর মিলন হইয়াছে সেখানে তার নানা ছোটবড় কথা নানা ছোটবড় ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মত তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে।' রবীন্দ্রনাথের 'একটি চাউনি' ও 'একটি দিন' উপভোগ্য। শ্রীআবদুল হকের 'বিড়াল' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসবে' তাঁহার উক্ত-নামধেয় নাটকের 'ভিতরের কথাটি' বুঝাইয়াছেন। ষ্টেড্ নিজে তাঁহার নিজের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইহা নূতন। (১) 'বাংলা কথ্য ভাষা', (২) 'উদ্যোগশিক্ষা', (৩) 'শারদোৎসব', (৪) 'প্রতিশব্দ', (৫) 'মিলনের সৃষ্টি', (৬) 'বিদ্যাসমবায়', (৭) 'শান্তিনিকেতনের মন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ', (৮) 'অনুবাদচর্চ্চা', (৯) 'তেল আর আলো', (১০) 'মনোবিকাশের ছন্দ', (১১) 'আহারের অভ্যাস' ও (১২) 'শীলগ্রহণ' রবীন্দ্রনাথের রচনা, বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের 'শান্তিনিকেতন' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী' সুতরাং 'শান্তি-নিকেতনে'র দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইয়াছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাঁতারে' অনেক তথ্য আছে। তাঁহার 'দেশের কথা'ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'বুড়া-শিব' পড়িয়া বুঝা যায়, 'কাব্যি'ও বুড়াশিব হইয়া থাকে, তাহারও ভীমরথি হয়। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'বিলাতে যুদ্ধকার্য্যে ভারতবাসী' আমরা সকলকে পড়িতে বলি।

ব্রহ্মবিদ্যা। সর্ব্বপ্রথমে জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র';—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় 'অনূদিত' বলা যায় না—'আনীত', বা ব্যাখ্যাত। 'উহি যব নিমজল বেদ!' জয়দেব বুঝা যায়, কিন্তু 'উঁহি' ও 'নিমজল'? নিমজল—নিমজ্জিত হইয়াছিল? আমরা জানিতাম, বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারিশ ময়দা; অকুতোভয়ে, অসঙ্কোচে ও অনায়াসে থাসিবার বস্তু। কিন্তু সেই থাসা ময়দা যে রবারে পরিণত হইতে পারে, ভুজঙ্গবাবু তাহা বুঝাইয়া দিলেন! ইহা ভাষা-রাসায়নিকের নূতন আবিষ্কার। 'নোবেল প্রাইজে'র যোগ্য। 'তরণ-জেল জমু' কি? হীরেন্দ্রনাথ এই স্তোত্রের টীকা দিলেন না কেন? দ্বিতীয় স্তবকে আছে —'বিপুল ভুজজয়'। ইহা ভুজঙ্গ-কূট। 'রাবণ ঘাতলি', অর্থাৎ, রাবণকে হত্যা করিলি! 'ঘাতলি' শুনিয়া মাইকেলও সমাধিগর্ভে নড়িয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। 'ত্রিভুবন গরসল।' অর্থাৎ, গ্রাস করিল! যখন 'গ্রাসিল' হয়, তখন 'গরসল' হইবে না কেন? 'গাহন করলসি!' 'করলসি' অর্থাৎ করিলি! ইহা ভৌজঙ্গ শব্দ-তাসের টেক্কা! বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা কবিতার ভাগ্যে কি আছে, বলা দুষ্কর। 'হংস', 'নূতন মাপের কথা' প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের জন্য, সাধারণ পাঠকের অনধিগম্য।

নারায়ণ। অগ্রহায়ণ।—'নারায়ণ' এই সংখ্যায় ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। 'সম্পাদকের নিবেদনে' দেখিতেছি,—'এই পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবীদের নিকট বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া আসিতেছি।' সে 'আদর্শ ও উদ্দেশ্য' নিশ্চয়ই 'নিহিতং গুহায়াম্।' সে আদর্শের ও সেই উদ্দেশ্যের সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিলে ভাল হইত। গত পাঁচ বৎসর 'নারায়ণ' সাধারণ মাসিকের পথেই বিচরণ করিয়াছে; পাঁচ ফুলে সাজি সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহার তথাকথিত 'আদর্শ ও উদ্দেশ্য' সুস্পষ্টরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে—প্রতিষ্ঠিত না হউক—উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছে, এমন ত মনে হয় না। আমরা ত 'সে আদর্শ ও উদ্দেশ্যে'র কোনও ধারণাই করিতে পারি নাই। শেষ দুই বৎসর আমরা শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর কোনও কোনও 'আদর্শের ও উদ্দেশ্যে'র পরিচয় পাইয়াছি। তাহাই কি 'নারায়ণে'র 'আদর্শ ও উদ্দেশ্য'?—বলিতে পারি না। 'সম্পাদকের নিবেদন'ও গিরিজা-গন্ধি। সম্পাদক বলিতেছেন,—'তথাপি আশা হয় এ মোহ কাটিবে, বাঙ্গলা একদিন তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। বাঙ্গালী তাহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া,—জীবনে ও সাহিত্যে নব নব রূপের সৃষ্টি করিতে পারিবে।' তাঁহার এই আশা সফল হউক। তাহার পর, 'কৃত্রিমতা ও সর্ব্ব প্রকার পরানুকরণের মোহ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে, আমাদের জীবনকে বিষে জর জর করিয়া দিয়াছে। বিষ পরিপাক হয় না পাশ্চাত্যের বিষ আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।' পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বেও আমাদের জীবনে 'কৃত্রিমতা ও সর্ব্বপ্রকার পরানুকরণের মোহ' না ছিল এমন নহে। তখনও ছিল, এখনও আছে; ভবিষ্যতেও থাকিবে; অন্ততঃ থাকিতে পারে জাতির বা সাহিত্যের জীবন সে আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্ম-ভাবের আধা হইয়াছে; যুগে যুগে নব নব আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যও স্বাভাবি নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চরিতার্থ হইবে, এ আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নহে। কিন্তু, 'কৃত্রিম

ও পরানুকরণের মোহ' ভিন্ন আর এক প্রকার ভীষণ বিষে 'আমাদের জীবনকে জর-জর করিয়া দিয়াছে।' তাহা কামের বিষ। 'নারায়ণ' স্বয়ং সেই বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন; বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে সেই বিষে জর্জ্জরিত করিয়া প্রত্যবায়ভাজন হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও এই বিষের ক্রিয়া চলিতেছে। 'নারায়ণ' সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, সেই বিষের প্রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে, 'বাঙ্গালী * * * জীবনে ও সাহিত্যে নব নব রূপের সৃষ্টি করিতে পারিবে।' কাম-কূপের মণ্ডূক কুৎসিত ভিন্ন আর কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। 'নারায়ণ' সে পথ পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেকে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। নারায়ণ সেই কামকলুষ দূর করুন। তাহাই তাঁহার 'আদর্শ ও উদ্দেশ্য' হউক। যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি সম্ভব ও স্বাভাবিক। সম্পাদকের নিবেদনে দেখিতেছি—'এই শ্রেণীর সাহিত্য ও জীবনকে * * * প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করি নাই, ভীতও হই নাই।' সাধু। কিন্তু ভাবের 'পরানুকরণের মোহে'র ন্যায় ভাষারও পরানুকরণের মোহ আছে। উদ্ধৃত অংশে তাহার উদাহরণ সুস্পষ্ট। 'জীবনকে প্রতিবাদ' পলাশীর যুদ্ধের পরের সৃষ্টি; 'মিষ্ককে ব্যবহারে আনিও'র ভায়রাভাই। 'জীবনের প্রতিবাদ' বাঙ্গালা। 'জীবনকে প্রতিবাদ 'বংলু'! অবশ্য, যাহা বাঙ্গালা, তাহা ব্যাকরণের অনুসারী, অতএব পরবশ। যাহা 'বংলু', তাহা মৌলিক ও আত্মবশ! কিন্তু 'কৃত্রিমতা ও পরানুকরণের মোহ' ত্যাগ করিয়া 'নব নব রূপের সৃষ্টি' করিতে হইলে, খাঁটী ও স্বদেশী ও অকৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান চাই। ফেরঙ্গ 'বংলু' আর যাহাই হউক, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' এই সংখ্যায় শেষ হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বেণের মেয়ে' বিশেষত্বে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। শ্রীরেবতীমোহন সেনের 'ঠাকুর হরিদাস' উপাদেয় নিবন্ধ। ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর 'রোয়াইল—ঢাকা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীগিরিবালা দেবীর 'গৌরী' নামক তথাকথিত গল্পে দেখিতেছি,—'প্রভাতপদ্মের মত প্রফুল্ল মুখখানিতে কালিমা বেষ্টিত হইয়াছে।' কালিমা 'বেষ্টিত'? শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রবন্ধে আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও তাহার বর্ত্তমান সুযোগ্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' কিন্তু বাঙ্গালা পুঁথির সম্পাদন সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে ভবিষ্যতে প্রমাদের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইতে পারে। উপসংহারে ভট্টশালী লিখিয়াছেন,—'এই পাঠোদ্ধারে দীনেশ বাবু এমন স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই দুই খণ্ড পুস্তক যে একেবারে বাতিল হইয়া যাইবে,—শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দীনেশ বাবু যে বাধা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন, প্রাকৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের শতাব্দ-ব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টায়ও তাহা সম্যক্ দূর হইবে কি না সন্দেহ! বস্তুতঃ এই বিপুলকায় দুইখণ্ড পুস্তক আধুনিক কালের অসতর্ক, দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য, অবৈজ্ঞানিক সম্পাদনের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ যাইয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট পৌছিবে। আরাম-কেদারায় শুইয়া প্রত্নচর্চ্চার চেষ্টা এবং একদিনে প্রাসাদ-নির্ম্মাণের প্রয়াস পরিত্যক্ত না হইলে বাঙ্গালা দেশের প্রত্নচর্চ্চার প্রয়াস বঙ্কিম-বর্ণিত শিমুল ফলের দশা কখনও অতিক্রম করিবে

পারিবে না। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা বারান্তরে করিব, বাসনা রহিল।' বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার প্রশংসাপত্র বটে। 'দীনেশবাবুর বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে'র যে আলোচনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে হইয়া গিয়াছে, এবং তদুপলক্ষে যে পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা কি জনসাধারণের অগোচরই থাকিবে? শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর 'কালিদহে' পড়িয়া আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিতার সৌরভও আছে, গৌরবও আছে। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' অনন্ত প্রবন্ধ। এবার 'ব্রাহ্মসমাজে ত্রিমূর্ত্তি' 'প্রকট' হইয়াছে। গিরিজা-শঙ্কর মহর্ষিকেও ক্রমে অসহ্য করিয়া তুলিলেন। এই 'আদর্শ ও উদ্দেশ্য' পরিত্যাগ করিলে, অন্ততঃ স্বতন্ত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ হইলে, মাসিকের পাঠক নিশ্চিন্ত ও উপনিষদের ভাষায় 'অভীঃ' হইতে পারেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার 'কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা' চলনসই রচনা। কবির প্রতিভার বিশ্লেষণে যে শক্তি আবশ্যক, বর্ত্তমান রচনায় তাহার পরিচয় নাই। 'উপন্যাস-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কিরণময়ী' প্রবন্ধে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্বল্পপরিসরে যে বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। ইহা বাদ-প্রতি-বাদের আলোচনা। বাদ ও প্রতিবাদ আমরা পড়ি নাই। কিরণময়ী বস্তুতন্ত্রহীন কি না, তাহারই বিশিষ্ট বিচার। কিন্তু বস্তুতন্ত্র কি?

জার্ম্মাণীর যৎকিঞ্চিৎ।

শ্রীরামচন্দ্র প্রবল অত্যাচারী রাক্ষস নৃপতি রাবণকে সবংশে পরাজিত করিয়াও মৃত্যুশয্যাশায়ী রাবণের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পদদলিত, মৃত্যুমুখ শত্রু হইতেও শিক্ষণীয় বিষয় জানিয়া লইতে হিন্দুদের কোন কালেই আপত্তি নাই। যে পন্থা অবলম্বন করিয়া শত্রু প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল, যে নীতি ও যে শৃঙ্খলায় দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় হইতে চলিয়াছিল, তাহার পতনসময়ে তাহা জানিতে পারিলে, অবজ্ঞা করা সমীচীন নহে। চারি বৎসর পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া জার্ম্মাণী আজ মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, এমন কি, স্বাধীনতা লুপ্ত হইলেও, বাণিজ্য-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পুনরায় লুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিবে, এই ভয়ে ইংরাজ শিল্পিগণ পর্য্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। "রাসায়নিক শিল্প-সমিতি"র বার্ষিক অধিবেশনে প্রায় সকল বক্তাই গভমেণ্টকে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে-জার্ম্মেণ যুদ্ধের পর যখন রাজনীতিবিশারদ বিস্মার্ক জার্ম্মেণ সাম্রাজ্য সংগঠন করেন, তখন জার্ম্মেণী একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপরই নির্ভর করিত। বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ লোক তখন কর্ম্মানুসন্ধানে জার্ম্মেণীর বাহিরে যাইতে বাধ্য হইত। এমন কি, ১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬ লক্ষ লোক জার্ম্মেণী পরিত্যাগ করে। কিন্তু তৎপরে স্রোতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। পরবর্ত্তী ১০ বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ লোক নানা কর্ম্ম উপলক্ষে জার্ম্মেণীতে আসিয়া অধিবাস করে। নিত্য নব শিল্পের অবতারণায়, সহস্র সহস্র কর্ম্মপ্রার্থীর কর্ম্মসঙ্কুলান হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে এক একটী শিল্পকেন্দ্র সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া উঠে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জার্ম্মেণী যে শিক্ষাপ্রণালী ও সুশৃঙ্খলার দ্বারা সমগ্র দেশের নরনারীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, যে শিক্ষার ফলে অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, আজ সেই শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে এ স্থানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জার্ম্মানীতে বালক বালিকা সকলকেই ৬ বৎসর কাল হইতে ১৪ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মোট আট বৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়। বিদ্যালয়ের ব্যয়-বহনে অক্ষম বালকগণ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে (volk school) ভর্ত্তি হওয়ার অনুমতি পায়। সাধারণতঃ প্রতি সহরেই এক বা ততোধিক অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে। ব্যয়ভারবহনে সমর্থ বালকদিগের জন্য "জিম্‌নাশিয়া" (Gymnasium) নামক বিদ্যালয় আছে।

যেখানে অবৈতনিক শিক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক, সেখানে অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেই "জিম্‌নাশিয়া"র কয়েক বর্ষ পাঠোপযোগী শ্রেণী থাকে। জিমনাশিয়া হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার "বিদ্যালয়-পরিসমাপ্তি"র (school final) পরীক্ষা দিতে হয়। অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে "জিম্‌নাশিয়া"য় ভর্ত্তি হইলে ২।১টি অতিরিক্ত বিষয় নিজে শিক্ষা করিয়া লইতে হয়। "অষ্টবর্ষব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা" ও "জিমনাশিয়া"র শিক্ষায় অনেক প্রভেদ আছে। প্রথমোক্তটিতে অল্পসময়ে বালকদিগকে একটু অধিক কর্ম্মঠ করার বন্দোবস্ত আছে। শেষোক্তটিতে অনেকগুলি নূতন পুরাতন ভাষা ও সমস্ত বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া ছাত্রদিগের মনে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয়।

অবৈতনিক বিদ্যালয়ে জার্ম্মেণীর ইতিহাস, জার্ম্মেণীর ভৌগোলিক বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, খনিতত্ত্ব, গণিত, পরিমিতি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও অপরাপর অত্যাবশ্যক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে পরিভ্রমণ ও কারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। চিকিৎসক দ্বারা প্রতিমাসে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান হয়। কোনও বালক রীতিমত পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে পাইতেছে না বলিয়া শিক্ষকের সন্দেহ হইলে, কিংবা চিকিৎসক অভিযোগ করিলে, শিক্ষক অভিভাবকের কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন অভিভাবকের দণ্ড হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবশ্য বিচারকালে অভিভাবক তাহার আর্থিক অক্ষমতা প্রতিপাদন করিতে পারিলে বালকের জন্য পথ্যের ব্যবস্থা সকল কর্ত্তৃপক্ষই করিতে বাধ্য। তজ্জন্য দেশব্যাপী সভাসমিতিরও অভাব নাই। গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই প্রতি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতে, স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তন যাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেরূপ ছাত্রদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া,

তজ্জন্য গঠিত সমিতির নিকট প্রেরণ করেন। শারীরিক অবস্থাভেদে স্থান নির্ব্বাচিত হইলে, এক এক জন শিক্ষক সমভিব্যাহারে ছাত্রগণ যথাস্থানে প্রেরিত হয়। এরূপ স্থলে জার্ম্মেণীর সকল প্রদেশের ষ্টেট্ রেলওয়েই বিনা ভাড়ায় তাহাদের যাতায়াতের অনুমতি দিয়া থাকে। শিশুগণ মাতৃহীন না হইলে তিন যোড়া মোজা ও তিনটা শার্ট লইয়া যাইতে বাধ্য। স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তন তিন সপ্তাহের জন্য হয়। নূতন স্থানে যাইয়া ছাত্রগণ শিক্ষকের সঙ্গে মাঠে, পর্ব্বতে, বা সমুদ্রে, নৌকাতে পরিভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়া থাকে।

"জিমনাশিয়া"র ছাত্রদের পক্ষেও এই নিয়ম। কিন্তু তাহাদের ব্যয়ভার নিজেদেরই বহন করিতে হয়।

"জিমনাশিয়া" তিন প্রকার। তিনটিতে পাঠ্যের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কাজেই তিন প্রকার "স্কুল-সমাপ্তি"র সার্টিফিকেট হয়। মোটের উপর তিন প্রকার বিদ্যালয়ের যে কোনটির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া যায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সময়ে যে যে বিষয় গ্রহণ করা হইবে, সেই সেই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রগণের জিমনাশিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়। এক শ্রেণীর জিমনাশিয়াতে সাহিত্য, গ্রীক, ল্যাটিন, ইতিহাস ইত্যাদি, অপরটিতে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ ও বিজ্ঞান, এবং তৃতীয়টিতে দুইএর সংমিশ্রণ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। নয় বৎসর শিক্ষালাভের পর একটি পরীক্ষা আছে। তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণ সৈনিক বিভাগে একবর্ষব্যাপী স্বেচ্ছা-সেবার অনুমতি পায়; এই জন্যই এই পরীক্ষা এক-বর্ষব্যাপী স্বেচ্ছা-সেবার পরীক্ষা বলিয়া কথিত হয়।

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ নিজ ব্যয়ে, এমন কি, অশ্বারোহী বিভাগে ভর্ত্তি হইলে নিজের ঘোড়ার ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিয়া, একবৎসর কাল স্বেচ্ছা-সেবা করি-লেই, বাধ্যতামূলক যুদ্ধশিক্ষার নিদর্শনপত্র পায়। কিন্তু অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে এবং যৎসামান্য পকেট-খরচ পাইয়া তিন বৎসর স্বেচ্ছা-সেবা করিতে বাধ্য। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, যুদ্ধশিক্ষার্থী সকলে কেবল বন্দুক কামান চালান শিক্ষা না করিয়া, অনেকে যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পাদি শিক্ষা করে। এতদ্ব্যতীত কেহ দর্জ্জি, কেহ সূত্রধর, বা রাজমিস্ত্রী হইয়াও বাহিত হয়।

একবর্ষব্যাপী স্বেচ্ছা-সেবার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার তিন বৎসর পরে "স্কুল-সমাপ্তির পরীক্ষা"।

জিমনাশিয়ায় শিক্ষাকালে ছাত্রদিগকে কঠোর নিয়ম পালন করিয়া শৃঙ্খলামত চলিতে হয়। এ সময় ছাত্রদের কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকে না।

ভিন্ন ভিন্ন জিমনাশিয়ায় ছাত্রগণের ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোষাক থাকে। ছাত্রগণ এই পোষাক পরিধান না করিয়া কখনও বাহির হইতে পারে না। পোষাক দ্বারা স্থানীয় পুলিস, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিদর্শন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কোন্ ছাত্র কোন্ বিদ্যালয়ে সংস্থষ্ট, তাহা জানিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণের সঙ্গেও একখানা নিদর্শন কার্ড থাকে। নিদর্শন কার্ড সঙ্গে না রাখা অপরাধবিশেষ। স্কুলের বাহিরে আইন-বিরুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিলে ছাত্রদের নিদর্শন কার্ড হইতে নাম, নম্বর সংগ্রহ করিয়া স্কুল-কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিলেই স্কুলে তাহার বিচার হইয়া থাকে। নিতান্ত গর্হিত অপরাধের জন্যও কোনও পুলিস ছাত্রদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে না। ছাত্রগণের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ। স্কুলের বিশেষ পোষাক পরিয়া তামাক, চুরুট ক্রয় করিতে গেলে, কোনও ব্যবসায়ী বিক্রয় করিতে পারে না। কোন্ বর্ষের ছাত্রগণ কোন্ কোন্ সময়ে সহরে বাহির হইতে পারিবে, তাহাও স্কুল-কর্তৃপক্ষ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। সাধারণতঃ শীতকালে সকাল ৭টায় ও গ্রীষ্মকালে ৬॥টায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার নিয়ম। ছাত্রগণ স্ব স্ব প্রাতরাশের জন্য রুটী, মাখম প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। ৯টার সময় প্রাতরাশের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা বিরাম থাকে। তৎপরে একটা পর্য্যন্ত শিক্ষা কার্য্য চলিতে থাকে। একটার পর ছাত্রগণ মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য বাড়ী যায়। অপরাহ্নেও পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের ছাত্রদিগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষকের নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা (Coaching) লইতে হয়; অথবা শিক্ষকের সঙ্গে স্থানীয় মিউজিয়ম, প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, কল, কারখানা ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে হয়। ছাত্রগণ এই ভাবে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকলে শিক্ষা লাভ করে। এই প্রকার দৈনিক কার্য্যসম্পাদনের উপরই বার্ষিক শ্রেণী-পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। অনেক ছাত্র ১০।১২ টা বিষয়ের মধ্যে কেবল দুই তিনটা মাত্র বিষয়ের পরীক্ষা দিয়াই শ্রেণী পরিবর্ত্তন করিতে পারে। আবার যাহাদের দৈনিক কার্য্যসম্পাদন শিক্ষকগণের অভিপ্রায়োপযোগী হয় নাই, তাহাদের সকল বিষয়েই পরীক্ষা দেওয়া

আবশ্যক হয়। ৯ম বর্ষের "একবর্ষব্যাপী স্বেচ্ছা-সেবা"র পরীক্ষা ও ১২শ বর্ষের "স্কুল-পরিসমাপ্তি"র পরীক্ষা, গভর্মেণ্ট নিযুক্ত প্রাদেশিক স্কুলে পরিদর্শকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এ সকল বিদ্যালয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এক দিকে বিদ্যালয়ে যেরূপ ছাত্রদিগকে কঠোর নিয়ম এবং বিশেষ সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার অধীন হইয়া চলিতে হয়, অপর দিকে ছাত্রগণ স্কুল-পরিসমাপ্তির পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ মুক্ত। তখন কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে যাইয়া যে যে বিভাগে অধ্যয়ন করিবে, সে সেই বিভাগের ২।১ জন অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিবার নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা জমা দিলেই ছাত্রত্ব বজায় থাকে। অধ্যাপকদিগের হাজিরা-কিতাব নাই। কাজেই বক্তৃতা শুনিতে কে আসিল কে, না আসিল, তজ্জন্য কোন বাঁধাবাঁধি নাই। কিন্তু উপাধিলাভের জন্য পরীক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলি যত সময়েই হউক শেষ করিতে হইবে। বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গেলেও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে কোন পরীক্ষায়ই উপস্থিত হইবার অধিকার পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী পরীক্ষা আছে,—শিক্ষকতার পরীক্ষা ও উপাধিলাভের পরীক্ষা।

শিক্ষকতা-পরীক্ষাটী উত্তীর্ণ হইলেই গভর্মেণ্ট স্বয়ং তাহার কর্ম্মসংস্থান করিতে বাধ্য। এই পরীক্ষায় অনেকগুলি বিষয় থাকে—কিন্তু কোনও একটী বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের সিভিল সার্ব্বিসের মত, উত্তীর্ণ হইলেই কর্ম্মসংস্থান হয় বলিয়া পরীক্ষাটী বিশেষ জটিল। শিক্ষাদানপ্রণালী, সর্ব্ব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ইতিহাস, এই চারিটী বিষয় বাধ্যতামূলক। এতদ্ব্যতীত পরীক্ষার্থিগণের নিজ নিজ অভিপ্রায়মত আরও অন্ততঃ ৪টী বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে দুইবার করিয়া গ্রহণ করে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ তৎপরে অল্প মাহিনায় এক বৎসর কাল শিক্ষানবীশী করিয়া 'জিমনাশিয়া' প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হয়। উপাধিপরীক্ষায় একটী বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ ও Practical works ছাড়াও কোনও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের অধীনে রীতিমত কিছুদিন কার্য্য করিতে হয়।

শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইলে প্রাথমিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পরীক্ষার্থিগণ স্বাধীনভাবে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানে সমর্থ বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক তাহাকে কোনও বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ছাত্রগণ নির্দ্ধারিত বিষয়ে যাবতীয় গ্রন্থাদি ও পত্রিকাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তৎপরে স্বাধীনভাবে নিজ তত্ত্ব আবিষ্কারে মনোযোগী হয়। এ সময় কঠোর পরিশ্রম ও অতিশয় বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য-চালনা আবশ্যক, নতুবা সমুদয় শ্রম উপাধিলাভের পক্ষে বিফলও হইতে পারে। কার্য্য সম্পন্ন হইলে "তত্ত্ব" বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এক সব্ কমিটী গঠন করিয়া কমিটীর হস্তে "তত্ত্ব"টী বিবেচনার্থ প্রদান করে। "তত্ত্ব" সম্পূর্ণ নূতন হওয়া আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে কোনও ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, অথবা কোনও পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হইয়া থাকিলে, কিংবা অন্ততঃ কোনও সভা সমিতিতে পঠিত হইয়া থাকিলেও, উপাধির জন্য গৃহীত হয় না। "তত্ত্ব"টী দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার কথঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইল বলিয়া মনে হইলে উপাধিপ্রার্থীর তত্ত্ব গৃহীত হইবে। এ দিকে অধ্যাপকও এই তত্ত্বটী একমাত্র উপাধিপ্রার্থী স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া নিদর্শনপত্র দিবেন। তত্ত্ব গৃহীত হইলে, প্রার্থীর স্কুল-পরিসমাপ্তির নিদর্শন অথবা বিদেশীর পক্ষে বি, এ, বা বি এস্ সির নিদর্শন থাকিলে ও প্রার্থী অন্যূন সাড়ে তিন বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হইলে, উপযুক্ত ফিস্ লইয়া তাহাকে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে আহ্বান করা হয়। সাধারণতঃ যে বিষয়ে "তত্ত্ব", সেই মূল বিষয়ে অনধিক এক ঘণ্টা ও সঙ্গের অপর তিনটী বিষয়ে অনধিক আধ ঘণ্টা মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার সময় সেই ফ্যাকল্টীর সকল অধ্যাপকই উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। "উপাধিপ্রার্থী" বিশেষ পোষাক পরিধান করিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, একই দিনে ক্রমে চারিটী বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া যায়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ফ্যাকল্টীর ডেকান, পরীক্ষকগণ ও দর্শক ভাবে কোনও অধ্যাপক উপস্থিত হইলে, তিনি সকলের করমর্দ্দন করিয়া "বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত" করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে তত্ত্বটী নিজ ব্যয়ে অন্ততঃ ৩০০ খণ্ড মুদ্রিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত ৩০০ খণ্ড হইতে জার্ম্মেণীর সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রেষ্ঠ

পাঠাগার এবং পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করিয়া অন্ততঃ আট সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করেন। ইতিমধ্যে উক্ত "তত্ত্বে"র মৌলিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ না হইলে, উপাধিপ্রার্থীকে "উপাধি-ভূষিত" করা হয়। যেমন উপাধি লাভ করিল, অমনই সম্মানার্হ হইল, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, কোনও অধ্যাপকের সঙ্গে অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর সহকারী ভাবে থাকিতে হয়। তৎপরে বিশেষ কোন কৃতিত্বপূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারিলে, এবং সেই "তত্ত্ব" ফ্যাকল্টীর সকল অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, তাহাকে বিনা মাহিনায় "উপদেশক"-রূপে গ্রহণ করা হয়। উপাধি-লাভের জন্য যে তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়, তাহাকে Dissertation ও অধ্যাপক-শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য প্রকাশিত তত্ত্বকে Habituation বলে। "উপদেশক"-ভাবে থাকিবার কালে তাহার বিশেষ বক্তৃতার জন্য যে ফি আদায় হয়, তাহা উপদেশকের প্রাপ্য; এতদ্ব্যতীত সমুদয় প্রবীণ অধ্যাপকদিগের বক্তৃতার ফিসের শতকরা কতক টাকা এই নবীন "বক্তা"দিগকে দেওয়া হয়। এই শ্রেণীতে থাকিবার কালেও গভর্মেণ্ট হইতে "অধ্যাপক" উপাধি লাভ করা যাইতে পারে। "বক্তা" শ্রেণী হইতে অধ্যাপক-শ্রেণী, এবং অধ্যাপক হইতে সাধারণ অধ্যাপক (ordinarius) হওয়া সময়সাপেক্ষ।

কৃতিত্ব না দেখাইয়া কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীর মৃত্যুতে পরবর্ত্তীর উন্নতিলাভ জার্ম্মাণীতে সম্ভবপর নহে। এ দিকে আবার উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও শিক্ষকতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ "জিমনাশিয়া" প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে পারে না। উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ যেমন উপাধি লাভ না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতে পারে না, উপাধিপ্রাপ্তগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারিলেও, শিক্ষক হইতে পারে না।

প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্র ও অধ্যাপকগণের ভিন্ন ভিন্ন সমিতি আছে। সমিতিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সমিতির প্রতিনিধিগণের বিশ্ববিদ্যালয়-চালনা কার্য্যেও অনেকটা কর্ত্তৃত্ব আছে। অবস্থাপন্ন ছাত্রগণ এরূপ কোনও সমিতির সংস্পৃষ্ট না থাকা বিশেষ সম্মানের বিষয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন সমিতির সভ্যগণ নিজ নিজ পোষাক পরিধান করিতে বাধ্য। এই সমিতিগুলি রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার এক একটি কেন্দ্র-

স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় চতুর্থাংশ ছাত্র নানারূপ সমিতিতে যুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ছাত্রগণ কোনও সমিতির বন্ধনে আবদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদিগকে "মুক্ত-ছাত্র" (free students) বলে। এই মুক্ত ছাত্রগণের স্বার্থরক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর সকলকে লইয়া একটি "মুক্ত-ছাত্র-সমিতি" গঠন করেন। তাহাদের প্রধিনিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়-চালনা কার্য্যে যোগদানের জন্য আহূত হয়। রেক্টরের যত্নে তাহারা নানা প্রকার ক্রীড়া, কৌতুক, পরিভ্রমণ ও কল কারখানা দর্শনের সুযোগ পায়। তাঁহারা একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকাও পরিচালনা করেন। জার্ম্মেণীতে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে কোনও বোর্ডিং নাই। অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে চিকিৎসার ব্যয় গভর্মেণ্ট বহন করেন, কিন্তু জিমনাশিয়ার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-দিগকেই "পীড়ার তহবিল-"(krankenkasse)-এ কিছু কিছু চাঁদা দিতে হয়। কখনও পীড়া হইলে "পীড়িত-তহবিলে"র পক্ষ হইতে চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষা করিয়া হাঁসপাতালে দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা না করিলে, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যান। পীড়িত ছাত্র যে কোনও ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য আনয়ন করিতে পারে। ঔষধালয় "পীড়া-তহবিল" হইতে মূল্য আদায় করে।

কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা—

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষালাভের পর ছাত্রগণ কোনও ব্যবসায় বাণিজ্যে শিক্ষানবীশী করে, কিংবা জীবিকা-উপার্জ্জনের পন্থা শিক্ষার জন্য কোনও শিল্পবিদ্যালয় কিংবা ব্যবসায়-শিক্ষার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়।—বিনা শিক্ষায় কোনও ব্যবসা হয় না। ভৃত্যকেও ভৃত্যবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া নিদর্শন-পত্র সহ কর্ম্ম সংস্থান করিতে হয়। নিয়মিত ভাবের হস্তশিল্পবিদ্যালয় (Hand working school), প্রাথমিক মধ্য টেক্‌নিকেল স্কুল, পলিটেক্‌নিক ও হাইয়ার টেক্‌নিকেল স্কুল সর্ব্বত্রই আছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের সংস্রবে বহুবিধ শিল্পবিদ্যালয় আছে। শর্করা-রসায়ন বিদ্যালয়, কাগজ ও সেলোলয়েড শিল্প-বিদ্যালয়, রঞ্জক ও সূচীকারকদের বিদ্যালয়, সাবান ও চর্ব্বি শিল্পের বিদ্যালয় ইত্যাদি। মোটের উপর কি কি শিল্পের বিদ্যালয় আছে না বলিয়া, কি কি শিল্পের বিদ্যালয় নাই, তাহা বরং ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এই সকল বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী শিল্প অতি অল্প সময়ে অতি সুন্দর ভাবে শিক্ষা হয়। অবৈতনিক

শিক্ষায় শেষোক্ত সকল শিল্পবিদ্যালয়ে ও মধ্য টেকনিকেল স্কুলে পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হওয়া যায়। পলিটেকনিকে প্রবেশ করিতে একবর্ষব্যাপী স্বেচ্ছা-সেবার পরীক্ষা এবং হাইয়ার টেক্‌নিকেল স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ ও উপাধি দান করিতে পারে বলিয়া "স্কুল-সমাপ্তির নিদর্শন" আবশ্যক হয়।

বাধ্যতামূলক শিল্পশিক্ষা—

বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যতীত অন্ধ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি অঙ্গহীনগণ পাছে সমাজের গলগ্রহ হয়, এজন্য বার্ষিক অন্যূন তিন সহস্র মার্ক (এক মার্ক ৮৹ আনা ধরা যায়) আয় আছে—সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, এই শ্রেণীর লোক কোনও একটা শিল্প বা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে বাধ্য।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা অবসানপ্রায়। কাজি সাহেব ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট; তাঁহার সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে চোপ্‌দার, পেয়াদা ও শিপাহীগণ দণ্ডায়মান। তাঁহার এক পার্শ্বে একটু দূরে ন্যায়রত্ন ও তাঁহার কন্যা আসামীর বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকল লোকই এই মামলার বিচার দেখিতে আসিয়াছে। বিচার-ফল জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠাকুল,—তাহাদের অনেকেই কাজি সাহেবের অন্য পার্শ্বে বসিয়াছিল; চাষারা দল বাঁধিয়া তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল। বিচারসভা নিস্তব্ধ, যেন মূকের সভা!

সেই সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ 'হটো-হটো' শব্দ হইল, চারিদিকে সহসা যেন চাঞ্চল্যের স্রোত বহিয়া গেল। অনেকে সরিয়া গিয়া পথ ছাড়িয়া দিল; ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য অনেকে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। এই মামলার ফরিয়াদী তালুকদার বিজয় দত্ত তাঁহার সম্ভ্রমোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, তাঁহার পরিচারিকা রমণীকে সঙ্গে লইয়া বিচারসভায় প্রবেশ করিলেন। রমণীকে কিছু দূরে রাখিয়া বিজয় দত্ত কাজিসাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করিলেন।

বিচার আরম্ভ হইল; কাজি সাহেবের ইঙ্গিতে রমণীকে তাঁহার সম্মুখে

আনিয়া হলফ্ দেওয়া হইল। রমণী অশিক্ষিত নীচবংশীয় স্ত্রীলোক, বোধ হয় পূর্ব্বে কখন তাহাকে কোন মামলায় সাক্ষ্য দিতে হয় নাই, সে যাহাতে ঘাব্ড়াইয়া না যায়—এজন্য তালিম দেওয়ার ক্রটী হয় নাই; সুতরাং সে হলফ্ লইয়া কাজি সাহেবের শ্মশ্রুবহুল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিলক্ষণ অপ্রতিভভাবে বলিল, "আমাকে যে দিব্যি কর্‌তে বল্‌বা, আমি তাই কর্‌বো, চোখের মাথা খাই যদি মিথ্যে বলি।"

কাজি বলিলেন, "তুই তালুকদারের হারেমের—কি ব'লে অন্দরের বাঁদী?" রমণী তাহার ঘোমটা ইঞ্চি দুই সম্মুখে টানিয়া বলিল, "আমি হারামের বাঁদী হ'তে যাব কোন্ দুখে? আমি গিন্নিমার ঝি।"

কাজি সাহেব দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, "ঐ কথাই আমি পুছ্ করছি। এখন বল্ এই চুরীর কি জানিস্। তোর কপালে দু'টা আঁখ আছে না? ঐ আঁখসে কি দেখ্‌লি, ঠিক্ ঠিক্ বল, ঝুটাবাৎ কভ্‌ভি না বল্‌বি।"

কাজি সাহেব বাঙ্গালা ভালই বুঝিতেন, এবং বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতই শুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতে পারিতেন, সে পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমোলে বাঙ্গালীর ছেলেরা মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞতা-প্রকাশ যেমন গৌরবের বিষয় মনে করিত, এবং বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া 'মোচা'কে 'ক্যালাকা ফুল' বলিয়া সাহেবীয়ানার পরিচয় দিত, এই বিচার সভায় কাজি সাহেবও স্বীয় আভিজাত্য-গৌরব-প্রদর্শনের জন্য সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন, পাছে কেহ তাঁহাকে খাস্ দিল্লীর আমদানী বলিয়া মনে না করে!

রমণী বাম হস্ত কটিদেশে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উভয় চক্ষু স্পর্শ করিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "এই দুটি চোখের মাথা খাই যদি মিথ্যে বলি; ইষ্টিদেবতার সাম্‌নে সত্যি কথা বল্‌তে চুকিনে, তা হোক্ না কেন সে আমার বাপের ঠাকুর। কাল গিন্নিমা যখন পুবের ঘরের বারান্দায় ব'সে দিদির চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন, সেই সময় সুমতি ঠাকরুণ কোথা থেকে এসে তাঁদের কাছে বস্‌লো। এ কথা সে কথা হচ্ছে, এমন সময় কর্ত্তা বাড়ী ফিরে এসেছেন শুনে গিন্নিমা আর দিদি দু'জনেই উঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গ্যালেন, সেই ছ্যাকে ঐ বাম্‌নী দিদির চুল-বাঁধার ফিতেটা টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে পেট্ কোঁচড়ে পুরলে—তার পর উঠে একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে হন্ হন্ করে চ'লে গ্যালো; তাই না দেখে—আমার আকেল গুড়ুম!"

কাজি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেই ফিতে তুই ঐ আসামীকে পেট্‌-কোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে ভাগ্‌তে আপন আঁখ্‌সে দেখ্‌লি ?"

রমণী বলিল, "হাঁ দেখ্‌লাম বৈকি ? ঘরের মদ্যি দেঁড়িয়ে দেখ্‌লাম না তো কি ?"

কাজি বলিলেন, "দেখ্‌লি ত চোট্টা বেটীকে গেরেফ্‌তার কর্‌লি না কেন ?"

রমণী বলিল, "আমি কি সিপুই যে গেরেফ্‌তার করবো ? তবে হাঁ, আমি চোর চোর ব'লে চ্যাচামেচি করতে পারতাম, তা আমি করিনি। সাধে করিনি ? সত্যবালা দিদি ঐ বাম্‌নীটাকে সোনার চক্ষে দেখেছেন, ওর সঙ্গে তাঁর পিরীত পেরণয় আছে কি না ; তাঁর ভালবাসার লোক—তাঁর ফিতে চুরি করে পালালো—এ কথা বল্‌লে দিদির মন্ত সোজা হতো ; তাঁর গোসার ভয়ে আমি রা কাড়িনি।"

কাজি সাহেব বলিলেন, "লেকেন ফিতার 'কিম্মত' তুই ওয়াকিব্‌ আছিস্‌ ?"

রমণী বলিল, "কিসের মত—তাই বল্‌ছো ?"

কাজি সাহেব কড়া স্বরে বলিলেন, "নেই, নেই ; আমি পুছ করছি—সেই ফিতার দাম কি বাৎলাও।"

রমণী বলিল, "ওঃ দাম ! তার দাম কত, ক্যাম্‌নে কব ? আমি কি ও রকম ফিতে কিনেছি না 'কাতু' দেখিচি যে, দাম জান্‌বো ! সে কি আর যে-সে ফিতে ? তাতে সোনার জরি আছে—মতি আছে, মুক্তো আছে। সোনার পৈঁছে, বাউকে ঝক্‌ মারে, এমন ফিতে ! সাদে কি মার সুমতি সুমতি ঠাক্‌রুণের 'নোব' হয়েছ্যালো ?"

কাজি সাহেব রমণীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, সুমতির দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার জবাব কি ? ঐ বাঁদীর বাৎ সাচ্চা কি ঝুট্‌া ? তুমি ফিতা চুরি করিয়েছিলে ?'

সুমতি সতেজে মাথা তুলিয়া সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে বলিল "না, আমি চোর নই। ব্রাহ্মণের বিধবার বিরুদ্ধে এত বড় বদনাম কোন ভদ্রলোকে দিতে পারে না।"

কাজি বলিলেন, "ঐ বাঁদী এ কথা বলে কেন ?"

সুমতি বলিল, "তা সেই জানে,—পরের মনের কথা আমি কি ক'রে বল্‌ব ?"

কাজি বলিলেন, রমণীর দুষমণি ? তার সঙ্গে তোমার বিবাদ আছে ?"

সুমতি বলিল, "না।"

কাজি বলিলেন, "তোমার সাফাই সাক্ষী আছে ? সাফাই দেবে ?"

সুমতি আবেগ ভরে বলিল, "সাফাই টাফাই জানিনে সাহেব! আমার সাক্ষী ধর্ম্ম; আমার সাক্ষী দেবতা, সেই নারায়ণ বিপদভঞ্জন মধুসূদন,—তাঁর ত কিছু অগোচর নেই; তাঁদেরই আমি সাক্ষী করে বল্‌ছি, চুরি করা দূরে যাক—ফিতে আমি ছুঁইওনি। আপনি মুসলমান—শোরের মাংস যেমন আপনার অস্পৃশ্য, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, ফিতে কি ঐ রকম কোন বিলাসের সামগ্রীও আমার সেইরূপ অস্পৃশ্য।"

কাজি সাহেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোবা! তোবা! দেখ বেটী! তোমার নেড়ায়ন না মদ্‌সোদন্ যে সব নাম বাৎলালে, তারা যদি আমায় সামনে এসে বলে যে তুমি ফিতে চুরি করনি, তবে তোমার বাৎ বিশওয়াশ করা যেতে পারে। তারা গরহাজির; রমণীর জবানবন্দীতে তোমার কসুর প্রমাণ হয়েচে। এই বাঁদী ঝুটবাত বলেছে—এ বিশওয়াসের কুছু কারণ নেই। তোমার সাফাই সাক্ষী—"

কাজি সাহেবের কথা শেষ না হইতেই সেই জনতার ভিতর হইতে কে সুস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিল, "আছে, আছে, এই নিরপরাধ বিধবার আমিই সাফাই সাক্ষী!"—বামাকণ্ঠনিঃসৃত সকরুণ অথচ সতেজ স্বর! মর্ম্মাহত স্তম্ভিত শত শত দর্শকের মুহ্যমান হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার করিয়া কাহার কণ্ঠ হইতে এই করুণাভরা অভয়বাণী নিঃসারিত হইল? তবে কি ইহা তাঁহারই অমোঘ দৈববাণী—যিনি উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, বিপন্ন প্রহ্লাদকে দৈত্যকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নরসিংহ-মূর্ত্তিতে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন? যিনি কুরুসভায় অপমানিতা অপহৃতবসনা দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিয়াছিলেন?—দর্শকগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া মহাউৎসাহে সমবেতকণ্ঠে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিল, পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, এক পরমা-সুন্দরী যুবতী আলুলায়িতকুণ্ডলে নিবিড়জলদজাল-মধ্যবর্ত্তিনী উজ্জ্বল দামিনী-প্রভার ন্যায় সেই বিচারসভায় প্রবেশ করিতেছে!

যুবতী কাজি সাহেবের সম্মুখে আসিয়া, লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় পরিহার পূর্ব্বক সতেজে বলিল, "কাজি সাহেব, রমণী মিথ্যাবাদিনী, তাহার কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। সুমতি ফিতে চুরি করেনি, সে চোর নয়; চোর আমি; আমার আমার ফিতে আমিই লুকিয়ে রেখেছি।"

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিতদৃষ্টিতে সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল এক জন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এখনও রাত্রি যিনি হচ্ছে, এখনও আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উঠছে! ধর্ম্ম আছে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—"

চোপদার ও পদাতিকেরা সমস্বরে হুঙ্কার দিল, "চোপ, চোপ!"

তালুকদার স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত হইয়া এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন! তিনি তাঁহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এ যে তাঁহারই কন্যা সত্য বালা! সত্যবালা অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য বিচার সভায় আসামীর সাফাই সাক্ষী দিতে আসিয়াছে? একি বিড়ম্বনা! তাঁহার জাতি গেল, সম্মান নষ্ট হইল, তাঁহার গৌরব-মণ্ডিত উন্নত মস্তক মাটীর ধূলার সহিত মিশিয়া গেল! তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল।

মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধ বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিল। তালুকদার আসন ত্যাগ করিয়া এক লম্ফে সত্যবালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু সত্যবালা নড়িল না; সে তাহার পিতার মুখের দিকে দৃক্পাতও করিল না; সুমতিকে মুক্তিদানই তাহার লক্ষ্য, সে দৃঢ়স্বরে কাজি সাহেবকে বলিল, "কাজি সাহেব! দোষ আমারই, সুমতির কোন দোষ নেই, তাকে ছেড়ে দেন; যে সাজা দিতে হয়—আমাকে দিন।"

এ কি রহস্য! তালুকদার-কন্যা প্রকাশ্য বিচারসভায় উপস্থিত হইয়া কি উদ্দেশ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা সুমতির মুক্তিকামনায় তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, কেন-ই বা সে সুমতির অপরাধ নিজের স্কন্ধে লইয়া বিচারসভায় অসংখ্য লোকের সম্মুখে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এরূপ উৎসুক হইয়াছে ইহা বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কাজি উভয় হস্তে দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া বিচারাসন পরিত্যাগ করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার 'দোস্ত' তালুকদার মহাশয়কে বহুজন-সমক্ষে অপদস্থ ও মর্ম্মাহত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অধিকতর লজ্জার দায় হইতে নিষ্কৃতিদানের জন্যই উঠিয়া চলিলেন! তালুকদার ও তাঁহার পরি-

চারিকার সাহায্যে অবাধ্য কন্যাকে টানিতে টানিতে অন্তঃপুর অভিমুখে লইয়া চলিলেন। কন্যাকে তিনি যে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন, একালের ভদ্রসমাজে তাহা প্রকাশের যোগ্য নহে।

কাজি সাহেব বিচারসভা ত্যাগ করিলেও সমাগত পল্লীবাসিগণ সে স্থান ত্যাগ করিল না, সুমতি ও ন্যায়রত্নের প্রতি কিরূপ দণ্ডের আদেশ হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল-হৃদয়ে আলাপ করিতে লাগিল। দুই চারি-জন যুবক নিঃশব্দে সভা ত্যাগ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল, কাজি সাহেব তালুকদারের বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিতেছে; সম্মুখস্থ দ্বার বন্ধ থাকিলেও কাজি সাহেবের ফরসীর গড় গড় ধ্বনি বহু-দূরবর্ত্তী মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং অচিরকালমধ্যে বজ্রাঘাতের আশঙ্কায় সকলেই আকুল হইয়া উঠিল।

কিছুকাল পরে কাজি সাহেব একখণ্ড কাগজ হস্তে লইয়া বিচারসভায় প্রত্যাগমন করিলেন। এতক্ষণ সভামধ্যে কোলাহল চলিতেছিল, এবং প্রত্যেকেই কাজির বিচার সম্বন্ধে স্ব-স্ব অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক সভাটিকে হাটে পরিণত করিয়াছিল; রায় লইয়া কাজি সাহেবকে সভায় প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া সকলেই নীরব হইল; যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাজি সাহেবের সহিত তালুকদারের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে হাতমুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছিল; চোপ্‌দারের পাগড়ীর ঘটা ও লাঠীর বহর দেখিয়া মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া তাহারা বসিয়া পড়িল।

কাজি সাহেব আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার পেস্‌কারের হস্তে রায়ের কাগজ-খানি প্রদান করিলেন; কাজি সাহেব যে ভাষায় রায় লিখিয়াছেন, তাহার সাত আনা ফার্সি, পাঁচ আনা অশুদ্ধ উর্দ্দু, এবং সিকি দিল্লীর আমদানী বাঙ্গালা! পেস্‌কার ফৈজউদ্দীন মুন্সী গভীরস্বরে রায় পাঠ করিল। আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় তাহা এই :—

"সুমতি ফিতা চুরিয়াছে, এবং তাহার পিতা জানিয়া শুনিয়া চোরামাল নিজ দখলে রাখিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই; কিন্তু রমণী ভিন্ন তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন সাক্ষী বা প্রমাণ নাই; এজন্য হুকুম হইল যে—

"তারানাথ ন্যায়রত্নের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা তালুকদারের সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, এবং আগামী কল্য প্রভাতে তাহার ও তাহার কন্যা সুমতির মাথা মুড়াইয়া এবং নেড়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া তাহাদের উভয়কে গ্রাম হইতে

নির্ব্বাসিত করা হয়; তালুকদারের এলাকা মধ্যে আর কখন তাহারা আশ্রয় পাইবে না।”

এইরূপে কাজির বিচার শেষ হইলে সভাভঙ্গ হইল; এই দণ্ডাজ্ঞা শেলের ন্যায় গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তাহারা ব্যথিতহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে সেই রাত্রে হাজতে রাখা হইল। শতধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কাজির বিচারের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও সভ্য জগতে এইরূপ কাজির বিচার দুর্লভ নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাজি সাহেবের আদেশানুসারে প্রভাতেই ন্যায়রত্ন ও তাঁহার কন্যা সুমতিকে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। গ্রামের পক্ষে ইহা দুর্দ্দিন মনে করিয়া গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই এই অবিচারের কথা লইয়া আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিল। কেহ কাজিকে গালি দিতে লাগিল; কেহ বলিল, তালুকদার হিন্দুসন্তান হইয়া ন্যায়রত্নের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের এমন সর্ব্বনাশ করিলেন, ব্রাহ্মণের অভি-সম্পাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহাকে নির্ব্বংশ হইতে হইবে, তিনি নরকে পচিবেন। কেহ বলিল, কলির ব্রাহ্মণের কি আর সে তেজ আছে? যদি ঘোর কলি না হইত, তাহা হইলে ন্যায়রত্ন পৈতা ছুঁইয়া শাপ দিলে তালুকদারকে ভস্ম হইতে হইত। এক জন প্রাচীন ভদ্রলোক প্রতিবেশীদের সকল কথা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, ন্যায়রত্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষমাশীল; তিনি জানেন, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে, ক্ষমা দ্বারা অত্যাচারকে জয় করিতে হয়; সকল অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করাই মহতের কার্য্য। এ কথা শুনিয়া একটি যুবক বলিয়া উঠিল, ‘তাহা হইলে কাপুরুষের কার্য্যটি কি মহাশয়? গ্রামবাসিগণের মধ্যে এই ভাবে তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইল। তখন গ্রামের জনসাধারণ ন্যায়রত্নকে তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিদায়দানের জন্য দলবদ্ধ হইয়া হাজতঘরের অদূরবর্ত্তী তেমাথা পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দেখিল, তালুকদারের সুব্যবস্থায় হরিবোলা নাপিত পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং দুই কলসী ঘোলও আনীত হইয়াছে!

বেলা অধিক হইলে কাজি সাহেবের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া মেহেদীরঞ্জিত কপিশ দাড়ির নিশান উড়াইয়া অনুচরবর্গ সহ হাজতঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাইক ও পদাতিকেরা সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কাজি সাহেবের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহার অনুষ্ঠিত উৎসব আরব্ধ হয় নাই; তাঁহার ইঙ্গিতে সুমতি ও ন্যায়রত্ন বন্দিভাবে হাজতের বহির্দ্দেশে আনীত হইলেন।

কিন্তু কাজি সাহেব তাঁহার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি তাঁহার সম্মুখে নরমুণ্ডের স্রোত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, বুঝিতে পারিলেন, এই উত্তেজিত ক্ষুব্ধ জনস্রোত যদি সবেগে তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে—তাহা হইলে তাহাদের নিষ্পেষণে তাঁহার আস্থিগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং যদি উন্মত্তপ্রায় গ্রামবাসিদের এক এক জন এক একটি করিয়া তাঁহার দাড়ি গোঁফ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে আসামীদ্বয়ের মস্তক মুণ্ডিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শ্মশ্রু গুম্ফের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে! এই অপ্রীতিকর সম্ভাবনায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া আসামীদ্বয়ের মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে এক এক কলসী ঘোল ঢালিবার ব্যবস্থা করিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জমাদারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, আসামীদ্বয়ের মাথায় ঘোল ঢালা হইলে 'ঢেড়ি' (ঢোল) পিটাইয়া তাহাদিগকে দিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে, তাহার পর তাহারা একবস্ত্রে গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইবে।

কাজি প্রস্থান করিলে দুই জন পেয়াদা সুমতির সম্মুখে গিয়া বলিল, জল্‌দি মাথার কাপড় খোল্, দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লি ক্যান্? তাতে কি ফয়দা?"

সুমতি তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, এত অপমান সহ্য ক'রে ঘৃণিত জীবন-ধারণ করা কি সামান্য বিড়ম্বনার বিষয়? এর চেয়ে যদি জল্লাদের হাতে আমার মাথা কাটা যেত, সে-ও ত ভাল ছিল বাবা! আমি মর্‌তে রাজি আছি, এ অপমান আমি সহ্য করব না, আমি কিছুতে মাথা মুড়োতে দেব না।"

পেয়াদা বলিল, "তুই বল্‌ছিস্ কি? কাজি সাহেবের হুকুম তুই তামিল

করবি নে? তোকে আল্‌বৎ মাথা মুড়োতে হবে। ভালমানসির মতোন কথা শোন্‌; হারামির মতোন গোঁ ধ'রে দেঁড়িয়ে থেকে না হ'ক ক্যান্‌ বে-ইজ্জৎ হ'স?"

সুমতি তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া পেয়াদা বলপ্রয়োগে তাহার মস্তক হইতে বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিয়া কেশরাশি আলুলায়িত করিল; কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় কেশদাম লম্বমান হইয়া তাহার গুল্‌ফ স্পর্শ করিল।

সুমতি রমণীসুলভ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিবার চেষ্টা করিলে দুই জন দুইপাশ হইতে তাহার দুই হাত টানিয়া ধরিল, আর এক জন পেয়াদা তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। তখন নাপিত তাহার নিকট সরিয়া গিয়া মাথা কামাইবার পূর্ব্বে চুলগুলি খাট করিয়া লইবার জন্য কাঁচি বাহির করিল।

সুমতি পেয়াদার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া আর দুই জন পেয়াদা তাহার দুই পা ধরিয়া তাহাকে মাটীতে বসাইয়া রাখিল; অগত্যা সুমতি হতাশভাবে বসিয়া রহিল। নাপিত প্রথমে কাঁচি দিয়া তাহার কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহার মস্তকে ক্ষুর চালাইতে লাগিল।

সুমতির হাত পা নাড়িবার শক্তি না থাকিলেও সে নাপিতকে এই নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মাথা নাড়িতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নাপিতের সঙ্কল্প টলিল না, সে যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত ক্ষুর চালাইলেও ক্ষুর-ধারে সুমতির মস্তকের ত্বক্‌ স্থানে স্থানে কাটিয়া গেল; তাহার ললাট ও চোখ মুখ ও ঘাড় বহিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, সুমতি ভগ্নস্বরে বলিল, "ওগো, তোমরা ক্ষুরখান আমার গলায় বসিয়ে দিয়ে একেবারে আমাকে মেরে ফেল, আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক্‌। এ রকম করে দগ্ধিয়ে মেরো না। হরি, দীনবন্ধু, মধুসূদন, কোথায় তুমি, এই অনাথাকে এই রাক্ষস-গুলার হাত থেকে রক্ষা কর। মা দুর্গা, আর আমাকে কষ্ট দিও না।"

ন্যায়রত্ন কন্যার দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কম্পিতপদে কন্যার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন, কাতরস্বরে বলিলেন, 'মা, স্থির হও। মাথা না মুড়িয়ে যখন আমাদের নিষ্কৃতি নেই, ওরা যখন কাজির হুকুম নিশ্চয়ই তামিল করবে—তখন মা, মাথা নেড়ে বাধা দিয়ে ফল কি? এতে তোমার যন্ত্রণা বাড়ছে বৈ ত নয়; রক্তে তোমার

নাক কান চোখ মুখ ভেসে যাচ্ছে; বাপ হয়ে আমাকে তোমার এই দুর্দ্দশা দেখ্‌তে হচ্ছে! ও ক্ষুর যে আমারই কলজে কেটে কেটে নামাচ্ছে! মা, আর মাথা নেড় না, ওরা তোমার মাথা মুড়িয়ে দিক্‌, যা খুসী তাই করুক। তোমার কষ্ট যন্ত্রণা আর আমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না। মা জগদম্বা, তোমার মনে কি এই ছিল? এ যে অতি কঠোর পরীক্ষা, মা!"

সুমতি কাঁদিয়া বলিল, "আমি কি করে এ কালামুখ নিয়ে লোকের সাম্‌নে বের হব? কেমন করে লোককে মুখ দেখাব?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "বিস্তর পাপ করেছি মা, এ তারই শাস্তি। পাপের শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন, এরা কেবল উপলক্ষ মাত্র। যত কষ্ট হোক, হৃদয় ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাক্‌, ভগবানের দেওয়া শাস্তি বহন কর্ত্তেই হবে।"

ন্যায়রত্নের কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল, যেন তাঁহার হৃদয়-শোণিত অত্যাচারের পেষণে জল হইয়া অশ্রুরূপে নির্গত হইতেছিল। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মা জগদম্বাকে ডাকিয়া মনে মনে বলিলেন, 'দাও মা, তোমার অধম সন্তানকে কত শাস্তি দেবে দাও। কাজি সাহেবের এই নিষ্ঠুর আদেশ এই পৈশাচিক উৎপীড়ন তোমারই আদেশ মনে করে সকল যন্ত্রণা সহ্য করবো মা, মাথা নত করে তোমার আদেশ পালন করতে পারি—সে শক্তি দাও, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য যেন তোমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না হারাই, তোমার করুণায় সন্দেহ করার চেয়ে মানুষের বেশী পাপ আর কি আছে মা!"

সুমতির মস্তক মুণ্ডিত হইল; পেয়াদারা তাহাকে ছাড়িয়া ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এক জন কঠোরস্বরে বলিল, "কি ঠাকুর, চোখ বুঁজে ভাব্‌তে লেগেছো কি, কও ত! মেয়েটার মত তুমিও কি বজ্জাতি করবা? বুড়ো মানুষ মাথায় যদি ক্ষুরের দুই এক পোঁচ বেধে যায় ত সাম্‌লাতে পারব না ঠাকুর, তা আগে ভাগে কয়ে দিচ্ছি।"

ন্যায়রত্ন কোন কথা বলিলেন না, তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নিঃশব্দে নাপিতের হস্তে মস্তক সমর্পণ করিলেন; তাঁহার মাথাটি পূর্ব্ব হইতেই নেড়া, হ্রস্ব কেশরাশির মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘশিখা ছিল। নাপিত ব্রাহ্মণের শিখা কর্ত্তন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া এক জন পেয়াদা তাহার কাঁচিখানি তুলিয়া লইয়া ন্যায়রত্নের শিখাটি বামহস্তে আকর্ষণপূর্ব্বক 'কচ্‌' করিয়া কাটিয়া দিল। নাপিতের পাপের ভয় দূর

হইল; সে তখন অনায়াসে তাঁহার বিরল কেশে ক্ষুর চালাইয়া তাহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিল।

উভয়ের মস্তক মুণ্ডিত হইলে পেয়াদারা দুই কলসী ঘোল তাঁহাদের মস্তকে ঢালিয়া দিল। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ও পরিধেয় বস্ত্র ঘোলের প্লাবনে সিক্ত হইল! তখন কাজি সাহেবের আদেশানুযায়ী চারি জন পেয়াদা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে চলিল। এক জন মুচি ঢোল লইয়া তাঁহাদের আগে আগে চলিল, এবং ঢোল পিটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের অপরাধ ও তাহার শাস্তির কথা ঘোষণা করিতে লাগিল।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে যে সুপ্রশস্ত তেমাথা পথ ছিল, সেই পথের ধারে গ্রামের অধিকাংশ লোক সমবেত হইয়া বিষণ্ণবদনে নতমস্তকে আক্ষেপ করিতেছিল, প্রহরিপরিবেষ্টিত ন্যায়রত্ন ও সুমতি মুণ্ডিতমস্তকে সিক্তবস্ত্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ভক্তি-উদ্বেলিত-কণ্ঠে তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; যেন পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া কোন মানবমিত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন! সকলেই পথের ধূলায় দেহ প্রসারিত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের প্রণিপাত করিল। তাহারা তাঁহার পদপ্রান্তে দেহ লুণ্ঠিত করিয়া দেহ পবিত্র ও জীবন সফল মনে করিল। গ্রাম্য রমণীগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এই মর্ম্মভেদী বিদায়দৃশ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল; কি এক সুগভীর অব্যক্ত বেদনায় তাহাদের বক্ষের শিরা উপশিরাগুলি টন্‌-টন্‌ করিতে লাগিল। অভাগিনী সুমতির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন সজলনেত্রে গদগদস্বরে বলিলেন, "মা জগদম্বে, এ-ও ত তোমারই লীলা! লীলাময়ি, যে অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টকে তুমি এই বৃদ্ধের জীর্ণ অবসন্ন হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছ,—তাহাই সম্মানের শতদলে বিকশিত হইয়া তোমার এই অযোগ্য ভক্তকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করিতেছে; মা, এ তোমারই অর্ঘ্য। এই অকিঞ্চন দীনহীন অধমকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমার পূজা তুমিই গ্রহণ করিতেছ!"

গ্রামবাসিগণ সকলেই নির্ব্বাক্‌, কাহারও মুখে কথা সরিতেছে না। সুমতি দুঃখে, ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে,—ইহা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ন হৃদয়বেগে চঞ্চল হইয়া পুরোবর্ত্তী গ্রামবাসিগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, আজ তোমরা দয়া করিয়া এই অভিশপ্ত, দুর্নামগ্রস্ত হতভাগ্য বৃদ্ধকে মাতৃস্বরূপিণী, চিরকল্যাণদায়িনী,

স্নেহময়ী পল্লীজননীর ক্রোড় হইতে চিরনির্ব্বাসনের প্রাক্কালে বিদায় দান করিতে আসিয়াছ। আমাদের অপমান ও কলঙ্কের আর কিছু বাকি নাই। আমরা চোর অপবাদ লইয়া চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইতেছি; এই গ্রামে আর আমাদের প্রত্যাগমনের অধিকার নাই। তোমরা আমার পরমাত্মীয়; এতকাল তোমাদের সঙ্গে সুখে দুঃখে একত্র বাস করিয়াছি, কত সময় হয় ত মন্দ বাক্যে তোমাদের মনে বেদনা দিয়াছি; হয় ত কত জনের সহিত মন্দ ব্যবহার করিয়াছি, তোমাদের অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি; সে সকল কথা তোমরা ভুলিয়া যাও, আমার সে সকল ক্রটী তোমরা মনে রাখিও না।"—ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল, বিগলিত অশ্রুরাশি তাঁহার হৃদয়বেদনা লঘু করিতে লাগিল।

এক জন গ্রামবাসী ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "দাদাঠাকুর, আপনি ও কথা বল্‌বেন না! আপনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—আজ হরিরামপুরের লক্ষ্মী ছাড়্‌ল, গ্রামের লোক আজ পিতৃহীন হ'লো। আমাদের মঙ্গলের জন্যে আর কে চেষ্টা করবে? আমাদের সকল আশা-ভরসা আপনার সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।"

আর এক জন বলিল, "আজ যে কাণ্ড হয়ে গেল, এর পর কি এ গ্রামে বাস করতে আছে? অন্যত্র মাথা রাখ্‌বার যায়গা থাক্‌লে আপনার সঙ্গে আমরাও এ গ্রাম ত্যাগ করতাম। এই শ্মশানে বাস করে আর ফল কি?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আজও মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, আজও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে; এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই! অবশ্যই আছে। আমরা বেঁচে থেকেই তা দেখ্‌তে পাব।"

ক্রোধে, ক্ষোভে, মনস্তাপে নানা জনে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল; এক জন ব্রাহ্মণ হাতে উপবীত জড়াইয়া তালুকদারকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে ন্যায়রত্ন সম্ভ্রভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কর কি? কর কি? এমন কার্য্য কখন করিও না। তালুকদার রাজা, প্রজার পিতৃস্থানীয়; আমরা তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের বিচারক নহি। স্থির হও স্থির হও ভাই, আমাদের সুখদুঃখ ভগবানের হস্তে। মানুষের শক্তি-সাধ্য কতটুকু? মানুষ ত উপলক্ষ্যমাত্র।"

কথায় কথায় ক্রমে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পেয়াদারা অধীর হইয়া উঠিল; এক জন বলিল, "অনেক বাৎচিৎ হয়েছে ঠাকুর, এখন চল। আর আমরা দেরী করতে পারিনে।"

ন্যায়রত্ন বিনা প্রতিবাদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সুমতি অবনত-মস্তকে তাঁহার পাশে পাশে চলিল। গ্রামের লোকেরা এখনও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল; জনতা হ্রাস হওয়া দূরের কথা, গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঢেঁড়ির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ততই নূতন নূতন লোক জনতায় যোগদান করিতে লাগিল। এই রূপে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ন্যায়রত্ন স্বীয় বাসগৃহের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি আজন্মের ভদ্রাসন হইতে চিরবিদায়-গ্রহণের ইচ্ছায় সুমতি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, পেয়াদারা তাহাতে আপত্তি করিল না। তিনি সুমতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে তাঁহারা প্রাঙ্গনমধ্যস্থ তুলসী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করিলেন; সেই স্থানে বসিয়া আর তাঁহাদের উঠিবার ইচ্ছা হইল না। সুমতির কোমল-হৃদয় তাহার আজন্মের বাসভূমির মমতায় আকুল হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু হইতে নীরবে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। এই ভিটায় সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে সুখদুঃখের সহস্রস্মৃতি সংগুপ্ত রহিয়াছে; বিস্মৃত প্রায় অতীত স্মৃতিগুলি একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল! শৈশবে সে কোথায় বসিয়া কি ভাবে খেলা করিত, দুঃখময় যৌবনে নিরাশা ও বেদনা তাহার অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়ে ঘনাইয়া আসিলে তাহার পূজনীয় পিতৃদেব কোথায় বসিয়া তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিলেন, কোথায় বসিয়া তাহার পিতা কোন্ কোন্ কার্য্য করিতেন, মধ্যাহ্নে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া সে কোথায় তাহার পিতাকে ভোজনে বসাইত, এবং কোন্ স্থানে বসিয়া তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন,—সে সকল কথা একে একে স্মরণ হওয়ায় তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত ও বিহ্বল করিয়া তুলিল। .সে ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রথমে বাসগৃহে, তাহার পর পাকশালায় প্রবেশ করিল, এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে চারি দিকে চাহিতে লাগিল! যে সকল দৃশ্যে সে আশৈশব অভ্যস্ত, যাহা তাহার নিকট চির-পুরাতন, আজ তাহা নির্নিমেষ-নেত্রে পুনঃপুনঃ দেখিয়াও সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না; অশ্রুর উচ্ছ্বাসে সে চারিদিক 'ঝাপসা' দেখিতে লাগিল। তাহার 'ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত' চির-বিদায়ের সম্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া ক্ষুদ্র গৃহের সেই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের অনেক উচ্চে উঠিলেন। বেলা ক্রমেই অধিক হইতেছে দেখিয়া পেয়াদাদের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল,তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ন্যায়রত্নকে আহ্বান করিল, কিন্তু সুমতি তখন এতই গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল যে. সে আহ্বানধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আর অধিক বিলম্ব করিলে হয় ত পুনর্ব্বার লাঞ্ছিত হইতে হইবে জানিয়া ন্যায়রত্ন তৎক্ষণাৎ তুলসীমঞ্চের পাদমূল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক স্তূপীকৃত হস্তলিখিত গ্রন্থরাশির ভিতর হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাখানি বাছিয়া লইয়া, সুমতির হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিলেন ; তাহার পর তাঁহারা মা জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে দেবীচরণে প্রণাম করিলেন। ন্যায়রত্ন দেবী জগদ্ধাত্রীর মহিমমণ্ডিত মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণনেত্রে চাহিয়া করযোড়ে বলিলেন. "মা জগদম্বা, এতদিন তুমি আমাকে যে পথে চালাইয়াছ—আমি সেই পথেই চলিয়াছি। আমাকে যে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছ, সেই কাজই করিয়াছি ; আজ চোর অপবাদ লইয়া, তোমার বাড়ী ঘর তোমাকেই সমর্পণ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিলাম। কোথায় চলিলাম জানি না ; তুমিই তাহা জান ; আমি এইমাত্র জানি, তুমি আমাদিগকে যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইতে হইবে। আমাদের এই নির্ব্বাসন দণ্ড—তোমারই ইচ্ছার ফল।"—ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল ; অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার দেবীচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "মা দয়াময়ী, দুর্গতিনাশিনী, যদি না বুঝিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, এ অধম সন্তানকে ক্ষমা করিও। বিদায় হই মা!"

মন্দির হইতে নামিয়া আসিয়া ন্যায়রত্ন দেখিলেন, স্ত্রীপুরুষ অনেকেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য মন্দির-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ভক্তিভরে ন্যায়রত্নের পদধূলি গ্রহণ করিল। সুমতি তাহার পূজনীয় ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া সমবয়স্কাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। ন্যায়রত্ন হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তবে আমরা যাই, তোমাদের সঙ্গে এই শেষ দেখা!"

আগন্তুক গ্রামবাসিগণ সকলেই নির্ব্বাকভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা সরিল না। তাহাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুছিয়া অশ্রুমুখী সুমতিকে সঙ্গে লইয়া চলিতে আরম্ভ

করিলেন। কয়েক জন লোকে তখনও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। অবশিষ্ট সকলে নির্নিমেষনেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহারা দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে তাহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্রমে তাঁহারা গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন; সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত প্রান্তর; শ্যামল শস্যশীর্ষে প্রান্তর সুশোভিত; দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ! আরও দূরে প্রান্তর-প্রান্তস্থ ধূসর বনভূমী, মেঘমালার ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিল। গ্রামের ভিতর হইতে সঙ্কীর্ণ বক্র পথ প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

পেয়াদারা ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে গ্রামপ্রান্তে রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যে কয়েক জন গ্রামবাসী তাঁহাদের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে দুই একখানি পরিধেয় বস্ত্র দান করিল। কেহ কেহ প্রণামীস্বরূপ ন্যায়রত্নের হস্তে দুই একটি মুদ্রা পাথেয় দিয়া বলিল, "অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে যে গ্রাম পাইবেন, সেই গ্রামে গিয়া স্নানাহার করিবেন। ভগবান নিশ্চয়ই আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন; গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যিনি জননীর স্তনে তাহার জন্য আহার সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তিনি নিরাশ্রয় বিপন্ন নিরুপায় সন্তানকে অনাহারে রাখিবেন না! আপনি যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুন, আমরা সংবাদ পাইলেই সেখানে গিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।"

ন্যায়রত্ন তাহাদিগকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দান করিলেন; তাহার পর দুঃসহ বেদনাভার বক্ষে লইয়া কন্যা সহ রৌদ্র-প্রতপ্ত সঙ্কীর্ণ প্রান্তর-পথে কম্পিতপদে অগ্রসর হইলেন। শত-বিহঙ্গম কলকাকলি-মুখরিত, নানাজাতীয়-বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত, চিরজীবনের কর্ম্মক্ষেত্র, সাধনার শান্তিময় তপোবন, সহস্র সুখদুঃখস্মৃতির আগার, ছায়া-শীতল পল্লী তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অতীত জীবন ন্যায়রত্নের নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি কাতর-নয়নে একবার ঊর্দ্ধে—একবার সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার মস্তকের উপর সৌরকর-সমুদ্ভাসিত অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে উদ্বেলিত-তরঙ্গ-সঙ্কুল অসীম সংসার-সমুদ্র! একখণ্ড শুভ্র মেঘ ঊর্দ্ধাকাশে সুমন্দ সমীরণহিল্লোলে লক্ষ্যহীন ভাবে কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে ভাসিয়া যাইতে-ছিল; ন্যায়রত্নও সেইরূপ—জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্নেহময়ী কন্যা সহ—অকূল সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন। এই সময় এক জন রাখাল গোচারণ-

ক্ষেত্রে তাহার গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী একটি সুবিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মেঠো সুরে গান গায়িতেছিল :—

"হরি, এই কি গতি তার,
যে জন বিপদ্-তারণ মধুসূদন বলে বার বার!"

দশম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়, কাহারও মুখোপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে না; কাহারও দিন সুখে কাটে, কাহারও দিন দুঃখে অতিবাহিত হয়। দুঃখের দিন দুর্য্যোগপূর্ণ তমোময়ী রজনীর ন্যায় দীর্ঘ মনে হয়; মনে হয়, এ দিন বুঝি কাটিবে না, কিন্তু তাহাও কাটিয়া যায়। সুখদুঃখ, পাপতাপ, জ্বালা যন্ত্রণা বক্ষে লইয়া সকলেরই দিন নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে; সে কেবল রাখিয়া যায় স্মৃতি। সুখের স্মৃতি থাকে; দুঃখের স্মৃতিও পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় দুঃখীর চিত্তপটে চির-মুদ্রিত থাকে।

ন্যায়রত্নের মান সম্ভ্রম ও সুখ শান্তির দিন চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার মধুর স্মৃতি সুকোমল পুষ্পসৌরভের ন্যায় তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাসনকালে আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে পাথেয় বলিয়া যে অর্থদান করিয়াছিল, কয়েক দিনেই তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় সুমতিকে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু সে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কন্যা, কি বলিয়া ভিক্ষা চাহিতে হয়, তাহা সে জানে না। গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা চাহিতে গিয়া তাহার মুখে কথা সরে না, তাহার মোটা মোটা চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে, সে দীননেত্রে কাতরভাবে চাহিয়া থাকে। কি বলিতে হইবে—তাহা সে স্থির করিতে পারে না। তাহার মুখ দেখিয়া কোন গৃহস্থের সদয়হৃদয়া কন্যা বা বধূ এক মুষ্টি ভিক্ষা দেয়, কেহ বা 'ধাড়ী মাগী, গতর খাটিয়ে খেতে পারিস্‌নে? ভিক্ষা কর্‌তে লজ্জা হয় না?' ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেয়। কি দুঃখে কষ্টে পড়িয়া সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতে কাহার আগ্রহ হইবে? তাহার কষ্টের কথা ত কাহাকেও বলিবার নহে। যে দিন সে দুই চারি জন গৃহস্থের গৃহে মুষ্টিভিক্ষা পায় সে দিন পিতা-পুত্রীর একবেলার অন্নের সংস্থান হয়; যেদিন ভিক্ষা না পায়, সেদিন উভয়েরই

উপবাস। এইরূপে কোনদিন অর্দ্ধাশনে, কোনদিন অনশনে ক্রমাগত সুদীর্ঘ পথ চলিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতি উভয়েরই দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে। এই কয় দিনেই ন্যায়রত্নের বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

কাজি সাহেবের আদেশ,—তাহারা বিজয় দত্তের এলাকায় বাস করিতে পারিবে না। সুমতিও সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, এই পাপিষ্ঠ তালুকদারের অধিকারসীমায় পুনঃপ্রবেশ করিবে না, বাস করা ত দূরের কথা।

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ, সুমতি ভদ্রকন্যা—দীর্ঘপথ-ভ্রমণে অনভ্যস্তা। এ জন্য তাঁহারা প্রতিদিন কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াই পরিশ্রান্ত ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িতেন। সুস্থদেহ বলবান যুবক একদিনে যে পথ অতিক্রম করিতে পারে, সেই পথ চলিতে তাঁহাদের তিন চারি দিন লাগিত। এই কয় দিনে তাঁহারা বিজয়দত্তের এলাকা অতিক্রম পূর্ব্বক অতি কষ্টে অন্য একজন তালুকদারের এলাকায় উপস্থিত হইলেন।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। শুক্লপক্ষের খণ্ড চন্দ্র পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে হইতে ম্লান কৌমুদীরাশি বিকীর্ণ করিয়া ধরাতল প্লাবিত করিতেছে। সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ মুক্ত প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। এই শান্ত সুন্দর মৌন সন্ধ্যায় ন্যায়রত্ন ও সুমতি সেই নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কিছু দূরে একখানি গ্রাম। গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী অস্ফুট চন্দ্রকিরণে ধূসর গিরিশ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

সুমতি কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বাবা, এতদিনে বুঝি আমাদের কষ্টের অবসান হ'ল।"

ন্যায়রত্ন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "ভগবান জানেন।"

আবার কিছুকাল নীরব থাকিয়া সুমতি বলিল, "বাবা সমস্ত দিন তুমি উপবাসী আছ, কিছুই তোমার খাওয়া হয় নি। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আজ ত আর ভিক্ষা করবার সময় নেই। এখন আর এ মাঠের মধ্যে ব'সে থেকে কি হবে? ঐ ত গ্রামের গাছ পালা দেখা যাচ্ছে, চল, গ্রামের মধ্যে যাই।"

ন্যায়রত্ন বিনা বাক্য-ব্যয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া সুমতি ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে উভয়ে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী আম কাঁঠালের বাগান অতিক্রম করিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে দুই চারিটি সুবৃহৎ

অট্টালিকা, কিন্তু অট্টালিকাগুলি জীর্ণ, শ্রীভ্রষ্ট, কোন কোন অট্টালিকার ছাদ ভেদ করিয়া অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ উর্দ্ধে শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়াছে, ক্ষুধিত বাদুড়ের দল নিঃশব্দেপক্ষসঞ্চালনে অট্টালিকার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, দুই একটা শৃগাল আহারের সন্ধানে অট্টালিকার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গ্রাম্য কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া সবেগে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। অট্টালিকাগুলির সম্মুখে লাল ভেরেণ্ডা, কালকাশিন্দা ও আশ্যাওড়ার জঙ্গল, কোন অট্টালিকার কোন কক্ষে মৃৎপ্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, ভাঙ্গা জানালা দিয়া মৃদু দীপরশ্মি দেখা যাইতেছে! কোন কোন অট্টালিকা সম্পূর্ণ নির্জ্জন বোধ হইতেছে; যেন তাহারা অতীতের সুখসমৃদ্ধির ও গৌরবের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া ক্ষোভে দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

আরও কিছু পথ অতিক্রম করিয়া সুমতি এক গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিল। সে গৃহস্থের নিকট নিজেদের কোন পরিচয় না দিয়া গৃহস্থের আঙ্গিনাস্থিত একখানি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় প্রার্থনা করিল। নিরাশ্রয় বিদেশী লোক দেখিয়া গৃহস্থের দয়া হইল, সে সুমতির প্রার্থনায় সম্মতি দান করিলে, সুমতি ও ন্যায়রত্ন সেই রাত্রির জন্য সেই ভগ্ন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পথশ্রান্ত ন্যায়রত্ন তাঁহার মলিন উত্তরীয় প্রসারিত করিয়া তাহার উপর শয়ন করিলেন, শয়নমাত্র তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু সুমতির চক্ষে ঘুম নাই, সে তাহার পিতার পাশে বসিয়া ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।—ভিক্ষা করিয়া অর্দ্ধাহারে, কোনদিন বা অনাহারে তাহারা এই কয়দিন কাটাইয়াছে। আজ সমস্ত দিন তাহাদের আহার হয় নাই, এ ভাবে কয়দিন চলিবে, কি উপায়ে সে তাহার বৃদ্ধ পিতার জন্য একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সুমতি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। গ্রামে দুই চারিটি অট্টালিকা আছে দেখিয়া তাহার ধারণা হইল, এই গ্রামে নিশ্চয়ই দুই চারি জন ধনবান লোক বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি দয়া করিয়া তাহাকে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সে সেখানে যাহা পাইবে, তাহা দিয়া ও অবসরকালে কোন গৃহস্থবাড়ী কাঁথা সেলাই করিয়া বা পৈতা কাটিয়া যাহা উপার্জ্জন হইবে, তদ্দ্বারা তাহার বৃদ্ধ পিতার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিলে দুই জনের প্রতিপালনোপযোগী অর্থের সংস্থান হইবে না, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ, আমরা এই অকিঞ্চিৎকর আখ্যায়িকায়

যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন এক মন চাউলের মূল্য দশ টাকা ও একজোড়া মোটা কাপড়ের মূল্য ছয় টাকা হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা কোন গঞ্জিকাসেবীর উর্ব্বরমস্তিষ্কপ্রসূত অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনারও আয়ত্তাতীত ছিল।

সুমতি ব্রাহ্মণকন্যা, দুরবস্থাপন্না অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা ভদ্রপরিবারে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, এবং এই কার্য্যে তাহাদিগকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইত না, তাহা সে জানিত। সে চেষ্টা করিলে কোন-না কোন পরিবারে এইরূপ একটি চাকরী সংগ্রহ করিতে পারিবে ভাবিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং তাহার পিতার পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল।

সুমতি প্রভাতে উঠিয়া তাহার আশ্রয়দাতা গৃহস্থের কন্যার সহিত আলাপ করিল; সে কথাপ্রসঙ্গে সেই গৃহস্থকন্যার নিকট জানিতে পারিল, অল্পদিন পূর্ব্বে সেই পল্লীর অন্যতম গৃহস্থ রামদেব ভট্টাচার্য্যের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঠাকুরসেবা আছে, তিনি চাষীগৃহস্থ বলিয়া তাঁহার অনেকগুলি রাখাল কৃষাণকে দুবেলা খাইতে দিতে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাচীন, 'দ্বিতীয় সংসার' করিবার বয়স ও সুযোগ অনেক পূর্ব্বেই অতীত হইয়াছে, অথচ সংসারের ভার লইবার উপযুক্ত কোন স্ত্রীলোক নাই, এজন্য সংসারের সকল কাজ তাঁহারই ঘাড়ে পড়িয়াছে; স্ত্রীলোকের কার্য্য পুরুষের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কষ্টের সীমা নাই।—সুমতি বুঝিল, সেখানে চেষ্টা করিলে পাচিকার কার্য্য জুটিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের একটা দোষের কথা শুনিয়া সুমতি একটু ভীত হইল; সে শুনিল, এই ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দুর্ম্মুখ, সামান্য কারণেই তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া উঠে, তখন তাঁহার মুখবিবর হইতে যে সকল দুর্ব্বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা শুনিলে মরা মানুষেরও না কি রাগ হয়।—এবং সে সকল দুর্ব্বাক্য নিঃশব্দে পরিপাক করিতে না পারিয়া যদি কেহ প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে ক্রোধান্ধ ভট্টাচার্য্য তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকভোগের ব্যবস্থা করেন, এমন কি, 'পান হইতে চুণটুকু খসিলে' তাঁহার ব্রাহ্মণীরও পরিত্রাণ ছিল না, দিবারাত্রি ভূতের মত খাটিয়া তাঁহাকেও নিত্য ব্রাহ্মণের নিকট গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, মরিয়া তাঁহার হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে।

এই সকল কথা শুনিয়া সুমতি ক্ষণকাল চিন্তা করিল, শেষে সে মনে মনে

এই সিদ্ধান্ত করিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে তাঁহার সংসারে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সে প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিবে, তাহা হইলেও কি তাহাকে বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? সাধ্যানুসারে তাঁহার আদেশ পালন করিলেও যদি তিনি অকারণ দুর্ব্বাক্য বলেন, তাহা হইলে সে তাহা নীরবে সহ্য করিবে। বোবার শত্রু নাই, এ কথাটার কি একেবারেই কোন মূল্য নাই?

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সুমতি তাহার পিতার সহিত রামদেব ভট্টাচার্য্য নামক দুর্ব্বাসাটির সন্ধানে চলিল। ভট্টাচার্য্যের গৃহের সন্ধান পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না।

তখনও অধিক বেলা হয় নাই। প্রাতঃসূর্য্য রক্তরাগনেত্রে পূর্ব্বাকাশ হইতে ধরাতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র, ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটি নিমগাছের ডালে বসিয়া একটা দহিয়াল তখনও প্রভাতী সঙ্গীত গায়িতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রস্ফুটিতপুষ্পপূর্ণ সাজিটি হাতে লইয়া ঠাকুরদালানে প্রবেশোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় সুমতি তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করিল।

ভট্টাচার্য্য বিস্মিত দৃষ্টিতে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কে বাছা?"

সুমতি মাথা তুলিয়া মুখ হেঁট করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমি ব্রাহ্মণকন্যা।"

ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্নের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে যে বুড়াটিকে দেখিতেছি, উনি কে?"

সুমতি বলিল, "উনি আমার পিতাঠাকুর।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী?"

সুমতি বাসগ্রামের নাম প্রকাশ না করিয়া বলিল, "বাড়ী আমাদের অনেক দূর।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হুঁ, তা এখানে এসেছ কোথায়?"

সুমতি বলিল, "আপনারই কাছে।"

ভট্টাচার্য্য এ কথায় অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমারই কাছে! —আমার কাছে তোমার কি আবশ্যক?"

সুমতি মুখখানি কাঁচু মাচু করিয়া বলিল, "ঠাকুর, বড় কষ্টে পড়ে আপনার কাছে একটু কাজের চেষ্টায় এসেছি।"

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার ন্যায়রত্নের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "তোমার বাবা ত দেখ্‌ছি বুড়ো মানুষ, ওঁর বয়স বোধ হচ্ছে আমার চেয়ে অনেক বেশী। উনি আবার কি কাজ করবেন, আর জানেনই-বা কি কাজ?"

সুমতি বলিলেন, "আপনি সত্যই বলেছেন, আমার বাবার আর কোন কাজ করবার শক্তি নেই, কাজ উনি করবেন না, আমিই করবো!"

ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, তিনি ফুলের সাজিটি সাবধানে নামাইয়া রাখিয়া সুমতিকে বলিলেন, "তুমি? তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তুমি আমার কাছে কি কাজ করবে?"

সুমতি বলিল, "ব্রাহ্মণ-কন্যার যে কাজ,—তা সমস্তই আমি করতে পারবো। রান্না করতে পারবো, ঘর গৃহস্থালীর যে কোন কাজের ভার দেবেন, তাই করবো।"

ভট্টাচার্য্য তখন ন্যায়রত্নের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ন্যায়রত্ন কতক কথা গোপনে রাখিয়া এবং যতটুকু উপস্থিত ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে,তাহা বলিয়া ভট্টাচার্য্যের কৌতূহল দূর করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই বুঝিতে পারিলেন, তিনি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বটেন।

ভট্টাচার্য্য ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঠাকুরপূজা জানেন?"

ন্যায়রত্ন ঠাকুর পূজা জানেন কি না, এরূপ প্রশ্ন তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, বা তাঁহাকে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে—এ কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলে, বুড়া হইয়াছি, ঠাকুর পূজা জানি না বলিলে আপনি হয় ত আমাকে ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক মনে করিবেন। আমি সামান্য কিছু জানি।"

চাকরীর উমেদারী করিতে আসিয়া কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া নিজের ঢাক নিজে না বাজাইলে চলে না, সরল ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহা জানিতেন না, বা জানিয়াও তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার এই কুণ্ঠিত ভাব, 'সামান্য কিছু জানি'—প্রকৃত জ্ঞানের নিদর্শনসূচক এই কথা প্রখর বৈষয়িকবুদ্ধিসম্পন্ন ভট্টাচার্য্যের মনে অবিশ্বাস উৎপাদন করিল, তিনি ন্যায়রত্নকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন,

"সামান্য কিছু জানেন? ঠাকুর পূজা করিবেন, তাহার মধ্যে সামান্য আর অসামান্য কি আছে? আচ্ছা বলুন দেখি, নারায়নের ধ্যান কি?"

ন্যায়রত্ন নয়ন মুদিত করিয়া নারায়ণের দিব্যমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সুললিতকণ্ঠে উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিলেন,—

"ধ্যেয়ঃ সদা সাবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।"

এই ধ্যান আবৃত্তি করিতে করিতে ন্যায়রত্নের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, উভয় চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিল, তাঁহার বোধ হইল, শঙ্খচক্রধারী হিরণ্ময়বপু নারায়ণ সবিতৃমণ্ডলমধ্য হইতে পদ্মাসনে আবির্ভূত হইয়া সহাস্যবদনে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন! সেই ভট্টাচার্য্যের দেবায়তনে আর কেহ তেমন ভক্তিভরে ও আন্তরিকতার সহিত ভগবৎ-স্তোত্র আবৃত্তি করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, বৃদ্ধ কেবল যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ নহে, তিনি ভক্ত, ভাবুক ও প্রেমিক।

ভট্টাচার্য্য ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়া এই অল্পবয়স্কা কন্যা সঙ্গে লইয়া কেন পথে পথে বেড়াইতেছেন?"

ন্যায়রত্ন কাতরভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।"

ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্নকে আর কোন কথা না বলিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই ব্রাহ্মণ ও তাহার বিধবা কন্যাটিকে গৃহে স্থান দিলে মন্দ হয় না; ব্রাহ্মণটি ঠাকুর পূজা করিবে, তাহার কন্যা রন্ধনাদি সংসারের সকল ভার লইতে পারিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া এ ভাবে পথে বাহির হইয়াছেন কেন? তাঁহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বলিতেই বা তাঁহার অনিচ্ছা কেন? মেয়েটির মাথা মুড়ানো। ইহারই বা কারণ কি? যুবতী বিধবাকে স্বেচ্ছায় মস্তক মুণ্ডন করিতে ত প্রায় দেখা যায় না। তবে কি এই যুবতী ভ্রষ্টচরিত্রা? সম্ভব বটে; এই ব্রাহ্মণের গ্রামের লোকেরা হয় ত যুবতীর কলঙ্কের কথা জানিতে

পারিয়া মেয়েটীর মাথা মুড়াইয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিয়াছে; স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কন্যাসহ ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়াছে। এই জন্যই ব্রাহ্মণ কন্যাসহ পথে বাহির হইবার কারণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

ভট্টাচার্য্য অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিলেন, অবশেষে তিনি স্থির করিলেন এরূপ অজ্ঞাত কুলশীল ব্রাহ্মণ ও তাহার কন্যাকে গৃহে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে।

ন্যায়রত্ন সুমতি সহ গৃহপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্যের মতামতের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভট্টাচার্য্য ঘরের বাহিরে আসিয়া ন্যায়রত্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমাদের এই গ্রামের কেহই আপনাদিগকে চেনে না, আপনাদের সম্বন্ধে কোনও কথা জানে না। আপনার সহিত আলাপ করিয়া আপনাকে সুব্রাহ্মণ বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে, কিন্তু আপনি এই যুবতী কন্যাসহ কি কারণে পথে বাহির হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আপনাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, এই জন্য আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনার মেয়েটীর চরিত্র পবিত্র নহে; এরূপ সন্দেহস্থলে উহার হস্তে অন্নজলগ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হইবে না; এবং সমাজও আমার এই কার্য্যের সমর্থন করিবে না। এ অবস্থায় আমার গৃহে কি করিয়া আপনাদের স্থান হইতে পারে?"

সুমতি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্যের সকল কথা শ্রবণ করিল। সাধ্বী রমণীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপের ন্যায় মর্ম্মান্তিক কথা তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই; সুমতি সর্ব্বাঙ্গে শতবৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভব করিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার হাত ধরিয়া ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গন পরিত্যাগপূর্ব্বক পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্য তাহাদের এই বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া শিখা আন্দোলনপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার অনুমানই সত্য; আমার মুখে কুলের পরিচয় পাইয়া আর এক মুহূর্ত্ত উহারা এখানে দাঁড়াইতে সাহস করিল না; ঠিক যেন জোঁকের মুখে চুণ পড়িয়াছে! হুঁঃ, এত বয়স হইল, এখনও মানুষ চিনিবার শক্তি হয় নাই? প্রভাতে একটা পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিলাম, আজ দিনটা যে বড় ভাল যাইবে, এরূপ বোধ হয় না।"

সুমতির মুখ দেখিয়াই ন্যায়রত্ন বুঝিতে পারিলেন, ভট্টাচার্য্যের আরোপিত কুৎসিত অপবাদে সে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে। তিনি নানা কথায় তাহাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতার কোন কথাই তাহার

কর্ণে স্থান পাইল না। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তখন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সুমতি সেই শান্ত সুন্দর নির্ম্মল প্রভাতে সেই গ্রাম্য পথের ধারে বসিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিল। জীবন তাহার নিকট জটিল প্রহেলিকা ও নিদারুণ দুর্ব্বহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার ধারণা হইল, মিথ্যা কলঙ্কের পশরা বহিবার জন্যই সে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে। তাহার জীবন অবিরাম দুঃখ কষ্ট ও অপমানের কণ্টক-ক্ষেত্র। সেদিন কাজি সাহেব চোর অপবাদ দিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, সমগ্র গ্রামবাসীর সম্মুখে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিল; আজ এই ভিন্ন গ্রামে আর এক জন অকারণ তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে গুরুতর কলঙ্কের কালী লেপন করিল! ইহার পর তাহার অদৃষ্টে আরও কত লাঞ্ছনা আছে, কে বলিতে পারে? সে ভাবিল, পদে পদে এরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া এই আশাহীন আনন্দহীন দুর্ব্বহ কষ্টের জীবন রাখিয়া ফল কি? এখন তাহার পক্ষে মরণই মঙ্গল, জীবনে সে যে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহা দুর্লভ না হইতেও পারে। মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া সে মৃত্যুর জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল, স্থির করিল, বিষপানে বা উদ্বন্ধনে সে প্রাণত্যাগ করিবে।

সুমতি আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এমন সময় অতীন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি-বলে সে যেন শুনিতে পাইল, কে তাহার কর্ণমূলে বলিতেছে, 'বাছা, তুমি আত্মহত্যা করিলে তোমার বৃদ্ধ পিতার কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে? তুমি মরিলে এই প্রবাসে তোমার পিতারও জীবন শেষ হইবে। আত্মহত্যা মহাপাপ, একে ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহার উপর তুমি পিতৃহত্যার পাতকেও লিপ্ত হইবে, নরকেও তোমার স্থান হইবে না। মৃত্যুর পর তোমার অশান্ত আত্মা শ্মশানবাসী প্রেতের ন্যায় নিরন্তর নিরাশ্রয়ভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে। সহ্য কর, সহ্য কর; সহিষ্ণুতাই মনুষ্যের রক্ষাকবচ। মিথ্যা কলঙ্কের ভার দুর্ব্বহ মনে করিতেছ, কলঙ্ক সত্য হইলে কি সে ভার বহন করিতে পারিতে?"

সুমতির মনে হইল, ইহা দৈববাণী, ভগবানই তাহাকে এই পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। সত্যই ত, সে আত্মহত্যা করিলে কিরূপে তাহার পিতার জীবন রক্ষা হইবে? আর কোনও কারণে না হউক, তাহার

পিতার সেবা শুশ্রূষার জন্যই তাহার প্রাণধারণ করা আবশ্যক।—সুমতির সঙ্কল্প বিচলিত হইল। পিতার সুখ-দুঃখের তুলনায় সুমতি নিজের সুখদুঃখ, মান অপমান, প্রশংসা-গঞ্জনা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিত। তাহার পিতা মানব-সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ; তিনি পবিত্রচেতা, মহাপণ্ডিত, ভগবদ্ভক্ত, সকল সদ্‌গুণের আধার; তাঁহাকেই যখন ভাগ্য-বিড়ম্বনায় এত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা উৎপীড়ন ও মনস্তাপ সহ্য করিতে হইতেছে, তখন দুঃখে কষ্টে ও মিথ্যা কলঙ্কে তাহার কি বিচলিত হওয়া শোভা পায়? যাঁহারা মহৎ, ভগবান তাঁহাদিগকেই মহাদুঃখে সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবী রাজমহিষী হইয়াও মিথ্যা কলঙ্কের ভার বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজীবনকাল তাঁহাকে দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। রঘুকুলরাজলক্ষ্মী, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী মহারাণী শৈব্যাকেও কি অল্প দুঃখ কষ্ট, উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে? তাঁহারা যদি সে সকল কষ্ট যন্ত্রণা নতশিরে সহ্য করিয়া থাকেন, তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা—সে দুঃখ কষ্টে কেন অধীরা হইবে? রামায়ণ-মহাভারত-বর্ণিত পূতচরিত্রা মহিয়সী নারীগণের অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার কাহিনীগুলি একে একে সুমতির স্মরণ হওয়ায় তাহার হৃদয়ে যেন দৈববলের সঞ্চার হইল; মিথ্যা কলঙ্ক, অপমান, গঞ্জনা তাহার নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইল। সুমতি উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বদিন হইতে তাহার পিতা উপবাসী আছেন, এ কথা স্মরণ হওয়ায় সুমতি অদূরবর্ত্তী আর এক জন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিল।

সেই বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক সম্মার্জ্জনীহস্তে গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কৃত করিতে-ছিল। সুমতি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে বলিল, “মা, আমি বামুনের মেয়ে, কাল থেকে আমার বুড়ো বাবা উপবাস করছেন, দয়া করে যদি আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও ত—”

সুমতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই বর্ষীয়সী গৃহস্থরমণী কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, “আ মোলো যা! সময় নেই, অসময় নেই, সকাল বেলা উঠোনে ছড়া ঝাঁট পড়্‌তে না পড়্‌তে কোত্থেকে ভিকিরি এসে হাজির! একেবারে পেট হাতে করে এসেছে। আবার বলা হচ্ছে বামুন, কি রকম বামুন? ভাট না আচায্যি?”

স্ত্রীলোকটির এই দুর্ব্বাক্য সুতীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় সুমতির মর্ম্মভেদ করিল, কিন্তু অভুক্ত ক্ষুধিত পিতার শুষ্ক মুখখানির কথা মনে পড়ায় অতিকষ্টে সে

আত্মসংবরণ করিল, উদরান্নের অভাবে ভিক্ষালাভের আশায় যাহাকে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে, তাহার আবার মান অপমান কি? দুর্ব্বাক্য শুনিয়া বিরক্ত হইলে ভিক্ষা করা হয় না। সুতরাং সুমতি স্ত্রীলোকটির কথায় বিরক্ত না হইয়া কাতরভাবে বলিল, "না মা, আমরা ভাটও নই, আচার্য্যিও নই, আমরা ভাল বামুন।"

কিন্তু স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত মুখরা, সুমতির কাতরতা-দর্শনে তাহার মনে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ভাল বামুন! ভাল বামুন জাতব্যবসা ছেড়ে পেটের দায়ে ভিক্ষে করেই বেড়ায় বটে! গেরস্তর দুয়োরে 'ভিক্ষে দাও গো' ব'লে দাঁড়ালেই বুঝি কাঁড়ি কাঁড়ি ভিক্ষে পাওয়া যায়? ঘোর কলি, ঘোর কলি! বামুনের মেয়ে পৈতে কাটা চরকা কাটা ছেড়ে পেটের দায়ে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়,—এমন চোখেও দেখিনি—কানেও শুনিনি! টাকায় দশ আড়ি (প্রায় চারি মন) ধান ছিল, বছর মন্দ, আট আড়ির ওপর এক কাঠাও পাবার যো নেই। ভিক্ষে বড় সস্তা নয়? না গো, এখানে কিছু হবে-টবে না। ও পাড়ার মজুমদারদের বাড়ী আজ ছরাদ' (শ্রাদ্ধ) হচ্ছে, সেইখানে যা, বিকেলে কাঙ্গালীবিদেয় হবে, এক মাল্‌সা চিঁড়ে গুড় পাবি, বুড়ো বাপ্‌কে পেট ভরে খেতে দিস্।"

গৃহস্থরমণীর কথায় সুমতির চক্ষে জল আসিল। "হা ভগবান, শেষে শ্রাদ্ধের বাড়ীতে কাঙ্গালী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে! না জানি অদৃষ্টে আরও কত দুর্গতি আছে।" মনে মনে এই কথা বলিয়া সুমতি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহস্থের গৃহ ত্যাগ করিল।

ন্যায়রত্ন কিছু দূরে পথে বসিয়া কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুমতি বিষণ্ণবদনে ছল-ছল নেত্রে ধীরে ধীরে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তখন পথে লোকজনের যাতায়াত আরম্ভ হইতেছিল; তাহাদের অনেকেই শ্রাদ্ধবাড়ীর সমারোহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন বুঝিতে পারিলেন—হরিনাথ মজুমদার সেই গ্রামের একজন ধনবান ব্যক্তি, সেই দিনই তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ। মজুমদার খুব ঘটা করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন; নিকটবর্ত্তী দশখানি গ্রামের আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহার বাড়ীতে কুটুম্বিতা করিতে আসিয়াছে। বার জন হালুইকর ব্রাহ্মণ সহর হইতে লুচি ভাজিতে আসিয়াছে। দুই গোলা চিঁড়া ও এক গোলা

মুড়কী কাঙ্গালীবিদায়ের জন্য প্রস্তুত। দেশ বিদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন পথে বসিয়াই গ্রামস্থ পথিকগণের মুখে এই সকল আলোচনা শুনিতে পাইলেন।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পত্রী হইয়াছে শুনিয়া ন্যায়রত্নের সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল।

দেশ বিশেষের এই প্রকার কত শ্রাদ্ধসভায় ন্যায়রত্নের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সেই এলাকার মধ্যে তিনিই 'একপত্রী' ছিলেন। আর আজ এই শ্রাদ্ধসভায় তিনি অনাহূতভাবে উপস্থিত হইবেন, এ কথা মনে করিতে সুমতি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিল; কিন্তু সে সুখ সম্মানের দিন অতীত হইয়াছে, দুদিন যিনি অনশনে আছেন,—ভিক্ষাও যাঁহার পক্ষে দুর্লভ, তাঁহার অভিমান করা সাজে না ভাবিয়া সুমতি তাহার পিতাকে শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হইতে নিষেধ করিল না। ন্যায়রত্ন সুমতিকে একটি প্রাচীনা কৈবর্ত্তরমণীর কুটীরে রাখিয়া ধীরে ধীরে হরিনাথ মজুমদারের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মজুমদারের বাড়ী কোন্ দিকে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা হইল না; কারণ, সেই পথ দিয়া দলে দলে লোক হরিনাথের মাতৃশ্রাদ্ধ দেখিতে যাইতেছিল। ক্রমশঃ।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য।

শেষ।

বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মত সাধনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যে মন্দাকিনী বাঙ্গালাদেশে আনিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র সমাজকে সঞ্জীবিত করিতেছে। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কেহ বা একাধিক বিভাগে—কেহ বা বহু বিভাগে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে প্রতিভার অধীশ্বর, সে প্রতিভার আবির্ভাব কোন দেশে—কোন সাহিত্যে—কোন কালেই সুলভ নহে। বাঙ্গালা সাহিত্য যেমন অক্ষয়, তাঁহার যশও তেমনই অক্ষয়। তিনি "সোনার বাঙ্গালা"কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

তাঁহার রচনাও তেমনই চিরদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে বাঁশী বাজাইবে। বাঙ্গালীর আপনার—বাঙ্গালীর সাহিত্যদিক্‌পাল বলিয়াই তাঁহার পরিচয়—তাহাতেই তাঁহার পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে সম্মান পাইয়াছেন—সে সম্মান তাঁহার নহে—সে সম্মান বাঙ্গালীর, সে সম্মান বাঙ্গালা ভাষার। আর তিনি বিদেশে সম্মান লাভ করিবার পর অতর্কিত পার্ব্বত্যবাত্যাবাহিত অকালজলদের বর্ষণের মত যে সম্মান সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার উপর বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার কথা আর না-ই বলিলাম। নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য, এবং সেই সাহিত্যের অধিকারী বাঙ্গালী তাঁহার নিকট যে ঋণে বদ্ধ, তাহা অপরিশোধ্য।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে যাঁহারা যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। সেরূপ চেষ্টায় বিশেষ বিপদও যে নাই, এমন নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজও জীবিত—জীবিত লেখকদিগের রচনা সম্বন্ধে কোনরূপ মত-প্রকাশ প্রদীপ্ত অঙ্গারের উপর পাদক্ষেপের মত বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষ, সাহিত্য-ব্যবসায়ী আমি—তাঁহাদের অনেকেই আমার পরিচিত—অনেকে আমার সুহৃদ। সকলের সম্বন্ধে মত-প্রকাশের সময় এখনও আইসে নাই—সকলের সম্বন্ধে মত প্রকাশের যোগ্যতাও আমার নাই। সুতরাং সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে যাঁহারা সুপরিচিত—যাঁহারা নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখকালে তাঁহাদেরই কয় জনের নামোল্লেখ করিব। ইহাতে দোষ-গুণ-বিচারের—উৎকর্ষাপকর্ষনির্দ্ধারণের কোনরূপ চেষ্টা থাকিতে পারে—এমন কথা যেন কেহ মনে না করেন।

দর্শন বিভাগে—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তাঁহার 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত করেন, তাহার পূর্ব্বে, বোধ হয়, বাঙ্গালায় সেই জাতীয় পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। কেন না, তাহার পূর্ব্বে দর্শনের পঠন পাঠন এদেশে সংস্কৃতেই হইত—পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা ইংরাজী ব্যতীত বাঙ্গালায় হইত না। তাহার পর চন্দ্রশেখর বসু, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সরল বাঙ্গালায় দর্শনের জটিল তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ তেমনই দক্ষতাসহকারে সেই কার্য্য করিতেছেন।

দর্শনের পর আর একটি দুর্ব্বোধ বিষয়ের কথার উত্থাপন করিব—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকৃতির গোপন-তত্ত্ব উপন্যাসের নায়িকার ভালবাসার মত চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ও জগদানন্দ বাঙ্গালায় বিজ্ঞানকথা সর্ব্বজনবোধ্য করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীব-জন্তুর কথা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক-জগতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কারের সূচনাসময়ে ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের সারস্বত-সম্মিলনে যখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কথা তাঁহাদের দুই জনের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—

'বহু দিন হ'তে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি';
তুমি তা'রে আজি তুলিয়া আপনি—রটালে বিশ্বময়।"

ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানকথা বুঝাইয়াছেন। জগদীশচন্দ্র বাঙ্গালায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন—তিনি বিরলপ্রাপ্ত অবসরের মধ্যেও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালায় তাঁহার আবিষ্কার জানাইলেন না কেন? আকাশ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত আবিষ্কারের মূলকথা "সাহিত্যে" একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধে যাহা বীজ—পরে তাহাই বিশাল বৃক্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হইয়া তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যদিগকে যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ যদি আমি তাহা প্রকাশ করি, তবে আশা করি, আমার আচার্য্য তাঁহার পুরাতন শিষ্যের অপরাধ লইবেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদিগের আবিষ্কারবার্ত্তা বিদেশে পণ্ডিত-সমাজে প্রচার করিতে হয়। কিন্তু বিদেশী সভাসমিতির নিয়ম এই যে, যে সংবাদ পূর্ব্বে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়, তাহা আর তাঁহাদের পত্রে স্থান পায় না। সেই জন্য তাঁহাকে এতদিন বাধ্য হইয়া স্বদেশীর পূর্ব্বে বিদেশীকে তাঁহার আবিষ্কারের সংবাদ দিতে হইয়াছে। এত দিনের চেষ্টায় সে বাধা দূর হইয়াছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে স্বতন্ত্র পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন তাঁহাকে আর বিদেশী পত্রে তাঁহার আবিষ্কার-সংবাদ প্রকাশ করিতে হইবে না। আশা করি,

এখন একই সময়ে বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে তাঁহার আবিষ্কার-বিবরণ প্রকাশিত হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন, আমরা যদি সত্য সত্যই রসায়নে মৌলিক আবিষ্কার করিতে পারি, তবে আমরা রসায়নের নূতন আবিষ্কারকথা পাঠ করিবার জন্য যেমন জার্ম্মাণ ও রুসিয়ান ভাষা শিক্ষা করি, আমাদের আবিষ্কারবিবরণ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইলে বিদেশীয়রা তেমনই বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা শিখিবে। তাঁহার কথা—ভবিষ্যদ্বাণী হউক। তিনি এবং তাঁহার বাঙ্গালী সহকর্ম্মী ও ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের আবিষ্কারের কথা বাঙ্গালাতেই লিপিবদ্ধ করেন, তবে আমরা এমন আশা অবশ্যই করিতে পারিব যে, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা শিখিতে হইবে; বিজ্ঞান বিভাগে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধির সীমা রহিবে না।

বিজ্ঞানের একাংশে—চিকিৎসাবিষয়ক সাহিত্যে আমাদের উন্নতি উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহাম্মদের অস্ত্রোপচারবিষয়ক পুস্তক, ভাগ্যবান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্যবান পিতা গঙ্গাপ্রসাদের 'ধাত্রী-শিক্ষা', দুর্গাদাস করের 'ভৈষজ্য-রত্ন', রাধাগোবিন্দ করের ও লালমোহনের বিবধ পুস্তক বিদেশী ভাষায় লিখিত যে কোন পুস্তকের পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে।

বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা সরলভাবে বুঝাইয়া আজ চুণীলাল বসু দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু 'শরীর-পালন'-প্রণেতা যদুনাথ ও 'স্বাস্থ্য-রক্ষা'র গ্রন্থকার রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিত্যগোপাল ও নাট্যকার বলিয়া অধিক প্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে সব পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজীতে; কিন্তু প্রবোধচন্দ্র দে বাঙ্গালায় সে বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করিয়া নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি গোপালন সম্বন্ধেও একাধিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ধন-বিজ্ঞানে বা অর্থনীতিতে গিরীন্দ্রনাথ পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

যাঁহার "ক্ষণভিন্নসৌহৃদ" স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র উৎসর্গপত্র লিখিয়াছিলেন, সেই দীনবন্ধু এ দেশের নাট্যসাহিত্যে নবশক্তির সঞ্চার করেন। দীনবন্ধুর প্রতিভার সমালোচনা করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কিন্তু তাঁহার সময় শিক্ষিতসমাজে ভাবের নবপ্রবাহসঞ্জাত চাঞ্চল্যে যে শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দীনবন্ধুর নাটকে সর্ব্বত্র

সপ্রমাণ। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে' যেমন বাঙ্গালার নীলকরপীড়িত প্রজার বেদনায় বাঙ্গালীর অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন—'সধবার একাদশী'তে তেমনই নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত মদ্যমাংসলোলুপ সমাজের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় হাসি ও অশ্রু শরতের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের মত পরস্পরের সহচর। দীনবন্ধু যখন নাটক রচনা করেন, তখনও বাঙ্গালায় দর্শক-সাধারণের জন্য রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তাহার সূচনামাত্র হইতেছে। তাহার পূর্ব্বে মধুসূদনের, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ও অন্যান্য লেখকের রচিত নাটক সখের রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল। তাহার পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘ জীবনে বহু নাটকে বহুবিধ চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—বহু সুমধুর সঙ্গীতে নাটক খচিত করিয়াছেন—বহুদিন বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের শাসক ও চালক হইয়া ছিলেন। অমৃতলাল বসু নিপুণ শিল্পী—তাঁহার নাটক ও প্রহসন বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের বহুমূল্য উপাদান। ক্ষীরোদপ্রসাদ উপন্যাস অপেক্ষা নাটকেই অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আর দ্বিজেন্দ্রলাল, তিনি যখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন—হাস্যরসপ্রধান রচনার ও নাটকের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যখন আপনার সকল সম্বল বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিতে প্রযুক্ত করিবার সকল আয়োজন করিলেন, তখনই যে মৃত্যুর অতর্কিত আহ্বান আমাদিগকে তাঁহার সাধনার ফল হইতে বঞ্চিত করিল, ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। বঙ্গবাণী তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে তাঁহার "অমল কমল-চরণে স্থান" দান করিয়াছেন—কাল তাঁহাকে সে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না।

দীনেশচন্দ্র সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। হয় ত ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত পুঁথিপত্রের সাক্ষ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন মত পরিত্যাগযোগ্য বিবেচিত হইবে। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের সহিত তাঁহার গ্রন্থের তুলনা করিলেই তাঁহার শ্রমশীলতার ও উপাদানসংগ্রহ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাস-উদ্ধারের প্রথম গৌরব তাঁহার, এবং বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শ্রমের পুরস্কার।

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীনাথের ও যোগেশচন্দ্রের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

যাঁহারা রচনায় ভক্তিতত্ত্বের আশ্রয় লইয়া সাহিত্যে ভক্তির ধারা প্রবাহিত

করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন বিশেষ পরিচিত। শিশিরকুমারের 'নিমাইচরিত'-ক্ষরিত অমিয়া সংসার-সাগরের বেলাভূমিতে তপ্ত বালুকায় শায়িত বহু বাঙ্গালীর বেদনাবিক্ষত হৃদয়ে অমোঘ ভেষজের মত কার্য্যকরী হইয়াছে। প্রসন্ন সেনের কথার উল্লেখ না করিয়া এ বিভাগের কথা শেষ করা যায় না।

শিশুপাঠ্য সাহিত্যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধারণ নহে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কুলদারঞ্জন রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী বালককে সাহিত্যে চিত্ত-বিনোদনের ও শিক্ষালাভের সুলভ উপকরণ প্রদান করিয়াছেন।

সমাজতত্ত্বে ভূদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, এবং ভাব-প্রকাশের অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁহার রচনায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছে।

অভিধান বিভাগে নগেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞভাজন।

যাঁহারা সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে যশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়-চন্দ্র সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, মসারফ হোসেন, সকলেই বাঙ্গালীর কাছে সুপরিচিত। এই সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি তিব্বতীয় ও পালি ভাষাদ্বয়ে সুশিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালীকে অনেক নূতন কথা শুনাইতেছেন। সিংহলেও আমি এই বাঙ্গালী সাহিত্যিকের যশের পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি।

সমালোচনার কথায় আমি পূর্ব্বেই কয় জন যশস্বী লেখকের নামোল্লেখ করিয়াছি। ললিতকুমার সমালোচনায় যে দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা কোন দেশের সাহিত্যেই সুলভ নহে। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সরস সমালোচনায় অনেক প্রাচীন কবির রচনাসৌন্দর্য্যের আস্বাদ বাঙ্গালী পাঠককে দিয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্নের রচনা বঙ্কিমভক্তের অবশ্যপাঠ্য। নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে যাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে যাইলে অকাল-নির্ব্বাপিতজীবনদীপ দুই জনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়সেই যে সব রচনা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা উৎকর্ষে রচনার আদর্শ। আর

অজিতকুমার অনুশীলনে আপনার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ করিয়া তাহার প্রয়োগের পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায়ও অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' যে শাণিত সমালোচনা থাকিত, তাহার দেখা পাই সুরেশচন্দ্রের "সাহিত্যে" "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"য়। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, যে ইস্পাতে সেনাপতির তরবার প্রস্তুত হইতে পারিত, তাহা লেখকের লেখনীমুখ সূক্ষ্ম করিবার ছুরিকাগঠনেই ব্যয়িত হইতেছে।

পথের ও যানের সুবিধা বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে ভ্রমণ-বাসনা বলবতী করিয়াছে, তাহার ফলেও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। জলধরের ভ্রমণসীমা ভারতবর্ষ অতিক্রম করে নাই, কিন্তু চন্দ্রশেখর সেনের বাসনা 'ভূপ্রদক্ষিণ' না করিয়া নিবৃত্ত হয় নাই। 'য়ুরোপে তিন বৎসরে'র কথায় রমেশচন্দ্র দত্ত ইঁহাদিগের পূর্ব্বগামী।

চরিতকথার লেখকদিগের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিদেশের বহু বরেণ্য ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন, এবং রজনীকান্ত গুপ্ত 'আর্য্যকীর্ত্তি'র কথা শুনাইয়া বাঙ্গালীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বিহারীলাল সরকারের ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর নামোল্লেখ না করিলে এ বিভাগের কথা একান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামোল্লেখ অন্য প্রসঙ্গে করিয়াছি। তারকনাথ একখানি পুস্তকেই অমর হইয়াছেন। বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরের কথা বুঝি তাঁহার মত করিয়া আর কেহ লিখেন নাই। 'স্বর্ণলতা'র সরলা আপনার দুঃখে বাঙ্গালী পাঠকের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন, এবং আমরা তাঁহাকে আমাদেরই অশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া হৃদয়-মন্দিরে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করি। 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্রের খ্যাতিতে আমরা যেন 'রাজলক্ষ্মী'-লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্রকে ভুলিয়া না যাই। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রায় মহাশয়' সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ফটোগ্রাফ—কিন্তু হরিদাস শিল্পী—Photo-artirt। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' কল্পনার নূতন সৃষ্টি। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন উপন্যাস রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি দুই জনের উল্লেখ করিব।—প্রভাতকুমারের রচনা আখ্যানবস্তুর বৈচিত্র্যে ও জটিলত্বে, ঘটনার অপ্রত্যাশিত সংস্থানে ও অতর্কিত

আবর্ত্তনে উপন্যাস-পাঠকদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে, এবং মনোযোগ আকৃষ্ট করে। শরৎচন্দ্র মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন—নূতন নূতন অবস্থায় মানুষের মন কি ভাবে প্রভাবিত হয়, এবং মানুষকে কিরূপে নূতন কার্য্যে প্রয়োজিত করে, ঘটনার বর্ণে মানুষের কাজ কেমন রঞ্জিত হয়, তাহাই তিনি দেখাইতে আনন্দ-লাভ করেন। যাহা আপাততঃ অসম্ভব মনে হয়, তাহাই কেন সম্ভব, তিনি দেখান। রচনায় যে নূতনত্ব আছে, তাহারই জন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই অভিনন্দিত হইয়াছেন।

কবিতার কেন্দ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অরুণ-রাগ-রঞ্জিত সমুচ্চ গিরি-শিখরের মত হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কীর্ত্তিই প্রথম লক্ষিত হয়। রবীন্দ্র-নাথের কথা আমি কোন এক বিভাগে বলিব না। 'সদ্ভাব-শতকে'র কৃষ্ণচন্দ্র আপনার ক্ষেত্রে আপনি একক। রবীন্দ্রনাথের পর অক্ষয়কুমার বড়ালের গীতিকবিতা ও গাথা আমার কাছে চিরমধুর মনে হয়। তাঁহার রচনা-প্রদীপের আলোকে আমরা যে কবি-প্রতিভা দেখিতে পাই, তাহা একান্তই দুর্ল্লভ। বঙ্গবাণীর চরণে তাঁহার কবিতা-'কনকাঞ্জলি' তাঁহার যশেরই মত অক্ষয়। গোবিন্দদাসের কবিতার সৌন্দর্য্য তাঁহার জন্মভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই মত উদ্দাম এবং কমনীয়। যাহারা "ক্ষিপ্তগ্রহ প্রায় ধরাতে আসিয়া জ্বলিয়া হইলা শেষ", সেই নবীন কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় প্রতিভার বিদ্যুদ্বিকাশ আছে, প্রতিভার অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয়ও প্রচুর। কুমুদ-রঞ্জনের 'একতারা'য় আরও এক গুপ্তভাবের অস্তিত্ব সুরেই প্রকাশ পাইয়াছে। আমার পরম স্নেহভাজন কালিদাস রায়—"নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" প্রভৃতি কবিতার যে সুর ধরিয়াছেন, তাহা খাঁটী বাঙ্গালার পরিচিত সুর। সে সুর শুনিলেই বাঙ্গালীর মন মাতিয়া উঠে। রজনীকান্তের গান বাঙ্গালায় চিরদিন আদৃত হইবে। আমি আর এক জনের কথা বলিব। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের গীতিকবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইলেও, যাঁহার "শেষ" "প্রচারে" শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "প্রচারে"র প্রচার শেষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা ভুলিতে পারি না। সে দিন 'প্রচারের' অন্তর্ধানে তাঁহার মনে যে বেদনা বাজিয়া উঠিয়াছিল, বুঝি তাহাই তাঁহাকে কৃষ্ণবিরহাতুর বৃন্দাবনের বেদনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল—তাই তিনি গায়িয়াছিলেন—

"গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন।
আর গাহে না পিক, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকাবনে খেলিতে নব কলিকা সনে
মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ।"

ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের নাম করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে ক্ষেত্রে যত কৃতিত্বই কেন দেখাইয়া থাকুন না—বাঙ্গালার ইতিহাস বিভাগে তিনি আমাদের চূড়ামণি। তাঁহার পর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিল-নাথ রায়—ইঁহাদের নাম করিতে হয়। ইঁহাদের সকলের রচনাই যে মৌলিক তত্ত্বোদ্ধারের গৌরবে সমুজ্জ্বল, তাহা নহে; কিন্তু সকলেরই রচনায় নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার নবভাব-প্রবাহ বাঙ্গালীকে প্রথমে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধারেই বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। অক্ষয়-কুমারের 'গৌড়লেখমালা', রমাপ্রসাদের 'গৌড়রাজমালা', এবং রাখালদাসের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বাঙ্গালীকে তাহার গৌরবগর্ব্বোজ্জ্বল অতীতের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধারসাধনে—উপকরণসংগ্রহে বাঙ্গালার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালী যে কত সাহায্য করিতে পারেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যখন পথের এত সুবিধা ছিল না—ব্যোমযান ত পরের কথা, বাষ্পীয়যানের কল্পনাও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই, তখনও বাঙ্গালী বিদেশে খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী বৌদ্ধ-গুরু তিব্বতে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জয়পুর-নগর-রচনার গৌরব বাঙ্গালীর। বারাণসী বাঙ্গালী নৃপতির-দিগ্বিজয়ের সাক্ষ্যপ্রদান করি-তেছে। বৃন্দাবন বাঙ্গালীর আবিষ্কার। বাঙ্গালার বিজয়-বাহিনী যেমন জলপথে সিংহলে ও যবদ্বীপ প্রভৃতিতে বাঙ্গালার সভ্যতা বহিয়া লইয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালীর বাণিজ্য-তরী যেমন তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে প্রাচীর নানাদেশে পণ্য লইয়া যাইত, তেমনই বাঙ্গালী বাহিনী স্থলপথে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীর্থ প্রয়াগে এবং উড়িষ্যার তালীবনশ্যাম সমুদ্রবেলায় জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিল। ভারতের নানাস্থানে—বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপকরণ। বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, সে সব সংগ্রহ করিতে হইবে—সে সকল পরীক্ষা করিতে হইবে—সে সকলের সাহায্যে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূ করিতে হইবে। সে কাজে বাঙ্গালার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহায্য

প্রয়োজন। কিন্তু নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বিভাগ কেবল বাঙ্গালার ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নহে। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন, তাহাও বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। মিশরের ও আরবের ইতিহাস বাঙ্গালায় রচিত হইলে বাঙ্গালী তাহাতে আপনার ইতিহাসের উপকরণও পাইবে। অনেক ইংরাজ ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন—বাঙ্গালীর দ্বারা অন্যান্য দেশের ইতিহাসগুলি অদূর ভবিষ্যতে লিখিত হইবে, এমন আশা আমরাই অবশ্যই করিতে পারি! সেই আশা পূর্ণ হইলে যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে—শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্য্যসীমার কথা স্মরণ করিয়া এই স্থানেই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সব মহিলা নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনে ও প্রসাধনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কথার উল্লেখ না করিলে অকৃতজ্ঞতার প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। যে দিন 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'র প্রকাশে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-সমাজে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল—সে সব কবিতা যদি মহিলার রচনা হয়, তবে তাহা এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের কিরূপ সুফলের পরিচায়ক, তাহার আলোচনা হইয়াছিল,—সে দিনে আর আজিকার দিনে কি প্রভেদ! উন্নতি কত দ্রুত! স্বর্ণকুমারী দেবী বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর রচনা আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়াছি। নিরুপমা দেবী 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র শিল্পী—তিনি 'দিদি'র সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় করাইয়া তাহার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। অনুরূপা দেবী ও ইন্দিরা দেবী উপন্যাস-রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সুখলতা রাও শিশুপাঠ্য সাহিত্যে নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে কখন কবির অভাব হয় নাই। জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের দেশে—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব স্বাভাবিক। এ দেশে মহিলারাও যে কবিতাবিভাগে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' বঙ্গবিধবার পবিত্র অশ্রু—

> "এ নহে সে অশ্রু, সখা, যানান্তে নয়নকোণে,
> ঝরিতে যা চাহিত না, দেখা হ'লে ফুলবনে।

সে অশ্রু এ নহে, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে—
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির কোমল থরে।
এ শোকাশ্রু——"

মানকুমারী, বিনয়কুমারী প্রভৃতি অনেকেই উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন। আর যমুনার কূলে দাঁড়াইয়া আমি 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীর "যমুনা-কল্পনা"র কথা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? তাঁহার যমুনা-কল্পনা বাঙ্গালীর চিরাগত সংস্কার-লতিকার প্রস্ফুটিত কুসুম। এই কালিন্দীর কূলেই কবিকল্পনা বাৎসল্য-সখ্য-দাস্য-ভক্তিপ্রেমভালবাসার লীলাস্থলী বৃন্দাবন রচনা করিয়াছে—

"তা'র কূলে কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুল ছায়া দান;
তা'র জলে জলে ছুটে প্রেমের পিরিতি
কল্লোলে বিরহ-গান।"

যমুনায় "স্নান"—সে কত আশার পরিতৃপ্তি—

"ধীরে উষাকর ধরি সেই পুণ্যজলে
নামিয়া করিব স্নান,
আমি সেই বারিপানে বিশ্বের পীরিতি-
অমিয়া করিব পান।"

উনবিংশ শতাব্দী শেষে ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত মহিলা-কবির এই রচনার সহিত নীলকণ্ঠের একটি গানের তুলনা করিলে আমরা কালপাত্র-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রবাহিত ভাবধারার সন্ধান পাইব। যে যাত্রাগান বাঙ্গালার শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তবিনোদন ও শিক্ষা-বিস্তার করিবার জন্য কল্পিত, সেই যাত্রার দলের অধিকারী নীলকণ্ঠ গায়িয়াছিলেন—

"কবে বৃন্দাবনের প্রতি গলি গলি
ঘুরিয়া বেড়া'ব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি;
কণ্ঠ ভণে, পিব করপুটে তুলি
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার?"

বাঙ্গালার নূতন সাহিত্যে—ইংরাজির প্রভাবে পরিপুষ্ট এই সাহিত্যে যে বাঙ্গালার ভাবধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতেই বুঝা যায়, এ সাহিত্য বিদেশী নহে—ইহা আমাদের আপনার। যে লতা আজ পত্রপুষ্পে

সুশোভিত হইয়াছে, তাহার মূলে কেহ বা টেম্‌সের, কেহ বা টাইবারের, কেহ বা টাইগ্রীসের বারিসেচন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সে আমাদেরই তমালগাত্রাবলম্বিনী আমাদেরই মাধবী। যদি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তাহার ভ্রমর-ঝঙ্কৃত বিকশিতকুসুম শোভা দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। বাঙ্গালা ভাষার সরোবরে যে সাহিত্য-কুসুমের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতেছি, তাহা বিদেশ হইতে আনীত মোমের ফুল নহে—সে শতদলের মৃণাল বাঙ্গালার ভাব হইতেই রসাকর্ষণ করিয়াছে—সেই শতদলই আমরা আমাদের পূজায় ব্যবহার করিয়া থাকি। মধুসূদন যে দেশে প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে—

"ইটালী বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন ;
বহুবিধ পিক যেথা গাহে কুতুহলে।"

কিন্তু তাঁহার কবিতার ভাব বাঙ্গালার ভাব। সেই প্রবাসে তিনি তাঁহার "মাতৃভূমিস্তনে" "দুগ্ধ-স্রোতরূপা" কপোতাক্ষীকেই স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।" এই যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য, ইহা নবজাগ্রত বাঙ্গালীর সাহিত্য। যখনই কোন জাতি জড়ত্বশাপমুক্ত হইয়া আপনার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে তাহার সাহিত্য তাহার নূতন অবস্থার অনুপযোগী অনুভব করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর সেই চেষ্টার ফল।

"নানান দেশে নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা
পূরে কি আশা!"

আশা পূরে না—ব্যক্তিরও নহে, জাতিরও নহে। সেই জন্য জাতীয় সাহিত্য সর্ব্বত্র জাতীয় উন্নতির নিদর্শন। সেই জন্যই সভ্য জাতির সাহিত্যে মধ্যে মধ্যে renaissance দেখা যায়—শীর্ণ নদীতে নূতন বারিধারা প্রবাহিত হয়—সে "যৌবন জলতরঙ্গে" নূতন সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বাঙ্গলায় তাহাই হইয়াছে। সে সাহিত্য কত সুন্দর—কত সমৃদ্ধ—কত সম্পূর্ণ, আমরা তাহারই কিছু আলোচনা করিলাম।

আশা করি, আজিকার এই নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য পুরাতন হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে, এবং যখন ইহা পুরাতন-পর্য্যায়-ভুক্ত হইবে,

তখনও ইহা সৌন্দর্য্যে চিরনবীনই রহিবে; আর সেই আশার আনন্দে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবকগণ আমাদের সাধনার পথে অগ্রসর হইব—ভবিষ্যতের পুরস্কারের আশায় বর্ত্তমানকে অবহেলা করিতে পারিব—বঙ্গবাণীর চরণে কেবল নিবেদন জানাইব—

"ফুটি যেন স্মৃতি-জলে মানসে, মা, যথা ফলে—
মধুময় তামরস কি বসন্তে—কি শারদে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

পঞ্চম প্রবন্ধ—১।

তৃতীয় বিগ্রহপালনের রাজত্ব, পালরাজবংশের অধঃপতন ও সেনরাজ-বংশর প্রতিষ্ঠা; বাঙ্গালার বহির্দ্দেশের তদানীন্তন রাজনীতিক ঘটনা-পরম্পরার প্রসঙ্গালোচনা; বেলাব তাম্র-শাসন ও সিংহপুর;—বেলাব শাসনের বিশিষ্ট আলোচনা;—বাঙ্গালায় বর্ম্মা রাজবংশধর;—বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের প্রমাণালোচনা;—শূর বংশ ও আদিশূর;—হরিকেলের চন্দ্ররাজবংশ ও চন্দ্রদ্বীপ;—শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন;—পাল সাম্রাজ্যের সামন্তপ্রথা;—তৃতীয় বিগ্রহ পালের সহিত সমসাময়িক সামন্ত নৃপতিগণের সম্বন্ধ ও তাঁহার রাজ্যসীমা;—তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজ্যকালের লেখমালা ও রজতমুদ্রা।

তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্ব;—পালরাজবংশর অধঃপতন ও সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা।

নয়পালের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত না হইলেও যে, সকল আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজত্বকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বাঙ্গালায় সুচিরস্থায়ী আক্রমণ সূচিত হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে অবশেষে পালরাজবংশের অধঃপতন ঘটিয়া সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বিগ্রহপালের পুত্র রামপালের জীবন-চরিত অবলম্বনে যে রামচরিত কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহারই টীকার একাংশে বিগ্রহপাল যে দাহন-রাজ কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাভূত করিয়া ও পরিশেষে তাঁহার সহিত

সন্ধি স্থাপিত করিয়া তাঁহার দুহিতা যৌবনশ্রীর পাণি গ্রহণ করেন,—তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্লিখিত কর্ণই কলচুরি রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি কর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। চেদি রাজ্যের পশ্চিমাংশ দাহল নামে পরিচিত ছিল, এবং তাহার রাজধানী ত্রিপুরী নগরী (বর্ত্তমান 'তিবর', জব্বলপুরের নিকট) কলচুরি বংশের আদিম রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে যে চেদিরাজ্যকে মহাকোশল বলিত, তাহার প্রধান নগর ছিল রতনপুর। মহানদী নদী যে উপত্যকা বিধৌত করিয়া প্রবাহিত, তাহাই মহাকোশল রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত; বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগই স্থূলতঃ প্রাচীন মহাকোশল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাহল এবং মহাকোশল দুইটি বিভিন্ন রাজ্য ছিল,—কিন্তু দাহল রাজ্যই উভয় চেদিরাজ্যমধ্যে সমধিক পরাক্রমশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে—বিক্রমাঙ্কের পিতা প্রথম সোমেশ্বর কর্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমাঙ্ক সমরে গৌড়ের বিজয়হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কামরূপাধিপতির সুদূরপ্রসারিত রাজশক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত—কল্যাণীর চালুক্য রাজবংশের ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বা বিক্রমাঙ্কের জীবনচরিত, এবং উহা তাঁহারই রাজসভার বিদ্যাপতি বিহ্লন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বিক্রমদেব কর্ণাটেন্দু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; এবং কাশ্মীরের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কহ্লন বিহ্লনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া বিক্রমাঙ্ককে 'কর্ণাট' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণাট অবশ্য বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশের কতকাংশের প্রাচীন নাম,—ভারত-ইতিহাসের ইংরাজ যুগের আলোচকবর্গের নিকট উহাই কর্ণেটিক (the carnatic) বলিয়া সুপরিচিত।

যে সেন-রাজবংশ পরবর্ত্তী কালে গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রথমে কল্যাণীর চালুক্য-রাজবংশীয় কতিপয় আক্রমণকারী সামন্ত নৃপতির সহিত বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাঁহাদিগের মিত্রনৃপতিস্বরূপ রাঢ় দেশের স্থায়ী অধিবাসী হয়েন, তাহার নিদর্শন কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজসাহী জেলার দেবপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের প্রথম সেন-রাজ বিজয় সেনের প্রশস্তিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়ের পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাটের বৈরিগণকে নিহত করেন, এবং তাঁহার শেষ জীবনে গঙ্গার তীরস্থ তীর্থনিচয় দর্শন করেন।

আবার, বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট সীতাহাটিতে প্রাপ্ত, বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, চন্দ্রবংশোদ্ভব বহু নরপতি শৌর্য্যবীর্য্যে রাঢ় দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং সমরবিজয়ী সামন্ত সেন সেই চন্দ্রবংশসম্ভূত ছিলেন; এবং বাঙ্গালার শেষ নরপতি লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে সামন্ত সেন 'কর্ণাট-ক্ষত্রিয়'-রাজবংশ-সম্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার বহির্দ্দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক প্রসঙ্গালোচনা।

এই স্থলে, প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের শেষ হইতে বাঙ্গালার বহির্দ্দেশের রাজনীতিক ঘটনাপরম্পরার প্রসঙ্গালোচনার পুনরায় প্রয়োজন হইতেছে। চন্দেল্লগণ জেজাকভুক্তি (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে তাহারাই গৌড়ের পালরাজগণের চিরশত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী কান্যকুব্জের প্রতীহারগণকে উৎখাত করে। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল মুসলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহাদিগের সহিত চন্দেল্লগণের সংঘর্ষ ঘটে, এবং চন্দেল্লগণ কয়েকবার বিশিষ্টরূপ পরাজয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই চেদির কলচুরিগণ তাহাদিগের নৃপতি গাঙ্গেয়ের এবং [গাঙ্গেয়ের পুত্র] কর্ণের অধীনে শক্তিশালী হইয়া উঠে, এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্ল ও প্রতীহারগণকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহাদিগের রাজ্যবিস্তার করে। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক চন্দেল্ল ও প্রতীহারগণের উৎপীড়ন হওয়ায় তাহাই গাঙ্গেয়ের ও কর্ণের, তথা গৌড়াধিপ মহীপালের, রাজ্যাধিকারলিপ্সার অনুকূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কর্ণ পররাজ্য-আক্রমণে উৎসাহশীল ছিলেন, এবং প্রতিবেশীর পক্ষে অনুকূল ছিলেন না—ইহাই ধারণা হয়। যদিও নবম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়াধিপ প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল কলচুরি-রাজকুমারী লজ্জা দেবীর পাণিগ্রহণ করায় চেদির কলচুরি-বংশের সহিত গৌড়ের পালবংশ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; তথাপি গৌড়রাজ নয়পালের রাজত্বের প্রথম ভাগে কর্ণ নয়পালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং পরে মহাত্মা অতীশের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিরোধের মীমাংসা ঘটিয়াছিল। কিন্তু নয়পালের মৃত্যুর পর, পুনরায় কর্ণের সহিত নয়পালের উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিগ্রহপালের বিরোধ উপস্থিত হয়। রামচরিতের টীকায়, বিগ্রহপাল কর্ণকে

পরাভূত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, এবং তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভবতঃ কর্ণের সহিত বিগ্রহপালের সন্ধি-হেতুই কল্যাণীর চালুক্যগণের সহিত বিগ্রহপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

চালুক্য রাজবংশ, দশম শতাব্দীর শেষভাগে, নৃপতি দ্বিতীয় তৈলের বা তৈলপের অধীনে দাক্ষিণাত্যে পরাক্রমশালী হইয়া উঠে, এবং উক্ত তৈলপ কর্ত্তৃক শেষ রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কক্ক ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হয়েন, ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কিয়ৎকাল পরেই, চালুক্য রাজ্য চোলরাজ রাজরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল; কিন্তু ১০৫২ বা ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যগণ প্রথম সোমেশ্বরের নেতৃত্বাধীন তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে কোপ্পম নামক স্থানে চোলদিগের সহিত বিরাট সমরে ব্যাপৃত হয়, এবং সেই যুদ্ধেই রাজরাজের পৌত্র এবং বাঙ্গালার আক্রমণকারী রাজেন্দ্র চোলের পুত্র—রাজাধিরাজ চোল নিহত হয়েন। এই যুদ্ধের ফলেই তুঙ্গভদ্রা নদী—চালুক্যরাজ্য ও চোল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমায় পরিণত হয়। সোমেশ্বরই, বোধ হয়, চালুক্য-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি, এবং তিনিই কল্যাণী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন;—এই কল্যাণীই কল্যাণী-রাজবংশের রাজধানী হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজশক্তির প্রসার ঘটিলে পূর্ব্ব প্রান্তের পররাজ্যাধি-কারেচ্ছু চেদি রাজের সহিত চালুক্যগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে; এবং সোমেশ্বর কর্ত্তৃক কর্ণের পরাভব যে বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এইরূপ সময়ে, কর্ণের অদৃষ্টে ক্রমান্বয়ে বহুসংখ্যক পরাজয়-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি কীর্ত্তিবর্ম্মা পরিচালিত চন্দেল্লগণ কর্ত্তৃক, মালবাধিপতি উদয়াদিত্য কর্ত্তৃক, অনহিলওয়ারার অধীশ্বর প্রথম ভীমদেব কর্ত্তৃক, এবং গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে, কীর্ত্তিবর্ম্মা চন্দেল্ল ১০৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া-ছিলেন, এবং তিনি মুসলমান আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে খর্ব্বীকৃত চন্দেল্ল রাজশক্তির বহুলপরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়।

উদয়াদিত্য মালবের পরমার বা পওয়ার রাজবংশোদ্ভূত,—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উপেন্দ্র বা কৃষ্ণরাজ নামক জনৈক নৃপতি ঐ রাজ-

বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজ্য অবন্তী ও উজ্জয়িনী নামেও পরিচিত ছিল, এবং এক সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও কলা-বিজ্ঞানের অনুশীলনের নিমিত্ত তদ্‌রাজ্যের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

অনহিলওয়ারা রাজ্য গুর্জ্জরপ্রদেশে চালুক্যবংশীয় মূলরাজ নামক জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক ৯৬১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

চালুক্য-রাজ প্রথম সোমেশ্বর ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন,—অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সোমেশ্বর রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া আট বৎসর কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি আপন সহোদর ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। বিক্রামঙ্ক কাঞ্চী-নগরী অধিকার করিয়াছিলেন, এবং কর্ণাট প্রদেশে প্রভূতপরিমাণে আপন আধিপত্য-বিস্তার করিয়া কর্ণাটেন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য-কালে, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রাভিজ্ঞ মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্য-রাজধানী কল্যাণী নগরীতে অবস্থান করিতেন।

বিক্রমাঙ্কদেবচরিত হইতে যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বিক্রমাঙ্ক চালুক্যের সহিত গৌড়পতি তৃতীয় বিগ্রহপালের বিরোধ ঘটিয়াছিল, এইরূপই সূচিত হয়। বিক্রমাঙ্কের পিতা প্রথম সোমেশ্বরের বৈরী কর্ণ কলচুরির সহিত বিগ্রহপালের মৈত্রীস্থাপনের ফলে ঐরূপ বিরোধ ঘটিয়া থাকিলেও ঘটিয়া থাকিতে পারে, অথবা নাও ঘটিয়া থাকিতে পারে; এবং সম্ভবতঃ ঐরূপ বিরোধের ফলেই চালুক্য নৃপতির সামন্তরাজস্বরূপ রাঢ়দেশে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উক্ত উদ্ধৃত অংশে বিক্রমাঙ্ক কর্ত্তৃক গৌড়ের পরাজয় ও কামরূপ-রাজশক্তির পরাভব একত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার অধীন পরগণে মহেশ্বরীর অন্তর্গত বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত নৃপতি ভোজবর্ম্মার একখানি তাম্র-শাসনে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, ভোজবর্ম্মার পিতামহ জাতবর্ম্মা কামরূপ বিজয় করিয়া কর্ণ-দুহিতা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। এই কর্ণ যদি চেদিরাজ কর্ণ কলচুরি হয়েন, তাহা হইলে কর্ণের অপর দুহিতা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করা হেতু গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত উপরি-উক্ত জাতবর্ম্মার শ্যালীপতি (ভায়রা) সম্বন্ধ ছিল। জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক কামরূপ-বিজয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, বিক্রমাঙ্কদেবচরিতের উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা সূচিত হইতে

পারে যে,—কর্ণ, তৃতীয় বিগ্রহপাল, এবং জাতবর্ম্মার মধ্যে শক্তিসমন্বয় সাধিত হয়, এবং সেই সমন্বিত শক্তির সহিত বিক্রমাঙ্কদেবের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল।

বেলাব তাম্রশাসন ও সিংহপুর।

বেলাব তাম্রশাসন অনুসারে ভোজবর্ম্মার বংশ যদুবংশ হইতেই উদ্ভূত,—যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং সেই রাজবংশ সিংহপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বন্ধুবর অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক শাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়া, উল্লিখিত সিংহপুরকে বাঙ্গালার রাঢ়প্রদেশের সিংহপুরের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন, এবং তাহাই বিশেষ সম্ভব বলিয়া মনে হয়; রাঢ়ের এই সিংহপুর হইতেই একাধিক নরপতি সিংহলে গমন করিয়া ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তথায় আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন,—সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস ও লেখমালায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালার সহিত সিংহলের এই প্রাচীন সম্বন্ধ বিশেষ কৌতূহলকর বিষয়, এবং অধিকতর আলোচনার যোগ্য। সিংহলের প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে, (এ কিংবদন্তী—মহাবংশ, দীপবংশ ও রাজাবলীয় গ্রন্থেও সংরক্ষিত রহিয়াছে)—বিজয় নামে এক রাজপুত্র ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া সিংহলে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন; বিজয়ের পিতার নাম সিংহবাহু, তিনি লাল বা রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী সিংহপুর, বা সিংহপুর নগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

সিহবাহু বা সিংহবাহু, কলিঙ্গরাজ-জামাতা জনৈক বঙ্গাধিপের পৌত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিজয়ের জন্মের, পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের, এবং সিংহলে আগমনের বৃত্তান্ত নিতান্তই কাহিনীমাত্র; কিন্তু সে কাহিনীতে উল্লিখিত বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সিংহপুর, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক প্রমাণ-মূলে, অর্থপূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কাহিনীর মতে, সিংহবাহু আপন জন্মদাতা সিংহকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পুত্র বিজয় ও অন্যান্য বংশধরগণ সিহল বা সিংহল উপাধি প্রাপ্ত হয়েন;—এই সিংহলই লঙ্কাদ্বীপের বর্ত্তমান নাম। উক্ত কাহিনীতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, বিজয় তাঁহার অনুচরবর্গ সহ সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম অবতরণ করিলে পর, সামুদ্রিক ব্যাধিতে অবসন্ন হইয়া তাঁহারা ভূতলে করতল স্থাপন করিলেন; মৃত্তিকার [তাম্র] বর্ণে তাঁহাদিগের করতল রঞ্জিত হইল; এই ব্যাপার হইতেই তাঁহারা 'তাম্বপানীয়' উপাধি লাভ করিলেন; এবং ইহা হইতেই তাম্বপাণি (তাম্রপাণি) নামের উৎপত্তি হইল। প্রাচীনকালে তাম্রপাণি বলিতে সিংহলকেই বুঝাইত।

ইহার পরবর্ত্তী কালে, মহাবংশের উনষষ্টি অধ্যায়ে তিলকসুন্দরীর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিঙ্গরাজদুহিতা তিলকসুন্দরী প্রথম বিজয়বাহুর মহিষী ছিলেন, এবং তাঁহার মধুকল্লভ প্রমুখ আত্মীয়ত্রয় সিংহপুর হইতে সিংহলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথম বিজয়বাহু ১০৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, তাঁহার গৌড়াধিপতি তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক হইবারই সম্ভাবনা। কলিঙ্গের গঙ্গ-বংশের কতিপয় তাম্রশাসনে মধুকামার্ণব নামে তদ্বংশীয় জনৈক নৃপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—মহাবংশের মধুকল্লভ উক্ত মধুকামার্ণবের পালি অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু তাম্রলিপি হইতে গঙ্গবংশীয় মধুকামার্ণবের যে কাল অনুমিত হয়, সিংহলের প্রথম বিজয়বাহু তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তাহার পর, সিংহলে নৃপতি নিঃশঙ্ক মল্লের ও তাঁহার ভ্রাতা নৃপতি সাহস মল্লের কতকগুলি শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে;—ইহারা উভয়েই সিংহপুর হইতে সিংহলে আগমন করেন, এবং অনুজ সাহস মল্ল ১২০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব্বজ নিঃশঙ্ক মল্লের রাজ্য লাভ করেন। নিঃশঙ্ক মল্ল তাঁহার শাসনে আপনাকে ইক্ষ্বাকুরাজবংশসম্ভব কলিঙ্গরাজবংশীয় নৃপতি বিজয়ের বংশধর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; থুপরমের নিকট গোলপোতায় প্রাপ্ত একখানি শাসনে, নিঃশঙ্ক মল্ল রাণী পার্ব্বতীর গর্ভে সিংহপুরেশ্বর কলিঙ্গরাজ গোপরাজের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং অনুরাধাপুরে প্রাপ্ত অপর একখানি শাসনে তিনি সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। পলম্নরুভে প্রাপ্ত সাহস মল্লের শাসনে লিখিত রহিয়াছে, তিনি বিশ্ববিশ্রুত ইক্ষাকু-অন্বয়-অন্বিত অস্খলিত কলিঙ্গরাজ-বংশোদ্ভূত, এবং তিনি সিংহপুরে শ্রীগোপরাজের ঔরসে তাঁহার মহিষী রহিদালোকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার ভ্রাতা নিঃশঙ্ক মল্লের অভাব হইলে, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর উপদেশক্রমে মল্লীকর্পূর নামক জনৈক সামন্ত কলিঙ্গে প্রেরিত হয়েন, এবং তাঁহারই আমন্ত্রণে সাহস মল্ল কতিপয় দুর্নীতিক মন্ত্রণাদাতার উত্থাপিত বাধা অতিক্রম করিয়া সিংহলে আগমনপূর্ব্বক আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন; নৃপতি বিজয়ই যক্ষকুলের নিধনসাধন করিয়া উৎপাটিত-মূল ক্ষেত্রের ন্যায় লঙ্কাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং সেই বিজয়ের বংশধর-গণ কর্ত্তৃকই উক্ত প্রদেশ বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পর কলিঙ্গরাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি এবং উমাবর্ম্মার একখানি—সিংহপুর

হইতে প্রদত্ত এই দুইখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চন্দ্রবর্ম্মার শাসনখানি গঞ্জাম জেলার কোমর্ত্তি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল; এবং উমাবর্ম্মার শাসনখানি ভিজগপত্তনের পলকোণ্ড তালুকের একটি কর্ম্মকারের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু উহা কোথায় প্রথম পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই শাসনদ্বয়ে কোনও অব্দের উল্লেখ নাই। বর্ম্ম-শেষ-নামযুক্ত প্রাচ্য গঙ্গবংশ নামে পরিচিত কলিঙ্গের এক রাজবংশেরও কতকগুলি শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাদের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই।

অতএব আমরা একদিকে পাইতেছি,—বাঙ্গালার রাঢ় অঞ্চলের সিংহপুর হইতে আগত নৃপতি বিজয়ের রাজ্যাধিকার ও উপনিবেশস্থাপন-সম্বন্ধীয় সিংহল-প্রচলিত অর্দ্ধকাল্পনিক কিংবদন্তী, এবং সেই কিংবদন্তীমূলে লব্ধ বঙ্গ ও কলিঙ্গের নামোল্লেখ;—বিজয়ের পিতামহ সেই বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন, এবং সেই কলিঙ্গ বিজয়ের প্রপিতামহীর পিত্রালয় ছিল। অপর দিকে পাইতেছি,—সিংহপুর রাজধানীর কলিঙ্গ-রাজবংশের বহু নৃপতি যে সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক প্রমাণ, এবং বর্ম্মা-শব্দশেষ-নামযুক্ত কলিঙ্গ রাজগণের সিংহপুর হইতে প্রদত্ত দুইখানি তাম্রশাসন। এই সকল প্রমাণ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে,—রাঢ় অঞ্চলের যে সিংহপুর কলিঙ্গ-রাজবংশের রাজধানী ছিল, যে রাজবংশ হইতে সিংহলের বহু নরপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ভোজবর্ম্মাও যাহার অন্যতম বংশাবতংস ছিলেন, ভোজবর্ম্মার বেলাব তাম্রশাসনের উল্লিখিত সিংহপুর, সেই সিংহপুর হওয়াই বিশেষ সম্ভব। বেলাব-শাসনের একাংশে—দুর্ভাগ্যক্রমে সে অংশ খণ্ডিত—লঙ্কাদ্বীপ শব্দ রহিয়াছে; তাহা হইতে সিংহলের উপর ভোজবর্ম্মার চক্রবর্ত্তিত্বের অধিকার অনুমিত হইতে পারে।

—ক্রমশঃ।

ব্যাসিলী-বদল।

১

"আমাদের দেশে—কেবল আমাদের দেশে কেন—সকল দেশেই সুকুমার-মতি বালকবালিকাদিগের জন্য যে সকল পুস্তক রচিত হয়, সে সকলেই পরম

কাল্পনিক পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্ষমতার উপর এই বিশ্ব-রহস্য-রচনার আরোপ করিয়া অজ্ঞান লেখকগণ বিদ্যার্থীর অনুসন্ধিৎসার সর্ব্বনাশ করেন। বিদ্যার্থীর হৃদয়ে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিয়া কোথায় তাঁহারা তাহাদিগকে সকল বিষয়ে মৌলিক চিন্তায় উৎসাহিত করিবেন, না মানবজ্ঞানের ধ্যানধারণার অতীত কোনও শক্তির কল্পনা করিয়া তাহাদিগের উদ্গতপ্রায় অনুসন্ধিৎসার অঙ্কুর বিনষ্ট করেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্যে জগতের জ্ঞানোন্নতির কত ক্ষতি হয়—উন্নতির প্রবাহবেগ কিরূপ প্রতিহত হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না; বা বুঝিলেও, সংস্কারবশবর্ত্তী হইয়া সে দিকে মন দেন না। তাঁহাদের এইরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করা জ্ঞানান্বেষিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আশা করি, এ বিষয়ে লোক আর নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বাস্তবিক, এই বিশ্ব-রহস্যের কারণ সন্ধান করিলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর এক প্রকার বীজাণুকে বহু রহস্যের নিয়ন্তা বা স্রষ্টা বলিয়া বুঝা যায়। কি ভূমিতে—কি অনিলে—কি সলিলে, সর্ব্বত্রই ইহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে ও বর্দ্ধিত হয়। ইহাদের ক্ষমতার কথা মনে করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল বীজাণু—ব্যাসিলী, ব্যাক্‌টিরিয়া, মাইক্রোব, এই তিন নামে পরিচিত। গুণ-ভেদে ইহারা আবার দুই জাতিতে বিভক্ত—সুশীল ও দুঃশীল। যে তামাকে হাভানা চুরুট প্রস্তুত হয়, তাহার যে তার, তাহা অন্য তামাকে পাওয়া যায় না; যে সরে কৃষ্ণনগরের সরভাজার 'শচীর রসনাযোগ্য সুমধুর তারে'র সঞ্চার হয়, সে সরের যে তার, সে তার কাশী, কাঞ্চী, কনখল, কোন স্থানের সরে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, হাভানা চুরুটের তামাকে বীজাণু থাকে, অন্য চুরুটের তামাকে তাহার অভাব—কৃষ্ণনগরের সরে যে বীজাণু থাকে, সীতাভোগের রাজধানী বিদ্যার বাপের বাড়ী বর্দ্ধমানে, বা ছানাবড়ার ছাপাম্নগড় বহরমপুরে তাহা পাওয়া যায় না। আর দুঃশীল ব্যাসিলীগুলি জীবদেহে রোগোৎপত্তির কারণ। জীবদেহে প্রবেশ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা রোগ উৎপন্ন করে। তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিলে রোগে নষ্ট হইবেই। সুতরাং তাহাদিগের বিনাশই চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য; আর সেই জন্যই ইন্‌জেকশন চিকিৎসা অর্থাৎ বেধ্য চিকিৎসায় যত শীঘ্র উপকার দর্শে, আর কোন চিকিৎসায় অর্থাৎ সেক তাপে বা সেবনে তত শীঘ্র উপকার দর্শিতে পারে না।"

শীতের মধ্যাহ্নে শয্যায় শয়ন করিয়া ডাক্তার নলিন 'কার' নিদ্রার আয়োজন

করিতে করিতে একখানি ডাক্তারী মাসিকপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলেন। ডাক্তার নলিন কারের আসল নাম—শ্রীনলিনী-মোহন কর। বাল্যকালে খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময় বালক নলিনী বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী কহিতে ও ইংরাজী পোষাক পরিতে শিখিয়াছিল। তাহার কথা শুনিলে ও পোষাকের কায়দা দেখিলে লোকে মনে করে, সে দীর্ঘকাল বিলাতে কাটাইয়াছে। নহিলে কি এ সব এমন দুরস্ত হয়! কিন্তু আসলে সে বোম্বাই মেলগাড়ীতে একবার খড়্গপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল—আর নহে! বাল্যকালেই সে নলিনীমোহন কর নামটাকে "নলিন কারে" পরিণত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সেই জন্য তাহার কোন কোন বদরসিক সতীর্থ তাহাকে দেখিলে বলিত—"এ কার বিট্‌ এ ডেম্‌।" তাহার পর সে যখন ডাক্তারী পড়িতে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে, তখন সে পুরা দস্তুর মিষ্টার কার। তাসে ব্রিজ খেলিতে, বাঁকা করিয়া সিগারেট মুখে ধরিয়া ধূমপান করিতে, অকারণে আই-গ্লাসে চক্ষু ঢাকিতে —সতীর্থদলে তাহার সমকক্ষই কেহ ছিল না। সর্ব্বত্রই বদরসিক লোক থাকে—মেডিকেল কলেজেও ছিল; তাহারা মিষ্টার কারকে "চালিয়াৎ" বলিত। তাহার পর সে ডাক্তার হইয়া বাহির হইল; সে রোগীর বাড়ীতে যাইয়াই ঘড়ী দেখিত—আর বলিত, কয় বাড়ীতে ডাক্তারের (সকলেই অবশ্য য়ুরোপীয়) সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। দুনিয়ায় যেমন বদরসিক অনেক, —তেমনই বোকাও অনেক। বোকারা তাহার ভড়ঙ্গের ভোলায় ভুলিত; বদরসিকরা তাহার কথা লইয়া হাসাহাসি করিত, তাহাকে "ফ্যাস-ফিজ" অর্থাৎ "ফ্যাশনেবল ফিজিসিয়ান" বলিত। ঔষধ ত সকল ডাক্তারই খাওয়ায় —সে ত সেই "আন্তিকালের" ব্যবস্থা—ছোঃ, সে নিতান্তই পুরাতন! তাই মিষ্টার কার ইনজেকশন চিকিৎসারই সমধিক পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং যে প্রবন্ধ হইতে উপরে একাংশ উদ্ধৃত হইল, সেটি তাহার কাজে লাগিবে মনে করিয়া সে প্রবন্ধটি পাঠ করিল। লেখকের নাম—বিধুশেখর রায়। তিনি মিষ্টার কারের সতীর্থ—ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন।

বিধুশেখরের সহিত তাহার অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু সে শুনিয়াছে, বিধুশেখর ব্যাসিলীর চাষ করিয়া থাকেন। আজ এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহার সেই কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবিল, বিধু-

শেখর যখন ব্যাসিলী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়াছে—স্বয়ং পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্লেষণের কাজ করে, তখন তাহার সহিত পরিচয়ে তাহার কিছু লাভও হইতে পারে। এই কথা মনে করিয়া সে স্থির করিল, একবার বিধুশেখরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। রোগী থাকুক আর নাই থাকুক, ডাক্তারের পক্ষে বাড়ীতে বসিয়া থাকা পশারের হানিজনক। তাই সকালে বিকালে ডাক্তার কার অনেকটা করিয়া ঘুরিয়া আসিত। কখনও সে মিউনিসিপ্যাল বাজারের সস্তা কেক খরিদ করিতে যাইত, কখনও বা গড়ের মাঠে বিনামূল্যে হাওয়া "খাইতে" যাইত; লোক জিজ্ঞাসা করিলে ভবানীপুরের রোগীর গল্প জুড়িয়া দিত। "শুভস্য শীঘ্রম্,"—তাই নলিন স্থির করিল, সেই দিনই অপরাহ্নে সে ভবানীপুরে অনির্দ্দিষ্ট এবং অনির্দ্দেশ্য রোগীর সন্ধানে না যাইয়া বিধুশেখরের বাড়ী যাইবে।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে মাসিকপত্রখানা ফেলিয়া কম্বলটা টানিয়া গাত্র আবৃত করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইল।

২

কিন্তু সে দিন অপরাহ্নে নলিনীর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। কারণ, সে বাহির হইবার পূর্ব্বেই রোগীর বাড়ী তাহার ডাক পড়িল—পাড়ার একটি বাড়ীতে একটি মেয়ে খেলা করিতে করিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল; বাড়ীর লোক ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর কাছের ডাক্তারকে ডাকিতে আসিয়াছিল। ডাক্তার যতক্ষণ বাড়ীতে পা দিলেন—রোগী ততক্ষণে সজ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিতেছেন না। তাঁহাদের ভীতি-ভাব লক্ষ করিয়া মেয়েটি কাঁদিতেছে, আর তাহার কান্নাকে কোনরূপ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি স্থির করিয়া মেয়েরা আরও ভয় পাইতেছেন। মেয়েটির মাথায় ও মুখে ঠাণ্ডা জল দেওয়া ও পাখার বাতাস করা চলিতেছে। শীতের সময় তাহাতেও বোধ হয় তাহার কান্না বাড়িতেছে! এই অবস্থায় নলিন তথায় উপস্থিত হইল। পাঁচ সাত জন মহিলা এক সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—নলিনী, পূর্ব্বেই যিনি তাহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে ব্যাপারটা শুনিয়াছিল। পাখা করা বন্ধ করিতে বলিয়া সে প্রথমে মেয়েটির হাত, পা,

পাঁজরা, সব পরীক্ষা করিতে লাগিল—হাড় ভাঙ্গিয়াছে কি না, অথবা স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে কি না, দেখিতে হইবে। অপরিচিত ব্যক্তির পুষ্ট অঙ্গুলীর প্রবল চাপে মেয়েটি আরও চীৎকার করিতে লাগিল। মেয়েরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই একটা কিছু হইয়াছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাড় ভাঙ্গে নাই ত?" গম্ভীরভাবে নলিন বলিল, "না। তবে 'ইনটারন্যাল'—অর্থাৎ এই শরীরের মধ্যে কোন 'ইন্‌জুরী'—কি না ক্ষতি—হয় ত হইয়াছে।" সে পকেট হইতে ষ্টেথস্কোপ বাহির করিয়া আবার পরীক্ষা করিল, এবং শেষে "একোয়া রোজা"—কি না গোলাপজলের সঙ্গে একটু "টিংচার আর্নিকা" খাওয়াইবার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া বলিয়া আসিল, "দরকার হইলে এক ঘণ্টা পরে খবর দিবেন—আমি ঘুরিয়া আসিব।"

খবরের আশায় সে ঘুরিতে গেল না। কিন্তু খবর আর আসিল না। কারণ, ডাক্তার যাইতে না যাইতে মেয়েটি গরম কাপড়ে আবৃত হইলে বিস্ময়কর দ্রুততাসহকারে ক্রন্দন বিস্মৃত হইয়া মাতৃস্তন্যপানে সানন্দে মনোযোগ দিল, এবং ডাক্তারখানা হইতে ঔষধের শিশি লইয়া তাহার কাকা ফিরিবার পূর্ব্বেই নিতান্ত নির্লজ্জভাবে নিদ্রিত হইল!

কিন্তু নলিনীর সঙ্কল্পে দৃঢ়তার অভাব ছিল না। তাই পরদিন সে বেলা পড়িতে না পড়িতে গাড়ী আনিতে বলিল। পত্নী শান্তিলতা জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকাল সকাল?"

নলিনীর জীবনে এক জনের কাছে সে কোন সত্য গোপন করিত না—তাহার পত্নীকে সে সব কথা বলিত। সে অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছিল, যে কাযে সে নিজের বুদ্ধিতে চলিয়াছে, সে কাজে প্রায়ই ঠকিয়াছে—আর যে কাজে শান্তির মতে চলিয়াছে, সেই কাজেই প্রায় জিতিয়াছে। তাহার জিনিসপত্র সবই শান্তি ঠিক করিয়া রাখে—কিসে সব ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পাইয়া সে তাহার ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে, শান্তি সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিত। সেই জন্য নলিনী সব কথা তাহাকে বলিত। সে শান্তির কথায় উত্তর দিল, "আজ বৈকালে রোগী নাই, তাই এক জন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"বিধুশেখর রায়।"

"কই, তাঁহার কথা ত তোমাকে বলিতে শুনি নাই!"

"না। বিধুও ডাক্তার—আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহার কাছে একটু কাজ আছে।"

"কি কাজ?"

"সে ইন্‌জেকশন চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে—ইন্‌জেকশনের ঔষধ প্রস্তুত করে। তাহার সাহায্যে ব্যবসার কিছু সুবিধা হইতে পারে।"

"সে ত ভালই।"

তাহার পর শান্তি কহিল, "বিধুশেখর রায় কে? গুপ্তিপাড়ায় বাড়ী?"

নলিনী বলিল, "তা ত জানি না।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "তোদের আলাপ বুঝি কেবল 'ভাল আছেন ত?'—এই পর্য্যন্ত? পরিচয়ের ধার ধার না! বিধুশেখর রায় ডাক্তার—যিনি গোয়াবাগানে ডাক্তারী করেন, তিনি ত?"

"হাঁ। তুমি যে একেবারে থ্যাকারের 'ডাইরেক্টারী' দেখিতেছি! তাই বটে।"

"কাহারও পরিচয় দিলে বলিবে—দক্ষিণে ঘটক; ঠিকানা বলিলে বলিবে—ডাইরেক্টারী। আমি একা কত কি হইব?"

"সবে ধন নীলমণি হইলে এমনই হয়। অত গুণ নহিলে আর তোমাকে গৃহিণী, সচিব, সখী—সব বলিয়া এত আদর করি?"

নলিনীর কথাগুলি অত্যুক্তি নহে।

শান্তি বলিল, "আমার চাঁপাকেও ত জান—বিধুবাবু চাঁপার ভগিনী বিশাখাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

আদর করিয়া শান্তির গণ্ডে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া নলিনী যাইয়া গাড়ীতে উঠিল।

৩

এক দল লোক আছে, যাহারা যে কাজটা ধরে, সেই কাজ লইয়াই পাগল হয়। মানুষের মস্তিষ্ক না কি নানা অংশে বিভক্ত—এক এক অংশে এক এক ভাবের বাস—যাহার যে ভাব যত প্রবল, তাহার মস্তিষ্কে সেই ভাবের আবাস-অংশ তত পুষ্ট। তাহা হইলে এই সব লোকের মস্তিষ্কে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ নাই—সবটাই এক; তাই তাহারা যখন এক দিকে মন দেয়, তখন আর অন্য দিকে মন দিতে পারে না। বিধুশেখর সেই দলের লোক।

নলিনী বিধুশেখরের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল—সব বাড়ীটাই যেন

একটা পরীক্ষাগার। বাঙ্গালীর বাড়ী; কিন্তু কোথাও একটুও ময়লা নাই—উঠানের কোণে আবর্জ্জনা নাই, কোথাও নিষ্ঠীবনচিহ্ন নাই—তামাকের গুল নাই। আছে কেবল কতকগুলি খাঁচায় খরগোশ, আর গেনি পিগ্—সেই-গুলির দেহে রোগরসের পরীক্ষা হয়। নলিনী ভাবিল—এমন নহিলে বিজ্ঞাপন, আর এমন বিজ্ঞাপন নহিলে লোক ভুলে? এখন বিজ্ঞাপন দিতে হইবে এমন করিয়া যে, কায ঠিক হয়, অথচ লোক বিজ্ঞাপন বলিয়া বুঝিতে না পারে; অর্থাৎ, লোক বিজ্ঞাপনে ভুলে, কিন্তু সে কথা স্বীকার করে না—সেইটুকু বুঝিয়া বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিধুশেখরের বিজ্ঞাপনে বাহাদুরী আছে বটে!

দ্বারবান নলিনীকে তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল—তাহার পর সে বিধুশেখরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে শুনিয়া সঙ্গে করিয়া দ্বিতলে লইয়া গেল। সিঁড়ির প্রাচীরে বড় বড় অক্ষরে নানা কথা লিখিত, যথা—"থুথু ফেলিবেন না", "নাক ঝাড়িবেন না", "তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ।" এ সব নিষেধ। আর লিখিত—"বিনামূল্যে কাহাকেও ঔষধ বা উপদেশ দেওয়া হয় না।" সর্ব্বোচ্চ স্থানে লিখিত,—"কায শেষ হইলে আর বৃথা কথায় সময় নষ্ট করিবেন না।" এইটি পড়িয়া নলিনী একটু দমিয়া গেল। যে লোক পয়সা-দেওয়া আগন্তুককে এমন অনুরোধ (আদেশই বটে) করিতে পারে, সে ত আস্ত পাগল। সে যে কাযে আসিয়াছে, সেটা তাহার কায হইলেও, বিধুশেখরের নিতান্তই অকাজ। কি করা কর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে সে ভৃত্যের সঙ্গে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিল। ভৃত্য একটি বদ্ধ দ্বারের কাছে যাইয়া একটি বোতাম টিপিল—পাশের ঘরে ঘণ্টা বাজিল; তাহার পর ঘরের ভিতর হইতে প্রবেশাজ্ঞা পাইয়া ভৃত্য নলিনীর নামের কার্ড লইয়া ঘরে ঢুকিল। কয় মিনিট পরে বিধুশেখর আসিয়া নলিনীকে দেখিয়া বলিল, "কে, আপনি!"

নলিনী আত্মীয়তা করিতেই আসিয়াছিল, বলিল, "বটে! আমাকে আবার আপনি বলা সুরু করিলে!"

বিধুশেখর বলিল, "তবে আর বলিব না। কি দরকার?"

নলিনী ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ!—এ যে সেই মূর্ত্তিমান "কায শেষ হইলে আর বৃথা কথায় সময় নষ্ট করিবেন না!" এখন উপায়? সে বলিল, "আমি তোমার কাজ দেখিতে আসিয়াছি।"

বিধুশেখর নলিনীর দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের বিকাশ

দেখিলে মনে হয়, এমন কথা যে কেহ তাহাকে বলিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

তাহার ভাব দেখিয়া নলিনী বলিল, "আমি কালকে তোমার প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমি ইন্‌জেকশন চিকিৎসাই করি। তাই তোমার কায দেখিতে আসিলাম।"

বিধুশেখরের মুখ হইতে বিস্ময়ের ভাব দূর হইল—সে মুখে যেন একটু প্রফুল্লভাব দেখা দিল। সে বলিল, "সে ত ভাল কথা। কিন্তু তুমি জুতায় রাস্তার ধূলা—জামায় বাহিরের কত ব্যাসিলী আনিয়াছ। তোমাকে কেমন করিয়া পরীক্ষাগারে লইয়া যাই? আর সে ঘরে না যাইলে ত বুঝান যাইবে না?"

নলিনী উত্তর দিল, "আমি জুতা ও কোট খুলিয়া যাইতেছি—আমি ত আর কোনও জিনিস ঘাঁটিব না।"

"আচ্ছা।"

নলিনী জুতা ও কোট খুলিতে খুলিতে ভাবিল—পাগল বটে!

ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল, ঘরের প্রাচীর মসৃণ টালিতে আবৃত—মেজেয় মার্ব্বেল পাথর—ঘরের আসবাব যথাসম্ভব কাচের।

বিধুশেখর নলিনীকে ব্যাসিলী দেখাইতে দেখাইতে—কাজ বুঝাইতে বুঝাইতে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল—কতক্ষণ বকিতেছে, তাহা বুঝিতেও পারিল না। শেষে সন্ধ্যার অন্ধকার হইলে যেন তাহার চৈতন্য হইল।

একটি টেবলে দশ বারটি ঔষধ প্রস্তুত ছিল—ইন্‌জেকশন চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা সেই সব ঔষধ প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন। নলিনী সেগুলির সংখ্যা দেখিয়া ভাবিল—ইহার দ্বারা উপকার করাইয়া লইতে পারিলে উপকার অনিবার্য্য। তাহার পর আবার বিশ্লেষণ আছে। সুতরাং বিদায় লইবার পূর্ব্বে নলিনী স্থির করিল, বিধুশেখরকে "হাত করিয়া" "খেলাইতে" হইবে।

৪

যে কথা, সেই কাজ। এক দল লোক সঙ্কল্প করিতে খুব মজবুদ কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করে না। সেটা অক্ষমতা হেতু বা আলস্যপ্রযুক্ত। নলিনী সে দলের লোক ছিল না। সে সঙ্কল্প করিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিত। এ ক্ষেত্রেও সে তাহাও করিল। সে বিধুশেখরের সঙ্গে খুব মিশিয়া গেল। তাহাতে তাহার ব্যবসায়ের সুবিধাও যে না হইতে লাগিল,

এমন নহে। কারণ, বিধুশেখর ব্যবসায়ে "দোকানদারীর ধার" ধারিত না; সে রোগবীজের পরীক্ষায়—বৈজ্ঞানিক ভাগে মন দিয়াছিল; চিকিৎসার দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সেই চিকিৎসাতেই নলিনীর লক্ষ্য ছিল—সে "দোকানদারীটা"ও ভাল করিয়া কণ্ঠ করিয়াছিল। সুতরাং ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, যাহারা পরীক্ষাদির জন্য বিধুশেখরের কাছে আসিত, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার ভারটা নলিনীই লইত; বিধুশেখর কাজ করিয়াই সময় পাইত না। ইহাতে খুবই সুবিধা হইল।

এই সময় বিধুশেখর দুইটা পরীক্ষা লইয়া বড় বিব্রত ছিল। সে যক্ষ্মার ও উন্মাদের রোগ-রস প্রস্তুত করিতেছিল—সেই সব রোগ-রসের কার্য্য পরীক্ষা করিতেছিল। সে পরীক্ষার কথা সে নলিনীকে বলিত বটে; কিন্তু সে কাজে নলিনীকে হাত দিতে দিত না। যত দিন সাফল্যলাভ না হয়, ততদিন সে কাজ ত অসম্পন্ন—ততদিন তাহা পরীক্ষকের—আর কাহারও নহে।

৫

নলিনীর শ্যালক কুমুদিনীকান্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি চাকরীর শিক্ষানবীশীর পরেই বাটোয়ারার কাযে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মফঃস্বলে পানাপুকুরের তীরে তাম্বু ফেলিয়া কায করিতে হইত। তিনি ম্যালেরিয়া বাধাইয়াছিলেন। কুইনাইন-সেবনে জ্বরের বেগ কমিয়াছিল! কিন্তু তাঁহার শঙ্কিত চিত্তের বেগ কমে নাই। তাঁহার মনে হইত, প্রত্যহ অপরাহ্নে শরীরটা খারাপ হয়—চক্ষু জ্বালা করে। বগলে থারমোমিটার দিয়া জ্বরের চিহ্ন না পাইয়া তিনি জিহ্বায় তাপ লইতেন—একটু জ্বর ত হয়! তাঁহার শরীর দিন দিন কৃশ হইতেছিল—হয় জ্বরে, নহে ত দুর্ভাবনায়। তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে দেহের ওজন দেখিতেন—প্রত্যহ তাপ লইয়া খাতায় লিখিতেন—ডাক্তার দেখাইতেন—ভাবিতেন। শেষে মফঃস্বলের ডাক্তারেরা তাঁহার আশঙ্কা দেখিয়া ও দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া একটু শঙ্কিত হইলেন—বলিলেন, এমন ভাবে শরীর ক্ষয় হওয়াটা ভাল নহে, ইহা ক্ষয়রোগের চিহ্ন হইতে পারে। কুমুদিনীকান্ত সাব্যস্ত করিলেন, ও "হইতে পারে"টা রোগীর কাছে তাহার প্রকৃত অবস্থা না বলিবার ছল, তাঁহার দেহে ক্ষয়রোগের চিহ্নই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন—যাহা কিছু ছিল, স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিলেন—আহা সে যুবতী, তাহাকে কত কষ্টই পাইতে হইবে! তাহার পর ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

ডাক্তার দেখাইবার কথা হইলে কুমুদিনীকান্ত হতাশভাবে বলিলেন, "কিই বা আছে যে, আর পয়সা নষ্ট করিব? থাক।" শেষে অবশ্য ডাক্তার দেখান হইল। ডাক্তারেরা যক্ষ্মার কোন চিহ্ন পাইলেন না বটে, কিন্তু আশাও দিতে পারিলেন না; খাতা দেখিয়া বলিলেন, "শরীরের ওজন যেরূপ কমিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কাই হয়। বিশেষ, এ ব্যাধি যতদিন দেহে পুষ্ট হয়, ততদিন আমরা ধরিতে পারি না—যখন ধরিতে পারি, তখন চিকিৎসার অতীত।" টিউবারক্যুলিন টেষ্ট; সেও সব সময় নির্ভরযোগ্য হয় না।" তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কেবল এক জন বৃদ্ধ চিকিৎসক বলিলেন, "ওজন দেখা - তাপ লওয়া—ঔষধ খাওয়া, তিনই ছাড়িয়া দিলে যদি রোগ সারে।"

ভ্রাতার জন্য শান্তিলতার আশঙ্কার অন্ত ছিল না। সে কেবলই স্বামীকে বলিত, "কোন উপায় কি করিতে পার না?"

একদিন নলিনী একটা উপায় দেখিল। সে দিন বিধুশেখর তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার একটা পরীক্ষা শেষ হইয়াছে—যক্ষ্মার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ডাক্তার কক্ যাহা পারেন নাই, সে তাহা পারিয়াছে। এখন উন্মাদের ঔষধটা আবিষ্কার করিতে পারিলেই সে এই দুই আবিষ্কারের কথা জগতে প্রচারিত করিবে।

নলিনী স্ত্রীকে বলিল, "বিধুশেখর যক্ষ্মার ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছে। যদি সেটা আনা যায়, তবে বোধ হয় রক্ষা হয়।"

শান্তি বলিল, "সেইটাই আন।"

"সে কাজ আমার সাধ্যাতীত।"

"কেন?

"সে এখন সে ঔষধ বাহির করিবে না।"

"উপায়?"

"তাহাই ভাবিতেছি।"

"আমি চাঁপাকে লইয়া যাইয়া বিশাখাকে ধরিব—ঔষধ আমি আনিবই।"

"সে বড় কঠিন ঠাঁই। বিশাখা, ললিতা, চন্দ্রাবলী ত পরের কথা, স্বয়ং রাধা চাহিলেও সে এখন ঔষধ দিবে না।"

"কেন?"

"বিধুশেখর একটি আস্ত পাগল—মতের দাস। সে আরও বিস্তৃতভাবে

কাজ না করিয়া—দেশবিদেশে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া ঔষধ বাহির করিবে না।"

শান্তি একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি নিশ্চয় বলিতে পার যে, ঔষধে রোগ সারিবে।"

"নিশ্চয় বলিতে না পারি—এ কথা বলিতে পারি যে, খুব সম্ভব সারিবে। কারণ, জীবদেহে যে সব পরীক্ষার সাফল্য দেখিয়া আমরা ঔষধের গুণ বিচার করি, সে সব পরীক্ষাই করিয়া দেখা হইয়াছে।"

"ঔষধ আমাকে আনিতেই হইবে।"

"ইংরাজীতে না বলে—কিনিয়া, চাহিয়া, ধার করিয়া বা চুরী করিয়া—এই কয়টা উপায় আছে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "যেটাই হউক—একটা উপায় করিতে হইবে।"

পরদিন মধ্যাহ্নে শান্তি স্বামীকে বলিল, "আমি চাঁপার বাড়ী চলিলাম। তুমি যে ঔষধের কথা বলিয়াছ, তাহা কোন্ ঘরে, কোথায়, কেমন শিশিতে আছে, আমাকে ঠিক করিয়া বলিয়া দাও—যেন ভুল না হয়।"

নলিনী কাগজে নক্সা আঁকিয়া ঘরের কোথায়—কোন আলমারীতে কোন্ থাকে ঔষধ আছে—দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল; কেমন পাত্রে ঔষধ আছে, তাহাও বলিয়া দিল।

শান্তি কাগজের টুক্‌রাখানা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নলিনী তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হইল।

৬

বিশাখা বলিল, "দিদি, এ কাজ আমি কেমন করিয়া করিব?"

শান্তি কাঁদিয়া ফেলিল।

শান্তির চাঁপা কনিষ্ঠাকে বলিলেন, "চাঁপার ভাই মরিতে বসিয়াছে। তুই যদি একবার তার স্ত্রীর মলিন মুখ দেখিস, তবে তুই আর এমন কথা বলিতে পারিস্ না। এই ঔষধে সে বাঁচে।"

"কিন্তু আমি কেমন করিয়া চুরী করিব? তিনি জানিতে পারিলে কি ভাবিবেন? আর তিনি জানিতে না পারিলেও আমি মনকে কি করিয়া বুঝাইব?"

শান্তির চাঁপা কিন্তু তাহার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি যেমন করিয়াই হউক, ভগিনীকে দিয়া এ কাজ করাইয়া লইবেন। তিনি

বলিলেন, "মরণ বাঁচনের কথা না হইলে আমি এত কথা বলিতাম না। রচু কি? দু'মাস পাদ্রীস্কুলে পড়িয়া বুঝি তোর এই বোধ হইয়াছে? স্বামীর জিনিস স্ত্রী লইলে সে কি চুরী করা হয়? আমাদের সর্ব্বপ্রথম কাজই ত কর্ত্তাদের মন চুরী করা। যদি চুরীই বলিস, এ কাজ ভালর জন্য না মন্দের জন্য? তোর স্বামীর ঔষধে যদি এক জনের প্রাণরক্ষা হয়, তবে সেটা পাপ, না পুণ্য?"

তবুও বিশাখা দিদির মতে মত দিতে পারিল না।

তখন তাহার দিদি যুক্তির তূণীর হইতে শেষ বাছা বাণটি বাহির করিলেন। বিশাখার ছেলেটি মাসীর কোলে ছিল। তিনি বলিলেন, "কি জানি, বিশাখা, তোদের কেমন বুঝ। আমার ত ভয় করে; গুঁড়াগাড়া লইয়া ঘর করিতে হয়; লোকের আশীর্ব্বাদ পাইলেই বাঁচিয়া যাই—তাহাদের গায় বিধবার তপ্তশ্বাস—অভিসম্পাত লাগাইতে নাই।"

এইবার ফল ফলিল। হিন্দুর মেয়ে পাদ্রীর স্কুলে যাহাই পড়ুক না কেন, স্বামীর যত্নই অবিশ্বাসে অভ্যস্ত হউক না কেন, তাহার সংস্কার দূর করিতে পারে না। সে বিশ্বাস করিতে পাইলেই—একটা কেন, দশটা মানিতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। ছেলের গাত্রে তপ্তশ্বাসের কথায় বিশাখার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার দিদি তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

বিশাখা একটু ভাবিল; তাহার পর বলিল, "তুমি কি আমাকে এই কাজ করিতে বল?"

"হাঁ লো হাঁ।"

"কিন্তু কেমন করিয়া ঔষধ বাছিয়া লইবে?"

শান্তি বলিল, "আমি বাছিয়া লইতে পারিব।" সে নক্সাখানি বাহির করিয়া নলিনী যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহাই বলিল।

তখন বিশাখা বলিল, "তবে আমি দিদি আসিয়াছেন বলিয়া উঁহাকে ডাকিয়া আনি। আপনি ঘরে যাইয়া যাহা করিতে হয়—করুন। আমি কিছু করিতে পারিব না।"

শান্তি বলিল, "তাহা হইলেই হইবে।"

বিশাখা স্বামীকে ডাকিয়া আনিল। তাহার দিদি ভগিনীপতির সঙ্গে নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

বিশাখা শান্তিকে স্বামীর পরীক্ষাগারে লইয়া গেল।

শান্তি স্বামীর নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একটি আধার লইয়া, সে যেন স্পর্শমণি পাইল, এমনই আগ্রহে বক্ষের বসনে লুকাইয়া রাখিল; তাহার পর সেই শূন্য স্থানে সেইরূপ আর একটি আধার রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার চাঁপা বুঝিতে পারিলেন, সে ঈপ্সিত বস্তু পাইয়াছে। তখন তিনি বিধুশেখরকে বলিলেন, "তোমার কাজের ক্ষতি হইতেছে। তবে এখন যাও।"

বিধুশেখর নিষ্কৃতি পাইল। সে পরীক্ষা করিতে করিতে চলিয়া আসিয়াছিল; ফিরিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

৭

শান্তি ফিরিয়া যখন স্বামীকে ঔষধের আধারটি দিল, তখন নলিনীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তবে ঔষধ আনিতে কোনও ভুল হইয়াছে কি না, সেই জন্য সে পুনঃপুনঃ শান্তিকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল; কারণ, সব ঔষধ একইরূপ পাত্রে থাকে—আর পাত্রের গায়ে নাম লিখা না থাকাতে কোন্‌টি কিসের ঔষধ, তাহা বিধুশেখর ব্যতীত কেহই ঠিক বলিতে পারিত না।

কিন্তু শান্তির মনে সেরূপ কোন সন্দেহের অবকাশই ছিল না। বিধুশেখর যে সেই দিনই পরীক্ষার জন্য আধারগুলি সরাইয়া থাকিতে পারে, এমন সন্দেহই তাহার হয় নাই। সে নক্সা ধরিয়া কেমন করিয়া—কোথা হইতে ঔষধ আনিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিল। তখন নলিনী নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পরদিনই সে কুমুদিনীকান্তের দেহে ঔষধ প্রয়োগ করিল।

৮

ঔষধের ফলে কুমুদিনীকান্তের উন্মাদ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। নলিনী চিন্তিত হইল। শান্তি স্বামীর উপর রাগ করিল। তখন নলিনী অনেক ভাবিয়া দেখিয়া শান্তিকে বুঝাইল, নিশ্চয়ই ঔষধ আনিতে ভুল হইয়াছে। বোধ হয়, কোন কারণে বিধুশেখর ঔষধের পাত্রগুলির স্থান বদলাইয়া রাখিয়াছিল; শান্তি যক্ষ্মার ঔষধ আনিতে উন্মাদরোগের ঔষধ আনিয়াছে। হিতে বিপরীত হইয়াছে। তাহা না হইলে এমন হইতে পারে না।

শুনিয়া শান্তি কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "আমি এ কি করিলাম! ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া ভাইকে পাগল করিয়া দিলাম!"

নলিনী বলিল, "উন্মাদের ঔষধ আছে—রোগ সারিতে পারে। যাহা হউক, আমি ব্যাপারটা বুঝিয়া আসি।"

সে বিধুশেখরের কাছে যাইয়া তাহাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিল; কারণ,

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বিধুশেখর উন্মাদের ঔষধ পরীক্ষা করিতেছিল—কিন্তু জীবদেহে তাহার ফলে যক্ষার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে!

নলিনী প্রশ্ন করিয়া জানিল, যেদিন শান্তি ঔষধ লইয়া গিয়াছিল, সেদিন স্ত্রীর কথায় বিধুশেখর পরীক্ষা করিতে করিতে শ্যালিকার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার সময় যে স্থানে যক্ষার ঔষধ থাকিত, সেই স্থানে উন্মাদের ঔষধ ও যেস্থানে উন্মাদের ঔষধ থাকিত, সেই স্থানে যক্ষার ঔষধ রাখিয়া গিয়াছিল।

নলিনী ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল—শান্তি উন্মাদের ঔষধ লইয়া তাহার স্থানে যক্ষার ঔষধ রাখিয়া গিয়াছিল, আর বিধুশেখর সেই ঔষধই জীবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়াছে। কিন্তু সে কথা সে প্রকাশ করিতে সাহস করিল না।

৯

কিন্তু বিধুশেখরের উন্মাদের ঔষধের পরীক্ষা শেষ হয় নাই—ঔষধের তেজও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সপ্তাহমধ্যেই কুমুদিনীকান্তের পাগলের লক্ষণ দূর হইতে লাগিল; আরও সপ্তাহমধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হইল। কেবল প্রকৃতিস্থ নহে, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইল। তাহার ম্যালেরিয়ার পর হইতে সে কেবল আশঙ্কায় ও দুর্ভাবনায় ক্ষীণ হইতেছিল। কয় দিন পাগলের মত হইয়া সে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল—ঔষধজাত রোগ-লক্ষণের চাঞ্চল্যে তাহার দেহের জড়তাও দূর হইয়া গিয়াছিল। কাযেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

কয় দিন কুমুদিনীকান্তকে লইয়া বিব্রত থাকায় নলিনী বিধুশেখরের কাছে যাইতে পারে নাই। তাহার পর যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার দুঃখের ও অনুতাপের আর সীমা রহিল না। অসাফল্যের বেদনায় ও দুশ্চিন্তায় একান্ত অধীর ও চঞ্চল হইয়া বিধুশেখর নিজ দেহেই উন্মাদের ঔষধ প্রবিষ্ট করাইয়াছে। সে একেবারে উন্মত্ত! দেখিয়া নলিনী ভাবিল, এ কি করি-লাম—এমন সর্ব্বনাশও করিলাম! কেন সে দিন বিধুশেখরকে সব কথা বলি নাই! রোগের লক্ষণ দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, বিধুশেখর নিজদেহে যে ঔষধ প্রবিষ্ট করাইয়াছে, তাহা উগ্র—যদি তাহা পূর্ণবীর্য্য লাভ করিয়া থাকে, তবে ত বিধুশেখর চিরজীবন উন্মত্ত হইয়া থাকিবে! সে বন্ধুর কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে!

সব কথা শুনিয়া শান্তিরও অনুতাপের অবধি রহিল না।

* * * * *

সুখের বিষয়, বিধুশেখর যে ঔষধ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা

উগ্রতর হইলেও, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দীর্ঘ ছয় মাস পাগল থাকিবার পর ধীরে ধীরে তাহার রোগ-লক্ষণ দূর হইতে লাগিল। নলিনী অক্লান্ত-ভাবে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিল। সকলেই তাহার বন্ধুপ্রীতির প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু শান্তি ব্যতীত কেহই তাহার কার্য্যের কারণ অনুমান করিতে পারিল না।

ক্রমে বিধুশেখরও সুস্থ হইল; কিন্তু সুস্থ হইয়া ব্যাসিলীর ব্যাপার একেবারেই ত্যাগ করিল। বিশাখা তাহাকে আর সে ব্যবসা করিতে দিল না।

ব্যাসিলী-বদলের ফলে বিধুশেখরের পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়া গেল; যক্ষার ও উন্মাদের ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াও প্রচারিত হইল না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নাটকের বিশেষত্ব।

নাটক অর্থে ক্রিয়া-চিত্র বুঝাইয়া থাকে। নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার মনোভাব কার্য্যে স্পষ্টীকৃত করাই নাটকের উদ্দেশ্য। নাটকায় ব্যক্তিগণ বাস্তবরূপে পরিগৃহীত হয়। নাটক বিবিধ রকমের হইতে পারে, তাহাদের আকার ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু এক বিষয়ে তাহাদের ঐক্য আছে—তাহা ক্রিয়াপরম্পরার সহিত নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের জীবন্ত-চিত্রের অভিব্যক্তি। ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করা মনুষ্য-প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম—ইহার মজ্জাগত গুণ। অঙ্গভঙ্গি, বাক্য, কিংবা উভয়ের সমন্বয়ে মানুষ তাহার হৃদয়ের ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিয়া থাকে। উৎসবে, পূজামণ্ডপে ও আনন্দের সময় মানুষের হৃদয়তন্ত্রী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শে বাজিয়া উঠে, এবং নৃত্য ও গীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভাব-প্রকাশের আর একটি উপায়, অনুকরণ; কিন্তু অনুকরণ ক্রিয়ায় পরিণত না হইলে তাহা নাটক পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার অনুকরণ নাটকের বীজ। তার পর নাটক যখন সাহিত্যের আকার ধারণ করে, এবং সাহিত্যের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন উহা নাট্য সাহিত্য-রূপ বিশেষ নামে অভিহিত হয়।

নাটকের সহিত অভিনয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জাতীয় সাহিত্যের আদি অবস্থায় গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও

সাহিত্যের প্রথমে নাটকের উদ্ভব দেখিতে পাই না। গদ্যের বহু পূর্ব্বে কাব্যের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ অতীত যুগের স্বপ্নময় দিবসে কবিতা-সুন্দরী মনোহরবেশে আনন্দসুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া মনুষ্য জাতির সমক্ষে কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সভ্য-মানবের জ্ঞানালোক সেই নিবিড় অন্ধ-তমস ভেদ করিতে অক্ষম। কোন্ অপরূপ দৈবশক্তি প্রভাবে জড়ে জৈব-পদার্থের আবির্ভাব হইয়া এই বিশাল প্রাণি-জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল, অভিব্যক্তিবাদ কিংবা বিজ্ঞান যেমন তাহার সন্তোষজনক উত্তরদানে অসমর্থ, মানব-ভাষার প্রথম-উদ্ভব-নির্দ্ধারণে ভাষাবিৎ সুধীমণ্ডলীর বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ পরাজিত, সেইরূপ, কি অবস্থায়, কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে মানব-হৃদি-রঞ্জন গীত ছন্দোবন্ধে প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান একরূপ অসম্ভব। কিন্তু অপর প্রমাণাভাবে অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বোধ হয়, মধুর-কণ্ঠ বিহঙ্গমের অস্পষ্ট আনন্দ-কাকলি, মধুপানমত্ত ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জন, বায়ুহিল্লোলে মৃদু আন্দোলিত সুষমামণ্ডিত পুষ্প, অমল ধবল তুষারশোভিত অভ্রভেদী গিরিশিখর, দিগন্ত-প্রসারিত মহাসিন্ধুর গভীর গর্জ্জন, বালার্ক সিন্দূর-ফোঁটা-শোভিত সুখময়ী ঊষার অপরূপ ছটা, নীলাম্বরে পূর্ণ-শশধরের প্রাণোন্মাদকারিণী শুভ্র সুধাধারা, সমুদ্র-গামিনী কল-কল-নাদিনী নির্ঝরিণীর শ্রুতি-সুখকর মধুর গীতি, জল-প্রপাতের দূরাগত ধ্বনি আদি-মানবের হৃদয়ে এক অভাবনীয় আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। বোধ হয়, সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে কবিতার প্রথম জন্ম।

যাহা হউক, নাটকের জন্ম ও নামকরণের বহুপূর্ব্বে গীতিকবিতা কিংবা মহাকাব্য, কিংবা উভয়েরই উদ্ভব হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক, নাটকের বিশেষত্ব কোথায়? অভিনয়-কলা-কৌশলের সহিত নাটকের সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। উপযুক্ত অভিনেতা নাটকের উপযুক্ত ব্যাখ্যাকর্ত্তা। একটু সামান্য দৃষ্টিতে, একটি ইঙ্গিতে, একটি অঙ্গুলি-সঞ্চালনে, একটু সামান্য হাসিতে, তাহার মুখমণ্ডলে ভাবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের হৃদয়ে যে ভাব, যে ধারণা, যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা ব্যাখ্যাকার সমগ্র ব্যাকরণ শব্দশাস্ত্র ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া দর্শকদিগের হৃদয়ে সেইরূপ অব্যক্ত অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করিতে পারেন না। নাটক লিখিতে হইলে কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া নিয়মের দাসত্ব মানিয়া লইয়া ঘটনাবলীর বর্ণন করিলে

উৎকৃষ্ট নাটক হইবে না। সেক্ষপীয়র জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁহার কয়েকখানি নাটক মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণে, মানব-হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে নিহিত ভাবরাশির পরিস্ফুরণে, বিশ্বসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার নাটকগুলির উপাখ্যানভাগ অপর গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে গৃহীত; কিন্তু লিপিকুশলতা, রচনা-বৈশিষ্ট্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনোহর ভাবের সমাবেশ ও তাহার কর্ম্মে বিকাশ, তাঁহার নিজস্ব।

ভাব নাটকের প্রাণ। বিষয় নাটকের কঙ্কালস্বরূপ—মৃত উপাদান-স্বরূপ। এই বিষয়কে নাটকাকারে পরিণত করিয়া মানব-হৃদয়ের ভাবরাশিকে ক্রিয়া ও বাক্যে বিকাশ করাই নাটকারের প্রধান কার্য্য। নাটকে মানবহৃদয়ের যে চিত্র প্রধান করা হয়, তাহা কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় সমস্ত ঘটনাবলীর সমন্বয়-বিধান করিবে। দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী জীবন-প্রবাহের উদ্দাম স্রোতঃ-স্বরূপ অনন্ত প্রবহমান। কিন্তু এই জীবন্ত ভাবকে নাটকের অত্যাবশ্যক বন্ধনে সংযত করিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে, একটি ঘটনা লইয়া একখানি নাটক হইবে। ইংরাজী নাটকে, বিশেষতঃ সেক্ষপীয়রের নাটকে দেখিতে পাই, প্রধান ঘটনার সহিত একটি করিয়া অন্তঃঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রধান ঘটনার সহিত অপর ঘটনার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটিকে নিম্নতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে আর এক বিষয় লইয়া সমালোচক-দিগের মধ্যে মত-বৈষম্য হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, নাটকে কাল ও দেশের একত্ব থাকা উচিত। কিন্তু হিন্দু ও ইংরাজ নাটককারগণ এই বিধিবন্ধন মানিয়া লন নাই। এই কৃত্রিম বন্ধনের গণ্ডীর মধ্যে নাট-কীয় চরিত্রকে আবদ্ধ রাখিলে নাটকের বিষয়ে লঘুতা আসিয়া পড়ে। কারণ, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে বাস্তব জীবনে এমন খুব কম ঘটনা ঘটে, যাহার বিন্যাসে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষার উন্মেষ হইতে পারে। চরিত্রের পূর্ণতা দেখাইতে হইলে কেবলমাত্র অংশাবশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। মনুষ্যচরিত্র এমনই একটি জটিল বস্তু যে, দুই একটি ঘটনায় তাহার বিশ্লে-ষণ করা সুকঠিন। একটি ব্যক্তিকে চিনিতে হইলে তাহার সমস্ত জীবন, অন্ততঃ তাহার জীবনের বৃহত্তর অংশ দেখিতে হইবে। ঘটনা-বিপর্য্যয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেষ্টনার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবন পরিণতি লাভ করে। প্রধান চরিত্রগুলির পারিপুষ্টিসাধনের নিমিত্ত তাহাদের অন্তর্নিহিত মহনীয়

ভাবগুলির উন্মেষের জন্য একটা জীবনের বৃহত্তর অংশের বিকাশ হওয়া প্রয়োজনীয়। কারণ, দেখিতে পাই যে, পাপাসক্ত কলুষিত ব্যক্তিও উত্তেজনা ও উন্মাদনার বশে কোন জনহিতকর কিংবা উচ্চাঙ্গের কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেই ব্যক্তি আদর্শের উচ্চ আসনে স্থান পাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কেবলমাত্র গোপীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ ও রঙ্গ রস ক্রীড়ার অংশ লইয়া তাঁহার চরিত্র দেখাইতে যাওয়া বিষম বিড়ম্বনা। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী বীরের জীবনে অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভবপর। কেবলমাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশ লইলে তাঁহার দেব-চরিত্রের খর্ব্বতা সাধন করা হয়। অতএব নাটকীয় প্রধান ব্যক্তিগণের চরিত্রের পূর্ণতা দেখাইতে হইলে, চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখাইতে হইলে, ব্যক্তিগণের জীবনের মহত্ত্ব ও গরিমা দেখাইবার জন্য চরিত্রবিশ্লেষণ করিতে হইলে, এবং জটিল মনুষ্য-চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবসমূহ চিত্রাঙ্কনে ফুটাইবার লিপিকুশলতা ও প্রতিভা দেখাইতে হইলে, কাল ও স্থান রূপ মাপকাটী খর্ব্বতা ও সঙ্কীর্ণতা সাধন করিবে সন্দেহ নাই, এবং যে লোক-শিক্ষার জন্য নাটকের জন্ম ও প্রয়োজনীয়তা, তাহা অনেকটা পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নাটকের আর একটি মহান উদ্দেশ্য, দর্শক-হৃদয়ে উচ্চভাব-স্ফূরণ ও তাহার কার্য্যে পরিণতি। কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধন নাটকের চরম লক্ষ্য। কবি যাহাকে তাঁহার নানাবিধ মধুর বাক্যের ছটায় এবং অঘটন-ঘটনপটীয়সী কল্পনার সাহায্যে ব্যক্ত করেন, কিংবা নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া, দর্শকের ন্যায় বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ও ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া দৃশ্য কাব্যের সাহায্যে হৃদয়গ্রাহী করিয়া ফুটাইয়া তোলেন, সুনিপুণ নাট্যকার তাহা ক্রিয়া দ্বারা কিংবা বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া চিত্রকে সজীব করিয়া তুলেন, এবং সেই সঙ্গে ঘটনাস্রোতকে অগ্রসর করিয়া দেন। তান-লয়-সংযোগে একটি সুমধুর গীতি-শ্রবণে কিংবা তারস্বরে কোন একটি উচ্চাঙ্গের কবিতাপাঠে হৃদয়ে একটি পবিত্র ভাব জাগ্রত হয়। দৃশ্যনাটকের অভিনয়-দর্শনে দর্শক-হৃদয়ে কর্ম্মপ্রবণতা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু গীতিকাব্য-পাঠে বা শ্রবণে তাহা হয় না। রবীন্দ্রনাথের "তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুল-হার" কবিতা পাঠ করিলে ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা মনে হয়—বিশ্বজগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যের তিনি যে আধার—তাঁহার মহিমা যে গভীর, এই কল্পনা আমাদের মনকে উন্নত করে। বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দের যে

অপূর্ব্ব বিকাশ, এবং তাহার মধ্যে সেই আনন্দময় পুরুষের যে প্রকাশ, তাহা আমাদের বেশ উপলব্ধি হয়। কিন্তু "মেবার-পতন" কিংবা "চাঁদ বিবি"র ন্যায় একখানি দৃশ্য নাটকের অভিনয়-দর্শনে হৃদয়ে উচ্চভাবের সমাবেশত হয়ই, তাহার পরিণিত করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে অভিনীত হইলে, আমাদের মধ্যেও সেইরূপ কর্ম্মপ্রবণতা আনয়ন করে। অভিনেতা কৃতিত্বের সহিত রঙ্গমঞ্চে তাহার হাভভাব, দেখাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়কে ভিন্ন ভিন্ন রসে সিক্ত করেন, এবং ভাব, ক্রিয়া ও শিক্ষার উন্মেষ করেন।

এই জন্য নাটকীয় চরিত্রের বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। এই জন্য চরিত্র-অঙ্কণে যথেষ্ট লিপিকুশলতার প্রয়োজন; কারণ, প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকা চাই যে, যাহা দ্বারা দর্শকবৃন্দের বা পাঠকবর্গের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। চরিত্রে মানবীয় ভাব পরিপূর্ণ হওয়া চাই। চরিত্র-অঙ্কনে যাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে—যিনি শ্রেষ্ঠ নাটক-কার, তিনি নাট্যোল্লিখিত সামান্য সামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষত্ব আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে সজীব করিয়া তোলেন; পাকা চিত্রকরের ন্যায় তূলিকার সামান্য স্পর্শে সমস্ত চিত্রের সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব সম্পাদন করেন, এবং শুষ্ক কঙ্কালসার দেহে যেন বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিয়া জীবন্তভাব প্রকটিত করেন। চরিত্র ফুটাইতে হইলে দুই একটি কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। নায়ক কিংবা নায়িকার রঙ্গমঞ্চে উপযুক্ত সময়ে আবির্ভাব, কিংবা দুই তিনটি ব্যক্তির মধ্যে চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য নিপুণতার সহিত প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, অভিনয় দর্শকের হৃদয়গ্রাহী হয়। চরিত্রের একত্ব-সম্পাদন করাও বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব জগতে এমন মানুষ দুর্লভ নহে, যাহার কার্য্যের বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যই তাহার বৈশিষ্ট্য। এরূপ জটিল চরিত্রের অঙ্কনে যেরূপ পাকা হাতের লিপিকুশলতার প্রয়োজন, সেইরূপ দর্শকবৃন্দের উপর ইহার প্রভাবও অসীম। বাস্তব জীবনে প্রত্যেক মনুষ্যের মনোভাবের ক্রমবিকাশ অবস্থার উপর নির্ভর করে।

ক্রমশঃ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ।—এবার 'ভারতী'তে ছবি নাই। শ্রীহেমেন্দ্র রায়ের 'কাল-বৈশাখী' ধূলা, বালি ও শুক্‌নো পাতা উড়াইয়া আঁখির সহিত টক্কর দিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি গানের স্বর লিপি দিয়াছেন। নমুনা—

'তোরা কাঁদিস সখি নয়ন-জলে ;
আমি কাঁদি মোর আঁখি-লোর বহে না ব'লে।'

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গল্পের শেষ' বোধ হয় একটি গল্প। নায়ক অপরেশ বলিতেছেন,—'ও রকম গল্প আজকালকার পাঠকদের বোঝানো শক্ত।' নায়িকা অপর্ণাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 'এ রকম', গল্প ? আমরা বলি, 'ও রকম' ও 'এ রকম—'দু' রকম গল্পই 'আজকালকার পাঠকদের গেলানো' শক্ত নয় ; তাঁহারা তাহাই গেলেন। গিলিতে ভাল-বাসেন। এমন কি, আর কিছু গিলিতে চান না। বোধ হয়, পারেনও না। প্রমাণ—হাতে হাতে। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'স্বন-পসারী' কবিতা ; তিন পৃষ্ঠায় কবিতাও আছে, অ-কবিতাও আছে। হাত কাঁচা। কবি অনেক সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা আভাসে বুঝা যায় ; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যকে তিনি সুন্দর করিয়া তাঁহার কবিতার পটে আঁকিতে পারেন নাই। সমস্ত শ্লোক-গুলির মধ্যে একটা 'বক্তব্যে'র বন্ধন নাই। কোনও কোনও প্রতিভাশালী কবি কবিতার ফুলে মিনি সুতায় মালা গাঁথিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বন-পসারী' সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। ইহার উদ্দেশ্যও অস্পষ্ট। কবির নিজের ভাষায়—'ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে।' তিন পৃষ্ঠা কবিতা পড়িয়া যদি জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 'সীতা কার ভার্য্যা ?' তাহা হইলে পাঠক, আমরা অবশ্যই নাচার! আজকাল বাঙ্গালা কবিতা এই পথেই ছুটিতেছে। তাহার 'আকাঙ্ক্ষা' নাই, 'অভিধা' নাই, 'ব্যঞ্জনা'ও নাই। তাহা এত গভীর যে, অতলস্পর্শ বলিলেও চলে। কবিরা নিশ্চয়ই বুঝিয়া লেখেন, অথবা লিখিয়া বুঝেন, কিন্তু আমরা পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারি না, অগত্যা বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া রণে ভঙ্গ দি। শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দের 'কাণা শ্যাম' নামক নক্সাটি মন্দ নয়। তবে তিন চারি পৃষ্ঠায় শেষ হইতে পারিত, এবং সংক্ষিপ্ত হইলে বোধ করি আরও 'জমাট' হইত। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণার গান' মেঘ ও রৌদ্রের মত ; আলোও আছে, ছায়াও আছে। মুদ্রাদোষের কবলে পড়িয়া কত সৌন্দর্য্য 'অক্কা' লাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গে এক জন বলিয়াছিলেন,—অমর ঝাঁটা মারিয়া মা-লক্ষ্মীকে বার বার বিদায় করিতেছে, কিন্তু মা-লক্ষ্মী বলিতেছেন, 'আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না।' সত্যেন্দ্রের 'ঝর্ণার গান' পড়িয়া সেই কথাটা মনে পড়িল। কবি সত্যেন্দ্রও যেন শত চেষ্টা করিয়াও কবিতা-লক্ষ্মীকে তাড়াইতে পারিতেছেন না—এত অত্যাচার সহিয়াও সত্যেন্দ্রের মানসী প্রিয়তমের রচনায় ফাঁক পাইলেই মণি-মুক্তা ঢালিয়া দেন। 'ভাই' ও 'সংবাদই'ও না হয় মিলিল, কিন্তু 'খিল-খিলাই' কি ? দরজীরা 'খিলায়' বটে, কিন্তু 'খিলখিলায়' কে ? এবং

'খিলখিলাই' কোন ধাতুর ক্রিয়া? 'হা কে বলে দেবে মোরে' [রবীন্দ্রনাথ], ইহার অর্থ কি? 'ঝিলমিলাই' বুঝিতে পারি, 'খিলখিলাই'? শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর 'ছাত্র' 'বড় গল্প' এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দারু-ব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা' উল্লেখ-যোগ্য, সুখপাঠ্য। লেখক উপসংহারে অনুমান করিয়াছেন,—'এই যে পুরীর তিন মূর্ত্তি, এঁরা, মোটেই হিন্দুর দেবতা ছিলেন না—এখন হয়েছেন—সমুদ্রতীরের শবর-ধীবরদেরই ইনি মৎস্যেন্দ্ররূপী কোন আদিম দেবতা, তবে শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ হবে, কিন্তু চক্ষুষ-প্রমাণের সঙ্গে ঠিক মিলবে—যদি আলাস্কার ধীবর রাজার যে মূর্ত্তিটি প্রকাশ করা যাচ্ছে, তার বুকে ও হাতে মৎস্য-দেবতার যে চিহ্ন আঁকা আছে, তার দিকে লক্ষ্য করা যায়।' অনুসন্ধানের বিষয় বটে। দুঃখের বিষয় এই যে, আলাস্কার ধীবর-রাজার ছবির হাতে 'যে চিহ্ন আঁকা আছে', তাহা বড় অস্পষ্ট। শ্রীকিরণ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রসের প্রলাপে' রস আছে, কিন্তু 'চিটে'। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'নিশির ডাক' ভূতের গল্প। আখ্যানবস্তু উল্লেখযোগ্য, কিন্তু রচনা বড় শিথিল। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'রূপসী'র গোড়াটা অত্যন্ত ঐহিক, শেষটা আধ্যাত্মিক কি না, তাহা বাঙ্গালা কাব্য-সায়রের পরমহংস ও পাতীহংসেরাই বলিতে পারেন। 'পড়সী'তে ও 'বঁড়সীতে' বেশ মিলিয়াছে, কিন্তু 'উপোসী' ও 'রূপসী'র মিল যে সাংঘাতিক! 'লিরিক্' ক্রমে বাঙ্গালা দেশে 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' হইয়া উঠিল। 'মাসকাবারি' পড়িয়া অজিতকুমারকে মনে পড়িল। 'দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে'? সৌরীন্দ্রমোহনের 'কাজরী' চলিতেছে।

প্রতিভা। পৌষ। শ্রীগুরুদাস সরকারের 'ফরাসী দেশে ভারততত্ত্ব' Sylvan Levyর 'L'Indianisme' অবলম্বনে লিখিত উপাদেয় সন্দর্ভ। প্রবন্ধের শেষে যে গ্রন্থসূচী আছে, তাহা অনুসন্ধিৎসুর কাজে লাগিবে। কস্যচিদ্‌বিদ্যাবিনোদস্য 'সাহিত্যিকের নানা কথা' অত্যন্ত 'পান্‌সে' বলিয়া মনে হয়। উহার অনেক মন্তব্য অসংযত। টিপ্পনী ক্ষুরধার না হইলে সার্থক হয় না। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ 'দুঃখ-দান' কবিতার প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—

'কাঁদায়ে তুলিব আমি আনন্দ-নিলয়।'

তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ও 'দুঃখ-দানের' নাম অন্বর্থ হইয়াছে। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সুন্দরবন' সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত, কিন্তু সুখপাঠ্য। 'একঘেয়ে' কাশী-গয়া ও বালি-কোন্নগরের ভ্রমণকাহিনীতে অরুচি হইয়া গিয়াছে। মুখ বদলাইবার অবকাশ দিয়া লেখক আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীভবরঞ্জন তর্কতীর্থের 'ন্যায়শাস্ত্রের উপকারিতা' উল্লেখযোগ্য সন্দর্ভ। চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মার নামে যতটা মৌলিকতা আছে, তাঁহার 'আত্মার বোধনে' ততটা মৌলিকতা নাই। তবে রচনায় উদ্দীপনা আছে। ঘুমের দেশে জাগরণের গান আবশ্যকও বটে উপভোগ্যও বটে। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনের অতিসংক্ষিপ্ত 'বাঙ্গালায় সন্ন্যাসি-বিপ্লবে' সমগ্র বাঙ্গালার সন্ন্যাসি-বিপ্লবের বিবরণ নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার নির্দ্দেশে প্রমাণপ্রয়োগ, বর্ণনার শৃঙ্খলা ও সর্ব্ববিধ তথ্য-সংগ্রহ অপরিহার্য্য। দেড় পৃষ্ঠায় এমন ঘটনার বিবৃতি অসম্ভব। আশা করি, লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অংশ উদ্ধার করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইবেন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'পথিক' নামক পদ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'সোয়া শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের সাংসারিক অবস্থা'য় তুষ অধিক ও

শস্য অল্প হইলেও, উপভোগ্য। শ্রীকালিদাস রায় কর্ত্তৃক ফরাসী হইতে সঙ্কলিত 'ঘুমপাড়ানিয়া গান' সুখপাঠ্য। কিন্তু 'হাজার পাখী পাল্লা দিয়া গায়' কবিতাটির সুরে 'থাপ খায় না'।

পল্লী-বাণী। পৌষ।—'পল্লীবাণী' নয় এক বৎসর মাস প্রকাশিত হইতেছে। মূলমন্ত্র—

'জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম শুধু বিভিন্ন সোপান,
লক্ষ্য—আত্ম-বিসর্জ্জন, একত্ব-বিধান।'

পল্লী-বাণী এই লক্ষ্য-লাভে দেশবাসীর সহায় হউন, তাঁহার সাধনা সফল হউক। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়ের 'পরাবিদ্যার স্বরূপ ও সামর্থ্য' ভাষায় রামমোহন-যুগের সমীপবর্ত্তী।—'পরাবিদ্যার বিদ্যমানতা শতাব্দশতকাল যাবৎ সংসারে অপ্রতীয়মানা হইলেও তাহার ক্ষীণচ্ছায়া বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে সংনিবদ্ধা আছে। সুতরাং, ইতরেতর খণ্ডসমূহ সংযোজনে ছিন্নলিপি মর্ম্মাবগমচেষ্টনের ন্যায়, অথবা কঙ্কালদর্শনে অতীত জীবের আকৃতি প্রকৃতিনির্ণয়ায়াসের ন্যায়, ঐ সকল শাস্ত্রালোড়নে, পরাবিদ্যার স্বরূপ ও সামর্থ্যাবধারণোদ্যোগ সাফল্য লাভ করিতে পারে।' এ যুগে মাসিকের পৃষ্ঠায় এমন ভাষার আবির্ভাব সম্ভব, তাহা বোধ করি, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারেরও স্বপ্নাতীত। সে যুগের ভাষাও পদে ছিল! এ রচনা কাহাদের জন্য? ইহা কি 'সবুজ-পত্রে'র প্রতিক্রিয়া? 'সমঃ সমং শময়তি?' শব্দ-চয়নে এখনও এত কষ্টকল্পনা এ যুগে আর দেখিয়াছি, মনে হয় না। শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্তের 'রামটেক' ক্ষুদ্র ভ্রমণবৃত্তান্ত। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'পল্লীচিত্রে'র প্রশংসা করিতে পারিলাম না। লিখিবার কিছু নাই। থাকিলে কোনও রচনাই সার্থক হয় না। কবিতাও নহে। মিলই কবিতা নহে। ইহার একটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য—

'হৈমন্তিক ধানের সুবাস
কমলার সম্ভাষণ বয়ে আনে সমীরণ
করি মন পুলক-উদাস।'

কিন্তু 'পুলক' বর্জ্জন করিতে পারিলে কবি শ্লোকটিকে আরও সুন্দর করিতে পারিতেন। অগাধ-রচনা, ও সমস্ত মাসিকে নাম-লাঞ্ছনার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া আমাদের দেশের অনেক কবিই পাকা ঘুঁটী কাঁচাইয়া কবিতার অপমান করেন। কেন এ দুর্ব্বলতা শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর 'প্রেম' অস্ফুট আধ্যাত্মিক রূপক; অনধিকারী আমরা অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। 'পোষা কুকুর' ফরাসী গল্প—ক্রমশঃপ্রকাশ্য। শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্তের 'প্লিনির ভারতবর্ষ—ভূমিকা' মোট দুই পৃষ্ঠা। ফুটনোটে প্রকাশ,—তাহারও 'কতক অংশ ১৩১৮ সালে নবমসংখ্যক "আর্য্যাবর্ত্তে" প্রকাশিত হয়।' কতখানি তখন প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং কতখানি এখন হেমের খনি হইতে বাহির হইয়া ভুজঙ্গের ফণায় পড়িল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। ইহা কি হেমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৌতুক? অনবরত ভূ-তত্ত্বের পাষাণ ঘাঁটিয়া হেমচন্দ্র পাষাণ হইয়া গিয়াছেন, নতুবা বাঙ্গালার নিভৃত-পল্লীর সাহিত্য-সাধনার নৈবেদ্যে উচ্ছিষ্ট দিয়া নির্ম্মমভাবে এমন বিদ্রূপ করিতে পারিতেন না। শ্রীপঞ্চানন ঘোষের 'রমণী' পড়িলাম, 'সাহারায় প্রফুল্ল কমল'ও দেখিলাম, কিন্তু কবিত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। খোদ কবিও তাহার সন্ধান পান নাই, ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। শ্রীঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বসিহরাট পরিচয়' ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-বর্জ্জিত

হইলেও আমরা সাদরে পড়িয়াছি। পল্লী-পত্রে এইরূপ পল্লী-কাহিনীর অবতারণাই প্রশস্ত। 'শ্রীপুর' সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য। 'বাঁশি' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অক্ষম অনুকরণ—অসহ্য। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের 'লাজিকা—লতার বাঁধন' বিফল হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে লাভ কি? লেখক নিজের আলোকে নিজের পথে চলুন না। শ্রীমতী অমিয়া দেবীর 'প্রায়শ্চিত্ত' চলনসই গল্প। শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবীর 'সমস্যা'য় দেখিতেছি,—'উর্ব্বরা কল্পনা মনোগত জল্পনা, মীমাংসাহীন হয়ে দাঁড়ায় এসে!' সম্পাদক ভুজঙ্গ বাবু নিজে কবিতা লেখেন; তিনিই বুকে হাত দিয়া বলুন, এই গদ্যের গুটী কাটিয়া কবিতা প্রজাপতি কখনও বাহির হইতে পারে, এমন আশা করা যায় কি না? শ্রীমতী নীলিমাপ্রভা সরকারের 'বাল-বিধবা'ও, তথৈবচ। ইনি 'লাগে'র সঙ্গে 'থাকে' মিলাইয়া দিয়াছেন। একটা কথা বলি, আমরা বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পল্লী-বাণী শুনিতে চাই বটে, কিন্তু কবিতায় নহে। দেশে দেশে মাসিকপত্র হউক, সমৃদ্ধি লাভ করুক, কিন্তু ঘরে ঘরে এই শ্রেণীর মহিলা-কবির সৃষ্টি হইলে বাঙ্গালা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

সাহিত্য, ২৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

সমবায়-সমিতি।

শারীরিক ব্যাধিসমূহ সাধারণতঃ জীবাণুর আক্রমণ হইতে হয়। ব্যাধি-নিবারণের প্রধানতঃ দুইটী পন্থা আছে :—

প্রথম পন্থা :—ঔষধ-প্রয়োগে রোগ-উৎপাদক জীবাণু ধ্বংস করিয়া ব্যাধি আরোগ্য করা; যেমন কুইনাইন সেবন করাইলে ম্যালেরিয়ার জীবাণু নষ্ট হয়। দ্বিতীয় পন্থা :-যেমন ডিপথিরিয়া কিংবা ধনুষ্টঙ্কার রোগে সিরাম্ ইন্‌জেকসন; ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে রোগ-উৎপাদক জীবাণু ধ্বংস হয় না বটে, কিন্তু ব্যাধি-আনয়নকারী জীবাণু নষ্ট করিবার পক্ষে শরীরের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, তাহাতে শারীরিক শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়, অথবা আক্রমণ করিয়া কিছু করিতে পারে না।

আমাদের এই শরীর যন্ত্রের ব্যধিরূপ অনিষ্টনিবারণের বিষয়ে যেমন প্রধানতঃ এই দুইটী পন্থা দেখিতে পাই, জনসমাজ ও সামাজিক ব্যাধি সম্বন্ধেও ঠিক্ এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পন্থা, বাহিরের শক্তির অনুকূলতায় কোনরূপ ব্যাধির আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া; দ্বিতীয় পন্থা, যে স্বাভাবিক আত্ম-সংরক্ষণী ও উন্নতিবিধায়িনী শক্তির দ্বারা সমাজ যন্ত্র বা শরীর যন্ত্র সহজ, সরল ও অবিকৃতভাবে পরিচালিত হয়, সেই শক্তির ক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য দূর করিবার সহায়তা করিয়া তাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এক কথায় প্রথমটী বাহিরের সাহায্যে শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা মাত্র। অপরটী বাহির হইতে আহরিত সাহায্যের অবলম্বনে আভ্যন্তরীণ আত্মশক্তিকে পুনরুদ্বোধিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

জীবতত্ত্ববিদের চক্ষে মনুষ্যশরীর ও মনুষ্য-সমাজে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মনুষ্য-দেহ যেমন (Protoplasm) জৈব বস্তুর সমষ্টি, সমাজও সেইরূপ জন-সমষ্টিমাত্র। শরীরের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং অস্থি, মাংস, মেদ, ত্বক্, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতির পরস্পরাবলম্বী প্রত্যেক অংশেরই বিভাগ নির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মসম্পাদনের এবং স্ব স্ব অংশের স্বাস্থ্য ও সবলতার উপর সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্য ও ব্যাধিনিবারণী ক্ষমতা নির্ভর করে, জনসমষ্টিরূপ সমাজদেহেরও ঠিক সেইরূপ

পরম্পরাবলম্বী এবং কার্য্যশৃঙ্খলা সাধনের জন্য বিভাগ নির্দ্দিষ্ট। প্রত্যেক বিভিন্ন অংশের সবলতা, স্বাস্থ্য ও কর্ম্মপটুতার উপর সমাজশরীরের স্বাস্থ্য নির্ভর করিয়া থাকে। এবং শরীরের পক্ষেও স্বাভাবিক আত্মসংরক্ষণী শক্তিই যেমন দেহ-রক্ষা ও ব্যাধিনিবারণ সম্বন্ধে মুখ্যভাবে এবং বাহিরের অনুকূলতা গৌণভাবে আবশ্যক, জনসমাজ সম্বন্ধে প্রয়োজন হিসাবেও ঠিক তাহাই বলা যায়। অতএব এ কথা বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না যে, মনুষ্যসমাজ মনুষ্যদেহের বৃহত্তর সংস্করণবিশেষ। সমস্ত জগৎসমাজকেও মনুষ্যসমাজের বিরাটতম সংস্করণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

মনুষ্যদেহের যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের অচ্ছেদ্য সংযোগ, মনুষ্যসমাজেরও তদ্রূপ। চিকিৎসক প্রধানতঃ দৈহিক অস্বাস্থ্য-নিবারণের দিকেই দৃষ্টি দিতে বাধ্য, সে জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই দিক হইতেই আলোচনা করিব।

জনসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্তপরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, আচ্ছাদন-বস্ত্র ও আবাসগৃহ প্রভৃতি প্রথম প্রয়োজন ; পরে কোনও কারণে ব্যাধি হইলে ঔষধ ও চিকিৎসার প্রয়োজন। যে রোগীর দেহে আত্মসংরক্ষণী শক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, গুরুতর রোগের আক্রমণেও অনেক সময় সে সামান্য চিকিৎসাতেই আরাম হয়। কিন্তু যাহার দেহে সেই স্বাভাবিক শক্তি নিস্তেজ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, শত ঔষধেও তাহাকে নিরাময় করিয়া তুলা যায় না। বরং অনেক সময় দুর্ব্বল দেহে ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় তাহার অধিক অনিষ্ট হয়। সে হিসাবে চাউলের দুর্ম্মূল্যতা, আচ্ছাদন-বস্ত্রের অভাব প্রভৃতির দিকে চিকিৎসক-মাত্রেরই দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন আছে। আর ইহা স্পষ্ট দেখা যায়, দারিদ্র্য অভাব যত অধিক, ব্যাধিও সেই পরিমাণে অধিক। এইরূপ অভাবরূপ ব্যাধি-নিবারণেও প্রথমোল্লিখিত দুইটী পন্থার কথা বলিতে হয় ; প্রথম পন্থা, গভর্মেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্য ; দ্বিতীয়, বাহিরের সাহায্যের অবলম্বনে পল্লীর জীবনীশক্তি পুনরায় এরূপভাবে সবল করিয়া তোলা, যাহাতে অভাবের আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ অভাবেই আমরা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। অথবা মহামান্য গবর্মেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করি। যেমন, বস্ত্রসমস্যা। পূর্ব্বের মত দেশের সকল স্ত্রীলোকেই নিয়মিত চরকা লইয়া অবসরমত কিছু কিছু সূতা কাটিলে এ সমস্যার যে সমাধান হয় না, এমন নহে। পূর্ব্বে যখন কলের কাপড় একেবারেই ছিল না, তখন

এই চরকাই সমস্ত দেশের আচ্ছাদন যোগাইয়াছে। এখন যে তাহা বস্ত্রেরঅভাবের নিবারণে একেবারেই অপারগ হইবে, এরূপ ভাবিবার কোনও হেতু নাই।

খুলনা জেলায় সম্প্রতি চাউলের অভাবে দেশবাসীর যে দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত, তাহার পরিচয় খুলনাবাসীর নিকট দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইহার প্রতিবিধান-কল্পে খুলনাবাসী কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে লোন-আফিস হইতে টাকা ধার করিয়া চাউল আনাইয়া, যাহাতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কিছু কম দরে চাউল পান, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহৃদয়তা ও সাধুচেষ্টার জন্য তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদার্হ। বস্তুতঃ এ সময় যদি তাঁহারা এরূপভাবে সাধারণের অন্নাভাবমোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে লোকের যে কিরূপ কষ্ট হইত, বলা যায় না। কিন্তু এরূপভাবে অন্নাভাবের প্রতীকার রোগনিবারণের প্রথম পন্থার ন্যায় সাময়িক প্রতীকারমাত্র। ভবিষ্যৎ প্রতীকারের উপায়-স্বরূপ কোন স্থায়ী সুফল ইহাতে ফলিবে না। যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আপনাদের দুর্দ্দশা আপনারা মোচন করিবার মত সবলতা লাভ করিবে, ততক্ষণ একের অথবা সম্মিলিত সদাশয়গণের আনুকূল্যে তাহাদের অভাব দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এবারের মত অভাবের প্রতীকারই যথেষ্ট নহে; এরূপ অভাব বার বার ঘটিতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ অভাবনিবারণের চেষ্টা ও সামর্থ্য যাহাদের নাই, তাহাদের পরিণামে যে আরও অভাবে পড়িতে হইবে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

দুর্ভিক্ষ কেন ঘটে, এবং তাহার প্রতীকারের উপায় কি, ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে এ কথা নিশ্চয় বলা যায়, আত্মনির্ভরপরায়ণ ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিবান্ হইলে খুলনার ন্যায় ধান্য-প্রসবিনী জেলার অধিবাসিগণের এক বৎসরের অথবা বৎসরদ্বয়ের অজন্মায় এত অধিক অন্নকষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গদেশে খুলনা ও বাঁকুড়া, এই দুই জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধমান, যশোহর, হুগলী প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সরকারী জন্ম-মৃত্যুর তালিকায় দেখা যায়, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যায় বাঁকুড়া ও খুলনা জেলাই প্রায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এইরূপ শিশু-মৃত্যুর আধিক্যের প্রধান কারণ অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই দুই জেলায় দুগ্ধ অধিক দুর্ম্মূল্য ও অনেকের পক্ষে মূল্যের আধিক্য হেতু দুষ্প্রাপ্য। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শৈশব হইতেই শিশু-দেহ স্বতঃ দুর্ব্বল হইলে রোগের সামান্য আক্রমণেও তাহা আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতার প্রধান কারণ, গো-জাতির অভাব ও গো-জাতির খাদ্যের অভাব। এ দেশের ধান্য প্রায়ই জলা জমীতে উৎপন্ন হয়; এ জন্য খড় ভালরূপ পাওয়া যায় না। খড়ের নীচের অর্দ্ধেক এত কর্দ্দমাক্ত যে, উহা গো-জাতির অভক্ষ্য। সেই জন্য কৃষকেরা ধান্য কাটিবার সময় কেবল শিষগুলি কাটিয়া লইয়া যায়। খড়ের অধিকাংশই ক্ষেত্রে রহিয়া যায়। আবার খুলনার লোনামাটীর জন্য এই জেলায় যে বড় বড় ঘাস জন্মায়, তাহা ভক্ষণ করিলে অন্য দেশ হইতে আনীত গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। গো-জাতির প্রধান খাদ্য দূর্ব্বা ঘাসও কোন কারণবশতঃ এ অঞ্চলে জন্মে না। গো-দুগ্ধের অভাবের এইগুলিই প্রধান কারণ।

খুলনা জেলায় গোচারণ-মাঠের অভাবের বিষয় আমি জনহিতাকাঙ্ক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বাহাদুরের নিকট জানাইলে তিনি এ সম্বন্ধে যে সকল জমীদার-দিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন, সকল স্থান হইতে প্রায় একই রূপ উত্তর আসিয়াছিল। এবং সে উত্তরের ভাবার্থ এই যে, গ্রামে গোচারণের মাঠ নাই; জমীদারের খাসেও এরূপ জমী নাই, যাহাতে গোচারণের মাঠ করিয়া দিতে পারেন।

এখন মনে করুন, যদি কোনও গ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক নিজ গ্রামের অবস্থাহীন ব্যক্তিগণের শিশু পুত্রদিগের পালনের জন্য নিজ ব্যয়ে দুগ্ধ বিতরণ করেন, তাহা হইলে প্রথম পন্থা বা কুইনাইন-প্রয়োগে জ্বরনিবারণের ন্যায় সেই গ্রামের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কিছুদিনের জন্য কমিতে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনও ফল হয় না। বরং তিনি যদি দুগ্ধ বিতরণ না করিয়া সেই অর্থে গোচারণক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত জমী ক্রয় করিয়া দেন, এবং এরূপ সর্ত্তে সেই জমী দান করেন যে, যে সকল গাভী মাঠে চরিবে, তাহাদের প্রত্যেকের অধিকারী গোপালনের ব্যয়স্বরূপ প্রত্যেকে মাসে একটা সাধারণ ভাণ্ডারে কিছু কিছু অর্থ রক্ষা করিবেন, সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে ক্রমশঃ গোচারণের মাঠের পরিমাণবৃদ্ধি এবং গোচারণক্ষেত্রে গাভীদিগের ভক্ষণোপযোগী ঘাস—যেমন গিনি ঘাস, কায়না ঘাস—প্রভৃতির চাষ হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ গোজাতির স্বাস্থ্য ও বংশবৃদ্ধির সহায়তা দ্বারাই গো-দুগ্ধের অভাব স্থায়ীভাবে নিবারিত হইতে পারে; অন্য উপায়ে তাহা হয় না।

পূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়াছি, জীবদেহের সমস্ত বিভিন্নাংশই পরস্পরাবলম্বী, এবং জনসমাজও তদ্রূপ। যদি বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, কি জৈব বস্তুসমষ্টি মনুষ্যদেহ, কি মনুষ্যসংঘ-সমষ্টি

সমাজ অথবা জাতি, উভয়ই সমবায়-প্রণালীর কার্য্যপরিচালনে গঠিত ও ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। উদ্ভিদতত্ত্ব-আলোচনায় মূলের সহিত প্রত্যেক পত্রের সম্বন্ধ সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রহীন মূল কখনও বৃক্ষকে সজীব রাখিতে পারে না। আবার প্রতি পত্রের প্রত্যেক সূক্ষ্ম স্নায়ুর উপর পত্রের জীবন নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতির সমবায়-কার্য্যালয়ে এইরূপ কার্য্যশৃঙ্খল-গ্রন্থিতে আবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগ সকল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বলিয়া ইহার মধ্যে উচ্চত্ব বা হেয়ত্ব কিছু নাই। কার্য্যশৃঙ্খলার প্রয়োজন হেতুতেই এইরূপ ভাবে বিভাগনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। পত্রের ক্ষুদ্রত্ব হেতু এমন কেহ বলিতে পারেন না, মূল প্রয়োজনীয়, এবং পত্র সেরূপ প্রয়োজনীয় নহে। তবে মূল এনক এবং কেন্দ্র-স্বরূপ ও পত্র অসংখ্য, এ জন্য কতকগুলি পত্রের অভাব অন্য পত্রগুলির দ্বারা কোনরূপে পূরণ হইতে পারে। কিন্তু মূলের অভাব পূরণ হয় না, এ জন্য মূল বিশেষভাবে রক্ষণীয়, ইহাই বিশেষত্বমাত্র। জাতিভেদে প্রাকৃতিক সমবায়ে কার্য্যপ্রণালীর কিছু জাতীয় বিশেষত্ব দেখা যায় বটে, যেমন এক এক জাতীয় উদ্ভিদের স্থায়িত্বে ও বংশরক্ষা-প্রণালীতে এক একরূপ বিশেষত্ব, এক এক জাতীয় প্রাণীরও এক একরূপ জাতীয় বিশেষত্ব, মানবসমাজেও সেইরূপ জাতীয় বিশেষত্ব আছে। কিন্তু মূলতঃ কার্য্যপ্রণালী একই ধারায় অনুবর্ত্তন করে। আমাদের এত কথা বলিবার হেতু এই যে, প্রতি সমাজেই নানা বৃত্তিধারী এবং সম্পদ সম্বন্ধেও নানা অবস্থার জনগণ বাস করেন; কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের জীবন, কৃষক ও ভূস্বামীর জীবন, উভয়ই একই বৃহৎ সামাজিক জীবনরূপ কার্য্যপ্রণালীর পরম্পরাবলম্বী বিভিন্ন অংশ। এ কথা স্মরণ রাখিলে মানবকে দরিদ্রতা এত পরমুখাপেক্ষী এবং সম্পদও এত অহঙ্কৃত করিবার অবকাশ পায় না। প্রকৃতি জননীর নিকট সহজাতসংস্কাররূপে প্রথমে আমরা এই সমবায়-প্রণালীর কার্য্য-পরিচালনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মধুমক্ষিকার সমাজ, পিপীলিকার সমাজ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। চিকিৎসক শরীর যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালীর গবেষণায় প্রতিক্রিয়ার ভিতরও এই সমবায়-কার্য্যপ্রণালীর পরিচয় পাইয়া থাকেন। এমন কি, ঘড়ি প্রভৃতি মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রগুলির অনুশীলনেও আমরা একটী ক্ষুদ্রতম চক্র অথবা কলকব্জার সহিত বৃহত্তম চক্রের গতি পর্য্যন্ত কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। এই সকল হস্তনির্ম্মিত যন্ত্রগুলিও যখন যথানিয়মে

চালিত হইয়া দুঃসাধ্য দুরূহতম কার্য্য সকলও সহজ উপায়ে সম্পাদিত করিতে পারিতেছে, তখন বিশ্বস্রষ্টার স্বহস্তরচিত মানব-সমাজ দ্বারা কি না সম্ভব হইতে পারে?

এই যে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া, যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ উচ্ছেদের অভিমুখে চলিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও যাহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি নাই, ইহার নিবারণ সম্বন্ধে সেই দুই পন্থার কথাই বলিতে হয়। প্রথম পন্থাই গবর্মেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্য, এবং দ্বিতীয়, বাহিরের সাহায্য অবলম্বনে পল্লীসমূহের জীবনীশক্তি পুনরায় এরূপ ভাবে সবল করিয়া তোলা, যাহাতে আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

দুর্ব্বলের পক্ষে অবলম্বনযষ্টি অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু যষ্টির সাহায্যে যেন সে আবার নিজের পদদ্বয়ের কার্য্যক্ষম শক্তির পুনরুদ্ধার করিতে পারে, সেই চেষ্টারই অধিক প্রয়োজন। যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আপনাদের দুর্দ্দশা আপনারা মোচন করিবার মত সবলতা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা লাভ করিবে, ততক্ষণ একের অথবা সম্মিলিত সদাশয়গণের আনুকুল্যে তাহাদের দুঃখ দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশে, "আমি দরিদ্র", এ কথা স্বীকার করিতে অনেকেই লজ্জা-বোধ করেন না, এবং দারিদ্র্য বা অক্ষমতা কতকটা গর্ব্বের জিনিস বলিয়া মনে করেন। হয় ত সেই গর্ব্বে কিছু পরিমাণে এই ভাব মিশ্রিত থাকে যে, "আমার অক্ষমতা অন্যের পুণ্যসঞ্চয়ের সহায়তা করিতেছে।" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "পল্লীর উন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে,—তিনি কোন এক জলাভাবগ্রস্ত গ্রামে গ্রামবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোরা যদি কূয়া খুঁড়িস্, বাঁধিয়ে দিবার খরচ আমি দিব।' কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, 'এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, 'কূয়া আমাদের দ্বারা খুঁড়াইয়া কেবল বাঁধানর খরচাটা দিয়া তুমি কূয়া-প্রতিষ্ঠার পুণ্যটুকু লাভ করিবে। আমাদের কূয়া যদি আমরাই খুঁড়িয়া দিলাম, তবে আর তোমার দানের মূল্যটা কি রহিল?' কিন্তু সেই গ্রামে এত জলের অভাব যে, মেয়েরা দুই তিন মাইল দূর হইতে দুবেলা জল বহিয়া আনে। এক জনের ঘরে আগুন লাগিলে জলাভাবে সমস্ত গ্রাম জ্বলিয়া যায়। অথচ তাহারা নিজেদের অভাবমোচন সম্বন্ধে নিজেরাই শুধু উদাসীন নহে, সেই অভাব অন্যের পুণ্যসঞ্চয়ের অনেকটা কারণ জানিয়া গর্ব্বিতও বটে!

সেই জন্য উপস্থিত সভায় আমার বক্তব্য এই যে, কি অন্নাভাব, কি বস্ত্রাভাব, এই সকলের অবশ্যম্ভাবী ফল যে স্বাস্থ্যহানি, এই সমুদয় অনিষ্টনিবারণে সাময়িক অর্থানুকূল্যের দ্বারা উপস্থিত সমস্যার মীমাংসায় কোনও লাভ নাই। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনের সময় উপস্থিত সমস্যারই সমাধান করিতে হয় বটে, কিন্তু পরে ভবিষ্যতের দিকেও অবধান আবশ্যক। বারবার উপস্থিত হইতে পারে এমন অভাবগ্রস্তের পরানুকূল্যের দিকে অধিকতর নির্ভর ও নিজের অক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায়, গ্রামে সমবায়-সমিতি ও সমবায়-ভাণ্ডার-স্থাপন। এইরূপ প্রতি গ্রামে সমবায়-সমিতির যদি এক একটী গ্রামস্থ কেন্দ্র এবং জেলায় বৃহৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার অভাব-সমস্যারই অনেকটা মীমাংসার আশা করা যায়। চাষীদিগের অর্থাভাব হইলে আর তাহাদিগকে অযথা অল্পমূল্যে মহাজনদিগের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিতে হয় না। সমবায়-ধনভাণ্ডার হইতেই তাহাদের গ্রামস্থ সমস্ত উৎপন্ন শস্যাদি সমিতি ক্রয় করিয়া লইয়া পরে সেগুলি সুবিধা মতে বিক্রয় করিতে পারেন। অর্থাভাবের সময় আর তাহাদের অতি অধিক সুদে ধার করিতে হয় না। সমবায়-সমিতি-ভাণ্ডার হইতে অতি কম সুদে ধার পায়। এবং সে সুদও ধনবৃদ্ধি করে। সঞ্চিত ধন যদি ব্যক্তিবিশেষের ধন-বৃদ্ধি না করিয়া একটী জনসংঘের শ্রীবৃদ্ধি করে, তাহাতে যে দেশের অধিকতর মঙ্গল হয়, এ কথা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ সমবায়-সমিতি হইতে প্রথমতঃ সকল শ্রেণীর কার্য্যকরী ক্ষমতা এবং স্বাবলম্বন বাড়িয়া যাইবে। গ্রামের অন্তর্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং অলসতা ও উদাসীনতার পরিবর্ত্তে উৎসাহ আসিয়া গ্রামবাসিগণের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সবল করিবে। কারণ, যে সকল কার্য্য করিলে আমাদের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ পায়, সেই সমস্ত কার্য্যজনিত পরিশ্রমের উপরই আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধ-স্থলে সহযোগী সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে; এবং ঐক্য ও আত্মীয়তার বৃদ্ধি এবং অবস্থাভেদের দূরত্ব অনেকপরিমাণে দূর হইবে। তৃতীয়তঃ, অভাবমোচন ও স্বাবলম্বনের ফলে যেমন দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, সেইরূপ মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে। যেমন পরমুখাপেক্ষীর প্রকৃতি ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ দাতৃত্বভাবও দাতার মানসিক স্বাস্থ্যহানির একটী কারণ। সামবায়-কার্য্যপ্রণালীতে দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তি অনুযায়ী সকলেই সমাজের নিকট নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন, এবং সামাজিক উন্নতির

সকলেই ফলভোগী হইবেন। দান ও গ্রহণের তাহাতে কোনও সংস্রব থাকিবে না। চতুর্থতঃ, ম্যানুফ্যাক্‌চার, বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবসায়ে লাভের হিসাব খতাইয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যায়, মূলতঃ যাহা অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার গৌণ বা পরিত্যক্ত অংশগুলি কাজে লাগাইতে পারিলেই প্রকৃত লাভবান্ হওয়া যায়। যেমন ডালের ব্যবসায়ে আস্ত মটর কলাই ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ে পরিত্যক্ত ভুষি হইতেই অনেকটা লাভ পাওয়া যায়। কয়লার ব্যবসায়ে পাথুরে কয়লা হইতে কোক্ কয়লা করিবার সময়ে যে গ্যাস বাহির হয়, তাহা হইতে আলো হয়; যে আলকাতরা বাহির হয়, তাহা হইতে রং, সুগন্ধ ও ঔষধ প্রভৃতি অনেক মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং যে এমোনিয়া বাহির হয়, তাহা জমীর সার প্রভৃতি বহু প্রকার প্রয়োজনসাধনে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ সকল প্রকার উৎপাদক ব্যবসায়ের গৌণ অংশটী হইতে বিশেষভাবে লাভবান হওয়া যায়। সেইরূপ আমরা সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ প্রভৃতির জন্য যে সকল কার্য্যভার গ্রহণ করি, তদ্ভিন্ন জীবনের অতিরিক্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা, যাহা হইতে জীবন প্রকৃত ফলবান হয়, সেটী পরিত্যাক্ত অংশের মত আবর্জ্জনায় পরিহার করি। পল্লীবাসিগণের অবসরসময় প্রধানতঃ পরচর্চ্চা, দ্বিতীয়তঃ মোকর্দ্দমার চর্চ্চা, অর্থাৎ কোন্ সাক্ষী কিরূপ জেরায় অটল ছিল, কে ভড়কাইয়া গিয়াছিল, কোন মোক্তার কিরূপ আইনের সূক্ষ্মতর্কে হয়কে নয় ও নয়কে হয় করিয়া হাকিমকে বোকা বানাইয়াছিলেন, ইত্যাদিরূপ নিতান্ত তুচ্ছ অপ্রোয়জনীয় চর্চ্চায় পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু সেই সময় যদি পল্লীর সঞ্জীবনী সমবায়ের কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তবে সেই পরিত্যক্ত সময় হইতেই মনুষ্যসমাজ কতই না লাভবান হইতে পারে।

আমাদের মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"পাটের দর কমিয়া যাইতেছে বলিয়া কৃষকেরা হাহাকার করিতেছে, কিন্তু ধান্য দুর্ম্মূল্য হইতেছে যদি চাষীরা পাট আবাদ বেশী না করিয়া ধান্যের চাষ বেশী করে, তবে ধান্যের দুর্ম্মূল্যতা কমে, এবং পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায়।" মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের এই সদুপদেশ যদি সমবায়-সমিতির দ্বারা কার্য্যকরী করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে চাষীদিগকে হাতে-কলমে পরামর্শ দিবার জন্য পন্থা আর কি আছে? পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া এবং ধান্যের মূল্য কম হওয়া প্রভৃতি বিষয় আমাদের দেশে ধনাগমের অর্থাৎ Point of Economics-এর দিক হইতেই যে কেবল প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। Sanitary

Commissioner'sএর Report পড়িলে বুঝা যায় যে, এই সব কথা আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকার্য্যের এরূপ অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাতে এক জন কৃষক তাহার নিজের চেষ্টায় যে পরিমাণে কৃষিকার্য্য করিতে পারে, তাহাতে তাহার খরচ পোষান কঠিন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য প্রথমতঃ কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইবে। চাষী প্রজাদিগকে অর্থাভাবের জন্য অযথা অল্পমূল্যে মহাজনদিগকে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। ইহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। অভাবের সময় ভাণ্ডারের সঞ্চিত দ্রব্য হইতে তাহাদের অভাব পূরণ করিতে হইবে। অর্থ প্রয়োজনের সময় সমিতির অর্থ-ভাণ্ডার হইতে কম সুদে ধার পায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গ্রামের অন্তর্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় সমবায়-সমিতি ব্যতিরেকে ইহার কোনও একটী কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান হওয়া দুরূহ। *

সরকারী ডাক্তারখানার সম্বন্ধে অন্য সকল জেলা হইতে খুলনা জেলার এক বিষয়ে প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আয়ের অনুপাতে এই জেলার District Board Dispensary অন্য জেলা অপেক্ষা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ডিস্‌পেন্‌সারির সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য মাননীয় রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি তাঁহার স্বর্গগতা জননীর আদ্য শ্রাদ্ধে ব্যয়-বাহুল্য অপেক্ষা দুঃস্থ পীড়িতগণ যাহাতে ঔষধ ও চিকিৎসকের সাহায্য পায়, সেজন্য ডিস্‌পেন্‌সারির গৃহনির্ম্মাণে অর্থ দান করিয়া যে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, অনেক সদাশয় তাঁহার সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্বর্গগত ভক্তি ও প্রীতির পাত্রগণের স্মৃতির জন্য, ঔষধালয়স্থাপনের জন্য অর্থদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ সুদৃষ্টান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, যদিও ভারতবর্ষীয়-মাত্রই আধ্যাত্মিকতার অনুরাগী, এবং সাংসারিক ধন সম্মান হইতে আধ্যাত্মিকতাই তাহাদের মনকে অধিক আকর্ষণ করে, কিন্তু এই ধর্ম্মভাবের অপ-ব্যবহারও অনেক সময় আমাদের যথার্থ পথে চালিত না করিয়া কেবল অন্ধভাবে পরানুগামী করে। আবার অনেক সময় এ সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লোভ বা মর্য্যাদা-রক্ষার নামান্তরমাত্র হয়। এরূপ স্থলে যিনি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা উপেক্ষা

* খুলনার অন্তর্বাণিজ্য কি কি ভাবে সমবায়-সমিতি দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে Co-operative Journal of May 1919 এ একটী প্রবন্ধ আছে।

করিয়া প্রকৃত সম্বায়ের পন্থা দেখান, তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামে ঔষধালয়-স্থাপনের জন্য একান্ত ইচ্ছুক না হইয়া, প্রয়োজনানুসারে সমবেতের দানে একটী স্থায়ী ঔষধালয় স্থাপন করিতে আপত্তি না করেন, এবং দানের সহিত নামের সম্বন্ধ একেবারেই বিস্মৃত হন, তাহা হইলে, তাহা অধিকতর সুখের বিষয় হয়, সন্দেহ নাই। আর দানের সঙ্গে দানের এই দায়িত্বটুকু গ্রহণ করা উচিত, যেন দান গ্রহীতাকে অযোগ্য না করিয়া যোগ্যতর করে।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়, যিনি দেশ-হিতার্থ সর্ব্বত্যাগী, নিজের সামান্য সম্বলও যিনি নিজের জন্য সঞ্চিত রাখেন না, যিনি তাঁহার গ্রামের শিক্ষার উন্নতির জন্য ১০,০০০৲ টাকা, স্কুলের জন্য ২৪,০০০৲, এবং অন্যান্য বিষয়েও অজস্র দান করিয়াছেন, সেই মহাত্মার জন্মগ্রাম রাড়ুলী কাটীপাড়া গ্রামে District Boardএর যে দাতব্য ডিস্‌পেন্সারী আছে, গ্রামবাসিগণ তাহাতে নিজ নিজ দেয় সামান্য চাঁদা দিতেও ভার বোধ করেন। এইটী আমার বোধ হয়, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া (অর্থাৎ Point of View of Phyctopathology) গবেষণার বিষয়। তাঁহারা মনে করেন না যে, এই ঔষধালয় তাঁহাদের নিজেদেরই জন্য। অথবা তাঁহাদের পল্লী-জননীর সেই জগন্মান্য সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার জন্মগ্রামের ঔষধালয়টী যাহাতে সুনিয়মে চলে, সে দিকে তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে না। আবশ্যকের সময় মাত্র তাঁহারা ঔষধালয়ের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে চাহেন; কিন্তু চাঁদা দিবার সময়ে তাহা বিরক্তিকর মনে করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল নহে।

যশোহর জেলার দেশপ্রসিদ্ধ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর মফঃস্বলের চিকিৎসা ও ঔষধের অভাব দূর করিবার জন্য যেরূপ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কতকটা সমবায়ের কার্য্যপ্রণালী আছে। তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সীমানা-ভুক্ত যে কোনও গ্রামে যেখানে ডাক্তারের অভাব, সেখানে যদি কোন যোগ্য ডাক্তার ডাক্তারখানা খুলিয়া বসেন, তাহা হইলে যশোহর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে তাঁহাকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া যাইবে, এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্যও কিছু দেওয়া হইবে। তাঁহাকে নিকটস্থ স্কুলের ছাত্রদিগকে পীড়ার সময় বিনা ভিজিটে দেখিতে হইবে; ইহা ভিন্ন তাঁহার এই বৃত্তি-ভোগের জন্য অন্য কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না। এই ডাক্তার যদি চিকিৎসা

বিদ্যায় পারদর্শী হন, এবং গ্রামবাসিগণের যদি চিকিৎসকের অভাব হইয়া থাকে, তবে আশা করা যায়, তিন বৎসরের মধ্যে তিনি তথায় আপনার পসার করিয়া স্থায়ী হইতে পারিবেন। District Boardএর আর কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না; নতুবা বুঝিতে হইবে, হয় তিনি নিজে অক্ষম, অথবা তথায় ডাক্তারের যথার্থ অভাব নাই।

ঢাকা District Board হইতেও কতকটা এইরূপ ধরণেরই একটী কার্য্য-প্রণালী স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু এই প্রণালীটীর এখনও কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয় নাই।

এই যে যশোহর জেলায় ডাক্তারকে মাসিক বৃত্তি দ্বারা Subsidize করা হইতেছে, এবং ঢাকা District Boardএ ঐরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহা বাহিরের কোনও সাহায্য না লইয়া কোন গ্রামে সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া অর্থ উঠান সম্ভব। পানিহাট গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ সমবায়-প্রণালীতে কতকগুলি Co-operative ডিস্‌পেন্‌সারির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার নিয়মাবলী July মাসের Co-operative Journalএ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে পাঠকবর্গ এই সমবায়-প্রণালীর dispensaryর বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

এ জেলার অনেক গ্রামে অ্যাণ্টিম্যালিরিয়াল লিগ Ante-Malarial League স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্যগণ কোনও একটী বিশেষ গ্রাম কিংবা স্কুল লইয়া, তাহাতে যতগুলি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোক কিংবা বালক বালিকা আছে, তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ ঔষধ খাওইয়া তাহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার বিষ একেবারেই দূরীভূত করিবার চেষ্টা করেন। কারণ, ম্যালেরিয়ার জীবাণুগ্রস্ত গ্রামে যে লোক থাকে, তাহা হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু অপরের দেহে সংক্রামিত হওয়ায়, তাহারাও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়।

সেই জন্য গ্রামে যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোক থাকে, তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলা, তাহার উপকারের জন্য নহে। ইহা অপর গ্রামবাসীর উপকারের জন্য করিতে হইবে, এই শিক্ষাটী আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোক হইতে ম্যালেরিয়া-বীজ যে পরিমাণে ছড়ায়, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শিশু হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকপরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। সেই জন্য কোন গ্রামের ম্যালেরিয়া-নিবারণের পক্ষে সেই গ্রামের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শিশুদিগকে যথাযথরূপে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য

করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই জেলায় কতকগুলি স্থলে Ante-Malarial League গঠিত হইয়া জনসাধারণের তরফ হইতে এই কার্য্যের চেষ্টা হইতেছে, এবং এই চেষ্টাও অধিকাংশ স্থলে ফলবতী হইতেছে। এই Anti-Malarial Leagueই ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য সমবায়-সমিতির কার্য্যপ্রণালী মতে চেষ্টার একটী উদাহরণ।

এই জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে একটী নিয়ম করা হইয়াছে যে, যদি কোন গ্রাম হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে জমা দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে কয় মাসের জন্য টাকা জমা দেওয়া হইবে, সেই কয় মাসের জন্য সেই গ্রামে একটী epedemic ডাক্তার ঔষধাদি সহ প্রেরিত হইবে। এ স্থলে একটী গ্রামের লোকদিগের ডাক্তার পাওয়া, শুদ্ধ তাহাদের আবেদনের উপর নির্ভর করিতেছে। সমবায়-সমিতির প্রণালী অবলম্বন করিয়া ডাক্তারের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা ব্যয় নির্ব্বাহ করা এই জেলার অধিকাংশ গ্রামবাসীর পক্ষেই সম্ভব। ইহা ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য সমবায়-সমিতির কার্য্যপ্রণালী মতে চেষ্টা করার আর একটী উদাহরণ।

কলিকাতায় Central Co-operative Anti-Malarial Society Ltd. নামে কোনরূপ সরকারী সাহায্য না লইয়া সমবায়-সমিতির প্রণালী অনুসারে ম্যালেরিয়া-নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমাদের সকলের এই চেষ্টায় সাহায্য করা উচিত। এই সোসাইটীর কতকগুলি নিয়মাবলী পাঠ করিলে, এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য এবং কার্য্যকলাপের বিষয় বিশদভাবে বুঝা যাইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি এই Central Co-operative Anti-malarial Societyর affiliated Society এই জেলায় স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

এইরূপ সমবায়-সমিতির প্রণালী মতে আমাদের সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিবার অনেক উপায় আছে। পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশই বঙ্গদেশের মত ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত হইয়াছিল। এই সকল দেশই দেশের লোকদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই ভীষণ ব্যাধির দৌরাত্ম্য হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদিগের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই।

শেষ কথা এই যে, যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া জাতীয় কল্যাণের জন্য কায়মনোবাক্যে এইরূপ গ্রামের উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন, আজ ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের এই

মহৎ চেষ্টার অবমাননা করিব না। কে কাহাকে ধন্যবাদ দিবে? এ যে সকলের নিজেরই কার্য্য। তবে সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার পাদপদ্মে এইমাত্র কামনা করি, আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তবুদ্ধি যেন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধিতে বদ্ধ না রহিয়া, যাহাতে সমাজের স্থায়িত্বের প্রকৃত আশা নির্ভর করিতেছে, সেই বৃহৎ সঙ্ঘগত স্বার্থবুদ্ধিতে আপনার তুচ্ছ স্বার্থ মিলাইয়া এক করিয়া তাহার তুচ্ছতাকে মহৎ করিয়া তুলে, এবং আমরা এই সকল শুভ কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ প্রতিষ্ঠার কামী না হইয়া যেন আত্মপ্রসাদেই তৃপ্তিলাভ করি।

দরিদ্রগণের প্রতি করযোড়ে নিবেদন, তাঁহারা দৈন্যের অক্ষমতা এবং পরানুকূল্যের আশা অহরহ স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিয়া এবং বারবার আবৃত্তি করিয়া আপনাদিগকে অধিক অক্ষম করিবেন না; বরং আমি মানুষ, দারিদ্র্য ও অভাব জয় করিবার শক্তি আমারও আছে, এই কথা স্মরণ করিয়া আপনার লুপ্তপ্রায় শক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন, এবং প্রার্থীর পরিবর্ত্তে শ্রমফলভোগী হইয়া অসম্মান হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। ধনিগণের প্রতি আমার করযোড়ে নিবেদন, তাঁহাদের দান যেন দানস্বরূপ না হইয়া সমাজের নিকট নিজ কর্ত্তব্যসাধনস্বরূপ হয়।

প্রত্যেক সাধু চেষ্টা ও মহৎ কার্য্যে বিঘ্নকারক অনেক দোষও থাকে। সেগুলিও জনসমাজের আভ্যন্তরীণ সরলতা হইতে নিরাকৃত হয়। যদিও এই সমবায় প্রণালী একেবারে দোষমুক্ত নয়, কিন্তু যাহাতে ইহাতে দোষ ঘটিতে না পারে, সে জন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী এই দায়িত্ববোধ যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই আশা করিয়া অদ্য অবসর লইলাম। *

শ্রীসরসীলাল সরকার।

কায়রো।
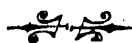
কায়রোর পিরামিডের পরই প্রধান দ্রষ্টব্য-স্থান—কেল্লা। দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যেমন, কায়রোতেও তেমনই দুর্গ বলিতে কেবল সৈন্যনিবাস বুঝায় না। দুর্গ—সহরের মধ্যে সহর—প্রাচীর-বেষ্টিত—সুরক্ষিত, রাজার বা রাজপ্রতিনিধির

---

* খুলনায় সমবায় সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

আবাস স্থান। তথায় প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া, তাঁহারা সাবধান হইয়া বাস করেন। কারণ, স্বজন ও পরজন হইতে পদে পদে তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কা। যে স্থলেই রাজার বা রাজপ্রতিনিধির অধিকার প্রজার স্বীকৃত নিয়মে সীমাবদ্ধ নহে, সেই স্থলেই—অর্থাৎ যে স্থানেই রাজা Constitutional monarch নহেন, সেই স্থানেই এই অবস্থা। ঐতিহাসিক হিসাবেও এই কেল্লা অবশ্য-দ্রষ্টব্য। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সালাদিন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহম্মদ আলীর নামের সঙ্গেই কেল্লার কথা বিজড়িত। তিনি ইহার প্রাচীরগুলি পুনর্গঠিত করেন। কেল্লার মধ্যে মসজেদ ও প্রাসাদ আছে। প্রাসাদটি বর্ত্তমানে সৈনিক কর্ম্মচারী-দিগের আবাসস্থান, হাঁসপাতাল, বুরুজখানা প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত।

সারাসিনিক স্থাপত্যের নিদর্শন বার-এল আজব দ্বারপথে কেল্লায় প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর পথ উঠিয়া পাহাড়ের উপর গিয়াছে। এই দুর্গেই মামেলুক বেগগণ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড মহম্মদ আলীর কলঙ্ক। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে যেমন নিরাপদ হইবার জন্য ও দেশে বিদ্রোহ-সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া শান্তি-স্থাপনোদ্দেশে তুরুস্কের সুলতান জানিসারীদিগকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, মহম্মদ আলী তেমনই সেই উদ্দেশ্যে মামেলুকদিগকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও দুর্গের পূর্ব্বাংশে একটি স্থান দেখাইয়া প্রদর্শক বলে—'এই স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এমিন পলায়ন করিয়াছিলেন।' মামেলুক-দিগের মধ্যে তিনিই প্রাণ লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ আলীর নিমন্ত্রণে মামেলুকেরা দুর্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রণপ্রিয়, বীর, অশ্বারোহণ-পটু। সকলেই সুবেশে সজ্জিত। একে একে তাঁহারা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। মহম্মদ আলী তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ওদিকে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করা হইল। তখন মামেলুকেরা মহম্মদ আলীর উদ্দেশ্য বুঝিলেন; কিন্তু তখন তাঁহারা বন্দী—চারিদিকে পুরপ্রাচীর—কেবল উপরে নীল আকাশ—মুক্তির রাজ্য। সহসা বন্দুকের ধূমে সে আকাশও মলিন হইয়া গেল—প্রাচীর হইতে গুলি বর্ষিত হইল। মামেলুকেরা কেহ বা যুদ্ধোদ্যম করিতে করিতে, কেহ বা আল্লার নাম স্মরণ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এমিন বে বেগে অশ্ব চালাইয়া সেই অগ্নিবর্ষণের মধ্য দিয়া পুরপ্রাচীরে আসিলেন—আরোহীকে লইয়া অশ্ব লম্ফ দিল। অজস্র গুলিবৃষ্টির মধ্যে তিনি নিম্নে মাংস-পিণ্ডে পরিণত অশ্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া একটি মসজেদে আশ্রয়

লইলেন ও শেষে মরুভূমিতে চলিয়া গেলেন। এই কিংবদন্তী যতই কেন চিত্তাকর্ষক হউক না, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মেকলের ঐতিহাসিক রচনার কথার আলোচনাপ্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলিয়াছেন, যাহারা হীনচরিত্র বলিয়া ঘৃণিত, সেই সব ঐতিহাসিক ব্যক্তির দোষ ক্ষালন আজ কাল ইতিহাসে রেয়াজ হইয়াছে—টাইবিরিয়াস হইতে টাইটাস ওটস পর্য্যন্ত সেই জন্য নূতন বর্ণে চিত্রিত হইতেছেন। আমাদের দেশেও আমরা ইহা লক্ষ্য করিতেছি। এক দিকে এই—আর এক দিকে ইতিহাস হইতে কিংবদন্তীর বর্ণ বিধৌত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আকবর বাদশাহের খৃষ্টান বেগমের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতেছে। কাশিমবাজারে কান্ত মুদী যে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ডোল চাপা দিয়া ও পান্তাভাত খাওয়াইয়া সিরাজদ্দৌলার কোপানল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণাভাব আলোচিত হইতেছে। এমিনের এই অসম্ভব কার্য্যেরও প্রমাণ নাই। তিনি, বোধ হয়, সন্দেহহেতু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আইসেন নাই; তাই রক্ষা পাইয়াছিলেন।

দুর্গের দক্ষিণ দিকের প্রাকার হইতে নিম্নে সহরের ও নদীপ্রান্তরের দৃশ্য উপভোগ্য বটে। কেবল সেই দৃশ্য দেখিবার জন্যই দুর্গে গমনের শ্রম সার্থক হয়।

দুর্গ মধ্যে কয়টি মসজেদ আছে। সেগুলির মধ্যে প্রাকারোপরি অবস্থিত সুলেমান পাশার মসজেদ উল্লেখযোগ্য, এবং মহম্মদ নসরের মসজেদ প্রাচীনতম —১৩১৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। মহম্মদ আলির মসজেদই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এলাবাষ্টারের স্তম্ভশোভিত বলিয়া ইহাকে এলাবাষ্টার মসজেদও বলে। এই এলাবাষ্টার মর্ম্মরের মত একপ্রকার কতকটা স্বচ্ছ কোমল খনিজ পদার্থ। ইহারই বিরাট স্তম্ভের উপর মসজেদের গম্বুজ। মসজেদ বৃহদাকার -মধ্য-ভাগের কারু ও মনোরম। ইহা কনস্তান্তিনোপলের মসর ও সমানিয়া মসজেদের অনুকরণে রচিত। মহম্মদ আলী মামেলুকদিগের হত্যাক্ষেত্রে মসজেদ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার শবও এই মসজেদে সমাহিত। মসজেদের দ্বারে স্মৃতিচিহ্নরূপে এলাবাষ্টারের নানা প্রকার কাগজ-চাপা বিক্রয় হয়।

কায়রো সহরে সর্ব্বসমেত তিন শতেরও অধিক মসজেদ আছে। এই সংখ্যাধিক্য হেতু সকল মসজেদ সুসংস্কৃত অবস্থায় রক্ষিত হয় না। আজকাল আরব স্মৃতিকীর্ত্তি রক্ষার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই Commission for the Preservation of Arabic Monnumts মসজেদগুলির

সংস্কারের যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সমিতির চেষ্টায় এলঘুরী মসজেদের সংস্কার হইয়াছে। ইহা এলঘুরী নামক সারকেশিয়ান মামেলুক সুলতানের কীর্ত্তি। ইনি খৃষ্টীয় ১৫০১ অব্দ হইতে ১৫১৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই মন্দিরের প্রাচীর ও হর্ম্ম্যতল সুদৃশ্য মর্ম্মরাবৃত।

স্থাপত্যসজ্জার হিসাবে আবুবকর মসজেদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহার মর্ম্মরের মিশ্রকাজ (Mosaics) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইব্রাহিম আঘার মসজেদ 'নীল মসজেদ'' নামে সমধিক পরিচিত। যে মামেলুক অটোমান সুলতানদিগের অধীনে মিশরের প্রথম পাশা হইয়াছিলেন, তিনিই ইহা নির্ম্মাণ করান। পরে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম আঘা ইহা সংস্কৃত ও বিস্তৃত করেন। ইহার স্তম্ভশ্রেণী, মিনার ও ছাত সবই সুন্দর, কিন্তু ইহার প্রাচীরগাত্রে যে সব গাঢ় নীল বর্ণের টালি আছে, তাহার তুলনা নাই। এই সব মিনাকরা টালি বহুমূল্য। যাঁহারা বিলাতে প্রসিদ্ধ শিল্পী লর্ড লেটনের গৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহাতে প্রাচীরসংলগ্ন নীল টালি দেখিয়া থাকিবেন। সে সব প্রাচীর পুরাতন গৃহ হইতে বহুকষ্টে ও বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত। আমি আর একটিমাত্র মসজেদের উল্লেখ করিব—সে ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে নিহত সুলতান হাসানের মসজেদ। এই মসজেদে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ গম্বুজের নিয়ে নিহত সুলতানের শব সমাহিত। ইহা বৃহদায়তন, এবং ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত। এক হিসাবে ইহা কায়রোর জাতীয় মসজেদ। অশান্তির ও বিপ্লবের সময় জনগণ এই মসজেদে সমবেত হইয়াছে এবং এই মসজেদেই সরকারের বিরোধী জননায়কগণ লোককে উপদেশ দিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন মিসরে জাতীয় আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়, তখনও তাহাই হইয়াছিল। এই জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ আজও বর্ণিত হয় নাই। ইহার ইতিহাস উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু আজ যে ভাবের প্লাবন সমগ্র প্রাচীতে পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা তাহারই অংশ। সে ভাবের প্লাবন স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হইয়াছিল।

অল-অজহরের কথা বলিয়াই কায়রোর মসজেদের বিবরণ শেষ করিব। এই মসজেদের বৈশিষ্ট্য, ইহা মসলেম বিশ্ববিদ্যালয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এই মসজেদ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দশ-সহস্রাধিক ছাত্র এক সঙ্গে এই বিদ্যালয়ে পাঠ করে—বর্ণ-পরিচয় হইতে

মুসলমান শাস্ত্র ও দর্শন পড়ান হয়। প্রায় তিন শত শিক্ষক শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। মসজেদ ও সংলগ্ন বিদ্যালয় বৃহদায়তন। ইহার অনুচ্চ ছাত— প্রায় চারি শত স্তম্ভ গৃহটিকে গাম্ভীর্য্য দান করে, এবং ম্লানতেজ রবিকরে সে গাম্ভীর্য্য যেন বিবর্দ্ধিত হয়। মিসরের সরকার বৎসর বৎসর যে পত্রিকা বা Almanac প্রকাশ করেন, তাহাতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বিবরণ আছে। তাহাতে দেখা যায়, খৃষ্টীয় ৯৭০ অব্দে এই মসজেদের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, এবং দুই বৎসর পরে শেষ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অল-অজহরের পুস্তকগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন তাহাতে ৪০ হাজার পুস্তক আছে; তাহার মধ্যে ১৫ হাজার পুঁথি। ইহার কয়টি শাখাও আছে। ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের বজেটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বাবদে মোট প্রায় ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ছাত্রদিগের রুটীর খরচ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও অন্যান্য ব্যয় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। শিক্ষকের সংখ্যা ৩ শত ৮১, এবং ছাত্রসংখ্যা ৯ হাজার ১৯; ছাত্রদিগের মধ্যে ৮ হাজার ৪ শত ৫৪ জন মিসরী, সিরিয়ান, তুর্ক, বাংমুরীশ; অবশিষ্ট আফগানিস্থান, বাগদাদ, বর্ম্ম, ভারতবর্ষ, জাভা, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে আগত। ছাত্রদিগকে শিক্ষা, বাসস্থান ও খাইবার রুটী দেওয়া হয়। অনেকে এজন্য টাকা দান করিয়াছেন। এই সব ছাত্রদিগের মধ্য হইতেই মসজেদে উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। জগতের সর্ব্ব দেশ হইতে যে এত ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাগত হইয়া থাকেন, তাহা আমি দেখিবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী' ছদ্মনামে এক জন বাঙ্গালী লেখক 'ভারতী' পত্রে এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কখন স্ব-নামে, কখন 'গোপাল-শাস্ত্রী' নামে, কখন বা 'ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী' ছদ্মনামে বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসী ছাত্র আছেন জানিয়া আমি তাঁহাদিগের কাহাকেও ডাকিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। অধ্যক্ষ এক জন লোককে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি যাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন, তিনি বাঙ্গালী। তিনি কিছুকাল হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস ও পাঠ করিতেছেন; বলিলেন, যুদ্ধের সময় ডাকের গোলে বাড়ী হইতে খরচ না আসায় কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী ছাত্র তিনি একা। আমাদের বাঙ্গালা হইতেও যে বিদ্যার্থী মুসলমান যুবকেরা এই দূর দেশে যাইয়া থাকে, তাহা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। এই বিদেশে—

অপ্রত্যাশিতভাবে এই মুসলমান যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় পরম প্রীতি লাভ করিলাম, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলাম। তিনি অধ্যাপককে বলিলেন, আমি মুসলমান নহি—বাঙ্গালী হিন্দু; কিন্তু আমরা উভয়েই ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে আসিয়াছি—আমরা দুই জনে সে হিসাবে ভাই। অধ্যাপক মহাশয় আমার করমর্দ্দন করিলেন। অন্যান্য মসজেদের মত এই মসজেদেও প্রবেশদ্বারে চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে বা কাপড়ের জুতা পায় দিয় ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন প্রাবেশিকেরও ব্যবস্থা আছে; তাহা দিলে প্রবেশের জন্য ছাড়পত্র পাওয়া যায়। এই অল-অজহর দেখিয়া বাগদাদের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়িল। তথায় একটি বিদ্যালয়-গৃহ এখন শুমরীক বা কুৎঘরে পরিণত হইয়াছে। কায়রোর এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাপি মুসলমানদিগের জ্ঞানানুশীলনের সাক্ষ্য দান করিতেছে। যে মুসলমান ধর্ম্ম সাম্যমন্ত্রের প্রচারক, সেই মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা জ্ঞানবিস্তারে অল্প সাহায্য করেন নাই।

কায়রোয় আমাদের অবস্থিতির মেয়াদ তিন দিন। দুইদিনে যতটুকু দেখিতে পারিলাম, দেখিলাম। তৃতীয় দিন (১০ই সেপ্টেম্বর) আমাদিগকে হেলিও-পলিস দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল।

হেলিওপলিসে যাইবার পূর্ব্বে আমরা কয়জন মামেলুকদিগের সমাধি দেখিতে গেলাম। এই স্থানে কতকগুলি সমাধি—কালবশে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ভালরূপ সংস্কৃত হয় নাই। কিন্তু এগুলি দেখিলে মুসলমানদিগের এক এক পরিবারের সমাধিগৃহের আকার প্রকারের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎ হলের মধ্যে অনেকগুলি সমাধি; কোনটি অধিক জমকাল, কোনটি সাধারণ। হর্ম্ম্যতলে লম্বা গালিচা পাতা, তাহার উপর বসিয়া মুসলমানরা কোরাণ পাঠ করিতেছেন, পরলোকগত সমাহিত ব্যক্তিদিগের পারলৌকিক মঙ্গলের প্রার্থনা করিতেছেন। কোরাণের পুঁথিগুলির পত্রে পত্রে পাড় আঁকা—তাহাতে কতদিন পূর্ব্বে যে সোনালী রঙ করা হইয়াছে, তাহা আজও ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সে-ঘরে সূর্য্য উজ্জ্বল নহে—একটু ম্লান। সেই অন্ধকার কক্ষের গাম্ভীর্য্য সমাধিস্থানের গাম্ভীর্য্য যেন আরও বিবর্দ্ধিত করে। এই সব সমাধির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমাধি আছে। কোন সমাধি পুরুষের ও কোন সমাধি রমণীর, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, পুরুষের সমাধির উপর ফেজ টুপী রচিত—স্ত্রীলোকের,

সমাধির উপর মুকুট। যে টুপী এ দেশেও মুসলমানেরা আজকাল ব্যবহার করিতেছেন—সেই তুর্কী টুপীই ফেজ।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই মামেলুকদিগের সমাধি দেখিয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কারণ, সময় বিভাগের বন্দোবস্তে তথায় আমাদিগের জন্য এক জন কর্ম্মচারী মোটর লইয়া অপেক্ষা করিবেন। তিনিই আমাদিগকে হেলিওপলিসে লইয়া যাইবেন।

হেলিওপলিস কায়রোর উপকণ্ঠে মরু-নগর। কায়রো হইতে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে ১০ মিনিটে এই নবরচিত সহরে উপনীত হওয়া যায়; বৈদ্যুতিক ট্রামও আছে। কিন্তু নূতন হেলিওপলিসের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন হেলিওপলিসের একটু পরিচয় দিব। সে হেলিওপলিস ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। মিশরের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকার ও বিস্মৃতির অন্ধকার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সে ইতিহাসেও হেলিওপলিসের প্রাচীনত্ব বিস্ময়কর। প্রথমে ইহা 'অন্' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তখন মিশরে ইহা 'মেমফিসে'র ঐশ্বর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুই প্রসিদ্ধ নগরে বৃষের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর এই হেলিওপলিস হইতে সূর্য্যপূজা সিরিয়ার সূর্য্যনগর Balbec প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হয়। আমাদের দেশের বৈদিক সাহিত্যেও দিবাকরের পূজার পরিচয় আছে। মানুষ সূর্য্যের আলোকবিকাশে বিস্মিত হয়। রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া সূর্য্যালোক জীবজগতে প্রতিদিন যেন নূতন জীবন সঞ্চারিত করে। পারসীকরা এখনও সূর্য্যের পূজা করেন। মিশরের মরুদেশে সূর্য্যের কর প্রখর। উদয়াস্ত ভাস্করের মূর্ত্তি মনোহর—উদয়াস্ত দিবাকরের অরুণরাগরঞ্জিত প্রকৃতিও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। তাই সূর্য্যের পূজা। আজ সেই সমৃদ্ধ নগরের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান—"কেবল নাম আছে।" এই হেলিওপলিসের সূর্য্য-মন্দির-প্রাঙ্গণে, আমাদের দেশের মন্দির-প্রাঙ্গণে গরুড়স্তম্ভ বা অরুণস্তম্ভের মত যে প্রস্তরস্তম্ভ (obelisk) ছিল, তাহা লণ্ডনে নীত হইয়া, টেমসের কূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিলাতে তাহা "ক্লিওপেট্রার সূচ" (Cleopatra's Neadle) নামে প্রসিদ্ধ।

এখন হেলিওপলিসে একটি পুরাতন প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান। স্তম্ভটি গোলাপী রংয়ের গ্রানাইটে গঠিত—প্রাচীন মিশরের চিত্রিত ভাষায় তাহার গাত্রে কত কথা উৎকীর্ণ।

এই প্রাচীন হেলিওপলিসের নিকটেই খ্রীষ্টানদিগের পুরাতন স্মৃতি ও কিংবদন্তী নানারূপে বিজড়িত। মিশরে পলায়নের পর খৃষ্ট ও খৃষ্টের মাতা যে

তরুতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, সে তরু এই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। হেরডের সৈনিকদিগের আক্রমণ হইতে খৃষ্টমাতা যে কৌশলে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাও অনৈসর্গিক। তিনি এই তরুর শাখামধ্যে লুক্কায়িত হইলে, উর্ণনাভ লূতা-তন্তুজালে তাঁহাকে লোকলোচন হইতে অন্তরালে রাখিয়াছিল। ইহারই সান্নিধ্যে একটি কূপ দেখাইয়া লোকে বলে, মেরী তাহার জলে শিশু খৃষ্টকে স্নান করাইয়াছিলেন।

এই প্রাচীন সহরের নিকটে নূতন সহর-রচনার আয়োজন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হয়; তাহা Heleopolis Oasis Scheme নামে পরিচিত। মরুপ্রান্তে স্বাস্থ্যকর স্থানে নূতন উদ্যান নগর রচনা করিবার কল্পনা অতি অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্যে পরিণত হয়। মরুময় ৬ হাজার একর জমীতে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া—বৃক্ষবীথি করিয়া—উদ্যান নগর রচনা করিয়া সহর রচিত হইয়াছে। রাস্তাগুলি সুগঠিত—প্রশস্ত। উদ্যানগুলি মনোহর। সৌধমালা সুবৃহৎ ও সুন্দর। বাস্তবিক, সৌন্দর্য্যে এই নূতন সহর প্যারিসের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার অধিকাংশ সৌধই মুরিশ স্থাপত্য-প্রথায় রচিত। সকল দেশের স্থাপত্যই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়। মরুদেশে এই মুরিশ স্থাপত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সমগ্র সহরে বিদ্যুদালোক আছে—সহরের জল ও আবর্জ্জনা নিকাশের ব্যবস্থাও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্বে জয়পুর সহর এইরূপে রচিত হইয়াছিল। আর আজকাল দুর্দ্দশাদাবানলদগ্ধ দিল্লীর উপকণ্ঠে দরিদ্র ভারতবাসীর অর্থের উপর নূতন দিল্লী রচিত হইতেছে। মার্কিনে এমন সহর অনেক আছে। মার্কিন পর্য্যাটকরা জয়পুরকে সেকালের সিকাগো বলেন। তাই সার ফ্রেডরিক ট্রিভস বলিয়াছেন, জয়পুরকে সেকালের সিকাগো না বলিয়া সিকাগোকে জয়পুরের আদর্শে রচিত নূতন সহর বলাই সঙ্গত। হেলিওপলিসের বড় বড় হোটেল, ডাকঘর, তারঘর, ঘোড়দৌড়ের মাঠের বাড়ী—এ সবই সুন্দর। আর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—সরল বিস্তৃত রাজপথ। নক্সা করিয়া নূতন সহর রচনা করিলে, এমন করিয়া রচনা করা সম্ভব হয়; নহিলে নহে। সব পুরাতন সহর প্রাসাদ বা দুর্গ বা মন্দির কেন্দ্র করিয়া গঠিত; তাহাদের রচনায় কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই—কেন না, শৃঙ্খলাসহকারে কেহ সহর রচনা করে নাই; গৃহের পার্শ্বে গৃহ—গৃহের সম্মুখে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শেষে যখন নগর বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে, তখন তাহা বিশৃঙ্খলার বিরাট বিকাশ। আমাদের দেশে বারাণসীতে ইহার বিশেষ প্রমাণ বিদ্যমান। দিল্লী

হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সব সহরেও ইহার অল্পবিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সহর বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায়ও শেষে গঠন ভাঙ্গিবার জন্য 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট' করিতে হইয়াছে।

হেলিওপলিসে আমরা একটি বৃহৎ বন্দী স্কন্ধাবার দেখিয়াছিলাম। এই আড্ডায় ৯ হাজার ৫ শত বন্দী ছিল—তাহারা তুর্কীর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইয়াছে। বন্দীদিগের মধ্যে কয় জন মাত্র জার্ম্মান্; আর প্রায় সকলেই তুর্ক। সহরের উপকণ্ঠে অনেকটা জমী কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। তাহার মধ্যে দরমার ঘর—মধ্যে পথ, দুই পার্শ্বে বন্দীরা থাকে। প্রত্যেকের সম্বল কম্বল ও আহার পানীয়ের পাত্র। এই সব তুর্ক দেখিতে বলবান—তাহাদের দেহ সুগঠিত, তাহারা কষ্টসহ। ইতঃপূর্ব্বে মেসোপোটেমিয়াতেও আমি এইরূপ তুর্ক সৈনিক দেখিয়াছি। স্কন্ধাবারে প্রহরীর বাহুল্য। সব বন্দোবস্ত চমৎকার। এমন কি, ইহাদের ঝারী-স্নানের (shower bath) ব্যবস্থাও আছে। বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা কাজ করিতে চাহে, তাহাদের কাজের ব্যবস্থাও করা হয়। অনেকগুলি বন্দী পুঁতির সাপ, লাঠী ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। তাহাদিগকে পুঁতি, সূতা প্রভৃতি কিনিয়া দেওয়া হয়, এবং জিনিস বিক্রয় হইলে উপকরণের মূল্য বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা শিল্পীর হিসাবে জমা করা হয়। সে মুক্তি পাইলে সে টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে।

হেলিওপলিস দেখিয়া মনে হইল, মিশরের মরুদেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে, বাঙ্গালার প্রান্তরে কেন তাহা সম্ভব হয় না? বাঙ্গালাতেই বা কেন আমরা ম্যালেরিয়া-বিবর্জ্জিত স্বাস্থ্যকর ও শোভাময় সহর রচনা করিতে পারি না? অভাব কিসের—অর্থের, না উদ্যোগের? ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া মোটরে উঠিলাম।

হেলিওপলিস হইতে আমরা পুরাবস্তুশালায় আসিলাম। আমি এই মিউজিয়মের বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব না। মিশরের সভ্যতা বহুকালের—মিশর বহু রাজবংশের উত্থানপতন-লীলাক্ষেত্র। কাজেই এই গৃহে যে সব দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া সংরক্ষিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক হিসাবে সে সব অমূল্য। প্রাচীন মিশরের কালাগত চিত্র কল্পনা করিতে হইলে এই গৃহে আসিতে হয়। এই স্থানে বিরাট ভাস্করকীর্ত্তি, সুরক্ষিত শব, পুরাতন অস্ত্র ও বস্ত্র—এ সব দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন নানা যুগের মিশরের চিত্র বায়স্কোপের চিত্রের মত নয়ন-

সম্মুখে ছুটিয়া উঠিতেছে—সরিয়া যাইতেছে। এই গৃহে যে সব পুরাতন যান রক্ষিত, সেই সব যানে এককালে মিশরের নৃপতিরা গমন করিতেন। সেই সব নৃপতির ও তাঁহাদের পত্নীদিগের শব এই গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। মিশরের 'মমীর' কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। প্রাচীন মিশরে শব রক্ষা করিবার কৌশল ছিল—আজ তাহা বিলুপ্ত। সেই উপায়ে রক্ষিত রাজা ও রাণীদিগের শব মিশরের নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গৃহে রক্ষা করা হইয়াছে। শবগুলি বিবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বিকৃত হয় নাই। যে নেত্রে রোষদৃষ্টি দেখিলে এককালে সহস্র সহস্র প্রজা প্রাণভয়ে কম্পিত হইত, সেই নেত্র আজ দৃষ্টিহীন! মিশরের মৃত অতীতের মৃত নৃপতিদিগের মৃতদেহ আজ দর্শকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে! এই গৃহটির জন্য মিশরী সরকারের প্রশংসা করিতে হয়। গৃহনির্ম্মাণেই প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে—সংরক্ষিত দ্রব্যাদি সাজাইবার পদ্ধতি প্রশংসনীয়, এবং প্রত্যেক দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি সহজেই জানা যায়।

এই মিশরী মিউজিয়ম দেখিয়া আরবী মিউজিয়ম দেখিতে হয়। প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিউজিয়ম-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ইহা মধ্য-যুগের সারাসিনিক শিল্পের নিদর্শনে পূর্ণ। পুরাতন ভগ্ন মসজেদ হইতে সংগৃহীত ও ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে ক্রীত নানা শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ দ্রব্য এই গৃহে সজ্জিত।

খদিবের পুস্তকাগারও রম্য গৃহ। ইহাতে প্রায় ৭০ হাজার পুস্তক আছে।

আমরা হেলিওপলিস হইতে মিউজিয়মগুলি দেখিয়া যখন হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমরা শ্রান্ত। কিন্তু তখনও আমাদের যাত্রার বিলম্ব আছে। আমি সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিবার জন্য খালিফদিগের সমাধিমন্দির দেখিতে গেলাম। কায়রো সহর ছাড়াইয়া—পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনাস্তূপের পার্শ্ব দিয়া গাড়ী জনবিরল সমাধিক্ষেত্রে আসিল। চারি দিকে ভগ্নপ্রায় গৃহ ও সমাধি ও মসজেদ। অনেক মসজেদে গৃহহীন আরবরা আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু এই সব জীর্ণ সমাধিমন্দিরে বা মসজেদে স্থাপত্য দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। অনেকগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কালের আঘাত সহ্য করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। বিশেষ, কাইটবের মসজেদ স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়, এবং বারকুকের মসজেদ সত্য সত্যই চিত্রার্পিত বলিয়া মনে হয়।

এই সব সমাধিমন্দির দেখিয়া আমি আবার কায়রোর বাজারের মধ্য দিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। সময়ের অভাবে নীলনদের কূলে অন্যান্য

প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইল না। আমরা আলেকজান্দ্রিয়ায়ও যাইতে পারিলাম না।

সেই দিনই অপরাহ্ণ ৬টার পর আমরা পোর্ট সইদে যাত্রা করিলাম। তখন 'অস্তরবি চিতা রচে মেঘের উপরি'—পশ্চিম গগনে দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছে।

রাত্রি ১১ টার পর আমরা আবার নির্ব্বাপিতদীপ, অন্ধকারাচ্ছন্ন পোর্ট সইদে ফিরিয়া আসিলাম, এবং হোটেলে আশ্রয় লইলাম।

ক্ষয়াবশেষ।*

—:*:—

একণে আরও কয়েকটি ক্ষয়াবশেষের কথা উল্লেখ করিব। পেটে দুইটি অন্ত্র আছে; একটি ছোট, একটি বড়। বৃহদন্ত্রটির প্রথমাংশে একটি স্থান বক্রভাবে থলের মত হইয়াছে। উহাকে ইংরাজিতে সিকম * বলে। ঐ থলের

অন্ধান্ত্র।

সংলগ্ন একটু লম্বমান অংশ আছে। † এই অংশের শেষভাগ বন্ধ। ‡ আরম্ভ-স্থানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ। এই লম্বমান অংশ কোন জীবের ছোট, কাহারও বড়। ওরাংওটাংদিগের এই অংশ বড়; কাঙ্গারুশ্রেণীর কোনও জীবের অত্যন্ত বড়। নরজাতিমধ্যে কাহারও থাকেই না; কিন্তু অধিকাংশ নরেরই থাকে। এই শ্রেণীতে উহার দৈর্ঘ্য চারি পাঁচ ইঞ্চির অধিক হয় না। এই লম্বমান অংশের [অর্থাৎ অন্ধান্ত্রের] অর্দ্ধভাগ অথবা তাহারও অধিক ভাগ কখন কখন রন্ধ্রহীন নীরেট হইয়া থাকে; কখন বা ইহার শেষাংশ চ্যাপ্টা ও জমাট্-বাঁধা মত হয়। অন্ধান্ত্রের দ্বারা দেহের বিশেষ কোন উপকার হয়, এরূপ বুঝা যায় না। বরং সময় সময় ইহার পীড়া হইয়া অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়; কখনও বা মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। এই পীড়াকে এপেন্ডিসাইটিস্ বলে। § বলিয়াছি,

---

* Coecum.

† Rudiments.

‡ Vermiform appendage

¶ বাঙ্গালাতে ইহাকে 'অন্ধান্ত্র' বলা যাইতে পারে। বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ কৃত অভিধানে ঐ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

§ Appendicitis.

অন্ত্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য কোন জীবের বড়, কাহারও ছোট, নরশ্রেণীতে অত্যন্ত ছোট হইয়া থাকে; কাহারও অন্ধান্ত্র গোল, সচ্ছিদ্র; কাহারও চ্যাপটা, নীরেট, এবং রন্ধ্রহীন। এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, ইহা ক্রমে উচ্চতম জীবের (মানবের) দেহে প্রায় লুপ্ত ও ক্রিয়াহীন হইয়াছে। ডারুইন্ বিবেচনা করেন, ওরাংওটাং প্রভৃতির আহার অপেক্ষা নরজাতির আহার অনেক পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অন্ধান্ত্র ঈদৃশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

চক্ষুঃপত্র।

আমাদিগের চক্ষুতে দুইটি পাতা আছে। কিন্তু পক্ষি-শ্রেণীতে, কোন কোন উভচর জীবে, কতিপয় সরীসৃপে, এবং দুই একটি স্তন্যপায়ী জীব-শ্রেণীতেও চক্ষুর তিনটি পাতা আছে। পক্ষীরা ঐ তৃতীয় পাতা চক্ষুর তারার উপর টানিয়া দিয়া থাকে। ঐ পাতা স্পন্দনশীল। কাককে ঐরূপ অবস্থায় অনেকেই দেখিয়াছেন; তখন বোধ হয় যেন উহার চক্ষুই নাই। নরশ্রেণীতে চক্ষুর তৃতীয় পত্র প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার কোন চিহ্ন এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; কেবল চক্ষুর যে কোণ নাসামূলের নিকটবর্ত্তী, সেই কোণে লাল-আভা-যুক্ত একটু ক্ষুদ্র মাংসখণ্ডমাত্র ক্ষয়াবশেষ বর্ত্তমান আছে।

ধূলি, কীটাদি, প্রবল বায়ু প্রভৃতি হইতে চক্ষুর রক্ষা করিতে ঊর্দ্ধাধঃ দুইটি চক্ষুপত্র মুদিত করিতে হয়। তাহাতে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়; সুতরাং চলা ফেরা করিবার অসুবিধা হয়। তৃতীয় পত্র দ্বারা ইতর প্রাণিগণ চক্ষুকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এবং উহার মধ্য দিয়া একটু দেখিতেও পায়। নর-জাতি হস্ত ব্যবহার করে, গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক পরিচালনা করে। তদ্দ্বারাই চক্ষুকে রক্ষা করা যায়। সুতরাং এই জাতিমধ্যে তৃতীয় চক্ষুঃপত্র থাকিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এ জীবে ঐ পত্র প্রায় ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে।

মূত্রকোষলগ্ন গণ্ড।

এক্ষণে আর একটিমাত্র ক্ষয়াবশেষের উল্লেখ করিব। ইহা একটি ছিদ্রযুক্ত গণ্ড (gland)। এই গণ্ড পুংজাতীয় স্তন্যপায়ী জীবের মূত্র-কোষের অধোভাগের নীচে অবস্থিত। মূত্রকোষের নিম্নভাগ বর্দ্ধিত হইয়া মূত্রনালে পরিণত হইয়াছে। মূত্রনাল যে স্থানে উপস্থমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটু উপরে, মূত্রকোষের বর্দ্ধিত অংশের প্রারম্ভস্থানের নিম্নে একটি সচ্ছিদ্র নাতিবৃহৎ গণ্ড আছে। উহার ছিদ্রও মূত্রনালে প্রবেশ করিয়াছে। এই গণ্ড পুংগণের থাকে,

স্ত্রীগণের থাকে না। কিন্তু স্ত্রীগণের ঠিক এই স্থানে, অর্থাৎ মূত্রকোষের বর্দ্ধিত অংশের প্রারম্ভস্থানের নিম্নে জরায়ু নামক যন্ত্র অবস্থিত। জরায়ু ভ্রূণাধার। পুংগণের ঠিক জরায়ুস্থানে একটি নাতিবৃহৎ গণ্ড কেন? পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইহাকে জরায়ু যন্ত্রের অনুরূপ অথবা তুল্য যন্ত্র বিবেচনা করেন। যদিও এই যন্ত্র পুংদেহে প্রায় অকর্ম্মণ্য ও জরায়ু অপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তথাপি মূত্রকোষ, মূত্রনাল, জরায়ু—এই তিনটির অবস্থান দৃষ্টে এই গণ্ডকে জরায়ুর অনুরূপ যন্ত্র বিবেচনা করা হয়। এ মীমাংসা সঙ্গত হউক আর না হউক, * এ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যজনক বৃত্তান্ত কতিপয় ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাহা এই:—যে সকল জীবের স্ত্রীদেহে জরায়ু দ্বিখণ্ডিত, সেই সকল জীবের পুংদেহে এই গণ্ডও দ্বিখণ্ডিত! এ গণ্ড জরায়ুর অনুরূপ যন্ত্র না হইলে, এরূপ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিশেষতঃ, এই গণ্ড নরদেহের সকল ক্ষেত্রে তুল্য পুষ্ট হয় না। ইহার অবয়ব ও ক্রিয়া কোন নরদেহে পুষ্ট, এবং কোথাও অপুষ্ট। ইহার আয়তনও ছোট বড় হইয়া থাকে।

এই গণ্ডের উল্লেখ করিবামাত্রই মনে এক অপূর্ব্ব চিন্তা উদিত হয়।

উভলিঙ্গত্ব।

ডারুইন এই গণ্ডকে কেবল জরায়ুর অনুরূপ * মাত্রই বলিয়া নীরব হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুগণের হরগৌরীতত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিন্তা ও কল্পনা এই পথে বহুদূর অগ্রসর না হইয়া ক্ষান্ত হইতে পারে না। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানও এই মতের সমর্থন করিতেছে। জরায়ুর অনুরূপ যন্ত্র পুংগণের কেন? পুংগণ কি কোন কালে স্ত্রীগণের ন্যায় ছিল? পুংত্ব ও স্ত্রীত্ব কি একাধারে বিদ্যমান ছিল? 'ছিল' বলি কেন? এখনও জীবগণমধ্যে উভলিঙ্গত্ব দেখা যাইতেছে। পুংধর্ম্ম ও স্ত্রীধর্ম্ম একাধারে বর্ত্তমান থাকা, উচ্চশ্রেণীস্থ জীবমধ্যে অধিক দেখা যায় না; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ জীবমধ্যে বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণিমধ্যে কোনও কোনও মৎস্যশ্রেণীতে, এবং একটি উভচর শ্রেণীতে উভলিঙ্গত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেরুদণ্ডবিহীন প্রাণিমধ্যে স্পঞ্জ জাতিতে, কৃমিজাতিতে, শম্বুক-জাতি প্রভৃতিতে উভলিঙ্গত্ব প্রায় সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে। সর্ব্বজনপরিচিত জোঁক উভলিঙ্গ। পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগণ অধিকাংশই উভলিঙ্গ। বহুসংখ্যক পুষ্পেই পুংযন্ত্র ও স্ত্রীযন্ত্র একাধারে বর্ত্তমান আছে।

---

* The vesicula prostatica which have been observed in many male mammals is now universally acknowledged to be the homologue of the female uterus.—Descent of Man (1906) p. 34.

সুতরাং উভলিঙ্গত্ব আকস্মিক ঘটনা নহে। উচ্চশ্রেণীস্থ জীবে পুংধর্ম্ম ও স্ত্রীধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকাই সাধারণ নিয়ম হইয়াছে; কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে অধিকাংশ জীবই উভলিঙ্গ। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীস্থ জীবমধ্যে লিঙ্গভেদ নাই। প্রটোজোয়া-শ্রেণীস্থ জীবগণের, কতিপয়-স্পঞ্জ-শ্রেণীর জীবের, এবং কোন কোন সিলেণ্টেরেটার † (পুরুভুজ শ্রেণীর) লিঙ্গভেদ নাই। লিঙ্গভেদ অপুষ্পিত উদ্ভিদগণেরও নাই। যেমন ব্যাঙের ছাতা, ফার্ণ ইত্যাদি।

সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে, লিঙ্গভেদ মৌলিক লক্ষণ নহে। অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীস্থ জীবের [কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, উভয়েরই] লিঙ্গভেদ হয় নাই। তাহাদিগের বংশবৃদ্ধি হয়, ফাটিয়া এবং ফুলিয়া। * পরে লিঙ্গভেদ হইলেও এক দেহেই উভয়বিধ লিঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাই উভ-লিঙ্গত্ব। সর্ব্বশেষে উভলিঙ্গত্ব পৃথক হইয়া বিভিন্ন দেহে স্থাপিত হওয়ায় কেহ পুংধর্ম্মযুক্ত, কেহ স্ত্রীধর্ম্মযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং কেহ পুরুষ, কেহ স্ত্রী, এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি বহু প্রাচীন যুগের অনুন্নত জীবশ্রেণীর উভলিঙ্গত্ব † উচ্চশ্রেণীর জীবকেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নাই। এখনও পুরুষের মধ্যে উভলিঙ্গ হিজ্ড়ে (নপুংসক) নরশ্রেণীতেও দেখা যায়। আমি আমার নিজ গ্রামে এক জন দেখিয়াছি। পুরুষের দুগ্ধস্রাবী স্তন, স্ত্রীলোকের গোঁপ দাড়ী, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। স্ত্রী-যন্ত্রে উপস্থের ক্ষয়াবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ সকল ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান; উহা নিগ্রো, জাপানীগণের মধ্যে কখন কখন দীর্ঘায়তন হইতেও দেখা যায়। বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতির স্ত্রীদেহেও কদাচিৎ ঐরূপ হইয়া থাকে। ‡ উহার

---

* একটি জীবদেহ ফাটিয়া দুইটি, দুইটি ফাটিয়া চারিটি, এইরূপ কোন কোন জীবের দেহের কোন স্থান ফুলিয়া বর্ত্তুলাকার একটি পদার্থ হয়। উহা খসিয়া পড়ে, এবং পৃথক জীব হয়। এইরূপে ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হয়।

† There can be little doubt that permaphrodition (উভলিঙ্গত্ব) was the primitive stage among multicelluear animals. * * * unisexuality (একলিঙ্গত্ব) avolved out of permaphrodition.—Geddes and Thomson's Evolution of Sex. P. 78.

‡ আমার শ্রদ্ধের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার পরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি স্ত্রীগণের এই প্রত্যঙ্গটি এত দীর্ঘ দেখিয়াছেন যে, তাঁহাকে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া সাধারণ আয়তনে আনিতে হইয়াছিল।

† যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহুল্য ও জটিলতা যত কম, তাহাকে তত অনুন্নত, এবং যত বেশী, তত উন্নত বলা হইয়া থাকে।

কোন কোন পুংধর্ম্মও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এ সকল বিবেচনা করিলে স্তন্যপায়ী পুংজাতীয় জীবদেহে জরায়ুর অনুরূপ যন্ত্র থাকা দুর্ব্বোধ হয় না। অতি প্রাচীন যুগে যে উভলিঙ্গত্ব অনুন্নত জীবগণের সাধারণ ধর্ম্ম ছিল, তাহাই কালক্রমে জীববিবর্ত্তনের নিয়মাধীনে এক্ষণে প্রায় অকর্ম্মণ্য, ক্ষুদ্র ও অপুষ্ট অবস্থায় ক্ষয়াবশেষরূপে উন্নত নর-শ্রেণীতেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

জীবদেহে বহুসংখ্যক ক্ষয়াবশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান আছে। সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং এক্ষণে ক্ষয়াবশেষের কারণ আলোচনা করিয়াই এ সন্দর্ভের উপসংহার করিব।

হেতু।

ডারুইন এবং ওয়ালেস্ উদ্ভাবিত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধান জীব-বিবর্ত্তনের একটি প্রধান উপায়। সংক্ষেপতঃ ঐ বিধানের অর্থ এই:—জীব অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নত হইয়াছে। এক-জাতীয় জীব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে শেষে এত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যে, তাহাকে বিভিন্ন-জাতীয় জীব বলিয়া বিবেচনা করা যায়। ঐ পরিবর্ত্তিত জীব স্থায়িভাবে পৃথক সংজ্ঞা লাভ করে। পরিবর্ত্তন সকল পদার্থেরই মৌলিক ধর্ম্ম; কিছুই চিরদিন সমান থাকে না। জীবের পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমে চলিয়া আসে; এবং বংশানুক্রমে আরও পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমে বহুবংশের পরে এক জীব বহু শাখা প্রশাখায় পরিবর্ত্তিত হইয়া বহুজাতীয় জীব গঠিত করে; তাহাদিগের নামও বিভিন্ন হয়। সরীসৃপ জাতির দন্ত, ফুস্ফুস্ ও সম্মুখের পদদ্বয় (যাহা হস্তের অনুরূপ) কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে অন্য আকার প্রাপ্ত হইলে, অথবা বিলুপ্ত হইলে, যখন একটি বিশেষ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তখন পক্ষী নাম পাইয়া থাকে। ইহা ক্রমে হইয়াছে বলিয়াই অধিকাংশ জীবতত্ত্ববিদ্গণ বিশ্বাস করেন। *

এ পরিবর্ত্তন কেন হয়? তাহার উত্তর নাই। ইহা প্রকৃতির মৌলিক বিধান। যিনি এক ছিলেন, তিনিই বহু হইয়াছেন। কেন হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। যদিও পরিবর্ত্তনের কারণ অজ্ঞাত, তথাপি কোনও পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয় কেন, এবং কোনও পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয় না কেন, তাহার কারণ অনেকাংশে বুঝা যায়। সরীসৃপের দন্ত ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে পক্ষি-

* ডি-ভ্রিয্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন হওয়া বিশ্বাস করেন।

শ্রেণীতে লুপ্ত হইয়া গেল; * নর-শ্রেণীর 'আক্কেল দাঁত' (wisdom teeth) পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া এক্ষণে এত শক্তিহীন হইয়াছে যে, সকলেরই উহা উঠিতে ১৯।২০ বৎসর বিলম্ব হয়। কাহারও বা উঠেই না। আমাদিগের তালুর সম্মুখভাগের উপর পাটী দন্তের পশ্চাতে যে সকল অল্পউচ্চ আইল আছে, ঐ সকল স্থানে দন্ত ছিল। এখনও দুই এক ব্যক্তির ঐ স্থানে দুই একটি দন্ত থাকা দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিরই ঐ স্থানে দন্ত হয় না। মৎস্য শ্রেণীর ডানা সরীসৃপ-শ্রেণীতে কোন কোন স্থলে হস্তে ও পদে পরিণত হইয়াছে; কোন কোন স্থলে লোপ পাইয়াছে। হিংস্র জন্তুর শ্বদন্ত বড়, আমাদিগের নিম্নশ্রেণীর জীবের সকল দন্তই বড়। কিন্তু আমাদিগের ছোট হইয়া গিয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, মাংস ভেদ করিয়া উঠিতেই পারে না; মাংস কাটিয়া দিলে উঠে। এই সকল এবং আরও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে দুর্ব্বলতার দিকে যাইতেছে; অথবা সবল হইতেছে, পুষ্টতার দিকে যাইতেছে; অথবা অপুষ্ট হইতে হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। পরিবর্ত্তন জীবদেহের সাধারণ ধর্ম্ম; উপরন্তু বাহ্য প্রকৃতি চিরপরিবর্ত্তনশীল। ভূমির উচ্চাবচ অবস্থা, শীতোষ্ণতা, আর্দ্রতা অথবা শুষ্কতা, উর্ব্বরতা অথবা অনুর্ব্বরতা ইত্যাদির পরিবর্ত্তন স্বতঃই হইতেছে। এ পরিবর্ত্তনের সহিত জীব-দেহের পরিবর্ত্তন যদ্যপি সমঞ্জস অথবা অনুকূল হয়, তবে জীব সুরক্ষিত এবং ক্রমে উন্নত হইতে পারে। কিন্তু যদি অসমঞ্জস অথবা প্রতিকূল হয়, তবে জীব অনুন্নত হইয়া যায়, এবং কালক্রমে বিলুপ্ত হইতে পারে। বহুজীবের ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত জীব ও দেহের পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্যের প্রকৃত অর্থ কি? বিবেচনা করুন, একটি বিলে মৎস্য থাকিত; তাহারা ঐ বিলের শ্যাওলা আহার করিয়া জীবিত থাকিত। অকস্মাৎ কোন কারণে শ্যাওলা মরিয়া গেল। তখন মৎস্য অনাহারে মারা যাইবে। কিন্তু ঐ বিলের অতি নিকটে আর একটি জলাশয় আছে, তাহাতে শ্যাওলা আছে। এই অবস্থায় যদি মৎস্যের ফুস্ফুস্ বায়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান গ্রহণ করিবার উপযোগী হয়, অর্থাৎ তাহার ফুস্ফুসের পরিবর্ত্তন কিয়দংশে আমাদিগের মত হইতে আরম্ভ করে, এবং তাহার ডানা চারিটি যদি একটু সবলতা প্রাপ্ত হয়, তাহা

* এমন পক্ষী পূর্ব্বকালে ছিল, যাহার দন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে দন্তযুক্ত পক্ষী নাই।

হইলে ঐ মৎস্য নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়া শ্যাওলা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে যাইতে মৎস্যকে ক্ষেতের উপর দিয়া যাইতে হয়।

সুতরাং ফুস্‌ফুসের ও ডানার উপরের লিখিত অনুকূল পরিবর্ত্তন ঘটিলে মৎস্য আহার পাইয়া বাঁচিল, নচেৎ বাঁচিল না। বায়ুমণ্ডল হইতে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চালাইতে পারিলে, এবং জলে ও স্থলে উভয়ত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হইলে মৎস্য বাঁচিল বটে, কিন্তু সে আর ঠিক জলচর মৎস্য থাকিল না। তখন সে উভচর জীব-শ্রেণীতে উন্নত হইতে চলিল। ক্রমে সে সরীসৃপে, বিহঙ্গে, স্তন্যপায়ী শ্রেণীতে উন্নত হইবে। আহারের অসদ্ভাবের সহিত ফুস্‌ফুসের বায়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান-গ্রহণের উপযোগিতা জন্মিলে, মৎস্য উন্নত হইবে। অর্থাৎ, আহার, বাসস্থান, গতিবিধি, চরিত্র ইত্যাদির পরিবর্ত্তনের সহিত জীবদেহের ও বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ঐক্য হইলে জীবরক্ষা হইবে; অনৈক্য হইলে জীব ক্রমে মারা যাইবে। অন্য ভাষায় বলিলে, পরিবর্ত্তন জীবের জীবন-ব্যাপারের অনুকূল হইলেই তাহার উপকার এবং উন্নতি; প্রতিকূল হইলেই অপকার ও ধ্বংস। যদি বাঁচিয়া থাকা ও উন্নত হওয়া জীবের প্রধান প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ইহাও বলা যায় যে, যাদৃশ পরিবর্ত্তন জীবের প্রয়োজন সিদ্ধ করে, অর্থাৎ তাহার উপকার সাধন করে, তাদৃশ পরিবর্ত্তনেই জীবের ক্রমোন্নতি; তদ্বিপরীত পরিবর্ত্তনে অধোগতি, এবং অবশেষে বিলোপ। কিন্তু উন্নতি অথবা বিলোপ একদিনে হয় না।

আমরা ক্ষয়াবশেষের আলোচনায় বিলোপের কথাই চিন্তা করিব। বিলোপ একদিনে হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে স্বকর্ম্মসাধনের অনুপযুক্ত হয়। তখন হইতে জীবের বিলোপ আরম্ভ হয়। পরে ঐগুলি খর্ব্ব, অপুষ্ট, ক্রিয়াহীন হইতে হইতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন সে জীব বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর যদি বর্ত্তমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গই খর্ব্ব, অপুষ্ট, ক্রিয়াহীন হইয়া ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইলেও, তত্তৎস্থলে অন্যবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাত হইয়া জীবের পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রার সহায়তা করে, তাহা হইলে জীব বিলুপ্ত হয় না; অন্য শ্রেণীতে উন্নত হয়; কিন্তু পূর্ব্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে বিলোপের পথে অগ্রসর হওয়ায়, সেইগুলিই 'ক্ষয়াবশেষ'-রূপে উন্নত জীবদেহেও সাময়িকরূপে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষয়াবশেষের উল্লেখ করিয়াছি, উহারা এই কারণেই এখনও উন্নত জীবদেহে বর্ত্তমান আছে।

মাংসাশী ইতর জীবের শ্বদন্ত * বৃহৎ ও তীক্ষ্ণ। যে সকল জীব অপক্ক কঠিন পদার্থ ভক্ষণ করে, তাহাদিগের চর্ব্বণদন্তও † দৃঢ়, এবং তাহার উপরিভাগ প্রশস্ত। মানব সুসভ্য অবস্থায় সুপক্ক দ্রব্য আহার করে; তখন তাহার দৃঢ় প্রশস্তাগ্র অথবা তীক্ষ্ণ দন্ত প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইতর জীবের দন্ত যখন দুর্ব্বল, খর্ব্ব ও প্রশস্তাগ্র হইতে আরম্ভ করে, তখন যদ্যপি সেই জীবের অন্য প্রকারে উন্নতি হওয়ায় তাহার আহার পক্ক বস্তু হয়, তবে ঐ দন্ত ক্রমে ক্ষয়ের পথে আরও বহু দূর অগ্রসর হইবে, এবং শেষে বিলুপ্ত হইতে পারে। এ স্থলে দৈহিক পরিবর্ত্তন যে দিকে যাইতেছে, আহার্য্যের পরিবর্ত্তনও সেই দিকের অনুকূল হওয়ায় দন্ত 'ক্ষয়াবশেষ' হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হয়। এইরূপে ক্ষয়াবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ওয়ালেস্ এই ভাবেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কতিপয় জীব-বিজ্ঞানবিৎ এ সকল অন্যভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চাৎ তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশধর রায়।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন যখন হরিনাথ মজুমদারের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা অধিক হয় নাই; তিনি সেখানে বহুলোকের সমাগম ও আয়োজন আড়ম্বর দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সমারোহের শ্রাদ্ধই বটে। মজুমদার তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধ্যানুরূপ অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল বহিঃপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যান্য লোকের সহিত শ্রাদ্ধ-সভায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সভার একধারে প্রচুর মূল্যবান্ দান-সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে; সুদৃশ্য মশারি-সমাচ্ছাদিত খট্টা হইতে সবৎসা

* Cannine teeth. † Mollar teeth.

পাতী পর্য্যন্ত কোন দ্রব্যই বাদ যায় নাই। অন্তধারে কারুকার্য্য-খচিত একখানি সুবিস্তীর্ণ গালিচায় দেশ বিদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সশিষ্য শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে উপবেশনপূর্ব্বক হাত মুখ নাড়িয়া শিখা আন্দোলন করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন।

ন্যায়ের একটি জটিল প্রশ্ন লইয়া তখন দুই জন বিখ্যাত নৈয়ায়িকের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। উভয়েই মহাতার্কিক, এবং ন্যায়শাস্ত্রে আপনাকে অদ্বিতীয় মনে করিয়া, উভয়েই আত্মাভিমানে স্ফীত! কেহই ভ্রম স্বীকার করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনের সহিত এতই অশাস্ত্রীয় গালি বর্ষণ করিয়া স্ব-পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিয়া এত দুঃখেও ন্যায়রত্নের হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইল।

ন্যায়রত্ন সভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতদ্বয়ের তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতে-ছিলেন। তিনি যে এক জন মহাপণ্ডিত, তাঁহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া, ইহা কাহারও অনুমান করিবার শক্তি ছিল না। তিনি অনাহূত অপরিচিত ভিক্ষুকমাত্র; কেহই তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল না; তিনিও অনাহূত-ভাবে দিগ্দেশাগত নিমন্ত্রিত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে উপবেশন করা শিষ্টাচারসঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু পণ্ডিতগণের স্বভাব তিনি কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন? কথিত আছে, মহাকবি কালিদাস ছদ্মবেশে দেশ-ভ্রমণ-কালে একদিবস বাধ্য হইয়া রাজার পাল্কী বহিয়াছিলেন; তিনি বেহারার সহিত পাল্কী কাঁধে করিলেন, তথাপি এই হীন কার্য্য হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে সেই রাজার মুখ হইতে যখন অশুদ্ধ বাক্য উচ্চারিত হইল, তখন তিনি তাহার প্রতিবাদ না করিয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ন্যায়রত্ন যখন দেখিলেন, তর্ক-নিরত পণ্ডিতদ্বয় ভুল তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, তখন তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল; তিনি আর নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না। তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতদ্বয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন।

পণ্ডিতদ্বয় স্ব-স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তর্কযুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা দেখিল, অতিমলিন-বস্ত্র-পরিহিত, বিশুষ্কবদন, জীর্ণনামাবলি-বেষ্টিত-মস্তক, শীর্ণকায়

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সভাধিরূঢ় দুইজন খ্যাতনামা বিদ্যাদিগ্‌গজের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন! ইহা এমন অদ্ভুত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপার যে, সভার তুমুল কোলাহল মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল; সকলেরই মনে হইল, তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে।

মানুষমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদের অধীন; ভুল না হয় কার? ভ্রম-প্রদর্শন করিলে উদারহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ভ্রম স্বীকার করেন; কিন্তু এরূপ উদারতা সকলের নিকট আশা করা যায় না। যে দুই জন নৈয়ায়িক সভাস্থলে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা খ্যাতি প্রতিপত্তি অধিক ছিল, এবং তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদারতা ছিল না। সেই সভাস্থলে দেশবিদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলী, অধ্যাপকবৃন্দ ও তাহাদের ছাত্রবর্গের সমক্ষে এই ভাবে অপদস্থ হইয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন, এবং আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল, অনিমন্ত্রিত একটা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের এত স্পর্দ্ধা! সভাসীন সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সে অপমান করিতে সাহস করিল? সশিষ্য পণ্ডিতেরা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; ক্রোধাতিশয্যে তাঁহাদের নস্যের ডিবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল; অনেকের কাছা খুলিয়া গেল। তাঁহারা শিখা আন্দোলিত করিয়া ন্যায়রত্নকে তাঁহার দাম্ভিকতার উপযুক্ত শিক্ষা-দানের জন্য অগ্রসর হইলেন। সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু ন্যায়রত্ন সহসা পণ্ডিতগণের ধৈর্য্যবিচ্যুতিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; অপমান ও লাঞ্ছনা অপরিহার্য্য বুঝিয়াও প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, পণ্ডিতেরা প্রকাশ্য সভায় অপদস্থ হইয়া ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ক্রোধ খড়ের আগুনের মত ক্ষণস্থায়ী, তিনি মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত ও সংযত করিতে পারিবেন।

কিন্তু ন্যায়রত্নের আশা পূর্ণ হইল না। ক্রুদ্ধ পণ্ডিতদ্বয়ের ভক্ত শিষ্যেরা অধিকতর অপমান বোধ করিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং একটি ষণ্ডামার্ক শিষ্য গুরুভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার গলায় গামছা জড়াইয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল; অন্যান্য শিষ্যেরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, নিরুপায়, উপবাস-ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘাড়ে ও পিঠে ধাক্কা মারিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিল!

এই ব্যাপারে চারি দিকে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সকল লোক সেই দিকে দৌড়াইতে লাগিল! গৃহস্বামী হরিনাথ

শুনিতে পাইলেন, এক জন বৃদ্ধ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হঠাৎ শ্রাদ্ধ-সভায় প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগে সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যৎপরনাস্তি অপমান করিয়াছে। পণ্ডিতদের ছাত্রেরা গুরুর অপমানদর্শনে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই ভিক্ষুকে ধাক্কা মারিয়া সভার বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহাই গোলমালের কারণ।

হরিনাথ তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রাদ্ধ-সভায় সহসা এইরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, পণ্ডিতের দল কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছেন; ন্যায়রত্ন মৃতবৎ মাটীতে পড়িয়া প্রহারযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এবং একটি যুবক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতেছে। বৃদ্ধের চক্ষু নিমীলিত, এক একবার তিনি মুখ বিকৃত করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া হরিনাথের কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল; কিন্তু যে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ অনাহূত ভাবে শ্রাদ্ধ-সভায় প্রবেশ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অপমান করিতে সাহস করে, তাহার লাঞ্ছনায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলে পাছে তাহাতে পণ্ডিতগণের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি সহানুভূতিসূচক কোনও কথা বলিতে সাহস করিলেন না; স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের দুর্গতি দেখিতে লাগিলেন।

যে ব্রাহ্মণ-যুবক ন্যায়রত্নের পাশে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল, সে হরিনাথকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ীতে আজ কি অন্যায় কাজই হইয়া গেল! হরিরামপুরের মহাপণ্ডিত পরমভাগবত তারানাথ ন্যায়রত্ন আপনার বাড়ীতে এইরূপ লাঞ্ছিত হইলেন; আর আপনি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিতেছেন!"

ন্যায়রত্নের শ্রীহীন বিবর্ণ শীর্ণ দেহ, উপানদ্‌বিহীন ধূলিধূসরিত পদযুগল এবং ভিক্ষুকের ন্যায় মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া, এই বৃদ্ধ সত্যই যে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তারানাথ ন্যায়রত্ন, ইহা বিশ্বাস করিতে হরিনাথের প্রবৃত্তি হইল না; তথাপি এই ব্রাহ্মণ যুবক বৃদ্ধটিকে কি উদ্দেশ্যে তারানাথ ন্যায়রত্ন বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কিঞ্চিৎ আগ্রহ হইলেও তিনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে

তাঁহার কানে কানে বলিল, "সভাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপমানিত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি তাঁহাদের নিকট ক্রটী স্বীকার না করিয়া, যে তাঁহাদের অপমান করিল, এখানে আসিয়া তাহাকেই আদর যত্ন করিতেছেন; পণ্ডিতেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একযোগে আপনার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হরিনাথ ব্যগ্রভাবে ক্রোধোন্মত্ত পণ্ডিতদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার ক্রটী-মার্জ্জনার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরা নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদেরই এক জন চাঁই 'করচ' হইতে নস্যপূর্ণ 'শামুক' বাহির করিয়া নাসিকার লোমবহুল ছিদ্রপথে প্রায় একতোলা নস্য পুরিয়া সজলনেত্রে বলিলেন, "চল হে বিদ্যেবাগীশ, সকলকে নিয়ে সভায় চল, শাস্ত্রতেই বলেছে, সহনঞ্চাপকারস্য সামর্থ্যেপি ক্ষমা মতা। আমাদের যথেষ্ট অপমান হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কৃতীর বিশেষ অপরাধ নেই; ওঁকে ক্ষমা করাই উচিত। কি বল তর্করত্ন ভায়া?"— তর্করত্ন শিখায় হাত বুলাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ঠিক, ক্ষমাই মহতের ভূষণ। এবার ওঁকে ক্ষমা করা গেল। কিন্তু দক্ষিণার সময় যেন কোন ক্রটী না হয়।"—পণ্ডিতেরা দল বাঁধিয়া পুনর্ব্বার সভাস্থ হইলেন।

ব্রাহ্মণ যুবকের শুশ্রূষায় ন্যায়রত্ন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্ব্বতী, তুমি এখানে?"

পার্ব্বতী বলিল, "আপনার টোল বন্ধ হইবার পর উপস্থিত পণ্ডিতগণের অন্যতম মধুসূদন তর্কবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতেছি। অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গেই এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আপনি এখানে এ বেশে কি কারণে উপস্থিত হইলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।"

ন্যায়রত্ন মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেখ পার্ব্বতী, সে সকল কথা শুনিবার জন্য তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিও না। কেবল তাহাই নহে, যদি তুমি একদিনও আমাকে তোমার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার একটি ইচ্ছা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে।—আমার পরিচয় তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

কিন্তু পার্ব্বতী শ্রাদ্ধসভায় ন্যায়রত্নকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল, এবং অধ্যাপক-শিষ্যেরা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে উদ্যত হইলে পার্ব্বতীই তাঁহার পক্ষা-

বলম্বনপূর্ব্বক তাহার পরিচয় দিয়া ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণবটুদিগের কবল হইতে তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল, সুতরাং ন্যায়রত্ন তাঁহার পরিচয় গোপন রাখিবার জন্য পার্ব্বতীকে আদেশ করিবার পূর্ব্বেই সে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু শেষে সে ভাবিয়া দেখিল, ইহাতে ন্যায়রত্নের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে না। কারণ, আত্মাভিমানী পণ্ডিতের দল তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় অপদস্থ হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের শিষ্যেরা হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক পার্ব্বতী স্থির করিল, ন্যায়রত্ন সম্বন্ধে সে আর উচ্চবাচ্য করিবে না।

যাহা হউক, পার্ব্বতী সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ন্যায়রত্নের পরিচয় প্রদান করুক বা না করুক, এবং ন্যায়রত্নের সহিত সেই সকল পণ্ডিতের দেখা সাক্ষাৎ বা পরিচয় না থাক, তাঁহার নাম উপস্থিত পণ্ডিতগণের সকলেরই সুবিদিত ছিল, ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, তাহাও পাণ্ডিত্যাভিমানী কোন অধ্যাপকেরই অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ, ন্যায়রত্ন প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র হইতে যে সকল বচন ও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তর্কনিরত পণ্ডিতদ্বয়ের ভ্রমসংশোধন করিয়াছিলেন,—পণ্ডিতগণের ঔদরিকতা অপেক্ষা উদারতা ও ক্রোধ অপেক্ষা সহৃদয়তা অধিক হইলে তাহাতেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন—অনাহূত আগন্তুক বৃদ্ধ কোন ছদ্মবেশী মহাপণ্ডিত, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি!—সুতরাং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করা ও সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করা তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় অপ্রত্যাশিতভাবে অপদস্থ হইয়া তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এবং ন্যায়রত্নের নির্য্যাতনে কুণ্ঠিত হন নাই।

ক্রোধের বশে হঠাৎ কোন কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিলে, ক্রোধান্তে ভদ্রলোকমাত্রেরই মনে অনুতাপের সঞ্চার হয়! ক্রোধের উপশম হইলে পণ্ডিতেরা ন্যায়রত্নের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। এক জন প্রাচীন পণ্ডিত অনুতপ্তস্বরে বলিলেন, "ইনি যদি সত্যই হরিরামপুরের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক তারানাথ ন্যায়রত্ন হন, তাহা হইলে কাজটা বড়ই গর্হিত হইয়াছে।"

আর এক জন পণ্ডিত বলিলেন, "তিনি ন্যায়রত্ন হউন বা না হউন, ব্রাহ্মণ, তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহার উপর বয়সেও আমাদের সকলের অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার ধৃষ্টতা ও দম্ভ যতই অমার্জ্জনীয় হউক, তাঁহাকে ও ভাবে লাঞ্ছিত করা নিতান্ত বর্ব্বরের কার্য্য হইয়াছে।"

তৃতীয় পণ্ডিত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্, চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্' ?—যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, সে জন্য এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি ? আর এই রবাহুত দরিদ্র ভিক্ষুককে ন্যায়রত্ন মনে করিয়া আপনারা যে হা হুতাশ করিতেছেন, তিনি হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্ন, ইহার প্রমাণ কি ?"

প্রথমোক্ত প্রাচীন পণ্ডিতটি ধীরভাবে বলিলেন, "আমরা তাঁহাকে কেহই দেখি নাই, তাঁহার নাম শুনিয়াছি মাত্র ; কিন্তু পণ্ডিত মধুসূদন তর্কবাগীশের শিষ্য পার্ব্বতী ভট্টাচার্য্য বলিতেছিল, ঐ বৃদ্ধটিই হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্ন।"

পণ্ডিত মধুসূদন তর্কবাগীশ অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। এক জন পণ্ডিত বলিলেন, "আপনার সেই ছাত্রটিকে একবার ডাকুন ত তর্কবাগীশ মহাশয়, সে কি বলে শোনা যাক্।"

তর্কবাগীশের আহ্বানে পার্ব্বতী ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উক্ত পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন, "যে প্রাচীন ব্রাহ্মণটি সভামধ্যে আমাদের অপদস্থ করিয়াছিলেন, তুমি নাকি বলিয়াছ—তিনি হরিরামপুরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক তারানাথ ন্যায়রত্ন ? তিনি যে তারানাথ ন্যায়রত্ন, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে ?"

পার্ব্বতী উভয় সঙ্কটে পড়িল। ন্যায়রত্ন তাহাকে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অথচ সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী পার্ব্বতীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সত্যকথা-প্রকাশের অধিকার তাহার নাই, অথচ মিথ্যা বলাও অকর্ত্তব্য। এ অবস্থায় সে কি করিবে—স্থির করিতে না পারিয়া নির্ব্বাকভাবে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। উকীলের উৎকট জেরায়, সাক্ষীর কাট্‌রায় দণ্ডায়মান এ কালের ধর্ম্মভীরু সরলপ্রকৃতি সাক্ষীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে, সেকালের অধ্যাপক-শিষ্য-ভট্টাচার্য্য-নন্দনের অবস্থাও সেইরূপ হইল।

তাহাকে নীরবে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার অধ্যাপক তর্কবাগীশ মহাশয় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হঠাৎ কি তোমার বাক্‌রোধ হইল, পার্ব্বতী ! তোমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—তাহার উত্তর দিতেছ না কেন ? তুমি আমার চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিবার সময় কি আমাকে বল নাই যে, পূর্ব্বে তুমি হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্নের টোলে অধ্যয়ন করিতে, তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন টোল বন্ধ হওয়ায় আমার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছ ?"

পার্ব্বতী কাতরদৃষ্টিতে তাহার অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে কথা সত্য। আমি পণ্ডিত তারানাথ ন্যায়রত্নের টোলের ছাত্র ছিলাম,

সুতরাং তাঁহাকে চিনিতাম—এ কথা বলাই বাহুল্য। ইদানীং বহুদিন তাঁহাকে দেখি নাই। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখের আকার ও শারীরিক গঠন দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—ইনিই আমার ভূতপূর্ব্ব গুরু তারানাথ ন্যায়রত্ন। তবে আপনারা যদি বলেন, উহা আমার দৃষ্টির বিভ্রমমাত্র, তাহা হইলে আপনাদের কথার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।"

পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! এমন অর্ব্বাচীনের মত কথাও ত কখন শুনি নাই। মানুষের মত কি মানুষ থাকিতে নাই? তারানাথ ন্যায়রত্নের মুখাকৃতির সহিত এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই তর্কবাগীশের শিষ্য সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে—এই ব্রাহ্মণই তারানাথ ন্যায়রত্ন! পার্ব্বতী আমার শিষ্য হইলে আমি উহাকে সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি প্রদান করিতাম। আর প্রকৃতপক্ষে তারানাথ ন্যায়রত্নের যেরূপ সুনাম, সুযশ ও খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার ন্যায় পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তি যে দীনহীন দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় এই শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত হইবেন, ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।"

পণ্ডিতের এই উক্তি, সভাস্থ সকল পণ্ডিতই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন; তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইলেও এক জন পণ্ডিত পার্ব্বতীকে বলিলেন, "সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বোধ হয় বাহিরে কোথাও বসিয়া আছে; তুমি একবার বাহিরে গিয়া তাহার সন্ধান লইয়া এস। আমরা তাহাকে জেরা করিলেই তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিব।"

পার্ব্বতী হরিনাথের বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ন্যায়রত্নের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি প্রকৃতই তারানাথ ন্যায়রত্ন কি না, এই কথা লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যখন বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই অবসরে ন্যায়রত্ন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

* * * * *

ন্যায়রত্ন যে বিধবা কৈবর্ত্তরমণীর আশ্রয়ে সুমতিকে রাখিয়া শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়াছিলেন, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেখানে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিতে পাইলেন, সুমতি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। ক্রমে তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে সুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই দিন অনাহার, তাহার উপর শ্রাদ্ধবাড়ীতে অসহ্য লাঞ্ছনা; তাঁহার সর্ব্ব

শরীর অবসন্ন হইয়াছিল; তিনি দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে না পারিয়া শয়ন করিলেন। শয়নমাত্র তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ না করিলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করা যে অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইত, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া যৎসামান্য তণ্ডুল ও দুই একটি বার্ত্তাকু, আলু ও কয়েক খণ্ড তিন্তিড়ী সংগ্রহপূর্ব্বক সুমতি যখন সেই বিধবার কুটীরে প্রত্যাগমন করিল, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। বহুস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় সুমতি দেখিয়াছিল, কিছু দূরে আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে,—পুষ্করিণীর একটি ঘাট ইষ্টকবদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বাঁধা ঘাট।

তখন পর্য্যন্ত ন্যায়রত্নের স্নানাহ্নিক হয় নাই। সুমতি কুটীরে আসিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি সহ পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল। সেখানে উভয়ে স্নান করিলেন। সুমতি তাড়াতাড়ি আহ্নিক শেষ করিয়া ঘাটের অদূরস্থ একটি আম্রবৃক্ষমূলে তিউড়ী খুঁড়িয়া ভাত রাঁধিতে বসিল। আলু সিদ্ধ, বেগুন পোড়া, তেঁতুল এবং কিঞ্চিৎ লবণ অন্নের পর্য্যাপ্ত উপকরণ, ইহা সে জানিত।

ন্যায়রত্ন অদূরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। রন্ধন শেষ হইলে সুমতি হাঁড়ীর সমস্ত ভাত একখানি কদলীপাত্রে ঢালিয়া, তাহার পিতাকে পাতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া পুষ্করিণীতে হাত পা ধুইতে গেল। কিন্তু ভাতের প্রতি ন্যায়রত্নের লক্ষ্য রহিল না; তিনি মুদিতনেত্রে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে একটা কুকুর বৃক্ষান্তরাল হইতে নিঃশব্দে সেখানে আসিয়া ভাতগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল!

সুমতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুকুরটা অর্দ্ধেক ভাত খাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্তদিনের পরিশ্রমের এই পরিণাম? সুমতি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "বাবা, এ কি হ'ল? হায়, হায়, আপনি যে দুইদিন উপাসী আছেন!" মনের দুঃখে সুমতি কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর পুষ্করিণীর ঘাটে রানার উপর অবসন্নভাবে শয়ন করিল; এবং অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। তখন তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই; এবং এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন তাহার সে কষ্ট অনুভব করিবার শক্তিও বোধ হয় অন্য কাহারও নাই। কুকুরটা নির্ব্বিঘ্নে ভাতগুলি উদরস্থ করিয়া লাঙ্গুল আন্দোলন

করিতে করিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। ন্যায়রত্ন নির্নিমেষনেত্রে শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'ভগবান, এও তোমার পরীক্ষা! তোমার এই অধম ভক্তকে পরীক্ষার অনলে আর কত দগ্ধ করিবে? নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু মেয়েটার কষ্ট যে আর দেখিতে পারি না।"

তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, তখন আর পুনর্ব্বার ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় ছিল না; তাঁহার বা সুমতির সেরূপ প্রবৃত্তি এবং শরীরের সেরূপ অবস্থাও ছিল না। ন্যায়রত্নও অবসন্নদেহে শয়ন করিলেন। সহস্র চিন্তা তুমুল ঝটিকার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ সংক্ষোভ উপস্থিত করিল। তঁহার উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অসহ্য অন্তর্ব্বেদনা তিনি আর হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি আবেগভরে :উঠিয়া বসিয়া নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়, অনাথের একমাত্র সহায় মা জগদম্বাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, এবং করযোড়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'মা জগজ্জননী' তোমার শ্রীচরণে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমার সেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক বুঝিয়া, বাসের জন্য আমাকে যে সামান্য কুটীর দিয়াছিলে তাহা হইতে বিতাড়িত করিলে; আমার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটা ও আজন্মের বাসগ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিলে; আমাকে পথের ভিখারী করিলে; আমাকে অনন্ত দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলে! আমাকে যত দুঃখ দিতে হয়; দাও, মা, তোমার অভয় চরণতলে মাথা রাখিয়া সকল দুঃখ সকল কষ্ট ধীরভাবে সহ্য করিব; সকলই কাড়িয়া লইয়াছ, কিন্তু তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। তুমি যত কষ্ট দিতেছ, সকলই ত আমি সহ্য করিতেছি; কিন্তু মা, আমার অন্ধের যষ্টিস্বরূপিণী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি চিরদুঃখিনী সুমতির দুঃখ কষ্ট যে আর সহ্য করিতে পারি না। মা দুর্গতিনাশিনী, এত দুর্গতিতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে দয়াময়ী; দয়া করিয়া ক্ষমা কর। আমার এ দুঃসহ সন্তাপ হরণ কর। একবার করুণনয়নে সুমতির মুখের দিকে চাও, অনন্ত দুঃখের যাতনা হইতে তাহাকে উদ্ধার কর।'.

সুমতির মনেও তখন চিন্তার তুফান বহিতেছিল; আজ এই স্তব্ধ সন্ধ্যায়, উদার উন্মুক্ত নীলাকাশতলে, বাপীতটে ধরাশয্যায় নিপতিত থাকিয়া শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সকল কথা একে একে তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, নিত্য নূতন দুঃখের, কষ্টের, অপমান ও লাঞ্ছনার সুদৃঢ় লৌহ

শৃঙ্খল দ্বারা তাহার আশাহীন, শান্তিহীন, তমসাচ্ছন্ন মধ্যজীবন পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। কোন্ পাপে ভগবান্ তাহার অদৃষ্টে এত দুঃখ কষ্ট লিখিয়াছেন? জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কি তাহাকে এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? নিজের কষ্ট সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার বৃদ্ধ পিতার দুঃখ কষ্ট যে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সে জীবন দিলেও যদি তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব হইত!—সুমতি মুদিতনেত্রে এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল। অনন্ত চিন্তার কোথাও শেষ নাই বুঝিয়া সে হতাশভাবে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিল, দেখিল, নৈশাকাশ শুভ্রজ্যোতি অগণ্য নক্ষত্রে ভরিয়া গিয়াছে। সেই নক্ষত্ররাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুমতির মনে পড়িল, সে বাল্যকালে তাহার স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার নিকট শুনিয়াছিল, কোন একটি নক্ষত্রলোকে তাহার পুণ্যবতী জননী তাহার ভাই ভগিনীগুলিকে লইয়া বাস করিতেছেন। সুমতি স্তব্ধভাবে অনেক ক্ষণ আকাশের দিকে অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া রহিল; সে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'মা গো! তুমি কোথায় আছ, মা?'

যেন তাহার সেই নক্ষত্রলোকবাসিনী জ্যোতির্ম্ময়ী জননী লক্ষকোটী যোজন-দূরবর্ত্তী এই মর্ত্তলোকবাসিনী চিরদুঃখিনী কন্যার আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তরদান করিবেন, এমন সকরুণ, এরূপ নির্ভরতা পূর্ণ সেই আহ্বান! সুমতির সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া ন্যায়রত্নের চিন্তা ভগ্ন হইল। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, আজ দুই দিন সুমতির আহার হয় নাই। সে ক্ষুধায় কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া ন্যায়রত্ন কাতরপ্রাণে একান্তমনে মা অন্নপূর্ণার করুণা ভিক্ষা করিলেন; এক মুষ্টি অন্নদানে তাহার ক্ষুন্নিবারণের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। তিনি সেই নিস্তব্ধ বাপীতট প্রতিধ্বনিত করিয়া করযোড়ে উর্দ্ধমুখে আবেগকম্পিত-করুণ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

"রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং,
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং সর্ব্বদুঃখহন্ত্রীং।"

—জানি না, হতভাগ্য বিড়ম্বিত নিরন্ন বিপন্ন বৃদ্ধের এই কাতর প্রার্থনা স্বর্গলোকবাসিনী, সর্ব্বান্তর্য্যামিনী, নিখিল বিশ্বের অন্নদায়িনী, মূর্ত্তিমতী করুণা-

রূপিণী, সর্ব্বদুঃখনাশিনী জননী অন্নপূর্ণার চরণ-সরোজে স্থান পাইল কি না; কিন্তু তখন ভিক্ষা মিলিবার- সুদূর সম্ভাবনাও বর্ত্তমান ছিল না। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ-বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্ম, এমন কি, কাঙ্গালী-বিদায় পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু ভগবানের এমনই বিধান যে, ন্যায়রত্ন যখন একান্তমনে যুক্তকরে মা অন্নপূর্ণার নিকট এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রাদ্ধকর্ত্তা হরিনাথের মন হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কাঙ্গালী-বিদায়ের পর হরিনাথ গৃহপ্রাঙ্গণে একখানি কম্বলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে করিতে তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্মের কোন ত্রুটী হইয়াছে কি না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার মনে হইল, প্রভাতে তাঁহার গৃহে একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রাদ্ধসভার পণ্ডিতদিগের হস্তে অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়াছিলেন; প্রহৃত হইয়া তাঁহাকে বহির্বাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কার্য্যের ব্যস্ততায় তাঁহার সন্ধান লওয়া হয় নাই। মধ্যাহ্নে তাঁহার আহার হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর সকলকে ডাকাইয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না; কেবল একটি পরিচারক তাঁহাকে জানাইল,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের কাছে গলাধাকা ও কিল চড় খাইয়া অনেকক্ষণ বাহিরে পড়িয়াছিলেন; তাহার পর একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন; আর সেখানে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় নাই।

হরিনাথ এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে আসিয়া অপমানিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন। এই দানসাগর শ্রাদ্ধ, এত আয়োজন, বিপুল অর্থব্যয় সমস্তই পণ্ড হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। আজ এই পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্লাবিত দেশে বৈদেশিক আদর্শে হিন্দুসমাজের মতি গতি রুচি প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এ কথা অতিরঞ্জিত বলিয়াই অনেকের ধারণা হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে সময়ের ঘটনা অবলম্বনে এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তখন হিন্দু সমাজের অবস্থা এইরূপই ছিল; অতিথি তখন গৃহস্বামীর নিকট নারায়ণ-জ্ঞানে পূজিত হইতেন,—দাতা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। হায় সেকাল!

হরিনাথ উৎকণ্ঠিতচিত্তে সেই দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্ধানে চারি দিকে লোক প্রেরণ করিলেন; গভীর রজনীতে পাঁচ সাত জন লোক মশাল লইয়া

অভুক্ত বৃদ্ধকে খুঁজিতে বাহির হইল। হরিনাথ আদেশ করিলেন,—"তাঁহাকে যেখানে পাও, খুঁজিয়া সযত্নে লইয়া আসিবে। তিনি আসিতে অস্বীকার করিলে তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে আনিতেই হইবে।"

ন্যায়রত্ন যখন তদ্গতচিত্তে মা অন্নপূর্ণার ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময় দুই জন লোক মশাল হস্তে পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল; বাঁধা ঘাটের 'রাণার' উপর লোক দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা এখানে কে গো?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—"আমরা পথ-চল্‌তি লোক; তোমরা কে?"

আগন্তুকদ্বয়ের এক জন অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আমরা মজুমদার-বাড়ী থেকে আস্‌ছি, ঐ—ও পাড়ার যে বাড়ীতে আমাদের কর্ত্তার মায়ের ছেরাদ্দ হয়েছে।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—"এখানে কি মতলবে এসেছ?"

আগন্তুক মশালটা ন্যায়রত্নের সম্মুখে ধরিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ওহো, আপনিই ত সেই ঠাকুর বটেন! আপনি সকালে ছেরাদ্দ-বাড়ীতে গিয়েলেন না?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—"হাঁ, আমি সেখানে গিয়াছিলাম বটে।"

আগন্তুক বলিল,—"ছেরাদ্দের বৈঠকে সেই টিকিওয়ালা ঠাকুরদের সঙ্গে আপনার চেল্লাই 'কেজিয়ে' বেদেলো না?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—"না বাপু, আমি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করি নি, তাঁরাই আমার কথায় রাগ করেছিলেন।"

আগন্তুক বলিল,—"হ্যাঁ ঠাকুর হ্যাঁ; বামুনে রাগ ঐ রকমই বটে, গর্দ্দানী না দিলে তাঁদের রাগ দেখানো হয় না! তা ঠাকুর, আজ আমার মুনিব-বাড়ী আপনাদের সেবা হয় নি, কর্ত্তা হায় হায় করছেন, আপনাদের পায়ে ধরে নিয়ে যেতে ক'য়ে দিলেন। আপনাকে গরু খোঁজা করে খুঁজতে খুঁজতে এখানে নাগাল পেলাম। হেঁই ঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি আপনি চলেন।"

দুইজন লোককে মশাল লইয়া পুষ্করিণীর দিকে আসিতে দেখিয়া সুমতি উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত তাহার পিতার আলাপ শুনিয়া সে বুঝিল, প্রভাতে শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। পাছে সে তাঁহার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হয়, এই ভয়ে ন্যায়রত্ন কন্যার নিকট সে সকল প্রকাশ করেন নাই। সুমতির আগ্রহে তিনি সংক্ষেপে তাঁহার লাঞ্ছনার কথা তাহার গোচর করিলেন।

পণ্ডিতেরা অকারণে তাঁহার অপমান করিয়াছে শুনিয়া সুমতির হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইল। আবার সেই বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন? সুমতি তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিল।

হরিনাথের ভৃত্যদ্বয় অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও সুমতি ঠাকুরাণীর মত-পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না; যদিও তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া ন্যায়রত্নের কোমল হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল, এবং শ্রাদ্ধগৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আপ্যায়িত করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, তথাপি কন্যার অমতে তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না। ভৃত্যদ্বয় দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিল।

কিছুকাল পরে গৃহস্বামী হরিনাথ স্বয়ং ভৃত্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইলেন; তিনি ন্যায়রত্নকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া করযোড়ে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ন্যায়রত্ন তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে পাশে বসাইলেন; দীনতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আপনি কেন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন; আপনি ত কোন দোষের কার্য্য করেন নাই।"

হরিনাথ বলিলেন,—"আমার বাড়ীতে পণ্ডিতেরা আজ অকারণ আপনার অপমান করিয়াছেন। আমি তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি নাই; ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আমার নিমন্ত্রিত; তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিলেও তাঁহাদের আচরণের প্রতিবাদ করা আমার সাধ্যাতীত। এজন্য আমি আপনার নিকট অপরাধী। আমার এ অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করিতেই হইবে।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—"আমার কর্ম্মদোষেই আমি অপমানিত হইয়াছি, সে জন্য আপনি অপরাধী হইতে পারেন না। আপনার গৃহে আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই; অনিমন্ত্রিত অবস্থায় একে ত আমার সেখানে যাওয়াই উচিত হয় নাই; তাহার উপর আমার অনধিকারচর্চ্চা অত্যন্ত দোষাবহ হইয়াছে। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতেরা সভারূঢ় হইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিচারে ভ্রম ছিল স্বীকার করি—কিন্তু আমাকে ত তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম-সংশোধনের জন্য আহ্বান করেন নাই। তবে আমি কোন্ অধিকারে তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া সভাস্থলে তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিলাম? কার্য্যটি অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে; তাই ভগবান্ আমার দাম্ভিকতার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছেন, পণ্ডিতেরা উপলক্ষমাত্র।"

হরিনাথ বলিলেন,—"আমার ধারণা হইয়াছে, আপনি কোন ছদ্মবেশী মহাপণ্ডিত ; এরূপ প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, এরূপ সূক্ষ্ম বিচার, এ প্রকার আত্মানুশীলন—কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে ; আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।"

ন্যায়রত্ন এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে ঐ অনুরোধটি করিবেন না। আমার নিজের সম্বন্ধে আপনাকে আমি কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমি মা কমলার প্রসাদবঞ্চিত হতভাগ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণমাত্র—ইহার অধিক পরিচয় নাই।"

হরিনাথ বলিলেন,—"যাহা হউক, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, আমার পূজনীয় ব্যক্তি। আপনি অভুক্ত অবস্থায় আমার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমার দারুণ অপরাধ হইয়াছে। আমার গৃহে আপনি পুনর্ব্বার পদধূলি না দিলে—কিঞ্চিৎ আহার না করিলে, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, আমার সকল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইবে।"

সুমতি অন্য রাণায় বসিয়াছিল, ন্যায়রত্ন তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিলেন। হরিনাথ তাঁহাদের যে দুই চারিটি অস্ফুট কথা শুনিতে পাইলেন, তাহাতেই বুঝিলেন, মেয়েটি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরই কন্যা, এবং উভয়েরই সমস্ত দিন আহার হয় নাই।

পিতা ও কন্যা উভয়েই সমস্ত দিন অনাহারে আছেন শুনিয়া, হরিনাথের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল ; তিনি তখন উভয়কেই তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি আকিঞ্চন প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে জানাইলেন, তাঁহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে, তিনিও জলগ্রহণ করিবেন না। হরিনাথ তখন পর্য্যন্ত জলবিন্দুও পান করেন নাই।

এ কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন বা সুমতি তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ন্যায়রত্ন সুমতিকে লইয়া হরিনাথের সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। হরিনাথ পরমসমাদরে অতিথিসৎকার করিলেন, এবং তাঁহাদের বাসের জন্য একটি ঘর খুলিয়া দিলেন। সেই ঘরে তাঁহারা রাত্রিযাপন করিলেন। ন্যায়রত্ন ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—"মা অন্নপূর্ণা, এ তোমারই লীলা! ক্ষুধিত সন্তান কাতরপ্রাণে মা বলিয়া ডাকিলে তুমি কি স্থির থাকতে পার?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিনাথ মজুমদারের গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া অতি প্রত্যুষে সুমতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। ন্যায়রত্ন তখনও নিদ্রিত ছিলেন। সুমতি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিল,—"বাবা, রোদ্ উঠ্‌লে তোমার পথ চল্‌তে বড় কষ্ট হবে। চল, সকালে সকালে হাঁট্‌তে আরম্ভ করি ; তা হলে রোদ না থাক্‌তেই অনেক দূরে যেতে পারবো।"

ন্যায়রত্ন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং ভগবানের নাম লইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কন্যাসহ হরিনাথের গৃহত্যাগ করিলেন। তখনও পথে জনমানবের সমাগম হয় নাই। বিহঙ্গেরা শিশিরসিক্ত তরু-পল্লবের অন্তরালে বসিয়া প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে মাত্র ; এবং গ্রাম্য দেবমন্দিরে মঙ্গল-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি নীরব হইলেও তাহার শেষ সুর সুমন্দ প্রভাত-বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া ন্যায়রত্নের হৃদয়ে শান্তি ও প্রসন্নতার সঞ্চার করিতেছিল। দূরস্থ মুসলমান-পল্লীতে ভক্ত মুসলমানেরা সমস্বরে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; কি বলিয়া তাহারা প্রার্থনা করিতেছিল, ন্যায়রত্ন তাহা বুঝিতে না পারিলেও বহুদূরাগত সেই সুগম্ভীর নির্ভরতাপূর্ণ প্লুত স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া তিনি অনুভব করিলেন, তাহা ভক্ত হৃদয়েরই আকুল উচ্ছ্বাস—নিখিল বিশ্বের প্রণম্য ও শরণ্য অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির চরণোপান্তে প্রেরিত হইতেছে।

অল্পকাল পরে তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন। ন্যায়রত্ন সেই মধুর উষায় মুক্ত প্রকৃতির নেত্রতৃপ্তিকর মনোহর শোভা দেখিয়া মুগ্ধহৃদয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ কি বিপুল রহস্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে, এবং উষার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার বিরাটদেহ উদ্ভাসিত করিতেছে। সম্মুখে দিগন্তব্যাপী শস্যশীর্ষ হরিৎ প্রান্তর কমলার শ্যামাঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে। দিগন্তসীমায় আকাশের সহিত প্রান্তর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিতালোকে উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যদেব যেন ভূগর্ভ হইতে অনন্ত-মহিমায় সমুদিত হইলেন। তাঁহার রক্তাভ রশ্মিজাল শ্যামল শস্যশীর্ষ সঞ্চিত শুভ্র শিশির-বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া অনুপম শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

ন্যায়রত্ন প্রান্তরবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে দেব দিবাকরের সেই তেজোমহিমমণ্ডিত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে বিহ্বলপ্রায় হইলেন, বিপুল পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। যিনি এই সুবিশাল জগন্মণ্ডলের জীবনস্বরূপ, যাঁহার আলোকে চরাচর উদ্ভাসিত, যাঁহার উত্তাপে সমগ্র বিশ্ব সঞ্জীবিত, যাঁহার আকর্ষণে সমগ্র সৌরজগৎ নিয়ন্ত্রিত, যিনি সপ্তবর্ণের আদিকিরণ বলিয়া সপ্তাশ্ববাহিত রথে সমাসীন-রূপে কল্পিত, নভোমণ্ডল যাঁহার প্রভায় কখন নীলিম, কখন হরিদ্রাভ, যাঁহার প্রসাদে এই সুবিশাল বসুন্ধরা অনন্তকোটী জীবের অধ্যুষিত, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তিনি জড়পিণ্ড হইলেও সৃষ্টির আদিকারণ সূর্য্যদেবের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ন্যায়রত্নের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইলে, তিনি তাঁহার নিষ্প্রভ নেত্রের ক্ষীণ দৃষ্টি পূর্ব্বগগনে প্রসারিত করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥
"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।"

বলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া সুমতি সহ তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক জন পথিক বিপরীত দিক হইতে আসিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছে। ন্যায়রত্ন কোথায় যাইবেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি সেই পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই স্থান হইতে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন ভদ্রপল্লী নাই। পূর্ব্বদিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে রামদেবপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লী আছে বটে, কিন্তু সেখানে কোন ব্রাহ্মণের বাস নাই, কোন ভদ্রলোকও সে গ্রামে বাস করে না।

পথিক তাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলে, সুমতি বলিল,—"চল বাবা, আমরা ঐ রামদেবপুরেই যাই। লোকটির কাছে শুনা গেল, সেখানে কোন ভদ্রলোক নাই, নাই বা থাক্‌ল ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের—ব্রাহ্মণের ব্যবহার ত কা'ল সেই ভট্টাচার্য্য মশায়দের কাছেই পাওয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধ-সভাতেও ভদ্রতার নমুনা দেখে এসেছ। ভদ্রলোকের চেয়ে চাষাই ভাল, বাবা!"

ন্যায়রত্ন কন্যার কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলেন।

এই কয়েকদিন ক্রমাগত পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ন্যায়রত্ন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। নিদারুণ অবসাদে তাঁহার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অন্য লোক এক প্রহরে যে পথ চলিত, সেই পথ চলিতে তাঁহার দুই প্রহরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইতেছিল। সুমতি মনে করিয়াছিল, মধ্যাহ্ন কাল সমাগত না হইতেই যদি তাহারা রামদেবপুরে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে যেরূপেই হউক, যৎকিঞ্চিৎ চাউল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা রন্ধন করিবে, এবং আহারদানে পিতার ক্ষুন্নিবারণ করিয়া, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য, স্থির করিবে। কিন্তু দেড় প্রহর বেলা অতীত হইল, সূর্য্যদেব প্রায় মাথার উপর আসিলেন, তাঁহার প্রচণ্ড কিরণ অগ্নিশিখাবৎ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনও তাঁহাদিগকে ছায়াহীন জলাশয়বর্জ্জিত তপনতাপপ্রতপ্ত বিশাল প্রান্তর ভেদ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইল। পথ আর ফুরায় না। সুমতি কাতরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—সেই বিশাল প্রান্তরের শেষ নাই, তাল-খর্জ্জুর-কুঞ্জ ভিন্ন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই; তাহার মনে হইল এ পথ তাহার চিরদুঃখময় জীবনপথেরই ন্যায় অনন্ত, অসীম।

ন্যায়রত্নের মস্তকে ছত্র ছিল না; মুণ্ডিতমস্তক উত্তরীয় দ্বারা আবৃত; মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড আতপতাপ তাহাতে নিবারিত হয় না! ঘর্ম্মধারায় তাঁহার জীর্ণ দেহ প্লাবিত হইল। একে নিদারুণ পথশ্রম, তাহার উপর মধ্যাহ্ন কালের প্রখর রৌদ্র। ন্যায়রত্ন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; কিন্তু পাছে সুমতি তাঁহার কাতরতায় বিব্রত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া কম্পিতপদে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা যখন বিমুখ হন, তখন বিপদের উপর নূতন বিপদ আসিয়া আক্রমণ করে। ন্যায়রত্নেরও তাহাই হইল। নিয়মিত সময়ে আহারের অভাব, দেহের নির্য্যাতন, সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম, বিশ্রামের ব্যাঘাত প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার সুপ্ত শূল বেদনা বহুদিন পরে এই অসীম প্রান্তরপথে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল! যতক্ষণ তাঁহার সাধ্য হইল, তিনি সেই যন্ত্রণা সহ্য করিলেন; তাহার পর আর তাঁহার চলিবার শক্তি রহিল না। সেই মাঠের মধ্যে নিকটে বা দূরে এমন কোন শাখাবহুল বৃক্ষ ছিল না, যাহার শীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি একটু বিশ্রাম করেন! মধ্যে মধ্যে দুই একটি তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ ছিল; ন্যায়রত্ন আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া একটি সুদীর্ঘ তালবৃক্ষের পত্রচ্ছায়ায় অবসন্নভাবে শয়ন করিলেন, এবং সেই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তিলাভের জন্য মনে মনে মা জগদম্বার করুণা

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি অধিক, কেবল তাঁহারাই তাহা নীরবে সহ্য করেন। সুমতি পিতার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল; সে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে পিতার শিয়রপ্রান্তে বসিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহার মস্তকটি ক্রোড়ে তুলিয়া লইল; তাহার পর অঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে করিতে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা খুব কষ্ট হচ্ছে কি ?"

ন্যায়রত্ন কোন কথা না বলিয়া নীরবে পড়িয়া রহিলেন। চক্ষু নিমীলিত, অসহ্য যাতনায় তিনি এক এক বার মুখ বিকৃত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সুমতির আশঙ্কা ও উদ্বেগ শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। সুমতি সাবধানে তাঁহার ললাটের ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা !"

ন্যায়রত্ন যেন তাহার আহ্বান শুনিতে পান নাই—এই ভাবে অতি মৃদু-স্বরে বলিলেন,—"সুমতি !"

সুমতির মনে হইল, তাঁহার চেতনা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে, তাহার কথা তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে নাই। সুমতি তাঁহার মস্তকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাকুলস্বরে বলিল,—"কেন বাবা ?"

ন্যায়রত্ন শুষ্ককণ্ঠে জড়িতস্বরে বলিলেন,—"বড় তৃষ্ণা, একটু জল দাও মা।

জল! এই জনহীন জলহীন বিশাল প্রান্তরে পিপাসায় পিতার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। এখানে সে কি উপায়ে পানীয় সংগ্রহ করিবে?—সুমতির মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আকুলদৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিল, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র যেন শুষ্কহাস্যে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

সুমতি বসিয়া ছিল। সে পিতার মস্তক ধীরে ধীরে অঞ্চলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং সতৃষ্ণনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল, অসীম প্রান্তর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ধূ ধূ করিতেছে। কোন দিকে জনমানবের সমাগম নাই। কিন্তু তাহার বোধ হইল, অনেক দূরে কয়েক জন কৃষক ক্ষেত্রে হলচালন করিতেছে। এক জোঁয়ালে বাঁধা একটি সাদা ও একটি কাল বলদ দেখিয়া তাহার এই ধারণা সত্য মনে হইল।

সুমতি বলিল,—"বাবা, একটু স্থির হয়ে থাক, আমি এখনই জল এনে দিচ্ছি।"—সুমতি যথাসাধ্য দ্রুতগতি কৃষকদের দিকে অগ্রসর হইল।

ন্যায়রত্ন বা সুমতি কেহ কখনও এ অঞ্চলে আসেন নাই; সুতরাং এ দিকের পথ ঘাট সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা ছিল না। তাঁহারা জানিতেন,

না যে, দূরবর্ত্তী ঐ তাল খর্জ্জুর কুঞ্জের অন্তরালে ক্ষুদ্র রামদেবপুর গ্রামখানি লুক্কায়িত রহিয়াছে। সুমতি দূর হইতে যাহাদিগকে হল চালনা করিতে দেখিয়াছিল—তাহারা রামদেবপুরেরই কৃষক; এবং এই সকল কৃষিক্ষেত্র রামদেব-পুরেরই এলাকাভুক্ত।

গোপজাতীয় বলরাম ঘোষ রামদেবপুরের এক জন মাতব্বর চাষী গৃহস্থ। সে তাহার দুই পুত্র সঙ্গে লইয়া জমী চাষ করিতে আসিয়াছিল—তাহারাই পিতাপুত্র তিন জনে হলচালন করিতেছিল।

মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া বলরামের স্ত্রী রাইমণি ঘোষাণী পতি ও পুত্রদের জন্য পানীয় জল ও কিছু খাবার লইয়া কৃষিক্ষেত্রে আসিতেছিল; তাহার স্কন্ধে এক কলসী সুশীতল পানীয় জল, কলসীর মুখ একটি বাটী দিয়া ঢাকা,—সেই বাটীতে এক দলা শুষ্ক ইক্ষু গুড়, এবং হস্তে একটি পুঁটুলীতে কতকগুলি ছোলা ভিজা।

রাইমণি কৃষিক্ষেত্রের প্রান্তস্থিত 'আইলে'র উপর একটি বাব্‌লা গাছের ছায়ায় জলের কলসীটি নামাইয়া তাহার কনিষ্ঠপুত্র রাধানাথকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা আদু, অনেক ব্যালা হ'য়েচে, দোপর গড়ে যায়, একটু জল খেয়ে নে; পিত্তি পড়ে অসুখ কর্‌বে, ঝট্‌ করে আয় বাবা! কাজ কম্ম নিয়ে আস্‌তে দেরী হয়ে গিয়েচে। আহা, তেষ্টায় বাছার আমার মুখ শুকিয়ে এট্টু হ'য়ে গিয়েছে। আজ 'ওদ্দুর'ও পড়চে যেন আগুনের ফুল্‌কি!"

রাইমণি সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে পাইল, একটি মেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। এই নির্জ্জন প্রান্তরে এরূপ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা যায় না, সুতরাং সুমতিকে সেই ভাবে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া রাইমণির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার স্বামী ও পুত্রদ্বয়ও লাঙ্গলের মুঠা ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সুমতি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বাসরুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, আমি বামুনদের মেয়ে, আমার বাবা বুড়ো মানুষ, আমরা অনেক দূর থেকে আস্‌ছি। ক্ষিদে তেষ্টায় বাবার আর চল্‌বার শক্তি নেই। তিনি ঐ তালগাছতলায় পড়ে আছেন, জল জল করে কাবরাচ্ছেন, তা তোমরা যদি সৎ সুদ্দুর হও, তবে একটু জল দিয়ে আমার বাবার প্রাণ বাঁচাও, নৈলে তোমাদের মাঠে ব্রহ্মহত্যা হয়।"

সুমতির ব্যাকুলতা দেখিয়া ও তাহার কাতর কথা শুনিয়া বলরাম তৎক্ষণাৎ লাঙ্গল ছাড়িয়া দিল, ব্যগ্রভাবে বলিল, 'তুমি ও কি কথা কও ঠাক্‌রুণ! আমরা তিন তিনটে গোয়ালের মরদ থাক্‌তে আমাদের ক্ষ্যাতের পাশে থানোকা বেম্মহত্যে হবে? গোয়ালের হাতের জল দুদের সঙ্গে যে বামুনের পেটে না পড়েচে, সে বামুনই নয়। তবে আর ঠাকুরকে জল খাওয়াতে ভয়ডা কি? চল ত ঠাক্‌রুণ—তোমার বাবা কোন্ ঠাঁইডাতে পড়ে জলের জন্যে কাব্‌রাচ্ছে, তেনাকে জল খাইয়ে আসি।—আয়রে আমু, লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে আমার সাতে চল্। বিশে—তুই এখেনে থাক্, আমরা ঝট্ করে আস্‌চি।"

রাধানাথ তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, "শুন্‌চিস্ তো মা! তেষ্টায় উনার বাপের ছাতি ফেটে যাচ্চে, দে জলের কলসী আর গুড়ের বাটীটা দে। ঠাকুরকে আগে বাঁচাই, আমাদের অদেষ্টে যা হয় হবে। চাষার পেরাণে অনেক সয়। ভদ্দর লোক, বামুন, এই ওদ্দূরে তেষ্টায় তেনার ছাতি ফাট্‌বে না ত কি আমাদের ছাতি ফাট্‌বে?"

কলসীর জলে হাত ধুইয়া রাধানাথ গুড়ের বাটী সহ জলের কলসী কাঁধে তুলিয়া লইল।

রাইমণি সহানুভূতিভরে বলিল, "আহা! যা বাবা যা, ঝট্ করে জল নিয়ে যা। বামুন ঠাকুরের পেরাণ রক্ষে হবে, আজ আমার জল আনা সার্থক। আহা মা! 'ওদ্দূরে' তোমার মুখখানও ত শুকিয়ে আমচুর হয়ে গিয়েছে, কদ্দূর থেকে আপনারা আস্‌চো?"

সুমতি বলিল, "অনেক দূর থেকে আস্‌ছি মা, আমরা বড় দুঃখী।"

সুমতিকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া রাইমণি বলিল, "তা আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি বল্‌চো, আমাদের বাড়ী চল না, আমাদের বাড়ীতে তোমাদের পায়ের ধূলো পড়লে আমাদের জন্ম সাত্তক হবে।"

সুমতি ব্যগ্রভাবে বলিল, "বাবা যদি বেঁচে থাকেন, তবে নিশ্চয় তোমাদের বাড়ী যাব, তোমাদের এ দয়া জন্মে ভুলতে পারব না।"

বলরাম বলিল, "দুত্তোর দয়া; বামুনকে যদি তেষ্টার জল না দিলাম, এ কাটা-মতে করলাম কি? ওরে বিশে, ঝট্ করে কলে আর জিয়ালা বলদ নাঙ্গল থেকে খুলে গাড়ীখান জুড়ে নিয়ে আয়। ঠাকুরের সেবা হয় নি, বুঝলি—অদ্দুর ঠাকুর এ ওদ্দূরে হেঁটে যেতে পারবে না। ঘোষাল তুমিও এসো, ঠাকুরকে গুছিয়ে আনিলে।"

সদয়হৃদয়া গোপপত্নী স্বামী ও কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত সুমতির অনুসরণ করিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ লাঙ্গলের বলদ খুলিয়া গাড়ী জুড়িতে চলিল।

যথাসম্ভব দ্রুত চলিয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট তালবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ন্যায়রত্ন তখন সংজ্ঞাহীন! সুমতি তাড়াতাড়ি তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল, "বাবা, জল এনেছি, জল খাও।"

ন্যায়রত্ন কোন উত্তর দিলেন না, তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে. উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে।

পিতার কোন সাড়া না পাইয়া সুমতি কাঁদিয়া উঠিল. বলিল, "হায়, হায়, কি হ'লো, তেপান্তর মাঠের মধ্যে অঘোরে বাবার প্রাণ গেল ?"

বলরাম বলিল,"আমরা থাক্‌তে থামকা ঠাকুর 'মিত্যু' হবেন ? দেও ত ঘোষাণ, ঠাকুরের মাথায় ঘটী খানেক জল ঢেলে। বড্ড গরম কি না ঠাকুরের ভিরমি নেগেচে।"

রাইমনি বলিল, "মিন্‌সের য্যামোন আক্কেল, শুধু জল ঢাল্‌লেই বুঝি কাটে ? মাঠাকরুণ, তুমি খুব করে উনার মাতায় আঁচলের 'বাসাত' কর, আমি উনার চোকে মুকে মাতায় জলের ঝাপ্‌টা দিই। ভয় কি মা, কেঁদ না। আমরা যখন এসে পড়েচি—তখন উনাকে সুস্ত না করে কি ছাড়বো ?"

সুমতি অতি সাবধানে পিতার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে লাগিল; রাইমণি তাঁহার মস্তকে ও চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুকাল শুশ্রূষার পর ন্যায়রত্নের সংজ্ঞা হইল। তিনি চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সুমতি তখন গুড়ের বাটীর গুড় রাইমণির হাতে দিয়া বাটী ধুইয়া ফেলিয়া তাহার পিতাকে অল্প অল্প করিয়া জলপান করাইল। রাইমণি কোমলস্বরে বলিল, "বাসি মুখে শুদু জল কি খেতে আছে বাবা, একটু গুড় মুখে দাও।" কিন্তু তিমি প্রাণের দায়ে জলপানে বাধ্য হইলেও পূজা আহ্নিক না করিয়া মিষ্টমুখ করিতে সম্মত হইলেন না।

ন্যায়রত্ন জলপানে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রাইমণি ও তাহার স্বামী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "আজ তোমরা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করেছ, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বলরাম ও তাহার স্ত্রীপুত্র ন্যায়রত্নের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর বলিল, "ঠাকুর আশীর্ব্বাদ কর, যেন

আমাদের চাষ আবাদ বজায় থাকে, আর আপনার মত বামুনের সেবা করে জন্ম সাথক করতে পারি।"

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ গাড়ী লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বলরাম তাহাকে বলিল, "গাড়ী থুয়ে এদিকে আয়রে বিশে! ঠাকুরের পায়ের ধুলো নে!"— তাহার পর সে করযোড়ে ন্যায়রত্নকে বলিল, "ঠাকুর, আপনার হুকুম পেলে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই। আমরা গোয়ালা, তোমাদের সেবায় কোন বাধা হবেন না। তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর আমাদের এই গোয়ালের ঘরেই 'পিরতিপালন' হয়ে লো। আহা, আজ তোমাদের সেবা হন নি, খিদে তেষ্টায় আর এই 'ওর্দ্দুরে' 'উনার' মুখও শুকিয়ে আম্‌চুর হয়েচ! আমাদের যা সয়, আপনা গোর ভদ্দোর নোকের কি তা সয়?"

ন্যায়রত্ন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমার যে আর চলিবার শক্তি নেই বাবা!"

বলরাম বলিল, "আপনি হেঁটে যাবা কেন ঠাকুর? হেঁটে যাবা ত বিশে গাড়ী আন্‌লো ক্যানে? আপনি এই গাড়ীতে মজা করে শুয়ে যাবা।"

ন্যায়রত্ন সুমতির মুখের দিকে চাহিলেন। সুমতি সেই বিপদ্‌কালে ইহা ভগবানেরই অনুগ্রহ মনে করিল। এত দয়া সে ত কোনও ভদ্রলোকের নিকটে কোন দিন লাভ করে নাই। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ঘোষেরা পিতা পুত্রে ন্যায়রত্নের হাত ধরিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিল। রাধানাথের মায়ের অনুরোধে সুমতিও গাড়ীর এক পাশে উঠিয়া বসিলে, বিশ্বনাথ গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। বলরাম গাড়ীর পাশে পাশে চলিল।

রাধানাথ লাঙ্গল গরু লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য মাঠের দিকে গেল; সেদিনের মত তাহাদের চাষ বন্ধ রহিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতে চাহেন,—বেলাব শাসনের ভোজবর্ম্ম যাদববংশীয় হইতে পারেন;—ইয়ুয়ান চুয়াঙ্গের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পাই, যাদব রাজবংশ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্জাব প্রদেশের সিংহপুর নামক স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাকে নিতান্তই অনুমান বলিয়া মনে হয়, এবং এ অনুমান সত্য হইলেও এ রাজবংশ পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রাঢ়ের সিংহপুরের অবস্থান-ক্ষেত্র এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই; তবে উহা বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উড়িষ্যা বা কলিঙ্গের সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। রাঢ়ের কতকাংশ এক সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যের অভিভূক্ত থাকাও অসম্ভব নহে।

বেলার শাসনের বিশিষ্ট আলোচনা।

বেলাব শাসনের উল্লিখিত জাতবর্ম্ম, ভোজবর্ম্মার পুত্র; এবং এই জাতবর্ম্ম কেবল কামরূপই জয় করেন নাই, তিনি অঙ্গে বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিহারে আপন শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং দিব্য ও গোবর্দ্ধনকে পরাভূত করিয়াছিলেন,—ইহাও শাসন-মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই গোবর্দ্ধন যে কে ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না, কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর রচিত রামচরিত কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়—দিব্য বা দিব্যক, উত্তর-বঙ্গের কৈবর্ত্ত-নায়ক ছিলেন, এবং পরবর্ত্তী পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে তিনি বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে স্বাধীনশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। বেলার শাসন হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরও জাতধর্ম্ম জীবিত ছিলেন, এবং বিগ্রহপালের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহীপালের সহিত সমন্বিত হইয়া তিনি কৈবর্ত্ত-রাজের প্রতিরোধসাধনে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। জাতবর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা, এবং সামল বর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মাই বেলার-শাসনদাতৃরূপে দৃষ্ট হন।

এ শাসন সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিবার লোভ হইতেছে; কারণ, এই শাসনখানি বড়ই মূল্যবান্। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অতি সযত্নে ইহার পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিরাছেন; এবং এই শাসনখানি তৎকালীন ভূমিদানপত্রের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী দাতা রাজা ভোজবর্ম্মের বংশপরিচয়-প্রদানান্তে শাসনে উক্ত হইয়াছে :—"স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীসামলবর্ম্ম দেবপাদানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ভোজঃ * * * মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ।" অর্থাৎ, শ্রীবিক্রমপুরে সংস্থাপিত শিবির হইতে মহারাজাধিরাজ-সামল বর্ম্মদেব-পাদানুধ্যাত, পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্ভোজ * * * যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন।

তাহার পর যে অষ্টপ্রকার ব্যক্তিবর্গের প্রতি শাসন-বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তি, যথা,—রাজন্, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র প্রভৃতি। তাহার পর নানা রাজকর্ম্মচারীর—নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারীর তালিকা; উপাধি দেখিয়াই তাহাদিগের কতকগুলির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়; কিন্তু কতকগুলি এমনও রহিয়া যায়, যাহাদের কার্য্যভার এখনও নির্ণীত হয় নাই। যথা—

(১) রাজামাত্য।

(২) পুরোহিত।

(৩) পীঠিকাবিত্ত, [বুঝিতে পারা যায় না]

(৪) মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ; [প্রধান বিচারপতি]

(৫) মহাসান্ধিবিগ্রহিক [সন্ধি-বিগ্রহের (যুদ্ধের) মন্ত্রী—সম্ভবত foreign minister বা বৈদেশিক মন্ত্রী]

(৬) মহাসেনাপতি।

(৭) মহামুদ্রাধিকৃত [ইংরাজিতে যাঁহাকে Keeper of the royal seal বলে।

(৮) অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক [অর্থাৎ chief privy-conncillor]

(৯) মহাক্ষপটলিক [মহাফেজ] বা record Keeper বা মহাফেজ।

(১০) মহাপ্রতীহার [অনুবাদ হইয়াছে chief warder, কিন্তু ঠিক অর্থ বুঝা যায় না]

(১১) মহাভোগিক [অনুবাদ হইয়াছে chief groom, * কিন্তু অর্থ ঠিক বুঝা যায় না]

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভোগিক' শব্দে অশ্বরক্ষক বুঝায়।

(১২) মহাব্যূহপতি [ব্যূহ বলিতে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি সমন্বিত সৈন্যবল বুঝায় ; মহাব্যূহপতি এইরূপ পূর্ণাঙ্গ সৈন্যবলের অধিনায়ক]

(১৩) মহাপিলুপতি—[প্রধান হস্তিরক্ষক]

(১৪) মহাগণস্থ—[গণ বলিতে ২৭ গজ, ২৭ রথ, ৮১ অশ্ব, এবং ১৩৫ পদাতির সমাহার বুঝায় ; মহাগণস্থ তাহারই নায়ক]

(১৫) দৌঃসাধিক [গ্রামপরিদর্শক]

(১৬) চৌরোদ্ধরণিক [দারোগা]

(১৭) নৌবলব্যাপৃতক [নৌসেনার অধিনায়ক]

(১৮) হস্তী-অশ্ব-গো-মহিষ-অজাবিকাদি-ব্যাপৃতক অর্থাৎ হস্তী অশ্ব প্রভৃতির পরিদর্শক।

(১৯) গৌল্মিক [৯ হস্তী, ৯ রথ, ২৭ অশ্ব, ৪৫ পদাতি (অর্থাৎ গুণের ⅓ অংশ) লইয়া এক গুল্ম তাহারই অধিনায়ক]

(২০) দণ্ডপাশিক [পুলিস কর্ম্মচারী অথবা, দণ্ডদাতা জহ্লাদ]

(২১) দণ্ডনায়ক [ম্যাজিষ্ট্রেট]

(২২) বিষয়পতি [কতকগুলি বিষয় লইয়া একটি ভুক্তি (বা বিভাগ) ; এইরূপ একটি বিষয়ের (বা জেলার) ভারার্পিত কর্ম্মচারী]

(২৩) শাসনগর্ব্বে পৃথগভাবে অনুল্লিখিত, অথচ অধ্যক্ষ প্রকার মধ্যে উল্লিখিত রাজপাদোপজীবিবর্গ।

এই সকল রাজকর্ম্মচারীর পরে,—চট্টের, ভট্টের, নাগরিকের এ ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণোত্তমের,—অর্থাৎ এই শাসন যাহদিগের প্রতি উদ্দিষ্ট, তাহাদের উল্লেখহইয়াছে।

এই চট্টের (কোনও কোনও শাসনে 'চাট' দেখা যায়) এবং ভট্ট বা ভটের বিশদ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অন্যান্য শাসনে এই সকল নামের পূর্ব্বে আরও কতকগুলি জাতির বা সঙ্ঘের নাম দৃষ্ট হয়,—তাহাদিগের কতকগুলি নাম জানা নাম ; আবার কতকগুলি নামের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নিরূপিত হয় নাই ;—ঐ সকল নামপর্য্যায়ের সর্ব্বশেষে 'সেবকাদিন' শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। যথা, নারায়ণ পালের ভাগলপুর শাসনে রহিয়াছে,—"গৌড় মালব খস হূণ-কুলীক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভট-সেবকাদিন্" ; অর্থাৎ, গৌড় প্রভৃতি জাতীয় রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ। এ স্থলে গৌড় অর্থে স্পষ্টতঃই গৌড়জন, মালব অর্থে মালবজন, হূণ অর্থে হূণ জন ; কর্ণাট অর্থে কর্ণাট জন, এবং লাট অর্থে লাট-জন (লাট বর্ত্তমান গুজরাট)।

ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে এক জাতিকে মনু খস নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা কে, বা কোথায় তাহাদের বসতি ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। ভটের সাধারণ অর্থ—বেতনভোগী সৈনিক, অথবা ভৃত্য। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা দ্বারা কোন জাতি বা সঙ্ঘবিশেষকেও বুঝাইয়া থাকে,—সে জাতি বা সঙ্ঘের উদ্ভব-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কুলীক শব্দ এ যাবৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

আবার শাসনের যে স্থলে বিশেষ অনুগ্রহাধিকারাদির ও তদঙ্গীয় উপদ্রবমুক্ততার উল্লেখ রহিয়াছে, সে স্থলেও দেখিতে পাই—"অ-চাটভট্ট-প্রবেশ"—অর্থাৎ চাটের ও ভট্টের সেথায় প্রবেশাধিকার নাই।

ইহা বোধ হয় অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে,—বাঙ্গালার প্রাচীন নৃপতিবর্গের অধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী রাজকর্ম্মচারিরূপে কার্য্য করিত; তন্মধ্যে চাট ও ভট্টজাতীয়গণ ট্যাক্স আদায়, চৌকিদারী প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিত, এবং তাহাদের উপদ্রবের হস্ত হইতে মুক্ত থাকা বিশেষ অনুগ্রহাধিকারমধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই।

সর্ব্বশেষে, শাসনের বাক্যগুলি সাধারণভাবে জনপদবাসিগণের, ক্ষেত্রকরগণের, এবং ব্রাহ্মণোত্তমসমূহের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।

এইরূপ অনুবন্ধের শেষ বাক্য,--"মতম্ অস্তু ভবতাম্," অর্থাৎ, আপনার অভিমত হউক।

তাহার পর, প্রদত্ত ভূমির নির্দ্দেশ:—উহা পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন মণ্ডলের অধীন কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ মণ্ডল মধ্যে উপ্যলিকা গ্রামে অবস্থিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা বহু ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল; এবং প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয়ে, এবং প্রত্যেক বিষয় কতকগুলি মণ্ডলে, এবং প্রত্যেক মণ্ডল কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল;—পালরাজগণের তাম্রশাসনে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রাজবংশের শাসনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ঐরূপ দেশবিভাগ প্রচলিত ছিল। বক্ষ্যমান শাসনে অধ্যক্ষপ্রকারে বিচারপতির উল্লেখ থাকিলেও, উহাতে কোনও বিষয়ের উল্লেখ নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

দুর্ব্বাসা ঠাকুর।
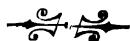
তেঁতুলবেড়ের সাতকড়ি ঘোষাল ওরফে সাতুঠাকুরকে লোকে দুর্ব্বাসা ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। অবশ্য দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ক্রোধাগ্নিতে কেহ যে কখনও ভস্মীভূত হইয়াছে, এমন কথা শুনা যায় নাই; তথাপি তাঁহার দ্বিতীয় রিপুটা খুব প্রবল না হউক, তাহা এত সহজেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিত যে, তাহাতে মহামুনি দুর্ব্বাসাও অনেক সময়ে বোধ হয় লজ্জা অনুভব করিতে পারিতেন। সাতু ঠাকুর কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেন না; বরং আর পাঁচটা রিপুকে বশে আনিয়া এই রিপুটাকেই সকলের উপর প্রাধান্য দান করিতেন।

অবশ্য, সাতুঠাকুর চিরদিনই দুর্ব্বাসার এই প্রচণ্ড ক্রোধ লইয়া সংসারটাকে ভস্ম করিবার জন্য উদ্যত হইতেন, তাহা নহে। একদিন সংসারের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বাতও তাঁহার সহিষ্ণুতাকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যু, মহাজনের উৎপীড়ন, জ্ঞাতিদিগের দুর্ব্যবহার, গ্রামের লোকের হৃদয়-হীনতা, এ সকলই তিনি সহাস্যমুখে সহ্য করিয়া সংসারের নিকট আপনার সবলতা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং গোপনে শুধু বিশ্বনাথের চরণে আপনার মর্ম্মবেদনা জানাইয়া আসিতেছিলেন।

সাতু ঠাকুর পুরুষানুক্রমে গ্রামদেবতা বিশ্বনাথের সেবায়েত। লোকে বলিত, বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ নহেন; স্বয়ম্ভু; বহুদিন পূর্ব্বে এখানে তুঁত-গাছের ক্ষেত ছিল। জমিতে চাষ দিতে দিতে শিবলিঙ্গ উত্থিত হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার মাথায় লাঙ্গলের ফলার চিহ্ন দেখা যায়। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ন'পাড়ার হাজরারা ইহাঁর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং বর্দ্ধমানের মহারাজ ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সে মন্দির এক্ষণে জীর্ণ; হাজরারা নির্ব্বংশ; এবং ভূসম্পত্তি স্বল্প-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কাহারও ধারণা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। সাতু ঠাকুর ইহাঁকে স্বয়ং কৈলাসবাসী মহাদেব বলিয়াই জানিতেন, এবং তদনুরূপ ধারণা লইয়াই নয় বৎসর বয়স হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। শুধু সেবাই করিতেন না, ইহাঁকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা জানে, দুর্ব্বল

প্রজা যেমন প্রবলের অত্যাচার-কাহিনী রাজার নিকট নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তেমনই সংসারের যত অত্যাচার অবিচার সকলই এই জগৎপতির চরণে নিবেদন করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতেন।

দেবোত্তর জমী যাহা ছিল, পৈতৃক ঋণের দায়ে মহাজন তাহার অধিকাংশ বেচিয়া লইল। অনেকে পরামর্শ দিল, "সাতু ঠাকুর, দেবোত্তর জমী কেউ বেচে নিতে পারে না। তুমি মামলা কর, ফেরত পাবে।"

সাতু ঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিল, "এখানে ফেরত পেতে পারি, কিন্তু বিশ্বনাথের আদালতে তো পাব না।"

জমী যাহা রহিল, তাহাতে কষ্টে দিন চলিতে লাগিল। এমন সময় গ্রামের গোপী মুখুয্যে মারা গেলে তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটা গোল উঠিল। গোপীনাথ নাকি কলিকাতায় বেশ্যামহলে পৌরোহিত্য করিতেন, এবং তাহারই ফলে তিনি অনেকগুলি পয়সা রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং সমাজের কেহই গোপী মুখুয্যের শ্রাদ্ধে পাতা পাতিতে চাহিলেন না। পরিশেষে তদীয় পুত্র সামাজিকগণকে যথেষ্ট প্রণামী দিয়া এই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিল। সকলেই তাহার বাড়ীতে গেল, কেবল সাতুঠাকুর গেলেন না। বলিলেন, "বেশ্যাবাজীর অন্নগ্রহণ ক'রে সে হাতে বিশ্বনাথের মাথায় ফুল দিতে পারবো না।" সামাজিকগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সাতু ঠাকুর আপনার জেদ ছাড়িলেন না। ইহার ফলে সামাজিকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিলেন। সাতু ঠাকুর কিন্তু ইহাতে ভীত বা দুঃখিত হইলেন না।

কিন্তু সেই দিন ভীত হইলেন, যে দিন স্ত্রী রোগশয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, অথচ এক জন ডাক্তার বা একবিন্দু ঔষধ খুঁজিয়া পাইলেন না। তারপর কেবল বিশ্বনাথের চরণামৃত খাইয়া তিন বছরের ছেলে বিশুকে স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া স্ত্রী যখন পরলোকের পথে যাত্রা করিল, তখন সাতুঠাকুর এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না যাহার কাছে ছেলেটাকে রাখিয়া স্ত্রীর সৎকারের চেষ্টা করেন। পরিশেষে বদন সর্দ্দারের মায়ের কাছে ছেলেকে রাখিয়া, কয়েক জন ইতর লোকের সাহায্য লইয়া, পত্নীর দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিলেন।

তারপর সেই মাতৃহীন শিশু—সংসারের একমাত্র অবলম্বন বিশুকে কিরূপে মানুষ করিবেন—ভাবিয়া আকুল হইলেন। জ্ঞাতি বিধু ঘোষাল বলিলেন, "ছেলেটাকে বিলিয়ে দাও হে সাতকড়ি। আমার পিস্‌তুতো ভাই কালী পুষ্যিপুত্র নেবার চেষ্টা করছে, বল তো তাকে খবর দি।"

সাতু ঠাকুর ইহাতে মত দিলেন না। স্ত্রীর শেষ সঞ্চিত ধন, পিতৃপুরুষের একমাত্র পিণ্ডস্থল, সংসারে মায়া মমতার আধার,—সেই পুত্রকে বিলাইয়া দিবেন? তবে আর কাহাকে লইয়া সংসারে থাকিবেন? না না, বিশুকে তিনি যেরূপে পারেন, মানুষ করিবেন।

তাঁহার এক বিধবা শ্যালিকা ছিল। তাহাকে আনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি ছেলেটার প্রতিপালনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু আর একদিকে বড় গোল বাধিল। বিধবা যুবতী শ্যালিকাকে ঘরে আনিয়া রাখায় পাঁচ জনে পাঁচ কথা কহিতে লাগিল। পরিশেষে এমন হইল যে, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই বাঁকিয়া বসিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, "সাতুঠাকুর গ্রামের বুকের উপর বসিয়া যদি এমন গর্হিত কাজ করেন, তবে তাঁহাকে বিশ্বনাথের মন্দিরে উঠিতে দেওয়া হইবে না।"

২

এক দিকে পুত্র, অন্য দিকে বিশ্বনাথ; সাতুঠাকুর কোন্ দিক রাখিবেন—ভাবিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিবারও অবসর পাইলেন না। সেই দিনই পূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে গ্রামের পাঁচ জন প্রধান সমবেত হইয়াছে। তাহারা সাতু ঠাকুরকে বাধা দিয়া বলিল, "ঠাকুর, হয় বিধবাটাকে ত্যাগ কর, নয় তো আমরা অন্য ব্রাহ্মণ দিয়া পূজা করাইব।"

প্রসন্ন সরকার সদম্ভে বলিয়া উঠিল, "করাব কি, আমি বিধু ঘোষালকে স্নান ক'রে আসতে বলেছি, আজ থেকে সে পূজা করবে।"

সাতু ঠাকুর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি থাকিতে বিধু আসিয়া বিশ্বনাথের পূজা করিবে? সে পূজার কি জানে? গাঁজা খায়, গয়লাপাড়ায় গিয়া পড়িয়া থাকে, আচার বিচারের ধার ধারে না; তাহার হাতে কি বিশ্বনাথ পূজা গ্রহণ করিতে পারেন? তাহার স্পর্শে অশুচির আশঙ্কায় দেবতা যে মন্দির ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন। দেবতাকে যে উপবাসী থাকিতে হইবে? উঃ, কিসের সংসার, কিসের মমতা! তিনি স্নেহের অনুরোধে দেবতার এই কষ্ট চোখে দেখিবেন! দেবতার উপর পুত্রকে স্থান দিয়া আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবেন!

মুহূর্ত্তে সাতুঠাকুর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন, এবং শ্যালিকাকে ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

স্নেহের উপর ভক্তিকে স্থান দিয়া সাতুঠাকুর শ্যালিকাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পুত্রকে রাখিতে পারিলেন না। লোকে বলিল, "ঠাকুর, ছেলেটা যে

যায়, ওর দিকে চেয়ে দেখ।” সাতুঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন, “বিশ্বনাথ দেখবেন।”

বিশ্বনাথের জন্যই তিনি যখন ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায়টা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বিশ্বনাথই তাহাকে রক্ষা করিবেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা নাই বলিয়া দেবতাও কি অকৃতজ্ঞ হইবেন? এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সাতুঠাকুর নিশ্চিন্ত রহিলেন।

দেবতা কিন্তু দেখিলেন না। তাঁহার চরণামৃত, তাঁহার প্রসাদ, কিছুই ছেলেটাকে রক্ষা করিতে পারিল না। জ্বরে, যকৃতের পীড়ায় জীর্ণ হইয়া বিশু একদিন পিতার কোলেই চক্ষু মুদ্রিত করিল। সাতুঠাকুর নিজের হাতে পুত্রের চরম সৎকার সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। তারপর শ্মশান হইতে ফিরিবার পথে মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যে ভীমগর্জ্জনে ‘বিশ্বনাথ!’ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণের সে রুদ্রগর্জ্জনে রুদ্রদেবের প্রাণ বিচলিত না হইলেও তাঁহার মন্দিরটা যেন থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

পাথরের ঠাকুর! তোমার মধ্যে দেবতার সত্তা বুঝি এতটুকুও নাই! উঃ, এতকাল কি গ্রামের সমস্ত ভক্তি প্রীতি দিয়া একটা চেতনাশূন্য জড় পাথরের সেবা করিয়া আসিলাম? সাতুঠাকুরের ইচ্ছা হইল, এই পাথরটাকে টানিয়া তুলিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দেন। কিন্তু না, তুমি থাক ঠাকুর; এতকাল ভক্তি দিয়া যে ভুল করিয়াছি, এবার অভক্তি দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া তাহার শোধ দিব।

সেই দিন হইতে মহিম্নস্তোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে মন্দির আর মুখরিত হইত না; শিবাষ্টকের সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া কেহ মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইত না। সাতু-ঠাকুর পূজা করিতে আসিয়া কেবল শিবের মাথায় এক ঘটী জল ঢালিয়া দিতেন, তার পর বোঁটা সমেত কতকগুলা বেলপাতা চাপাইয়া দিয়া চালগুলা বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেন; কোন দিন বা বেলপাতাগুলা চাপাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া যাইতেন। ওহো, বেলপাতার বোঁটা শিবের মাথায় যে বজ্রের আঘাত দেয়। সাতু-ঠাকুর তাড়াতাড়ি সেগুলাকে পুষ্পপাত্রে ফেলিয়া এক একটী করিয়া বোঁটা কাটিতে বসিতেন। কিন্তু তখনই মনে হইত, কেন বৃথা এই পণ্ডশ্রম! পাথরের কি প্রাণ আছে যে, সে আঘাতের বেদনা অনুভব করিতে পারিবে? যদি পারিত, তবে আজ কি তাঁহাকে পুত্রশোকের—রোষে সাতুঠাকুরের চোখ দুইটা জলিয়া উঠিত; কম্পিতহস্তে বৃন্তহীন ও সবৃন্ত বেলপাতাগুলা এক সঙ্গে তুলিয়া

লইয়া শিবের মাথায় চাপাইয়া দিতেন। কেমন ঠাকুর, বোঁটাগুলার আঘাত তোমাকে লাগে কি? তাহাতে কি তোমার কষ্ট অনুভব হয়? যদি তুমি শুধু পাথর না হও, যদি তোমার ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির কোনখানে চেতনার একটুও আভাস থাকে, সে আভাস আছে নিশ্চয়; না না, তুমি শুধু জড় পাথর নও, দেবতার সত্তা তোমার মধ্যে আছেই আছে, আর এই বিল্বপত্রের বৃন্তের আঘাত নিশ্চয় তোমার মস্তকে বজ্রের আঘাত দিতেছে। তথাপি আমি জানিয়া শুনিয়াও—ওহো দেবতা!

সাতুঠাকুরের দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল গড়াইত; কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি প্রস্তরময় মন্দিরতলে লুটাইয়া পড়িতেন।

কেহ যদি কোন দিন পূজার সময় আসিয়া বলিত, "ঠাকুর, আমার ছেলের বড় ব্যামো, বাবাকে মানত কর, ভাল হ'লে বাবাকে ষোল আনা দিয়ে যাব।" তাহা হইলে সাতু ঠাকুর ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "ছাই দিবি! ছেলের ব্যামো হ'য়ে থাকে, ডাক্তার দেখা, বদ্যি দেখা। বাবা তোর ছেলেকে ভাল করবার তরে এখানে বসে আছে আর কি?"

তাঁহার সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া লোকের মুখ দিয়া কথা সরিত না; ভয়ে ভয়ে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিত।

৩

"তারা, কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে সংসার গারদে থাকি বল্।"

একটা বৃষ্টিশূন্য ঘোলাটে মেঘ আসিয়া ফাল্গুনের অপরাহ্নটাকে বড়ই বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছিল; দক্ষিণে বাতাসটাও সেদিন ছিল না, উত্তুরে বাতাসে একটু একটু শীতের সঙ্গে কেমন যেন একটা অস্বচ্ছন্দ-ভাব আনিয়া দিতেছিল। সাতুঠাকুর ময়লা বনাতখানা জড়াইয়া বাড়ীর বাহিরে ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া গুন্-গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

"তারা, কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে সংসার গারদে থাকি বল্।"

"বামুন জেঠা!"

সাতুঠাকুর গান ছাড়িয়া ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, প্রসন্ন সরকারের ছোট ছেলে হাবু। বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া সাতুঠাকুর মুখ ফিরাইয়া লইলেন। হাবু কিন্তু তাঁহার বিরক্তিটুকু আদৌ গ্রাহ্য করিল না, সে আর একটু সরিয়া আসিয়া সহাস্যমুখে পুনরায় ডাকিল, "বামুন জেঠা!"

গম্ভীরস্বরে সাতুঠাকুর উত্তর দিলেন, "কেন?"

"বাত্তা (বাতাসা) দেবে না ?"

"না, বাতাসা নাই।"

সাতুঠাকুর তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সে কঠোর দৃষ্টিতে ভীত হইয়া হাবু ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সাতু ঠাকুর অন্যদিকে মুখ রাখিয়া পুনরায় অনুচ্চকণ্ঠে গান ধরিলেন—

"আমার বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধরে খাই হলাহল।"

হঠাৎ হাবুর দিকে ফিরিয়া পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে ?"

শঙ্কাজড়িতস্বরে "দাই" বলিয়া হাবু তাঁহার দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎপদ হইল। সাতুঠাকুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রসন্ন সরকারের এই ছেলেটা প্রায় প্রত্যহই আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত। এই প্রসন্ন সরকারই একদিন তাঁহাকে বিশ্বনাথের সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল। সে কথাটা সাতুঠাকুর আজিও ভুলেন নাই, এবং সুযোগ পাইলে তিনি যে একদিন আপনার পুত্রশোকের কঠোর প্রতিশোধ লইবেন, এমন একটা কল্পনাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই প্রসন্ন সরকারের ছেলে আসিয়া যে প্রত্যহ তাঁহাকে বিরক্ত করিবে, ইহা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কিন্তু সেই যে এক দিন তিনি বাড়ীর সামনে হাবুকে খেলা করিতে দেখিয়া তাহাকে প্রসন্ন সরকারের ছেলে বলিয়া না জানিয়াই তাহার হাতে খানকতক বাতাসা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে হাবু যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সেই দিন হইতে হাবু প্রায় প্রত্যহই দিবসের কোন না কোন এক সময়ে বামুন জেথার নিকট উপস্থিত হইত, এবং তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বাতাসা সন্দেশ আদায় করিয়া লইত।

শত্রুর পুত্র জানিলেও সাতু ঠাকুরকে হাবুর জন্য বাতাসা সন্দেশ গুছাইয়া রাখিতে হইত। নতুবা ছেলেটা বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলে; পাছু পাছু ফেরে, ধমক দিলে কাঁদিয়া ফেলে। কাজেই তাহার আবদার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য সাতুঠাকুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজে না খাইয়া মিষ্টান্নগুলা তুলিয়া রাখিতেন। এবং হাবু আসিলে তাহার হাতে সেগুলা দিয়া যেন একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি পাইতেন। কোন দিন যদি হাবু না আসিত, তাহা হইলে দিবা-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাতুঠাকুর বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে ঘন ঘন

দৃষ্টিপাত করিতেন। তার পর হয় তো হঠাৎ সচকিতভাবে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিতেন, এবং আপনার এই অকারণ উদ্বেগে আপনিই লজ্জিত হইয়া পড়িতেন।

সেদিন কিন্তু হাবু বামুন জেথার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কঠোরতা দেখিতে পাইল যে, ভয়ে সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল, এবং যাইতে যাইতে এক একবার পিছনে ফিরিয়া বামুন জেথার মুখের কঠোর ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে কি না, ইহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই রূপে সে খানিকটা দূরে গেলে সাতুঠাকুর হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন্।"

হাবু থমমিয়া দাঁড়াইল। সাতুঠাকুর এবার স্বরে একটু কোমলতা আনিয়া বলিলেন, "দাঁড়ালি যে, আয়।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। হাবু সাহস পাইয়া হাসিমুখে তাঁহার পিছনে আসিল।

সাতুঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া শিকা হইতে বাতাসার হাঁড়ী পাড়িতে পাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'খানা নিবি?"

হাবু হাত পাতিয়া বলিল, "দু'খানা!"

"মোটে দু'খানা!" বলিয়া সাতুঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া তাহার হাতে এক মুঠা বাতাসা দিলেন। বাতাসা পাইয়া হাবুর মুখে হাসি ফুটিল; সে আহ্লাদে গা দোলাইতে দোলাইতে সেগুলার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। সাতুঠাকুর স্থির প্রসন্নদৃষ্টিতে তাহার উল্লাসসূচক অঙ্গভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আর চাই?"

হাতের অবশিষ্ট বাতাসাগুলা একেবারে মুখে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাবু বলিল, "হুঁ।"

সাতু ঠাকুর এবার দুইটা সন্দেশ লইয়া তাহার দুই হাতে দিলেন। সন্দেশ পাইয়া হাবু আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল; উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল, "দুতো অন্দে, বা বা!"

সাতু ঠাকুর তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "লাফায় না, খেয়ে ফেল।"

হাবু সাগ্রহদৃষ্টিতে একবার সন্দেশ দুইটার দিকে চাহিয়া সাতু ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি খন্দে কাবে না বামুন জেথা?"

সহাস্যে সাতু ঠাকুর বলিলেন, "আমি আর কি খাব বল্, আর তো নাই।"

হাবু তাঁহার দিকে একটা হাত বাড়াইয়া দিয়া গ্রীবা আন্দোলনপূর্ব্বক বলিল, "তবে এত্তা তুমি কাও, এত্তা আমি কাই।"

সাতু ঠাকুরের মুখখানা প্রীতিভরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাবুর মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া স্নেহসরসকণ্ঠে বলিলেন, "না রে বোকা, আমি খেয়েছি, তুই খা।"

"কেয়েতো ? থত্যি ?"

"হাঁরে হাঁ, তুই খা তো।"

হাবু এবার বিনা বাক্যব্যয়ে সন্দেশ দুইটা উদরস্থ করিল। তার পর সে সাতু ঠাকুরের কাছে বসিয়া, আজ সে কাহার সঙ্গে খেলিয়াছে, ঘোষেদের মেনীর সঙ্গে কেন আড়ি দিয়াছে, কাল সকালে তাহার সঙ্গে ভাব করিবে কি না, ইত্যাদি গল্প আরম্ভ করিল। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া ধরণীর বুকে পড়িলে হাবু চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারটা যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। সাতুঠাকুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের আরতি দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার বিশু আর এই হাবু নাকি সমবয়স্ক। উভয়ে একই দিনে একই সময়ে জন্মিয়াছিল। কিন্তু একই তিথিতে একই লগ্নে জন্মিয়া বিশু কবে চলিয়া গেল; আর হাবু দিনে দিনে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে সেও ঠিক এমনটিই হইত। সমগ্র অন্তর প্রদেশে তীব্র মোচড় দিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস এমনই বেগে বাহির হইল যে, তাহাতে হাতের জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা নিবিয়া গেল। সাতুঠাকুর পুনরায় তাহা জ্বালিয়া লইয়া আরতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার কি বিচার! যে প্রসন্ন সরকার অনাচারী বিধু ঘোষালের হাত দিয়া পূজা খাওয়াইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার ছেলের কোন আপদ বালাই নাই। আর যে সন্তানের সুখ-দুঃখকে গ্রাহ্য না করিয়া দেবতাকে এই লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিল, তাহাকে আজ পুত্রশোকে হায় হায় করিতে হইতেছে। উঃ, দেবতা কি নির্লজ্জ! সাতু ঠাকুরের ইচ্ছা হইল, হাতের জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা নির্লজ্জ দেবতার মাথায় আছড়াইয়া দিয়া এই তীব্র অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সাতু ঠাকুর দাঁতে দাঁতে চাপিয়া জ্বলন্তদৃষ্টিতে দেবতাকে যেন ভস্ম করিতে উদ্যত হইলেন।

৪

সারা দিনটা কাটিয়া গেল। গোধূলির ধূসর ছায়ায় আকাশের ঔজ্জ্বল্য

ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিতেছে। আর একটা পাখীকেও উড়িতে দেখা যায় না। হাবু কৈ আজ আসিল না। সাতু ঠাকুর যত পারিলেন, দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করিয়া পথের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ না কে আসিতেছে? না, ঘোষেদের নেপা। আজ আর সে আসিবে না। নাই বা আসিল, তাহাতে কি? কিছুই না। তবে ছেলেটা দোষে গুণে ভাল, বড় মায়াবী। নতুবা কোন্ ছেলে আবার হাতের সন্দেশ অপরকে দিতে চায়? আহা! বালক কি না, মনে খল-কপটতা কিছুই নাই। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বড় হইয়াও ছেলেটা বাপের মত নিষ্ঠুর হইবে না। আজ পাঁচটা সন্দেশ ছিল, নিজে জল খাইবার সময় একটাও খাইতে পারেন নাই, বাতাসা খাইয়া সন্দেশগুলি তুলিয়া রাখিয়াছেন। হাবু আসিলে খাইত। যখন আসিল না—থাক্, কাল আসিয়া খাইবে। আর না;—বিশ্বনাথের আরতির সময় হইয়াছে। সাতুঠাকুর আর একবার প্রসারিতদৃষ্টিতে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে ঢাকা পথের দিকে চাহিলেন। তারপর ভ্রূকুটী করিয়া উঠিয়া উত্তরীয়খানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইলেন।

পরদিনও হাবু আসিল না। উৎকণ্ঠায় সমস্ত অপরাহ্নটা অতিবাহিত করিয়া সাতু ঠাকুর যখন বিশ্বনাথের আরতি করিতে যাইতেছিলেন, তখন প্রসন্ন সরকারের মেজো ছেলে আশু ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া আসিতেছিল। সাতুঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ওষুধ রে আশু?"

আশু বলিল "হাবুর।"

চমকিতভাবে সাতুঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কি হয়েছে?"

আশু বলিল, "পরশু রাত হ'তে খুব জ্বর হয়েছে, বুকে সর্দ্দি বসেছে। ডাক্তার বলছে—"

"নিমোনিয়া নাকি?"

"হাঁ, দু'দিকেই হ'য়েছে।"

আশু চলিয়া গেল। সাতু ঠাকুর স্তব্ধভাবে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেটার অসুখ,—ডবল নিউমোনিয়া। সহসা সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারের মধ্যে একটা আশা ও আশঙ্কার বিদ্যুৎ যেন তাঁহার চোখ দুইটাকে ধাঁধিয়া দিয়া চমকিয়া গেল। সাতু ঠাকুর শিহরিয়া উঠিলেন।

হে বিশ্বনাথ! কে বলে—তুমি নাই? কে বলে—তুমি পাথরের ঠাকুর? তোমার ওই প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে দেবত্বের যে সত্তা আছে, সে সত্তা দিয়া তুমি ভক্তের মর্ম্মবেদনা বেশ অনুভব করতে পার; মানুষের কাতর ক্রন্দনে তোমার

ন্যায়ের সিংহাসন বিচলিত হয়। মূর্খ আমি, পাপী আমি, তাই তোমাকে শুধু পাথর ভেবে তোমার এত লাঞ্ছনা, তোমার উপর এত অত্যাচার করেছি।

সাতু ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া মন্দিরতলে লুটাইয়া পড়িলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অজ্ঞানের শত অপরাধ মার্জ্জনা কর বিশ্বনাথ!"

অনেকদিন পরে সাতু ঠাকুর সে দিন শিবাষ্টক পাঠ করিতে করিতে বহুক্ষণ ধরিয়া দেবতার আরতি করিলেন।

আরতি দিয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময় সাতু ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়াইয়া একবার প্রসন্ন সরকারের বাড়ীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। ডবল নিউমোনিয়া, ঐটুকু ছেলে, কতক্ষণ যুঝিবে? প্রসন্ন সরকার! সাতকড়ি ঘোষালের বুকে কি রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, এইবার তা বুঝিতে পারিবি। কলি বলিয়া কি ধর্ম্ম নাই? দেবতা নাই? ব্রাহ্মণ নাই? বিনা দোষে ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছনা করার কি ফল, এইবার তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবি।

সাতু ঠাকুর চিত্তে যেন একটা তীব্র প্রসন্নতা লইয়া ধীরগম্ভীরপদে বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

সে রাত্রে আর আহারে প্রবৃত্তি হইল না। দূর হউক, ক্ষুধাও তেমন নাই, রাঁধিতেও পারা যায় না. একটু জল খাইয়া পড়িয়া থাকিব। জল খাইতে গিয়া শিকা হইতে মিষ্টান্নের হাঁড়িটা পাড়িতেই সন্দেশগুলার উপর দৃষ্টি পড়িল। এঃ সন্দেশগুলা খারাপ হইয়া যাইতেছে। হাবু যে আর উঠিয়া সন্দেশ খাইতে আসিবে,সে আশা নাই; সারিয়া উঠিলেও তাহার এখন উঠিয়া বসিতেই এক মাস সময় লাগিবে। সুতরাং সন্দেশ কয়টা রাখিয়া আর ফল কি? সাতু ঠাকুর সেই সন্দেশ কয়টা লইয়া জল খাইতে বসিলেন। একটা সন্দেশ হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, বড় চমৎকার সন্দেশ, বাজারে জিনিস নয়, ফরমাস দিয়া তৈরী। আহা, এমন চমৎকার সন্দেশ পাইলে হাবুর কতই না আহ্লাদ হইত! কিন্তু তাহার আহ্লাদে হইত কি? সাতকড়ি ঘোষালের সাত পুরুষ স্বর্গে যাইত! সাতুঠাকুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল তিনি নিজের উপর রাগে নিজের ঠোঁটটা কামড়াইয়া ধরিলেন।

আপনার মূর্খতায় আপনিই হাসিয়া সাতুঠাকুর একটা সন্দেশ মুখে দিলেন। এ কি, এ যে গলা দিয়া নামিতে চায় না, কে যেন গলার ভিতর হইতে উপর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে! আরে নির্লজ্জ বুড়া, একটা বালকের উদ্দেশে খাবার রাখিয়া সেই খাবার নিজের মুখে তুলিতে তোর লজ্জা করে না!

যাহার জন্য রাখিয়াছিলি, সে আজ মৃত্যুশয্যায়; আর তুই বুড়া হাসিতে হাসিতে সেই সন্দেশ মুখে তুলিয়াছিস? ওরে নিষ্ঠুর, এই নির্ম্মমতার পাপেই তুই আজ পুত্রহীন, নির্ব্বংশ, সংসারের স্নেহ দয়া মায়ার সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন। সাতুঠাকুর মুখমধ্যস্থ সন্দেশটা থু-থু করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন; তারপর অবশিষ্ট সন্দেশগুলা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

৫

সকালে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া সাতুঠাকুর ভাবিতেছিলেন, ছেলেটা কেমন আছে—কে জানে। বাঁচিবে, না মরিবে! সঠিক সংবাদটা কাহার নিকট পাওয়া যায়। বাঁচুক মরুক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি তেমন কিছু নাই, কিন্তু সংবাদ পাইলে মনটা অনেক স্থির হয়। কে সে সংবাদ দিবে? নিজে একবার দেখিতে গেলে হয় না? কিন্তু ছিঃ, মনের ভিতর অশুভ-কামনা লইয়া দেখিতে যাওয়া, সে যে বিষম লজ্জার কথা। অন্তরে উৎকণ্ঠার ভার লইয়া সাতুঠাকুর যেন ছটফট করিতে লাগিলেন।

সম্মুখের রাস্তা দিয়া গণেশ মণ্ডল যাইতেছিল। গণেশ তো প্রসন্ন সরকারের খুব অনুগত। তাহার বাড়ীর দিক হইতেই আসিতেছে; খুব সম্ভব, উহার নিকট সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে। সাতুঠাকুর গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিলেন, "ওহে গণেশ!"

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সম্বোধন-শ্রবণে গণেশ একটু চমকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "পেন্নাম বাবা ঠাকুর।"

সাতুঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?"

গণেশ একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "সরকার মশায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর ছোট ছেলের বড্ড ব্যামো কি না।"

যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞভাব প্রকাশ করিয়া সাতুঠাকুর বলিলেন, "বটে? ব্যামোটা কি?"

গণেশ বলিল, "জ্বর বিকার, নিমুনিয়া।"

একবার কাশিয়া সাতুঠাকুর বলিলেন, "আছে কেমন?"

গণেশ। থাকা-থাকি আর কি, খুবই বাড়াবাড়ি। বিকারের ঝোঁকে তেড়ে তেড়ে উঠছে, আবোল তাবোল বক্‌ছে। আশা নাই, তবে বাবা যদি ফেলে যান, তবেই।"

সাতুঠাকুরের মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি গম্ভীরস্বরে "হুঁ" বলিয়াই অস্থিরভাবে উঠিয়া পড়িলেন। গণেশ কিন্তু তাঁহার সে অস্থিরতা লক্ষ্য করিতে পারিল না; সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সরকার মশায়ের মুখে তো রা নাই, মা আছাড়-কাছাড় কচ্ছে। পরেশ ডাক্তারকে নাকি আনতে গিয়েছে। আহা ছেলে নয় তো, যেন রাজপুত্তুর, শত্রু যে, সেও ফিরে চায়। ভগবান যে কার কপালে কখন কি লিখেছেন, কে বলতে পারে।"

সাতুঠাকুর এতক্ষণে আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া তীব্র ভ্রূকুটীর সহিত বলিলেন, "রাজপুত্তুর বুঝি মরে না?"

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সহসা ক্রোধের সম্ভাবনা দর্শনে শঙ্কিত হইয়া গণেশ বলিল, "তা আর মরে না বাবা ঠাকুর? কে আর অমর ফল খেয়ে এসেছে, বল। তবে একটা সময় আর অসময় আছে। অসময়ে গেলে একটু দুঃখু হয় বৈকি!"

সাতুঠাকুরের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। রোষতীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার দুঃখু হয় বলে কেউ তো মরবে না? ভারী দয়ালু লোকটা তুমি কি না।"

নির্দ্দয়তা যে কিসে হইল, এবং দুঃখ-প্রকাশেই যে কি দোষ ঘটিল, তাহা গণেশ বুঝিতে পারিল না; না বুঝিলেও প্রতিবাদ করিয়া দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ক্রোধোদ্দীপনে সাহসী হইল না; সে আর একটা 'পেন্নাম জানাইয়া' আস্তে-ব্যস্তে তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। সাতু ঠাকুর রোষসঙ্কুচিতমুখে অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

তবে বাঁচিবে না? দেবরোষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কি মানুষের সাধ্য? হায় হতভাগ্য প্রসন্ন সরকার! ডাক্তার কবিরাজে কি করিবে? এই ক্ষুদ্র বালকের উপর দেবতার যে শাসনদণ্ড উত্থিত হইয়াছে, ডাক্তার কবিরাজের সাধ্য কি, তাহার প্রতিরোধ করে। তোর অদৃষ্টে পুত্রশোক যে দৈবের বিধান। জয় বিশ্বনাথ! ধন্য তোমার মহিমা!

দেবতার মহিমাস্মরণে ভক্তের মুখ, প্রেমে ভক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিল।

একবার দেখিয়া আসিলে হয়, হাবুর কি অবস্থা হইয়াছে, আর পুত্রের সে অবস্থা-দর্শনে প্রসন্ন সরকারের গর্ব্বস্ফীত মুখখানা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। যে প্রতিহিংসার জন্য এতদিন দেবতার দ্বারে মাথা কুটিয়া,

আসিয়াছি, এবং নিষ্ফল ক্রোধে দেবতাকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি, আজ সেই প্রতিহিংসাবৃত্তি সার্থক হইয়াছে। এ সার্থকতা একবার নিজের চোখে দেখিব না?

সাতুঠাকুর এক পা এক পা করিয়া প্রসন্ন সরকারের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

৬

প্রসন্ন সরকার বাড়ীর বাহিরে ডাক্তারের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল; সাতুঠাকুরকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর গো, আমার হেবো যে যায়। বাবাকে জানাও, আমি যোড়া ঢাক দিয়ে ষোড়শোপচারে বাবার পূজা দেব।"

হো হো মূর্খ! কাহাকে যোড়া ঢাকের লোভ দেখাইতেছিস্? বাবা নিজেই যে এই মরণের দুন্দুভি বাজাইয়া দিয়াছেন? তাঁহার যে পিণাক, সংহারের ভৈরব আরাবে বাজিয়া উঠিয়াছে, জোড়া ঢাকের শব্দে তাহার ধ্বনি কি চাপা পড়িবে? এ যে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের স্বহস্ত-প্রদত্ত দণ্ড! এ দণ্ড কে রোধ করিবে?

সাতুঠাকুর পা ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছে?"

চোখ মুছিয়া প্রসন্ন উত্তর দিল, "পূর্ণ বিকার, প্রলাপ বকছে। নাড়ী কখনও আছে, কখনও নাই।"

সাতুঠাকুর গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; প্রসন্ন ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "একবার দেখবে না দাদাঠাকুর? একটু পায়ের ধূলো দেবে না?"

"চল।"—সাতুঠাকুর প্রসন্নের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

আজ যে বড় ভক্তি প্রসন্ন সরকার! আজ যাহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য ব্যস্ত, একদিন তুমিই না সেই বামুনকে বিশ্বনাথের দরজা হ'তে—। ছিঃ, লোকের বিপদের সময় পরিহাস করা কি উচিত?

রোগীর ঘরের দরজায় উঁকি দিয়াই সাতুঠাকুর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ কি সেই হাবু? তিন চারি দিনেই যে বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, শুধু লাল চোখ দুইটা যেন আরও স্ফীত, আরও বিস্ফারিত হইয়া বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে; ঠোঁট দুইটায় কে যেন কালী মাড়িয়া দিয়াছে। মৃত্যু আসিয়া মুখখানার উপর যেন আপনার কঙ্কালময় হাত বুলাইয়া দিয়া গিয়াছে। উঃ, এ অবস্থা হইতে ফিরায় কাহার সাধ্য! তাঁহার

বিশুর মুখের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল। সাতুঠাকুর রুদ্ধশ্বাসে নির্নিমেষ-নেত্রে হাবুর মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা হাবু চীৎকার করিয়া উঠিল, "বামুন জেথা, বামুন জেথা!"

যেন বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে সাতুঠাকুরের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিতহস্তে দরজার বাজুটা চাপিয়া ধরিলেন।

হাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মেলো না বামুন জেথা, মেলো না; আমি আল থন্দে কাব না।"

সাতুঠাকুর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "হাবু!"

হাবু নিশ্চল, নিরুত্তর। কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার সর্ব্বশরীর যেন একবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে অধীরভাবে বিছানা হাতড়াইতে হাতড়াইতে কাঁদিয়া উঠিল, "আমাকে মালবে, বামুন জেথা, মালবে, মা, মা!"

মা শিয়রেই বসিয়াছিলেন; ছেলের মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া তাহার উপর নিজের মুখ রাখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাপ আমার! যাদু আমার!"

সাতুঠাকুরের নিঃশ্বাস বুঝি রুদ্ধ হইয়া আসিল; চোখের জল বুঝি আর থামে না। উঃ, চুলোয় যাক্ বিশুর স্মৃতি, উচ্ছন্ন যাউক সংসার, এ কি করিলে বিশ্বনাথ!

হাবুর মা পুত্রের শিয়র হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সাতুঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং আপনার হাতের সোনার বালা দুইগাছা খুলিয়া তাঁহার পায়ের উপর রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমরা মনে করলে মরা বাঁচাতে পার। আজ বালা দু'গাছা দিলাম, বল তো আমার সর্ব্বস্ব দেব। তুমি বাবাকে জানিয়ে আমার ছেবোকে বাঁচিয়ে দাও।" জানাইলে বাবা কি রক্ষা করিতে পারিবেন না? দেবতার অসাধ্য কি? কিন্তু ও সাতকড়ি ঘোষাল, কাহার ছেলের জন্য তুমি বাবাকে জানাইতে যাইবে? যাহাকে পুত্রহীন করাইবার জন্য বাবার মাথায় পঞ্চপ্রদীপ ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়াছিলে—সাতুঠাকুরের চোখের সামনে সব যেন ঝাপ্সা হইয়া আসিল। হাবু চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাত্তা দাও বামুন জেথা, বাত্তা দাও।"

সাতুঠাকুর পদাঘাতে বালা দুইগাছাকে ছুঁড়িয়া দিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কাণের পাশ দিয়া ফাল্গুনের বাতাস হো-হো শব্দে বহিয়া যাইতে লাগিল।

সাতুঠাকুর চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। তিনি

অনেকক্ষণ রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন, "হোপ্‌লেস্; বেলা আড়াই প্রহর পার হইবে না।" বাড়ীতে কান্নার উচ্চরোল উঠিল। মা পুত্রের শিয়র ত্যাগ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। প্রতাপপুর হইতে এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন পরেশবাবুকে আনিতে লোক গিয়াছে। কিন্তু সে লোক বা ডাক্তার, কাহারও দেখা নাই। আর ডাক্তার আসিয়াই বা কি করিবে? মরণের ঔষধ তো ডাক্তার দিতে পারে না। প্রসন্ন সরকার হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় ঠিক একটা ঘূর্ণী ঝড়ের মত সাতুঠাকুরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সকলে ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সাতুঠাকুর কিন্তু কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে রোগীর শিয়রে গিয়া বসিলেন, এবং বিশ্বনাথের চরণামৃত রোগীর মুখে ঢালিয়া দিয়া হাতটা তাহার গায়ে মাথায় বুলাইয়া দিলেন। তার পর সেইখানে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "বিশ্বনাথ, যদি একদিনের তরেও প্রাণের আবেগে ভক্তিভরে তোমার পায়ে ফুল জল দিয়ে থাকি, তবে তারি ফলে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও দয়াময়! তোমার সে দয়ার বিনিময়ে এ জন্মে আমার দেবার কিছু নাই, কিন্তু এই উপবীত ছুঁয়ে বলছি, পর পর যত জন্ম হবে, সেই সব জন্মেই আমি পুত্রশোকের অসহ্য বেদনা বুক পেতে নেব ঠাকুর!"

গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ গৃহমধ্যে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কণ্ঠধ্বনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের কর্ণে মেঘমন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে পরেশ ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বুক পিঠ পরীক্ষা করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "ভয় কিছুই নাই, বাঁ দিকে সর্দ্দিটা বসেছে মাত্র, নিউমোনিয়া নয়। হরিশ বাবু ভুল করেছেন। নাড়ীর কোনও দোষ নাই।"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে "জয় বাবা বিশ্বনাথ!" বলিয়া সাতুঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্ন সরকার তাঁহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "পায়ের ধূলো দাও দাদাঠাকুর, তুমিই আমার মরা ছেলেকে বাঁচালে।"

তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া সাতুঠাকুর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা ব'লো না প্রসন্ন সরকার, তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন বিশ্বনাথ। মরা

বাঁচায় আমার হাত থাকলে আমি দু'হাতে গলা টিপে তাকে মেরে ফেলতাম।"

দাঁতে দাঁতে ঘষিতে ঘষিতে সাতুঠাকুর ক্রোধকম্পিতপদে ঘরের বাহির হইলেন। সকলে ভীতিবিহ্বলদৃষ্টিতে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ক্রোধ-রুদ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা। দ্বিতীয়বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা; কার্ত্তিক —শ্রী সেখ হবিবর রহমনের জাতীয় সঙ্গীতে পূর্ব্ব অবদানের স্মরণ ও মনন আছে; কিন্তু রচনায় কবিত্ব বা ভাষার উদ্দীপনা নাই। ছন্দেও যতি অত্যন্ত দুর্ব্বল, এই জন্য সুরও জমাট হয় নাই। শ্রীকাজী আকরম হোসায়নের 'গল্প—সাহিত্য' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ। ইনি যে দিক হইতে গল্পসাহিত্যের সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। শ্রীকাজি নজরুল ইসলামের 'হেনা' ঠিক ছোট গল্প নহে; উল্লেখযোগ্য আখ্যান। রচনায় সম্পূর্ণ সাফল্যের পরিচয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশাপ্রদ আভাস আছে। আর একটু সংযম, আর একটু সংহতি গল্পটির আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিত। নবীন লেখক বাহুল্যবর্জ্জনে অভ্যস্ত হইলে, তাঁহার গল্প আরও মনোরম হইতে পারিবে। কাজী নজরুল 'বঙ্গ-বাহিনী'র অর্থাৎ বাঙ্গালী পল্টনের হাবিলদার। করাচীর কর্ম্মক্ষেত্রে এক জন বাঙ্গালী মুসলমান মাতৃভাষার সাধনা করিতেছেন, যুগধর্ম্মের এই দান বাঙ্গালী সাদরে গ্রহণ করিবে। কাজী সাহেবকে আমরা একটি গল্প শুনাইব। ইংরেজ ঔপন্যাসিক মরে তাঁহার 'My contemporaries in fiction' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন,—"আমি স্বয়ং সৈনিক ছিলাম; বহুকাল বারাকে টমী অ্যাটকিন্সের [পল্টনের সৈনিকের] জীবন যাপন করিয়াছি। তাহার পর বন্দুক ফেলিয়া কলম ধরিয়াছিলাম। আমি উপন্যাসই লিখিয়াছি। কিন্তু টমীর জীবনে উপন্যাসের বস্তু আছে, তাহা আমি ধরিতে পারি নাই। কিন্তু রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং সুদূর পঞ্জাবের খবরের কাগজের আফিসে চাকরী করিতেন, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কলম চালাইতেন। তিনি সৈনিক-জীবনের গল্প লিখিয়া সফল হইলেন। যশস্বী হইলেন। আমি তাহা ধরিতে পারিলাম না। মরের একটা উক্তি এখনও আমার মনে আছে,—'Plots are hovering over our heads.'—যাহার শক্তি আছে, যাহার দৃষ্টি আছে, সে ধরিতে পারে। কল্পনাই গল্পের একমাত্র উৎস নয়, দৃষ্ট-জগতেও আখ্যানবস্তু ছড়াইয়া আছে। কাজী নজরুল যে জীবন যাপন করিতেছেন, যে প্রতিবেশে বাস করিতেছেন, তাঁহার মাথার উপর মৌমাছির ঝাঁকের মত সেই জীবনের ও সেই প্রতিবেশির আখ্যান-বস্তু নিশ্চয়ই উড়িতেছে। তিনি কল্পনার জালে সেই সকল আখ্যানবস্তু ধরিবার চেষ্টা করিলে, গতানুগতিকতার বাধা অতিক্রম করিয়া মৌলিকতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন; বাহুল্য ও 'সেণ্টিমেণ্টালিটীর উপাদানে 'নাটুকে' গল্প রচনা করিবার দুর্ভাগ্য ও দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। শ্রীমহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের 'পণ্ডিত রেয়াজ-উদ্দীন আহম্মদ মাশহাদী' প্রবন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য নাই।

আহম্মদ সাহেবের গুণপক্ষপাতীরা তাঁহার 'সুরিয়া-বিজয়' মুদ্রিত করিলে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করিবে। শ্রীকেশবলাল বসুর 'আলীবখ্শ' স্মরণীয় অবদান অবলম্বনে লিখিত ক্ষুদ্র গাথা। প্রসাধনে কবিতাটি আরও সুন্দর হইতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দশম ও একাদশ শ্লোকের দুর্ব্বলতা উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমইনউদ্দীন হোসায়নের 'নারীর মূল্য ও ইসলাম' সামাজিক প্রবন্ধ। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্ম্মে নারীর মর্য্যাদা, অধিকার ও আদর্শ হীন, ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাহার বিপরীত, ইহাই লেখকের প্রতিপাদ্য! সকল চালেরই দুই পিঠ আছে। প্রাচীন আদর্শ লইয়া বর্ত্তমানের সমর্থন চলে না। একদেশদর্শনেও বিশেষ কোনও লাভ নাই। সমাজের আদর্শও চিরস্থায়ী নহে। দেশ কাল পাত্র ও প্রতিবেশপ্রভাবে সমাজের বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আজ বিংশ শতাব্দীর আলোকে তিন চারি সহস্র বৎসরের ব্যবস্থায় আদিমতার যে ছায়া দেখি, সেকালে তাহাই হয় ত ভাস্বর বলিয়া মনে করিবার কারণ ছিল। এখন সেই 'হীন' আদর্শের উত্তরাধিকারী হিন্দু প্রভৃতি 'উন্নত আদর্শে'র অধিকারী লেখককে বর্ত্তমানের প্রমাণে 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে' বলিতে পারে কি না, তাহাই বর্ত্তমানের বিচার্য্য। শুধু নর-নারীর সাম্যের ভেরী বাজাইয়া সমাজ যে লাভ করে, ইউরোপে আমেরিকায় আমরা তাহার নমুনা দেখিতেছি। তাহাই 'উচ্চ' আদর্শ নহে। তদপেক্ষা উচ্চ আদর্শ না হইলে মানুষ বাঁচিবে না, সমাজ থাকিবে না। 'গ্রহণে'র অধিকারে সাম্য নাই, 'স্থিতি'ও নাই। 'ত্যাগে'ই সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 'প্রদানে'র নিম্নতম আদর্শ ও 'আদানে'র উচ্চতম আদর্শ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এখন আবশ্যক অতীতের অভিজ্ঞতায় বর্ত্তমানের বিশ্লেষণ, এবং বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতের ভিত্তিস্থাপন। কোনও সমাজে পুরুষের আদর্শ 'হীন' ছিল বলিয়া নারীর আদর্শ 'হীন' করা যায় না। পুরুষের আদর্শ উন্নত কর; এবং নিষ্কাম-ধর্ম্মের কষ্টি-পাথরে মানবতার সোনা বাচাই করিয়া লও—নর ও নারীর প্রাচীন আদর্শে কে পাকা সোনা ও কে কাঁচা সোনা, তাহার বিচার করিয়া কোনও লাভ নাই—বোধ করি এই জীবন-সংগ্রামের দিনে আমাদের সে অবকাশও নাই। এখন যে আদর্শ আমাদের অস্তিত্ব-রক্ষায় ও জাতি-গত-বৈশিষ্ট্য-বিকাশের অনুকূল, তাহাই নরেরও আদর্শ, নারীরও আদর্শ। যদি সকল ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ হইতে তিল তিল আহরণ করিয়া তিলোত্তমার মত আমাদের জীবন-সংগ্রামের ও যুগধর্ম্মের আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে প্রাচীর সকল সনাতন আদর্শ চরম চরিতার্থতা লাভ করিবে। প্রাচীন আদর্শের বিপরিণামেই নূতন আদর্শ বিবর্ত্তিত হয়। ইহাই প্রাণের লীলা। শুধু মৃত আদর্শের ব্যবচ্ছেদে ও তুলনায় সমালোচনায় কোনও জীবিত সমাজ বা সমাজ-সমবায় জাতি জীবন-যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারে না। শ্রীএকলিমুর রেজার 'স্বরূপে'র স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীকাজী আবদুল ওদুদের 'মা' নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। মানব-মনের ভাব-বিশ্লেষণে পটুতাই লেখকের বিশেষত্ব। লেখক সবুজ ভাষার উপাসক। কিন্তু ইঁহার 'চল্‌তী ভাষা'য় হেঁয়ালি নাই, ইংরেজীর ভাবের ও 'বাক্যে'র পাদরীগন্ধিনী তর্জ্জমা নাই। কিন্তু বুড়ীর 'নম্র চোখ'ও 'লোল শুক্‌নো চিবুক' সবুজ ও সাধুর সঙ্কর নয়? শ্রীখোন্দকার গোলাম আহম্মদের 'ভারতে মোস্‌লেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা' ও শ্রীমোজাফর আহম্মদের 'বঙ্গদেশে মাদ্রাসার শিক্ষা' উল্লেখযোগ্য।

অন্বেষণ। কার্ত্তিক।—স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর চেষ্টায় এমন চমৎকার হাফ্‌টোন্ প্রস্তুত হইতেছে, এমন ছবি ছাপা সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে গৌরব-গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। 'মুক্ত' শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ক্ষুদ্র কবিতা। শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সোনার ঝরণা' সুলিখিত গল্প। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোহনলালের বয়স দশ এগার বৎসরের অধিক নয়। যে বয়সে ছেলেরা গল্প শোনে, মোহন সেই বয়সে গল্প শুনাইতেছে। এমন ভাবে, এমন ভঙ্গীতে, এবং এমন ভাষায় অবলীলায় গল্প বলিয়া যাইতেছে, যাহা অনেক প্রবীণের রচনায় দেখা যায় না। এই রহস্য এমন উপভোগ্য যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তির এই উদাহরণ বাঙ্গালীর গোচর না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মোহনলালের গল্প আমরা শশধর বাবুকে পড়িতে বলি। তাঁহার 'বংশানুক্রমে'র আলোচনায় কাজে লাগিবে। মোহন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র, ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। 'মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ', এবং 'বাপকা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ্ নহী, তব্ ভি থোড়া' স্মরণ করুন। infant fenomena মোহনকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি। ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ধূমকেতু', শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুবুদ্ধি গোয়ালা' উপভোগ্য। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'আরসলা' উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ক্রমশঃপ্রকাশ্য। ছেলেদের জন্য যে পদ্ধতিতে লিখিতে হয়, দ্বিজেন্দ্র বাবু সে পদ্ধতির পাকা জহরী। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আমরা অনেকেই ছেলেমানুষ, দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় আমরাও অনেক নূতন কথা শুনিতে পাই।

নারায়ণ। মাঘ।—'বাঙ্গালী, জাগ' গদ্য-কবিতা—স্বদেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাস—উপভোগ্য। লেখক বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অবদানের স্মরণ ও মনন করিয়াছেন, দেশমাতৃকার চরণে আন্তরিক ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন।—'বৌদ্ধ, জৈন, সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রবল বন্যা একের পর অপর যে মাটীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—সে মাটী চিরকাল বোবা হইয়া থাকিবে না। সে মাটী একদিন কথা কহিবেই কহিবে।' উপসংহারে,—'বিশ্ব-স্রোতে, বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টি-স্রোতে বাঙ্গালা আবার শতদলের মত আপন গরবে আপনি ফুটিবে, আপনি ভাসিবে। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বাঙ্গালা তাহার স্বাতন্ত্র্য আবার একবার ফুটাইয়া দেখাইবে। "স্বাদিতে নিজ মাধুরী"—বাঙ্গালা রসে রূপে ভোরপুর হইয়া আবার দেখা দিবে।' 'সাধ্ব' গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীমধুসূদন গোস্বামীর 'ব্রহ্মোত্তম' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু 'সাধ্ব' কি? 'মাধ্ব' নয় ত?

শ্রীসরোজ চৌধুরীর 'রেণু' ন্যাকামী ও 'নাটুকে' ভাবাতিশয্যের খিচুড়ী। বাঙ্গলাকে যদি কখনও কথা কহিবার অবকাশ দিতে হয়, তাহা হইলে এ সকল 'কথা'কে এমন গভীর গর্ত্তে গোর দিতে হইবে, যেন কোনও মতে তাহার আওয়াজ মাটীর উপর না আসে।—আজকালকার কাব্য-সমালোচনাকে আমরা জুজুর মত ভয় করি; তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারি না। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'গীতাঞ্জলি ও অন্তর্য্যামী'ও সমালোচনা। বিশেষত্ব এই যে, ইহা যোড়া কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা। 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে লেখকের ঠিক বক্তব্য কি, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। 'অন্তর্য্যামী' রসা রোডের আধ্যাত্মিকতার ঘোড়-দৌড়ের মাঠে 'গীতাঞ্জলি'কে ক' lengthএ হারাইয়া দিয়া 'you scratch my back and I scratch your's সুরের কপ...

জিতিয়াছে, তাহাও ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে এই প্রবন্ধে 'যদি'র একটা 'ফিলজফী' আছে, তাহা উদ্ধৃত করি,—

'মালঞ্চের কবির কাব্যসৃষ্টির স্তরে চিত্তরঞ্জনের ধর্ম্মজীবনের যে বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য কবিদিগের বিশেষতঃ সুইনবার্ণের যে প্রভাব আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করি, অন্তর্যামীতে আমরা তাহার কিছু দেখিতে পাই না। মালঞ্চের কবি প্রায় দশ বৎসর কাল কবিতা না লিখিলেও তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে অনেকগুলি স্তর ক্রমে ক্রমে পার হইয়া আসিয়াছেন, ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। যদি তিনি গীতাঞ্জলির কবির মত এই দশ বৎসর কাব্যসৃষ্টি করিতেন, তবে সম্ভবতঃ আমরা তাহা প্রত্যক্ষও করিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির ধারায় তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ। অন্তর্যামীর কবির মানসিক বিকাশের পথ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাহা অপ্রত্যক্ষ—অনুমানসাপেক্ষ। অথচ তাহা গীতাঞ্জলির কবির মানসিক পরিবর্ত্তনের মতই ধ্রুবসত্য।'

'যদি'র এই বিজয়-বৈজয়ন্তী খোদ চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণে'র মন্দিরের চূড়ায় পৎ-পৎ-শব্দে উড়িতেছে! উপভোগ্য নয়? দ্বিজেন্দ্রলালের 'হতে পারতাম' মনে পড়ে না? যাহা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, অপ্রত্যক্ষ,—অনুমানসাপেক্ষ, তাহাও 'ধ্রুব সত্য'! যেমন, ব্রহ্ম। তাহা মূকাস্বাদনবৎ। ইহা মোওাস্বাদনবৎ! সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে 'যদি'র স্বপ্ন জাগাইয়া দিলেন। হায় যদি! তুমি চরণে স্থান দিলে, অতীতে না হউক, বর্ত্তমানে কত 'হতাশের আক্ষেপ'ই না লিখিতে পারিতাম। 'ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি, ধনেভ্যঃ পরং 'ক্রিটিক্' নাস্তি লোকে।' শ্রীইন্দুলোচন চক্রবর্ত্তীর 'কবিরাজ মহাশয়' একটি চলনসই উপাখ্যান—আখ্যান-বস্তু সাবানের সহিত তুলনীয়। লেখক খুব ফেনাইয়াছেন। 'চীনা পাড়া' উল্লেখযোগ্য। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'তন্ত্রের মূলতত্ত্ব' আমরা বুঝিতে পারিলাম না—বোধ হয় অনধিকারী বলিয়া। আর, 'এ শুদ্ধি বা রূপান্তরের অর্থ—অভূতপূর্ব্ব অভিনব একটা কিছু সৃষ্টি করা নয়, এ হইতেছে—তরল করিয়া দেওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া; মুক্ত করিয়া দেওয়া—হৃদয়গ্রন্থি-মধ্যে জমাট যাহা, তাহাকে টুটাইয়া ভাঙ্গিয়া ভূমায় বিস্তৃত করিয়া ধরা। তবেই উহার মধ্যে ফলিয়া রাঙ্গাইয়া উঠিবে—জীবের শিবত্ব। পূর্ণ প্রকৃতির পূর্ণ দ্যোতনা না খেলাইয়া ভাসাইয়া তুলিলে, পূর্ণ শুদ্ধি ও পূর্ণ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।' ইহা বোধ করি বঙ্কিম বাবুর কাপালিক ও খোদ আগমবাগীশও বুঝিতে পারিবেন না।

পরুষ্ণী-যুদ্ধে সঙ্গত আর্য্যনরপতিগণ।

আমরা 'সুদাস' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, কতকগুলি আর্য্যনরপতি ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে সুদাসের বিরুদ্ধে আসিয়া পরুষ্ণী (অর্থাৎ রাভী) নদীর কূল ভেদ করিয়া দেন। বৈদিক যুগে আর্য্য রাজগণ যুদ্ধ-গমনকালে ঋত্বিক্‌দিগকে সঙ্গে লইতেন, ইহা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের রচিত ঋক্ উদ্ধার করিয়া উক্ত প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। ঋত্বিক্‌গণ স্ব স্ব রাজার বিজয় কামনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যজ্ঞ করিতেন, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিতেন। কোন্ কোন্ রাজা ও ঋষি সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

বশিষ্ঠ ঋষির রচিত সুদাসের বিজয়-যজ্ঞের স্তোত্র উদ্ধার করিয়া উপরিউক্ত প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে, ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ, শ্রুতকবষ ঋষি, দ্রুহ্যু ও তাঁহার সৈন্যগণ, অনুর পুত্র ও তাঁহার সৈন্য, সসৈন্য তুর্বশ ও চয়মান-পুত্র কবি সুদাসের বিরুদ্ধে আগমন করেন। এই যুদ্ধে ছয় সহস্র অনুবংশীয় সৈন্য ও ছয় সহস্র দ্রুহ্যুবংশীয় সৈন্য প্রাণত্যাগ করে; চয়মান-পুত্র কবি, শ্রুতকবষ ও বৃদ্ধ দ্রুহ্যু মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই প্রাচীন কালেও দেখা যাইতেছে, যুদ্ধে কত লোক হত হইত, তাহা যুদ্ধাবসানে গণনা করা হইত। যে সকল রাজা বা ঋত্বিক্ যুদ্ধে হত হইতেন, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া বিজয়-যজ্ঞের স্তোত্রে তাঁহাদের নাম ঋক্‌বদ্ধ করা হইত। এই যুদ্ধে বিজিতগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিজেতার পরিচর্য্যা করিতে প্রদান করিয়াছিল, ইহাও দেখান গিয়াছে।

'পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু' প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, পূরু-রাজ ত্রসদস্যু মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা কুরুশ্রবণের নিকট কবষ নামে এক ঋষি ধন প্রার্থনা করেন। ইহা হইতে অনুমান করি, পরুষ্ণী-যুদ্ধে পুরু-রাজ কুরুশ্রবণ কবষ ঋষি সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। সেই জন্য কবষ ঋষির নাম বশিষ্ঠ উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঋষি-রচিত কতকগুলি সুন্দর স্তোত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সংগৃহীত হইয়াছে। শত্রু কবষকে শ্রুত আখ্যা প্রদান করায় বশিষ্ঠের সত্যবাদিতা প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, তিনি যে বেদ-বিদ্ ও বিদ্বান্ ছিলেন, শ্রুত শব্দ

দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। কণ্বপুত্র সোভরি ঋষির রচিত একটী স্তব হইতে আমরা অবগত হই যে, তিনি ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষির যজ্ঞ করেন। (১) অতএব কুরুশ্রবণ ও তৃক্ষি দুই ভ্রাতা ছিলেন। এই দুই ভ্রাতাই যে সুদাসের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাহা পরে দেখান যাইতেছে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, সুবাস্তু (বর্ত্তমান স্বাৎ,) নদীতীরে ত্রসদস্যুর রাজধানী ছিল। অতএব পুরুগণ সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিয়া পরুষ্ণী (বর্ত্তমান রাভী) নদীর কূল ভেদ করে।

ঋগ্বেদে কবিপুত্র উশনার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি মনুর যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করেন, এক জন ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন। (২) মহাভারতে কবিপুত্র উশনাকে শুক্রাচার্য্য, ভৃগুশ্রেষ্ঠ এবং ভার্গব বলা হইয়াছে। (৩)

অতএব উশনা ভৃগুবংশীয় ছিলেন, বুঝা যাইতেছে। ঋগ্বেদের প্রত্যেক সূক্তের মুখবন্ধে উহার রচয়িতা ঋষির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে দেখিতে পাই, ভৃগুর দুই পুত্রের নাম ছিল কবি ও বেন; এবং উশনা কবির ও পৃথু বেনের পুত্র ছিলেন। (৪) ঋগ্বেদ হইতে ইহাও জানা যায়, ভৃগুগণ আয়ুবংশীয়দিগের পুরোহিত ও নহুষ আয়ুবংশীয় ছিলেন। অতএব ভৃগুগণ পরুষ্ণী-যুদ্ধে আগমন করায় নহুষবংশীয় কোন নরপতি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন, অনুমান করি। নহুষ-প্রজাগণ যে সুদাসের বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহার আরও প্রমাণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

শংযু ঋষি বৃহস্পতির পুত্র ও ভরদ্বাজের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি একটী স্তবে বলিয়াছেন—'হে ইন্দ্র! নহুষ-কৃষকদিগের মধ্যে যে তেজ ও ধন আছে, কিংবা

---

(১) ৮। ২২। ৭

(২) আবজিং। উশনা। কাব্যঃ। ত্বা। নি। হোতারং। অসাদয়ৎ।
ত্বা। মনবে। জাতবেদসম্॥ ৮।২৩।১৭ (বাশ্বের পুত্র বিশ্বমনা)

কবিপুত্র উশনা মনুর নিমিত্ত, হোতা তোমাকে, জাতবেদা তোমাকে, যজ্ঞকারী তোমাকে, স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৩) কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে। মহা, আদি। কবিপুত্র উশনার শাপে আমি যৌবনে তৃপ্ত নহি। ৮৪।২৮

শুক্রো নামাসুরগুরুঃ সুতাং জানীহি তস্য মাম্।—ঐ, ৮১।৯। আমাকে অসুরগুরু শুক্রের সুতা বলিয়া জানিবেন।

ততঃ কাব্যো ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ সমন্যুরুপগম্য হ। ঐ। ৮০।১। অনন্তর কবিপুত্র ভৃগুশ্রেষ্ঠ ক্রোধান্বিত হইয়া সমীপে গমন করিয়া।

নাধর্ম্মং ন মৃষাবাদং ত্বয়ি জানামি ভার্গব। ঐ ৮০।৭

পঞ্চক্ষিতিদিগের উজ্জ্বল অন্ন ও যে সকল বল আছে, তাহা আমাদিগকে দাও।' (৪)

'হে মঘবন্! কিংবা যে কিছু বীর্য্য তৃক্ষি, দ্রুহ্য ও যাহা পূরু জনে আছে, তাহা আমাদিগকে দাও (ও) যুদ্ধে হিংসার্থ সঙ্গত অমিত্রদিগকে (আমাদের অধীন করিয়া) দাও।' (৫)

শংযু ঋষির স্তব হইতে আমরা অবগত হইতেছি, নহুষের কৃষকগণ, পঞ্চক্ষিতিগণ, তৃক্ষি, পূরু, ও দ্রুহ্য শংযুর যজমানের শত্রু হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে দ্রুহ্যকে আমরা পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখি। অতএব, পরুষ্ণী-যুদ্ধের পূর্ব্বে শংযু যে এই স্তব রচনা করেন, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। বসিষ্ঠের স্তোত্রে ভৃগুগণের উল্লেখ দেখিয়া আমরা যে অনুমান করিয়াছিলাম, নহুষবংশীয় কোন রাজা এই যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন, শংযু ঋষির স্তবে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে বলিয়াছেন যে, 'সেই মহৎ অগ্নি বল দ্বারা নহুষের প্রজাকে কর-প্রদ করিয়াছেন।' (৬) ইহা দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, নহুষের প্রজাগণ সুদাসের শত্রু হইয়াছিল, এবং পরাজিত হইয়া করপ্রদানে বাধ্য হয়। বশিষ্ঠ ঋষি অপর এক ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নাহুষ (অর্থাৎ নহুষপুত্র) সরস্বতীতীরে বাস করিতেন। (৭) আমরা ইহা হইতে অনুমান করি, সিন্ধু নদীর তীরে নহুষ-পুত্র যযাতি রাজত্ব করিতেন, এবং তিনি সুদাসের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যেরূপ শংযু ঋষির স্তবে, সেইরূপ বিশ্বামিত্র-পুত্রদিগের ও বসিষ্ঠের স্তোত্রেও দেখিতে পাই, ক্ষিতিগণ তাঁহাদের শত্রু হইয়াছে। বিশ্বামিত্রপুত্রগণ বলিতেছেন, 'ক্ষিতিগণ জনদিগের পরম শত্রু হইয়াছে, অতএব হে অগ্নি! পশ্চিম দিকের

---

(৪) ৯।৪৭—৪৯ ও ৯।৭০-৭৯ ; ৯;৮৫ ৯।৮৭—৮৯ ; ১০।১২৩ ; ১০।১৪৮।

(৫) আ। জন্দ্রঃ। কেতুং। আয়বঃ। ভৃগবানং। বিশে। বিশে। ৪।৭।৪ বামদেব।
আয়ুগণ ভৃগুসম্বন্ধীয় কেতুকে (অগ্নিকে) সকল প্রজার মধ্যে আহরণ করিয়াছেন।
ইমম্। বিধন্তঃ। অপাং সধস্থে। দ্বিতা। অদধুঃ। ভৃগবঃ। বিক্ষু। আয়োঃ।—২।৪।২

(৬) যৎ। ইন্দ্র। নাহুষীষু। আ। ওজঃ। নৃম্নং। চ। কৃষ্টিষু।
যৎ। বা। পঞ্চ। ক্ষিতীনাং। দ্যুম্নং। আ। ভর। সত্রা। বিশ্বানি। পৌংস্যা॥—৬।৪৬।৭

(৭) যৎ। বা তৃক্ষৌ। মঘবন্। দ্রুহ্যৌ। আ। জনে। যৎ। পূরৌ। কৎ। চ। বৃষ্ণ্যম্।
অস্মভ্যং। তৎ। রিরীহি। সম্। নৃষহ্যে। অমিত্রান্। পৃৎসু। তুর্বণে॥—৬।৪৬।৮

অয়াজ্ঞিদিগকে দহন কর।' (৮) এই স্তোত্র হইতে অবগত হই যে, জন-দিগের বিপক্ষ ক্ষিতিগণ উহাদের পশ্চিমে বাস করে। বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, 'হে ইন্দ্র! এই সকল দিনে আমাদিগকে সাহায্য কর; দুষ্ট মিত্র ক্ষিতিগণ আগমন করিতেছে।' (৯) এই সকল স্তোত্র পরুষ্ণী-যুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে 'জন'-গণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা ভারত-জন নামে বেদে প্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্র ঋষি একটী ঋকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্তোত্র ভারত-জনদিগকে রক্ষা করে। (১০) অতএব সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব দিকে যে আর্য্যজাতি বাস করিত, তাহারা ভারত-জন নামে বেদে প্রসিদ্ধ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। নহুষ ও পূরুদিগের প্রজাগণ ক্ষিতি নামে অভিহিত হইত। ইহারা সিন্ধু নদীর পশ্চিমে ও আফগানিস্থানের মধ্যে বাস করিত বলিয়া অনুমান করি। (১১)

আমরা 'পূরুকুৎস ও ত্রসদস্যু' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, ভরদ্বাজ ঋষি পূরু-দিগের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। তখন ভারতজন ও ক্ষিতিদিগের মধ্যে বিবাদ হয় নাই। যখন এই বিবাদ উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ ভরদ্বাজ ঋষি তখন জীবিত ছিলেন না। সেই জন্য এই যুদ্ধের উল্লেখ তাঁহার রচিত ঋকে দেখিতে পাই না। তাঁহার ভ্রাতা শংযু কিন্তু এ সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি কাহার যজ্ঞে উল্লিখিত ঋক্-গুলি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। সম্ভবতঃ দিবোদাসের যজ্ঞে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন। কারণ, ভরদ্বাজ-বংশ দিবোদাসের পুরোহিত-বংশ ছিলেন, 'দিবোদাস' প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে।

পরুষ্ণী-যুদ্ধে চয়মান-পুত্র কবি আগমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীও চয়মানের পুত্র ছিলেন। অতএব ইঁহারা দুই জনে যে ভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এই যুদ্ধকালে অভ্যাবর্ত্তী জীবিত ছিলেন কি না, তাহা কোন ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার ভ্রাতা কবি এই যুদ্ধে আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করি সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী তখন জীবিত ছিলেন, এবং তিনিই ইঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া থাকিবেন।

---

(৮) সঃ। মিত্রধা। নহুষঃ। যহুঃ। অগ্নিঃ। বিশঃ। চক্রে। বলিহৃতঃ। সহোভিঃ। ৭।৬।৫

(৯) ৭।১৯।২

(১০) ৩।১৮।১।

(১১) ৭।২৮।৪।

আমরা তুর্বশ ও অনুর পুত্রের নাম বিপক্ষদিগের মধ্যে দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের মধ্যে তুর্বশ যদুর নাম বহুস্থলে একত্র বর্ত্তমান। বৈদিকযুগে এই সকল আর্য্য সম্প্রদায় বিখ্যাত ও পরাক্রমশালী ছিল। এই বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের বিবরণ অপর এক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে দিবার চেষ্টা করিব। দ্রুহ্যুগণ যে তুর্বশ-যদুদিগের মিত্র ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

পরুষ্ণী-নদীর যুদ্ধে এক পক্ষে সুদাস ও দিবোদাস, তৃৎসু ও ভরতদিগের অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধ করেন। ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ-ভ্রাতা শংযু, বশিষ্ঠ, পরাশর, শক্তি ও বিশ্বামিত্রপুত্রগণ তাঁহাদের ঋষি ছিলেন। অপর পক্ষে সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী, তাঁহার ভ্রাতা কবি, অনুর পুত্র, দ্রুহ্যু, তুর্বশ, নহুষ-প্রজাগণ, অনুগণ, দ্রুহ্যুগণ, পঞ্চক্ষিতিগণ, কুরুশ্রবণ, তৃক্ষি, ভৃগুগণ ও কবষ ঋষি এই যুদ্ধে যোগদান করেন। ইঁহাদিগের সহিত পক্থ, অলিন ও বিষাণযুক্ত শিবগণ আগমন করিয়াছিল, বর্ণিত আছে। বৈকর্ণ নামক জনপদদ্বয়ের লোকও আসিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি, পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু পূরুদিগের রাজা ছিলেন। এই পূরুদিগকে তাহা হইলে পূরু নামক কোন রাজা হইতে উৎপন্ন মনে করিতে হইবে। কিন্তু এই পূরু কে? বশিষ্ঠ ঋষি পরুষ্ণী-বিজয়-যজ্ঞে 'যজ্ঞে মিথ্যা-বাক্য-উচ্চারণকারী পূরুকে জয় করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা ঋক্‌বদ্ধ করিয়া পাঠ করিয়াছেন। (১২) আমরা দেখাইয়াছি, নাহুষ প্রজাগণ এই যুদ্ধে আগমন করিয়াছিল। তাহা হইলে কেহ মনে করিতে পারেন, এই পূরু মহাভারতোক্ত যযাতির পুত্র ও নহুষের পৌত্র ছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, এই যুদ্ধে পুরুকুৎসের পৌত্র কুরুশ্রবণ এবং তৃক্ষিও আগমন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা যযাতি বা তৎপুত্রের সমসাময়িক হইয়া পড়েন। অতএব, পুরুকুৎস-বংশ যে পূরু হইতে উৎপন্ন, তিনি যযাতি-পুত্র হইতে পারেন না। ঋগ্বেদে আমরা এই প্রাচীন 'পূরু' সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাই নাই।

বশিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যুকে 'পূরু' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। (১৩) যে যজ্ঞে ঋষি এই ঋক্ পাঠ করেন, তাহার উদ্দেশ্য, তুর্বশ যদুকে দিবোদাসের অধীনে আনিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা। (১৪) ইহা

(১২) ৭।৫৩।১২

(১৩) 'বৈবস্বত মনু ও সুদাস' প্রবন্ধে ও আমরা ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(১৪) ত্বং। পৌরুকুৎসিং। ত্রসদস্যুং। আবঃ। ক্ষেত্রসাতা। বৃত্রহত্যেষু। পূরুম্। ৭।১৯।৩ ক্ষেত্রজয়ের যুদ্ধে বৃত্রহত্যা-সময়ে, পুরুকুৎস-পুত্র পূরু (রাজা) ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছ।

হইতে আমরা অনুমান করি, দিবোদাস বশিষ্ঠ ঋষি দ্বারা এই যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। দিবোদাসের যজ্ঞে ত্রসদস্যুর নাম উচ্চারিত হওয়ায়, দিবোদাস ও ত্রসদস্যুর মধ্যে মিত্রতা সূচনা করিতেছে। অনুমান করি, এই যজ্ঞের পর পূরুরাজ ত্রসদস্যু মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার পুত্র কুরুশ্রবণ রাজা হন। পূরুরাজ কুরুশ্রবণ পিতৃবন্ধু দিবোদাসের সহিত মিত্রতা রক্ষা না করিয়া তুর্বশ-যদুদিগের সহিত মিলিত হইয়া দিবোদাস ও সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। এই জন্যই বশিষ্ঠ ঋষি 'যজ্ঞে মিথ্যাবাক্য-উচ্চারণকারী পূরুকে জয় করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অতএব, এই 'পূরু' নাম পূরুরাজ কুরুশ্রবণকে বুঝাইতেছে, মনে করা যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সিন্ধু নদীর উভয়দিকে আর্য্য নরপতিগণ বৈদিক যুগে রাজত্ব করিতেন। সিন্ধুনদীর পূর্ব্বকূলে অতিথিগ্ব দিবোদাস ভারতজনদিগের অধিনায়ক ছিলেন। ভরদ্বাজ ও অথর্ববংশীয়গণ ইঁহার যজ্ঞ করিতেন। রাভী নদীর তীরে সুদাস তৃৎসুদিগের নায়ক হইয়া বাস করিতেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রবংশীয়গণ ইঁহার ঋষিবংশ ছিলেন। তৃৎসুদিগকে ভারতজন-দিগের একটী শাখা বলিয়া অনুমান করি। পূরুকুৎস-বংশীয়গণ পূরুদিগের রাজা ছিলেন। সুবাস্তুতীরে ইঁহাদিগের রাজধানী অবস্থিত ছিল। অগস্ত্য, কবষ ও কণ্ব-বংশীয়গণ ইহাঁদিগের ঋষিবংশ। নহুষ-পুত্র যযাতি সিন্ধুতীরে রাজত্ব করিতেন। ভৃগু ও পজ্রবংশীয়গণ ইঁহাদিগের ঋষি ছিলেন। তুর্বশ, যদু, অনু ও দ্রুহ্যু নামক নরপতিগণ সম্ভবতঃ তুর্কিস্থানের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন। কণ্ববংশীয় ঋষিগণ ইহাঁদিগের পুরোহিত ছিলেন। সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী পার্থবদিগের রাজা ছিলেন। প্রাচীন পার্থিয়ায় তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করি। ইহাঁর বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

(১৫) নি। তুর্ব'শং। নি। যাদ্বং। শিশীহি। অতিথিগ্বায়। শংস্যং। করিষ্যন্। ৭।১৯।৮
অতিথিগ্বকে সুখী করিতে তুর্বশ ও যদু (জনকে) বশে আনয়ন কর।

৩

পক্ষান্তরে, মণ্ডল ও গ্রাম, এতদুভয়ের মধ্যে খণ্ডল নামে একটি নূতন বিভাগের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাসনোক্ত পৌণ্ড্রভুক্তির সহিত বাঙ্গালার পালরাজগণের অন্যান্য শাসনের উল্লিখিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। চৈনিক তীর্থযাত্রী ইয়ুয়ান চুয়াঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে বাঙ্গালায় একটি নগর ছিল, এবং উহা সম্রাট্ হর্ষের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সামন্তরাজ্যবিশেষের রাজধানীরূপে বিরাজ করিত। এই ইয়ুয়ান চুয়াঙ্গ [ভারতবর্ষে আসিয়া] অতিথিরূপে সম্রাট্ হর্ষের সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে নানারূপ বিভিন্ন অনুমানের অবতারণা হইয়াছে, কিন্তু ইয়ুয়ান চুয়াঙ্গের বর্ণনা অনুসারে উহা বগুড়ার সমীপবর্ত্তী মহাস্থান নামে পরিচিত স্থান হওয়াই বিশেষ সম্ভব বলিয়া মনে হয়। মহাস্থানে প্রাচীন নগর ও দুর্গের নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে, পালরাজ-শাসনের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিকে উত্তরপূর্ব্ব বাঙ্গালারই প্রদেশবিশেষ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বক্ষ্যমাণ শাসনের পৌণ্ড্রভুক্তিও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি হইতে পারে।

ভূমির অবস্থানের পরিচয়প্রদানান্তে শাসনে ভূমির পরিমাণ, পাটকে ও দ্রোণে উল্লিখিত হইয়াছে; পাটক ও দ্রোণই তৎকালে ভূমি-পরিমিতির প্রচলিত পরিমাণ ছিল।

অন্যান্য প্রাচীন ভূমিদানপত্রে যেরূপ চৌহদ্দী দৃষ্ট হয়, এই শাসনখানিতে চৌহদ্দীর সেরূপ কোনই উল্লেখ নাই। স্বত্ব ও সর্ত্তগুলি যে পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) তৃণপূতি গোচর পর্য্যন্ত [রাধাগোবিন্দ বাবু ইহাকে 'including grass, filthy water and pasture grounds' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার যে দ্বাদশ ভলুমে উক্ত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পাদটীকায় এপিগ্রাফিয়ার সুপণ্ডিত সম্পাদক অধ্যাপক ষ্টেনকোনো বলিয়াছেন,—পূতিশব্দে এক প্রকার তৃণকেও বুঝায়।]

দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে, নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে, প্রথম মহীপালের বাণনগর তাম্রশাসনে, এবং মদনপালের মনহলী তাম্রশাসনে—গৌড়-লেখমালায় প্রকাশিত এই চারিখানি পালরাজ-শাসনে সদৃশ শব্দের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাদের প্রায় তিনখানিতে 'প' স্থলে 'য' পঠিত হইয়া 'পূতি' স্থানে 'যুতি' পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। গৌড়লেখমালার সুপণ্ডিত সম্পাদক এই শব্দের কোনও অনুবাদ প্রদান করেন নাই।

(২) সতল সোদ্দেশ,—ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-তল সহ।

(৩) সাম্রপণস সগুবাকনারিকেল—আম, কাঁঠাল, সুপারি ও নারিকেল বৃক্ষ সহ।

(৪) সলবণ—লবণ বা লবণাক্ত-মৃত্তিকা সহ। রাধাগোবিন্দবাবু ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন,—ভূমিখণ্ড সমুদ্রকূলবর্ত্তী হইবে; কিন্তু সলবণ শব্দটি প্রচলিত দস্তুর-মোতাবেক শাসনমধ্যে আসন গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে। তৎকালে লবণের উপর শুল্ক আদায় হইত, উহাতে তাহাও সূচিত হইতে পারে।

(৫) সজলস্থল।

(৬) সগর্ত্তোষর—খাল, খন্দ ও অজন্মা ভূমি সহ।

(৭) সদশাপরাধ—রাধাগোবিন্দবাবুর অনুবাদ,—'with respect to which the ten offences should be tolorated' (যাহার সম্পর্কে দশাপরাধ মার্জ্জনীয়)। অন্যান্য শাসনে আমরা 'সদশাপচার' এবং 'সদশাপরাধ' প্রাপ্ত হই, এবং কোনও কোনও স্থলে উহার সহিত 'সচৌরোদ্ধরণ' শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাই। এই শেষোক্ত শব্দের দ্বারা চোরকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার বা কর্ম্মতার বুঝায়; এবং দশাপরাধ বিষয়ে ফৌজদারীর এলাকা খাটিবে, অথবা প্রদত্ত ভূখণ্ডের উপর ঐ সকল অপরাধ সংঘটিত হইলে তাহার দণ্ড বা জরিমানা-আদায়ের অধিকার থাকিবে—অপরাপর শব্দগুলির ইহা উদ্দিষ্ট হইতে পারে।

(৮) পরিহৃতসর্ব্বপীড়া—সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন-মুক্ত।

(৯) অচাডভডপ্রবেশা—এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

(১০) অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য—সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্সের দায়মুক্ত।

(১১) সমস্ত রাজভোগ্য কর হিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা,—এই বাক্য অন্যান্য শাসনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, গ্রহীতাকে ভূসম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকার কর নিঃশেষে প্রদত্ত হইয়াছিল—অর্থাৎ, কেবল রাজগ্রাহ্য বলি নহে, তদতিরিক্ত করও (এখন যাহাকে আবওয়াব বলা যায়) দান করা হইয়াছিল।

ইংরাজ অ্যাটর্ণীর দলীলের মুশাবিদায় যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সতর্ক সাবধান যথাযথ বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল ভূমিদানপত্রেও প্রায় তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। রাজকর্ম্মচারিগণের সুদীর্ঘ তালিকা-দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সমুন্নত ও সুবিস্তৃত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ শাসনের সময়েও যে তদুল্লিখিত সমুদয় রাজকর্ম্মচারীরই অস্তিত্ব ছিল, ইহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন রাজবংশের শাসনসমূহে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের ভিন্ন ভিন্নরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন কর্ম্মচারীর কে কোন্ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধিত হয় নাই, এবং এই সমগ্র বিষয়টিই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া রহিয়াছে।

তাহার পর, গ্রহীতার নামের, বংশের ও উপাধির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রহীতার নাম রামদেব শর্ম্মণ; তিনি সাবর্ণ-গোত্রীয়; মধ্যদেশ (কান্যকুব্জ) হইতে আগত, এবং উত্তররাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামে উপনিবিষ্ট পীতাম্বর দেবশর্ম্মণের তিনি প্রপৌত্র; শুভদিনে উদকস্পর্শপূর্ব্বক 'বিষ্ণুচক্র' মুদ্রায় মুদ্রিত তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ ভূমিদানপত্র রাজা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উহা ভূমিচ্ছিদ্র-নীতি (অর্থ-শাস্ত্রসম্মত বিধানবিশেষ) অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। এই দানপত্রের তারিখ ভোজবর্ম্মার রাজ্যাঙ্কের ৫ বর্ষের ১৯ শ্রাবণ; এবং উহা স্বয়ং নৃপতি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ আছে।

বাঙ্গালার 'বর্ম্মা' রাজবংশ।

এইরূপ সময়ে বাঙ্গালায় যে একটি বর্ম্মারাজবংশ বিদ্যমান ছিল, তাহা অন্যান্য লিখিত প্রমাণ দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

সেই সকল লিখিত প্রমাণের মধ্যে, একখানি তাম্রশাসনের অবস্থা অতীব শোচনীয়;—তাহার যে অংশ পাঠযোগ্য, তাহাতেই প্রকাশ রহিয়াছে, উহা জ্যোতিবর্ম্মার পুত্র হরিবর্ম্মা কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে সম্পাদিত হইয়াছিল। রায় সাহেব 'নগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্কলিত' বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে যে পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পরিশুদ্ধ হইলে, দানের বিষয়ীভূত ভূমিখণ্ড যে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত— তাহাও দৃষ্ট হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, রায় সাহেবের পাঠ কতকটা অনুমান-মূলক ও অশুদ্ধ; এবং রাখালদাস তাঁহার বাঙ্গালার পালরাজ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ভূমিকায়, এই শাসনের স্বকৃত পাঠোদ্ধার

প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার পর উড়িষ্যায় পুরীর নিকটে ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ শিলালিপিতে ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক অনন্ত বাসুদেবের মন্দির-নির্ম্মাণের বিষয় উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হয়,—সাবর্ণমুনিবংশীয় শ্রোত্রীয়গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত গ্রামসমূহমধ্যে সিদ্ধল গ্রামই সর্ব্বপ্রধান,—উহা রাঢ় প্রদেশের অলঙ্কার-স্বরূপ। (প্রথম) ভবদেব সিদ্ধল গ্রামের একটি প্রখ্যাতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি গৌড়রাজের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এই ভবদেবের রথাঙ্গ নামে এক পুত্র ছিল; রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, এবং অত্যঙ্গের পুত্র স্ফুরিতবুধ, স্ফুরিতবুধের পুত্র আদিদেব বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। আদিদেবের গোবর্দ্ধন নামে এক পুত্র ছিল,—সেই গোবর্দ্ধন জনৈক বন্দ্যঘাটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতা সাঙ্গতা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্র (দ্বিতীয়) ভবদেব বহুকাল হরিবর্ম্মার ও পরিশেষে তাঁহার পুত্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এবং তিনি রাঢ় প্রদেশে একটি দীর্ঘিকা খনন, এবং ভুবনেশ্বরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শিলালেখটি ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতির রচিত, এবং উহাতে, ভবদেব যে বালবল্লভীভুজঙ্গ উপাধিতেও সুপরিচিত ছিলেন—তাহারও উল্লেখ আছে। এই বালবল্লভী নাম রামচরিতেও দৃষ্ট হয়। যে সকল সামন্ত নৃপতি রামপালের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা দিতে গিয়া রামচরিতে দেবগ্রামের ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বালবল্লভীর নদীসমূহ-বিধৌত ভূখণ্ডের অধিপতি 'বিক্রমরাজ' উল্লিখিত হইয়াছেন। এই বালবল্লভী যে কোন্ দেশ, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। বেলাব শাসনে ক্রমান্বয়ে বজ্রবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, সামলবর্ম্মা ও ভোজবর্ম্মার নামোল্লেখ আছে, কিন্তু জ্যোতিবর্ম্মার ও হরিবর্ম্মার শাসন দুইখানিতে প্রদত্ত বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণের নাম অন্যরূপ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই তিনখানি শাসনেই বর্ম্মরাজগণকে রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা যায়, এবং হরিবর্ম্মার শাসনের 'পৌণ্ড্রভুক্তি' পাঠ যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, উক্ত প্রদেশ হরিবর্ম্মার এবং ভোজবর্ম্মার রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহা দ্বারা, বর্ম্ম-শেষ-নামযুক্ত তিনটি নৃপতিই যে একই রাজবংশীয় সে অনুমানও সমর্থিত হইতেছে। সম্ভবতঃ, জ্যোতিবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মা, ভোজবর্ম্মার অনেক পূর্ব্বের;—ইহা পরে দৃষ্ট হইবে। ভুবনেশ্বরের শিলালিপি অনুসারে, (প্রথম) ভবদেব গৌড়রাজের নিকট হইতে একটি গ্রাম-দান প্রাপ্ত হয়েন; সেই বংশেরই, চারি পুরুষ পরবর্ত্তী আদিদেব বঙ্গাধিপের প্রধান

মন্ত্রী হইয়াছিলেন, এবং আদিদেবের পুত্র দ্বিতীয় ভবদেব হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন। উল্লিখিত গৌড়রাজ পালরাজগণের ভিতর কেহ—হয় ত প্রথম মহীপাল, হইবেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং প্রথম ভবদেবের ও আদিদেবের মধ্যবর্ত্তী কালে সিদ্ধল গ্রামসমেত রাঢ়ের কতকাংশ পালরাজগণের অধিকারচ্যুত হইয়া বর্ম্মরাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল, এরূপ অনুমানও সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের প্রমাণালোচনা।

নেপালে, হরিবর্ম্মার রাজ্যকালে লিখিত বলিয়া দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে;—তাহাদের একখানি 'অষ্টসহস্রপ্রজ্ঞা-পরিমিতা'—হরিবর্ম্মার রাজ্যকালের ঊনবিংশ অব্দ সংবলিত; অপরখানি কালচক্রযানের টীকা "বীরমালাপ্রভা"—হরিবর্ম্মার ঊনচত্বারিংশ রাজ্যাব্দসংবলিত। ইহার পর যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করিব, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় প্রমাণ—তাহা কুলগ্রন্থ, কুলমঞ্জরী, কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নানা অংশ—তাহাতে বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব ও বংশাবলী আলোচিত হইয়াছে, এবং তাহা 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও দক্ষতার সহিত সঙ্কলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত শাসনাদির তুলনায় এই সকল গ্রন্থ আধুনিক, এবং বাঙ্গালার প্রাচীন-ইতিহাসসম্পর্কিত যে সকল প্রমাণ তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মূল্যও অনেক কম। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের অংশবিশেষের বর্ত্তমান গঠন-ব্যবস্থার আলোচনা-মূলক গ্রন্থ বলিয়া, রায় সাহেবের পুস্তক বহুমূল্য বটে; কিন্তু তাহা ছাড়া, কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণকেও তুচ্ছ করিলে চলিবে না, কারণ, তদন্তর্নিহিত কিংবদন্তীগুলির অন্ততঃ কতকগুলি যে প্রকৃত সত্যমূলক, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

কোটালিপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ রাঘবেন্দ্র কবিশেখর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বরচিত ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজের উদ্ভব-বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জরাজের রক্ষণাধীনে সরস্বতী-নদীতীরে বাস করিতেন। যখন কান্যকুব্জেশ্বরের রাজশক্তি মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ দশা, যবনের অভ্যুদয় ও দেশময় অশান্তি-অরাজকতা-দর্শনে, তত্রত্য দুই জন প্রধান ব্রাহ্মণ—(কর্ণাবতীর) গঙ্গাগতি মিশ্র, ও যাদবানন্দ মিশ্র স্থানত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া সপরিবার সপরিজন কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া, বারাণসীতে আগমন করিলেন; এবং যাদবানন্দ বারাণসীতেই

থাকিয়া গেলেন। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কতক প্রয়াগে (এলাহাবাদে), কতক কাশীতে, কতক গয়ায় বসতি করিলেন, এবং কতক কান্যকুব্জে ফিরিয়া গেলেন। গঙ্গাগতি তাঁহার পরিজন পরিবারবর্গ সহ বাঙ্গালায় চলিয়া আসিলেন। প্রথমতঃ কিছু দিন তাঁহারা যশোহরে ছিলেন; কিন্তু সাপের উপদ্রব, বাঘের উপদ্রব, কুমীরের উপদ্রব, লোণা জলের উপদ্রব—এই সকল নানা উপদ্রবে তাঁহারা যশোহর পরিত্যাগ করিলেন, এবং পূর্ব্বাঞ্চলে কোটালিপাড়ায় আসিয়া স্থায়ী হইলেন। তথায় কয়েক বৎসর বাস করিবার পর গঙ্গাগতি স্বীয় দুহিতার বরান্বেষণে কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিয়া, যশোধর মিশ্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন;—যশোধর পরে বহু অনুচরাদিসহ কোটালিপাড়ায় আসিয়া বসতি করেন। কান্যকুব্জ হইতে ফিরিবার পথে গঙ্গাগতি রাজা হরিবর্ম্মার রাজধানী হইয়া আইসেন; প্রধান মন্ত্রী বাচস্পতি মিশ্র রাজার সহিত গঙ্গাগতির পরিচয় করিয়া দেন, এবং রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থিত করেন, এবং কোটালিপাড়ায় নিষ্করভূমি প্রদান করেন। ভুবনেশ্বর-শিলালিপিতে ভবদেবের প্রশস্তি তাঁহার সুহৃদ্ বাচস্পতির রচিত, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বর-লিপির বাচস্পতি রাঘবেন্দ্রের গ্রন্থোল্লিখিত বাচস্পতি মিশ্র হইতে অভিন্ন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

ন্যায়সূচিনিবন্ধ-নামক ন্যায়দর্শনের একখানি প্রচলিত গ্রন্থ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতি মিশ্র রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা ও হরিবর্ম্মার মন্ত্রী যদি একই ব্যক্তি হয়েন, তাহা হইলে, হরিবর্ম্মার রাজত্ব-কালকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে স্থাপিত করিতে হয়। রাঘবেন্দ্রের গ্রন্থারম্ভে রাজা হরিবর্ম্মার বিজয় প্রার্থিত হইয়াছে, এবং নানা শব্দালঙ্কারে তাঁহার গুণগরিমা ও রাজশক্তি বর্ণিত হইয়াছে। হরিবর্ম্মা যে জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম্মদ্বেষিগণকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং বাণভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতি-প্রমুখ সপ্তমন্ত্রী যে তাঁহার ছিল,—তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে। এই বাণভট্ট ভুবনেশ্বর-লিপির ভবদেব হইতে পারেন,—তথায় তাঁহার ভট্ট ও বাণবল্লভীভুজঙ্গ উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা হরিবর্ম্মার জননী বারাণসী তীর্থদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার ভ্রমণ-সৌকর্য্য নিমিত্ত হরিবর্ম্মা যে এক নূতন প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, গ্রন্থারম্ভে হরিবর্ম্মার প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ আছে।

[illegible]

লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন!

কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাপিতে পারিব না। মাসিকপত্রের ক্ষেত্রে গত ত্রিশ বৎসর যাঁহাদের অনুগ্রহ পাইয়াছি, এই শুভ অনুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকেই 'বঙ্গদর্শন' হস্তগত করিবার সুযোগদানে আমরা বাধ্য। এই জন্য, তাঁহাদের পক্ষে—

প্রথম বৎসরের মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট হইল। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন তাহা অমূল্য।—অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না।—সেই 'বঙ্গদর্শন' 'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে, যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ, হুবহু—

Fac-simile সংস্করণ।

যাঁহারা তিন টাকা দিয়া চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র গ্রাহক হইবেন, অর্থাৎ 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার, সাহিত্য।

২০, [illegible] কলিকাতা।

পরবর্ত্তী কালের অপরাপর কুলগ্রন্থের মতে, নৃপতি সামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালায় আনীত হইয়াছিলেন।

রামদেব বিদ্যাভূষণের বৈদিক কুলমঞ্জরী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—গৌড়াধিপতি সামলবর্ম্মা কর্ণাবতী হইতে পঞ্চ অগ্নিহোত্রী বৈদিক ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালায় আনয়ন করিয়াছিলেন; এবং ইহাও লিখিত রহিয়াছে যে, চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার বিজয়সেন নামে এক পুত্র ছিল, এবং বিজয় সেনের ঔরসে তদীয় পত্নী মালতীর গর্ভে, মল্ল ও সামল নামে দুই পুত্র জন্মে। বিজয় সেনের মৃত্যুর পর মল্ল পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, এবং সামল বর্ম্মা বিপুল সেনাদল লইয়া বহির্গত হইয়া বহুদেশ অতিক্রম করিয়া এবং বহু নৃপতিকে পরাভূত করিয়া গৌড়দেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিক্রমপুরের নিকট স্বয়ং বাস করিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন। পরে তিনি কাশীরাজ নীলকণ্ঠের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ্বর-রচিত বৈদিক কুলমঞ্জরীতে দৃষ্ট হয়:—মহারাজ ত্রিবিক্রমের রাজধানী সুবর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরীতে ছিল; তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল, এই বিজয়সেন পরে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং তাঁহার পত্নী বিলোলার গর্ভে মল্লবর্ম্মা ও সামলবর্ম্মা নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মল্লবর্ম্মা পিতৃরাজ্যে থাকিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামলবর্ম্মা গৌড়রাজ্যে তাঁহার শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার যে সকল শত্রু ছিল, তাহাদিগের বিজয়সাধনোদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েন। পরে তিনি কান্যকুব্জরাজ নীলকণ্ঠের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার নবোঢ়া পত্নীকে স্বদেশে আনয়ন করিবার সময় তৎসহ যশোধর নামক এক বেদবাদী ব্রাহ্মণকেও আনয়ন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে,—সামলবর্ম্মা শূরবংশীয় বিজয়সেনের পুত্র; ১০৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদ লাভ করেন; এবং কাশীরাজতনয়া ভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার সামন্তসায়ের বৈদিকসমাজসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বৈদিককুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে,—পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণে লবণসমুদ্র এবং উত্তরে বরেন্দ্রভূমি, এই চৌহদ্দীভুক্ত প্রদেশে সামলবর্ম্মা তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন; এবং তাঁহাকে, সেনরাজগণের সামন্ত নৃপতি স্বরূপ করপ্রদান করিতে হইত। সামলবর্ম্মাই যে কান্যকুব্জ হইতেই হউক বা বারাণসী হইতেই হউক, প্রথম পাশ্চাত্য বৈদিকগণকে আনয়ন

কুরিয়াছিলেন, এবং উক্ত আনীত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে শুনক-গোত্রীয় যশোধর মিশ্রও আসিয়াছিলেন—এতৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জীতে অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। কয়েকখানি কুলগ্রন্থে ১০৭৯ খৃষ্টাব্দ ব্রাহ্মণগণের আগমন-কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কবিশেখর রাঘবেন্দ্রের মতে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সপরিজন গঙ্গাগতি মিশ্রই হরিবর্ম্মার রাজ্যকালে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় আগমন করেন; গঙ্গাগতির জামাতা যশোধর পরে আসিয়াছিলেন। হরিবর্ম্মা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। গঙ্গাগতি যদি তৎসময়ে বাঙ্গালায় আগমন করিয়া থাকেন; এবং যশোধর যদি তাঁহার জামাতা হয়েন, তাহা হইলে, যশোধরের ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে আগমন অসম্ভব নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী কুলপঞ্জীসমূহে হরিবর্ম্মার কোনও উল্লেখ নাই, এবং তাহাতে সামলবর্ম্মার যে উদ্ভব-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বেলাব-শাসনে প্রদত্ত বংশাবলীর সহিত বা সেনরাজগণের বিশ্বাসযোগ্য দলীলাতপ্রমাণের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। বেলাব-শাসন অনুসারে ভোজবর্ম্মার পিতা ও পূর্ব্বাধিকারী সামলবর্ম্মা, সামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা, এবং জাতবর্ম্মার পিতা বজ্রবর্ম্মা, এবং সেনরাজসম্বন্ধীয় লিপিবদ্ধ প্রমাণমূলে বিজয়সেনের পিতার নাম হেমন্ত সেন, এবং বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী—সুপ্রতিষ্ঠিত বল্লালসেন। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, হেমন্তসেন হয় ত ত্রিবিক্রম নাম বা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, এবং ইহার সমর্থনে তিনি রাণাঘাটের সাতকড়ি ঘটক-সঙ্কলিত একখানি কুলগ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে, কোনও কোনও সেন-রাজের একাধিক নাম ছিল। কিন্তু কুলগ্রন্থের ত্রিবিক্রম হেমন্তসেন হইলে, সামল বর্ম্মাকে বল্লালসেন হইতে হয়। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, সামলবর্ম্মার পিতা জ্যোতিবর্ম্মা তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক হইতে পারেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্দ নিরূপিত না থাকিলেও, তাহার পূর্ব্বাধিকারী নয়পাল যে খৃষ্টীয় ১০৪০ খৃষ্টাব্দে, অতীশ যৎকালে তিব্বতে গমন করেন, তৎকালে বাঙ্গালার সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তাহা আমরা অবগত আছি; অতএব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কোনও সময়ে তৃতীয় বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। হরিবর্ম্মা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আমরা যদি ইহা বাচস্পতি মিশ্র-রচিত ন্যায়-সূচিনিবন্ধের রচনাকাল হইতে অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বেলাব শাসনের বজ্রবর্ম্মা ও জাতবর্ম্মা হরিবর্ম্মার পরে

সিংহাসন অধিকার করেন; অথবা হয়ত হরিবর্ম্মা ও বজ্রবর্ম্মা একই ব্যক্তি ছিলেন। ইহার কোনও অনুমানই, তৃতীয় বিগ্রহ পালের সমসাময়িক ও জাতবর্ম্মার উত্তরাধিকারী সামলবর্ম্মা যে ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত অসমঞ্জস হইবে না। উপরি উক্ত প্রমাণমূলে, সামল বর্ম্মা ও বল্লালসেন এক অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব মনে হয় না; কিন্তু অন্যান্য লিপিবদ্ধ প্রমাণে বল্লাল সেনের কাল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শূরবংশ ও আদিশূর।

সেনের সহিত শূরের সম্বন্ধ—আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। (১৩২১ সালের ২৭ পৌষ তারিখে সঙ্কলিত) রমাপ্রসাদ চন্দ রচিত যে 'আদিশূর' প্রবন্ধ কলিকাতা সাহিত্য-সভায় পঠিত হইয়াছিল তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—বিজয় সেনের একখানি সম্প্রতি আবিষ্কৃত, কিন্তু অপ্রকাশিত তাম্রশাসনের মতে, বল্লাল সেনের গর্ভ্ভধারিণী বিলাস দেবী শূরবংশজাতা ছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা অনুসারে, বিজয় সেন স্বয়ংই শূরবংশীয়; এবং রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু কহেন—সামলবর্ম্মা কোনও কোনও কুল-গ্রন্থে 'শূরান্বয়' রূপে, এবং কোনও কোনও কুল-গ্রন্থে 'সেনান্বয়'রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের কোন কোন কুলজী অনুসারে, বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রীবংশোদ্ভব। যে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন বলিয়া সুপরিজ্ঞাত কিম্বদন্তী রহিয়াছে, এবং যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাঙ্গালায় বহু গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে, সেই আদিশূরের কাল লইয়া, এবং তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব লইয়া বহু বাদানুবাদ চলিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুল-গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিলে, আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা হইতে আদিশূরকে কাল্পনিক পুরুষমাত্র অনুমান করাও নিরাপদ হইবে না। বেলাব শাসন, হরিবর্ম্মার শাসন এবং ভুবনেশ্বর প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত না হইলে, হরিবর্ম্মা ও সামল বর্ম্মাও কাল্পনিক সৃষ্টি বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারিতেন। আমরা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পর্ব্বতলিপিতে রণশূর নামে এক সামন্ত নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ১০২০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে তিনি সম্ভবতঃ উড়িষ্যা প্রদেশবিশেষে বা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালায় আধিপত্য করিতেন; এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাঢ় প্রদেশে 'শূর'-শেষ-নাম-যুক্ত এক রাজবংশের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহা নিঃসংশয়ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। আদিশূর সেই বংশেরই কোন সামন্ত নৃপতি হওয়া অসম্ভব নহে, এবং তিনি কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ-

গণ সংখ্যায় কতজন ছিলেন, বা তাঁহারা কবে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এতৎপ্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান আক্রমণ, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গালায় আগমনের পক্ষে এক বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসম্ভব ছিল না।

বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কাশীপুরে সামল বর্ম্মার পিতা ত্রিবিক্রমের রাজধানী ছিল ;—এই সুবর্ণরেখা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার চিরাগত মধ্যবর্ত্তী সীমা-রেখা। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু কাশীপুরকে বর্ত্তমান কাশীয়ারী হইতে অভিন্ন মনে করেন, এই কাশীয়ারীতে, তিনি বলেন, এখনও প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর, সামল বর্ম্মার অগ্রজ মল্লের নাম শুনিলেই কলিঙ্গরাজবংশাবতংস নিঃশঙ্ক মল্ল ও সাহস মল্লের কথা মনে পড়িয়া যায় ; তাঁহারা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হরিকেলের রাজবংশ চন্দ্রদ্বীপ।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন দুইখানি আবিষ্কৃত হওয়ায়, আমরা পূর্ব্ববঙ্গে আর একটি রাজবংশের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইয়াছি। ঢাকা জেলার রামপালের ভগ্নাবশিষ্টের ভিতর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় যে শাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্রশস্তি-পাঠে জানিতে পারা যায়, শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র, তাঁহারা হরিকেল-বংশীয় ছিলেন, এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হরিকেল, বাঙ্গালার একটি অতি প্রাচীন প্রদেশ, কিন্তু ইহার অবস্থান যথাযথভাবে নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। ইয়ুয়ান চুয়াঙ্গের চরিতের অনুবাদের পরিশিষ্টভাগে মুঁসো ষ্ট্যানিস্লাস্ জুলিয়েন একখানি প্রাচীন চৈনিক ভূচিত্র পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন ; তাহাতে হরিকেল সমতট ও উড়িষ্যার মধ্যভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন ; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—ভারতের পূর্ব্বসীমার নিকট হরিকেল প্রদেশে তিনি এক বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই হরিকেলেই এক বিশিষ্ট বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত মুসো ফুঁসে, তদ্রচিত ভারতের বৌদ্ধ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, নেপালে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর দুইখানি বৌদ্ধ পুথিতে বিভিন্ন শ্রীমূর্ত্তির ও দেবায়তনের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোখ্য রহিয়াছে, তাহার

বর্ণনা করিয়াছেন; ঐ পুথি দুইখানির একখানি কেম্ব্রিজে ও অপরখানি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের অনেকগুলি বাঙ্গালার,—এবং একখানি ছবি হরিকেলের শিলালোকনাথ নামে পরিচিত বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের পাষাণপ্রতিমার প্রতিকৃতি।

মোগল সাম্রাজ্যে যাহা সরকার বাকলা বলিয়া অভিহিত ছিল, সে প্রদেশের প্রাচীন নাম চন্দ্রদ্বীপ; উহা এক্ষণে বাখরগঞ্জ জেলার কতকাংশ।

চন্দ্রদ্বীপ নাম হইতেই প্রতীয়মান হয়, উহা প্রথমতঃ একটি দ্বীপ ছিল; কাহিনীতে চন্দ্রদ্বীপ চন্দ্রগোমিন নামে সুপ্রসিদ্ধ পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে,—তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও কলাবিদ ছিলেন, এবং বৌদ্ধ শিল্পকলার মূল সূত্র সম্বন্ধে তাঁহার বাক্য প্রামাণ্য ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে,—ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই, তাঁহার এ পরিমাণ জ্ঞানোন্নতি হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীকে সবিনয় কুশল প্রশ্ন করিয়াছিলেন। চন্দ্রগোমিনের বিষয়ে তারানাথ এক গল্প লিখিয়াছেন,—ব্যাকরণে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, কাব্যে ও কলায় চন্দ্রগোমিনের বিশিষ্টরূপ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখিয়া জনৈক নৃপতি তাঁহাকে প্রভূত ভূমি দান ও আপন কন্যা দান করেন। চন্দ্রগোমিন্ বৌদ্ধ দেবী তারার বিশেষ ভক্ত ছিলেন, এবং একদা দাসী তাঁহার পত্নীকে 'তারা' নামে সম্বোধন করিতেছে শুনিয়া, তাঁহার বিশেষ উপাস্যা দেবী তারার নাম যে রমণী ধারণ করেন, তাঁহার সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহার অন্তঃকরণে দ্বিধা উপস্থিত হয়। ইহাতে তাঁহার শ্বশুর তাঁহার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হয়েন, এবং তাঁহাকে বাক্সে বদ্ধ করিয়া গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করেন। তারা-মার অনুগ্রহে, গঙ্গার সাগর-সঙ্গমের সন্নিকটে এক দ্বীপের অভ্যুদয় হইল, গঙ্গায় নিমজ্জিত বাক্স সেই দ্বীপে আসিয়া ঠেকিল, এবং চন্দ্রগোমিনের নামে সেই দ্বীপের নাম হইল চন্দ্রদ্বীপ। চন্দ্রগোমিন তথায় কিছুকাল বাস করিলেন, এবং অবলোকিতেশ্বরের ও তারার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। ফুসের বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির ভিতর একখানি তারামূর্ত্তি চন্দ্রগোমিনের তারামূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন।

শ্রীচন্দ্রের যে তাম্রশাসনখানির আলোচনা করা যাইতেছে, তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ শান্তিবারিক শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে, পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত নাব্য মণ্ডলের অধীন নেহাকাষ্টি গ্রামে ভূমিদান করা হইয়াছে। ভোজবর্ম্মার বেলাব শাসনের এবং

সম্ভবতঃ হরিবর্ম্মার শাসনের বিষয়ীভূত ভূমিও পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন—বেলাব শাসনের লিপি অপেক্ষা শ্রীচন্দ্র-শাসনগুলির লিপি অধিকতর প্রাচীন প্রকৃতির, এবং তাহা হইতে বলিতে চাহেন যে,—চন্দ্ররাজগণ আসিয়া বর্ম্মরাজগণকে উন্মূলিত করিয়া থাকিতে পারেন।

এই শাসনে মণ্ডলের নিম্নস্থানীয় বিষয়ের কোনই উল্লেখ নাই।

শ্রীচন্দ্রের অপর তাম্রশাসনখানি বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর গ্রামে পরলোকগত গঙ্গামোহন সরকার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে সতট পদ্মাবত বিষয়ান্তর্গত কুমারটোলা মণ্ডলের লেলীয় গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। এই শাসনে কোনও ভুক্তির উল্লেখ নাই। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গানের উল্লেখ করিয়াছেন;—ঐ সকল প্রাচীন হস্তলিখিত গানের বহিতেও এক চন্দ্র-রাজবংশের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম শ্রীচন্দ্র-তাম্রশাসনখানির ন্যায় এই সকল গানের বহিতেও সুবর্ণচন্দ্র নামে এক রাজার নাম দৃষ্ট হয়; উক্ত শাসনে সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারিরূপে ত্রৈলোক্যচন্দ্র উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং উত্তরাধিকারক্রম নিম্নলিখিতরূপ অবগত হওয়া যায়:—

সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র
|

গানের বহিগুলিতে উত্তরাধিকারক্রম নিম্নলিখিতরূপ দৃষ্ট হয়:—

সুবর্ণচন্দ্র
|
ধদিচন্দ্র
|
মাণিকচন্দ্র
|
গোবিন্দচন্দ্র

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের রাজপুরুষগণের অনেক সময়ই একাধিক নাম থাকিত। সেইরূপ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণও দুই নামে পরিচিত ছিলেন,—ইহাই ধরিয়া লইলে এই সকল অনৈক্যের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

আবার উত্তরবঙ্গে ময়নামতির কতকগুলি গান প্রচলিত আছে, তাহাতে

ময়নামতি রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বা তিলকচাঁদের কন্যা এবং গোবিন্দচন্দ্রের জননী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পালরাজগণের অধীনে গৌড়ের রাজতন্ত্রে, ভারতের অপরাপর প্রদেশের ন্যায় সামন্ত-প্রথাই অবলম্বিত ছিল; এবং পরাক্রমশালী পাল-রাজচক্রবর্ত্তীর চতুর্দ্দিকে বাঙ্গালার বিহারের নানাস্থানে যে বহু স্থানীয় রাজবংশ বিদ্যমান ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহারা পালরাজের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক সামন্ত-নৃপতিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উৎসাহশীল ও উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর শক্তিকে দুর্ব্বল পাইলে ন্যূনাধিকপরিমাণে তাঁহাদিগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিবেশ-প্রদেশে আপনাপন অধিকার বিস্তৃত করিতেন।

পালসাম্রাজ্যের সামন্ত-প্রথা।

পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের অবস্থাও এইরূপ;—তাঁহারা আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। উড়িষ্যার প্রত্যন্তসীমায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালায় অন্যূন একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে 'শূর'-শেষ-নাম-বা-উপাধিযুক্ত এক স্থানীয় রাজবংশ বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজবংশের কেহ কেহ বিকল্পে বর্ম্ম উপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এই রাজবংশের সহিত সম্ভবতঃ উড়িষ্যার প্রাচ্য গঙ্গবংশের, ও যে রাজবংশ সিংহলে বহু সামন্ত নৃপতি প্রদান করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধ ছিল। এই শূর বা বর্ম্ম বংশ পালরাজগণের অধীন সামন্ত ছিলেন কি না, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া মধ্য ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার কতকাংশ, এবং হয় ত উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও কামরূপের কতকাংশেও আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রতিপালক ছিলেন; বিবাহ-সম্বন্ধে সেন রাজগণের সহিত অন্বিত ছিলেন;—সেন রাজগণ সম্ভবতঃ কল্যাণীর চালুক্যরাজের সামন্ত নৃপতিরূপে উড়িষ্যায় ও বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন। তথাপি তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক ভোজবর্ম্মা চালুক্যরাজের সহিত সমরাবদ্ধ চেদিরাজ কর্ণ কলচুরির দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই; এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে, চালুক্য রাজশক্তির গতিরোধ করিবার নিমিত্ত ভোজবর্ম্মা বিগ্রহপাল ও কর্ণের সহিত দলবদ্ধ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বালোচিত অংশ হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে,—তৃতীয় বিগ্রহপাল সমগ্র বাঙ্গালার রাজদণ্ড পরিচালন করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্য,

মহীপালের ও প্রথম মহীমপালের রাজ্যের ন্যায়, মগধে, উত্তর রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালের লেখমালা ও রজত-মুদ্রা।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রচিত রামচরিত কাব্যের টীকায় দেখিতে পাই, তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদিরাজ কর্ণ কলচুরির যৌবনশ্রী নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাতে ইহাও দেখিতে পাই, বিগ্রহপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজকুমারীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই গর্ব্ভে রামচরিত কাব্যের নায়ক রাজা রামপাল জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নৃপতি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ কর্ত্তৃক পরাভূত ও সিংহাসনচ্যুত হওয়ায় খৃষ্টীয় ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজশক্তির পতন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাষ্টকূটবংশোদ্ভূত এক সামন্ত-বংশ পাল-রাজগণের অধীনে মগধের কতকাংশে আধিপত্য করিত, এরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পাল রাজগণের সহিত রাষ্ট্রকূট রাজগণের সুচিরকালস্থায়ী ও বহু বিবাহ-সম্বন্ধের বিবেচনা করিয়া দেখিলে মগধে রাষ্ট্রকূটবংশোদ্ভূত স্থানীয় সামন্ত রাজ-বংশ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালের তিনখানি লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে দুইখানির বিষয় এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। উহার একখানি তাম্রশাসন সুপরিচিত; উহা দিনাজপুর জেলার আমগাছি গ্রামে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; উহাতে বিগ্রহ-পালের রাজ্যাব্দের ত্রয়োদশ বর্ষে ৯ই চৈত্র তারিখে খোদ্দিত দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ডবর্দ্ধন ভূমির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের ব্রাহ্মণী গ্রামের অর্দ্ধাংশ দানের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিগ্রহপালের রাজত্বকালের উল্লিখিত অপর লেখখানি গয়ার পবিত্র অক্ষয় বট বৃক্ষের মূলাবদ্ধ একখানি শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ আছে,—ইহাতে বিগ্রহপাল রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে বিশ্বাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক 'বতেশ' এবং 'প্রপিতামহেশ্বর' নামে দুইটি লিঙ্গমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার বিষয় লিপিবদ্ধ থাকা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগ্রহপালের রাজত্বের তৃতীয় লেখখানি বিহার নগরে প্রাপ্ত, এবং কলিকাতার যাদুঘরে (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে) রক্ষিত একটি শিলাময় বুদ্ধমূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে;—উহাতে বিগ্রহপালের রাজ্যাব্দের ত্রয়োদশ বর্ষে দেহক নামীয় জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার বিষয় লিপিবদ্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। পাটনা জেলার ঘোষবর নামক স্থানের মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্টমধ্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যত দূর জানিতে

পাওয়া যায়, তাহাতে বাঙ্গালার পালরাজগণের যে সকল মুদ্রা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই মুদ্রাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম; কিন্তু উহার পূর্ব্বে এইরূপ প্রসিদ্ধ রাজবংশের কোনও মুদ্রা ছিল না, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

শিল্প-শাস্ত্র।

যাহাতে শিল্পের প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি কথিত হইয়া থাকে, তাহা শিল্প শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। সুতরাং শিল্প শাস্ত্র জানিতে হইলে, প্রথমতঃ শিল্প কি, তাহা জানা আবশ্যক। অমর সিংহের উক্তি হইতে জানা যায়, কলা প্রভৃতি কর্ম্মের নাম শিল্প। (১) অমরকোষের টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত বলিয়াছেন,—"নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি প্রকার কলা', এবং আদি-শব্দের দ্বারা সুবর্ণকার প্রভৃতির কার্য্য অভিপ্রেত হইয়াছে। অমর সিংহ 'আদি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; টীকাকার তাহার উপর আর একটা আদি শব্দ খাড়া করিয়াছেন। উভয়ের উক্তিতেই শিল্প শব্দের প্রতিপাদ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইতেছে না। অমর সিংহ স্থানান্তরে 'কারু' এবং 'শিল্পী' এই উভয়কে এক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। (কারুঃ শিল্পী; শূদ্র বর্গ; ৫) এই স্থলেও টীকাকার মূলের অনুসরণ করিয়া একটি বচনের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহার সাহায্যেও অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই, অধিকন্তু পাঁচটিমাত্র জাতি শিল্প সম্পর্কে শিল্পী নামে অভিহিত হওয়ায় শিল্পের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। (২) কারণ, বচনের অর্থানুসারে সূত্রধার, তন্তুবায়, নাপিত, রজক ও কর্ম্মকার, এই পাঁচ জাতিমাত্রই শিল্পী। কিন্তু মনু প্রভৃতির গ্রন্থে শিল্প শব্দের ব্যাপক অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। মনু আপদবস্থায় শিল্পকে ব্রাহ্মণ

---

(১) শিল্পং কর্ম্ম কলাদিকম্।

(২) তক্ষা চ তন্তুবায়শ্চ নাপিতো রজকস্তথা।
পঞ্চমশ্চর্ম্মকারশ্চ কারবঃ শিল্পিনো মতাঃ।

প্রভৃতি সমস্ত জাতির জীবনোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) টীকাকার কুমুক ভট্ট বলিয়াছেন,- 'লিখন প্রভৃতি কর্ম্ম শিল্প'। মহাভারত-পাঠে জানা যায়, অজ্ঞাতবাসার্থ পাণ্ডবগণ বিরাট-রাজভবনে উপস্থিত হওয়ার পর বিরাট ভূপতি তাঁহাদের :প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কাহার কি শিল্প-জ্ঞান আছে? অনন্তর তাঁহাদের উত্তর ও বৃত্তি-ব্যবস্থা হইতে জানা যায়, পাশক-ক্রীড়া, পাককার্য্য, নৃত্যগীত, গবাশ্বপালন-কৌশল ও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প নামে অভিহিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের মতে, কারু শব্দে শিল্পী এবং শিল্প উভয়ই অভিহিত হইয়াছে (৪)। স্মৃতি শাস্ত্রে 'কারু' ও 'শিল্পী' এই উভয় পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ('যন্ত্রাকরে কারুকশিল্পিহস্তে'—বিষ্ণুসংহিতা)

"শীল্‌সমাধৌ" এই ধাতু হইতে ত প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে 'শিল্প' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (৫) ধাতুর অর্থ—'সমাধি'; অর্থাৎ, চিত্তের একাগ্রতা। সুতরাং নিপুণতাসহকারে যাহার উদ্ভাবন হয়, তাহা শিল্প। অমর সিংহ জ্ঞান ও বিজ্ঞান এতদুভয়ের যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাতেও যেন এই অর্থই প্রতিভাত হয়, (মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ)। অতএব, যাহারা উদ্ভাবক, তাহারা 'শিল্পী', এবং যাহারা কেবল শিক্ষাবলে অপরের উদ্ভাবিত বস্তুর নির্ম্মাণে সমর্থ, তাহারা 'কারু' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অবান্তর-ভেদ-স্বীকারের ফলে স্মৃতিশাস্ত্রে 'কারু' এবং 'শিল্পী' পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। কোষ গ্রন্থে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং 'কারু' ও 'শিল্পী' এক পর্য্যায়েই পঠিত হইয়াছে। প্রতিভোত্থাপিত নিজের অথবা পরের প্রীতিপ্রদ ব্যাপারবিশেষ ও তন্নিষ্পন্ন পদার্থ শিল্প, শিল্পের এইরূপ লক্ষণ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

পাণিনির ব্যাকরণে শিল্পার্থে অনেকগুলি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তাহাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের ও শিল্পীর অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'শিল্পম্" ।৪।৪।৫৫। শিল্পার্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়। শিল্পিনি বা কৃঞঃ ।৬।২।৭৬। উদাহরণ, তন্তুবায়, তুন্নবায়। শিল্পিনি ষ্ণুন্। শিল্পি

(৩) বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ॥

(৪) কারুস্তু কারকে শিল্পে বিশ্বকর্ম্মণি শিল্পিনি।

(৫) খপ, শিল্প, সপ্প, বাষ্প, রূপ, পর্পতল্পাঃ। ৩৫০ উং। শিল্পং কৌশলং শীলসমাধৌ। —সিদ্ধান্ত কৌ।

কর্ত্তা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ণ্বুণ্ প্রত্যয় হয়। নর্ত্তক, খনক, রজক, ইত্যাদি।

অমর সিংহ প্রভৃতির মতে শিল্প ও কলা এক পদার্থ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রান্তরে শিল্প ও কলা এতদুভয়ের পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুক্রনীতিসারে কথিত হইয়াছে যে, প্রাসাদ, প্রতিমা, উপবন, গৃহ ও বাপী প্রভৃতির নির্ম্মাণপ্রণালী যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহার নাম শিল্প শাস্ত্র। (৬) কাচপাত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণের উপদেশ যাহাতে আছে, তাহার নাম কলা শাস্ত্র। (৭) শুক্রনীতিসারে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, বিদ্যা এবং কলা উভয়ই অনন্ত; ইহাদের সংখ্যা করিবার শক্তি কাহারও নাই। তন্মধ্যে প্রধান বিদ্যা দ্বাত্রিংশৎ, এবং প্রধান কলা চতুঃষষ্টিসংখ্যক। (৮)

শুক্রনীতিসারে বিদ্যার ও কলার যে পার্থক্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, যাহা সম্যক্ বাচিক, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারসাধ্য, তাহা 'বিদ্যা.'; পক্ষান্তরে যাহা মূক ব্যক্তিও সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা 'কলা' নামে অভিহিত হয়। উক্ত লক্ষণানুসারে গীত প্রভৃতি বিদ্যা এবং নৃত্যবাদ্যাদি কলা বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু গ্রন্থান্তরে এই মতের বৈপরীত্য উপলব্ধ হয়। বামন-কৃত 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' পাঠে জানা যায়, গীত, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতির নাম কলা; উক্ত কলার অভিধায়ক শাস্ত্র, (যাহা বিশাখিল প্রভৃতি মনীষি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে) কলা শাস্ত্র। (১০) গোপেন্দ্রত্রিপুরহর-বিরচিত 'কাব্যালঙ্কারকামধেনু' নামক বামনসূত্র-বৃত্তির টীকায় কথিত হইয়াছে যে, নৃত্যগীত প্রভৃতি কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি, ও উপকলার সংখ্যা চারি শত। টীকাকার ভামহের গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টি কলার নাম নির্দ্দেশ

---

(৬) প্রাসাদপ্রতিমা-রামগৃহবাপ্যাদিসৎকৃতিঃ।
কথিতা যত্র তচ্ছিল্প-শাস্ত্রমুক্তং মহর্ষিভিঃ॥ ৪।৩।৫৮।

(৭) কাচপাত্রাদিকরণ-বিজ্ঞানন্তু কলা স্মৃতা। ১৫।

(৮) বিদ্যাহ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪।৩।২৩।

(৯) যদ্যৎস্যাদ্বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞিতম্।
শক্তো মূকোপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎ স্মৃতম্॥ ২৫।

(১০) কলাশাস্ত্রেভ্যঃ কলাতত্ত্বস্য সংবিৎ।১।৩।৭॥
কলা গীতনৃত্যচিত্রাদিকাঃ তাসামভিধায়কানি শাস্ত্রাণি বিশাখিলাদিপ্রণীতানি কলাশাস্ত্রাণি।—বৃত্তিঃ।

করিয়াছেন। (১১) তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এবং শ্রীধরস্বামিকৃত ভাগবতের টীকায় কলার যে সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ দেখা যায়, ভামহোক্ত শ্লোকে পরিগণিত নামের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয় না। শ্রীধরস্বামীর উক্তি এই স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল, যথা 'গীত ১, বাদ্যং, ২ নৃত্যং, ৩ নাট্যং, ৪ আলেখ্যং, ৫ বিশেষকচ্ছেদ্যং, ৬ তণ্ডুলকুসুম-বলিবিকারাঃ, ৭ পুষ্পাস্তরণম্, ৮ দশন-বসনাঙ্গরাগাঃ, ৯ মণিভূমিকাকর্ম্ম, ১০ শয়নরচনম্ ১১ উদকবাদ্যমুদকঘাতঃ, ১২ চিত্রযোগাঃ, ১৩ মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ, ১৪ শেখরাপীড়যোজনম্ ১৫ নেপথ্যযোগাঃ, ১৬ কর্ণপত্রভঙ্গাঃ, ১৪ সুগন্ধযুক্তিঃ, ১৮ ভূষণযোজনম্, ১৯ ঐন্দ্রজালম্, ২০ কৌমারযোগাঃ, ২১ হস্তলাঘবম্, ২২ চিত্র-শাকাপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়াঃ ২৩ পানকরসরাগাসবযোজনম্ ২৪ সূচীবায়-কর্ম্ম, ২৫ সূত্রক্রীড়া, ২৬ বীণাডমরুকবাদ্যানি, ২৭ প্রহেলিকা, ২৮ প্রতিমালাস্যং, ২৯ দুর্ব্বাকযোগঃ, ৩০ পুস্তকবাচনম্, ৩১ নাটকাখ্যায়িকাদর্শনম্, ৩২ কাব্যসমস্যা-পূরণম্, ৩৩ পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্পাঃ, ৩৪ তর্কুকর্ম্মাণি, ৩৫ তক্ষণম্, ৩৬ বাস্তুবিদ্যা, ৩৭ রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ৩৮ ধাতুবাদঃ, ৩৯ মণিরাগজ্ঞানম্, ৪০ আকরজ্ঞানম্, ৪১ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ, ৪২ মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ, ৪৩ শুকসারিকাপ্রলাপনম্, ৪৪ উৎসাদনম্, ৪৫ কেশমার্জ্জনকৌশলম্, ৪৬ অক্ষরমুষ্টিকা-কথনম্, ৪৭ ম্লেচ্ছিত-কুতর্কবিকল্পাঃ, ৪৮ দেশভাষাজ্ঞানম্, ৪৯ পুষ্পশকটিকানির্ম্মিতিজ্ঞানম্, ৫০ যন্ত্রমাতৃকাধারণমাতৃকা, ৫১ সংবাচ্যম্, ৫২ মানসীকাব্যক্রিয়া, ৫৩ অভিধানকোশঃ,

---

(১১) নৃত্যং গীতং তথা বাদ্যমালেখ্যং মণিভূমিকাঃ।
দশনাঙ্গরাগশ্চ মাল্য-গুম্ফবিচিত্রতা।
বেণুবীণাদিকালাপপাটবং শেখরক্রিয়া।
নেপথ্যং গন্ধযুক্তিশ্চ কর্ণপত্রক্রিয়াভিধা।
বিশেষচ্ছেদ্যকল্পিশ্চ নানাভূষণযোজনম্।
ইন্দ্রজালং কৌচুমারঃ সামুদ্রং হস্তলাঘবম্।
সূচীবানক্রিয়া সূত্র ক্রীড়া সলিলবাদ্যকম্।
রূপশাস্ত্রপরিজ্ঞানং শারিকাশুকবাদনম্।
রসবাদো বাস্তুবিদ্যা তক্ষণং মেচিকোৎকরঃ।
সজীবনির্জীবদ্যূতশাস্ত্রং সম্পাঠ্যপাটবম্।
ধারণামাতৃকাযন্ত্রং মাতৃকাকাব্যলক্ষণম্।
আকর্ষকক্রীড়িতঞ্চ নিমিত্তাগমবেদনম্।
অগ্ন পুংসেনাদিস্তম্ভো বিষপ্রতিবিষাগমঃ।
পাকালীনৃত্যকরণং তণ্ডুলাদিবলিক্রিয়া।
প্রহেলিকা দুর্ব্বচকপ্রতিমায়াদিযোজনম্।
মন্ত্রবাদপরিজ্ঞানং বিশীর্ণাক্ষরমুষ্টিকা।
সর্ব্বাভিধানকোষোক্তিঃ পরকায়প্রবেশনম্।
অঙ্গব্যায়ামচিত্রাপ্তিঃ পত্রিকাচিত্রকর্ত্তনম্।
রত্নোৎপত্তিস্থানশাস্ত্র, দর্পণাদিলিপিক্রিয়া।
তিরস্করিণ্যাপ্তাবাপ্তিঃ পুষ্পশার্টিককাগমঃ।
হস্ত্যশ্বলক্ষণজ্ঞানং চৌর্য্যগুপ্তপরিচ্ছেদনম্।
পরোক্তিপরিজ্ঞানং জলযানাগমজ্ঞতা।
পরচেতঃপ্রবেশশ্চ চতুঃষষ্টি রিমাঃ কলাঃ।
অন্যাস্তুপকলাঃ প্রোক্তাস্তাসাংসংখ্যা চতুঃশতম্।
অত্রত্য পাঠ নির্ভুল আছে বলিয়া মনে হয় না।

৫৪ ছন্দোজ্ঞানম্ ৫৫ ক্রিয়াবিকল্পাঃ ৫৬ ছলিতকযোগাঃ ৫৭ বস্ত্রগোপনানি ৫৮ দ্যূতবিশেষঃ ৫৯ আকর্ষক্রীড়া ৬০ বালক্রীড়ণকানি ৬১ বৈনায়িকীনাং ৬২ বৈজয়িকীনাং ৬২ বৈতালিকীনাঞ্চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্ ৬৪। ইতি চতুষষ্টিঃ কলাঃ।' শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে, 'এই চতুঃষষ্টি কলা শৈবতন্ত্রোক্ত।' (দশমস্কন্ধ ৪৯ অ ৩৫ শ্লোক টীকা) পুস্তকভেদে শ্রীধরস্বামিকৃত পাঠেরও কতক পার্থক্য দেখা যায়। বাচস্পত্যাভিধানে এবং মুদ্রিত ভাগবতের টীকায় পাঠান্তর আছে। ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি দিনে গুরুর নিকট উক্ত চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কাদম্বরী কাব্যপাঠে জানা যায়, নায়ক চন্দ্রাপীড় সমস্ত বিদ্যা এবং সমস্ত কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কবি বাণভট্ট-বর্ণিত কলার মধ্যে পদ (ব্যাকরণ শাস্ত্র), বাক্য (মীমাংসা শাস্ত্র), প্রমাণ (ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্র), ধর্ম্ম শাস্ত্র, রাজনীতি শাস্ত্র, ব্যায়াম বিদ্যা, অস্ত্র বিদ্যা, রথচর্য্যা, গজারোহণ, ঘোটকারোহণ, বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্য, ভরতাদি-প্রণীত নৃত্য শাস্ত্র, নারদীয় প্রভৃতি গান্ধর্ব্ব বেদবিশেষ (সঙ্গীত শাস্ত্র), হস্তিশিক্ষা, তুরগবয়োজ্ঞান, পুরুষলক্ষণ, চিত্র কর্ম্ম, যন্ত্রচ্ছেদ্য, পুস্তকব্যাপার, লেখ্য কর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার দ্যূতকলা, গন্ধ শাস্ত্র, শকুনিরুত-জ্ঞান, (কাকচরিত্র বিদ্যা) গ্রহগণিত, রত্নপরীক্ষা, দারুকর্ম্ম, দন্ত ব্যাপার, বাস্তবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, মন্ত্রপ্রয়োগ, (তন্ত্রশাস্ত্র), বিষাপহরণ, সুরঙ্গোপভেদ (সুরঙ্গ-খনন বিদ্যা), তরণ (সাঁতার), লঙ্ঘন, প্লুতি (ভেকের মত গতি), আরোহণ, রতিতন্ত্র, ইন্দ্রজাল, কথা, নাটক, আখ্যায়িকা, কাব্য, মহাভারত পুরাণেতিহাস রামায়ণ, সর্ব্বলিপি, সর্ব্বদেশভাষা, সর্ব্ব সংজ্ঞা (সাঙ্কেতিকশব্দ-বোধক শাস্ত্র), অন্যান্য শিল্প ও অন্যান্য কলা।

দশকুমারচরিতে কুমাররাজ বাহনের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে চৌর্য্য বিদ্যাও পরিগণিত হইয়াছে। উহাও এক প্রকার কলা। আর্য্য সাহিত্যে কর্ণীসুত এই বিদ্যার প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহার অপর নাম করটক ও স্তেয়-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক। বিপুল ও অচল, এই দুই নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার দুই জন সখারও পরিচয় পাওয়া যায়। (১২) ইনি কলাঙ্কুর নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি স্তেয় রূপ কলার উদ্ভাবক, এই জন্য ইঁহার 'কলাঙ্কুর' নাম হইয়াছে। (১৩) কিন্তু মৃচ্ছকটিক প্রকরণে বর্ণিত শর্ব্বিলকের বৃত্তান্ত

(১২) কর্ণীসুতঃ করটকঃ স্তেয়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ। তস্য খ্যাতৌ সখায়ৌ যৌ বিপুলাচলসংজ্ঞকৌ।

(১৩) কলাঙ্কুরঃ স্তেয়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকে মূলদেবে কর্ণীসুতে। মূলদেবস্য স্তেয়রূপ-শিল্প-প্রবর্ত্তকত্বাৎ কলাঙ্কুরত্বং। (বাচস্পত্য)

হইতে জানা যায়, কার্ত্তিকদেব চৌর্য্য শাস্ত্রের উপদেষ্টা। চোরগণ স্কন্দপুত্র অর্থাৎ কার্ত্তিকের পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণসন্তান শর্ব্বিলক চারুদত্তের ঘরে সন্ধি কাটিবার উপক্রমে অভীষ্ট দেবতাকে এবং গুরুকে নমস্কার করিয়াছেন,—'নমো বরদায় কুমারকার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায়, যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ।' এই নমস্কারবাক্যে বরদ, কনকশক্তি, ব্রহ্মণ্যদেব ও দেবব্রত, এই কয়টি কার্ত্তিকেরই বিশেষণ। ভাস্কর নন্দী ও যোগাচার্য্য একই ব্যক্তি। উক্তযোগাচার্য্যই কার্ত্তিকেয় দেবের প্রথম শিষ্য বলিয়া পরিচিত। শর্ব্বিলকের বৃত্তান্তে এবং দশকুমারচরিতের বর্ণনায় বুঝা যায়, মধ্য যুগের সাহিত্যে চৌর্য্যবিদ্যার বর্ণনা একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং চৌর্য্য শিল্পও ঐ সময়ে উন্নতির পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছিল!

মৃচ্ছকটিকে 'সংবাহন' (হস্তপদাদিমর্দ্দন) নামক আর এক প্রকার কলার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রদর্শিত চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে এক একটি কলার উপদেষ্টা বহু আচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে বাস্তুশাস্ত্র-প্রণেতা আঠার জন আচার্য্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র ও বৃহস্পতি। (১৪)

অতি প্রাচীনকালে প্রত্যেক শিল্প কলার সূত্রগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের নানা স্থানে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনি-ব্যাকরণের 'পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' ।৪।৩।১০৯। 'কর্ম্মন্দ 'কৃশাশ্বাদিনিঃ।' ৪।৩।১১১। এই সূত্রদ্বয়ের অর্থ হইতে জানা যায়, 'শিলালি' ও 'কৃশাশ্ব' এই মুনিদ্বয় 'নটসূত্র' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাহারা শিলালির নটসূত্র অধ্যয়ন করিত, তাহারা 'শৈলালি' নামে ও যাহারা কৃশাশ্বের নটসূত্র অধ্যয়ন করিত, তাহারা 'কৃশাশ্বি' নামে অভিহিত হইত।

---

(১৪) ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ॥
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রবৃহস্পতী॥
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ। ২০—২৫২।

নাট্যাচার্য্য ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র সুধীসমাজে সুপরিচিতই আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-পাঠে জানা যায়, নারায়ণ মুনি চিত্রকলার সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং ঐ সূত্র বিশ্বকর্ম্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রত্যেক সূত্র গ্রন্থেরই মূল বেদের ব্রাহ্মণভাগে এবং প্রাচীনতম তন্ত্র শাস্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায়, মহর্ষি নারদ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট বল।" তখন নারদ অধীত গ্রন্থ ঋগ্বেদ প্রভৃতির নাম-কথনের সঙ্গে 'সর্পজনবিদ্যার'ও উল্লেখ করিয়াছিলেন। (১৫) তন্মধ্যে সর্পবিদ্যা গারুড় শাস্ত্র, এবং দেবজনবিদ্যা গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতপ্রণালীও নৃত্য গীত বাদ্য শিল্পাদির বিজ্ঞান। (১৬)

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

এযার কবি।

বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে স্ত্রীবিয়োগের কবিতা এক অভিনব সৃষ্টি। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা প্রেম-ভালবাসার সঙ্গীতে কাব্য-কুঞ্জ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে যুগের গীতিকবিতার পরিণতি যে পত্নী-বিলাপে, ইহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। সন ১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে এই শোক-সঙ্গীতের জন্ম। যে তিন জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পত্নীবিয়োগে বঙ্গভাষা কাব্যাকারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই তিন জন কবিই প্রৌঢ়াবস্থায় সন্তপ্ত হৃদয়ের যাতনা শ্মশান-সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১০ সালে ও অক্ষয়কুমার ১৩১৩ সালে বিপত্নীক হন। এই তিন জন সম-সাময়িক কবির জীবদ্দশায় স্ত্রীবিয়োগ না ঘটিলে, তাঁহাদের প্রতিভা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনায় ব্যাপৃত ছিল, তাহাতে ঠিক এরূপ শোকোচ্ছ্বাসময় গীতি-কবিতা-রচনার অবসর হইত না। দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত এই শ্রেণীর কবিতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি খণ্ডকবিতায় পরলোকগতা পত্নীর জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের 'স্মরণ'

---

(১৫) সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।

(১৬) সর্পদেবজনবিদ্যা—সর্পবিদ্যাং গারুড়ং দেবজনবিদ্যাং গন্ধযুক্তি-নৃত্যগীতবাদ্য-শিল্পাদিবিজ্ঞানানি।—শাং ভাঃ।

নামক নিবন্ধে সেই কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে; অক্ষয়কুমারের 'এষা' কিন্তু একখানি সুসম্পূর্ণ স্ত্রীবিলাপ কাব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বিপত্নীক অবস্থায় আরও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখনী এখনও বিষয়বৈভবে গরীয়সী। অক্ষয়কুমারের 'এষা' কিন্তু কবির শোকদগ্ধ হৃদয়ের শেষ কথা। অক্ষয়কুমার তাঁহার কবি-জীবনের শেষ কাব্যখানির 'এষা' নাম দিয়াছেন। এই নামের অর্থ তিনি নিজেই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে বলিয়া দিয়াছেন। 'এষা—ইষ্ ধাতু-নিষ্পন্ন; বৈদিক অর্থ—অন্বেষণীয়া, প্রার্থনীয়া, বাঞ্ছনীয়া।' বাস্তবিক, এষা কাব্যের আসল বস্তু কবির যে নিভান্ত প্রার্থনীয়, তাহা ইহার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।—

'জীবনে চাহি না কিছু আর,
শুধু তারে দেখি একবার
একবার তার মুখখানি!'

কবি 'এষা'র জন্য বহু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার দেখা পান নাই।—

'সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার!
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কত রোগে শোকে
খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার!'

অক্ষয়কুমারের স্ত্রীবিয়োগের কবিতাগুলিতে কেবল যে এষা নামের সার্থকতা সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগের কবিতাগুলির সহিত বয়সে ও ভাবের ঐক্যে এষা-কাব্যের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যদ্দারা বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন সূচিত হইতেছে। এষা-কাব্য অক্ষয়কুমারের কবি-জীবনের ট্রেজেডি। বঙ্গদেশের কাব্যকানন যে তিন জন শ্রেষ্ঠ কবি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ প্রেমের সৌরভে, হাসির উল্লাসে, স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য-প্রভায় পুলকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দৈববিড়ম্বনায় সেই তিন জন কবিই জীবনের শেষভাগে শোকের করুণ-সঙ্গীতে কবি-হৃদয়ের ট্রেজেডি বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বিপত্নীক জীবনের কবিতাগুলির ভিতর দিয়া এক নূতনতর ভাবের স্রোত প্রবাহিত। অক্ষয়কুমারের ন্যায় তাঁহারা নিজেদের এষার বিরহে কাতর হইয়া যে সকল গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, সেই কবিতাগুলি ছাড়া তাঁহাদের বিপত্নীক জীবনের অন্যান্য রচনাতেও বৈরাগ্য-মিশ্রিত করুণ রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায়। যুগবিশেষের কাব্য সমসাময়িক

জাতীয় জীবনের দর্পণস্বরূপ, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, এই তিন জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবির শেষ জীবনের রচনায়, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নেপথ্যে এক্ষণে যে ট্রেজেডির সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যায়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। জাতীয় জীবনে ট্রেজেডির সূত্রপাত হইলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারে না। কবিরা কতকটা ঋষিদিগের ন্যায় দ্রষ্টা, আর সেই কারণেই জনসাধারণের অগোচর অনেক ব্যাপার তাঁহাদের কাব্যে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। জীবনের সান্ধ্যগগনে বিরহের ছায়া পড়িয়া এই কবিত্রয়ের রচনায় কেমন একটা উদাসভাব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। অক্ষয়কুমারের এষায় এই উদাসভাব ঘনীভূত হইয়া যে ট্রেজেডির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার তুলনা বর্ত্তমান যুগের অপর কোনও বাঙ্গালী কবির রচনায় পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমারের কবি-হৃদয়ে বিষাদের ছায়া স্তরে স্তরে পত্নী কন্যা ও পরিজনের শোকস্মৃতির যে ঘনান্ধকার রচনা করিতেছিল, এষা কাব্যে তাহার বিকাশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। কবির জীবনের শেষাঙ্কে ট্রেজেডির শেষ দৃশ্য।—

'আমি রোগে দুঃখে শোকে,
গোধূলির ক্ষীণালোকে,
করজোড়ে করিতেছি মরণে মিনতি!'

এষা কাব্যের বিশেষত্ব—ইহার অকপট আন্তরিকতায়। অক্ষয়কুমার স্ত্রীবিয়োগে যে মর্ম্মান্তিক শোক অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাহা দুর্ব্বোধ ভাব বা ভাষার আবরণে ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন নাই। তীব্র শোকের আকস্মিক আঘাতে কবির হৃদয় যে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বিলাপোক্তির প্রতি বর্ণে প্রকাশ পাইতেছে। হৃদয়ের অধীরতা সংযম না মানিয়া একটা অস্বাভাবিক শোকগাথা রচনা করে নাই। কল্পনার কুহক শোক-কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়কে অপ্রকৃত বর্ণে রঞ্জিত করিবারও অবসর পায় নাই।

'সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী;—
চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি কবিত্ব-মন্দিরে;
ল'য়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে।
নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক;
বাস্তব জগৎ এই, মর্ম্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক;
মানবীর তরে কাঁদি—যাচি না দেবতা!'—(নিবেদন)

এষা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙ্গালীর পরলোকগতা পত্নীর চিত্র। অক্ষয়কুমারের এষা-চিত্রে বাস্তবের সৌন্দর্য্য সত্যের গরিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাল্পনিক প্রেমের বিশ্বব্যাপী অধিকার হইতে পারিবারিক প্রেমের ক্ষুদ্র উদ্যানবাটীর দিকে গীতি-কবিতা যে দিন ব্যথিতহৃদয় কবির সহিত ফিরিয়া আসিল, বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে সে এক স্মরণীয় দিন। 'একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা' বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী 'দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি' লইয়া জীবনে যাহা করিতে পারেন নাই, মরণে তাহা সাধিয়াছেন। কবির আত্মগ্লানিতে এই ভাব পরিস্ফুট।—

'প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চতরে!
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি!'

বাঙ্গালী কবির প্রতিভা এত দিন ঔপন্যাসিক প্রেম ভালবাসার কাল্পনিক আদর্শ রচনা করিতেছিল। অক্ষয়কুমার এষায় জীবন্ত আদর্শকে পূর্ণরূপে দেখাইয়াছেন। এষা বর্ত্তমান বঙ্গীয় কাব্যজগতে সেই কারণে একখানি অতুলনীয় কাব্য গ্রন্থ। অক্ষয়কুমারের পূর্ব্বে এই যুগে অপর কোনও বাঙ্গালী কবি জীবন-মরণের সমস্যার এমন সূক্ষ্মভাবে মীমাংসা করেন নাই। অথচ, কবির যাহা শোক, তাহার দৃশ্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নিত্য অভিনীত হইতেছে। স্ত্রীবিয়োগে অক্ষয়কুমারের অন্তরে যে শোক জাগিয়া উঠিল, সে শোকের চিত্রে কেবল গৃহিণীশূন্য বিশৃঙ্খল সংসারের দৃশ্য স্থান পায় নাই। পরিবার্ষিক ঘটনাকে উপেক্ষা করিয়া কবি নিজের ক্ষতচিহ্নের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন নাই। বাস্তবিক, অক্ষয়কুমারের সহৃদয়তার গুণে তাঁহার শোক সংক্রামক হইয়াছে। এষা কাব্য পড়িতে পড়িতে পুত্র-হারা স্থবিরা জননীর শোকে, নবীনা যুবতীর বৈধব্যে, মাতৃহীন শিশুর ক্রন্দনে আমাদের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। কবির শোক যেমন গভীর, তেমনই ব্যাপক। অক্ষয়কুমার যদি হিন্দু না হইতেন, তাহা হইলে দারুণ শোকের স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া হয় ত তিনি প্রলাপোক্তিতে এষাকাব্য সমাপ্ত করিতেন; নয় ত অতীতের চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া শোকের ভস্মস্তূপ রাখিয়া যাইতেন। এষার বিলাপসঙ্গীতে হাহাকারের ভিতর দিয়াও সান্ত্বনার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' পড়িয়া অক্ষয়কুমার কিন্তু সান্ত্বনা লাভ

করিতে পারেন নাই। 'পুরাতনে নূতনে মিলায়ে, ফেলিতেছি সকলি ঘুলায়ে—,' মনের এই অবস্থায় তিনি হিন্দুর আজন্ম বিশ্বাসের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।—

'কেন শোকে, মূঢ়ের মতন,
ত্যজিয়া বিশ্বাস সনাতন,
কবি হাহাকার?
ল'য়ে নিজ ভ্রান্ত মতামত
কেন—কেন আত্মহত্যা-পথ
করি পরিষ্কার?'

ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করিয়া বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী কবিরা মৃত্যুর পরপার সম্বন্ধে যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা হইতে এক অক্ষয়কুমার ছাড়া অপর কেহ যে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এমন মনে হয় না। টেনিসন 'ইন্ মেমোরিয়মে' পরলোকে মৃতের সহিত পুনর্মিলন ও মন্দের পর একটা অনিশ্চিত ভালর কল্পনা করিয়াছেন। ইংরাজ কবির খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এই পরলোক-তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এদেশের অনেক ভাবুক কবি জীবন-মরণের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর তাহার ফলে কাব্য-সংসারে কতকগুলি বিচিত্র অসম্পূর্ণ ভাবের কবিতা জন্ম লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমার হিন্দুত্বের দাবী করেন। তাঁহার নিকট ইহ-পরলোকের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই। যে কবির হৃদয় শ্রাদ্ধতর্পণাদির আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ, তাঁহার শোকে সান্ত্বনা আছে, নৈরাশ্যে শান্তি আছে, সংশয়ে বিশ্বাস আছে। অক্ষয়কুমার এষার শেষ কবিতায় প্রেমময়ের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু কবির হৃদয় গলিয়া বাহির হইয়াছে। সাধনার ফলে তিনি জীবনের শেষভাগে শোক জয় করিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা, মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কবির প্রার্থনার শেষ শ্লোকে ট্রেজেডি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।—

'ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ!
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ!
এখনো সে যুক্ত-করে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্ব্বাদ।'

এইখানেই কবির জীবন-কাব্যের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-বিয়োগের কবিতা করুণরসাত্মক, তাহাতে ট্রেজেডির উপকরণ আছে, অভিব্যক্তি নাই। শোকমাত্রই ট্রেজেডি নয়। প্রিয়জনের বিরহে অন্তর্জগতে যখন বিপ্লব উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে, তখন শোক ট্রেজেডিতে পরিণত হয়। আবার যখন শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ রক্তাক্ত হৃদয়কে মধুময় করিয়া তুলে, তখন ট্রেজেডি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে; বিরহ তখন বাঞ্ছনীয় বরণীয় বলিয়া মনে হয়। কাব্য-জগতে সেই কারণে ট্রেজেডির এত আদর। অক্ষয়কুমার কোনও তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া এষার ট্রেজেডি রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে তাঁহার শোকে কৃত্রিমতার আরোপ করা হয়। তীব্র শোকে তাঁহার হৃদয় কিছু দিনের জন্য অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কবির আজন্ম বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছিল।—

'এ নহে দেবের দয়া—দৈ ভার পীড়ন।
গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন!
মরণের পথে আর—
দূরে ফেলি ঘৃণা লাজ,
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ?
* * * * *
হৃদি-হীন বিধির কি দুর্ব্বোধ সৃজন!
নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আসুরক্তি
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—স্বপ্ন দরশন!
উন্মত্ত কবির মত,
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
লয়ে' এক অন্ধশক্তি—কল্পনা ভীষণ!'

গৃহদেবতাকে সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে মনে হয় যে, অন্তর্বিপ্লবে অক্ষয়কুমারের মন হইতে কিয়ৎকালের জন্য হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ভগবদ্‌ভক্তিও লোপ পাইয়াছিল।—

'ত্যজ গৃহ, যাও নিজ স্থান।
আমি আর পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না
তোমা মত হইতে পাষাণ।

গেছে সুখ, গেছে প্রীতি ; আছে বুকভরা স্মৃতি,
যাবে দিন করি তার ধ্যান।'

কবির মনে সংশয় ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই সংশয়, সনাতন ধর্ম্মে অবিশ্বাস, কবির হৃদয়ের কতটা দৈন্য, কতটা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে! কবির আত্মগ্লানি, অনুতাপ, বিধাতার প্রতি অনুযোগ, কতটা অন্তর্দাহ ব্যক্ত করিতেছে! কবির অবসন্ন হৃদয় শেষে মৃত্যুকেও কামনা করিয়াছে। কবিতার পর কবিতার মধ্য দিয়া যে ট্রেজেডি রচিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ চিত্র বর্ত্তমান যুগের বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এবার উপসংহারে ট্রেজেডির সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণবিকাশ। অবলম্বনশূন্য কাতর হৃদয় শান্তির ভিখারী হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের তাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক, কবি ও উপদেষ্টার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে, কিন্তু কোথাও হৃদয়-ব্যাধির প্রকৃত ঔষধ পায় নাই। মানব-হৃদয়ের এই যে অনন্ত বাসনা, বারংবার বিফলমনোরথ হইয়াও শোকজয়ের জন্য এই যে উদ্যম, সংশয় অবিশ্বাস অমঙ্গল অশান্তি বিদ্রোহ বিপ্লবকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার জন্য এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইহাই মানব-জীবনের ট্রেজেডির আদি, মধ্য ও অন্ত। অমর কবি দান্তের ন্যায় যুগব্যাপী সাধানার ফলে অক্ষয়কুমার শেষে এবার সন্ধান পাইলেন। শরৎসমাগমে আকাশ যখন নির্ম্মল হইল, সমীরণ সৌরভে আকুল হইয়া উঠিল, সেই সময়ে কবি একদিন প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গনের ধারে দাঁড়াইয়া 'যুক্ত-করে, নেত্র-নীরে' দেবীর বন্দনা করিলেন, আর কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—

'কর, মা গো, এ শোক মোচন!
মুছিয়া নয়ন-জলে হাসে ধরা ফুলে ফলে,
কাঁপে বুকে শ্যামল বসন।
পূজিতে ও রাঙ্গা পদ বিল-ভরা কোকনদ,
জবা-ভরা মালঞ্চ, অঙ্গন।'

তাহার পর যে দিন—

'ঘরে ঘরে পুরাঙ্গনা দেছে দ্বারে আলিপনা,
পূর্ণ-কুম্ভ, পল্লব-গ্রন্থন।
পূজা-গৃহে, গ্রাম-মাঝে, মন্দির বাজনা বাজে,
মা মা ধ্বনি—শুভ সন্ধিক্ষণ।'

সেই দিন, সেই মহাষ্টমীতে—'শুভ সন্ধিক্ষণে'—

"কি সম্ভ্রমে—কি আতঙ্কে—নত-জানু ভূমি-অঙ্কে,
সঘনে শিহরে প্রাণ-মন।

সে যেন গভীর খাসে, ছায়া সম বসি' পাশে,
ম্লান-মুখ উপবাসে,
গদ-বন্ধে—আমা সনে যাচে শ্রীচরণ!'

অতীত ও ভবিষ্যতের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে এবার সহিত মুহূর্ত্তের মিলনে বিরহীর হৃদয় হইতে শোকের গুরুভার চিরকালের তরে সরিয়া গেল। যে মেঘ অক্ষয়কুমারের হৃদয়কে এতদিন ঘিরিয়া ছিল, মিলনের অনুভূতি তাহাকে নিমেষের মধ্যে মুছিয়া ফেলিল। স্মৃতি অনুভূতিতে পরিণত হইল। কবির শূন্য হৃদয় সেই মিলনানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে অতীত ও বর্ত্তমান, মৃত ও জীবিতের মধ্যে সময়ের কোনও ব্যবধান আছে কি না, সে সম্বন্ধেও কবির সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি কোনও ব্যবধান থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে ব্যবধান দূরত্ব হিসাবে নগণ্য। 'এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়—হয়,' আর এবা ?

'এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!'

জীবনে মরণে সন্ধি হইয়া গিয়াছে; ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুর বিভীবিকাময়ী মূর্ত্তি কবির নিকট কল্পিত বলিয়া মনে হইল। শেষে যখন তিনি বুঝিলেন যে, মৃত্যু 'প্রেম হ'তে মধুময়', তখন এবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি!
তুমি যাহে দেছ পদ—
সে যে কুন্দ-কোকনদ!
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কভারে মৃত্যু কেন বিশপতি ?'

অক্ষয়কুমার বহির্জগতেও যে নূতন প্রাণের সাড়া পাইলেন, তাহাতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ নূতন কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল। মিলনের সুখে, মিলনের আনন্দে, মিলনের অনুভব-তৃপ্তিতে কবির অন্তর বাহির কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

'ভুলে গেছে নর—আপনার কথা,
আপনার সুখ, আপনার ব্যথা ;
প্রাণ যেন পায় প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধরে না !'

অনন্তরহস্যময়ী প্রকৃতি দেবী অবগুণ্ঠন সরাইয়া ফেলিলেন। কবি মূল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন প্রত্যক্ষ করিলেন। কবি নিজের ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারিয়া ডাকিয়া কহিলেন,—'কোথা—তুমি বিশ্বস্বামী! কোথা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি! কত তুচ্ছ—সুখ দুঃখ, জীবন-মরণ !'

এ ত শুধু শোক-জয় নয়—এ যে সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা! সংস্কৃত নাটকে ট্রেজেডির সমাপ্তি মিলনে। অনেকে পাশ্চাত্য নাট্যকারগণের পক্ষপাতী হইয়া মনে করেন যে, ট্রেজেডির উদ্দেশ্য দুর্ব্বহ শোকের চিত্র অঙ্কিত করা। সেক্সপিয়র কি সংস্কৃত নাট্যকারগণের ন্যায় মিলনান্ত ট্রেজেডি রচনা করেন নাই ? তাঁহার পরিণত বয়সের ট্রেজিক ঘটনাপূর্ণ নাটকগুলির শেষ দৃশ্যে মিলনের আনন্দই অনুভব করা যায়। টেম্পেষ্ট ও সিম্বেলিনে মানব-জীবনের পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেক্সপিয়র মিলনেই বিরহ ও দুঃখের অবসান বাঞ্ছনীয় স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরিণত বয়সের ট্রেজেডি রোমিও-জুলিয়েটের মর্ম্মভেদী শেষ দৃশ্যে কেপিউলেট্ ও মণ্টেগু পরিবারের মধ্যে চিরশত্রুতার অবসান হইয়া যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়, তাহাতে ট্রেজেডির সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস হইয়াছে বলা যায় না। বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম ট্রেজেডি চণ্ডী-কাব্যের শেষ দৃশ্যে বাঙ্গালী নায়কের দুঃখকষ্টময় জীবনের শেষটা মিলনের সুখে পরিপূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আধুনিক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে ট্রেজেডির শেষ অঙ্কে, এমন কি, যাত্রাভিনয়েরও শেষ দৃশ্যে মিলনের চিত্র না থাকিলে হিন্দু দর্শকবৃন্দের চিত্ত স্থির থাকে না। যেখানে ঘটনাবলীর শেষে জীবিত ও মৃতের মিলন অসম্ভব, সেখানে রঙ্গমঞ্চে মৃতের ছায়া-চিত্র পটের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়া শ্মশান-ক্ষেত্রে মিলনের যৎকিঞ্চিৎ মাধুর্য্য বিকশিত করিবার প্রথা দেখা যায়। অক্ষয়কুমারের জীবন হিন্দুর আদর্শে গঠিত, আর সেই কারণে তাঁহার এষা কাব্যে ট্রেজেডির সমাপ্তি মিলনে। কিন্তু এ মিলনে একটু বৈচিত্র্য ও অনেকটা বিশিষ্টতা আছে।

এ মিলনে কবি কেবল এষার সান্নিধ্য কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। এষা গীতি-কাব্য, ইহাতে দর্শক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য কবির নাটকের

প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। এষার উপসংহারে কবি আমাদিগকে শোকের অন্ধকূপ হইতে বিমল-আনন্দের প্রসারিত ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। এষা কাব্যের পূর্ব্বভাগে ট্রেজেডির অভিব্যক্তির ন্যায় ইহার শেষাংশে মিলনের অভিব্যক্তি মানব-হৃদয়ের গূঢ় তত্ত্বের এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। কবির ভাবুকতা সাধনার ফলে উৎকর্ষ লাভ করিয়া কিরূপে নিবৃত্তির মার্গে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার একটা ধারাবাহিক বিবরণ এষার উপসংহারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অক্ষয়কুমার যেমন কোনও তত্ত্বের খাতিরে এষা কাব্য রচনা করেন নাই, তেমনই তিনি নাট্য বা অপর কোনও কাব্যশিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার মধ্যে পূর্ব্বকার চিন্তার সূত্রগুলি বিন্যস্ত করেন নাই। যেমন স্ত্রীবিয়োগের পর, তেমনই এষার সহিত মিলনের পরও কবির মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহারই চিত্র তিনি একটির পর একটি এই ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই রূপেই জগতের প্রত্যেক যথার্থ ভাবুক কবির গীতি-কাব্য রচিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের মত কেহ কোনও কালে উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা রচনা করেন নাই, অথচ বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণ অলঙ্কারশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়াই বিরহ বা মিলন বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। যে সকল কবির হৃদয় ভাবপ্রবণ, তাঁহাদের অন্তর্জগতে কোনও একটা গভীর ভাব অজ্ঞাতসারে বিবর্ত্তনের নিয়মের অনুসরণ করে, এবং তাহার ফলে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবের বিকাশ তাঁহাদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়। এক একটি পদ বা কবিতা ভাববিশেষের স্তরমাত্র। বৈষ্ণব কবির ন্যায় অক্ষয়কুমারও বিরহান্তে যখন মিলনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন এই নূতন ভাবের বীজ ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে যথাসময়ে ফুল ফলে সুশোভিত মনোহর স্বর্গীয় দ্রুমে পরিণত হইল। এক-ই কাব্যে ট্রেজিডির পর মিলনের এমন অলৌকিক অভিব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। অক্ষয়কুমার সত্য সত্যই বিষবৃক্ষে প্রস্ফুটিত পারিজাতের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। এষা কাব্য পাঠ করিয়া কবির সহিত বলিতে ইচ্ছা হয়,—

> 'হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
> বৃথা নিন্দা করে লোকে;
> জগতে—তুমি ত শোকে
> অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!'

দুঃখবাদ-হিতবাদ, ট্রেজেডি কমেডি, জীবন-মরণের সমস্যা, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি সুপরিচিত উচ্চ অঙ্গের সমালোচ্য বিষয় ছাড়া এষা কাব্যের আর একটা দিক আছে। এই অপূর্ব্ব গীতি-কাব্যে অক্ষয়কুমার দাম্পত্য-প্রেমের যে উজ্জ্বল চিত্র

অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোনও কালে মলিন হইবার নহে। এ প্রেম খাঁটি হিন্দু দম্পতির প্রেম। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এই প্রেম অভিব্যক্ত। অসংখ্য নরনারী এই প্রেমের লীলায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এ প্রেম মূক, কাঁদিতেও জানে না। 'কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল!' রোগে শোকে অনাদরে এ প্রেম চঞ্চল হয় না। এ প্রেমে লালসা নাই, ছলনা নাই। এ গভীর প্রেম মনে 'ধীর উল্লাস', প্রাণে 'দৃঢ় বিশ্বাস', শোকে দুঃখে 'স্নিগ্ধ সান্ত্বনা' দান করে। 'কত শক্তি আপদে' বিপদে! কত শোভা গৌরবে সম্পদে!' মরণে এ প্রেম মরে না। এ প্রেমে বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই।

'ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্তে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ আমার!'

অক্ষয়কুমার এষা-কাব্যে পতিব্রতা বঙ্গনারীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ চিত্র প্রাচীন বা বর্ত্তমান বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে বিরল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরে কুলবধূর চরিত্র কি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে রাজ-দম্পতি, মুনি-দম্পতি, বীর-দম্পতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণভেদে প্রায় সকল অবস্থার হিন্দুনারীর আদর্শ-চরিত্রের বর্ণনাও সংস্কৃত সাহিত্যে পাঠ করা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে পতিব্রতার দৃষ্টান্তের যদিও অভাব নাই, কিন্তু কবির চরিত্র-চিত্রণ-শিল্পে দক্ষতার অভাবে ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলার চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় নাই। তা ছাড়া, ফুল্লরা ব্যাধকুলতিলক কালকেতুর সহধর্ম্মিণী। খুল্লনা ধনপতি বণিকের ঘরণী। বেহুলা চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ। শেষোক্ত দুইটী রমণীরত্ন প্রাচীন বঙ্গে অবস্থাপন্নের গৃহলক্ষ্মী। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরে নারী-চরিত্র যে কি ভাব ধারণ করিত, সে সম্বন্ধে প্রাচীন ব্রতকথার উপাখ্যানভাগেও যৎসামান্য বর্ণনা আছে। কেবল এক চৈতন্য-সাহিত্যে বর্ণিত শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিতে বঙ্গনারীর চরিত্রের মহত্ত্ব কবির লেখনীমুখে অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী কবিরা খণ্ডকবিতায় বঙ্গনারীর চরিত্রের যে আংশিক বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাতে কবি-কল্পনার আতিশয্যমাত্র দেখা যায়। অপর পক্ষে, এখনকার পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে দাম্পত্য-প্রেমের নামে প্রায়-ই নির্লজ্জ মুক্ত প্রেমের অভিনয় হইয়া থাকে। ফল কথা, একটি অখণ্ড আদর্শ নারী-চরিত্র, যাহার

সৌন্দর্য্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে, তাহা এক অক্ষয়কুমার ছাড়া অপর কোনও বাঙ্গালী কবি কাব্যের উপকরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী কবিরা প্রেম প্রেম করিয়া নিজেরাও দিশাহারা হইয়াছেন, আর দেশশুদ্ধ লোককেও পাগল করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার শুভাগমনে এ দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার যে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হয়, তাহাতে প্রেমের বিজাতীয় নূতন ভাব আসিয়া বাঙ্গালী কবিসম্প্রদায়ের হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার ফলে বঙ্গভাষার কাব্য-ভাণ্ডারে স্তূপাকার প্রেম-ভালবাসার সঙ্গীত, গীতি-কবিতা, নাট্যকাব্য সংগৃহীত হইয়াছে। কল্পনার উত্তেজনায় মুক্ত প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তি নৈরাশ্য প্রভৃতি অশান্তিকর ভাব ছাড়া আর বেশী কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রতীচ্য ভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাসনাময় হৃদয়ের বিশৃঙ্খল ভাব এই চিত্রে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। গীতি-কাব্য ও রঙ্গমঞ্চে যদিও মুক্ত প্রেমের চর্চ্চা হইয়া থাকে, বাঙ্গালীসমাজে ইহার চর্চ্চা আদৌ নাই। আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে মুক্ত প্রেমের চর্চ্চা হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বে যেটুকু প্রেমের চর্চ্চা অবরোধের মধ্যে হওয়া সম্ভব ছিল, তাহাও এই কল্পিত ঔপন্যাসিক প্রেমের তাড়নায় লোপ পাইয়াছে। অবরোধের মধ্যে প্রেমের আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এই ধারণা প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কবিদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে তাঁহারা বিদেশী আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কবিদের আদর্শ-ভ্রম হইলে কাব্যের যে দুর্দ্দশা হয়, আমাদের দেশের গীতি-কাব্যেও এক্ষণে তাহাই হইয়াছে। কেবল গীতি-কাব্য কেন, আজকাল বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের প্রত্যেক বিভাগেই ত অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট আদর্শের প্রাধান্য। দেশ-কাল-পাত্রের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আদর্শ প্রস্তুত করিলে সে আদর্শ বিসদৃশই হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়কুমারও কবিজীবনের উষালোকে যে সকল স্বপ্নময়ী গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কাল্পনিক প্রেমের প্রভাব যে একেবারে নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। তবে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে অক্ষয়কুমার যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কবির প্রতিভা দুরন্ত কল্পনাকে আয়ত্ত সংযত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগে নির্ম্মম বাস্তবতা কুহকিনী কল্পনার মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কবির চক্ষে পবিত্র প্রেমের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি সুপ্রকাশ করিয়াছে। উপেক্ষিত দাম্পত্য-প্রেমের 'নীরব আত্ম-দান' অনুতপ্ত হৃদয়কে

মথিত করিয়া কবি-জীবনের যে ট্রেজেডি রচনা করিয়াছে, তাহাতে পরিত্যক্ত কল্পনার চিহ্নমাত্র নাই। অক্ষয়কুমারের ন্যায় নব্য-বঙ্গের কবিরা যেদিন দাম্পত্য-প্রেমের মূল্য বুঝিবেন, সেদিন তাঁহাদেরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে। স্ত্রীবিয়োগে অক্ষয়কুমার সারাটা জীবনের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জীবনে যে প্রেমের চর্চ্চা সহজ ছিল, 'মরণে দুর্লভ আজ তাহা!'

'আজি বুঝি, আমি অপরাধী,
মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি,
　　সহি নিজ পাপ-তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি মন,
পরেছিনু প্রেম-সংযমন—
　　খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।'

দাম্পত্য-প্রেমের ন্যায় এত বড় একটা 'জীবন-জড়ান সত্য' এতদিন পরে যখন হিন্দু কবির হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তখন মনে হয় যে, সমাজের তলে তলে হিতকর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারের এষা বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগ-প্রবর্ত্তক কাব্য-গ্রন্থের স্থান অধিকার করিবে। তাহা না হইলেও, এষার কবি অক্ষয়কুমার বড়াল পাশ্চাত্যভাবসিক্ত আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে প্রেম সম্ভব, তাহার জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আর সেই জন্য এষা কাব্য-জগতে উচ্চতম স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

অদৃষ্ট!

১

"তা বাপু, মনটা আমার কেমন করে, তাই কথাটা বল্‌ছি। তুমি আমার জামাই, অমন ক'রে রেগে উঠ্‌বে জান্‌লে কথাটা বল্‌তাম না।"

"না বলাই ভাল ছিল। আমার দাদার ঘাড়ে একটা বিরাট পরিবার। তিনি স্বয়ং মহাদেবের মত সেই ভীষণ গঙ্গাপ্রপাত মাথায় করে রাখ্‌ছেন। আর আপনারা—বল্‌ছেন কি'না দাদা আমার স্ত্রীকে দেখ্‌তে পারেন না!"

"তা বাবা, পাঁচ জনে এসে বলে—শুনি। একটু কষ্ট হয় না কি? হাজার হোক্—আমার ত মেয়ে।"

"পাঁচ জনে বলে? আমি বিশ্বাস করি না। আমার দাদার উপর পাঁচ জনের কারও এতটুকু মন্দ ভাব আছে, অতি বড় শত্রুও তা বল্‌তে পারে না। এগুলি দুষ্ট লোকের রচা কথা। ঘর ভাঙ্গবার চেষ্টা।"

"আ—ছি ছি! ও কথা কি বলছ বাবা। তোমাদের ঘর ভাঙ্গা? সে কি হ'তে পারে? গাঁয়ের মধ্যে তোমরাই বড়—তা কি হয়! না বাবা—ভাইয়ের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারার চিন্তাও করো না—সর্ব্বনাশ!"

"আমি ত কর্‌ছি না—কিন্তু আমার মাথায় সে চিন্তাটা ঢোকাবার জন্য দূর থেকে চেষ্টা হচ্ছে, তা—"

"সর্ব্বনাশ! বাবা, সাবধান থেকো, আমি—আমি—কিন্তু বাবা এ সব কুমন্ত্রণার ধারেও যাইনি। বেশী দুঃখ কষ্ট হয়, আমার মেয়েটা না হয় বছরে এগার মাসই এখানে এসে থাক্‌বে। তবু তোমাদের—ভাই-ভাই—"

"আজ তবে আসি। ঘাটে নৌকাটা তিন দিন বসে আছে। দাদাও হয় ত ভাবছেন।"

২

"আমায় তবে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না—এত কষ্ট আমার সয় না,—আমার একটা ব্যবস্থা কর।"

"দেখ কমলা, তোমার জেদ যে খুব বড়, তা আমি বুঝি। ভুবন চাটুর্য্যের ছেলে আমি—আমায় নিতান্ত বোকা ঠাওরাও কেন? তোমার বাপের বাড়ী যাবার কি দায় পড়ে গেল, শুনি?"

'আমায় যখন তোমরা কেউ দেখ্‌তে পার না, আমার কাজ কর্ম্ম, চাল চলন কিছুই যখন তোমাদের পছন্দ হয় না, আমার সন্তানগুলি পর্য্যন্ত তোমাদের চক্ষুঃশূল—"

"মিথ্যা কথা! আমার দাদা বরং তোমায় একটু বেশী সমঝে চলেন। আমি লক্ষ্য করি, দাদা তোমার কথায় টুঁ শব্দটী করেন না; আর বড় বউ—যাঁকে কেউ নিন্দা করে না, এমন কি, ও বাড়ীর কেষ্টার মার মুখেও যাঁর প্রশংসা ধরে না, তাঁর উপর অবশ্য তোমার রাগ হতেই পারে না।"

"তাই ত বলি, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তোমরা সবাই ভাল,—আমিই মন্দ, আমার বাপ মা আমায় কেন আগুনে ফেলে দিলে না গো।"

"কাঁদ—কাঁদ কমলা,- যদি দু ফোঁটা চোখের জল সত্যি ফেল্‌তে পার—তা হলেও অনেকটা শান্তি পাবে। আমার দাদা—আমার মার পেটের ভাই,—যার স্নেহে, ভালবাসায়, আদরে, শাসনে, সুখে দুঃখে ত্রিশ বৎসর কাটিয়ে দিয়েছি, তুমি এসে আজ বার বৎসর ধরে সে সব সত্যকে নির্জ্জলা মিথ্যা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছ। তার পর বড় বউ - তাঁকেও আজ কুড়ি বছর দেখ্‌ছি। অতি বড় শত্রুও তাঁর নিন্দা করে না। কমলা, তোমায় মিনতি করি, আমার মাথায় আগুন জ্বেলে দিও না। বেশ আছি। খাই দাই, ঘুরে বেড়াই। তুমিও বেশ আছ—আমি জানি, তোমার কোনও দুঃখ নাই। যেটুকু আছে, সেটুকু তোমার পৈত্রিক রক্তের দোষ।"

"আমার বাপ তুলছ? সাবধান। মনে রেখো, কমলা তোমার ঘরে এঁটো কুড়োবার মেয়ে নয়—"

"তুমি ঠাকুরাণীর হালে আছ, তা জানি। এও যদি না ভাল লাগে—ভাল হবে না;—দুঃখ পাবে।"

৩

"এতগুলো টাকা—ন দেবায় ন ধর্ম্মায় গেল, অথচ তোমায় কেউ বল্লেও না! কেন, তুমি ভেসে এসেছ না কি যাদব বাবু!"

"আমায় বল্‌বে কি? নিজের হাতে সিন্ধুক থেকে টাকা বার ক'রে দিয়েছি মধুবাবু! আমার যে এ কর্ত্তব্য।"

"আমি শুনেছিলাম, মাধব বাবু নিজে লুকিয়ে টাকাগুলো—"

"লুকিয়ে? আমার দাদার উপর ক'দিন আপনার এ ভাব মধুবাবু? ছি!"

"এরা একটা ষড়যন্ত্র করছে। গাঁয়ের মধ্যে কেউ আমাদের মোরাতে পারছে না। কেউ দাদার বুদ্ধির কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না। আমাদের দু' ভাইকে দু'ভাগ করে জব্দ করতে চায়। ওদিকে ব্রাহ্মণী ক্রমে ক্রমে সাতটী কন্যা প্রসব করায় চির-পর-প্রত্যাশী শ্বশুরকুল. একটা দাঁও মারতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ, আমরা দু'ভাগ হয়ে গেলেই ওঁরা এসে কর্ত্তৃত্ব করবেন, আর আমার বাপ দাদার বুকের রক্তে বখরা বসাবেন! তা হচ্ছে না আমি জেগে আছি!"

৪

"ছোট বউ মা কি তোমায় কি বলেছেন?"

"ওমা! কখন?"

"এই কাল বিকাল বেলা?"

"কি জানি বাবু, অন্দরের খবর কি ক'রে সদরে যায়, কে জানে।"

"বলেছেন না কি?"

"বলে থাকে, বলেছে; তা তোমার কাছে নালিস করলে কে? ছোট বোন্ সে, দুটো কথা বল্লেই বা। তাতে তোমাদের কি? আমার মণি যদি আমায় একটা কথা বলে, তা হলে বুঝি ভারী দোষ হয়? না?"

"নাঃ—তবে কি না কথাটা শুনে—"

"শুন্‌তে গেলে কেন—শুনি?"

"কানে গেছে, তাই শুনেছি।"

"এক কানে গেলে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"ছোট বউ একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেন।"

"ছোট বউয়ের বিচার কর্‌বে বড় বউ। তোমার সে কথায় কাজ কি?"

"তুমিও বুঝি তাকে কিছু বলেছ!"

"বলে থাকি, বলেছি, বেশ করেছি। আমার কর্ত্তব্য আমি কর্‌ব। সে বিচারের ভার তোমার নয়। এখন খেতে বস।"

৫

"শুনেছ কমলা, কাল রাত্তিরে দাদা আর বড় বৌ যে সব কথা বলেছেন!"

"শুনেছি গো শুনেছি। এগুলো তোমাদের শোনাবার ষড়যন্ত্র।"

"এও ষড়যন্ত্র! ভাল। ধন্য মেয়ে তুমি।"

"আমি তোমাদের পরিবারে আর থাকব না। আমায় একটা হাঁড়ি দাও, দুবেলা দুটো চাল দিও,—আমি উঠানের একপাশে রেঁধে খাব। তবু আমি ওদের সঙ্গে খাব না।"

"চলে গেলে কমলা! আমার বুকের উপর কশাইয়ের মত ছুরী চালাতে তোমার দ্বিধা হলো না। কমলা, তোমার দোষ নাই। আমি আজ দশ বছর লক্ষ্য করছি, আমার শ্বশুরকুল ক্রমাগত ছুরী শাণাচ্ছেন। আচ্ছা, তাই হোক। কিন্তু—কিন্তু—দাদাকে পৃথক হবার কথা বলি কি ক'রে?—"

৬

"কি মাধব বাবু, হাতে ধরে ভাইকে মানুষ করলেন, বিয়ে দিলেন, সেই ভাই পৃথক হয়ে গেল? চুল চেরা ভাগ করে সম্পত্তি বেঁটে নিলে? ঘর দরজা গরু বাছুর—"

"হাঁ মধুবাবু, ইহাই রীতি। সমান ভাগ করতে হলে দু'দিকের পাল্লায় সমান জিনিসই তুলতে হয়। নৈলে অসমান হয়।"

"আপনার বিয়ের দানসামগ্রীগুলো কমই হউক আর বেশীই হউক—তার নামটী পর্য্যন্ত নাই; আর যাদব তার সব বিয়ের যৌতুক বেছে নিয়ে গেল?"

"ভাইকে দিয়েছি—গঙ্গায় দিইনি।"

"শুনলাম, যাদবের শ্বশুর এসেছেন। তিনি নাকি বলেছেন—গত পনর বছরের নিকাশ দাবী করতে। যাদব দু'চার দিনের মধ্যেই—"

জমা খরচ লেখা আছে। তা ছাড়া দু পাঁচ হাজারের কথা—কিছু নয়।"

"তা ত বটেই, তবে কি না গোলোকবাবু বড় ধুরন্ধর। যাদবকে ঠিক করে তুলছেন—।"

"মধুবাবু, এখন যান, আমার ঢের কাজ আছে। যাদবকে আমি যত চিনি, তত আর কেউ চেনে না।"

৭

ঠাকুরপো যে শুকিয়ে যাচ্ছেন, দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"ঠাকুরপোর হলো কি? যেন একেবারে মুষড়ে পড়ছেন।"

"তা আমি কি করব?"

"করতে বলিনি গো। বলি দেখছ ত, সইতে পারছ ত?"

"হাঁ—হাঁ—হাঁ—যাও এখন।"

"ঠাকুরপোর এ দশা আমি ত আর দেখতে পারিনি।"

"চোখে ঠুলী দিয়ে থাক; না হয় বাপের বাড়ী যাও।"

"কথার শ্রী দেখ। যাকে আজ কুড়ি বচ্ছর ধরে খাইয়ে দাইয়ে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, তার অসুখ বিসুখ হলে দেখতে নাই?"

"দেখ চারু, মায়ের চেয়ে দরদী যে, তাকে বলে ডাইনী। আমার ভাইকে আমি যত জানি, যত ভালবাসি, আর কেউ তা করতে পারে না। আজ সে পৃথক হয়ে গেছে। তার কর্ত্তব্য সে করছে,—আমার কর্ত্তব্যও আমি করছি।"

"তুমি ত এমন ছিলে না। ভাইকে দেখবার জন্যও তোমার এক লহমা সময় হয় না?"

"না। আমার কাজ আছে। ভাই নাবালক নয়, অবোধ নয়, তাকে আমি দেখব কেন?"

"তোমার চোখ্ জলে ছল্-ছল্ করে কেন?"

"যাও এখান থেকে। না যাও—আমিই যাচ্ছি।"

৮

"তোমার দাদা এসে খবরও নিচ্ছেন না?"

'তার পর শুনুন, মেয়েগুলোর জন্যে ভাবনা নাই। ওদের ব্যবস্থা আমি করে যাব। কমলাকে নিয়ে যাবেন,—সে এ বাড়ীতে থাক্‌তে পারবে না।"

"মাধব এসে এই দু'মাসে একটী দিনও দেখেনি বাবা? কি আশ্চর্য্য! তাই ত, ভিন্নই না হয় হয়েছ,—তাই ত!"

"আপনি কি আজই যাবেন?"

"হাঁ, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। পাল্কী সঙ্গেই এনেছি।"

"এইমাত্র এলেন, এখনই যাবেন?"

"কাল রাত্রে এসেছি।"

"কাল এলেন—আর এতক্ষণ আপনাকে দেখিনি কেন?"

"এই তোমার টাকা পয়সা জিনিসপত্র সব নৌকায় তুল্‌ছিলাম, কমলা কেঁদে বল্‌লে,—'বাবা! আমার সব গেল বুঝি;—এ ভিটেয় আর থাকা চল্‌বে না; আমায়—নিয়ে চ'ল।' তাই—"

"সব উঠেছে?"

"হাঁ।"

"হরে কোথায়? তাকে ডাকুন।"

"হরে এসেছে বাবা।"

"যা ত হরে, দাদাকে ডেকে নিয়ে আয়। যা—"

"ডেকে দেখা করবে! দাদা ত।"

"দেখা কর্‌বার জন্যে নয়। আমার ঘরগুলো যদি উনি কিনে রাখেন।"

"তা মন্দ কথা নয়। মাধব ত এখনি আস্‌বে। ঘরগুলোর দাম সার দালান কোঠা ইঁদারা গরু বাছুর—ঘোড়া গাড়ী—তোমার অংশে হাজার দশেক হবে?"

"বেশী। হাজার পনর হবে।"

* * * *

"এই যে দাদা এসেছেন।"

"আমায় ডেকেছ যাদব?'

"যা-দ-ব—এই প্রথম। হাঁ, আপনাকে ডেকেছিলাম। আমার ত শেষ-দিন নিকট হয়ে এসেছে; শ্বশুর ম'শায় পাল্কী তৈরী করে' রেখেছেন—আমায় নিয়ে যাবেন। টাকা পয়সা—মালপত্র সব নৌকায় উঠেছে। আমার অস্থাবর-সম্পত্তি—ঘর দোর সব বিক্রী করতে চাই। আপনি রাখবেন কি?"

"কত টাকা দাম হবে?"

"পনর হাজার।"

"হাঁ, হরেও তাই বলছিল। হরে, যা ত, নায়েবকে ব'লে আয়,—পনর হাজার টাকার নোট নিয়ে আস্তে।"

* * * * *

"এই নাও যাদব, তোমার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির দাম পনর হাজার টাকা।"

"শ্বশুর মশায়ের হাতে দিন।"

"এই নিন তাওয়াই মশাই।"

"রাখ—গুণে দেখি। হাঁ, হয়েছে। তবে আর কি যাদব,—এখন তোমায় বিছানা শুদ্ধ ধরে পাল্কীতে উঠাই!"

"ওরা সব নৌকায় গেছে?"

"হাঁ—গেছে।"

"আপনিও যান।"

"তুমি?"

"আমি—আমি—আমি কোথায় যাব? আমি দাদাকে ছেড়ে—দাদা!—"

"যাদু!—যাদু!—"

"দাদা—আজ আমি মুক্ত—আজ আমার বাঁচবার ঔষধ পড়েছে দাদা—" আমায়—আমায় কোলে নাও—দাদা!—"

"এ কি করছ যাদব?—তোমায় না নিয়ে আমি যাই কি ক'রে? যে ভাই দু বছর ধ'রে চোখে দেখে নি, মরতে বসেছ—একটীবার খোঁজ নেয় নি—সম্পত্তি কিন্‌তে এসেছে, তার হাতে তোমায় রেখে যেতে পারব না বাবু—"

'শ্বশুর ম'শায়, অবধান! এ আর এখন আপনার মেয়ের ঘর নয়—আপনার জামাইয়ের সম্পত্তি নয়। এ মাধব বাবুর ঘর। এখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে কিছু বলবেন না। চেয়ে দেখুন, দু'বছরে দাদা আমার বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর যা কিছু শক্তি সামর্থ্য ছিল, তা যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। কেন গেছে, তা আপনি বুঝবেন না, আমি জানি।"

"তবে কি হবে যাদব? আমি যে সব ঠিক করে ফেলেছি।"

"সব নিয়ে যান। যে মতলবে মেয়ে দিয়েছিলেন, তা হাঁসিল হয়ে গেছে; এখন যান। আমি দু বচ্ছরের পর জেল থেকে খালাস পেয়েছি। আজ আমার কি আনন্দ! এত দিন স্বাধীন ছিলাম, এখন ছেলেমানুষের মত পরাধীন হয়েছি। এখন দাদার ঘরে থাকব—খাব—আমার দিনগুলি আনন্দে কেটে যাবে।"

"তা হলে আর কি করি! যা ত হরে—কমলাকেও তুলে নিয়ে আয়। জিনিসপত্তর সব তুলে আন্। অনর্থক দুবার করে চাকরগুলোর খাটুনী।"

"কমলাকে আন্‌বার আগে একটা কথা ভাল করে বুঝাবেন। বলে দেবেন—এখন থেকে থাক্‌তে হবে দাদার বাড়ীতে—তাঁর অধীনে তাঁর মন রেখে। এখন থেকে আমরা এ বাড়ীর কেউ নয়। এগুলো সব স্বীকার করে থাক্‌তে পারেন যদি, তবে যেন আসেন। নয় ত নিয়ে যান, সেখানে থাক্‌বেন। যে অর্থ নিয়ে যাচ্ছেন—তিন পুরুষ রাজার হালে চল্‌বে। যা ভাল মনে করেন, করুন।"

"না;—মেয়েটাকে রেখেই যাচ্ছি। সেও আর তা হলে যেতে পাবে না।"

* * * *

"তবে চল্লাম কমলা, তোমার ভাল মন্দ দেখবার ভার এখন তোমার ভাসুরের উপর, আর বড় জায়ের উপর রইল। দাসীগিরি করে খেতে হবে।"

"কি কর্‌ব বাবা, অদৃষ্ট।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্বদেশের ভাষা।

"নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?"

তখনও বনমালীপুর গ্রাম সেকালের ছাঁচে টলমল করিতেছিল। পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটটি গ্রাম্য-কুলবধূগণের তীর্থস্থান। স্বচ্ছ জলটুকু তাহাদের লজ্জা-বিধৌত। সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে 'মাথাঘষা' মশলার পুরাতন সুগন্ধ। সেই সৌরভে মত্ত হইয়া মৎস্যকুল সুন্দরীকুলের অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ঈষৎ গভীর জলে অদূরে সারি সারি দলবদ্ধ হইয়া

উপস্থিত হইত। কঙ্কণের সুমধুর নিক্বণ তাহাদের নিকট পুরাতন হইলেও সুন্দরীকুলে যে একটা ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে, তাহা তাহারা দেখিতে পাইত। পূর্ব্বকালের মোটা মোটা তাগা, কণ্ঠের চিক্ ও নাকের নথ, এখন কেবল 'কনস্‌ার্ভেটিভ' ময়রার ঝির অঙ্গেই বর্ত্তমান। কিন্তু বসুজা মহাশয়ের বাটীর 'মেয়েছেলে' একেবারে অলঙ্কারবিহীন। কি লজ্জার কথা! বামহস্তের সোনার কাটা তাবিজ ও দক্ষিণপদের রূপার মল পূর্ব্বে নীলজলের মধ্যে কত বড় ও কত সুন্দর দেখাইত! সেগুলি ঠোকরাইয়া এক একটা রোহিত মৎস্যের সারা জীবন কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের উপাসক সে মৎস্যও নাই, এবং সে মনোহারী খাঁটী গহনাও নাই। ছি! ছি! কি লজ্জার কথা! যে সব বাসন লইয়া নৃত্যকালী বাঁধা ঘাটে বসিত ও মাজিত, এবং তাহার সঙ্গে 'পরাণ-বঁধুর' গ্রাম্যগীতি গায়িত, সে সব বাসনই বা কোথায়? নৃত্যকালীই বা কোথায়?

সেকালের ছাঁচে টলমল করিলেও, বনমালীপুরের যে একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুধু মাছ কেন, আমাদের হরিদাস মিত্রও বুঝিতে পারিয়াছিল। সে লোকটা কে, তাহা পরে বলিব। আপাততঃ প্রাণধন বাবুর কথা বলি। বসুজা মহাশয়ের বাটীর মেজ বাবু প্রাণধন বাবু টুক্‌টাক্ করিয়া ইংরাজী কথা কহিতেন। তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বি এ পাশ্, এবং ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত কেরসিন তৈলের একটা প্রকাণ্ড টেব্‌ল-ল্যাম্প সংগ্রহ করিয়া চক্ষুর মাথা খাইতে বসিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে ঘরের বৌ ঝি চক্ষুর প্রহরী ছিল। কোন বিপদ দেখিলেই তাহারা সাবধান করিয়া দিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাণধন দাদার বিবাহ হইয়া উঠে নাই। একটু সচেষ্ট না হইলে আজকাল বিবাহ নামক সুখ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা দুষ্কর, তাহা তিনি জানিতেন না।

বসুজা মহাশয়ের বাটীর মেয়েছেলে সকলেই কলিকাতা-ফেরত, বৈদ্যনাথ-ফেরত, পুরী-ফেরত, দিল্লী-আগ্রা-ফেরত। নদ নদী পর্ব্বত পাহাড়, এমন কি, সমুদ্রও তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ। বাস্তু ভিটা কোন ছার! তবে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে বনমালীপুর ভিন্ন গতি নাই। পুষ্করিণীর মাছ, গাভীর খাঁটী দুগ্ধ, ঘরের ধান, এই যে সকল ঐহিক সুখসম্পদ, মোগল বাদশাহ সাহজাহানের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা নিশ্চয় ঈশ্বরদত্ত। পরিশ্রান্ত জীবনে পিতামহের আদরের খট্টাঙ্গের উপর শয়ন করিয়া রাখালের সেকালের বাঁধা গান শুনিলে

বোধ হইত যে, এই ছোট হৃদয়টুকুর মধ্যেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মা। সে যত বিশ্ববিস্তৃত হউক না কেন, ছোট না হইলে সুখ নাই।

বাটীর মেয়েদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহার নাম বিমলা। তার চ'খে সখের সোনার চসমা। সে বসুজা মহাশয়ের আদরের মেয়ে, এবং সেই জন্যই তাহার এখনও বিবাহের চেষ্টা হয় নাই; তবে সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলন যথেষ্টপরিমাণে হইতেছিল।

বিমলার চেয়ে যে কম সুন্দরী, তার নাম কমলা। কমলার চসমা ছিল না, কারণ, সে অনেকদিন হইতে 'বড় বৌমা' বিমলার বড় দাদার গৃহিণী। তার একটী-মাত্র সন্তান, তার নাম খোকা, তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম। কমলার বাক্স গহনায় ভরা। বিমলার সম্বলের মধ্যে খানকতক সাবান্ ও বন্ধুবান্ধবের পুরাণো চিঠি। সুতরাং ধনেপ্রাণে কমলা বিমলা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এক বিষয়ে উভয়ের একমত ছিল। সময় পাইলেই উভয়েই পুরাতন সমাজের গণ্ডীবেষ্টিত বাগিচার সীমানায় ক্রমে ক্রমে মুক্ত ও ভাঙ্গা পথগুলি আবিষ্কার করিয়া অজানা মাঠের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত।

উভয়ের এক বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, সেটা পশুপক্ষীর ভাষা বুঝা। গাছের মধ্যে কোন্ পাখী কি কথা কহে, তাহা বিমলা ও তাহার ভ্রাতৃজায়া উভয়ে মিলিয়া আলোচনা করিত। সেদিন পশ্চিম দিকের মাঠে, যেখানে সূর্য্যাস্ত খুব সুন্দর দেখায়, ও যে মাঠের মধ্য দিয়া গোধূলির গাভী ঠিক ছ'টার সময় বাটী ফিরিয়া আসে, (বসন্তকাল উপস্থিত) এবং যেখানে একটা লোকও গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে পারে না (কারণ কেবল একটি গাছ), তাহারা বেড়াইতে গিয়া একটা ব্যাপার দেখিল। একটা গাছের ডালে, একটা অদ্ভুত পাখী, অনেকটা 'বৌ-কথা-কও' পাখীর মত—কিন্তু তাহার স্বরভঙ্গ রোগেই হউক, কিংবা সহর হইতে গ্রামে আসিয়া ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত হইয়াই হউক, কথাগুলি অনেকটা সাহেবী ধরণের। 'বৌ, চীৎকার কর, বৌ লাঠী হাতে কর, বৌ দাঙ্গা কর, বৌ বরের গলা টিপিয়া ধর'—এই রকম অবিশ্রান্ত ধ্বনি।

'কথাটা প্রেমের নয়, তবে ভাবাটা খুব পাকা', এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বিমলা গাছের দিকে চাহিয়া ছিল ও কমলা হাসিতেছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একটা লোক ঢিল ছুঁড়িয়া পাখীটিকে উড়াইয়া দিল।

বৌ এবং কিরণ উভয়েই অবাক! এত বড় আস্পর্দ্ধা কার? বনমালী-

পুরের বসুজা মহাশয়ের বাটীর মেয়েছেলের সম্মুখে ঢিল ছুঁড়িয়া পাখী তাড়ায়, এমন সাধ্য কোন লোকের ছিল না। লোকটা নিশ্চয় পাগল কিংবা ঘোর অসভ্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ মনে করিয়া, বিমলা চসমার মধ্য দিয়া যতদূর সম্ভব, তাহার দিকে সরোষে লক্ষ্য করিল।

যে হরিদাস মিত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, আগন্তুক সেই হরিদাস মিত্র। হরিদাস মিত্রের পিতা এক জন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক, এবং লাঙ্গল চষিত। ক্রমে ধান চাউলের দর বাড়িয়া অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি হওয়াতে, (এখন মাসে প্রায় সহস্রাধিক টাকা আয়) পুত্র লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছিল। লাঙ্গল ও কলমের যুক্তগুণে তাহার আত্মা, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই সমভাবে বিস্তৃত। কাজেই হৃদয় মুক্ত ও চরিত্র উদার। যুবক হরিদাসের চাঞ্চল্যের মধ্যে কেবল ঢিল ছুড়িয়া গাছের পাখী ও বানর তাড়ান' অভ্যাস। লোকটা সাদাসিধা।

২

বিমলার রোষকষায়িত চশমার আড়ালের চক্ষু দুটির ভাব দেখিয়া হরিদাস ত্রস্ত হইয়া পড়িল। 'অপরাধ ক্ষমা করুন' বলিলে, হয় ত বিপদ চুকিয়া যাইত, কিন্তু যখন বিমলা বলিল, 'তুমি এক জন অসভ্য চাষা', তখন কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া হরিদাস কেবল উত্তর দিল, 'এতে আর হয়েছে কি? আমি পাখী ধ'রে এনে দিচ্ছি।'

কিন্তু গাছের ডালের পাখী মাঠ হইতে আমবাগানে উড়িয়া গেলে তাহাকে ধরা সোজা কথা নয়। বসুজা মহাশয়ের আমবাগানে খুব ঘোর, তখন সূর্য্যও অস্ত গিয়াছে। হরিদাস কোমর বাঁধিয়া গাছে উঠিলেও, ও পাখীটি মধ্যে মধ্যে দেখা দিলেও, তাহকে ধরা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অবশেষে বিমলা ও কমলা গৃহে ফিরিয়া গেল, ও সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিলে হরিদাস আবার মাঠ বাহিয়া গৃহে গেল। তাহার বোধ হইল, যেন জীবনে একটা কলঙ্ক আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পক্ষে কোনও বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়া একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা পর্য্যন্ত সে কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু আজ সুন্দরীর মুখনিঃসৃত বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে 'অসভ্য চাষা'র শাণিত ধার তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। মনের আনন্দে রাখাল মাঠে বেড়ায়, ঢিল ছুড়িয়া পাখী তাড়ায়, তাহার মধ্যে অসভ্যতা কোনখানে? সভ্যতার উৎপত্তি কোথায়? সহরের লোক তাহা কোথা হইতে শিখিল?

সারারাত্রি হরিদাসের ঘুম হয় নাই। প্রত্যুষে পুনর্ব্বার সেই অপূর্ব্ব পাখীটি ধরিবার মানসে সে কোমর বাঁধিয়া আবার বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। দীর্ঘ বংশখণ্ড লইয়া, একটা গাছ হইতে আর একটা গাছে সেটাকে তাড়াইয়া, অবশেষে তাহার নিজের বাস্তুবাটীর দিকে লইয়া গেল। বিহঙ্গমপ্রবরের নিশ্চয় ধরা দিবার মতলব ছিল, নচেৎ অবশেষে হরিদাসের শয়নগৃহের চালের উপর সে উড়িয়া বসিবে কেন? চালে বসিয়া সে আবার ডাকিল 'বৌ—বয়ের গলা টিপিয়া দাও—।' হরিদাস বলিল, 'দাঁড়াও, তোমার গলা টেপা বের ক'রে দিচ্ছি।' হরিদাস চালের আড়া ধরিয়া উপরে উঠিল, এবং স্বীয় গলদেশ হইতে চাদরখানি মুক্ত করিয়া পাখীর সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিল। পাখী ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু হরিদাস?

খাঁচার মধ্যে পাখীটি পুরিয়া সে চাল হইতে লম্ফ দিতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। প্রাঙ্গনে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া হরিদাস যাতনায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল। পাখী তখন তাহার অদ্ভুত ভাষায় আবার বলিল, 'বৌ—গলা টিপে দাও।'

হরিদাসের পতনশব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ভগ্নী বামাসুন্দরী ছুটিয়া মাতাকে ডাকিল। মাতা ও কন্যা হরিদাসকে লইয়া গৃহের মধ্যে গেল। হরিদাসের দক্ষিণ হস্ত অসাড়। বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জননী ও ভগ্নীর চক্ষুর জল দেখিয়া হরিদাস বলিল, 'কোন ভয় নাই, জলপটী দাও, ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না। আর ঐ খাঁচাটা বসুজা মহাশয়ের বাটীতে তাঁর মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। আমার কোন কথা তাঁকে বলবার দরকার নেই। আমাকে চুপ করিয়া শুইতে দাও।'

পাখী চলিয়া গেলে হরিদাস শয়নগৃহে আশ্রয় লাভ করিল। ক্রমে খুব জ্বর। জলপটীর উপর ভরসা না করিয়া হরিদাসের জননী গ্রামের ডাক্তার বাবুকে ডাকিলেন। ডাক্তারবাবু ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'জ্বর সেরে যাবে—বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যে—কিন্তু যতদূর বুঝা যায়, হাতের একটা অস্থি প্রায় ভাঙ্গবার মত হয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভাঙ্গে নাই। কোন ভয় নাই, আমি প্রত্যহ আসব।'

হরিদাসের পিতা বৃন্দাবনে। বাটীতে কেবল জননী ও ভগ্নী, ও ছোট ভাই, এবং একদল অনুচর ও একপাল গাভী। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে হরিদাসই কেন্দ্র, সুতরাং সে পড়িয়া গেলে সকলে একত্র হইয়া তাহার শুশ্রূষায় রত হইল। অন্য সময় হইলে হরিদাস একদিনেই বল পাইয়া উঠিয়া বেড়াইত,

কিন্তু এবার তাহার মনের বল কমিয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ সেই 'অসভ্য-চাষা'র মর্ম্মবাণী। হরিদাস কাহারও সহিত কথা কহিত না।

বসুজা মহাশয়ের বাটী হইতে একটি লোক আসিয়া বলিল, 'দিদিঠাকরুণ পাখী পেয়ে বড় খুসী হয়েছেন ও ধন্যবাদ দিয়াছেন।' হরিদাস উত্তর দিল, 'বেশ! শুনে সুখী হলেম।'

পরদিন বিকালে ডাক্তার আসিয়া হরিদাসকে দেখিয়া বলিলেন, 'জ্বর অনেক কম, কিন্তু বেদনাটা বুকের দিকেই বেশী।' হরিদাস হাসিয়া বলিল, 'চারিদিকের খবর কি?'

ডাক্তার। ধান, চালের দর বড় বেড়ে গিয়েছে, অনেকে একবেলা খাচ্ছে।

হরিদাস। কত দর?

ডাক্তার। টাকায় চার সের।

হরিদাস। দেখুন, আমার গোলায় আট হাজার মণ চাল আছে, তার মধ্যে আপনি পাঁচ হাজার মণ, টাকায় দশ সের হিসাবে বেচিয়া দিন। দেখি, কোন ব্যাটা মহাজন টাকায় চারি সের দরে হাটে বিক্রয় করে!

ডাক্তার হরিদাসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্রামে সেই সংবাদ রটিয়া গেল।

অনেকে বলিল, হরিদাস মিত্র পাগল হইয়া গিয়াছে। বসুজা মহাশয়ের বাটীর মেজবাবু প্রাণধন বসু বি,এ, এ কথা লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। এক জন বলিল যে, হরিদাস চাল হইতে পড়িয়া যাওয়াতে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মেজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চালে উঠিবার কারণ কি?' তাহার উত্তরে বড়বৌ কমলা সেদিনকার কথা খানিকটা রঞ্জিত করিয়া বলিল যে, 'ঠাকুরঝির জন্য পাখী ধরিতে গিয়া সে পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথা খারাপ হওয়াটা বোধ হয় পড়িবার পূর্ব্বেই হইয়াছিল; কেন না, বিমলা (ঠাকুরঝি) তাহাকে অযথা ভৎ'সনা করিয়াছিলেন।'

প্রাণধনবাবু, বলিলেন, 'চাষাভূষাদের ভৎ'সনা করা ভুল। এখন তারা অল্পেই অবমাননা জ্ঞান করে।' বিমলা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, 'এ সব কথার কোন অর্থ নাই। হরিদাসবাবু মোটেই চাষাভূষা নয়, তাঁর কাজে বোধ হয়, তিনি আমাদের চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ।'

৩

* বনমালীপুরে এক জন 'পরীক্ষোত্তীর্ণা' ধাত্রী আসিয়া উপস্থিত, তাঁহার নাম 'মেরী ঘোষ'। তাঁহার ছাপানো কার্ড—

'মিস্ মেরী ঘোষ—

পরীক্ষোত্তীর্ণা হিন্দুধাত্রী' এবং ইংরাজীনবীশ।

'মেরী' কথাটা দেখিয়া পাছে কেহ তাঁহাকে খ্রীষ্টানী মনে করে, সেই ভ্রম অপনোদন করিবার জন্য কার্ডে উল্লিখিত 'হিন্দু ধাত্রী' ছুইটি কথার বাহুল্য। মেরী তাঁহার বাল্যকাল হইতেই 'ডাক্-নাম'।

কলিকাতা হইতে বড়বাবু তাঁহার স্ত্রী কমলাকে ইংরাজীভাষায় 'পারদর্শিনী করিবার জন্য ধাত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর একটা বিশেষ কারণ 'খোকার জন্য ভাল নর্সের দরকার। তাহার 'ফুড্' খাওয়ানো, পেনি পরানো, সাবান মাখানো, হাঁসানো এবং কাঁদানো, যেন পাড়াগেঁয়ে রকম না হইয়া পড়ে। কারণ, ভবিষ্যতে সাহেবদের সম্মুখে তাকে বের কর্ত্তে হবে।' ইত্যাদি। তবে এ সব বিষয়ে ধাত্রী কেন ? তাহার উত্তরে বড়বাবু লিখিয়াছিলেন, 'আজ্ কাল মেয়ে ছেলেদের অনেক রকম জরায়ুর রোগ হয়ে ঘন ঘন জ্বর হয়, হিষ্টিরিয়া হয়, এবং ভালবাসার স্বপ্ন দেখে, তাহাতে আয়ু কমিয়া যায়। এই সকল বিষয়ের প্রতীকার করিবার জন্য 'একাধারে' এক জন লোকের দরকার, এবং মিস মেরী ঘোষ সেই রকম লোক। আমি তাঁকে পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাসে দিতে স্বীকৃত, এবং তিনি আমাদের 'গেষ্ট্-হাউসে' (অতিথি-মন্দিরে) থাকিবেন। তবে গ্রামে কারও প্রসব-বেদনা হইলে এবং স্ত্রীলোকের কোন রোগ হইলে তিনি অবশ্য 'কলে' যাইবেন, 'ফিস্' বুঝা পড়া করিয়া করিয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের ভোলানাথ ডাক্তারের আধা-আধি বখ্রা, ইহাই আমার ইচ্ছা।'

বড়বাবুর ইচ্ছা বসুজা মহাশয়ের সংসারে ভগবানের ইচ্ছার প্রায় সমান, এ সম্বন্ধে কমলা ছাড়া কাহারও মতভেদ ছিল না। কিন্তু একাকিনী কমলা কি করিবে ? সে তার গহনার বাক্সর মধ্যে চিঠিখানি রাখিয়া ধাত্রীকে সমাদর করিল, এবং খোকা ধাত্রীকে দেখিয়া ত্রাহি স্বরে চীৎকার করাতে সান্ত্বনা করিতে বসিল।

কমলা। ছেলেটা বেয়াড়া, ঠিক তার বাপের মত। আমাদের বংশে বেয়াড়া ছেলে কখনো জন্মায়নি। বিশ্বাস না হয়, তবে আমার বাপের বাড়ী গিয়ে দেখ্বেন।

ধাত্রীর সে রকম ইচ্ছা মোটেই ছিল না; বিশেষতঃ কমলার পিত্রালয় আসাম ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী কোন জেলায়, তাহা কমলা নিজেই জানিত না। কিন্তু কমলাকে খুসী করিবার জন্য ধাত্রী বলিল, 'দিদি, আজ কালকার কচি ছেলেদের মেজাজও সাহেবের মত, তারা আর সেকালের মত শান্ত হয় না, বাঙ্গালা পড়তে চায় না, বইগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়। যার যে দিকে প্রবৃত্তি আপাততঃ সেই দিকে ঢিল দিতে হবে, এই হচ্ছে লেখা পড়া আরম্ভ করবার প্রধান উপায়।'

ইহা বলিয়া মিস মেরী হাসিল। মিস মেরী খুব সুন্দরী, 'তার সন্দেহ নাই, তবে বিমলার সহিত তুলনা করিয়া কমলার মনে হইল যে, বিমলার দন্তপাটী মুক্তার মত, মেরীর দাঁত বড় বড়, এমন কি, তার মধ্যে একটা বাঁধানো বলিয়া বোধ হয়। আর একটা কথা। মেরীর বয়স কত তাহা নির্ণয় করা শক্ত, 'বিশ কিংবা ত্রিশ, কিংবা চল্লিশও হইতে পারে। বোধ হয় বিশ, কিন্তু মুখখানি যা হোক খুব মাজা ঘষা ও শরীরের সঙ্গে খুব মানানো। ইহাই কমলার মত।

অতিথির সহিত পরিচয় লাভ করিতে বিমলা ও প্রাণধন বাবু (মেজ বাবু) উভয়েই আসিলেন: প্রথম আলাপে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রাণধন বাবু চা তৈয়ারি করিয়া সকলকে বাটিয়া দিবার সময় মেরীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আপনি আসাতে আমাদের বাড়ীর একটা মস্ত অভাব পূরণ হইয়া গেল। আমাদের বিমলার কোন সঙ্গিনী নাই। তার আর্টে খুব সখ, যে গান কটা শিখেছে, তা বেশ গায়, তবে ইংরাজী বইগুলো এখনও ভাল বুঝিতে পারে না। আমার সময় নাই, ছি ট্রিতে এম এ নিয়ে মহামুস্কিলে পড়েছি। আপনি বোধ হয় গান জানেন।'

মেরী সলজ্জভাবে বলিল, 'না। আমার গান শেখবার সময় হয় নাই, তবে এক একটু পিয়ানো বাজাতে পারি। কিন্তু সেগুলো ইংরাজী গৎ। শেখাবার লোক নাই।'

কমলা। ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী গৎ কেমন বেতর। আমার শুনলে হাসি পায়।

বিমলা। সব জিনিসের মধ্যেই এক একটা লক্ষণ আছে। ইরাজী ভাষা ও গানের চর্চ্চা বৈঠকখানার ফরাসের উপর ব'সে চলে না। অন্ততঃ পক্ষে একখানা টুল কিংবা চেয়ার চাই; বাঙ্গালা কথা ও গান ছেঁড়া মাদুরে ব'সে যেমন হয়, চেয়ারে বসে তেমন হয় না।

মেজবাবু। খোকার পাঁচ বৎসর বয়স, এখন তার চেয়ারে ব'স্‌বার সময় হয়েছে। আমার মতে চেয়ারে না ব'সলে ভাল লেখাপড়া হয় না।

কমলা। চেয়ারে ব'সলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমাদের বিমলার মত রোজ চেয়ারে বসে, আর চা খেয়ে।

বিমলা বলিল, 'আমি শুয়ে হরিনাম কর্ত্তে কখনই পারবো না।'

একটা কথাতে পাঁচটা কথা মনে আসে। পূর্ব্বের দিন কমলা ও বিমলা খট্টাঙ্গে শয়ন করিয়া আমাদের হরিদাসের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিল। হরিদাসের পাখীধরা, তার হাত ভাঙ্গা, তার আকস্মিক বদান্যতা ও পাগলের মত ব্যবহার, সেই কথাগুলি লইয়া বড় বৌ কমলা ও তার ঠাকুরঝি বিমলা অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিল। পুরুষের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইলে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের নিকট যতদূর ধরা পড়ে, ততদূর পুরুষ নয়। হরিদাস যে অসভ্য চাষা, তা এখন বিমলার নিকট বলিবার যো নাই, এবং তাকে অসভ্য চাষা বলিয়া বিমলা যে জীবনে একটা মস্ত ভুল করিয়াছে, সে কথা বিমলা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা মুখে আনা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্ভব। এক দিকে লজ্জা ও অন্য দিকে অনুতাপ। কমলা ঘুমাইয়া পড়িলে বিমলা মনে করিয়াছিল যে, একখানা চিঠি লিখিয়া তাহার অন্যায় ব্যবহার জানাইবে, ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কিন্তু এক দিনের আলাপে এক জন যুবককে পত্র লেখা ও সেই পত্রের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা—কি ভয়ানক কথা! এটা কতদূর ভাল মন্দ, তাই চিন্তা করিতে গিয়া বিমলার সারারাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল, ও সেই সঙ্গে হরিদাসের ভগ্ন হস্ত ও ১০৪ ডিগ্রী জ্বরের কল্পনা ও তার শুষ্ক ক্লিষ্ট সুন্দর মুখের কল্পনা ও সেই সঙ্গে তার বীরপুরুষের ন্যায় উন্নত দেহ, ও গ্রাম্য সরল স্বদেশী কথাগুলি—একে একে বিমলার স্মৃতি এত অধিকার করিয়াছিল যে, স্মৃতির সঙ্গে আরও পুরাতন স্মৃতি—ও আরও পুরাতন—এমন কি, বহু পুরাতন কোন স্মৃতি—এ জন্মেরই হউক কি পূর্ব্ব জন্মের, ইহলোকেরই হউক কিংবা অন্য কোন লোকের—সব একত্র মিলিয়া হরিদাসের নাম ও হরিনাম জড়াইয়া—বিমলার ও কমলার স্মৃতিপটে জাগরূক হইল।

সুতরাং 'শুয়ে শুয়ে হরিনামের' অর্থ উভয়ের নিকট একা দাঁড়াইয়া গেল, এবং তাহা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিয়া বিমলার মুখ রক্তবর্ণ হইল। তাহা দেখিয়া কমলা হাসিল ও মেরী সেটুকু দেখিয়া মনে করিল যে, ইহার মধ্যে একটা কথা আছে।

মেজবাবু সময় কাটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার দেশ দেখা হয়েছে?'

মেরী। কেবল কলিকাতা ও এই গ্রাম। আমার কপালে দেশদেখা ঘটিবে কি না, তা ভগবান জানেন।

মেজবাবু বলিলেন, 'খুব সম্ভব, ঘটিবে। আমার এক জন বন্ধু কখনও কলিকাতা ছেড়ে অন্য জায়গায় যায় নাই. কিন্তু অম্বলের ব্যায়রাম হয়ে শেষে তাকে মধুপুরে যেতে হয়েছিল। আপনার অম্বলের ব্যায়রাম আছে কি?'

মেরী। তা না থাক্‌লে কলিকাতা হতে বাহিরে আসব কেন?

এই মহাসত্যটকু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া মেজবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমারও সেই দশা!'

৪

মেরীর সহিত সকলেরই সদ্ভাব ঘনীভূত হইল। 'অম্বলের ব্যারাম' থাকাতে মেজবাবু তাহাকে ভালবাসিলেন; এবং ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি ও উপন্যাস এবং চিঠিপত্র লেখার ক্ষমতা দেখিয়া বিমলা তাঁহার বশীভূত হইল। মাতৃভাবের সম্পূর্ণতা দেখিয়া খোকা অচিরাৎ তাহাকে 'মাসীমা'র পদে বরণ করিল। তাহার জীবনের অতীত দুঃখের কাহিনী শুনিয়া কমলার প্রথম বৈরভাব ঘুচিয়া গেল। সেই কাহিনী মেরী সরল ও সুন্দর বাঙ্গলা ভাষায় আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া বড়বৌকে শুনাইত। মেরী বলিয়াছিল, 'আমার বাপ মা কেহই বাঁচিয়া নাই। কাঁথা শেলাই করিয়া ও গলাবন্ধ বুনিয়া আমি খ্রীষ্টানদের-স্কুলে লেখাপড়া শিখি। পরে মেডিকেল কলেজে পাশ হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করেছি।' খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মেরীর এতদিনে বিবাহ হইত, কিন্তু হিন্দু থাকিয়া গিয়া সে পথে বিলক্ষণ বাধা পড়িয়াছিল।

কমলা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'ধর্ম্মে মতি থাক্‌লে বিবাহের দরকারও নাই, বিবাহের ভাবনাও নাই। তোমার মত গুণবতী স্ত্রীর জন্য লোকে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে।'

এই হাহাকারধ্বনি কমলা কোথায় শুনিয়াছিল, তা মনে নাই। তবে 'আজ কালকার লোকের মতিগতি দেখে বোধ হয় যে, তারা রূপবতী স্ত্রীর চেয়ে গুণবতী স্ত্রীই খুঁজে বেড়ায়। তাতে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার লাঘব হয় ও খরচ কি সামান্য বাঁচে?'

কমলা বলিল, 'আমাদের প্রতিবাসীর মধ্যে একঘর কায়স্থ আছে, তাদের বাড়ী তোমাকে নিয়ে যাব। তারা চাষা হলেও খুব বড়লোক। তাদের বাড়ীর মেয়ে বামাসুন্দরীর খুব শীগ্‌গির ছেলে হবে। সেই সময় তোমার দরকার হবে।

বামাসুন্দরীর ভাই হরিদাস, তার সঙ্গে আমাদের বিমলার একটা পাখী নিয়ে রোষারুষি হয়েছিল, তাই মুখ দেখাদেখি নাই। তবে কি জান? কেউ কারও মুখ না দেখে কি বেশী দিন থাকৃতে পারে? হয় ত এমন একটা সময় আসবে যে, এক জন আর এক জনের কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে। যা হোক, ঘটনাটা ইতিহাসের মত। তিনি (বড়বাবু) থাকৃলে এর একটা কুলকিনারা হ'ত, কিন্তু মেজঠাকুরপোকে অম্বলের ব্যায়রামে মাটী করে দিয়েছে।'

ক্রমে বিমলা সেই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিল, এবং মেরী উৎসুক হইয়া শুনিল। খাঁচার পাখীটিও বহুরূপীর মত। সেটাও মেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

'একটা আন্দোলন যখন ঘটিয়াছে, তখন তাদের বাটীতে একবার যাওয়াই ভাল।' সুতরাং কমলা ও মেরী অপরাহ্নে আমবাগান পার হইয়া হরিদাসের বাটীতে গেল। বাগান পার হইলেই হরিদাসের আটচালা অদূরে দেখা যায়। এক জন রাখাল মেরীকে দেখিয়া বলিল, 'মা, তোমার পায়ের কাঁটা খুলেছে ত?' কিন্তু পরে মেরীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, অন্য এক জন স্ত্রীলোক, তাহাতে অপ্রতিভ হইয়া গেল। কমলা তখন একটা গাছের ডালের মধ্যে মৌমাছির চাক দেখিতেছিল। সেই অবসরে রাখালের সহিত কথোপকথন করিয়া মেরী বুঝিতে পারিল যে, বিমলা প্রত্যহ লতাপাতা ও কাঁটা ভাঙ্গিয়া সেই রাখালবালকের নিকট হরিদাসের সংবাদ লইয়া যায়, অথচ তাহা হরিদাস জানে না। এই আনাগোনার মধ্যে একদিন বিমলার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল, কিন্তু সে কথা বিমলা লুকাইয়াছে, এবং লুকাইয়া তাহার ব্যথা সহ্য করিয়াছে। 'ইতিহাসে'র মধ্যে সেটুকু টুকিয়া লইয়া মেরী কমলাকে লইয়া হরিদাসের বাটীতে উপস্থিত হইল।

বামাসুন্দরী উভয়কে সমাদরে সঙ্গে লইয়া তাদের 'গরীবের বাড়ী' দেখাইল। বাটীর মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি বড় কম, স্থাবরই অধিক। মেরী বলিল, 'স্থাবর সম্পত্তি ভগবানের সৃষ্টি ও অস্থাবর মানুষের সৃষ্টি।' বামাসুন্দরী বলিল, 'ঠিক বলেছেন। আমরা যে ক'জন এখানে থাকি, তারা দরকার হলে আমাদের গ্রামের লোক, সেগুলি বেঁটে খাই। আমাদের গরুর দুধ, গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, গোলার ধান, যখন যার অভাব হয়, নিয়ে যায়, আবার সাধ্যমত পুরিয়ে দেয়। বাবা বৃন্দাবন যাবার আগে বল্‌তেন, "যত পাপ পুণ্যি কেবল আপন-পরের ভাব থেকে হয়। নিজের ও পরের জিনিস, নিজের ও পরের আত্মীয় কুটুম্ব, এ সব আলাদা করে দেখ্‌লেই যত পাপ এসে পড়ে।' কমলা হাসিয়া বলিল, 'ঠিক বলেছ

বোন্; তোমার কথাগুলি শুনে আমার বড় ভক্তি হচ্ছে।' তবে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ঘরে সারি সারি অনেকগুলি হাঁড়ি, তার মধ্যে অনেক জীবনোপয়োগী সামগ্রী—মুড়ি, চিঁড়া, মুড়কি, নারিকেলের পাটালি, তিলের লাড়ু ও শুষ্ক ক্ষীরের ড্যালা। শেষোক্তগুলি হরিনামাঙ্কিত। একটা বড় জালার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তমাল গ্রন্থ। সেগুলি হরিদাসের নিজের হাতে নকল করা। মেরী বলিল, 'এমন সুন্দর লেখা কখনো দেখিনি।' আর একটা ঘরে পুরাতন তরবারি, লাঠী ও বর্ষা। সেগুলি বর্গীর হাঙ্গামার যুগের জিনিস। একটা ঘরে হরিদাসের মাতা চরখায় সুতা কাটিতেছিলেন। কমলা তাঁহার সহিত মেরীর পরিচয় করাইয়া দিল।—'ইনি আমাদের নূতন ধাত্রী। বামাসুন্দরীর ছেলে হবার সময় প্রসব করিয়ে দেবেন। এঁরা কলেজের পাসকরা ধাত্রী।' ধাত্রী সম্বন্ধে হরিদাসের মাতার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। এখন স্বচক্ষে ধাত্রী নামক পাশকরা মেয়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হরিদাস এখন শয্যা হইতে উঠিতে পারে। প্রথমে কমলার লজ্জা হইয়াছিল, 'কিন্তু যখন একবার সুমুখে বেরিয়েছি, তখন আবার লজ্জা করা কাপুরুষের কাজ', ইহা মেরীকে চুপি চুপি ব্যক্ত করিয়া ও বামাসুন্দরীর হাত ধরিয়া হরিদাসের শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

মেরী বলিল, 'আমি লেডী ডাক্তার ও নর্স। আমাকে দেখে লজ্জা করবেন না। কলিকাতায় অনেক ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় নিজে করবার সময় পান না, সেই জন্য নর্সের দরকার হয়। শুশ্রূষা করাই আমাদের কাজ। আমরা তা কলের মত কর্ত্তে পারি।' কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর হরিদাসের মুখে একটু আনন্দের ভাব সঞ্চারিত হইল। মেরী বলিল, 'আপনাকে একখানা ইজিচেয়ার পাঠিয়ে দেব।' কমলা বলিল, 'এ কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। আমাদের তিনখানা ইজি-চেয়ার আছে।' মেরী বলিল, 'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনার হাতের ব্যাণ্ডেজটা আর রকম ক'রে বেঁধে দিই। ডাক্তারগুলো হাঁসপাতালের রোগীর ব্যাণ্ডেজগুলোর মত জড়িয়ে কুড়িয়ে কাপড় বেঁধে দেয়, কিন্তু আজকাল আর্টের উন্নতির সঙ্গে এরও অনেক উন্নতি হয়েছে।' ইহা বলিয়া মেরী হরিদাসের বামহস্ত স্বীয়স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া ব্যাণ্ডেজ এবং হরিদাসের অঙ্গের শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিল।

৫

. ইংরাজীনবীশ কলিকাতার মেরীর কল্পনায় বনমালীপুরের কৃষকের গৃহ একটা নূতন পদার্থ। গৃহ মানবজীবনের প্রতিবিম্বস্বরূপ। তার সঙ্গে জীবনের ও মরণের ভাব গাঁথা। বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্যকুটীরে জীবনের চেয়ে মরণের কথা ও মরণের ছবিই বেশী। কিন্তু সেগুলি শান্তিপূর্ণ। সেই জন্য অন্যদেশে মজুরী খাটিতে গেলেও, গৃহে ফিরিয়া মরিতে সকলেরই সাধ হয়। এক ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া নীরবে নারিকেলবৃক্ষের তলে জীবনলীলা সংবরণ করা অতিশয় আরামের কথা। সে আরামটুকু সম্পূর্ণ করিয়া আত্মাকে অব্যাহতি ও আপাততঃ 'বেকসুর খালাস' দিবার নিমিত্ত আমাদের দেশে শবদাহের প্রথা। মরণের কথাই পারিবারিক ইতিহাসের উপাদান। বাটীর কর্ত্তা, ছেলে, মেয়ে, বৌ, ঝি, কবে কি করিয়া, কোন কথা বলিয়া ইহলোক অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিল,সেই পুরাতন কাহিনীগুলি স্মৃতি ও শ্রুতিস্বরূপ সকলে সংগ্রহ করিয়া রাখে। একটা অয়েলপেন্টিং কিংবা ফটোগ্রাফের চেয়ে তার মূল্য বেশী।

আমাদের ভাষাটাও সেই মরণ লইয়া। স্বদেশী ভাষা মৃত্যুর আনন্দে সংগঠিত। লজ্জা সম্রমের ভাষার মধ্যে 'মরণ আর কি! তোর মত বেহায়া কখনও দেখিনি, গলায় দড়ি দিয়া মরা উচিত।' অতিশয় দুঃখ হইলে "মরণের স্থান নাই." বিষ খাইয়া মরা, জলে ডুবিয়া মরা, তীর্থস্থানে গিয়া মরা, মরণ লইয়াই সকলে ব্যাকুল। স্ত্রী স্বামীকে রাখিয়া মরিতে চাহে।

কৃষক-কুটীরের দৃশ্যপ্রসূত এই মরণের ভাব মেরীর মনে নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাই সে প্রত্যহ বামাসুন্দরী কেমন আছে, এই খবর লইতে গিয়া হরিদাসের সঙ্গে গোটাকতক জীবন ও মরণের কথা কহিয়া আসিত। প্রথমে হরিদাসের গৃহের মধ্যে কিসে জীবনের সঞ্চার হইতে পারে, তাহারই কল্পনায় মেরী অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। 'এত বড় বাড়ী, এত ধানের গোলা, এত গরু বাছুর, কিন্তু ছেলেপুলের অভাব। জীবনের সাজগোজের মধ্যে ছেলেপুলে।'

কিন্তু ঘরে একটা লক্ষ্মী আবির্ভূতা না হইলে ছেলেপুলে আসিবে কার সঙ্গে?

তাই একদিন মেরী বামাসুন্দরীকে চুপি চুপি বলিয়াছিল, 'হরিদাস বাবুর বিবাহের কথা আপনারা ভেবে দেখেছেন কি? ছেলেপুলে না হলে বাড়ী আনন্দময় হবে কি ক'রে?' উত্তরে বামাসুন্দরী বলিয়াছিল, 'আমিও তাই দিনরাত্রি ভাবি। আমি শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেলে দাদাকে দেখ্‌বে কে? মার যত্ন ক'রবে কে?' এই বলিয়া বামাসুন্দরী কাঁদিল। 'আপনি না হয় দাদাকে

একবার বলে দেখুন। আমরা অনেক সম্বন্ধ স্থির করেছিলাম, কিন্তু তিনি রাগ করেন। সেই ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না।'

সেদিন বসুজাদিগের বাটীতে ফিরিয়া মেরী দেখিল যে, মেজবাবু অতিশয় কাতরভাবে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, 'আমার অম্বলের ব্যায়রাম এতদূর বেড়ে গেছে যে, জীবন রক্ষা করা সুকঠিন। বোধ হয় আমাকে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে যেতে হবে। আমার আরও বোধ হয় খাওয়া দাওয়ার মাত্রাটা বড় বেশী হ'চ্ছে।' মেরী একটু দুঃখময় হাসি হাসিয়া বলিল, 'আমারও সেই অবস্থা, কিন্তু আপনার মত এত অধীর হয়ে পড়িনি। আর যদি আপত্তি না থাকে, তবে আজ থেকে আপনার রান্নার তত্ত্বাবধান আমি নিজে ক'রব। বোধ হয় আপনার কোন আপত্তি নাই?' মেজবাবু বলিলেন, আপত্তি দূরে থাক্, আমি ঐ কথা রোজ মনে করি, এবং খাবার সময় প্রত্যহ তোমার কথা মনে পড়ে, কিন্তু আমি এ কথা বল্‌তে সাহস পাইনি। আমার—এ বিষয়ে কোন—কোন অধিকার নাই। তবে তোমারও অম্বলের ব্যায়রাম আছে, এই কথাটা মনে হ'লে আমার যেন কখনও কখনও মনে হয় যে, অধিকার আছে। তবে সে ভাবটুকু মাঝে মাঝে হয়, সর্ব্বদা নয়। অবেযদি তুমি আমাকে নিজের লোক বলে ভাব—তবে সে ভাবটুকু অর্থাৎ অধিকারের—সর্ব্বদা মনে হবে।'

মেজবাবু এত কথা মেরীকে কখনও বলেন নাই, এবং সে কথাগুলি ঠিক ইংরাজী কায়দা-সঙ্গত হইয়াছে কি না, মনে করিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইল, এবং সেই কষ্টদূরীকরণার্থ তিনি দুই বোতল সোডা-ওয়াটার ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিলেন, এবং একটু উপশম বোধ হইলে পুনর্ব্বার তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম চিন্তা করিয়া দেখিলেন। যদি স্বদেশী ভাষায় বলিতেন, 'তুমি আমাদেরই বাড়ীর লোক—অন্ততঃ—আমি তাই মনে করি—এবং তুমি চারিটি রেঁধে দেবে, তাতে দোষ কি?'—তবে হয় ত এত গণ্ডগোল হইত না—কিন্তু সভ্যতার খাতিরে হয় ত তিনি বেশী কথা বলিতে গিয়া ঠিক বলিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিয়া তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল।

মেরী ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি আমার হাতের রান্না খাবেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য।' ইহা বলিয়া সে বিমলার নিকট চলিয়া গেল।

এ দিকে কমলা বিমলার ইজি-চেয়ারখানি লইয়া হরিদাসকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। 'হরিদাস বাবুর বস্‌বার বড় কষ্ট হয়, ও মেরী যখন তাঁর

ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়, তখন তিনি মেরীর কাঁধে হাত দিতে লজ্জা বোধ করেন, সেই জন্য চেয়ারখানি পাঠিয়ে দিয়েছি।' এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া বিমলার বড় রাগ হইয়াছিল। মেরীকে দেখিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব ব্যাপারের অর্থ কি।'

বিমলার কথায় কথায় রাগ হয় ও কথায় কথায় তাহা জল হইয়া যায়, তাহা মেরীর অবিদিত ছিল না। সুতরাং সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'যদি বলেন ত চেয়ারখানা লইয়া আসি।'

বিমলা গম্ভীরভাবে বলিল, 'যা হবার তা হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার ও বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া আমি ভালবাসি না। আমার সঙ্গে ওঁর (অর্থাৎ হরিদাসের) সদ্ভাব নাই। তবে আপনি যদি জোর ক'রে যান, তবে আমার কোন কথা নাই। আমি বড় বৌকেও বুঝিয়ে দেব। এতে আরও যদি মনান্তর ঘটে, তার জন্য আমি দায়ী নই।'

বিমলার মুখের ভাব দেখিয়া মেরীর যেটুকু বুঝিতে বাকি ছিল, তাহা বুঝিল; এবং অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিল, 'আর কখনও যাব না, তবে আজ একবার যাবার কথা ছিল, না গেলে নয়, তাই যাব, এই শেষ যাওয়া।'

বিমলা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আমার কথার অর্থ আপনি বুঝতে পারেন নি। আপনি ধাত্রী, আপনার কাজ হলে আপনি নিশ্চয় যাবেন, তবে ডাক্তারের কাজটুকু আপনি অধিকার ক'রে বসলে ডাক্তার মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন। আপনার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে আধা-আধি বখরা, তাই বড় দাদা লিখেছিলেন।'

মেরী হাসিয়া বলিল, 'আমি পয়সা লইতে যাই নাই।'

বিমলা। সেটাও অন্যায়। আর সেটাও বোধ হয় ভাল দেখায় না।

মেরী চলিয়া গেলে কমলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুরঝি, তুমি রাগ করেছ?'

বিমলা বলিল, 'আমার বোধ হয় মস্ত ভুল হয়েছে। যদি হরিদাস মেরীকে ভালবাসে, তবে আমার বাধা দিবার কোন অধিকার নাই।' কমলার বোধ হইল যে, বিমলার মুখখানি অত্যন্ত ভার, এবং মাথাটাও ঠিক নাই। ইহার মধ্যে ভালবাসার কথা কেন? কিন্তু নিতান্ত সরলা হইলেও, কমলা বড় ঘরের বধূ। ভালবাসা কখনও সরল পথ দিয়া যায় না তাহা কমলার অনেকটা জানা ছিল। অন্ততঃ উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহার মনে

ধারণা হইয়াছিল যে, ভালবাসার একটা গণ্ডগোল না বাধিলে এত অধিক ন্যায়-অন্যায়-বিচার বিমলার স্বভাববিরুদ্ধ।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যায় হরিদাস কোমর বাঁধিয়া বিমলার জন্য পাখী ধরিতে চালে উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সন্ধ্যা ধরিয়া গণিলে আজ সম্পূর্ণ দুই সপ্তাহ। দুই সপ্তাহ মানবজীবনে বড় কম নয়। একটি কৃষ্ণপক্ষের পাঁচ দিন কাটাইয়া চন্দ্র শুক্লপক্ষের দশমীতে পদার্পণ করিয়াছে। পাঁচদিন পরে দোলপূর্ণিমা। বিমলা শীতল বায়ু সেবন করিতে পুষ্করিণীর বাঁধা সিঁড়ির উপর গিয়া বসিল। পিঞ্জরবদ্ধ পাখী সুযোগ পাইয়া ঘন ঘন ডাকিতেছিল, 'বৌ, বরের গলা টিপিয়া ধর।' বিমলার মনের ভাবের সঙ্গে হয় ত সেই কথাটি সে সময় মিলিয়া গিয়াছিল, তাই পাখীর কথাগুলি একমনে শুনিতে লাগিল। জলের মধ্যে মৎস্যগুলি সারি সারি দলবদ্ধ হইয়া বিমলাকে দেখিতেছিল।

অম্লরোগপ্রপীড়িত মেজবাবুর আহার প্রস্তুত করিয়া মেরী অতিশয় যশোলাভ করিল। মেজবাবু সকলের সম্মুখেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, 'এমন রান্না জীবনে কথনও থাইনি, এবং যদিও আমার রাত্রি জেগে চক্ষুর জ্যোতি নিতান্ত কমে গেছে, এবং অম্বলের ব্যায়রামে মনে তেমন জোর নাই, তবুও যত দূর সম্ভব আমি ভালবেসেছি।' কমলা ও বিমলা উভয়েই এ কথা শুনিয়া নিতান্ত আনন্দ লাভ করিল। পাছে মেজ বাবুর 'ভালবাসা'র অন্যপ্রকার অর্থ কেহ মনে করে, সেই জন্য তিনি 'যত দূর সম্ভব' কথাটি দিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি অতি সরল ও সুন্দরভাবে বড় বৌ ও বিমলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মেরীর সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত হইয়া পড়িল সেদিন দোলপূর্ণিমা। দোলপূর্ণিমার দিন সকলের মনেই আনন্দের মাত্রা স্বভাবতঃ বাড়িয়া যায়। বিমলার সঙ্গে মেরীর সেদিন যেটুকু মনান্তর হইয়াছিল, আজ সেটুকু ঘুচিয়া গেল। তাহার প্রমাণে বিমলা আজ মেরীর গাউন কাড়িয়া লইয়া একখানা ঢাকাই শাড়ী পরাইয়া দিল। এই নূতন সাজ দেখিয়া খোকা বলিল, 'মাসীমাকে খুড়ীমার মত দেখাচ্ছে।' যদিও খোকার কথার কোন অর্থ ছিল না, তথাপি হঠাৎ এই ভাবটি সকলের মনে আঘাত করিয়াছিল। পুত্রের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া কমলা তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং মেরীকে বলিল, 'তুমি ওকে মানুষ করে তুলেছ, তুমি চ'লে গেলে ও মুস্‌ড়ে যাবে। তুমি যথার্থই আমাদের মেজ বৌ হ'লে কতই সুখের হত।'

এতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত হইয়াছে কি না, তাহা মনে করিয়া কমলা বিমলার দিকে তাকাইল। বিমলার ভাবে বোধ হইল যে, কথাটি সে অপছন্দ করে নাই। বরং সেই ভাবটুকু যাহাতে বদ্ধমূল হয়, সেই জন্য একটু গোলাপী রঙ্গের আবীর লইয়া বিমলা তাহার গণ্ডদেশে মাথাইয়া দিল, এবং তাহার কর্ণের নিকট মুখখানি লইয়া চুপি চুপি বলিল, 'এখন বাগান পার হ'য়ে বামাসুন্দরীর বাড়ীতে অভিসার করে এস আমরা পিয়ানোটা নিয়ে পুকুরের পাড়ে গান করব এখন। ফিরে এসে একবার দেখা করিও—তোমার হতভাগিনী বিমলা।'

বিমলা যদিও কথায় কথায় কলহ করিত, কিন্তু সে কতদূর রসিকা, তাহা মেরী এতদিন জানিতে পারে নাই। সুতরাং কিয়ৎক্ষণ অবাক থাকিয়া পরে কেবল বলিল, 'বেশ। তোমার জন্য একবার কলঙ্কের বোঝা মাথায় করেছি, না হয় আর একবার ক'রব।'

সেই জন্য আমবাগান পার হইতে সেদিন মেরী অনেকটা চঞ্চল হইয়া পড়িল।

হরিদাস বসুজা মহাশয়দের বাটীর ইজি-চেয়ারখানি ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিল। অসভ্য-চাষার ইজিচেয়ারে বসা (বিশেষতঃ বিমলাদের ইজি-চেয়ার) কতদূর ন্যায়-সঙ্গত, পূর্ব্ব অপমান মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া হরিদাস তাহার বিচার করিতে ছাড়ে নাই। তাই সেই দিন বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া হরিদাস কত কি কথা মনে মনে একবার ভাবিয়া লইল। এই পূর্ণিমার দিনে রাখালদের ডাকিয়া হরিদাস আবীর খেলিত। আজ যেন সকলেই ম্রিয়মাণ। মাঝে মাঝে দক্ষিণ বায়ুস্বনে তাহার শয়নগৃহসংলগ্ন নারিকেল বৃক্ষগুলি পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিলেও, হরিদাসের সে দিকে মন গেল না।

হরিদাস সেই ইজিচেয়ারখানির দুইটি বাহুতে দৃষ্টি আরোপিত করিয়া চিন্তায় মগ্ন হইল। মুক্তমাঠের একটি গাছের ডাল হইতে সেই পাখীটিকে ঢিল ছুড়িয়া তাড়ান তাহার এতদিন পরে যেন অন্যায় বলিয়া ধারণা হইল। বাস্তবিক, কৃষক বলিয়াই কি বিমলা তাহাকে 'অসভ্য-চাষা' মনে করিয়াছিল? কিংবা তাহার ব্যবহারে? এ কথাটি তাহার মনে এতদিন উদয় হয় নাই। 'বোধ হয় আমার একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়েছে।'

'কিন্তু তাতেই বা কি আসে যায়? বিমলা বড় ঘরের মেয়ে। তার যা মনে হয়েছিল, সে তা বলেছে। আমি চাষা হয়ে সে কথা নিয়ে তোলাপাড়া করি কেন? তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? এ সংসারে কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ? আমি ত হরির দাস, হরি ছাড়া আমাদের আর কারও সঙ্গে সম্বন্ধ আছে কি?'

হরিনাম স্মৃতিতে জাগরূক হওয়াতে প্রেমজালবদ্ধ হরিদাসের মনের ভার লাঘব হইল। তার যেন বোধ হইল, সেই ইজি-চেয়ারখানির উভয় বাহুতে কতকগুলি হরিনাম অস্পষ্টভাবে আঁচড়ানো। ক্রমে বিস্মিত হরিদাস নিকটে গিয়া দেখিল যে, সেগুলি তাহার কল্পিত হরিনাম নয়, সত্য সত্যই চেয়ারখানিতে লেখা! অনেকগুলি সারি সারি নাম ও সকলের শেষে 'আমার অপরাধ ক্ষমা করিও'।

বসুজা মহাশয়দের বাটীতে হরিভক্ত কে? কোন হরিভক্ত ক্ষমাপ্রার্থী?

এই একটা নূতন চিন্তায় অধীর হইয়া হরিদাস বাটীর বাহিরে গেল। বাগান পার হইয়া মাঠের দিকে গেল। সেখানে দক্ষিণবায়ু বাহিয়া কোথা হইতে স্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি তাহার কর্ণকুহর স্পর্শ করিল। বোধ হইল, পিয়ানোর সঙ্গে হরিনাম।

'আজি বসন্তে মাতিয়ে তোমারি প্রেম
চরাচর—প্রবাহিত,

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে—

'ভুলে যাও হৃদয়ের দুঃখ, মান অপমান—

আবার— 'সকলেই সকলের'—

'একমন, একপ্রাণ'—

'তোমারি পদতলে'—প্রাণের বঁধু হে'—

হরিদাস জানিত, বসুজামহাশয়ের বাটীতে পিয়ানো ছিল, এবং জানিত, বিমলা মধ্যে মধ্যে গায়িত। সেই খণ্ড খণ্ড গানের ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া হরিদাস দূরে চাহিয়া দেখিল, বিমলা কমলার সঙ্গে তাদের পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া গায়িতেছিল।

হরিদাস বাটী ফিরিয়া আসিল। 'এ সব লোভ আমার পক্ষে ভাল নয়।'

পথিমধ্যে জনকতক রাখালবালক ধূলা লইয়া আবীর খেলিতেছিল। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, 'তোদের আবীর নাই?'

রাখালবালক বলিল 'কে দেবে?'

হরিদাস। আমি বেঁচে থাকতে তোদের আনন্দের লাঘব হবে না। আমি দেব। আমার সঙ্গে আয়।

হরিদাস গৃহে ফিরিয়া দেখিল, মেরী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া। হরিদাস বলিল, 'গরীবের আঁধার ঘরে আপনি পূর্ণিমার দিনে এসে আনন্দ সঞ্চার করেছেন, এ কথা কখনও ভুলব না—'

তার পর হরিদাস তাহার একটা ভাঙ্গা বাক্স হইতে দশটা টাকা লইয়া রাখাল-

বালকগণকে দিয়া বলিল, 'আবীর কিনে সকলে হরিনাম কর। সন্ধ্যাবেলায় মা হরির লুট দেবেন এখন।'

ইহা বলিয়া হরিদাস মেরীকে গৃহে লইয়া গেল। 'আপনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী। যদি বেঁচে থাকি, তবে মধ্যে মধ্যে আসবেন।'

হরিদাসের কথা শুনিয়া মেরী তাহার হৃদয়ের কতকগুলি বেদনা ও কল্পনা চাপিয়া দিল; হরিদাসকে দেখিয়া অবধি সে মনে মনে অনেকগুলি আশালতা রোপণ করিয়াছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে উপড়াইয়া ফেলিল।

অবশেষে মেরী বলিল, 'হরিদাসবাবু, একটা কথা আপনাকে বলিব, তা বলিতে পারি নাই। আজ আপনি নিজের ভগ্নীর মত মনে করিয়া স্নেহসম্ভাষণ করেছেন, সেই জন্য আমার সাহস হয়েছে।'

হরিদাস। বলুন।

মেরি। বিমলা আপনাকে ভালবাসে।

হরিদাস। কখনও না, ঘৃণা করে।

মেরি। না, ভালবাসে। সে ভালবাসা বড়ই গভীর। সে ভালবাসা বিক্ষত-হৃদয়ের। আপনাকে কটু কথা ব'লে অবধি সে মরমে ম'রে আছে। তার জীবনে সুখ নাই। আপনি যখন শয্যাগত, তখন সে কাঁটাবন ভেঙ্গে সকালে সন্ধ্যায় খবর নিয়ে যেত। পায়ে কাঁটা ফুটলে কাকেও বল্‌ত না। আমি যেদিন বলেছি 'হরিদাস একটু ভাল', সেদিন সে খে'তে ব'স্‌ত, নয় ত কেবল আঁচ'লে মুখ লুকিয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াত। সে ক্ষমাপ্রর্থনা ক'রে আপনাকে পঞ্চাশখানা চিঠি লিখেছে, কিন্তু লজ্জায় পাঠাতে পারে নাই। সেগুলি সে ছিঁড়ে ফেলে দিত। আমি কুড়িয়ে জড়ো করে রেখেছি। সে নিশিরাত্রে চেয়ারে ব'সে আপনার উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। মাথার কাঁটা দিয়ে আপনার নাম যেখানে সেখানে লিখেছে।'

বিমুগ্ধ হইয়া হরিদাস শুনিতেছিল।

মেরী আবার বলিল, 'আমার বলিতে লজ্জা কি? আমি আপনার নিকট আসি, তা বিমলার প্রাণে সহে না। আমি আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি, সে কথা সে মনে আনিতে পারে না। কেন? সে মনে করে, আমি তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেড়ে নিয়েছি। যেটা তার ভালবাসার দাবী, সেখানে অন্য কাহারও দাবী অনধিকারচর্চ্চা।'

মেরীর শুষ্ক শীর্ণ মুখের এই কথাগুলির মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলে হয় ত

হরিদাসের আনন্দস্রোত রুদ্ধ হইত, জীবনে একটা দুঃখের রেখা পড়িত। পাছে তাহার হৃদয়ের বেদনা হরিদাস ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে, সেই ভয়ে মেরী বলিল, 'হরিদাস, তুমি আমার নিজের ভাইয়ের মত, তাই আমার অনুরোধ—বিমলার সঙ্গে যে আড়িটুকু হয়েছে, সেটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে ভাব কর।' আমার কথা রাখ্‌বে ত ?'

হরিদাস। রাখ্‌ব।

মেরী। সেই মাঠের গাছতলায় দাঁড়িয়ে থেক।

মেরী চলিয়া গেলে হরিদাস ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ, বামা! মেরীর মন বড় উঁচু। আমাদের মত চাষাভুসোর ও রকম হয় না।'

বামাসুন্দরী মেরীর মনের কথা অনেকটা বুঝিয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতাকে বলিতে সাহস পাইল না!— সে কেবল বলিল, 'মেরী যাবার সময় খুব কেঁদেছিল।'

মেরীর কাঁদিবার অর্থ হরিদাস ঠিক বুঝিল না—'আচ্ছা, সে কথা তাকে জিজ্ঞাসা ক'রব এখন।'

তখনও দিবা অবসান হয় নাই। মেরী বিমলাকে গিয়া বলিল, 'আমি অভিসার সেরে এসেছি। এবার আমার কথা রাখতে হ'বে।'

বিমলা। এমন কি কথা ?

মেরী। আমার বড় সাধ যে, ঐ পিঞ্জরের পাখীটি নিয়ে সেই মাঠের গাছে একবার ঝুলিয়ে রাখব।

বিমলা খুব হাসিল। 'আমারও ঠিক ঐ মনে হচ্ছিল। আমি প্রত্যহ তাই মনে করি। অনেক সময় মনে করি যে, গাছের নীচে ব'সে, তুলি ও রং নিয়ে পাখীটির ছবি টেনে ফেলি।'

এই নূতন ভাবে মত্ত হইয়া উভয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম হাতে করিয়া মুক্ত মাঠের পুরাতন বৃক্ষের তলে গেল। হরিদাস দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইল।

মেরী বৃক্ষের ডালে পিঞ্জর বাঁধিয়া দিয়া বিমলাকে অস্তমিত সূর্য্যের দিকে তাকাইতে বলিল।

বিমলা। কেন বল ত ?

মেরী। বড়ই সুন্দর। আবার দুই ঘণ্টা পরে ঐখানে পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হবে। কি সর্ব্বনাশ!

বিমলা। কি হয়েছে ?

মেরী। তুলি ও পোর্টফোলিও ভুলে এসেছি।

বিমলা। তোমার কি ভোলা মন!

মেরী তুলি ও পোর্টফোলিও আনিবার ছলনা করিয়া দৌড়াইয়া অন্তর্হিত হইল। বিমলা একমনে কি ভাবিতেছিল। সেই প্রথমদিনের মুক্ত মাঠ ও প্রথমদিনের পাখী! বিমলা পিঞ্জরের দিকে তাকাইয়া দেখিল—কই? পাখী কোথায়? পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত! ভ্রমক্রমে মেরী সেটা মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ভ্রমক্রমে? কখনই না। এটা মেরীর শত্রুতা! এত সাধের পাখী। এত যত্নের পাখী। সেটা কোথায়?

বিমলা চতুর্দ্দিকে চাহিল। সম্মুখে হরিদাস!

এটাও কি ভ্রম? যে পূর্ব্বে কখনও অবগুণ্ঠনের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই, আজ সেই বিমলার অবগুণ্ঠন কেন? লজ্জা কিসের? অঞ্চলের কোণ মাথায় কেন?

হরিদাস ধীরে ধীরে বিমলার নিকট আসিয়া বলিল, 'ক্ষমা কর।' বিমলা জ্ঞানহারা হইয়া হরিদাসের উন্নত শীতল বক্ষে তাহার উষ্ণ মুখখানি স্থাপন করিল।

পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গম আকাশে উড়িতেছিল। যেন বিমলাকে নীরব দেখিয়া সে গায়িল, 'বৌ, কথা কও।'

হরিদাস আবার কহিল, 'আমাকে ক্ষমা ক'রেছ?'

বিমলার মান এবার সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়াছে। সে সেই পুরাতন স্বদেশী মোহজড়িতস্বরে প্রেমসিক্ত মধুর কণ্ঠনিঃসৃত কথায় বোধ হয় বলিয়াছিল, 'তুমি আমার জপমালা, তোমার নিকট আমার মান অপমান!'

মেরী তাহার প্রতিশ্রুত দূতীর কার্য্য শেষ করিয়া, ঢাকাই শাড়ীখানি খুলিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল, মেজ বাবু তাহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া। মেজ বাবু বলিলেন, 'মেরী, কাল আমাকে এম এ একজামিন্ দিতে যেতে হবে। তোমার কৃপায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে পড়িছি, এখনি তিনখানা ইতিহাসের মর্ম্ম আমার ক্ষীণ-স্মৃতিশক্তি সত্ত্বেও বেশ মনে পড়ছে। এখন আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় নাই, তবে খানিকটা জানিয়ে রাখা ভাল। তার একটা বিশেষ কারণ আছে।'

মেরী। সে বিশেষ কারণটা কি?

মেজ বাবু মেরীর হুকুম শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইলেন, চক্ষু টিপিয়া খোকাকে কি ইঙ্গিত করিলেন, এবং খোকা তার ব্রেস্ট-পকেট হইতে একটা মোড়ক বাহির করিয়া দিল, এবং মোড়ক অতি সাবধানে খুলিয়া মেজ বাবু

তাহার মধ্য হইতে একটু আবীর বাহির করিলেন, এবং সেই আবীরটুকু মেরীর ললাটে অতি সন্তর্পণে মাখাইয়া দিলেন।

মেরী মুখ নত করিয়া তাহা যে কেবল সহিয়া গেল, তাহা নহে, সেও তাহার অঞ্চল হইতে একটু আবীর লইয়া মেজবাবুর পদতলে মাখাইয়া দিল।

মেজবাবু বলিলেন 'ছি, করছ কি? আমার পা ছোঁয়া কেন?'

মেরী বলিল, 'আপনারা আমার অন্নদাতা, দুঃখের দিনে আপনার বড় দাদা আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আজ আমার স্থান অনেক উচ্চ দেখিয়া আমার অহঙ্কার হ'চ্ছে, সেই অহঙ্কারটা খাটো করবার জন্য আপনার পদতলে আশ্রয় নিয়েছি।'

মেজ বাবু। ঠিক পদতলে না। মেরী! তুমি যে স্থান অধিকার করেছ, সে স্থানে পূর্ব্বে আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও দেখি নাই। আজ যেন দেখ্‌ছি, সেই মন্দিরে আমার ঈশ্বরসেবার সাহায্যের জন্য তোমাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফিরে এসে এ সব কথা হবে।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ফাল্গুন।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হোলী' নামক ছবিখানি উপভোগ্য, এবং 'ভারতীয় চিত্রকলা'র প্রবর্ত্তক ও গুরুর রচনা-রীতির বিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য। চিত্রিতার হাতের আঙুলগুলি 'লতানে' বটে, অস্বাভাবিকও বটে, কিন্তু আর সব স্বাভাবিক। ছবিখানিতে ভাবের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। তাহা বুঝিবার জন্য ভাষা, টীকা ও টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই। 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' স্বভাবের অনুগত হইয়াও আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারে এবং অস্বাভাবিকতা কোনও পদ্ধতিরই লক্ষ্য হইতে পারে না, অবনীন্দ্রনাথের 'হোলী' আমাদের এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছে। আবীর সমস্তার আঙুলগুলি স্বভাবের অনুগত হইলে, অনুপাতের অনুবর্ত্তী হইলে এই সুন্দর ছবিখানি নিশ্চয়ই 'ভারতীয় ভাবে' বঞ্চিত হইত না। 'ক্রমে ফুলে মধু আসে।' আমরা নিরাশ হইব না। আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'অন্ন-সমস্যা'র দ্বিতীয় প্রস্তাব আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের 'ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিদ্যাপীঠ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নারী' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, এবং প্রবাসী'তে 'সাধু' ভাষায় রচিত, 'সবুজ'-রঙ্গে বঞ্চিত, হেঁয়ালী-বর্জ্জিত, সুস্পষ্ট কবিতা ছাপা হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি! শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'স্বাধীন প্রাণ' উদ্দীপনা; নবজাগ্রত যুগ-চেতনার আহ্বান। দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী।—

'শক্তি-ধারায় জাগিছে ধরায়
বিশ্ববিজয়ী গান।
নবীন দীপনে জীবনে জীবনে
জাগাও স্বাধীন প্রাণ।'

যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'মায়ার ফাঁশ' চলনসই গল্প। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' কবিতায় বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু কবির হাত এখনও কাঁচা। শ্রীসীতা দেবীর 'ভ্রষ্টলগ্ন' সুখপাঠ্য গল্প। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর 'কালো বেণী' কষ্টকল্পিত রচনা, বিশেষত্ব নাই। 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা' উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেকগুলি পুরাবস্তুর ছবি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' এখন সুপ্ত; লুপ্ত হয় নাই, ইহাই আমরা ভাগ্য বলিয়া মনে করি। লেখক লিখিয়াছেন,—'আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের হাওয়ার কি এক গুণ যে, এখানে মিউজিয়ম বা পাঠাগার বেশী দিন বাঁচিয়া কাজ করিতে পারে না। খোলা হইবার পর এ সব অনুষ্ঠান জীবনের চাঞ্চল্যে কিছুদিন নড়াচড়া করিয়া ধীরে ধীরে নীরব নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়ে! বরেন্দ্র সমিতি কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠানটিকে একটি জীবন্ত অধ্যয়নের কেন্দ্র করিয়া রাখিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন।' লেখকের প্রথম মন্তব্য বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' এই 'অনুষ্ঠানটিকে একটি

জীবন্ত অধ্যয়নের কেন্দ্র করিয়া রাখিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন', ইহা অতীতের কাহিনী। গত কয়েক বৎসর সমিতি অনেক লাট-বেলাট ও হোমরা-চোমরাকে চিত্রশালা দেখাইয়াছেন, সে হিসাবে ইহা 'জীবন্ত অধ্যয়নের কেন্দ্র' হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধান, গবেষণা, আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি প্রভৃতি 'জীবন্ত অধ্যয়নের কেন্দ্রে'র বিবিধ কর্ত্তব্য বর্জ্জন করিয়া সমিতি যে এত দিন শীতকালের ব্যাঙের মত সমাধিসুখে মগ্ন ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে হিসাবে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি'ও 'এ সব অনুষ্ঠান জীবনের চাঞ্চল্যে কিছু দিন নড়া চড়া করিয়া ধীরে ধীরে নীরব নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়ে' লেখকের এই মর্ম্মান্তিক সিদ্ধান্তেরই আমোলে আসে। তবে 'সমিতি'র নিদ্রাকে নিশ্চয়ই 'নীরব নিদ্রা' বলা যায় না; কারণ, সমিতি যখন মায়া-ঘোরে অচেতন ছিল, তখনও সমিতির শিলাবিন্যাসে, চিত্রশালা-নির্ম্মাণে, ইঁটের সঙ্গে কর্ণিকের সংঘাতে, এবং সর্ব্বশেষে গৃহ-প্রতিষ্ঠার উৎসবে 'রবে'র অভাব ছিল না। অতএব, ইহা 'সরব নিদ্রা'র পর্য্যায়ে পড়িতেছে।—'গৌড়লেখমালা' এখনও সম্পূর্ণ হইল না। 'গৌড়রাজ-মালা'র আর সংস্করণ হইল না। সমিতির অনুসন্ধানের, ভ্রমণের, খননের ও তীর্থদর্শনের কথাও আর শোনা যায় না।—সমিতি স্বেচ্ছামত সদস্য' গ্রহণ করেন, এবং স্বেচ্ছামত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন! সমিতির পূর্ব্বতন সদস্যদিগের সহিত এখনও তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও বুঝা যায় না! সে সম্বন্ধ কেন হইয়াছিল, কেনই বা গেল, তাহাও বাঙ্গালার ইতিহাসের মতই অস্পষ্ট!—'সমিতির ইচ্ছা আছে, তাঁরা "গৌড়শিল্পমালা" নাম দিয়া গৌড়ের শিল্পের একটি কাহিনী প্রকাশ করেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ১৯১৭ সালে সমিতিকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন তাঁর মৃত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য সবিতা-স্মৃতি-পুস্তক পর্য্যায়ক্রমে বাহির করিতে। এই পর্য্যায়ের প্রথম প্রকাশিত "ভাষাবৃত্তি" বইখানি লক্ষ্মণসেনের আদেশে লিখিত পাণিনির টীকাপুস্তক। আরো দুইখানি প্রকাশিত হইতেছে—"ধাতুপ্রদীপ" ও "অলঙ্কার কৌস্তুভ"। * * * সমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে প্রতিমা-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র সরকারী পোষ্টগ্রাজুয়েট রিসার্চ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন ঐ কার্য্যে সমিতিতে নিযুক্ত আছেন।' ইহা আশার কথা বটে। সমিতির অতিথি-সেবার চূড়ান্ত—'হেঁটেয় কাঁটা উপরে কাঁটা' হইয়া গিয়াছে;—এক লাট শিলা-বিন্যাস করিয়াছেন, আর এক লাট বাস্তু প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক সঙ্গে সমিতির কর্ম্মীদের ছবিও ছাপা হইয়া গেল,—যদিও আমরা ইতিপূর্ব্বেই ছাপিয়া চুকিয়াছি—এখন সমিতি একটু ঘর-মুখো হইয়া, এবং বারমুখো না হইয়া, পণ্ডিত-ব্রত পুনরায় গ্রহণ করিলে বাঙ্গালার ভাগ্য প্রসন্ন ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে। ছবির কথায় মনে হইল, রমাপ্রসাদের ছবিখানিতে তাঁহার চেহারা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু রাধাগোবিন্দের ছবিখানি দেখিয়া তাঁহার নামটিই উচ্চারণ করিতে হয়।

ভারতী। ফাল্গুন।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধূপের ধোঁয়ায় 'ভারতী'র মন্দির অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। ইহা নাটিকাও বটে, চম্পূও বটে। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উনো দুনো'র উপসংহার হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম—'রংকে ফেনিয়ে, ভাবকে ফেনিয়ে, ভাষাকে ফেনিয়ে অনেকবার আমি তোমাদের সামনে ধরেছি, হাততালিও পেয়েছি এবং ওর মধ্যে

যারা ফাঁকি ধরেছে, তাদের কাছে গালাগালিও খেয়েছি; আর মনে-মনে হেসেছি। * * * এই যে ভারত-শিল্প বলে কথাটা সবার মুখে এখন চলে গেছে, সেটাকে বাজারে চালাবার জন্তে একটা প্রকাণ্ড ফাঁদ আমাকে পাতবার ভার দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে একদিন এবং ব্যাধ যেমন মরা হরিণের ছালে সেজে আসল হরিণ ধরতে চলে, তেমনি আমাকেও কখনো মোগল, কখনো ক্ষপণক, কখনো বোষ্টম, কখনো শাক্ত - এমনি নানা শিল্পীর বেশ ধোরে লোক ভোলাতে হয়েছে। এ ভাব কোনোদিন দেখাতে সাহস হয়নি যে বিদেশের শিল্প আমি পছন্দ করেছি। * * * আমি মনে করেছি—এখন থেকে আমি মৌনব্রত যতটা পারি অভ্যাস করতে চেষ্টা করব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আর্ট জিনিসটা যে কেবলি পূবদেশে এবং পূবের মধ্যে আমাদের দেশেই প্রবলভাবে আছে, সেটা বিশ্বাস করতে আমি তোমাদের মানা করছি। এককাল ছিল যখন এর দিকে তোমাদের আকর্ষণ করবার জন্তে ভারত-শিল্পের National রাম-শিঙেটায় পু' জোরে আমাকে ফুঁ দিতে হয়েছে, কিন্তু এখন আমি দেশের শিঙে ফোঁকার ভার দশের হাতে দিয়ে নিজের ভাবনা নিয়ে গুছিয়ে বসবার একটু ছুটি জোগাড় করে নিয়েছি। * * * এখন আর শিল্পের জাতি-বিভাগ নিয়ে লড়ালড়ি কোরে মরতে আমায় হাজার লোভ দেখিয়েও তোমরা নামিয়ে আনতে পারবে না,—এমন কি নিজের শিঙে নিজে ফোঁকবার আশা দিয়েও না। কেন না বাজার আর সেখানকার দর-কষাকষির হট্টগোল ছাড়িয়ে [illegible] এসেই আমি বুঝতে পারছি যে, কলা-বিদ্যাধরী আর্টের যে যন স্তরে বাস করে সেই নিম্নস্তর ছাড়িয়ে একটা জায়গা আছে, যেখানে কলা-সরস্বতী পদ্মবনে বিরাজ করছেন—আর সেখানে আর্টের জাতিভেদ নেই; দেশ-বিদেশ সব সেখানে সমান, সবাই নিজের নিজের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে সেখানে চলেছে। সেখানে গ্রীক, পার্শী, হিন্দু, মুসলমান, চিনে, জাপানী এ-সবে ভিন্নতা নেই, এ তর্কও নেই। আছে কেবল বিচার—আর্ট কিংবা আর্ট নয়, নকল কিংবা আসল, আপনার কিংবা পরের; এমন কি নিজের আর্ট ও পূর্ব্বপুরুষের ধারকরা-পরস্ব কি না, এই বিচারই সেখানকার কথা; অন্য তর্কও নেই, কথাও নেই, ঝগড়াঝাটিও নেই।'—ওঁ শান্তি। 'ইহা বলিলেই সকল বলা হইল।'—গেটে। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'সে' কবিতায় 'যে'র সঙ্গে 'ছে' মিলিয়াছে। মিলের এই বিশেষত্ব ভিন্ন এই অক্ষম রচনায় আর কোনও দাবী-দাওয়া খুঁজিয়া পাইলাম না। শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রতীক্ষায়' সৌন্দর্য্য আছে। কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। কবির মানসীর সম্বন্ধেও কবির ভাষাতেই বলিতে পারি,—

'আমি চেয়ে আছি পথে—
ঐ গোধূলির উড়িয়ে ধূলি আস্‌বে সে কি রথে?'

———